আহমদ শরীফ রচনাবলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্‌মদ শরীফ রচনাবলী

১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী
১

আহমদ কবির সম্পাদিত

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ৮০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanaboli 1 : Collected works of Ahmed Sharif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
Second Reprint : February 2010

Price : Tk 800.00 only

ISBN 978-984-04-1287-7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাংলাদেশের জ্ঞানম নীষা ও পাণ্ডিত্যের জগতে আহমদ শরীফ মহীরুহ সদৃশ ব্যক্তিত্ব। উনআশিতম জন্মদিন উদযাপন শেষে আশি বছরের জীবন শুরু করার পর্যায়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু রেখে যান তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয়—অজস্র রচনা, অসংখ্য গ্রন্থ, অগণিত মূল্যবান গবেষণা। জীবনে এত বেশি লেখালেখি করেছেন যে সেগুলোর মুদ্রিত পৃষ্ঠা জড়ো করলে এক মহাস্তূপে পরিণত হবে বৈকি। নিঃসন্দেহে উত্তরসাধকেরা তাঁর বিপুল গবেষণার ফসল দ্বারা ঋদ্ধ এবং তাঁর অমল হিতবাদী চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশের মনন ধারার সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি এক প্রভাবশালী পুরুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা সহকারী হিসেবে তাঁর যথার্থ অধ্যাপনা জীবন শুরু। কিন্তু প্রভূত অধ্যয়ন, পরিচ্ছন্ন ইতিহাসজ্ঞান ও সমাজদৃষ্টির বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁর গবেষণা ও জ্ঞানকে অসামান্য এক ঠিকানায় পৌঁছে দেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও তুঙ্গে ওঠে। এ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, বাংলাভাষী সব অঞ্চলে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভাইপো ও পোষ্যপুত্র এবং ভাবশিষ্য আহমদ শরীফ আবদুল করিমেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানে ডক্টর শরীফের গবেষণা দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহিত্য সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ও আহমদ শরীফের। বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য রাজ্যের বরপুরুষেরা পিতৃব্য ও ভাইপো উভয়কে নিশ্চয়ই উচ্ছ্বসিত করতালি দেবেন।

উপাত্তে মধ্যযুগ, কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ আধুনিক—এই হল আহমদ শরীফের মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণা। কিন্তু তবু অচিরে 'মূর্তিমান মধ্যযুগে'র তথাকথিত ভাবমূর্তি ভেঙে দেন আহমদ শরীফ এবং পদার্পণ করেন আধুনিক সাহিত্যের জগতে। মূল্যায়নে অভিনিবেশী হন উনিশ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত এবং আরো অনেকের; একসময় যেমন তিনি মূল্যায়ন করেছেন দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান, আলাওল, কাজী দৌলত, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান প্রমুখের। হয়তো কখনো তাঁর মূল্যায়ন প্রতিক্রিয়াপূর্ণ, কিংবা কখনো বিতর্কিত, কিন্তু আহমদ শরীফের লেখার মূল্য এইখানে যে, একটা নতুন অভিমত ও দৃষ্টির পরিচয় সেখানে অবশ্যই আছে। আবার প্রতিদিনের সমাজপ্রবাহকে তিনি অভিনিবেশ সহকারে দেখেন, প্রগতি ও প্রগতির দ্বন্দ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সবসময় প্রগতির পক্ষেই নিজের চিন্তা ও অভিমত অনুকূল করে রাখেন। আহমদ শরীফের লেখায় বাংলাদেশের ভাঙাচোরা ও দুষ্ট সমাজের ক্লেদ ও ক্লিন্ন চিত্রগুলো অবশ্যই আছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আহমদ শরীফ নৈরাশ্য ভারাতুর নন, বরং সামাজিক প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায় দারুণভাবে বিশ্বাসী। আহমদ শরীফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলাবাদী লেখক নন, উপযোগিতাবাদী লেখক। সেই উপযোগিতাবাদের মূল আধার মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ, বাংলা ভাষার মানুষ, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ।

বাংলাদেশের আধুনিক চিন্তাচেতনার জগতে আহমদ শরীফ একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। তিনি পুরোনো মূল্যবোধ ও সংস্কারের ঘোর বিরোধী, সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক আধি-ব্যধির তুমুল সমালোচক। শ্রেয়সের সন্ধানী তিনি, তিনি গণমানবের হিতৈষী, সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল, একশ ভাগ অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী এবং সেইজন্যই নাস্তিক্য দর্শনের অনুরাগী। তাঁর গণমানব হিতৈষণা, মানবতাবাদ এবং সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, তাঁকে বাংলাদেশের বামধারার লোকদের প্রিয় করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাহসী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় তিনি সবসময় শ্রদ্ধেয় ও মান্য। অসংখ্য প্রগতিবাদী ও স্বদেশহিতৈষী সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ছিলেন যুক্ত এবং এই সব জায়গায় সবসময় তিনি স্পষ্টভাষী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী এবং গণমানবের হিতকামী। তারুণ্যমণ্ডিত আহমদ শরীফ জীবনে প্রচুর আড্ডা দিয়েছেন, জ্ঞান ও বিদ্যার কথা বলেছেন অজস্র ; ভাষণ, বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন অসংখ্য।

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে একজন সেরা গবেষক, উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক ও লেখক এবং চিন্তানায়ক। চল্লিশটির বেশি মৌলিক গ্রন্থ এবং চল্লিশটিরও বেশি সম্পাদিত গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। দৈনিকে সাপ্তাহিকে কলাম লিখেছেন প্রচুর এবং আমৃত্যুই লিখেছেন। তাঁর রচনাসম্ভার নানা বিষয়ের, নানা প্রসঙ্গের ও নানা রসের ও ব্যঞ্জনার। ইতিহাস ও ধর্মদর্শনের অতি গুরুতর রচনা যেমন তাঁর আছে, তেমনি আছে হালকা চালের লঘু রচনা। এত বিপুল রচনাসম্ভার রচনাবলীর আকারেই পরিবেশনযোগ্য। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সুখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা আগামী প্রকাশনীর সৌজন্য ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা অবশ্যই প্রশংসার্হ। হয়তো রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক পরিসজ্জাও হতে পারত। কিন্তু তাতে আহমদ শরীফের চিন্তা চেতনার কালানুক্রমিক পরিচয় পেতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হত। আলোচ্য রচনাবলী গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুসারে পরিকল্পিত। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে আহমদ শরীফের প্রথম দিককার মৌলিক গ্রন্থগুলো সংকলিত।

আহমদ কবির
আবুল হাসানাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বিচিত চিন্তা

সাহিত্য চিন্তা : ভাষার কথা ৩ কেজো ও অকেজো সাহিত্য ৭ সাহিত্যে রূপ-প্রতীক ১১ কথা সাহিত্যের সমস্যা ও এর বিষয় বস্তু ১৫ গণ সাহিত্য ২৪ বুর্জোয়াসাহিত্য বনাম গণসাহিত্য ২৮ সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা ৩১ কবিতার কথা ৩৫ সাহিত্যের স্বরূপ ৪১ সাহিত্যের আদর্শবাদ ও অর্ডিন্যান্স ৪৫ জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের মূল্য ৪৮ বাঙলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা ৫১ দোভাষী পুথির ভাষা ৫৫ পুথিসাহিত্যের ইতিকথা ৬৪ আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান ৭১ সাহিত্যের জাতীয় ঐতিহ্য ৭৪ সাময়িক পত্র ৭৬ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়া চিত্র ৭৮ জীবন শিল্পী ১২২

সংস্কৃতি চিন্তা : স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য ১২৫ মানুষের সাধনা ১২৭ বিকাশের পথে মানবতা ১২৯ জীবনবোধ ও সংগ্রাম ১৩১ স্বাতন্ত্র্য ১৩৩ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর ১৩৬ ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ১৪০ মানববিদ্যা ১৪৩ দেশ, জাত ও ধর্ম ১৪৬ সংস্কৃতি ১৪৯ দুর্দিন ১৫২ ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা ১৫৭ বিশ্বের নাগরিক ১৬১ জেহাদের স্বরূপ ১৬৩

সাহিত্যিক-চিন্তা : নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদন ১৬৭ মধুসূদনের অর্ন্তলোক ১৭০ বঙ্কিম-মানস ১৭২ সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা ১৭৯ রবন্দ্রী-মানসের স্বরূপ সন্ধানে ১৮৬ রবীন্দ্রনাথ ১৯০ অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ ১৯২ মহাকবি কায়কোবাদ ১৯৯ সৈয়দ এমদাদ আলীর সাধনা ২০২ শাহাদাৎ- সাহিত্যের বৈশিষ্ঠ্য ২০৪ নজরুল মানস ২০৭ যুগন্ধর কবি নজরুল ২০৯ নজরুলের কাব্য প্রেরণার উৎস ২১৩ নজরুলের কাব্য সাধনার লক্ষ্য ২১৭ নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে ২১৯ নজরুল-কাব্যে প্রেম ২২২ নজরুল ইসলামের ধর্ম ২২৭ লালন শাহ ২৩০ বাউল সাহিত্য ২৩৪

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা

অন্ন ও আনন্দ ২৪৩ মুক্তির অন্বেষায় ২৪৬ বিশ্ব সমস্যা ২৫০ মানবিক সমস্যার সমাধানে সংবাদপত্র ২৫৩ ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা ২৫৬ জাতীয়তা ২৬১ চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা ২৬৪ ইংরেজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয় -সূত্র ২৬৭ জীবন, সমাজ ও সাহিত্য ২৭৩ মসী-সংগ্রামীর সমস্যা ২৭৬ জাতিবৈর ও বাঙলা সাহিত্য ২৭৯ পঁচিশে বৈশাখে ২৮২ মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ ২৮৬ রবীন্দ্র প্রসঙ্গে ২৯১ মোহিত লালের কাব্যের মূলসূর ২৯৩ বাংলাভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব ৩০৮ বাঙলা সাহিত্যের আঁধার যুগের ইতিকথা ৩১৫ বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস ৩৩২ বৈষ্ণবমতবাদ ও বাঙলা সাহিত্য ৩৩৬ বিদ্যাপতির কাল নিরূপণ ৩৪৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ অন্বেষা

সংস্কৃতির মুকুরে আমরা ৩৬১ বাঙালির সংস্কৃতি ৩৬৪ বাঙলা ও বাঙালি ৩৬৯ ইতিহাসের ধারায় বাঙালি ৩৭২ জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব ৩৭৯ ভাষা প্রসঙ্গে—বিতর্কের অন্তরালে ৩৮৩ ইতিহাসের আলোকে আত্ম-দর্শন ৩৯০ একটি প্রতারক প্রত্যয় ৩৯৮ রাজনীতি ও গণমানব ৪০২ মিলন ময়দানের সন্ধানে ৪০৮ কল্যাণ অন্বেষা ৪১১ শিল্প সাহিত্যে গণরূপ ৪১৪ একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য ৪১৬ খাদ্য-সংকট : বিশ্বসমস্যা ৪২১ বাঙলার ধর্ম ৪২৫ বাউল তত্ত্ব ৪৩২ বাঙলায় সূফী প্রভাব ৪৬০ সংস্কার-সততা-সাহিত্য-প্রজ্ঞা-শিক্ষা ৪৬৯ পদাবলী : কাম ও প্রেম ৪৭৩ নজরুল-জিজ্ঞাসা ৪৭৭ নববর্ষ ৪৮০

জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে

একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা ৪৮৫ শিক্ষার হের-ফের ৪৮৯ প্রতিকার-পন্থা ৪৯২ ঐক্যসূত্র ৪৯৭ জিজ্ঞাসা ৫০০ দূর্বা ৫০৩ জীবনের নিয়ামক ৫০৫ একটি অলস-চিন্তা ৫০৮ একটি আষাঢ়ে চিন্তা ৫১১ অপ্রেম ৫১৪ ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস ৫১৭ বিদ্যা ও বিশ্বাস ৫২০ পূর্বপুরুষ : উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য ৫২২ সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য ৫২৭ সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব ৫৩০ আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে ৫৩৩ প্রবন্ধ-সাহিত্য ৫৩৫ গবেষণা-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্য ৫৩৭ সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ ৫৪০ বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা ৫৪৩ তত্ত্ব-সাহিত্যের গোড়ার কথা ৫৫৭ মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম-রচিত তত্ত্বসাহিত্য ৫৬৩ বাউল মত ও সাহিত্য ৫৬৫ সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা ৫৭১ কবি মুহম্মদ খান ও তাঁর কাব্য ৫৮৬ শাহ্ আবদুল লতিফ ভিটাই ৫৯৩ হবীবুল্লাহ বাহার-স্মরণে ৬০০ বলাকাকাব্যে মৃত্যু-মহিমা ৬০৩ নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে ৬০৭ নজরুল কাব্যে বীর ও বীর্যপ্রতীক ৬১৬

চট্টগ্রামের ইতিহাস

আদি যুগ ৬২১ মধ্যযুগ : প্রাক-মুঘল আমল ৬৩৯

জীবনপঞ্জি ৬৬০
গ্রন্থ পরিচিতি ৬৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত চিন্তা

আহমদ শরীফ রচনাবলী-১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জননী-স্বরূপা ফুফুআম্মা
মরহুমা বদিউননিসার
স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার কথা

কাছের মানুষকে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের কথা—কাজের কথা হয়তো বুঝিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু দূরের মানুষকে—ভবিষ্যতের মানুষকে—কাজের কিংবা মনের কথা কীভাবে বলা যায়? এ সমস্যা একদিন মানুষকে বিব্রত করেছে। এর সমাধান পেয়েছে মানুষ মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি সৃষ্টি করে।

সেই আদিকালে এক জায়গার বা এক গোত্রের মানুষ মিলে চুক্তি করেছে, অতঃপর বিশেষ বিশেষ ধ্বনি দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা ভাব কিংবা আচরণ নির্দেশিত হবে। যেমন 'গরু' বললে এক বিশেষ জীবকে বুঝব, 'ঘাস' ধ্বনিতে বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করব, 'সুন্দর' ধ্বনি দিয়ে এক বিশেষ ভাব ব্যক্ত করব, 'খাব' বলে এক বিশেষ উদ্দেশ্য জানিয়ে দেব। এভাবে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হল।

তাহলে ধ্বনি আসলে বোবা। মানুষের অভিপ্রায়ই তাকে অর্থ দান করে। ধ্বনিগুলোর অর্থবহতা একান্তভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তি-নির্ভর। এইজন্যেই দুনিয়াতে এত ভাষা এবং একের ভাষা অপরের অবোধ্য। যে-লোক যে-ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়, সে-ভাষাই তার মাতৃভাষা। সে-ভাষা তার দেহের রক্তমাংসের মতোই একান্ত নিজের। আমরা যা কিছু অনুভব করি, যা কিছু ভাবি, তা এই ভাষার মাধ্যমেই হয়। কাজেই ভাষা হচ্ছে জীবনানুভূতির বাহন, বেশি করে বললে বলতে হয়, ভাষাই জীবন। তাহলে মাতৃভাষা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে অনেকাংশে জীবনকেই খণ্ডিত করা, ক্ষুদ্র করা, হয়তোবা ব্যর্থ করা। কচ্ছপকে উল্টিয়ে দিলে যেমন সে না চলতে পেরে আর না-খেতে পেয়ে মারা যাবে, তেমনি মানুষের মুখের ভাষা—ভাব-ভাবনার ভাষা কোনো কৌশলে ভুলিয়ে দিলে মানুষ হিসেবে তার অপমৃত্যু অনিবার্য।

এ-যুগে নয় শুধু, চিরকাল মানুষ অবচেতন মনে এ-কথা উপলব্ধি করেছে। তাই প্রত্যেকের স্ব স্ব ভাষা এত প্রিয়। তিনটে ধর্ম দুনিয়াময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে : বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টধর্ম এবং ইসলাম। বিজাতির ও বিদেশীর এসব ধর্ম মানুষ সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে; কিছু ধর্মের ভাষা কেউ নেয়নি, এসব ধর্মভাষা মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার প্রাচীর পার হয়ে কারুর মুখের বুলি কিংবা মনের ভাষা হয়ে ওঠেনি এতকাল পরেও।

আগেই বলতে চেয়েছি, একটি বা একাধিক ধ্বনি-সমষ্টিতে হয় শব্দ, এবং শব্দের সঙ্গে শব্দের সুযোজনায় পাই ভাষা। ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য বক্তার অভিপ্রায় অনুসারেই অর্থবহতা লাভ করে, নইলে ওগুলো বোবা। যেমন : খা, যা, ধৃ, কৃ, 'হ' প্রভৃতি প্রকৃতি বা ধাতুমূল বক্তার কোনো অভিপ্রায় নির্দেশ করে না, এগুলোর সঙ্গে বক্তার পরিচায়ক ও তার অভিপ্রায়-সূচক পুরুষ (Person), কাল ও ভাব (Mood) জ্ঞাপক চিহ্ন যুক্ত হলেই তা অর্থবহ শব্দ বা পদ হয়। তেমনি 'মানুষ' শব্দের সঙ্গে বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ও কারক চিহ্ন যোগ করলেই তা বক্তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করবার যোগ্য হয়। এতেও হয় না, বক্তার অভিপ্রায়-অনুগ কণ্ঠস্বরও উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই, তা হলেই শব্দ বা বাক্য অর্থগ্রাহ্য হয়। লিখিত ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন যোগে এবং পৌর্বাপর্য সূত্রে এ অভিধা পাওয়া যায়, তাই আমরা বর্ণ-নির্ভর ভাষার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই। অর্থাৎ বক্তার উদ্দিষ্ট অভিপ্রায় বুঝে নিই। যেমন বিভিন্ন চিহ্ন যোগে একই শব্দের—আদেশ, নির্দেশ, অনুনয়, প্রশ্ন, বিস্ময় প্রভৃতি সূচক অর্থ পাই। একটি দৃষ্টান্ত দিই : যাও। যাও ! যাও ? যাও, ইত্যাদি চিহ্নযুক্ত 'যাও' পদটি বিভিন্ন অর্থ-ব্যঞ্জনা দান করছে।

অতএব আমাদের পুরোনো কথায় ফিরে যেতে হয় : "ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। ভাবই আসল, ভাষা হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ভাব থাকলে ভাষা আপনিতেই আসে।" ভাব ও ভাষায় আধেয়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধার সম্পর্ক। আধারের পরিবর্তনে 'আধেয়' আকৃতি বদলায়, প্রকৃতি হারায় না। অতএব ভাষা গৌণ, ভাবই মুখ্য।

এই উক্তির সার্থকতা ইসলামের ইতিহাসেও পাই। নবলব্ধ ইসলামি ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আরবি ভাষা পুরোনো কলেবরে নতুন অভিধা লাভ করে। এভাবেই আগুন-পূজক ইরানির ভাষা হয় ইসলামি। তারা আরবের ধর্ম নিল, কিন্তু নিজের ভাষা রাখল। তাই ইসলামের মৌল শব্দগুলোরও নিজেদের ভাষায় তর্জমা হল, তাতেই আরবের আল্লাহ, সালাৎ, সিয়াম, মলক ও জান্নাত শব্দগুলো ইরানে হল খোদা, নামায, রোযা, ফেরেস্তা আর বেহেস্ত।

এমনিই হয়। মাতৃভাষায় তর্জমা না হলে কোনো কথাই,—কোনো ভাব-ভাবনাই মনের কথা—প্রাণের কথা হয়ে ওঠে না। তাই তর্জমার প্রয়োজন ও আয়োজন। তাই ইসলামি ভাষা বলে স্বীকৃত আরবি, ইরানি ও উর্দু ভাষায় লিখিত কেতাব তথাকথিত হিন্দুর ভাষা বাঙলায় অনুবাদের প্রয়াস। আমরা তর্জমা করি, কেননা আমরা জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমরা রচনা করি, কারণ আমরা নিজেদের জানাতে চাই, বোঝাতে চাই। অতএব, আমাদের শ্রদ্ধেয় ইসলামি ভাষাতে আমাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয় না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই বিজাতির ও বিধর্মীর ভাষা বলে মেনে নিয়েও পবিত্র ইসলামের বাণী, মুসলিম-মনীষার ফসল নাপাক মাতৃভাষার মাধ্যমে পেতে চাই। নইলে হৃদয়ঙ্গম হয় না যে! তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামের বাণী ও বুলিকে পবিত্র রাখা নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিপাক করা। কাজেই ভাষার ইসলামিরূপের কথা এক্ষেত্রে উঠানোই নিরর্থক।

আর একটি কথা বলেছি, আমরা কথা রচনা করি; কেননা আমরা যা ভাবি, যা জানি তা অপরকে জানাতে চাই, অপরের হৃদয়-মনে সঞ্চারিত করে দিতে চাই। সে কী শুধু মুসলমানকে? সে কী কেবল স্বদেশবাসীকে? যদি বিশ্ববাসীকেও তা জানাতে চাই, তা হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ইসলামের কথা আর কেউ শুনতে চাইবে না, তার বিশ্বজনীন মর্মবাণীই কেবল অপরকে আকৃষ্ট করবে। এর তাজা প্রত্যক্ষ প্রমাণ য়ুরোপ। সচেতন বা অচেতনভাবে আমরা প্রতিমুহূর্তে য়ুরোপ থেকে মানস-খাদ্য গ্রহণ করছি, কিন্তু 'কিরিস্তানী'কে সযত্নে পরিহার করি—এড়িয়ে চলি। অথচ ভাব-জগতে যা কিছু য়ুরোপের দান—তার কতকাংশ নাস্তিক্যজাত হলেও অধিকাংশ আস্তিক্য বুদ্ধির ফল। সে-আস্তিক্য বুদ্ধি নিশ্চয়ই খ্রীস্ট-মত ভিত্তিক। তাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্মবোধ ছাপিয়ে যা বিশ্বজনীন রূপ নিয়েছে, অর্থাৎ যা সর্ব-মানবিক হয়ে উঠেছে, তা-ই আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তাতেই আমাদের অধিকার বর্তেছে। অতএব, বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন সৃষ্টি করতে হলে আমাদের ইসলামি ভাব ও বাণীকে 'অপরূপ' করে তুলতে হবে, কেননা আগেই বলেছি স্থূলস্বরূপে তা অমুসলিমের শ্রদ্ধা পাবে না। এজন্যে আমাদের লক্ষ্য হবে—Form-এর পরিচর্যা নয়, —Spirit-এর প্রতিষ্ঠা।

আবার বলছি, শব্দ হল ভাষা-সৌধের—বাক্য-দেহের বোবা উপাদান। বক্তা বা লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী তা অভিধা পায়। এজন্যে প্রয়োগভেদে শব্দ অর্থান্তর লাভ করে। যেমন, গৌরব—স্নেহ—pride, শ্রদ্ধা—ইচ্ছা, আকর্ষণ—respect, গঙ্গা—গঙ্গানদী, গাঙ—যে-কোনো নদী, যবন—Ionian—মুসলমান, পাষণ্ড-ধর্মসম্প্রদায়—দুর্বৃত্ত। এরূপ পঙ্কজ, গোপাল, করী। এছাড়া শব্দের একাধিক অর্থ তো রয়েইছে। যে-কোনো ভাষা সম্বন্ধে একথা সত্যি! আবার ভাব-বিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাব-চিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাক্-ভঙ্গিও বদলায়। ভাষা ও ভঙ্গি যে একান্তভাবে বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ, তার বিশিষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনা। রবীন্দ্রনাথও পয়ার-ত্রিপদীতে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু রূপে-রসে আগের ও তাঁর সমকালের অনুরূপ কবিতার সঙ্গে এদের পার্থক্য কত! কথায় বলে Style is the man. তাই ব্যক্তিক-ভঙ্গিই সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনে। আর 'ব্যক্তিক ভঙ্গি' বিশিষ্ট হয় কেবল তখনই, নতুন ভাব-চিন্তার বীজ উপ্ত হয় যখন বক্তার মনোভূমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মনন-চিন্তন নিত্য বিকাশমান। কাজেই তার নতুন ভাব-চিন্তা ধারণে সমর্থ পুরোনো শব্দগুলো স্ব-অর্থে টিকে থাকে, অন্যগুলো হয় বাদ পড়ে, নয়তো পুরোনো দেহে নব অভিধা নিয়ে বেঁচে থাকে। এতেও কুলোয় না, তাই অর্থগর্ভ ও ব্যঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। সৃষ্টি প্রতিভা-সাপেক্ষ, তাই প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ভাব-বাহী শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়। এভাবে সৃজনে এবং ঋণে-ঋক্থে ভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি পায়। সভা করে এ গ্রহণ, বর্জন ও সৃজন চলতে পারে না। সৃষ্টির মুহূর্তে স্রষ্টার মন্ময় গরজেই তা সম্ভব হয়। শব্দের এই অভিধা, বিবর্তন ও শব্দ সৃষ্টির জগৎ এক বিচিত্রলোক। ব্যক্তির ভাব-চিন্তার ও অনুভূতি-উপলব্ধির মানস-সত্তার সংস্পর্শে শব্দ প্রাণময় ও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এ অনুভূত সত্য, কিন্তু অনির্বচনীয়। এ রহস্য একদা ভারতীয় ঋষিদের চমকে দিয়েছিল, তাই বিস্ময়-বিমুগ্ধ ঋষি-মুখে উচ্চারিত হয়: 'বাক্ ব্রহ্ম'—শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের অবয়বে মানুষের ভাব-সত্তা যে জীবন্ত মূর্তি পায়, এবং সুবিন্যস্ত শব্দ যে অসামান্য শক্তির আধার হয়ে ওঠে, আর এজন্যেই 'বাক' যে জীবন-নিয়ন্তা ব্রহ্মস্বরূপ, তা ঋষিদের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' খ্যাতি থেকেই বোঝা যায়। গুঞ্জন ও মুখরতাতেই বাক্য-বদ্ধ শব্দের পরিচয়—বাক্যই মানসকে মূর্তি দেয়, ভাবকে দেয় মুক্তি—এভাবে বাগ্বদ্ধ হয় মানুষের আন্তর্সত্তা, ফুটে ওঠে জীবনের প্রতিচ্ছবি। ফলে ভাষা অনুভূত-জীবনকে দেয় মূর্তি আর জীবনানুভূতিকে দেয় মুক্তি। এবং জীবন হচ্ছে জাগ্রত মুহূর্তের কতগুলো অনুভূতির সমষ্টি। তাই বলেছিলাম যেহেতু ভাষাই বোধের বাহন, ভাষাই জীবন।

দুটো কারণে শব্দের সৃজন ও ঋণ গ্রহণ চলে : নতুন ভাব-চিন্তার উদ্ভাবনে এবং বস্তুর আবিষ্কারে। স্বদেশে যদি নতুন ভাব-চিন্তার উদ্ভব বা উন্মেষ হয়, কিংবা নতুন বস্তু তৈরি বা আবিষ্কৃত হয়, তা হলে নিজের ভাষাতেই সে-মনন প্রকাশক বা সে-বস্তু নির্দেশক শব্দ তৈরি হয়। আর যদি বিদেশী ভাব বা বস্তু নেয়া হয়, তা হলে প্রাসঙ্গিক বিদেশী শব্দকে নিজের ভাষায় ঠাঁই দিতেই হয়। একে রোধ করতে যাওয়া যেমন নিরর্থক, প্র-গরজ ছাড়া বি-ভাষার শব্দ আনার অপচেষ্টাও তেমনি অসার্থক।

সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের স্বস্তি আত্মগোপনে। সবল পরাক্রান্ত আর দুর্বল সন্ত্রস্ত। সবল জানতে চায়, জানাতে চায়, সে বুঝতে উৎসুক আর বোঝাতে প্রয়াসী। সে দিকে-দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়ার অভিলাষী, ব্যাপ্তিতেই তার আনন্দ, তার জীবনোল্লাস, তার আরাম। তাই মানুষের মানসোল্লাস আজ গ্রহে-গ্রহে জীবন ও জীবিকার প্রসার খুঁজছে। দুর্বলের ধর্ম আত্মসংকোচন আর সবলের বিলাস আত্মবিস্তারে। দুর্বল Self-preservation-এ বা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আর সবল Self-expansion-এ বা আত্মপ্রসারে রত। দুর্বল স্থবির, সবল চঞ্চল। একজন প্রাণহীনতায় অচল, অপরজন প্রাণপ্রাচুর্যে উল্লোল। দুর্বলের নিয়তি আত্মবিলোপে, সবলের তৃপ্তি আত্ম-উল্লাসে—মহিমার উজ্জ্বলতা সাধনে। আত্মার অপমৃত্যুতে দুর্বলের লয়, আর আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সবলের জয়। তাই দুর্বলতা সমাজে ঘৃণ্য, আইনে অপরাধ ও ধর্মে পাপ।

আমরা রেনেসাঁ-দীপ্ত জাগ্রত জাতি। আমাদের তো দুর্বলতা থাকার কথা নয়। তাহলে আমাদের ডর কিসে, আমাদের ভয় কাকে ? দ্বন্দ্বে ভীত হয় কারা ? আমরা তো দুর্বল নই ! আমাদের তো দেবার-নেবার পালা সবে শুরু হল ! এ বেনে-যুগে মানস-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাল ঠুকে চলতে না জানলে আমাদের 'জান' নিয়ে টানাটানি পড়বে, তাতে 'জান' যদিবা বাঁচে 'মন' নিশ্চিতই হারাব। আর কে না জানে, মন-হারানো জান-হারানোর চাইতেও ক্ষতিকর। 'উঠতির' লক্ষণই হচ্ছে নির্ভীকতা, উদারতা, প্রাণময়তা, মুখরতা, জিজ্ঞাসা, কর্মনিষ্ঠা ও চিন্তা-ভাবনার প্রবহমানতা। আমরা নতুন জাতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মব্যাপ্তিই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ব্রত। এতকালের আত্মসংকোচন ও জড়তার গ্লানি মুছে আত্মপ্রসারে ব্রতী হওয়াই তো কাম্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-প্রসঙ্গে এ আবেগের বন্যা ছুটল, সে-কথাই বলি : বুতপরস্তের আরবি, আগুন-পূজকের ফারসি এবং পৌত্তলিকের উর্দু [ভাষা-বিজ্ঞান মতে বাক্যরীতির (Syntax) ধরন দিয়েই ভাষার জাত বিচার হয়, এই দৃষ্টিতে উর্দু ভারতীয় আর্যভাষাভুক্ত] যদি ইসলামি ভাষায় পরিণত হতে পারে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের ভাষা অবিকৃতভাবেই ইসলামি হতে বাধা কী ? মুসলমানের মাতৃভাষা, মুখের বুলি হিন্দুয়ানি হতে পারে ? আমরা না বলি—

চীন ও আরব হামারা
হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হায় হাম
ওয়াতন হায় সারে জাহাঁ হামারা !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেজো ও অকেজো সাহিত্য

জার্ন্যাল কাব্য হয় কি-না কিংবা কাব্য জার্ন্যাল হতে পারে কি-না এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু নিরর্থক। কেননা, পরিণামে স্বীকার করতেই হবে যে জার্ন্যালও সাহিত্য হয়, আর সাহিত্যও জার্ন্যাল হতে পারে। এ-কথা এমন নিঃসংশয়ে বলতে পারছি, রবীন্দ্রনাথের শেষের দশ-বারো বছরের রচনার নজির সামনে রয়েছে বলেই।

এ যদি সত্য হয়, তাহলে জটিল কথার জাল না-পেতেই বলা যায় সাহিত্যের দুই তত্ত্ব-দুইরূপ, একটি তার ব্যবহারিক ও প্রাত্যহিক দিক, অপরটি তার আত্মিক ও চিরন্তন রূপ। এমনকি শক্তিমানের হাতে পড়লে একাধারেই দুইরূপ—দুইতত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে; শেক্সপীয়র-ভিক্টর হ্যুগো-গ্যেটে-টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এবং বড়-ছোট সব লেখকেরই সার্থক রচনায় এর প্রমাণ কিছু কিছু মিলবে।

যেহেতু মানুষের কোনো আচরণই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাব-নিরপেক্ষ নয়, সেহেতু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পারিবেশিক প্রভাব রচনায় না-থেকেই পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, চিন্তার উৎপত্তি ঘটে পরিবেশ থেকেই। Thought-provoke করাবার কারণ সবসময়ই আবেষ্টনীর মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে কোনো ভাবই নিরূপ-নিরপেক্ষ হতে পারে না, যেমন আগুন হতে পারে না নিরবলম্ব। কাজেই চিন্তার জাগরণ যখন আপেক্ষিক এবং তা পরিবেষ্টনী-উদ্ভূত—তথা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-সংস্কারপ্রসূত অন্তত সে-সংস্কার সংপৃক্ত, তাহলে মানবিক আচরণে নির্জলা নিরূপ-নিরপেক্ষ কিছু আরোপ করা অসম্ভব। এদিক দিয়ে যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব যে মানুষের ভাব-চিন্তা-অনুভূতি বাহ্য প্রয়োজন, প্রেরণা বা উত্তেজনা জাত—তা স্থূলও হতে পারে, আবার এমন সূক্ষ্মও হয়, যা সচেতনভাবে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু অবচেতনার প্রভাবে অভিভূতি আনে। যা স্থূল তা বাহ্য প্রয়োজন মিটায়। যা সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ তা দিয়ে ব্যবহারিক জীবনের কোনো কাজই হয় না হয়তো। যেমন কেজো কিছু হয় না ফুল বা পাতাবাহারের গাছ দিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যও দুই প্রকার—কেজো আর অকেজো। অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বোঝানো সহজ নয়, তেমনি অকেজো সাহিত্যের কার্যকরতা দেখানো কঠিন। তবে বলা যায়, জীবনে সুন্দরের যে-স্থান, মনে অকেজো সাহিত্যেরও সে-চাহিদা। আজ স্বার্থবুদ্ধির ফেরে পড়ে দুনিয়ার লোক কেজো সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। অকেজো সাহিত্যের নামে তারা চরম অবজ্ঞায় নাক সিটকায়। তাদের বক্তব্য অনেকটা এরকম : অন্নের কাঙাল চাষীর ধান-পাটের চাষই জীবনের ব্রত। কেননা ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করাই তার লক্ষ্য। সে যদি ধান-পাট ক্ষেতে ফুলের বাগান করার শখ করে, তাহলে তা হবে তার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। তাকে আমরা বলব মূর্খ, বিকৃতবুদ্ধি কিংবা নির্বোধ। সে ঘৃণ্য। আজকের দিনে সমস্যা-বিমূঢ় কাঙাল মানুষ তাই কেজো সাহিত্যের পক্ষপাতী। তাদের মতে সাহিত্য-বিলাসের পরিবেশ পৃথিবীতে আজ দুর্লভ। তাই রসকৈবল্যাদর্শের প্রতি তারা মারমুখো। তারা সংখ্যাগুরু। কাজেই সবাই তাদের দাপটে কাবু-খামোশ হয়ে আছে।

তাই বলে অকেজো সাহিত্য আজও অনর্থক নয় এবং কোনোকালেই একেবারে নিরর্থক মনে হবে না। কেননা তেমনি নির্বুদ্ধিতা হবে রমনাগ্রীনে ধানচাষ করবার আয়োজন করলে। ধান-পাটের প্রয়োজন যতই গুরুতর হোক, ফুল-বাগানের সাথে তার তুলনা হতে পারে না যেমন তুলনা হয় না লোহায়-সোনায় ফুল-বাগানের বিরোধিতা যদি করতে হয়, তা হলে তা অসামর্থ্যের অজুহাতেই করব, অপ্রয়োজনের বলে নয়। ধান-পাটে জৈব-প্রয়োজন মিটে, ওটি চাষীরও জীবনের লক্ষ্য নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—means to an end মাত্র। আমরা উপায়কেই লক্ষ্য ঠাওরেছি, আমাদের জীবনের বিড়ম্বনা এখানেই। ধান-পাট উপলক্ষ মাত্র—লক্ষ্য তো নিশ্চিত মানসানন্দ উপভোগ। বাগান সে চাহিদা মিটায়। কাজেই যেখানে জৈব-প্রয়োজনের শেষ, মানস-আয়োজনের সেখানেই শুরু। অতএব, অকেজো সাহিত্য কেবল উঁচুস্তরের নয়, যথার্থ কাজেরও ; কেবল উপভোগের নয়, পরম উপকারেরও।

সমস্যাবিমূঢ় কাঙাল মানুষের অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে, 'আঙুর ফল টক' শ্রেণীর যুক্তি দিয়ে মহৎ প্রয়োজনের আয়োজনকে তাচ্ছিল্য দেখাবার আস্ফালনেই কেবল আমাদের আপত্তি।

যে-অর্থে আমাদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রয়োজনের; সে-অর্থে সাহিত্য কোনো কালে প্রয়োজন ছিল না—হতে পারে না। সাহিত্য করে কয়জন, আর পড়ে কয়জন ? সাহিত্যই জীবনের অপরিহার্য সামগ্রী যে নয়, তার প্রমাণ (অশিক্ষিতের তো কথাই নেই) শিক্ষিত লোকদের গুটিকয়জনই সাহিত্য পড়ে। এবং তাও সারাজীবনে পড়ে কয়খানা ? যারা পড়ে না, তারা জীবনে উপভোগ-উপলব্ধির অসম্পূর্ণতাও অনুভব করে না। কাজেই সাহিত্যাদি কলা এমনিতেই কেজো জীবনের বাইরে। তাহলে যা আদপেই কেজো নয়, তাকেই কাজে লাগানোর এত আয়োজন কেন ? কথাটা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

জনমনে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রচেতনা দানের জন্যে কিংবা স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, কল্যাণবুদ্ধি জাগানোর জন্যে, অথবা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের ইঙ্গিত কিংবা প্রেরণা যোগাবার জন্যেই যে সাহিত্য হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আজকাল জীবন-সচেতন মানুষ মাত্রই একমত। এ যে-রচনায় নেই তা ব্যর্থ। এ-ই তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত। আমরা তো স্বীকার করেছি যে কেজো সাহিত্যও আছে। আমাদের আপত্তি হচ্ছে প্রথমত কেজো সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য নয়, দ্বিতীয়ত কেজো সাহিত্য নিতান্ত কেজো বলেই মহৎ নয়, তৃতীয়ত কেজো সাহিত্য সৃষ্টি করাই কারো ব্রত হওয়া উচিত নয়। কেন, এবার তা-ই বলছি। শোনা যায় এবং ঘটা করে সারা দুনিয়ার নানা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে শোনানোও হয় যে সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-প্রচারে, পীড়ন-অপসারণে, আযাদী অর্জনে, রাষ্ট্রগঠনে, মতবাদ গড়নে,বিপ্লব-বিদ্রোহ সৃজনে, সংস্কৃতির উন্নয়নে, জাগরণ আনয়নে কিংবা সামগ্রিকভাবে জাতীয় চেতনা দানে কেজো সাহিত্যের মতো এমন অব্যর্থ অস্ত্র আর নেই। ঘরে বসে কলম পেষো, কাগজে ছেপে দাও, ব্যস, জাদুর মতো অভীষ্ট ফল ফলে গেছে!

কিন্তু প্রচার-সাহিত্য ছাড়া এসব ব্যাপারে সাফল্যের আর কোনো উপায় নেই, কিংবা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারই একমাত্র পন্থা তা মানা যাবে না, কেননা আমরা চোখের সামনেই দেখছি, এক জায়গার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরই অন্যত্র দাঙ্গা বাঁধানোর পক্ষে যথেষ্ট। অশিক্ষিতের দেশ কঙ্গোও যখন স্বাধীন হয়, খবরের কাগজে পরিবেশিত লুমুম্বা-হত্যার কেবল সংবাদই যদি উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচুর কারণ হয়ে ওঠে কিংবা সম্পাদকীয় মন্তব্যই উত্তেজনা ও প্রেরণাদান তথা বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়, তাহলে চেতনা দানের সাহিত্য অপরিহার্য বলে মানি কী করে ? যেখানে স্বার্থ, গরজ ও পীড়ন সেখানে মনটি এমনিতেই Time-bomb-এর মতো তৈরি হয়েই থাকে, সামান্য উত্তেজনা কিংবা যোগ্য নেতৃত্বে গণশক্তি ফেটে পড়েই। এ আমাদের দেখা-জানা কথা। কাজেই কেজো সাহিত্য যে খুব কাজের তা ধ্রুব নয়। এক্ষেত্রে বরং রাজনীতিকের বক্তৃতাই বিশেষ কার্যকর। ভালো বক্তার ভালো লিখিয়ে হওয়া সম্ভব, কিন্তু বড় বক্তা বড় লিখিয়ে নন।

এবার অকেজো সাহিত্যের কথায় আসা যাক। ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শানুগত্য ও মতবাদনিষ্ঠা কেবল ভালো নয়, অতি প্রয়োজনীয়ও বটে। তাতে করে নিয়ম-নীতির বেষ্টনীর মধ্যে জীবন নির্বিঘ্নে উপভোগ করা সম্ভব ও সহজ হয়, তাতে মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা-পীড়নের আশঙ্কা কমে। এতে করে সজ্জন, সচ্চরিত্র ও সুনাগরিকের সংখ্যা বাড়ে। এককথায় ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব material ও লাভের ব্যাপারে একরকম নিশ্চিন্তই হওয়া যায়। কেজো জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরেও যে একটা মনোজগৎ রয়েছে ! উপভোগ-উপলব্ধির নিবিড়তম যে-কেন্দ্র, তাতে কেজো কথার দাম নেই। সে হল অকাজের কাজী, অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নিয়ে তার কারবার। সে স্থূল কিছু গ্রহণ করে না। হয়তো বা সহ্যও করে না। তার কাজ নির্যাস নেয়া, সেটি অবিমিশ্রতায় নিরূপ না হলেও স্বরূপে তাকে ধরা মুশকিল। ফুল গাছেই জন্মায়, তবু ফুল আর গাছ এক নয় ; তেমনি বাহ্যঘটনা, পরিবেশ ও আচরণই সে-উপলব্ধি ও বয়সের ভিত্তি বা প্রসূতি, তবু মা-মেয়ের আদর্শে মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কতটা স্বপ্নের মতোই। এ অবচেতন মনের লীলা। মনস্তাত্ত্বিক না হলে এ মনোরসের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যে-কারণে ফটো চিত্রকলা নয়, নক্সা সাহিত্য নয়, সে-কারণেই কেজো সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। কেজো সাহিত্যের বড় দোষ তার স্থূলতা ও বাস্তবানুরক্তি। আমরা এ-কথা হয়তো সবাই মানি যে প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে তোলা এবং খণ্ড, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে সমগ্রতার মর্যাদা ও গুরুত্ব দানই সাহিত্যের কাজ। কাজেই জীবনের রোজনামচা যেমন জীবনী নয়, সত্যকথার পদ্যরূপ যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন-মিটানো স্থূলতা এবং সাময়িকতাও অকেজো সাহিত্যের অবলম্বন হতে পারে না। কেননা অকেজো সাহিত্য যে-মনের খোরাক, তার সম্পর্ক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ নয়—পরোক্ষ। কথাটা ব্যাখ্যা করে বলি, সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র ও ধন-জন-মান প্রভৃতি আমাদের জৈবিক প্রয়োজনেরই অবলম্বন। এ জীবনে দেশ আছে, ধর্ম আছে, আইন আছে, সংস্কার আছে এবং আছে আরো কত কি। আমরা এসব নীতিশাসনের হাজারো গিঁঠাতে বাঁধা। আমাদের একটি মনোজীবনও আছে, যেখানে দেশ-কাল-সমাজ-ধর্ম-শাসন-নিয়ম কোনোটারই বন্ধন স্বীকার করিনে, বলা যায় এসবের অস্তিত্বই অনুভব করিনে। কাজেই সেখানে কোনো আদর্শবাদ কিংবা কিছুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্য নেই, স্থান-কালের তফাৎ নেই। এখানে যে-বোধ আছে তাকে বলা যায় মানবিক-বোধ। তা সচেতন নয়—সুপ্ত। একে বলা যায় Radical Humanism বা মৌল মানবিকতা। একে সযত্নে লালন করলে, সচেতনভাবে এর পোষকতা করলে পাই Rational Humanism বা বোধিসম্পন্ন মনুষ্যত্ব। এ মনুষ্যত্বের কাছে কালিক, ভৌগোলিক কিংবা সামাজিক বাছ-বিচার নেই। মৌল মানবিকতা বীজ হলে মনুষ্যত্ব হবে ফল। দেশ, কাল ও জাতিচেতনার ঊর্ধ্বে সর্বমানবিক, রসনিষ্যন্দী সাহিত্য এ বোধেরই সন্তান। যাতে মানুষ 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। কারণ বিপুলা পৃথিবীর নিরবধি কালের মানস-সঞ্চয় নিয়ে এর কারবার। এ হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাণের সাথে মিলায় প্রাণ। আবহমান কালের বুকে ধ্রুব হয়ে দাঁড়াবার কেরামতি থাকে এর। এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র দিয়ে এ খণ্ড-ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে করে এক অন্বয় চেতনার আবেশে মানুষ আনন্দলোকের অধিকার পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে এবং বলেও—এ জীবন 'মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি', এখানে যা দেখেছি 'যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' তখন সব সুন্দর এবং সুন্দর সর্বব্যাপী। তখন লোভে সুন্দর, ক্ষোভে সুন্দর, স্নেহে সুন্দর, প্রেমে সুন্দর, আনন্দে সুন্দর, বেদনায় সুন্দর। তখন দুর্বৃত্ত সুন্দর, নিপীড়িত সুন্দর, খল সুন্দর, ছলও সুন্দর। তখন কেড়ে খাওয়া আর সেধে দেওয়া—দুই-ই সমান, দুই-ই অপরূপ। এমনি বোধের অধিকারী হলেই মানুষ হয় জীবনরসিক। তখন সে দৃশ্যজগতের সবকিছু থেকেই কেবল আনন্দের উপাদানই পায়—সে-আনন্দে দৈবিক, মানবিক কিংবা আসুরিক বলে কোনো পরিমাণ বা স্তরভেদ থাকে না। একালের এক স্বীকৃত মহৎ লিখিয়ের মুখে তাই শুনি—'আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার তাতে কখনো ক্লান্ত হলো না। বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্ত কালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে ; মনে হয়েছে, যুগে যুগে এ বিশ্ববাণী শুনে এলুম। আমি ভালোবেসেছি এ জগৎকে, আমি প্রমাণ করেছি এ মহৎকে। আমি কামনা করেছি মুক্তিকে।'

ইনি আরো বলেন—

"এ কথা যখন জানি
মানবচিত্তের সাধনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুখ সবের অতীত।
তখন বুঝিতে পারি
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির।"

এসবকিছুর মূলে রয়েছে সামগ্রিক ভালোবাসা, নির্বিচার প্রেম—এই হচ্ছে জীবনরস, একে যে নিতে শিখেছে তাকেই বলি জীবনরসিক। তার চিত্তকে একটিমাত্র বোধই আচ্ছন্ন করে রাখে, সে জানে—

'এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি
এ ভালোবাসাই সত্য,—এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।'

শাদামাটা কথায় বলা যায়, মনের এ স্তর হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধির স্তর, 'To know all is to Pardon all' কথাটি যে-বোধের পরিচয় দেয়, আমরা সে-বোধের স্বরূপটিকেই Rational Humanism বা বোধিসম্পন্ন মনুষ্যত্ব বলছি। পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য দেয়া কিংবা নিখুঁত জগৎ উদ্‌ঘাটন করা এমনি মনুষ্যত্বেই সম্ভব।

'আমি কবি, তর্ক নাহি জানি। এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে।'— মহৎ সাহিত্যিকের লক্ষ্য, সাধ্য ও ব্রত এ-ই। অতএব এক্ষেত্রে আদর্শানুগত্য, জাতি ও সমাজ-চেতনা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত কথা। আদর্শানুগত্য মহৎ সৃষ্টির তো বটেই, ভালো সৃষ্টিরও পরিপন্থী। মন যাঁর মুক্ত নয়, চিন্তা তাঁর স্বাধীন হতে পারে না। আর স্বাধীন চিন্তা যেখানে অসম্ভব, সেখানে অনুভূতি খণ্ড আর উপলব্ধি পঙ্গু হবেই। কাজেই তাঁকে সত্য, সমগ্র ও সুন্দর ধরা দেয় না। তেমন লেখক, জাতীয় কবি হতে পারেন, সমাজ-দরদী ঔপন্যাসিক হতে পারেন, জনপ্রিয় মনীষীও হতে বাধা নেই, কিন্তু মানুষের আত্মিক মিলন-ময়দানে তাঁর স্বীকৃতি নেই—সেখানে তিনি অচেনা—অবাঞ্ছিতও। পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিক স্বার্থচেতনা যেমন পরিবারের অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটায়, তেমনি স্বাজাত্য ও স্বারাষ্ট্র্যবোধ দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত জিইয়ে রাখে। আজকের দুনিয়ার বারো আনা দুঃখের উৎস এটিই। আজ যখন পৃথিবীর ভৌগোলিক বাধা মুছে গেছে, রাজার রাজ্য উঠে গেছে, মানুষ রাষ্ট্রিক-সীমাও অপসারণের স্বপ্ন দেখছে, তখন গোত্র, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র-সীমা-চেতনাপ্রসূত আদর্শবাদ কিংবা মতবাদ-প্রবণতা মনুষ্য মনন ও প্রগতির বাধা বৈকী ! জাতীয় নয়—আন্তর্জাতিকতাই এ যুগের সাধ্য হওয়া উচিত—তাহলেই আশু মঙ্গল। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়েও যেমন পৃথিবী অখণ্ড, তেমনি দুনিয়ার মানুষের মনন ও আচার বৈচিত্র্য স্বীকার করেই মানুষ একজাত অর্থাৎ United in diversity—শতবছর পরে হলেও নিশ্চয়ই কোনো একপ্রকারের বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কাজেই দূরদৃষ্টি যার আছে, সে কেন বৃথা সাধনায় জীবন নষ্ট করবে !

বলেছি, আদর্শানুগত্য জীবনের আর আর ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু মানসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিশাপ। স্রষ্টা নিজেকে কোথাও বিকোতে পারে না, তার স্বাধীনতা কারও কাছে বন্ধক রাখা যায় না। তাহলে প্রতিমুহূর্তে তাকে আত্মপ্রতারণা করতে হয়। কারণ আদর্শ বিচ্যুতির ভয়ে সে তার উপলব্ধির সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। অকৃত্রিম কাঞ্চন ফেলে, সে গিল্‌টিকে সোনা করবার বিড়ম্বনায় আত্মনিয়োগ করে। এতে হয়তো কেজো সাহিত্য সৃষ্টি হয়—কাজেও লাগে, কিন্তু অকেজো সাহিত্য হতেই পারে না। কেজো সাহিত্য হচ্ছে বেগুন-ক্ষেত আর অকেজো সাহিত্য ফুলবাগান। যার যা রুচি ও প্রয়োজন, সে তা-ই করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য রূপপ্রতীক

কিছুকাল আগে মুসলমান লিখিয়েদের বে-ইসলামি রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ওটি পড়ে আমাদের মনে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জেগেছে :

প্রথমত, আমাদের ধারণায় ইসলাম হচ্ছে একটি ভাব বা আদর্শ কিংবা জীবন-বিধান বা জীবন-সংস্থা, যার সাধারণ নাম ধর্ম। কাজেই বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপারেই কেবল 'ইসলামি' কিংবা 'বে-ইসলামি' শব্দ বা সংজ্ঞার প্রয়োগ চলতে পারে। অন্যত্র 'ইসলাম' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ বই কিছুই নয়। নারঙ্গী কিংবা খোরমা বললে ইসলামি হবে, আর কমলা বা খেজুর বললে বুতপরস্তী হবে—এমন হাস্যকর যুক্তি শিক্ষিত মনে কী করে জাগে, ভেবে পাইনে।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই বলে মুসলমানের দেশ বা ব্যবহৃত সামগ্রীর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কী ? আরবি মুসলমান গেঁও খায়, বাঙালি মুসলমান খায় ভাত। তাই বলে কী গেঁও আর ভাত ইসলামি হল ? আরবের কোরআন আর রসুলই কেবল মুসলমানমাত্রেরই সাধারণ ঐতিহ্য, আর সে-সূত্রে এবাদতের ভাষা আরবিও। এ ছাড়া আরবের সঙ্গে মুসলমানদের অন্য কোনো সম্বন্ধ থাকার তো কথা নয়।

তৃতীয়ত, আরবেরা কোরআন গ্রহণ করল আর রসুলকে বরণ করল বটে কিন্তু তারা স্বদেশের ও স্বজাতির কুফরী ঐতিহ্যের গর্ব ছাড়েনি। ইরানেও দেখি তাই। য়ূরোপের খ্রীস্টানরাও গ্রীস-রোমের pagan ঐতিহ্য ভোলেনি। আমরা যে ইসলাম ও ইসলামের উদ্ভব-ভূমির দোহাই দিয়ে স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক ঐতিহ্য ভুলে আরবের বিয়াবান ও বসোরাই গোলাবের দিকে তাকিয়ে থাকবার নসিহত জারি করতে চাই—এরূপ চিন্তা দুনিয়ার কোনো জাগ্রত জাতি করে কী ?

চতুর্থত, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা জাতিক জীবনে উঠতির ও পড়তির কতগুলো সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। উঠতির লক্ষণ প্রাণময়তা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রসারের অবিরাম প্রয়াস। পুরোনোর পুচ্ছগ্রাহিতা নয়; নতুনের উদ্ভাবনে ও উদঘাটনে, ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে চিন্তার ও কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ও বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার নির্ভীক উদ্যমেই এর প্রকাশ ও বিকাশ। আর পড়তির লক্ষণ হচ্ছে পুচ্ছগ্রাহিতা, যোগ্যজ্ঞাতি প্রীতি, কুটুমের গৌরব-বশ্যতা, আত্মবিস্মৃতি, দেহে-মনে পরপোষ্যতা, অতীতমুখিতা, নিষ্প্রাণতা, আর চিন্তায় ও কর্মে উদ্যমহীনতা।

দুটো দৃষ্টান্ত নিলেই আমাদের বক্তব্য পষ্ট হবে। ইহুদির জাত আছে, ধর্ম আছে, ছিল না কেবল দেশ ; তাই বলে তারা আত্মবিস্মৃত ছিল না। এ কারণেই জনসংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আজকের য়ূরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তাদের দান গুরুত্বে বিশিষ্ট। আর পাক-ভারতে প্রায় আড়াইশ বছর আগে দেশী ও ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রীস্টান সমাজ গড়ে উঠলেও আত্মসচেতনতার অভাবে তাদের অস্তিত্বের ছাপ জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ফুটে ওঠেনি। তারা শাসকজাতির জ্ঞাতিত্বের গর্বে, স্বধর্মীর স্বদেশ য়ূরোপ-মুখিতায় এবং য়ূরোপীয় সংস্কৃতিতে স্বকীয়তার স্বপ্নে নির্বোধ আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে-আত্মপ্রবঞ্চনা করেছে, তাতে তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন তথা সাধনাহীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কেবলই Snobbery প্রকট হয়ে উঠেছিল— জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে সুস্থ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পায়নি। শিক্ষায়-সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞানে কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব-মাহাত্ম্যে তাদের কেউ গণ্য হয়ে ওঠেনি। স্বাধীন পাক-ভারতে তাদের মোহ-মুক্তির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠছে, এখন হয়তো তাদের সার্থক জীবন-সাধনা শুরু হবে।

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর ধরে উচ্চবিত্তের বাঙালি মুসলমান এরূপ বহির্মুখী মনের পরিচয় দিয়েছে। তাই বিগত হাজার বছরে বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তের দ্বারা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে শ্লাঘ্য কোনো কীর্তি গড়ে ওঠেনি। নিম্নবিত্তের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের মাটির মায়া ছিল, কিন্তু অজ্ঞতা-অশিক্ষার দরুণ তাদের স্বকীয় আদর্শ ও লক্ষ্য চেতনা ছিল না, তাই তারাও পর-প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বস্থ হতে পারেনি। আর তাই তারা গড়ে তুলেছিল লৌকিক ইসলাম—যার কল্পছায়ায় তারা জগৎ ও জীবনের মনোময় ব্যাখ্যা খুঁজেছে এবং পেয়েওছে। তাদের ভক্তিবাদ, বৈরাগ্য ধর্ম ও মানবতাবোধ এক অভিনব মরমীয়া তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, যাতে দেহাত্মবাদ, মুরশিদ পন্থ, অলখ সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী) জীবন- জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ও জৈবধর্মের বিকৃতি ঘটিয়েছে। তবু এ কারুর কাছে গর্বের, আবার কারুর কাছে লজ্জাকর।

যারা 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-পন্থী তাদের কাছে মানুষের প্রাকৃত-মানসের এই সহজ ও অকৃত্রিম প্রকাশ গর্বের ও আনন্দের সামগ্রী। আর যারা স্বধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী তাদের কাছে এ স্বধর্মভ্রষ্টতা—আদর্শচ্যুতি লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয়। এ প্রাকৃতজনেরা জীবন-ভাবনার প্রয়োজনে উচ্চারণ করেছে মানবতা ও মানব মহিমার চরম বাণী :

নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।

আর— 'লামে আলিফ' লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা-না হলে কী সব নূর-ই-তন
আদম তনকে সেজদা জানায়!

কিংবা, আহাদ আহমদ মাঝে
কেবল মিমে ফরক রয়।

AMARBOI.COM

আবার এরাই বাঁচবার গরজে করেছে নানা উপদেবতা ও অপদেবতার পূজা।

অতএব যারা 'ইসলাম'-অনুগ জীবন, আদর্শ ও সংস্কৃতির পক্ষপাতী, তারা বিগত হাজার বছরের বাঙলার ইতিহাসে নিছক ইসলামি সংস্কৃতির কোনো নিদর্শন পাবে-না। অবশ্য সুফীতত্ত্ব প্রভাবিত এই সংস্কৃতিকে দেশী মুসলিম সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে সহজেই গৌরব করা যায়।

সংস্কৃতি মাত্রেই স্বস্থ জীবনবোধের প্রকাশ এবং প্রাণময়তার অভিব্যক্তি। আর চিন্তায় ও কর্মে সুন্দরের সাধারণ নাম সংস্কৃতি। এর চর্চা এবং স্বরূপে এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের নাম সাংস্কৃতিক চর্চা। কাজেই তা বহু বিচিত্র ও নতুন হয়েই ফুটে ওঠে। নিতান্ত আদর্শানুগত্য কোনো সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে না, এমনকি সুষ্ঠু লালনেও অক্ষম। এইজন্যেই সাধারণত আমরা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি ও বুঝাই তাও আরব-ইরান-তুরানের দেশজ ও গোত্রজ সংস্কৃতির পাঁচমিশেলী রূপ মাত্র। তাই এর পরিচায়ক নাম হওয়া উচিত 'মুসলিম সংস্কৃতি' এবং যেহেতু এ সংস্কৃতির উদ্ভব মুসলিম মানসে এবং এর প্রতিফলন হয়েছে মুসলমানেরই আচরণে ও কর্মে, সেজন্যে রূপকল্পে ও ভাবরসে তা ইসলামি জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবিত। তাই বলে একে ইসলামি বলার যৌক্তিকতা নেই।

আগেও বলেছি, আবার বলছি ; ধর্ম এক জিনিস, আর স্বাদেশিকতা, স্বাভাবিকতা ও স্বাজাতিকতা অন্য বস্তু। মানুষ চিরকাল বিদেশের ও বিজাতির ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য ছাড়েনি। তাই পৃথিবীর তিনটে বহুল প্রচারিত ধর্মের ভাষা হিব্রু, পালি এবং আরবি—মসজিদ, মন্দির ও গীর্জার প্রাচীর ডিঙিয়ে বিদেশে কারো মুখের বুলি হতে পারেনি। হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্য-বশে ধর্মের উদ্ভবভূমি, ধর্মীয় ভাষা এবং ধর্মপ্রবর্তকের গোত্র শ্রদ্ধেয় হতে পারে, তাই বলে নির্বিকার ও নির্বিচার আত্মসমর্পণ তথা আত্মবিলয় দাবী করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিক দাবী আর পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে, অর্থাৎ ব্যক্তি যেভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরিবারের ও সমাজের সদস্য, তেমনি মানুষ বা জাতিবিশেষ তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাদেশিকতা এবং স্বাভাবিক আর স্বাজাতিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেই ধার্মিক ভ্রাতৃত্বে আস্থাবান থাকবে ও এর অনুসারী হবে ; আমরা যেমন একাধারে নিজের কাজও করি, দেশের কথাও ভাবি—এ দুটোতে কোনো অসঙ্গতি বা বিরোধ নেই। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের রূপ কার্যত এভাবেই ফুটে উঠেছে—মুসলিম জগতের ইতিহাস সর্বত্র এ সাক্ষ্যই বহন করছে। Pan Islamism বা বিশ্বমুসলিম ঐক্যবাদের যদি কোনো সদর্থ ও ব্যঞ্জনা থাকে, তবে তা এখানেই এবং এরূপই। এজন্যেই দেখতে পাই বুতপরস্ত আরব ইসলাম বরণ করল, আগুন-পূজক ইরানি ইসলামে দীক্ষা নিল ; কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির কুফরী ঐতিহ্য ত্যাগ করেনি, কিংবা স্বাদেশিকতা, স্বাভাবিকতা ও স্বাজাতিকতা ভোলেনি, অথবা আত্মস্বাতন্ত্র্য বিলোপ করে বিশ্বমানবতায় বা আন্তর্জাতিকতায় লীন হয়ে যায়নি। আত্মরতিতে নয়, আত্মপ্রেমেই অবশ্য বিশ্বপ্রেমের বীজ নিহিত থাকে। তাই দেখতে পাই, আদর্শ মুসলিম সুলতান মাহ্‌মুদ গজনবী মোমেন কবি ফিরদোসীকে দিয়ে লেখালেন 'শাহ্‌নামা' যাতে রয়েছে অমুসলিম ইরানি বাদশাহ্ ও বীরের কাহিনী। কাজেই ইসলামানুগ আত্মজীবন চর্যার মাধ্যমেই বিশ্বমানব পরিচর্যার পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

কোনো ভাষাতেই ধর্মীয় 'রূপ' থাক্‌তে পারে না, থাকে ধার্মিকভাব। মোমেন স্বেচ্ছায় যে কথা বলবে, যা ভাববে বা করবে, তাতে—এক কথায় তার চলনে-বলনে-করণে ইসলামি ভাব বা আদর্শ থাকবেই। সে যেখানেই থাকুক, যে-ভাষায়ই বলুক আর যে হাতিয়ারেই করুক। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। কাজেই মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্মের ভাষা মিশালেই ভাষা ও সাহিত্যের ধর্মীয় রূপ মেলে না। কে না বোঝে যে আরবি ভাষায়ও আল্লাহ্‌র নিন্দা করা যায়, আবার সংস্কৃত ভাষায়ও আল্লাহ্‌র বন্দনা সম্ভব।

আমাদের দুর্ভাগ্য, একটা অহেতুক মোহবশে আমরা যুক্তি ও বিবেচনা পরিহার করে একপ্রকার আদর্শ-মরীচিকার পিছু ধাওয়া করছি। তার ফলে আমরা আমাদের স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক গরজ ও উপযোগ ভুলে অর্থাৎ বাস্তব জীবনের পরিবেশ ও প্রয়োজন বিস্মৃত হয়ে মনোময় স্বপ্নলোক সৃষ্টির হাওয়াই আদর্শের রূপায়ণে ঊর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছি। এই আকাশচারিতা যে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের কেবল অপচয়ই ঘটাতে পারে, জীবনে কোনো সাফল্য কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে না, তা আমরা ভাবতেও চাই না। সত্যকে অস্বীকার করা যে দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া তথা জীবনকেই ফাঁকি দেওয়া—এ বোধ আমাদের যতদিন সহজভাবে না জাগবে ততদিন আমাদের মন-মানসের মুক্তি নেই। ফলে এগিয়ে চলার পথ নির্ণয়ের সমস্যাও থেকে যাবে। অতএব রুদ্ধ থাকবে অগ্রগতিও।

আমাদের কাছে যুক্তি-বুদ্ধি কীভাবে অবহেলিত এবং মোহাবেগ কত বেশি প্রবল তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই হবে।

উপমাদি অলঙ্কার তথা রূপ-প্রতীক ব্যবহৃত হয় বক্তব্যকে পষ্ট, সুষ্ঠু ও ঋদ্ধ করবার জন্যেই—শিল্প-সৌন্দর্যও ফুটে ওঠে এভাবেই, কেননা পরিচিত বস্তু বা ভাবের ব্যঞ্জনা ও ঐশ্বর্য বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে অসামান্য করে তোলে। মাতৃভাষার শব্দ ও স্বদেশের বস্তুই বক্তার বা শ্রোতার মানসলোকে এ গুণ নিয়ে বিরাজ করে। অপরিচিত বিদেশী শব্দ, ভাব বা বস্তু তার ব্যঞ্জনা ও লাবণ্য নিয়ে ভিন্নদেশীর কানে-মনে সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করতে পারে না। সত্যি কিনা জানিনে, শুনতে পাই কেবল বিদগ্ধ জনের পক্ষেই বিজাতীয় ভাষার রস-রূপ আয়ত্ত করা সম্ভব।

এ যদি সত্যি হয়; সাধারণের জন্যে রচিত সাহিত্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি শব্দ বা বস্তুনাম বসালে তার ধ্বনি-সৌন্দর্য ও অর্থব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পাবার কথা নয়। কেননা, ওগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব রয়েছে এবং তাই কল্পনার দৃষ্টিও অতদূর না- পৌঁছাই স্বাভাবিক। তেমন অবস্থায় বিয়াবান, কাফেলা, মঞ্জিল, নারঙ্গী, খোর্মা, শব্ব-ই-গুল, কোহ্ কিংবা ইংরেজি বা গ্রীক পৌরাণিক শব্দ প্রভৃতি রচনা-গৌরব বৃদ্ধি করার কথা নয়। আর একটি কথা আগেই বলেছি, আরব-ইরানিরা তাদের কাফের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য-রিক্‌থ অবহেলা করেনি, পরম শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কিন্তু আমাদের অমুসলমান পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভুলবার সাধনা করেছি, আর অবজ্ঞা করেছি আমাদের স্বকীয় ও স্বাদেশিক সম্পদকে।

আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি যা-ই হোক না কেন, তা থাকবে (এবং থাকা বাঞ্ছনীয়ও) মুসলিম আরব ও ইরানির প্রতি। তাদের কাফের পূর্বপুরুষের জন্যে আমাদের কোনো শ্রদ্ধা-সমীহের ভাব থাকার কথা নয়, থাকা উচিতও নয়, অথচ এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাব অদ্ভুত ও আত্মদ্বেষী। পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের কিছুসংখ্যক লোক আরব-ইরানি-তুরানির বংশধর হলেও নিশ্চয়ই আর সব মুসলমান দেশজ, তাহলে দাতার উপমা দিতে হলে বিদেশী বিজাতি কাফের 'হাতেমতাই'র চেয়ে দেশী এবং সম্ভবত জ্ঞাতি কর্ণের উপমা মনে জাগাই স্বাভাবিক ও শোভন। তেমনি কাফের কবি ইমরুল কায়েসের চেয়ে কালিদাসের দাবী কম নয়।

নওসেরওয়াঁ, জানজান, শাহ্‌রিয়ার হলেন বিদেশী অমুসলমান, আর বিক্রমাদিত্য-ভোজরাজা আমাদের প্রতিবেশী এবং নানা সূত্রে চেনা লোক। বিদেশী কাফের শাহ্‌নূরীমান, রোস্তম-সোহ্‌রাব আমাদের আপন হলে আমাদের পাশের বাড়ির ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কিংবা ভীমার্জুনকে পর ভাবা কষ্টসাধ্য। এ কতবড় আত্মলাঞ্ছনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা, আমরা ভেবে দেখছি কী? আমাদের রূপপ্রতীকে যদি বাছবিচার করতেই হয়, তাহলে আমাদের নীতি হবে—আমরা দেশী-বিদেশী মুসলিম ঐতিহ্য ও আদর্শপ্রসূ রূপপ্রতীকই কেবল গ্রহণ করব। দেশী বিদেশী কোনো মুসলমানেরই জ্ঞাতি অমুসলিমের কিছু গ্রহণ করব না। আর যদি সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষের জন্যে নির্বিচারে রূপপ্রতীক ব্যবহার করতে চাই, তা হলে দেশীগুলোকেও হেলা করব না, কোনো বিরূপতা দেখাব না।

বিদেশী ভাব, বস্তু, শব্দ ও রূপপ্রতীক গ্রহণ ও বরণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে তখনি, যখন জাতির ভাষা ও ভাবে তার অভাব থাকে অর্থাৎ নতুন বস্তুর নাম ও ভাবের বাহন হিসেবেই শুধু এক ভাষায় অপর ভাষার শব্দ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেমন এ যুগে বিভিন্ন নতুন বস্তু পরিচায়ক ও ভাব প্রকাশক ইংরেজি শব্দ এসেছে আমাদের ভাষায়। এ না হলে ঋণ গ্রহণ নিরর্থক ও অসার্থক।

আমরা এভাবে আড়াই থেকে তিন হাজার আরবি-ইরানি ও তুর্কী শব্দ আগেও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, প্রয়োজনমতো চিরকালই করব এবং তা শুধু এসব ভাষা থেকেই নয়, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো ভাষা থেকেই করব। কেননা, তাতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য এবং মন-মানস সমৃদ্ধই হবে। কিন্তু অহেতুক মোহবশে করলেই কেবল আপত্তি উঠবে এবং সে-আপত্তি নিশ্চয়ই কল্যাণ-বুদ্ধিপ্রসূত হবে।

বিশেষত, এখন আন্তর্জাতিকতার যুগ; চিত্ত প্রসারের এবং জীবনকে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেবার যুগ। অতএব যেখানে যা-কিছু ভালো, যা-কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর, তা-ই কুড়িয়ে নেব, সাদরে গ্রহণ করব, আর আগ্রহে বরণ করব। আমাদের ধর্ম-ভাই আরব-ইরানির অবদান গ্রহণ করতে কোনো কুণ্ঠা থাকার কথা নয়। কিন্তু সংকীর্ণ চিত্তের মোহ ও বিকৃতিবশে জগতের উদার-বিস্তারের আলো-হাওয়া থেকে নিজেদের গা-বাঁচিয়ে আদিম গোত্র ও কোটারি প্রীতির বশে পুরোনোকে ও বিশেষকে আঁকড়ে ধরার মনোভাবেই আমাদের আপত্তি। তা জীবন বিমুখিতার লক্ষণ তথা প্রগতির পরিপন্থী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু

সভ্যতার আদিম স্তরে এমন একদিন ছিল যখন স্থূল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও যৌনবোধ ছাড়া মানুষের আর কিছুই ছিল না। জনসংখ্যা কম ছিল, বিস্তৃত ভুবন পড়েছিল তাদের পায়ের তলায়। কাজেই জীবন-জীবিকার সমস্যা ছিল না মোটেই। তাই সেকালের অজ্ঞ মানুষ চারদিককার নিসর্গ ও প্রকৃতির প্রতি সবিস্ময়ে তাকাবার অবসর পেয়েছে প্রচুর। যেখানে অজ্ঞতা, সেখানেই বিস্ময় ও কল্পনার প্রশ্রয়। সেদিনকার বিস্ময়-ব্যাকুল মানুষ তাই মনোময় রূপকথা সৃষ্টি করে জগৎ ও জীবনের কল্প-নির্ভর ব্যাখ্যা দিয়ে স্ব স্ব কৌতূহল নিবৃত্ত করেছে। এরূপে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, দৈত্য, পরী, যক্ষ ও দেবতা মানুষের মনোরাজ্যে বিচরণ করতে থাকে।

দ্বিতীয়স্তরে মানুষের জীবনবোধ প্রসারিত হল। উচ্চবিত্তের লোকমনে আত্ম-প্রসারের প্রেরণা জাগল। কিন্তু কল্পলোকের পূর্বতন অধিবাসীরাও ঠাঁই ছাড়ল না। তারাও রইল। উচ্চবিত্তের মধ্যে এ আত্মপ্রসার প্রবৃত্তি দেখা দিল জরু ও জমির অধিকার লিপ্সারূপে। তারা রাজ্য ও রাজকন্যার সন্ধানে ছুটল দিকে দিকে। সৃষ্ট হল রোমান্স। এবারকার অভিযানে নায়ক রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্র, কোটাল আর বিত্তশালী সওদাগর। সেদিনও বেনে-বুদ্ধি রাজশক্তির সঙ্গে জোট মিলিয়ে পাল্লা দিয়ে চলত!

কিন্তু গণমানব-মনে এতবড় দুরাকাঙ্ক্ষা তখনও জাগেনি। একে তারা তাদের পক্ষে অশোভন ঔদ্ধত্য বলে মেনে নিল। তাই তারা পড়ে রইল একান্তে। কিন্তু ব্যবহৃত হল উচ্চবিত্তের জীবন-লীলার হাতিয়াররূপে। এভাবে শুরু হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পটভূমিকায় অজ্ঞ মানুষের কল্পবিহারী মনোজীবনের লীলা। কথা সৃষ্টি হল—রূপকথা ও উপকথা। এ কথার তথা সাহিত্যের নায়ক হচ্ছে উচ্চাভিলাষী উচ্চবিত্তের মানুষ।

সভ্যতার তৃতীয়স্তরে যদিও মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা বাড়ল—মানুষ অধিকতর জীবনমুখী হল, তথাপি তা গণজীবনেতর রইল। কল্পবিহারী মন মর্ত্য-প্রবাস শুরু করল বটে, তবে কল্পলোকের প্রতিবেশীকে ত্যাগ করল না। এতটুকু যে করল, তাও গরজে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। নিম্নবিত্তের ও কতক লোকের উচ্চাভিলাষ জাগল, জীবনে ভোগেচ্ছা বাড়ল, জীবিকা-প্রয়াস হল তীব্রতর। এরূপে জীবনবোধের প্রসার হল। সৃষ্টি হল রোমান্স।

এ স্তরে বাস্তব ও স্বপ্ন, কল্পনা ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধি, জগৎ ও জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল। সৃষ্টি হল অভিজাতদের গরজে ও স্বার্থে জাতীয় মহাকাব্য।

একেই আমরা বলছি আদি মধ্যযুগ। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এ স্তর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এ যুগের মুখ্য নীতি হচ্ছে 'জোর যার মূলক তার।' অর্থাৎ 'যোগ্যতরের উদ্বর্তন।' এ যুগের ক্রম পরিণতিতে মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিকাশ হয়েছে। বহু মহৎবুলি, নানা আপ্তবাক্য আমরা শুনলাম। বিচিত্রগামী বুদ্ধিবৃত্তির আভা পরিব্যাপ্ত হল সর্বত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জীবিকা সম্মুখীন হল কঠিনতর সমস্যার। জনসংখ্যা পেল বৃদ্ধি। স্থায়ী বসবাস হল। জীবন-বোধ প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল জীবনের চাহিদাও। অথচ প্রয়োজনের ওজনমতো ভোগ্যবস্তু বাড়েনি, ফলত দেখা দিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। লেগে গেল কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি। মানুষের এ আত্মধ্বংসী সংগ্রামে, এ দুর্যোগকালে এগিয়ে এলেন অভিজাত প্রজ্ঞাসম্পন্ন বুদ্ধিমানগণ। প্রচারিত হল 'ধর্মের' নামে নীতিশাস্ত্র। এরূপে শুরু হল নিয়তি, অদৃষ্টবাদ, ইহ-পরকাল, স্বর্গ-মর্ত্য, জন্মান্তর, পাপ-পুণ্য, 'রিজিকের মালিক রাজ্জাক', সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি হাজারো কথার মারপ্যাঁচে মানুষকে দ্বন্দ্বে নিরস্ত করবার অশেষবিধ প্রয়াস। এভাবে মানুষকে ত্রিবিধ নিয়মনীতির নিগড়ে বেঁধে রাখবার চেষ্টা চলল—ধর্মের বিধি, সমাজের নীতি ও রাজার শাসনই সেই নিগড়। চিরকালই দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

গেছে Law maker-রা সাধারণত Law abider হয় না, কাজেই এসব তৈরি হয়েছে দুর্বলকে দ্বন্দ্বে সংগ্রামে নিরস্ত রাখবার জন্যেই। তাঁদের সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিল, তবু যুগ ও জন-প্রয়োজনে পাল্টাতে হল নিয়ম ও আদর্শের ধরন ও ধারণ। এরূপে কত ধর্মের জন্ম মৃত্যু হল!

তারপর এল শেষ মধ্যযুগ। মানুষ আরো বাড়ল। জীবনবোধ তীক্ষ্ণতর হল। বৃদ্ধি পেল ভোগলিপ্সা। ফলে জীবনোপভোগের পরিধি হল প্রসারিত। ভোগ্যসামগ্রীর চাহিদাও বাড়ল। অধিকাংশ লোকের মনে জাগল উচ্চাভিলাষ। জীবন-ধারণ পদ্ধতি ও জীবিকা-উপায় উদ্‌ভাবনে অতৃপ্ত মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠল। দেখা দিল ভাববিপ্লব, আদর্শ বিভ্রাট, জীবনজিজ্ঞাসা, বুদ্ধিবৃত্তির বিচিত্রলীলা। বিজ্ঞান-দর্শনের কচকচি আর ঠোকাঠুকি। আস্তিক্য, নাস্তিক্য, ভাব, যুক্তি ও বিবর্তনবাদের সুরাসুরিক দ্বন্দ্বে নতুন ভাব-চিন্তা ও যুক্তির আবির্ভাব ঘটল। এ দ্বন্দ্বের ঝুঁকি নিল য়ুরোপ। যুগার্জিত বিশ্বাস-সংস্কার এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হল পরিবর্তিত। সমাজের অভ্যস্ত জীবন বিপর্যস্ত হল ভিতরে বাইরে। এ কারো কাছে অমৃত, কারো কাছে গরল।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বিশাল দুনিয়াকে করে দিল সংহত ও ছোট, এ ভাব বিপ্লব ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রদানব অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরে ফেলল আপন মুঠির মধ্যে। এ ভালোই হল। কেননা, কোনো 'নতুন' মানুষের অমঙ্গলের জন্যে আসে না, অন্তত এ পর্যন্ত তার পষ্ট প্রমাণ মেলেনি। নতুনকে বরণ ও ধারণ করেই মানুষ ও মনুষ্য-সভ্যতা এগিয়ে এসেছে।

নতুন যান্ত্রিক পরিবেশে জীবিকার্জন পদ্ধতিতে বিপর্যয় ঘটল। ধনবণ্টন সমস্যার অর্থনৈতিক আবর্তে জীর্ণ হয়ে পড়ল পুরোনো সমাজকাঠামো। বিত্তশালীদের জীবনে জীবনোল্লাস যেমন বাড়ল, তেমনি বিত্তহীনদের চিত্তে জাগল চরম বিক্ষোভ—সে বিক্ষোভ হতবাঞ্ছার। এর ফলে চিরকালের একটা মানসিক ব্যবধান ঘুচল। আগে আর্থিক সমতার কথা, জন্মসূত্রে নয়—কর্মসূত্রে জীবন নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগের বিষয়, পরলোকে বিশ্বাসী নিয়তিনির্ভর অজ্ঞ মানুষ ভাবতে সাহস পায়নি। এবার তাদের চোখ খুলে গেল, মনের সংকোচ গেল টুটে। উঠল জগতে ও জীবন জন্মসূত্রে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি। ফলে মানুষ অবিশেষের মনে জাগল অপরিমেয় ভোগেচ্ছা এবং তজ্জাত লোভ ও ঈর্ষা। আর তা থেকে শুরু হল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বিঘোষিত হল গণতন্ত্রের জয়।

এভাবে আধুনিক যুগ হল শুরু। বিজ্ঞানই এ যুগের উদ্বোধক। ভাবের রাজ্যেও পৌরোহিত্য তারই। এ-যুগ 'অধিকারবাদের' যুগ। সে-অধিকার আদায়ে সংগ্রামী মানুষ আমরা। এ যুগে আকাশ ও প্রকৃতি থেকে মানুষের দৃষ্টি নেমে এল জীবনের উপর—মাটির দিকে। ভোগেচ্ছার পরিপূর্তিই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমরা বস্তুতান্ত্রিক, আমরা নাস্তিক। কোনো বৃহৎ ও মহৎ বুলি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারছে না। মুগ্ধ করে না স্বর্গ-সুখ। বিভীষিকা সৃষ্টি করে না দোজখের যন্ত্রণা। আমরা বলি—'মানবের তরে মাটির পৃথিবী।'

চিরকাল দুর্বলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা চলে সঙ্ঘবদ্ধতায়। তাই আজ নিঃস্ব লোকেরা জোট বেঁধেছে। দোহাই কাড়ছে মানবতার। দুর্বল যখন বাহুবলে অন্যায়-নিপীড়নের প্রতিকারে অক্ষম হয়, তখন তার মুখে ফোটে ন্যায়-নীতির আবেদন। সে চেষ্টা করে সমশ্রেণীর ও সমভাবে নিপীড়িত জনের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের। যখন নিপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন মরিয়া হয়ে আত্মস্বার্থে লোক জুটে যায়। শুরু হয় সংগ্রাম। আমাদেরও এ মানবতা-মন্ত্রের পশ্চাতে রয়েছে বঞ্চিত বুকের বেদনার বিক্ষোভ। আসলে এটাও আমাদের ভোগেচ্ছা ও ঈর্ষার শোভন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বক্তব্যটি এই—'জনসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে, সে পরিমাণে যখন ভোগ্যসামগ্রী বাড়ছে না, তখন টানাটানি অপরিহার্য। এহেন দুর্দিনে যখন কারো কারো গাছতলাও জুটছে না তখন তোমাদের সৌধে বাস শোভা পায় না। এ হৃদয়হীন অসামাজিক মনোভাব। তোমাদের অট্টালিকা, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাপ্তি ও প্রাচুর্য দেখে আমাদের আশ্রয় ও অশনহীনতার দাহ বেড়ে যায়। অতএব, তোমরাও কিছুটা নেমে এসো, আমরাও কিছুটা উঠে আসি। তোমারও প্রাসাদের পাট চুকল, আমারও কুটিরের অভাব ঘুচল। এবার তোমার আমার অভাব সমান হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনের ঈর্ষাজাত লোভ-ক্ষোভের জ্বালা জুড়োল। তুমি আমি হলাম বন্ধু, আত্মীয় এবং অখণ্ড মানব জাতি। তবে অভাব রয়ে গেল। তা আর কী করা যাবে! এসো, দেখা যাক, নতুন যন্ত্র প্রয়োগে নতুন উপায়ে ও নতুনতর কৌশলে বুড়ি ধরণীর রস আরও কিছুটা নিঙড়ানো যায় কী না। এতে আরো প্রবল নৈতিক যুক্তি রয়েছে। আমরাই যখন আয়োজনাতিরিক্ত আমন্ত্রণ করি না, তখন স্রষ্টা খাওয়া-পরার ব্যবস্থাতিরিক্ত জন সৃষ্টি করেছেন—এ কথা ভাবব কেন? Terminus-এ প্রথম উঠেছে বলেই কী রেলগাড়ির গোটা Compartment-এ-কোনো লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? এ-ই হচ্ছে আজকের মানুষের মনের কথা, মুখের বুলি ও সংগ্রামের কারণ। এর সমাধান ছাড়া এড়ানোর উপায় নেই।

কাজের কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ ধরে রূপকথা শোনালাম, এর প্রয়োজন ছিল। পটভূমিকা ছাড়া বক্তব্য অর্থহীন হত।

সাহিত্য মনুষ্য-মনেরই সন্তান। তার যখনকার যে মনোভঙ্গি, তা-ই তখন প্রতিফলিত হয় তার সৃষ্ট সাহিত্যে। এজন্যেই সাহিত্যকে জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। বলা হয় ব্যক্তিক ও জাতীয় জীবনের মুকুর। বাহ্য সমস্যার সঙ্গে মানুষের এ মনোবিবর্তনের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে মানুষের অতীত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প। মানুষের অজ্ঞতার ক্রমবিদূরণ, জীবনবোধের প্রসার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির ক্রমবিকাশ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রমোন্নতি প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এসব সাহিত্যে। বিস্ময়াবিষ্ট অজ্ঞ মানুষের সাহিত্য ছিল ভূত-প্রেত-দেও-পরী-রাক্ষসের লীলা, তারপরের যুগে পেলাম রাজা বাদশাহ্‌র জীবন-বিলাস চিত্র। তারপরে পেয়েছি ন্যায়নীতি আদর্শবাদ-পুষ্ট ইহ-পারলৌকিক জীবনের মোহনীয় ও বিভীষিকাময়ী কাহিনী। মানুষের জীবন-জীবকার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মনোভঙ্গি যেমন বদলেছে, জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসা-পদ্ধতি যেমন বিবর্তিত হয়েছে, সাহিত্যেরও তেমনি সমভাবে রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে। বিবর্তিত হয়েছে ভাষা, পাল্‌টে গেছে ভঙ্গি, পরিবর্তিত হয়েছে রস-রুচিবোধ। বিষয়বস্তুও হয়েছে বহুবিচিত্র। আজকের সাহিত্যকে তাই পুরনো নিয়ম-নীতির নিরিখে যাচাই করা চলবে না। আজকের সাহিত্যের সাধারণ নাম 'রস সাহিত্য' নয়—গণসাহিত্য। আজকের সাহিত্য-শিল্প কুশলতা মাত্র নয়, গণমানবের আত্মিক উন্নতির জন্যেই সাহিত্য। সমাজের জন্যে নয়, রাষ্ট্রের জন্যেও নয়—একান্তভাবে ব্যক্তিসত্তায় আস্থাবান মানুষের জন্যেই হবে এ সাহিত্য। মানুষ-অবিশেষের মর্যাদা ও অধিকার-বোধ জাগানো ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই রচিত হবে সাহিত্য। প্রতি মানুষের জীবনের মর্যাদা ও মূল্যমান যথার্থভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মানুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলবার সাধনার অবলম্বন ও বাহন হচ্ছে এ সাহিত্য। তাই আজকের সাহিত্য অবসরবিলাসীর চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, কেজো মানুষকে প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠা দানের জন্যেই। হালকাভাবে বললেও স্বীকার করতে হবে যে : 'যার খায় তার গুণ গাইতে হয়।' এককালের লেখকেরা ধনীর আশ্রয়-নির্ভর ছিলেন, তাই সাহিত্যে স্তুতি গেয়েছেন ধনীমানবের। আজ গণমানবই তাঁদের খোরপোশ যোগায়। কাজেই আজ সাহিত্য সৃষ্টি হবে গণমানুষের স্বার্থে ও কল্যাণে। সেকালের ধনীদের স্তুতিকার হবেন একালের গণমানবের চাটুকার।

আজদের দিনের বিশ্বসাহিত্যে সার্থক স্রষ্টাগণ মানুষকে নিবিড়ভাবে জানবার ও জানাবার এই মহান ব্রতই গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে লেখকের সাহিত্য কথা-শিল্প নয়—জীবন-শিল্প। একনিষ্ঠভাবে সাধনা চলেছে জীবনের অর্থ খুঁজবারও। মার্ক টোয়েন, সমর্সেট মম, পার্লবাক, হেমিংওয়ে, জোলা, রোঁলা, আনাতোলা ফ্রাঁ, টুর্গেনিভ, গোর্কী, ডস্টয়ভস্কী, টলস্টয়, শেখভ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আমাদের এ পথেরই সন্ধান দিয়েছেন। কল্লোল কালিকলমের যুগ থেকে পশ্চিমবঙ্গেও এ সাধনাই লঘু-গুরুভাবে চলে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

আমরাও ব্রত গ্রহণ আর সাধনার দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। কিন্তু সিদ্ধি আজো যেন নাগালের বাইরে। এর যেসব কারণ আমরা অনুমান করেছি, সেগুলোই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আজকের সাহিত্যান্দোলনের উদ্‌গাতা য়ূরোপ। আজকের সাহিত্য মানুষের জীবনভিত্তিক। সে-জীবন বাহ্যত সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রিক হলেও তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াজ যে-মনোজীবন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই শিল্পীর মূল লক্ষ্য। কাজেই সেকেলে-ধারায় একেলে সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে না।

সাহিত্যের আধুনিক রূপকল্প হচ্ছে য়ূরোপের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফল। তাই তাদের কাছে যা স্বতঃস্ফূর্ত, আমাদের কাছে তা অনুকৃতি মাত্র। আর অনুকৃতি মাত্রেই কৃত্রিম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার শক্তি যেমন আমাদের জন্মায়নি, অথচ আমরা পূর্ণ যান্ত্রিক সেবা ও সুবিধে গ্রহণ করছি ; ওদের তৈরি যন্ত্রের অনুকরণে আমরাও অনুরূপ যন্ত্র তৈরি করে নিচ্ছি, কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারছিনে। সাহিত্য শিল্পে আর আদর্শেও তেমনি আমাদের অনুরূপ অক্ষমতা ও অনুকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রতীচ্য সংস্কৃতি বরণে ও ধারণে আমরা ভূঁইফোড় বলেই আমাদের স্বীকরণ ক্ষমতা জন্মায়নি। এসব গুণ আহরণ করা চলে না, অন্তর্নিহিত শক্তিবলে অর্জন করতে হয়, স্বোপলব্ধ হওয়া চাই। ফলে অশিক্ষিত লোক স্যুট পরলে যেমন তা তার দেহে খাপ খায় না, আমাদের মনের সঙ্গে য়ূরোপীয় ভাবধারাও তেমনি মিশে যেতে পারছে না। তাই আমাদের আত্মবোধ যত প্রবল, গণবোধ তত সাবলীল নয়। এজন্যেই শিক্ষা-প্রবুদ্ধ ও সংস্কৃতিপরায়ণ য়ূরোপে যা সহজেই সম্ভব হয়েছে, নতুন শিক্ষিত আমাদের কাছে তা-ই উঠেছে সমস্যা হয়ে।

আমরা কী লিখব আর কেমন করে লিখব তার সৃষ্টি-সম্ভব ধারণা আমাদের মনে গড়ে ওঠেনি। অথচ সাহিত্য-শিল্প হচ্ছে কী ভাবছি তা নয়, ভাব কীভাবে প্রকাশ করছি তা-ই। কাজেই আমাদের কথা-শিল্পে, রূপকল্প ও রসকল্প—এই উভয় দিক দিয়েই সমস্যা রয়ে গেছে।

মহৎ সৃষ্টির জন্যে জগৎ ও জীবনকে একান্তভাবে অনুভব করতে হয়। তার জন্যে দরকার দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মন। সৃষ্টির আগে দৃষ্টি নিখুঁত ও সামগ্রিক হওয়া চাই। এজন্যে আমাদের দুটো প্রাথমিক সাধ্যবস্তু রয়েছে। একটা হচ্ছে, জৈব-জীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তি তথা মানব-মনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানব- চরিত্রে ও আচরণে প্রাতিবেশিক প্রভাব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন। শিল্পীরা হচ্ছেন স্রষ্টা। আর ভাব-ভাষার জাদুস্পর্শে সজীব, সচল ও ক্রিয়াশীল মানুষ সৃষ্টি করা কী সহজ কথা ! কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সামগ্রিক স্বরূপ দৃষ্টিতে বা মনে ধরা না দিলে তার চলচ্চিত্র দেওয়া অসম্ভব। যেমন ঢাকা শহরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি জবাব খুঁজে পাইনে, কেননা এর সামগ্রিক রূপ আমার কাছে পষ্ট নয়। না-জানার চেয়ে কম জানাতেই ভুল হয় বেশি।

মানব-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে সৃষ্ট চরিত্র অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। আর সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিনির্ভরতা, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব যে মানুষের আচরণকে বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তা না জানলে, সজীব ও স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি হবে কী করে ?

এক কথায়, মানুষের প্রতিমুহূর্তের বাহ্যাচরণ ও জীবন-প্রচেষ্টার মধ্যে মনুষ্যজীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তির যে অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে, তার যথার্থ স্বরূপ না জানলে বা কারণ-ক্রিয়া জ্ঞান না জন্মালে কোনো রচনাই শিল্পায়ত্ত হবে না।

আমাদের মনে হয়, এ দুটো অভিজ্ঞতার অভাবেই মুখ্যত আমাদের ছোট গল্প সার্থক হচ্ছে না, আর লেখকেরা উপন্যাস রচনায় সাহস পাচ্ছেন না। যাঁরা সাহস করে এগিয়ে আসছেন, তাঁরাও প্রায়ই ব্যর্থ হচ্ছেন। এ কারণেই বহু প্রশংসিত 'সূর্য দীঘল বাড়ি'তে দৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নেই। অর্থাৎ দৃষ্টির পরিচয় আছে, কিন্তু সৃষ্টির স্বাক্ষর তেমন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে আমাদের যা ছিল তা-ও হারাতে বসেছি। পারিবারিক ও সামাজিক যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ ছিল, শিক্ষা-প্রবুদ্ধ জনগণ তাও হেলায় ত্যাগ করেছে। আমরা যতই বৃহত্তর মানবতাবোধ তথা মনুষ্যপ্রীতির দোহাই কাড়ছি, আমাদের আত্মীয়তাবোধ যেন ততই ম্লান হয়ে আসছে। অপ্রেম ও অসামাজিকতা যেন বেড়ে চলেছে। এর জন্যে দায়ী আমাদের নতুন-গড়া মধ্যবিত্ত মনোভাব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণের হাতে যোগ্যতাতিরিক্ত টাকা আসে, তাঁরা এখন উচ্চবিত্তের লোক। তাঁদের জীবনের ব্রত ধন-আহরণ আর লক্ষ্য একখানা গাড়ি ও ধানমণ্ডিতে একখানা বাড়ি। এসব ভুঁইফোড় ধনী আভিজাত্য-লোভে ও ঐশ্বর্যগর্বে নিজেদেরকে বিরাট গণসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছেন। অথচ এঁরাই হচ্ছেন সমাজ-সংস্কৃতির শক্তির উৎস। এর সঙ্গে একটি মারাত্মক সরকারি নীতিও হয়েছে যুক্ত। সরকার কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এতে চাকুরিজীবীদের অভাব অনেক পরিমাণে লাঘব হয়েছে। যদিও তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, তবু প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁরাই হচ্ছেন সমাজের দিশারী। পাঁচ কোটি লোকের দেশে কয়েক লক্ষ লোকের আর্থিক দৈন্য ঘুচলেই দেশ কিছু উন্নত হয় না। পক্ষান্তরে শিক্ষিত লোকদের এভাবে গণসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকার ভেদনীতির প্রয়োগে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন মাত্র। এতে নেতৃত্বাভাবে অজ্ঞ অসহায় পাঁচ কোটি লোকের অভাব-নিপীড়ন বাড়লই। যদি নতুন-গড়া শিক্ষিত শ্রেণীরও যথার্থ চিত্তবিক্ষোভ ও হৃতবাঞ্ছা থাকত, তবে তাদের প্রভাবে দেশের গণমন সহজে জাগত। আত্মরক্ষার গরজেই সমবেত প্রয়াস চলত দেশের উন্নতির জন্যে।

আমাদের এ-কথা ভুললে চলবে না যে শ্রমিক-নেতা যেমন শ্রমিক নন, কৃষক-নেতা যেমন চাষী নন, জননেতা যেমন জনগণের নাগালের বাইরে, তেমনি লেখকগণও সাধারণত অনভিজাত নন। কাজেই যে-সমাজ থেকে লেখকের আবির্ভাব সে-সমাজই এখন ধ্যান করছে গাড়ি-বাড়ির। কাজেই গণ-সমাজের প্রতি তাদের সে-নজর কোথায়—যে দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলে দরদবোধ ও সহানুভূতির ছোঁয়ায় গণহৃদয়-মন ও আশা-আরজু লেখকের নিজ হৃদয়-মনে মুকুরের মতো প্রতিফলিত হয়? উনিশ শতকের কোলকাতার মধ্যবিত্তদের মতোই আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠেছে এই বিত্তশালীরা।

আমাদের সামাজিক জীবনের আর এক মস্ত বিড়ম্বনা—মিথ্যা আত্মসম্মান-বোধ ও আভিজাত্যচেতনা। যে-কেউ একটু লেখাপড়া করে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলে আত্মপরিচয় দেয়। আসলে আমাদের সমাজে সাম্প্রত-পূর্ব যুগে শ্রেণী হিসেবে কোনো মধ্যবিত্ত ছিল না। আসলে সবাই বিত্তহীন। চাকুরি না করে যে খেতে-পরতে পারে না, সে বিত্তবান হয় কী করে! একজন দিনমজুর বা রিক্‌শাওয়ালা ও আমাদের তথাকথিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিত্তের দিক দিয়ে তফাৎ কোথায়! কাজ না পেলে ও'রও ভাত জুটে না, এরও আহার মেলে না। এ আত্মপ্রবঞ্চনা—আর্তনাদকে আস্ফালন দিয়ে ঢাকবার এ চেষ্টা আমাদের নিজেদেরও স্বরূপ উপলব্ধির পথে প্রবল বাধা। তাই আজো আমরা অকপটে আত্মকথাও শিল্পায়িত করতে পারিনি। মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত এই বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর মতো অসহায় দুঃখী মানুষ এদেশে সত্যিই আর নেই। এদের বিত্তের সঙ্গে বৃত্তি-বেসাত যুক্ত না হলে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটানো মুস্কিল, বৃত্তি যা জোটে তা সামান্য কেরানিগিরি, নয় মাস্টারি। আজকের দুর্মূল্যের দুর্দিনে যে জীবন-যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে দাঁড়াবার ঠাঁই পাচ্ছে না, এরা কুলি-মজুরের চাইতেও অসহায়। কেননা এরা দুঃখের কথা কইতেও পারে না, সইতেও পারে না; ভিক্ষাঝুলিও নেয়া চলে না, গাছতলায়ও বাস করতে পারে না। এবং এদের জীবনবোধ অশিক্ষিতদের চেয়েও বেশি বলে বেদনাও তীব্রতর।

আবার বিক্ষুব্ধচিত্তেও সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাতে চিত্ত বিক্ষোভজাত উচ্ছ্বাস শিল্পীর সংযমবোধ ও রসদৃষ্টি ব্যাহত করে। এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত হয় গীতাত্মক বা বিবৃতিমূলক। সার্থক সৃষ্টির জন্যে শান্ত, সমাহিত অথচ সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মনোভঙ্গির প্রয়োজন, পরিমিত দূর থেকে বা উপর থেকে দেখলে যে-কোনো বস্তু বা ঘটনার সামগ্রিক স্বরূপ যেভাবে দৃষ্টিগোচর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, ভেতর থেকে তা কখনো সম্ভব নয়, সে-অবস্থায় শুধু বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত রূপই চোখে পড়ে। তা-ই চিত্রিত করতে গেলে খাপছাড়া হয়ে ওঠে।

আর একটি ত্রুটি প্রায়ই চোখে পড়ে। আমাদের অনেক গল্প-লেখক মনে করেন, গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের বিশেষ পার্থক্য নেই। অনুভূতি ও ভাবের দিক দিয়ে হয়তো এ ধারণা আংশিক সত্য, কিন্তু আঙ্গিকের দিক দিয়ে এদের আসমান-জমিন তফাৎ। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অনুভূত তত্ত্বটি সংলাপের ও বিবৃতির মাধ্যমে কোনোরকমে প্রকাশ করেই ছুটি নিতে চান। ফলে অনেক গল্পই রূপে ও রসে তথা আঙ্গিকে ও চিত্রণে গল্প হয়ে ওঠে না। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখাতে চাইলে যেমন শুধু দিগন্তে একটা সূর্য এঁকে দিলেই হয় না ; আকাশ, নদী, গাছপালা, কুটির প্রভৃতির উপর অস্তায়মান সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে সূর্যাস্তকালীন দৃশ্য পরিস্ফুট করতে হয়, তেমনি গল্পের বক্তব্যের অনুকূল প্রতিবেশ বা পটভূমিকা সৃষ্টি করে বক্তব্যকে শিল্পায়িত করতে হয়। এ—না হলে গল্প অচল।

আর একটা বিষয় যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে আমাদের বুঝে দিতে হবে। যন্ত্র- বিজ্ঞানের প্রভাবের ফলে এ যুগে জনজীবনে বিপর্যয় এসেছে। সে-বিপর্যয় আর্থিক ও মানসিক। আমাদের আনন্দের পিপাসা আছে, অথচ আনন্দ নেই। আনন্দের সামগ্রী যতই বাড়ছে ততই আনন্দ যেন আলেয়ার মতো ফাঁকি দিচ্ছে, মরীচিকার মতো শুধু মানসিক পীড়নই বাড়াচ্ছে। য়ূরোপ তাই বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল আর ব্যাকুল শান্তি ও আনন্দের সন্ধানে কেমন যেন ছটফট করছে। আমাদের দেশেও সে অবস্থা এল বলে !

আগের দিনে আনন্দ-উৎসব ছিল পার্বণিক ব্যাপার, নিত্য ঘটত না। তাই যাত্রা, পাঁচালি, খেলা প্রভৃতির আয়োজনের উত্তেজনায় ও স্বপ্নে কাটত কয়দিন, আর স্মৃতিতে মাধুর্যে কাটত বহুদিন। এভাবে কেটে যেত স্বপ্ন ও স্মৃতিঘেরা বছর। অবরুদ্ধ বধূ বাপের বাড়ি 'নাইহরে' যাবার স্বপ্নে, নাইহরের সুখ-উত্তেজনায় আর 'নাইহর' অন্তে তার মধুর স্মৃতি মন্থন করে সহজেই বছর ফুরিয়ে দিতে পারত। আর আজ সিনেমা, খেলাধুলা, ভ্রমণ, কিছুই যেন চোখে নতুন ঠেকে না, মনে লাগায় না দোলা। শহুরে মেয়েরা 'নাইহরে' প্রিয়-পরিজনের সান্নিধ্যের মাধুর্য আর কল্পনাও করতে পারে না, অবাধে চলাফেরার সুবিধে সেই সুখ-স্বপ্ন ও উল্লাস থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের। তার উপর পৃথিবী একখানি ছোট মানচিত্রের মতো ঝুলে রয়েছে চোখের সামনে। বিদ্যার প্রসারে, আর বইপত্রের বদৌলত আগ্রহ ও কৌতূহল জাগাবার কোনো অজানা-অচেনা বস্তুই রইল না, সবকিছু পড়া-পাঠেরে মতো মনে হয় পুরোনো, নীরস ও একঘেয়ে। তাই আজকের দিনে উচ্চবিত্তের মানুষের মনেও স্বপ্ন বা স্মৃতি কোনোটাই ঠাঁই পায় না। মানবের মনোজীবনের এই শ্রান্তিও মনুষ্যজাতির একটা বড় সঙ্কট। এই বিড়ম্বনাও আজকের রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক দ্বন্দ্ব-হানাহানির জন্যে কতকটা দায়ী। তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই। তাই স্বস্তি আর শান্তিও দুর্লভ। এতে একটা নৈরাশ্যবাদ আমাদের পেয়ে বসেছে, আশাবাদ জাগাতে হবে আমাদের মনে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—সাহিত্য শুধু জনচিত্তের বিশ্লেষণ করবে না, প্রচলিত সমাজ-চিত্র দেবে না, সমাজকে নিয়ন্ত্রিতও করবে, দিশাও দেবে পরোক্ষভাবে, প্রভাবিত করবে অতি সন্তর্পণে। কিন্তু তাই বলে উগ্র ও প্রত্যক্ষ আদর্শবাদ থাকবে না। এটুকু আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে, সাহিত্যের উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে। কেননা শুধু বাস্তব দিয়ে চিত্র হতে পারে, শিল্প হবে না। রচনায় শিল্পীর মনের রঙ-রস ও চিন্তা মেশাতেই হবে। কিন্তু কোনো আদর্শবাদই জৈবধর্ম বা প্রাণধর্ম বা পরিবেশের প্রতিকূল হলে চলবে না। তথাপি এ-যুগে লেখকদের হতে হবে জীবন-শিল্পী। আদর্শবাদ থাকবে প্রচ্ছন্ন। মহৎ সৃষ্টির এ-ই লক্ষণ।

এ যুগের গল্প-উপন্যাসের পটভূমি বিশাল—গোটা দুনিয়া। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, স্বাদেশিকতা ও বিশ্বমানবতা এ যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, যদিও স্বাজাত্যবোধ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিজীবনে বল-ভরসার আকর, আত্মকল্যাণই এর লক্ষ্য; কিন্তু তবু 'কল্যাণ' আপেক্ষিক শব্দ। অপরের অকল্যাণ করে নিজের হিতসাধন হয় না। 'ব্যক্তিস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন করতে হলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবার-পরিজনেরও বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তেমনি পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই সামাজিক স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকা চাই। সামাজিক কল্যাণ সাধনের খাতিরেই স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক মঙ্গলের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।' আর স্বাজাতিক কল্যাণের গরজে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার কামনা জেগে ওঠে। অতএব, স্বাতন্ত্র্য-বোধ অসম্ভব !

কথাসাহিত্যে রূপ ও রসের দিক দিয়ে চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে :

ক. চিত্রধর্মী, খ. মনোসমীক্ষাধর্মী, গ. বিশ্লেষণধর্মী ও ঘ. রোমান্টিক।

কথাসাহিত্য ও নাটকের সংলাপের ভাষা নিয়েও কথা উঠেছে। এ ব্যাপারে একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে স্মরণীয় ও বিবেচ্য। সাধুভাষার কাছাকাছি না হলে কোনো কথ্যভাষাই দেশের সর্বাঞ্চলের লোকের বোধগম্য ও প্রয়োগ-যোগ্য হবে না। এটা বুঝেছিলেন বলেই পূর্ববঙ্গঘেঁষা উত্তরবঙ্গের লোক প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেছিলেন ভাগীরথী তীরাঞ্চলের ভাষা। নতুন কথ্যভাষা গ্রহণ করবার গরজ আমাদের থাকলে, কুষ্টিয়া যশোহর বা খুলনা অঞ্চলের কথ্যরূপ গ্রহণ করাই শ্রেয়। বিশেষত সাহিত্যের ভাষা চিরকালই কিছুটা কৃত্রিম। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত কথ্যভাষাও অকৃত্রিম নয়। ও-ভাষার অবিকল প্রতিরূপ কথায় ব্যবহৃত হয় না কোথাও।

আমরা অনেক সমস্যা তুলে ধরলাম। তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই। শক্তিমানের সামনে কোনো সমস্যাই টিকতে পারে না। এগিয়ে চলার পথ করে নিতে পারে সে। আমরা জানি, আমরা নব-শিক্ষিত ও নতুন সংস্কৃতিসেবী, আমাদের জাতীয় জীবনও আধুনিক অর্থে গড়ার মুখে। তবু আমাদের কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে দু-চারজন যথার্থ শিল্পীকে ইতিমধ্যে পেয়েছি। বেশ কয়েকটা ভালো সৃষ্টিও হয়েছে। অবশ্য আরো কিছুকাল হয়তো প্রতিভার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। এতে হতাশ হবার কিছুই নেই। কোনো দেশেই প্রতিভা গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না।

AMARBOI.COM

তিন

আধুনিক যুগে ব্যবহারিক জীবনে শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে মানুষ নিছক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কলকারখানা স্থাপনের ফলে আর্থিক বৈষম্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এনেছে গ্লানি, মনন-জীবন করেছে পঙ্গু। তাই অধিকারবাদের লড়াই শুরু হয়েছে দুনিয়াময়। ব্যবহারিক জীবনেতর যে-মনোজীবন রয়েছে, তা দুঃখ-দৈন্য ও অভাব-উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ার ফলে আজ লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত।

আমাদের দেশের সমস্যা যেমনি জটিল, তেমনি মারাত্মক। কিন্তু এদেশে যারা মার খায়, তারা সহ্য করতে অভ্যস্ত। আর যারা মার দেয়, তারাও একে অন্যায় বলে উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফলে যে-চেতনা যে-মর্যাদাজ্ঞান, যে-অধিকার আদায়-প্রয়াস বিপ্লব আনে, তা আমাদের দেশে আজো স্বপ্ন। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের নির্বাক-নির্বিদ্রোহ আত্মাহুতিই এর প্রমাণ।

তাই য়ুরোপের অনুকরণে আমাদের দেশে গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে-শৌখিন আন্দোলন শুরু হল, তাতে জনগণের আন্তরিক যোগ ছিল না। অনুভূতি- বিহীন মনীষালব্ধ বাণীর বাহক ও প্রচারক আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টা তাই 'ব্রত' না হয়ে 'বিলাস'রূপে প্রকাশ পেল। যে জিজ্ঞাসা, সমাজবোধ, সমস্যা-সচেতনতা, সামাজিক জীবনচেতনা ও বাস্তবানুভূতি, মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং রুচি-আদর্শ সজাগতা সার্থক সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, তা আমাদের আদর্শপ্রিয় য়ুরোপমুখী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল। এইজন্যে তাঁদের রচনায় মনন-বৈচিত্র্য নেই। তাঁদের রচনা যে বিচিত্রধারায় ও মননে সার্থক হয়ে উঠছে না, তার কারণ বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির অভাব। শুধু আদর্শের প্রতি আনুগত্য, কল্পনা, শ্রুতিস্মৃতি ও অনুকরণ দ্বারা সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষের মন ভাঙাগড়া আর সমাজ ভাঙাগড়ার মতো সৃষ্টি কী অল্প-সাধনায় সাধ্য !

একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারি, ইসলামের মূলবাণী হচ্ছে "Live and let live." মানে নিজে বেঁচে থাকো এবং অপরকে বাঁচতে সাহায্য কর। ইসলাম বলে—এমন কিছু তুমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই-এর জন্যে কামনা করো না, যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ করতে পার না ; অর্থাৎ যে-দুঃখ, যে-বেদনা, যে-আঘাত তুমি এড়িয়ে চলতে চাও ; সে-দুঃখ, সে-বেদনা, সে-আঘাত তুমি অপরকে দিও না। আজকের হিংসা-কোন্দল-হরণ-শোষণ-জর্জরিত মানুষের কাছে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বাণী কী আছে, যা এই হানাহানি আর কাড়াকাড়ির দুনিয়াতে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে নিঃশঙ্ক শান্তি দান করতে পারে ? জীবনের সমস্যা, তথা ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা এই আদর্শের আলোকে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশের জনসাধারণ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সর্বপ্রকার দুর্যোগ-দুর্ভোগকে মনুষ্যসাধ্য-বহির্ভূত তকদিরের মামলা বলে আত্মপ্রবোধের ছলে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে অভ্যস্ত। এই অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে যুগ যুগ ধরে অপমানিত ও নিরুদ্যম করে আসছে। এখানেই ঘটেছে আমাদের প্রাণধর্মের, মনুষ্যত্বের ও আত্মশক্তির অপমৃত্যু। 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা'—এই হচ্ছে আমাদের স্বীকৃত জীবন-দর্শন। এ মারাত্মক সর্বনাশা সংস্কার থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। কর্মবিমুখ, সাধনাভীরু, আকাঙ্ক্ষাবিহীন জনসাধারণ আলস্যকে উদাসীনতা, অক্ষমতাকে নিস্পৃহতা, কাপুরুষতাকে সহনশীলতা, আত্মবিশ্বাসকে অহঙ্কার, পরাজয়কে অদৃশ্যশক্তির ইচ্ছা, অভাব-অনটনকে আত্মিক শোধনের উপায় ও পার্থিব জীবনের দুঃখ-বেদনাকে পারলৌকিক জীবনে সুখের আভাস ঠাওরিয়ে, পৌরুষহীন নিষ্ক্রিয় জীবনকে শ্রেয় মনে করে নিয়েছে। আজকের দিনে খলতা, কপটতা, প্রতারণা, মিথ্যা, অন্যায়, দুর্নীতি পরিণত হয়েছে মানুষের জীবন-বেদে। এ অবস্থা অশুভ এবং পরিণাম ভয়াবহ। ন্যায়নীতি ও সত্য আজ নির্বাসিতা। ন্যায়নীতিবোধ জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। ন্যায়নীতি, সত্যপ্রীতি হারালে জাতি দাঁড়াবে কিসের জোরে ? মিথ্যায় সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তি নেই, তাই পতন অনিবার্য। এ কথার কথা নয়, ইতিহাসের বাণী। এজন্যে আমাদের সাহিত্যে প্রতারণা, মিথ্যা, অন্যায় ও দুর্নীতির বিভীষিকাময় পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ন্যায়-নীতি-সত্য যে আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্বের পরিপোষক, মনোবল ও আত্মশক্তির বিকাশক, এ ধারণাও জন্মিয়ে দিতে হবে ইতিহাসের নজির দিয়ে। মিথ্যা, প্রতারণা ও দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ড থেকে জাতিকে উদ্ধার করার ব্রতও গ্রহণ করতে হবে আমাদের সাহিত্য-স্রষ্টাদের।

শহরগুলোর বস্তিবাসীরা অশিক্ষা-অজ্ঞতা-অক্ষমতার দরুণ জীবনযুদ্ধে ঘায়েল হয়ে হয়ে ক্রমে উচ্ছন্ন যাচ্ছে। খাওয়া-পরার সংগ্রাম তীব্র ও দুর্বিষহ হচ্ছে আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। অপঘাতে অপমৃত্যুর হাত থেকে এদের বাঁচবার 'ইসম্' বাতলে দিতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমে। অন্তত শহর ছেড়ে শহরতলীতেও যেন বাঁচবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তারা, তেমন-পথের সন্ধান দিতে হবে তাদেরকে।

এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত কৃষিজীবী ও মজুর। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলকারখানা হওয়ার সাথে সাথে জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে যে-অনটন-সমস্যা এ যুগে দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের চাবিকাঠি এদের হাতে নেই। অদৃষ্টবাদের জাদুমন্ত্রের প্রভাবে ওরা স্রষ্টা বা সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করতেও ভুলে গেছে, দুঃখের দিনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও ভয় পায়—পাছে খোদা আরও রুষ্ট হন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ওদের পক্ষ হয়ে ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে। কিন্তু ওরা নিজেরা অদৃষ্টবাদী ও জড়ধর্মী। তাদেরকে আত্মসচেতন করে তুলতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রাণে প্রেরণা যোগাতে হবে আত্মমর্যাদার ও অধিকারবোধের। আজ তাদের জীবনে প্রেম পলাতক না হলেও স্বস্তি পলাতক। বুভুক্ষু, নিরন্ন, রোগগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ আশাহীন, ভাষাহীন পল্লীবাসীকে বাঁচানোর ও সমাজ-কর্মীদের প্রাণে সহানুভূতি ও সাড়া জাগানোর দায়িত্ব সমাজেরই। এরূপে আমাদের দরদী শিক্ষিত জনসাধারণ রাষ্ট্রের মারফত ওদের দুঃখমোচনে সক্ষম হবে। শিক্ষার আলোকে, আত্মমর্যাদাবোধের তীব্রতায় ওরা তখন নিজেরাই বুঝে নেবে নিজেদের দাবী-দাওয়া। বহুকালের অনভ্যাসের ফলে আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণেরা 'বন্দুক-ভীরু' হয়ে পড়েছে। বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে আমাদের কিশোর-তরুণদের। তাদের সাহস, চিত্তের দৃঢ়তা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের পাটা দেখে যেন 'ভয়ও ভয় পায়,' ভেতো বাঙালির বদনাম ঘুচুক ! পদ্মার দু-তীরে দুঃসাহসী পল্লীবাসী বর্ষাকালীন সর্বগ্রাসিনী পদ্মার প্রলয়-নাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে টিকে রয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে, তাদের বিচিত্র জীবন-কাহিনী আমাদের সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান হতে পারে।

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সনাতন জীবনযাত্রা প্রণালী ও মনের গতি-প্রকৃতি আমাদের সাহিত্যে পরিবেশন করতে পারে বিচিত্ররস।

পাটচাষীদের পাটের বাজারদর সম্পর্কিত আশা-নিরাশার চিত্রও সাহিত্য-বস্তু। "এ বছর পাটের দরে না-জানি কেমন করে, ঘরে ঘরে হল ভাবনা।" লক্ষ লক্ষ লোকের মরণ-বাঁচন যে-পাটের বাজারমূল্যের উপর নির্ভরশীল, পাটচাষীর সে-সমস্যা ও আশা-নৈরাশ্য সাহিত্যে অধিক পরিমাণে রূপায়ণ বাঞ্ছনীয় বৈকী ! মেঘনা, পদ্মা আর বঙ্গোপসাগরের জেলেদের ক্ষুদ্রতরী যোগে ঝড়ের রাতের দুঃসাহসিক অভিযানও মনোজ্ঞ সাহিত্যের উপাদান।

চট্টগ্রাম, সিলেট ও নোয়াখালীর নাবিকদের সমুদ্রযাত্রা, প্রবাস, দূরের পিপাসা, বর্মাপ্রবাসী চট্টগ্রামীদের বিচিত্র জীবন-কাহিনী রহস্য-মধুর রোমান্টিক সাহিত্যের উপাদান হতে পারে।

এছাড়া কলকারখানার মজুর, রিকশাওয়ালা, গাড়িওয়ালা, বিড়িওয়ালার জীবন তো রয়েছেই। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণও সাহিত্যিকদের ব্রত হওয়া উচিত। নারীর শিক্ষা, অবাধ চলাফেরা ও চাকুরি গ্রহণ ব্যাপারে-বাহ্যত না হোক-যুগসঞ্চিত ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারবশত আমাদের, বিশেষ করে প্রবীণদের মনে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। দেখাদেখি যুগরীতির কাছে ঘরে ঘরে সবাই আত্মসমর্পণ করছে সত্য, কিন্তু সমর্থন করে না অনেকেই ; প্রতিরোধ নেই বলে সমর্থন আছে মনে করবার কারণ নেই। এর সামাজিক ও নৈতিক ঝুঁকি এবং মানসিক দ্বন্দ্বেরও সুন্দর চিত্রাঙ্কন চলতে পারে।

মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত হতভাগ্যদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

মানুষের জীবনে সাহিত্যের উপাদানের অভাব কোনোদিনই হবে না। মানুষ যেমন আকৃতিতে বিচিত্র, তেমনি প্রকৃতি-প্রবৃত্তিতেও। মানুষের এই বিচিত্র জীবনলীলার কাহিনী কোনোদিন বলে শেষ করা যাবে না। তার উপর সৃষ্টি-স্রষ্টা, জগৎ-জীবন, প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির বিচিত্র সম্পর্ক সংযোগ তো আছেই—এসব রহস্য চির-নতুন সাহিত্যের চিরকালীন উপাদান।

আমরা ইট-সুরকির কথা আলোচনা করলাম, কিন্তু সৃষ্টির ব্যাপারে এদের গুরুত্ব বেশি নয় ; স্ব স্ব রুচি ও সাধ্যানুসারে শিল্পীরা সাহিত্যসৌধ গড়ে তুলবেন ; আকারে-প্রকারে, রূপে-রসে সে-সব সৌধ হবে বহুধা ও বহু বিচিত্র। সৃষ্টির ব্যাপারে নির্দেশ চলে না। লেখকের মন-মানসের ধ্যানই স্রষ্টা। বাস্তব অভিজ্ঞতা, দেখবার চোখ, বুঝবার বুদ্ধি, অনুভব করবার হৃদয়, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, মানব-মনের রুচি, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, সামগ্রিক জীবনবোধ—সর্বোপরি রূপায়ণশক্তি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য। এজন্যে সাধনা আবশ্যক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণসাহিত্য

গণসাহিত্য বা সাম্প্রত-সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে আজো অনেকেই বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। এমন লোকও আছেন, যাঁরা একে রসসাহিত্য বলতে কিছুতেই রাজি নন। এক কথায়, তাঁরা সাহিত্যের অত্যাধুনিক আদর্শে আস্থাবান নন।

দোষ তাঁদের নয়। নতুনকে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করা কোনোকালেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবীন ও প্রবীণে দ্বন্দ্ব নতুন নয়। প্রবীণের মনে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার গর্ব থাকে, তাতেই প্রবীণরা রক্ষণশীল। যাকে প্রবীণেরা 'প্রজ্ঞা' মনে করেন, তা আসলে সংস্কার ; আর যাকে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত ভাবেন, তা মূলত অভ্যস্ত সংস্কারের প্রতি অন্ধ মমতা। এজন্যেই প্রবীণমাত্রেই বিজ্ঞতার দাবী করেন। নবীনরা চলে প্রাণধর্মের প্রেরণায়। বয়োধর্মের গুণে সংস্কারবিমুক্ত একটি স্বচ্ছ অথচ উচ্ছ্বাসময় দৃষ্টি এদের স্বভাবজ। সে-দৃষ্টিতে জগৎ, জীবন, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক খুঁত—বহু ত্রুটি ধরা পড়ে যায়। তারুণ্যের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিসদৃশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আর শক্তির প্রয়োগ। আশ্চর্য এই যে, এককালে যাঁরা নবীন—নতুনের দিশারী ও পূজারী, তাঁরাই বয়োধর্মের বিধানে প্রবীণ—বিজ্ঞতাভিমানী, নতুনের বিদ্বেষী, রক্ষণশীল; তাঁরা এমন গোঁড়া রক্ষণশীল যে, নতুন তুলিতে আর বুলিতে ভীত ও ত্রস্ত হয়ে উঠেন। সবল হলে সশস্ত্র রুখে দাঁড়ান, দুর্বল হলে কান্না জুড়ে বসেন। ধর্মে-দর্শনে-সমাজে-সাহিত্যে-রাষ্ট্রে চিরদিন এই দ্বন্দ্বই চলে আসছে।

অতএব, আমাদের আজকের দিনের সাহিত্যাদর্শও যদি পূর্বযুগের মনন-পুষ্ট কারো পছন্দসই না হয়, তবে দুঃখ করবার কিছুই নেই। তাঁদের কাছে স্বীকৃতি না পেলে ক্ষুব্ধ হওয়াও উচিত নয়।

তবে প্রথা আছে, প্রচারণা চালিয়ে স্বমতের প্রতিষ্ঠা করা—আর অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস আনয়ন করা। আমরাই বা নিয়মের ব্যতিক্রম করব কেন ! তাই দু-চারটা কথা বলতে চাই।

সাম্প্রত-সাহিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে—এ সাহিত্য হৃদয় ও কল্পনাধর্মী নয়, নিছক ব্যবহারিক জীবনের অভাব-অভিযোগ নিয়ে একপ্রকার 'মানসিক ব্যায়াম' অথবা 'অশিক্ষিত মনের অসংযত উত্তেজনা।' অর্থাৎ তাঁদের মতে, আজকের সাহিত্য রসসাহিত্য নয়—অভিযোগ-অভিযানের বাণীবাহক প্রচারপত্র বিশেষ। তাঁরা বলেন—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-নিপীড়ন চিরদিন মনুষ্য-জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে এসবের প্রতিষ্ঠা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভটি তো রয়েছেই, এগুলো নিয়ে আবার সাহিত্য করা কেন ? আর এগুলোতে সাহিত্যের উপাদানই বা কোথায় ? সাহিত্য হবে ব্যবহারিক জীবনেতর এক কল্পজগতের দিশারী, সে-জগৎ হবে 'সব পাওয়ার দেশ'। জীবনে যা পাইনি, যা পারিনি—সেখানে থাকবে তারই সমাবেশ। সেখানে রাজা আর ভিখারি সমভাবে—'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'—এ মতের সমর্থক একজন কবি বলেছেন :

> জীবন যাহার অতি দুর্বহ—দীন দুর্বল সবি—
> রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ—সে-জন বটে কবি। (মোহিত মজুমদার)

অপর একজন বলেছেন :

> জীবনে যে-সাধ হয়েছে বিফল
> সে-সাধ ফুটিছে গানে। (রবীন্দ্রনাথ)

সুতরাং তাঁদের সুদৃঢ় অভিমত হচ্ছে—আধুনিক সাহিত্য-প্রচেষ্টা কোনোমতেই কবিকৃতি বা শিল্পীর 'সৃষ্টি' নয়; কারণ সাম্প্রত-সাহিত্যের আদর্শ বা বিষয়বস্তু কোনোটাই রচনাকে রসায়ত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarBoi.com

করবার যোগ্যতা নেই। কেননা—এ আদর্শে ও বিষয়বস্তুতে মানব-মনের ও হৃদয়ের চিরন্তন অনুভূতি ও প্রেরণা নিহিত নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ শোনা গেল, এখন আমাদের বক্তব্য পেশ করতে হয়।

প্রথমত, দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সাহিত্য নেই—তা সেই সাহিত্যের আদর্শ art for art's sake ই হোক, আর সমাজ-রাষ্ট্র বা ব্যক্তিজীবন-বোধই হোক। হোমারের 'ইলিয়ড-ওডেসি'তে যে-ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেসব চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যে-নীতির তারিফ করা হয়েছে, তা এদেশের নয়, এ যুগের নয়, এ জাতিরও নয়। তবে তা আজো বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে রইল কী করে ? ইরানের সেই বীর-বাদশা নেই, সে-কালও নেই, কিন্তু শাহনামা আজো আছে। জাঁ ভাল্জাঁর দিনের সেই ফ্রান্স আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। আজকের ফরাসি-জাতিতে ও ফরাসি দেশে সে-ফ্রান্সের সমাজের, রাষ্ট্রের, মানুষের চিহ্নমাত্র নেই ; তবে 'ল্য মিজারেবল্' আজো টিকে রইল কী করে ? একদিন যা ছিল একান্তভাবে একটি বিশেষ দেশের, কালের ও মানুষের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, তা-ই আজ দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবের সর্বজনীন হৃদয়ের ধন হয়ে উঠল কিরূপে ? জানি, বিরুদ্ধবাদীরা বল্বেন—এতে মানব-মনের ও হৃদয়ের চিরন্তন অভিব্যক্তি ছিল—যা সর্বকালের, সর্বদেশের ও সর্বমানবের। 'ল্য মিজারেবল'-এর মতো আরো দুটো পরিচিত গ্রন্থের নাম করব—একটা হচ্ছে 'Uncle Tom's Cabin' অপরটা 'নীলদর্পণ'। এ দুটোও প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো দেশে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। নীলদর্পণের আবেদন নীল-চাষ উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। এটি স্বদেশেও কালজয়ী হতে পারেনি। 'Uncle Tom's Cabin'-এর আবেদনও কী আজ আছে ? কিন্তু 'ল্য মিজারেবল'-এর গৌরব আজো অম্লান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু কোনোকালেই চিরন্তন নয়, আদর্শও অনেক সময় নিতান্ত সাময়িক সমস্যা-নির্ভর। তবু রসসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে এদের অনধিকার নেই।

অতএব একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল—তা হচ্ছে রসসাহিত্য বা চিরন্তন আবেদনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিষয়বস্তু বা আদর্শ বড়কিছু নয়, লেখকের শক্তিই আসল। 'ল' মিজারেবল'-এ যে-সার্জেন্ট-টার চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র নয়—সে হচ্ছে আইনের মূর্তিমান প্রতীক (personification of the spirit of law)। জাঁ ভাল্জাঁও নির্যাতিত মানবতার প্রতিমূর্তি একটি বিদ্রোহী আত্মাবিশেষ (a personified soul of the suffering humanity and its revolt against mankind)। ল্য মিজারেব্ল্-এর তাই এত কদর এবং অমর-সৃষ্টি বলে গোটা দুনিয়ায় অভিনন্দিত। অথচ একটা দেশের একটা বিশেষ যুগের আর্থিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্রীয় কুশাসনের চিত্র বই এ আর কিছু নয়।

'ওথেলো' নাটকের কথাই ধরা যাক্। বিষয়বস্তু হচ্ছে—এক তরুণ স্বামী—তার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে। এমন ঘটনা হয়তো আজো দৈনন্দিন ঘটছে। নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা। কিন্তু শুধু কী তাই ! ওথেলো ও ডেসডিমোনায় কী প্রেমের দুটো দিক মূর্তি পরিগ্রহ করেনি, ইয়াগো কী সর্বধ্বংসী মন্দশক্তির প্রতীক হয়ে ওঠেনি ? এখানেও প্রেম, প্রতিহিংসা ও ঘৃণা মূর্তিধারণ করেছে (The sprit of love, malice and hatred is manifested)। এজন্যেই 'ওথেলো'র কাহিনী ব্যক্তির হয়েও সমষ্টির হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানেই কবিকৃতি—শিল্পীর গৌরব এবং সৃষ্টির স্থায়িত্বও নির্ভর করে সম্পূর্ণ শিল্পকৌশলের উপর—বিষয়বস্তু বা আদর্শের উপর নয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা আজকের দিনে যে-জীবন-সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সমস্যা দুনিয়ায় কোনোদিন ছিল না। ব্যক্তিসত্তাবোধ ও তীব্র গণচেতনা এ-যুগের পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। শিক্ষা-সভ্যতার প্রসারে আধুনিক যুগের মানুষ জগৎ, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সম্পর্ক নতুনভাবে যাচাই করে নিতে বদ্ধপরিকর। কেননা শিক্ষা ও সুরুচি মানুষকে দিয়েছে তীব্র মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস। এদিকে পরিবেশও হয়ে উঠেছে প্রতিকূল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোটা দুনিয়ায় জীবন-ধারণযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব ঘটেছে একান্ত। ফলে লোভ আর কাড়াকাড়ি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানাহানি তীব্রতর হয়ে উঠেছে সর্বত্র। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, তাই দুর্বল জনসাধারণ ব্যবহারিক জীবনে শোষণ, অত্যাচার, পীড়ন ও অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে নিছক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। এইরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে ধন-বৈষম্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এনেছে ক্ষোভ আর গ্লানি, মনন জীবন করেছে পঙ্গু। অধিকাংশ লোকের ডাল-ভাতের সংস্থান না-থাকায় তারা বুনিয়াদি শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতির উপর ক্ষোভে উত্তেজনায় 'মারমুখী' হয়ে উঠেছে। বস্তুত বেঁচে থাকাই যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, তখন মনুষ্যত্ব-বিকাশক সুন্দর, বৃহৎ ও মহতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই অধিকারবাদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে দুনিয়াময়। সে-সংগ্রাম দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে আর শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম চলছে।

ব্যক্তিসত্তায় সংগ্রামী বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গণচিত্ত করেছে বিক্ষুব্ধ, বিস্রস্ত ; তাই আজকের দিনে বুনিয়াদি শিল্পকলায় ও রুচি-সৌন্দর্যে অনুরাগ প্রদর্শন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আজকের সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তাই বস্তু-ভাব-ভাষা-ছন্দ ও আদর্শ একান্তই নিরাবরণ ও নিরাভরণ। কিন্তু তাই বলে কী আজকের দিনের সাহিত্য আগামী দিনের জনগণ-মনে রস পরিবেশনে অক্ষম হবে ?

আমাদের এই সংঘাত-মুখর গ্লানিময় জীবনের, এ ক্লিন্ন দিনের কাহিনী কী তাদের মনে রেখাপাত করবে না ? তারা কী বুঝবে না—সমাজ ও রাষ্ট্রের অব্যবস্থায় যে-আর্থিক বিপর্যয় আসে, তাতে বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন রুগ্‌ণ-ক্লিষ্ট-পিষ্ট কোটি কোটি হতভাগ্য মানবসন্তান অপঘাত অপমৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্যে আনচান করেছিল ? তারা কী উপলব্ধি করবে না—ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই হতভাগ্যেরা বৃহৎ ও মহতের সাধনায়, সুন্দরের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ-অবসর পায়নি ? এ কলঙ্কিত যুগের মানুষের ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর ইতিহাস কী তাদের জানবার দরকার হবে না?

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বেদনার কাহিনী, আমাদের সংগ্রামের বাণী যদি তাদের কাছে কদর না পায়, তবে তা বিষয়বস্তু ও আদর্শের অযোগ্যতার দরুণ নয়, বরং তা আমাদের বাচনভঙ্গির ত্রুটি ও চিত্রণশক্তির অপটুতার জন্যেই উপেক্ষিত হবে।

আগেই বলেছি, রচনাকে রসায়িত শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শক্তি ও শিল্পকুশলতা প্রয়োজন। অন্যথায় রচনা রচনাই থেকে যায়, সাহিত্য হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক্। আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম বলেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর কাহিনী আমাদের উত্তেজিত করত, প্রেরণা দিত। আজ আজাদী পেয়েছি। পলাশী যুদ্ধ বা নবাব সিরাজদ্দৌলার কাহিনী আমাদের মনে আর সাড়া জাগাবে না ; ইতিহাসের অসংখ্য যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যা-কাহিনীর মতো এও একটি কাহিনী হয়েই থাকবে। তার বিশেষ আবেদন, বিশেষ ব্যঞ্জনা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ যদি 'জুলিয়াস সিজারের' মতো নাটক রচনা করে এ-কাহিনীকে ভিত্তি করে, তবে তার আবেদন থাকবে চিরস্থায়ী হয়ে। ফলে, পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক মূল্য শুধু ইতিহাসের ছাত্রের কাছেই থাকল, কিন্তু পলাশীযুদ্ধ বা সিরাজদ্দৌলা নাটকের আবেদন সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বমানবের কাছে সমভাবে পৌঁছবে। একেই বলে শিল্প, এতেই হয় সাহিত্য।

সুতরাং আধুনিক গণসাহিত্যকে প্রচারপত্রিকা বলে উপহাস করবার কারণ নেই। এ আদর্শে রচিত কোনো রচনা যদি পাঠক-হৃদয়ে সাড়া না জাগাতে পারে, তবে বুঝতে হবে, লেখক অক্ষম—প্রতিভাহীন। আদর্শ ছোট নয়—বিষয়বস্তুও সাহিত্যের উপাদান হবার অযোগ্য নয়।

আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর একটা নালিশ এই যে—এতে প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতিকে অস্বীকার ও উপহাস করা হচ্ছে। নরনারীর সম্পর্ক, প্রেম-স্নেহ-মমতা প্রভৃতির আধুনিক-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে, ফলে যা একসময় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক আবরণে বরণীয় ও সহনীয়রূপে পরম পবিত্র বলে বিবেচিত হত, তাকেই একান্ত জৈব-ব্যবহারিক প্রয়োজনের সামগ্রী বলে মাহাত্ম্যহীন করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সাথে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে মানুষের আস্তিক্য বুদ্ধিকেও। শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতির মতো পবিত্র বৃত্তি-ব্যঞ্জনাগুলোকেও যেন করা হচ্ছে উপহাস। সমাজ-রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসত্তার চিরন্তন সংস্কারকেও দলিত করে সমাজের ভিত জীর্ণ করে দিচ্ছে। এর ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্য-সৌষ্ঠব-শান্তি নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে যে-সংসার—সে-সংসারে প্রয়োজনের ব্যবহারিক বন্ধনের উপর ধর্মীয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা আরোপ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার মধ্যে যে একটা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সংস্কার জাগিয়ে রাখা হয়েছিল, তা যদি নষ্ট হয়ে যায় ; তবে সংসার, পারিবারিক বন্ধন টিকবে কোন্ আদর্শের জোরে ?—এ-ই হচ্ছে তাঁদের জিজ্ঞাসা।

অবশ্য এ-কথা সত্যি যে, আমরা যে-পরিমাণে কার্লমার্কস্ ও ফ্রয়েডের অনুরাগী হচ্ছি, ঠিক তার দ্বিগুণ পরিমাণে প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে দূরে সরে আসছি, ফলে প্রাচীনরাও ঠিক সেই পরিমাণে মানুষ ও মনুষ্য-সমাজের পরিণাম চিন্তায় ভীত-ত্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু প্রাচীনদের ভুল্লে চলবে না যে, কালস্রোত নদীর স্রোতের চেয়ে কম বেগবান নয়। কিছু ধরে রাখতে চাইলেই রাখা যায় না ; নতুন সূর্যের উদয়ে, নতুন মানুষের আবির্ভাবে নতুন দিন নতুন চিন্তা না এসে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যে অহরহ পরিবর্তন চলছে—বীজে মূল, মূলে কাণ্ড, কাণ্ডে শাখা, শাখায় পাতা-কলি-ফুল-ফল, ফলে আবার বীজ। স্রষ্টার কল চল্ছে অনবরত—সৃষ্টি আর ধ্বংস, ধ্বংস আর সৃষ্টি, এই তাঁর কাজ। যা যাচ্ছে তা আর ফিরে আসে না এবং Old order changeth yeilding place to new.

কিন্তু তবু নতুন যা আসছে, তার সাথে পুরাতনের অনৈক্য নেই, যদিও নতুন ও পুরাতন দুটোর আলাদা রূপ। তেমনি মনুষ্য-সমাজেও নতুন ও পুরাতনে রূপগত, পথগত অনৈক্য থাকলেও মৌলিক ঐক্য সর্বত্র বিদ্যমান, উদ্দেশ্যগত বিরোধ নেই কোথাও। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্য যেমন সুশৃঙ্খল ; জীবন ও সমাজবোধ, আজকের বিচার-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জন, বিশ্বাস-শ্রদ্ধা, উপহাস-উপেক্ষাও ঠিক একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার পালটাতে পারে, কিন্তু মানুষ চিরদিন সামাজিক জীবই থাকবে—তাতে সন্দেহ নেই। অতএব বলা যেতে পারে, এ পথে মানুষের পরিণাম ভয়াবহ হবে না বরং সামাজিক ও পারিবারিক জীবন আরও সুন্দর, আরো সার্থক, আরো মধুর হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং প্রাচীনদের আশঙ্কা করার কিছুই নেই, বরং ভরসা করার রয়েছে অনেক কারণ। কেননা শিক্ষা-সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলো অধিকতর বিকাশ লাভ করছে, বেহেস্ত-দোজখের শান্তি-শাস্তি নিরপেক্ষ সহজ মনুষ্যত্বের প্রেরণায় মানুষের মানবতাবোধ ও সুরুচি মানুষকে বিবেচক ও ন্যায়ানুরাগী করে তুলতে বাধ্য, যা আগের যুগে আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক শক্তির দোহাই কেড়েও সম্ভব হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুর্জোয়া সাহিত্য বনাম গণসাহিত্য

অত্যাধুনিক যুগে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রাদর্শের পরিবর্তন সাধনার্থ বিশেষ মত প্রচারের জন্যে এক ধারার সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে প্রচার সাহিত্য, বিপ্লবী সাহিত্য বা গণসাহিত্য। অধুনা দুনিয়াব্যাপী এই ধারার সাহিত্য-সৃষ্টিরই সাধনা চলছে। আধুনিক যুগে মানুষ ব্যবহারিক জীবনে শোষণ, অত্যাচার, পীড়ন ও অভাব-অনটন-জর্জরিত হয়ে নিছক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। "অধিকাংশ লোকের ডাল-ভাতের সংস্থান না থাকায় যেন তাঁরা বুনিয়াদী শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতির উপর মনের উত্তেজনায় মারমুখী হয়ে উঠেছে। বস্তুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে ধনবৈষম্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এনেছে ক্ষোভ আর গ্লানি, মনন-জীবন করেছে পঙ্গু। বেঁচে থাকাই যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, তখন মনুষ্যত্ব-বিকাশক বৃহৎ ও মহতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা বা শিল্পকলা ও রুচি-সৌন্দর্যে অনুরাগ প্রদর্শন সম্ভব নয়।"

তাই অধিকারবাদের লড়াই শুরু হয়েছে দুনিয়াময়। ব্যবহারিক জীবনে যে মনো-জীবন রয়েছে, তা দুঃখ-দৈন্য, অভাব-উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আজ লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত।

এইজন্যে সাম্প্রত-পূর্বযুগের সাহিত্যকে বলা হচ্ছে বুর্জোয়া সাহিত্য। প্রাক্তন জীবনবোধের মুকুরস্বরূপ এই সাহিত্য এবং সাহিত্যাদর্শ এখনকার পাঠকের নিকট সুপ্রাচীন ভগ্ন ইমারতের মতো পরিহার্য এবং উপেক্ষণীয়। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবানদের কাছে যেমন নতুন হর্ম্যের চেয়ে পুরোনো ভাঙা ইমারতের কদর অনেক বেশি, তেমনি মননধর্মীদের কাছেও প্রাক্তন সাহিত্যের মূল্য কম নয়। কিন্তু গণসাহিত্যবাদীরা বলেন—"জীবন ধারণ ও জৈব-ক্ষুধা নিবারণের পক্ষে যা অপরিহার্য, তা-ই শুধু সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে—এর অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা হবে মাতলামি।" সুতরাং এদের মতে শুধু তন্ময় (objective) বিষয়েই সাহিত্য রচিত হবে, মন্ময় (subjective) বিষয় নিয়ে বিলাস করবার দিন আর নেই। 'সরাব আর সাকি', 'প্রিয় আর প্রেয়সী'র কাহিনী শুধু অবান্তর নয়—অনর্থ সৃষ্টিকারীও বটে। এঁরা বুঝতে চান না যে, যাকে আমরা 'জীবন' বলি, তা-ও একটা অদৃশ্যবস্তু। 'দেহ' নিশ্চয়ই 'জীবন' নয়; 'জীবন' মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়-পরিধিতে উত্থিত অনভূতির সমষ্টিমাত্র। সে-অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-জগৎ থেকে শুধু উপাদান সংগ্রহ করে। এছাড়া জীবনের সাথে জগতের সম্পর্ক আর বিশেষ কিছুই নেই। নেই বলেই জগৎ ও জীবনের কোনো সর্বজনীন রূপ নেই, কেননা একই বস্তু বা ঘটনা বা দৃশ্য থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ও বিচিত্র অনুভূতি লাভ করে। তাই প্রত্যেকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র জগৎ ও জীবন। গাছের কোনো দুটো পাতা একরূপ নয়—তবু তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। তেমনি মানুষের মধ্যেও ভাব ও রুচির সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যই হচ্ছে আমাদের পারস্পরিক মিলনের ভিত্তিভূমি। সে মিলন সামাজিক, ধর্মীয়, বা রাষ্ট্রীয় মিলন—আদর্শের ও অনুভূতির মিলন। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা অনুভব করে যে-মন, তার চেয়ে অনুভূতির উপলক্ষ দেহ কী বড় হতে পারে? সুতরাং ডাল-ভাতের জীবন অপরিহার্য হলেও সে-জীবন মানুষের কাম্য নয়। যেমন বৃক্ষমূল বৃক্ষ-জীবনের ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু ফল ফলায় যে-অংশ, সে-অংশের রসদ জোগানোতেই এর সার্থকতা। যে-মাটির উপর তাজমহল দাঁড়িয়ে, সে-মাটির গুরুত্ব অনেকখানি—তবু তার গুরুত্ব শুধু তাজমহলের ভিত্তিভূমি বলেই। তাজমহলই কাম্য—মাটি নয়, অতএব আদর্শ বা মতপ্রচার বিরহিত সাহিত্যের যে utility নেই বলা হয়—তাতে সত্যি কতটুকু?

এমনিতেই আমরা দেখতে পাই, "সৌন্দর্য বস্তুটাই প্রয়োজনাতিরিক্ত। যেমন ইটের গাঁথুনিতেই ঘর তৈরি হয়, এতেই থাকা চলে, অর্থাৎ প্রয়োজন মিটে। চুনকাম করে যে অনর্থক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রম করা হয়, তাতে কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যেমন আমরা কাপড় পরি আব্রুরক্ষার জন্যে, রঙ আর কারুশিল্পের ঠিক প্রয়োজন নেই। সুতরাং সৌন্দর্য সৃষ্টিটা সবসময়েই ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে। কিন্তু সে-কি আরো গভীরতর প্রয়োজনের তাগিদ নয়? বস্তুত জৈব প্রয়োজনের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই আসল জীবনের চাহিদা আরম্ভ হয়। যাঁরা art for art's sake আদর্শকে গর্হিত বলে নিন্দা করেন তাঁরাও বক্তব্য বিষয়কে উপমা-অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর (অর্থাৎ সাহিত্য) করে তুলতে চান! এই সৌন্দর্য-প্রীতির কারণ ও প্রেরণার উৎসের সন্ধান করলে অনেক অবোধ্য অস্বীকৃত কথাই উপলব্ধ ও স্বীকৃত হবে। বিশেষত প্রত্যেক কথারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, সেভাবে বিচার করলে নিছক রস সৃষ্টির জন্যে যে-সাহিত্য, তা-ও হৃদয়মনের বিকাশে ও প্রসারে সাহায্য করে নিশ্চয়ই।"

বুভুক্ষাপীড়িত নির্যাতিত নিপীড়িত 'মানবতার বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার' অভিযান চালানোর জন্যে প্রচার সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এ-যুগে অস্বীকার করা চলে না। নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যে ডাল-ভাতের দাবী স্বীকৃতি না পেলে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অকালে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না—এ অতি সত্যি কথা। সুতরাং গণসাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি এ-যুগে অপরিহার্য। কিন্তু তবু রোগ-শোক, অভাব-উৎপীড়ন, অতৃপ্তি-অনটন, জরা-মৃত্যু, দুঃখ-বেদনা মনুষ্যজীবনে এবং জগতে নতুন কিছু নয়। এদের অনেকগুলো দুরতিক্রম্য বা অনতিক্রমণীয়। যদি কেউ ব্যবহারিক জীবনের এ দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনাকে ভুলে থাকবার জন্যে মনোময় কল্পজগৎ সৃষ্টি করে মনকে মুক্তপক্ষ এবং হৃদয়কে বল্গাহীন করে ক্ষণেকের জন্যে হলেও জগতের রূপ-রস ও আনন্দ পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে উপভোগ করে, তবে তা-ই কী তার যথালাভ নয়? ব্যবহারিক জীবনের অভাবে উৎপীড়নে পৃষ্ট দেহের সাথে মন-প্রাণকেও বিক্ষত করে যন্ত্রণা বাড়ানোতে কী জীবন-রসের উৎস শুকিয়ে যায় না? তার চেয়ে কেউ যদি দেহকে পিষ্ট হতে দিয়ে মন-প্রাণকে যন্ত্রণার কবলমুক্ত রেখে কল্পনার রসলোকে আশ্রয় খোঁজে, তবে তার সেই 'পলাতক মনোবৃত্তি' নিন্দনীয় হবার হেতু কী? মোহিতলাল বলেছেন :

জীবন যাহার অতি দুর্বহ—দীনদুর্বল সবি—
রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ—সে-জন বটে কবি। (বিধাতার বর)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে (এবং মিটেছেও) গানে।'

বরং এ আদর্শ জীবনীশক্তি বর্ধক ও সংগ্রাম-শক্তি (resisting power) প্রদায়ক। যাঁরা আজ ক্ষোভে-উত্তেজনায় নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসক হয়ে উঠেছেন, সে-ই অধিকারবাদের সংগ্রামীদলও উপলব্ধি করেন—জৈবক্ষুধার চেয়ে মনের ক্ষুধা অনেক তীব্র এবং স্থূল দৈহিক জীবনেতর যে-মনোজীবন রয়েছে, সেই অনুভূতির জীবনই সত্যিকার জীবন এবং সে-জীবন রসলোক-বিহারী—ডাল-ভাতের কাতর নয়। জগতের রূপ-রস সে-জীবনেরই সাধ-আহ্লাদের উৎস এবং ডাল-ভাত সে-জীবনে পুষ্টির সহায়ক মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করার উপায় নেই যে, জীবনে শত অভাব-দুঃখের মধ্যেও এমন মুহূর্ত আসে, যখন —

'আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে
ফুল মোরে ঘিরে বসে ;
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহু পাশে তার
বেষ্টনন করে কায়া।'

জীবনকুঞ্জে—মনের বনে যে-বসন্ত আসে, তাকে ঠেকায় কে ! বস্তুত গণ-সাহিত্যবাদী আর রস-সাহিত্যপন্থীদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন—তা হচ্ছে জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ করা। অতএব গণসাহিত্যবাদীদের ডাল-ভাতের সংগ্রাম সেই মনো-জীবন বা মনন-জীবনকে স্বচ্ছন্দে-নির্বিঘ্নে উপলব্ধি ও উপভোগ করবার জন্যেই। তারা আজ 'means' (উপায় বা উপলক্ষ)-এর জন্যেই সংগ্রামরত, এই 'means' (উপায় বা উপলক্ষ) যে 'end'-এ (সিদ্ধিতে) পৌঁছাবে, তা অনুভূতির জীবন বা মনন-জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে। সুতরাং তাদের গণসাহিত্য অস্থায়ী সংগ্রামী সাহিত্য মাত্র—স্থায়ী রস-সাহিত্য নয়। যেদিন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন হবে—তাঁদের দাবীদাওয়া মিটবে, সেদিন তাঁদের হাতে যে-সাহিত্য পাব, তা হবে উপেক্ষিত বিগত যুগের সাহিত্যেরই পুনরাবর্তন। সেদিন আবার শিউলি, বকুল, যূথী, গোলাপ, নার্গিস, হাস্নুহানার গন্ধে এবং দ্রাক্ষাবনের বুলবুল ও বসন্তের কোকিলের ধ্বনিতে সাহিত্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠবে ! তাও হবে নতুন—পুরাতনের অনুবর্তন নয়। কেননা নতুন মানুষের মনে পুরোনো কখনো ফিরে আসে না স্বরূপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের রূপকল্প ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা

বর্বরতম যুগে মানুষে আর পশুতে কোনো ভেদ ছিল না। পশুর মতো তারও সেদিন একমাত্র কাম্য ছিল ক্ষুন্নিবৃত্তি; তবু তার 'মন' বলে পশুর থেকে উন্নততর একটি বৃত্তি ছিল; ফলে, তার শুধু পেটে ক্ষুধা নয়, মনেও ছিল পিপাসা। সেটাও ভোগেচ্ছা। সেদিন সে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াসী ছিল, বাস্তব-ব্যবহারিক জীবনে আর কোনো ভোগ্যবস্তুর প্রত্যাশী ছিল না। সে-বোধই জাগেনি তখনো; কাজেই বঞ্চিত জীবনের হতবাঞ্ছার কোনো বিক্ষোভ ছিল না তার মনে। সেজন্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোনো চিন্তাই তাকে বিচলিত করতে পারেনি। তাই বাস্তব জীবনোপলব্ধির কোনো গরজ, জীবনকে যাচাই করবার কোনো প্রেরণাই সে বোধ করেনি সেদিন। সে তাকিয়েছিল তার চারদিককার অজানা ও রহস্যাবৃত চিরবিস্ময়কর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের দিকে। তা-ই তাকে করেছিল চকিত, বিস্মিত, ভীত, ত্রস্ত ও উল্লসিত। সেজন্যেই সে—চাটাইয়ে নয়, ঘাস বা পাতায় শুয়ে স্বপ্ন দেখত পাখির মতো দূর-দূরান্তরে উড়ে যেতে; খুঁজত আকাশের কিনারা—দুনিয়ার শেষ। সে কল্পনা করত, মানুষের অগম্য হিমালয়-সাহারা-অলিম্পাসে না-জানি কী আছে, কারা আছে ! নিশ্চয়ই সেখানে এমন কিছু আছে, এমন কেউ থাকে, যা কাম্য, যা শ্রেয়, বা সুন্দরতর ও মহত্তর এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে, রূপে-গুণে, বলে-ছলে যে বা যারা বিচিত্রতর।

মানুষ যা জানে না, যা বোঝে না, যা রহস্যাবৃত, যা অচেনা ; তাকে জানবার, বুঝবার ও আয়ত্ত করবার এক উদ্দাম বাসনা, এক অসহ্য ব্যাকুলতা বোধ করে। মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বুদ্ধির সাহায্যে, বোধির প্রয়োগে, চিন্তার মাধ্যমে তার একটা যুক্তিসহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্বস্তি পায় না। এভাবে সে বাহ্যজগতের সবকিছুর একটি সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবোধ পেয়েছিল। লাভ করেছিল আত্মপ্রসাদ।

এমনি করে মানুষ সেদিন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছিল। তাতে ছিল পঙ্খিরাজ ঘোড়া, বিচিত্র হাত-পা-মাথা-মুখ-চোখ-কানওয়ালা দেব-দৈত্য-পরী-জীন রাক্ষস-ড্রাগন। কল্পলোকের এসব জীবের কল্পিত রোমাঞ্চকর জীবনোপখ্যানই ছিল সেদিন মানুষের মনের রস-পিপাসা—মনের ক্ষুধা মিটাবার অবলম্বন। এ মনের প্রতিফলন দেখি রূপকথায়। রূপকথা সে যুগের জীবন্তিকা। রূপকথার জন্ম হল এভাবেই। কথায় বলে—'অদারু দারু হয় শিলে পিষিলে। অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' ফলে রূপকথাই যুগান্তরে হয়ে দাঁড়াল মানুষের অতি-শোনা প্রতিবেশী রাজ্যের সত্য কাহিনী। মাটির গড়া রক্তমাংসের মানুষের বাস্তবজীবনে প্রতিবেশীর প্রভাবের মতো সে প্রভাব পড়ল মানুষের মনে-মানসে আর ব্যবহারিক জীবনে। এসব কল্পলোকবাসী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে কল্পিত হয় দুইরূপে—অরি ও মিত্ররূপে। দেবতারা শক্তিমান অতি-মানুষ ও মানুষের সহায়রূপে কীর্তিত; আর সব দেব-মানবের শত্রুরূপে কল্পিত। এদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে দেব-মানব পরস্পরের সহায়ক। বর্বরতম মানুষের শৈশব অতিক্রান্ত হল এভাবে। মানুষের জীবনবোধের কিছুটা প্রসার হল। হতে থাকল জ্ঞানপ্রজ্ঞা-বোধির উন্মেষ। পূর্বের কল্পনালব্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে চলল। বিকশিত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানবমনে জেগে উঠল নতুনতর পিপাসা। জীবন-পরিধি হল কিছুটা প্রসারিত। বাহুবলে বলীয়ান মানুষের মনের ক্ষেত্র হল বিস্তৃত। আবার যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই মানুষের ভয়, সেখানে মানুষ অসহায়। তাই সৃষ্টির আদিতে মানুষ ভয় করেছে মাটির দূর্বা থেকে আকাশের নক্ষত্র অবধি সবাইকে।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা হয়েছে পরিমিত, কাঁচা মন হয়েছে পাকা। সে বিশেষ মানুষ। ইতরের চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে তার চাহিদা বেশি, সে দেহে শক্তিমান, কৌশলে কুলীন আর মনে উচ্চাভিলাষী। শিশুমানুষের—পশুমানুষের মন এভাবে একটু একটু করে ক্রমে জেগে উঠেছে। বিস্ময়বিমূঢ় মনে, শঙ্কাকাতর মনে, কল্পনাপ্রবণ মনে, আত্মপ্রত্যয়হীন মনে, ত্রাসদলিত মনে অঙ্কুরিত হয় কামনা—সে কামনা ভোগের, আত্মপ্রসারের—পরাক্রান্ত মনের। উচ্চাভিলাষী শক্তিবিলাসী মনে সাড়া দিয়ে নড়ে উঠল অজ্ঞাতপূর্ব দুটো লোভ—জমির আর জরুর। যেমন-তেমন জমি নয়—রাজ্য, আর যে-সে 'কন্যা' নয়—সুন্দরীতম ডানাকাটা পরী। দুটোই দুর্লভ। তাই শুরু হল অভিযান, বেধে গেল সংগ্রাম, দেখা দিল পদে পদে সংঘাত। এ অভিযানে দেবতা হল মানুষের সহায়, আর দেও-জিন-রাক্ষস দাঁড়াল পথরোধ করে। মানুষের মধ্যে এ উচ্চাভিলাষী সংগ্রামী দলে রয়েছে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্তুর, সদাগর আর কোটাল। এভাবে কল্পলোকের সঙ্গে যুক্ত হল ইহলোক। কল্পরাজ্যে-মনোরাজ্যে ঘটল মিতালি, স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হল জৈব-কামনা। জীবন পরিব্যাপ্ত হল জীবনেতর লোকে। দেব-মানবে জীবনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার রূপকথা নয়, কল্পলোক নয়, আবার তাকে বাদ দিয়েও নয়। এবার প্রবুদ্ধ জীবনের জয়যাত্রা—আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার স্পৃহার মূর্তস্বরূপ। এ-যুগ রোমান্সের যুগ। সভ্যতার ইতিহাসে মহাকাব্যের যুগ।—ইলিয়াড-ওডেসী আর রামায়ণ-মহাভারতে বিধৃত রয়েছে তার স্বরূপ। এ থেকে মনুষ্যসমাজেও সৃষ্টি হল শ্রেণী—তুচ্ছ ও উচ্চ মানবশ্রেণী। উচ্চমানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার দেখে সেদিন তুচ্ছ মানুষ ঈর্ষা করেনি বরং স্বাজাত্যবোধে সে উল্লসিতই হয়েছিল মানুষের জয়যাত্রায়। নির্বোধ তুচ্ছ মানুষ সেদিন আত্মভোলা হয়ে স্বজাতির প্রগতিতে আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিল, উপভোগ করেছিল পরমানন্দ। এভাবে মনুষ্যজীবনে সার্থক হয়ে উঠল স্বপ্ন ও সত্য, কল্পনা ও মনন, মাটি ও আকাশ, আর জীবন ও জিজ্ঞাসা। বাস্তবজীবনই ব্যাপ্ত হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে, এ ত্রয়ীর পটভূমিকায় সংঘাতে-ঈর্ষায়-বিদ্বেষে ও প্রীতি-অনুকম্পায় দেব-দৈত্য-নর রইল পরস্পরের প্রতিবেশী হয়ে।

এ যুগটি মানুষের জীবনে তথা ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থায়ী স্তর। মনুষ্যজাতির কোনো কোনো সম্প্রদায়ে আজো এর পূর্ণ ও প্রবল জের চলছে। এক সমাজেও প্রতিবেশ ও শিক্ষাগত কারণে সব মানুষ একই স্তরে উন্নীত হতে পারে না। তাই আলো-আঁধারি, কায়া-ছায়া, কল্পনা-বাস্তব, জ্ঞান-অজ্ঞান, বোধি-প্রজ্ঞা, ভাব-প্রবণতা, ভয়-ভাবনা, চেতনা-অবচেতনা, শঙ্কা-কৌতুক, বিস্ময়-জিজ্ঞাসা মিশ্রিত বহু বিচিত্র এ জীবনলীলার মোহ কোনো ছলেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না মানুষ। যতই ভাবে, যতই দেখে, ততই রহস্যের মায়াজালে আত্মসমর্পণ করে আত্মসমাহিত হতে চায়, গদগদ কণ্ঠে বিমুগ্ধ ও অতৃপ্ত চিত্তের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠে একটি কথায়—'আহা!' কিংবা একটি উচ্ছ্বাসিত নিশ্বাসে। এ যুগে মানবজাতি সাংস্কৃতিক মানানুসারে নানা স্তরে বিভক্ত রয়েছে। আমরা এর সবচেয়ে প্রগতিশীল সম্প্রদায়কেই আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব।

মনুষ্যের জাতীয় জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হয়ে গেল। এ যুগে আর রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্র, সদাগর ও কোটালে জীবনবোধ, উচ্চাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা সীমাবদ্ধ রইল না। রাজ-রাজড়াদের সান্নিধ্যে, দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগে, শিক্ষার প্রসারে জনমনেও ফুটে উঠল প্রসারিত জীবনের মোহময় রূপ। জীবনবোধ হয়ে উঠল সূক্ষ্ম। এবার আর স্বর্গপাতাল নয় শুধু মর্ত্য, ভাবপ্রবণতা নয়—ভাবনা ; পঙ্খিরাজের পিঠ নয়, আকাশের কিনারা নয়—জীবনের শারীর চাহিদা মিটাবার আগ্রহই মানুষকে কল্পনার স্বর্গলোক থেকে কঠিন মাটির সংগ্রামে নিয়োজিত করল। এবার আর আকাশ-বিহারের সাধ নয়, জমিচাষের গরজবোধই কর্মমুখর করে তুলল মানুষকে। এবার গানে-গাথায় দেও-জিন-রাক্ষসের কথা নয়, পরী-বিদ্যাধরী অপ্সরীর কামনা নয় ; হতবাঞ্ছ জীবনের বিক্ষোভ, 'বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার' আক্ষেপ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, কৃতার্থ মনের উল্লাস, বিজয়ী বীরের আস্ফালন ও দলিতজনের আর্তনাদই হল সাহিত্যের সামগ্রী। 'কাম আর অর্থ'—এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল এ স্তরে।

এবার আর বৃহৎ বা মহৎ কোনো জিজ্ঞাসা নয়, নিতান্ত বাসনা চরিতার্থ করাই জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। জীবন ও জীবিকার তফাৎ আর রইল না, জীবিকাই জীবন অর্থাৎ জীবিকা জীবন দ্বারাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের স্বরূপ অভিব্যক্তি পেতে শুরু করেছে। আগে মানুষ ছিল কম। পৃথ্বী ছিল বিপুলা, তার উপর নিতান্ত উদরপূর্তির সামগ্রী ছাড়া অন্য সামগ্রীর প্রয়োজনবোধ তখনো জাগেনি বলে হানাহানির কারণ ছিল না আহার্য নিয়ে। কেননা, তখনো সঞ্চয়-বুদ্ধি জাগেনি, পশুপাখির মতো দিনভর খুঁজে পেতে আহার করাই ছিল কাজ। তখনো মন অবচেতন স্তর পার হয়ে আসেনি, কাজেই কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি যৌনবোধ ও যৌন-উত্তেজনা। তবু আহার্য সংগ্রহঘটিত দ্বন্দ্ব আর যৌন-সম্ভোগ-সংক্রান্ত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সংঘাত যে ঘটেনি তা নয়। তবে তা মনে পুষে রাখার মতো নয়। পশুতে, পাখিতে এসব ব্যাপার যেমন ঘটে এবং যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এও তেমনি আর ততক্ষণ ও ততটুকু।

তারপর ক্রমে মানুষ জাগল। মানুষের জীবন-বিলাস বহু বিচিত্ররূপ ধরে বিকশিত হয়ে চলল। মানুষ বাড়ল। টান পড়ল ভোগ্যসামগ্রীতে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল শুরু। লাগল কাড়াকাড়ি, মারামারি আর হানাহানি। পৃথিবী হয়ে উঠল বসবাসের প্রায় অযোগ্য। নিশ্চিত-নির্বিঘ্ন-নিরুদ্বেগ জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। দুর্বলের সহায়, কল্যাণ ও শান্তিকামী, করুণা-বিহ্বল মানুষ এমনি সংকটে উচ্চারণ করেন একাধারে সাবধানধ্বনি ও অভয়বাণী; তাঁদের একচোখের দৃষ্টিতে থাকে ধমক, আর চোখে থাকে আশ্বাসের দীপ্তি ! তাঁরা দোহাই কাড়েন। বাহুবল, ধনবল, জনবল নয়, জ্ঞানবল ও বাক্যবলই তাঁদের মূলধন আর দোহাই-ই তাঁদের অস্ত্র। আল্লাহর দোহাই ও স্বর্গ-নরকের দোহাই, লাভ-ক্ষতির দোহাই, রোগ-শোক-মৃত্যুর দোহাই ও আপদ-বিপদের দোহাই কেড়ে তাঁরা লোকমনে এমন এক ভয়-ভাবনা ও আশা-আশ্বাসের পার্থিব-অপার্থিব পরিবেশ ও সংস্কার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তার সত্যাসত্য নির্ণয় অসম্ভব। এ রহস্যঘন, ত্রাসদুষ্ট, সন্দেহ-শঙ্কাপুষ্ট সংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বের হওয়া দুঃসাহসী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে রইল। তাতেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিমিত ও লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মনুষ্যসমাজের আবহ স্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। এ স্তরের মনুষ্যমনের প্রতিচ্ছবি পাই এ যুগে সৃষ্ট সাহিত্যে। সে-সাহিত্য রোমাঞ্চময় ও রোমান্টিক। তাতে রয়েছে বাস্তবজীবনে পাওয়া-না-পাওয়া হৃদয়ের স্বরূপ। জীবনের সাধ-আহ্লাদ, দুঃখবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ, তৃপ্ত হৃদয়ের মধুর প্রসাদ ও প্রশান্তি অভিব্যক্তি পায় সাহিত্যে। তাতে অলৌকিক-অসম্ভবতা আর রইল না, থাকল জীবনে সম্ভব অথচ অসাধারণ-অস্বাভাবিক পরিবেশে ও উপায়ে কামনা পূর্ণ করবার দিশা। এ সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শের স্বরূপ 'এই জীবনে যে-সাধ মিটাতে পারিনি, সে-সাধ জেগেছে গানে।' অথবা 'জীবন যাহার অতি দুর্বহ—দীনদুর্বল সবি। রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ সেইজন বটে কবি।' যেমন গত শতকে রচিত রোমান্সগুলো।

শুধু জীবনবোধের প্রসারেই মানুষের জৈব চাহিদা বাড়েনি, সভ্যতার দান তথা আবিষ্ক্রিয়াও মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়ে দিচ্ছে। যতই রকমারি ভোগ্যসামগ্রী বাড়ছে, ততই অসংযত হয়ে উঠছে মানুষের বাসনাও। তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি কিছুতেই হচ্ছে না। চাহিদা মিটাবার উপলক্ষে জীবিকার ধান্দাতেই ছুটোছুটি করে জীবন কাটছে চোখ তুলে চারদিকে দেখবার, ভাববার বা বিস্মিত হবার আগের মতো অবকাশই বা কোথায় ! কারো যদি অবকাশ ঘটেও যায়, তবু জ্ঞানে প্রবীণ পৃথিবীর লোক জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও নিসর্গের, আকাশের আর পাতালের সব রহস্য, সব খবর এমন করে বিশ্লেষণ করে নগ্ন করে তুলে ধরেছে জনসমক্ষে যে, জগতে আর জীবনে নতুন কিছুই রইল না যা মানুষের ভয়-বিশ্বাস, ত্রাস-শঙ্কা বা আনন্দ-উল্লাস-ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। ফলে 'খাও, গাও আর নাচো' এ-ই হয়ে উঠেছে জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন। কেননা জানা গেছে, আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। সব ফাঁকি, সব ভাঁওতা। যুগযুগান্তরে লালিত মানুষের পূর্বার্জিত বিশ্বাস-সংস্কারের ভিত উবে গেছে চোরাবালির মতো। ধসে পড়েছে ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক মূল্যমানের সৌধ। ভেঙে গেছে পারলৌকিক অস্তিত্বের স্বপ্নে গড়া আশা-আশংকার মনোময় ইমারত। কিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরসায়, কার ভয়ে কোনো মহৎ ও বৃহৎ প্রেরণায় মানুষ ভোগে থাকবে বিরত, বঞ্চিত হৃদয়ে প্রবোধের শান্তি বারি ছিটোবে; আর কেমন করে দিন-রজনীর অভাবে ধৈর্য ধারণ করবে ?

মহৎ ও বৃহৎ আদর্শবিহীন, জীবাত্মা-পরমাত্মারহস্য পরাঙ্মুখ, পরলোক-বিভ্রান্তিবিমুক্ত জৈব-জীবন-সর্বস্ব বস্তু-নির্ভর নাস্তিক্যাদর্শবাদীরা তাই একান্তভাবে ভোগ্যবস্তু লোলুপ। তাদের ধ্যানজ্ঞান আর কর্মভোগেচ্ছা পূরণেই নিয়োজিত। তাদের বুকে বিক্ষোভ, মুখে অভিযোগ, চোখে লোভ।

গাঁয়ে কোনো শক্তিমানের গরুতে যদি গরিব চাষীর ধান খেয়ে যায় তখন সে শক্তিমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সাহস না পেয়ে বা প্রতিকারের উপায় না দেখে, গাঁয়ের আর দশজনের কাছেই আবেদন জানায়—'আজ অমুকের গরুতে আমার ধান খেয়েছে, কাল তোমার ধান খাবে। পরশু অমুকের খাবে। অতএব, এস আমরা সবাই মিলে এর প্রতিকারের একটা ব্যবস্থা করি।' আজকাল শহরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এমনিভাবেই সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলেরা লড়াই করে। এরমধ্যে কোনো মহৎ প্রেরণা নেই। স্ব স্ব স্বার্থে লোক নিতান্ত সহজাতবৃত্তিবশে একজোট হয় মাত্র। একই মামলার আসামিরা যেমন আত্মনিষ্কৃতির জন্যে একমুখো চেষ্টা চালায়।

আজকাল মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত—ভোগী ও ভোগেচ্ছু, ধনী ও গরিব, ভোগী ধনীরা সংখ্যায় কম, কিন্তু বিত্তে বড়। ভোগেচ্ছুরা সংখ্যায় অগুণতি। তারা সব একজোট হয়েছে। তাদের বক্তব্য এই—পৃথিবী ও পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রী প্রকৃতির দান, আমরাও প্রকৃতিসৃষ্ট। কাজেই এতে সবার সমান অধিকার রয়েছে, এ কারো বা কোনো দল-বিশেষের একচেটিয়া ভোগ্য হতে পারে না। ধনী, তুমি অট্টালিকায় আছ, রাজা তুমি প্রাসাদে রয়েছ ; মধ্যবিত্ত, তুমি ভবনবাসী—আমরা এত গরিব-কাঙাল যখন কুটির আর গাছতলা সার করেছি, আর সবার জন্যে যখন অট্টালিকা ও প্রসাদের ব্যবস্থা করা যাবে না, তখন তোমরাও প্রাসাদ-অট্টালিকা-ভবন থেকে নেমে এস, আমরাও গাছতলা থেকে উঠে যাই। সবার জন্যে সমবিত্ত ও সম-ভোগের ব্যবস্থা হয়ে যাক। সুখে থাকি আর দুঃখে পড়ি তাতে আর ক্ষোভ বা ঈর্ষা থাকবে না। তোমাদের ভোগ দেখে আমাদের ঈর্ষা জাগে, তোমাদের বিত্ত দেখে আমাদের মনে ক্ষোভের উদয় হয়, তোমাদের ঐশ্বর্যে আমাদের লালসা বাড়ে। ভোগেচ্ছু বিক্ষুব্ধ দলবদ্ধ বঞ্চিত জনগণ মহৎ-নামের আবরণে এ মনোবৃত্তিকেই মহিমময় করে তুলে ধরেছে। 'মানবতা', 'সাম্য', 'ভ্রাতৃত্ব', 'জীবনবাদ' প্রভৃতি বুলির আবরণে ও আভরণে এমনি এক নগ্ন অসঙ্গত অথচ যৌক্তিক বাসনার দাবী পেশ করেছে। এ মনের অভিব্যক্তি যে-সাহিত্যে লাভ করেছে, তার নাম গণসাহিত্য। মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণজীবনে শ্রদ্ধা ও দরদ, প্রচলিত সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবজ্ঞা, বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এসব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাস্তবে জীবনায়ণের গৌরবে মানবতার বাণী প্রচারের দম্ভে, জীবন ও জীবিকার অভিন্ন স্বরূপ উদ্ঘাটন-গর্বে, জগৎ ও জীবনের যথার্থ সূত্র আবিষ্কার ও অকৃত্রিম সংজ্ঞা প্রয়োগ-গৌরবে এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত। এ সাহিত্যের মহান আদর্শ হচ্ছে—'মানুষের জন্যে, জীবন-জীবিকার জন্যে, মানবতাবোধ প্রসারের জন্যে, মানবকল্যাণের জন্যে, সমাজ-উন্নয়নের জন্যেই সাহিত্য।' মূলত ঈর্ষা, ভোগেচ্ছা, বঞ্চিত বুকের বিক্ষোভ ও অভিযোগ সম্বলিত এ সাহিত্যও রোমান্টিক। এ রোমান্টিকতা আকাশচারী নয়—ভূমি-নির্ভর, কল্পনাসর্বস্ব নয়—ক্লেদাক্ত কামনাপুষ্ট বাস্তব জীবনভিত্তিক। মহিমময় বুলির আবরণে এরই জয়গানে আমরা মুখর।

মানুষের সাহিত্য মানুষের মন-মননেরই প্রতিচ্ছবি—মানুষের আন্তর্জীবনেরই বাগ্-বন্ধ রূপ। এ অর্থে সাহিত্য চিরদিনই বাস্তব-জীবন ও বাস্তববোধ-ভিত্তিক। কাজেই সাহিত্য কোনোকালে কৃত্রিম অবাস্তব অলৌকিক ছিল না। মানুষের জীবনবোধ যে-যুগে যেমনটি ছিল, সাহিত্যে তেমনটিই বিবৃত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার কথা

আজকে বলে নয়, নতুন আঙ্গিক ও মননের কবিতা নিয়ে দেশে দেশে সমকালীন পাঠক মহলে বিরূপতা দেখা দিয়েছে যুগে যুগে। এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা সেকালেও ছিল না, আজকেও নেই। শুধু কাব্যক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও নতুন ভাব, চিন্তা ও আঙ্গিকের শত্রু চিরকালই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বিদেশের কথা বলে কাজ নেই। দেশেই রয়েছে এর বহু নজির। গত একশ বছরের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে লেখক-পাঠকে যে-কয়বার দ্বন্দ্ব ঘটে গেছে, তাদের উল্লেখ মাত্রই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

মধুসূদন বড় ভরসায় বড় মুখ করে বলেছিলেন "a real graduate" তাঁর মেঘনাদবধের টীকা লিখছেন। সে real graduate হেমচন্দ্রও অমিত্রাক্ষর ছন্দের গোড়ার কথাই বুঝতে পারেননি। 'মেঘনাদবধ' বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোনো কদরই হয়নি উনিশ শতকে। মধুসূদনের প্রতিভা ও সৃষ্টি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও অর্জন করেনি কোনোদিন। মধুসূদনের ঠাঁই হল না। হেমচন্দ্র হলেন জাতীয় কবি, শ্রেষ্ঠ কবি, মহাকবি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অশুদ্ধ ভাষা ও অশ্লীল উপাখ্যান সে-যুগে কী অবজ্ঞাই না লাভ করেছে! গুরুজনের নামে স্বরচিত উপন্যাস উৎসর্গ করে নীতবাগীশদের নিন্দা শুনতে হয়েছে তাঁকে।

সে যুগের আমেরিকা-ফেরৎ, বি-এ পাশ, ডেপুটি, কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'মাথা-মুণ্ড' বুঝতে না পেরে বলেছেন 'অর্থহীন।' প্রেমের অশ্লীল কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের চরিত্র নাশ করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি যদি তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য বলে থাকেন তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না।

এমন যে বিহারীলাল, তিনিও জীবৎকালে পাত্তা পাননি। আর কার কথা বলব ? শরৎচন্দ্র-নজরুলের উপর এককালে যে ঝড়ঝাপ্টা গেছে, তা অনেকেরই স্মরণে আছে। কল্লোল যুগের বহুনিন্দিত গল্প-লিখিয়েরা চোখের সামনেই ভক্ত-হৃদয়ের পূজো পাচ্ছেন।

নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন মাত্রেই প্রতিভার দান। ইচ্ছে করলেই কেউ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। দুনিয়াতে স্তরে স্তরে কোটি কোটি মানুষ এসেছে, গেছে। নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করতে পেরেছে কয়জনে ? ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্রব্য-সামগ্রীই হোক, রান্নাবান্নার কলাকৌশলই হোক, সমাজে-ধর্মে-রাষ্ট্রে বা আচার-আচরণেই হোক, নতুন উদ্ভাবন সহজ কথা নয়। এতে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, সৃষ্টি-পরিকল্পনা তাদের মধ্যে নেই। অবচেতন মনে সৃজনের কোনো প্রেরণা সুপ্ত যদিও বা থাকে, তা অনুকরণ স্পৃহাতেই রূপ নেয় এবং সার্থকতা খোঁজে।

মানুষের পুরোনোর প্রতি যত প্রীতি আছে, নতুনের প্রতি তত শ্রদ্ধা নেই। তাই সাধারণ মানুষ ঐতিহ্যপ্রিয়, প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল। তাদের পুরোনোর প্রতি যেমন মমতা ও শ্রদ্ধা থাকে, নতুনের প্রতি তেমনি থাকে ভীতি, বিরূপতা আর অবজ্ঞা। মানুষ যতটা পশ্চাৎমুখী, সে পরিমাণে সম্মুখদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তাই ইতিহাসের সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল নতুনকে অভিনন্দিত না করে পুরাতনকে বন্দনা করেছে। ইতিহাস আমাদের বলেছে—কোনো নতুনই মানুষের অকল্যাণের জন্যে আসে না। অন্তত তা যে মানুষেরই অগ্রগতির নিশ্চিত ফল এবং ফেলে আসা দিনের চেয়ে যে না-আসা দিনগুলোতে মানুষের বোধবুদ্ধির বেশি বিকাশ হবে—কেননা সামগ্রিকভাবে মানুষ প্রতিমুহূর্তেই উন্নত হচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে, রুচি-বুদ্ধি-বোধির বিকাশ হচ্ছে—তা ইতিহাস চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবু আমাদের চৈতন্য হয় না। আমরা চিরকাল এ ব্যাপারে অর্থাৎ নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে নির্বিচারে পুরাতনের পক্ষই সমর্থন করেছি। তবু কোনোদিন রোধ করা যায়নি নতুনের প্রতিষ্ঠা।

এতে দুটো তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এক. বোঝা যাচ্ছে নতুনের উদ্ভাবক সাধারণ মানুষের তুলনায় কত অসাধারণ। আর এজন্যেই সাধারণের পক্ষে সমকালীন প্রতিভার মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান সম্ভব হয় না। তাদের চোখে সে বিদ্রোহী। দুই. মানুষের পশ্চাৎমুখিতা ও নতুনের প্রতি অশ্রদ্ধা এতই প্রবল যে এ ব্যাপারে তাদের বিচারশক্তি লোপ পায়, চোখ থেকেও তারা দৃষ্টিহীন। একটা অন্ধ সংস্কার-নির্ভর আবেগই তাদের একমাত্র অবলম্বন—যুক্তি-বুদ্ধি নয়।

শুধু সাহিত্য ব্যাপারেই নয়, ধর্ম ও রাষ্ট্র বিষয়েও তাই। রাজনীতিতে নেতৃত্ব মানার বা সামাজিক কাজে কর্তৃত্ব স্বীকার করার ব্যাপারে তাই অনেক সময়—যুক্তি নয়—অভিমানই দেয় বাধা। এ ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠের অভিমান আর মর্যাদাবোধও অনেকাংশে দায়ী।

২

যেখানে অজ্ঞতা, সেখানেই কল্পনার প্রশ্রয়। বিস্ময়ের উৎস এবং আশ্রয়ও তা-ই ! আর যেখানে কল্পনা ও বিস্ময় সেখানেই উচ্ছ্বাস। বলা যায়, উচ্ছ্বাস ও কল্পনা বিস্ময়-বোধেরই সন্তান। অতিভাষণ উচ্ছ্বাসের নিত্যকালের সঙ্গী। এবার ভারতচন্দ্রের উক্তি স্মরণ করুন : 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' ফল দাঁড়াল এই—লোকে দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, ড্রাগন, পক্ষিরাজঘোড়া, দেবলোক, জীন, পরী, গন্ধর্ব প্রভৃতি যেমন মনোরাজ্যে সৃষ্টি করেছে, তেমনি করেছে চন্দ্রে-সূর্যে-মেঘে-সমুদ্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ। আমাদের রূপকথায়, উপকথায়, ইতিবৃত্তে, মহাকাব্যে, ধর্মশাস্ত্রে ও রোমান্সে তাই আদি মধ্যযুগে এর ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি। 'মধ্যযুগ' আমরা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করছি, কেননা 'মধ্যযুগ' সবদেশে ও সবজাতে সমকালীন নয়—এর শুরু ও শেষ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশ হল মানুষের বুদ্ধি ও বোধের। এর ফলে মানুষের মনে যুক্তিবাদের জন্ম হল। জন্ম হল বললে ভুল বলা হয় ; বরং বলা যেতে পারে সুপ্তি থেকে জেগে উঠে বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হল, কেননা যুক্তিবাদই মনুষ্যত্ব। যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় মানুষের differentia হল যুক্তি-বুদ্ধি। বহুকাল চলল 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান' অবস্থায়। অবশেষে বিজ্ঞান এসে সব তত্ত্ব ও কল্পনার, বিশ্বাস ও সংস্কারের গোড়ার কথা বেফাঁস করে দিল। আমরা দেখলাম সূর্য বামুন হয়ে মর্ত্যে নামতে পারে না ; চাঁদ সুন্দরও নয়, প্রণয়ীও নয়। রাক্ষস, ড্রাগন, যক্ষ, দৈত্য দুনিয়ায় কোনোকালে ছিল না। সূর্য অস্তও যায় না, আবিরও ছড়ায় না। অরুণে-কমলে সখ্য নেই। চাঁদে-চকোরে প্রেম নেই, মেঘ বাষ্পপুঞ্জ মাত্র—ইন্দ্র-ঐরাবতের সঙ্গে তার সম্পর্কমাত্র নেই, বজ্র শয়তানও তাড়ায় না, দৈত্যও খেদায় না, বৃত্রকেও মারে না ! এভাবে আমাদের কল্পনার তাসের ঘর ভেঙে পড়ল, স্বপ্নসৌধ জাদু-সৃষ্ট বস্তুর মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমরা—অজ্ঞরা অবাক হয়ে ভাবলাম—এসবের বিরুদ্ধে 'হাজারো বছর কাটিয়া গিয়াছে কেহ তো কহেনি কথা !' আজ একি কথা শুনি—নেই ! নেই, সত্যি কিছুই নেই—এ কারণে নাস্তিক্যের উল্লাসে, বন্ধন-মুক্তির স্বস্তিতে, মুক্তির আশ্বাসে, ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ততার আনন্দে, প্রসারিত জীবনের মুখরতায় মানুষ স্বচ্ছন্দ ও উচ্ছল হয়ে উঠল।

রূপকথা অচল হল, উপকথা উবে গেল, পুরাণ তলিয়ে গেল ; কারণ তাদের কাঠামো যে-উপাদানে তৈরি, ভোজবাজির মতো মন থেকে মুছে গেল সে-সব। তাই আজকের দিনে আর রূপকথা তৈরি হয় না, উপকথা বলবার লোক নেই, পুরাণ শুনবার ধৈর্য নেই। মানুষের যুগযুগান্তর লালিত বিশ্বাস ও সংস্কার ভেঙে চুরমার হল। আদি বা মধ্যযুগের সে-জগৎ নেই, তাই সে-জীবনও নেই, তাতেই সে-সাহিত্য-শিল্প আর ধর্মবোধও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন বিশ্বাসের অবলম্বন খুঁজে পেল, তাই নিয়ে সে নতুন করে গড়ছে স্বপ্নসৌধ, সাধের জগৎ, শখের ইমারত আর গরজের বুরুজ।

৩

স্থানিক, কালিক আর পাত্রিক বিবর্তনে সাহিত্যের রসকল্পে নয় শুধু, রূপকল্পেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। বলেছি, মানুষের জীবনের তথা সাহিত্যের আদি ও মধ্য স্তর ছিল অজ্ঞতার যুগ ; তাই কল্পনা, বিস্ময় এবং উচ্ছ্বাসই ছিল সাহিত্য-দেহের হাড় ও প্রাণ। কল্পনায় ভাটা পড়লে কল্প-সৃষ্ট বস্তুর মূল্য কমে যাবেই, বিস্ময় উবে গেলে বিস্ময়ের অবলম্বনও বাজে হয়ে যায়, আর কল্পনা-রূপ আধার না থাকলে আধেয় বিস্ময়ও পায় লোপ, কাজেই বিস্ময়জাত উচ্ছ্বাসের জন্মউৎসই যায় শুকিয়ে। আর এসবকিছুর উৎস ছিল হৃদয়বৃত্তি এবং তজ্জাত বোধি। মুক্তবুদ্ধি পাত্তা পায়নি সে যুগে।

বলেছি, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অতিভাষণের যোগ নিত্যকালের। আগে ছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে এ উক্তি যাচাই করা যাক। সমিল ছন্দের খাতিরে আমাদের সবসময় ভাব প্রকাশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি অবান্তর কথা যোগ করে দিতে হয়। মনে করা যাক, একটি চরণে একটি ভাব প্রায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে, শুধু একটিমাত্র শব্দ বাকি। কিন্তু যেহেতু চরণে আর জায়গা নেই, সেজন্যে একটি শব্দ প্রয়োগের গরজে আমাকে একটি পুরো চরণ তৈরি করতে হয়। ফলে কতগুলো অপ্রয়োজনীয় শব্দ শুধু ধ্বনি ও ছন্দ রক্ষার খাতিরে জুড়ে দিতে হয়। উচ্ছ্বাসের ভাষা যেমন :

১. হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো
নাচেরে হৃদয় নাচেরে

২. আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।

৩. এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর!......
এই তোমার পরশ-রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা—রইল প্রাণে সঞ্চিত।

৪. আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী—
আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।

৫. আজি কী তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী শরৎকালের প্রভাতে
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল তোমার কানন সভাতে।

৬. তোমার ছুটি নীল আকাশে, তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ওই দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল তলায়, গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপে ঝাপে পারুল ডাঙার বনে।

মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ হৃদয়বৃত্তির আশ্রয় ত্যাগ করে বুদ্ধি-বৃত্তির নিশ্চিত স্মরণ নিয়েছে। আজকের মানুষের বুদ্ধিনির্ভর। হৃদয়-ধর্ম জল-শোধন যন্ত্রের মতো বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, বলা যায়—বুদ্ধির দ্বারা শোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এভাবে মিতালি ঘটেছে মন-মস্তিষ্কের। আবেগও তাই উদ্বেগ বলে ভ্রম জন্মায়। মানবসভ্যতার তথা সাহিত্য-শিল্পের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমবিবর্তনের ধারা এভাবে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই লর্ড মেকলে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরানো রীতির কবিতার অপকর্ষ ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিতে উচ্ছ্বাসের ঠাঁই নেই। কাজেই আমাদের কাব্যকলার ছন্দে ও বাক-পদ্ধতিতে পরিবর্তন না এসে পারে নি। বুদ্ধি লব্ধ তথ্য, বুদ্ধি-নির্ভর ভাষণ চটুল হতে পারে, সরস হতে পারে, বিদ্রূপাত্মক হতে পারে; দীপ্ত হতেও বাধা নেই, কিন্তু ললিত-মধুর, আবেগ-বিভোল হতে পারে না। নূপুরের দিন নেই, কাজেই শিঞ্জন শোনার আশা বিড়ম্বিত হবেই।

তাই আজকের কবিতা তথা-কথিত ছন্দ বিহীন।

৪

শারীর প্রেমের উপর আগের যুগে মানুষ Divinity বা দিব্যতা আরোপ করে একপ্রকার আত্মবঞ্চনামূলক আত্মপ্রসাদ লাভ করত। যদিও মনে জানত—এ ফাঁকি, তবু মহত্ত্ব ও দিব্যতা আরোপ করে, একে নির্বিশেষ ভাবলোকে স্থাপিত করে, এর মহিমা ঘোষণা করে নিজেদের মহিমান্বিত করে তুলত। এতে সুখ ছিল কিনা জানিনে, তবে মুখরক্ষা হত ! এ-যুগের বিজ্ঞান সব রহস্য বেফাঁস করে দিয়ে বলল, প্রেম আকাশের নয়, নিতান্ত পঙ্কজ। খগজ প্রেম শুধু ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ল, তা নয় ; বিজ্ঞান জানাল—এটা হচ্ছে জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তি, বিশেষ বয়সের ধর্ম, এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ারই অঙ্গ, একান্তই প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। বিশেষ বয়সের পূর্বে বা পরে—অপর জীবের তো নয়-ই,—স্বাভাবিক মানুষেরও তা থাকে না। প্রেম-মহিমা তাই আর কথার সাগর মন্থন করে শব্দ চয়ন করে সোচ্ছ্বাসে গাওয়া চলে না। তেমনি ভূতে যার বিশ্বাস নেই, তাকে ভূতের ভয় দেখানো যায় না।

AMARBOI.COM

পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার যখন মিথ্যে হয়ে গেল, তখন পুরোনো রূপপ্রতীক কী সত্য থাকতে পারে ? চাঁদ-সূর্যের গোপন তত্ত্ব জানার পরে তাদের সেবাকালীন স্বরূপে রূপপ্রতীক সৃষ্টি করা কী চলে ? চকোর দেখিইনি, কাজেই চাঁদ-চকোরের উপমা দিতে আমার যুক্তি-বুদ্ধি বাধা দেবেই। ক্ষীণ মাঝার সঙ্গে কেশরী বা চুলের উপমা শুধু সেকালেই চলতে পারত; যেকালে বিশাল নথও নাকে শোভা পেত, পুরুষের কানে কুণ্ডল আর হাতে বালা মানাত ও পাজব-চন্দ্রহারে নারী ললাম লাবণ্যে ললনা হয়ে উঠত !

আমাদের রুচির বিকাশ হয়েছে, সৌন্দর্যবোধ সূক্ষ্ম হয়েছে। তাই আদ্যিকালীন কাব্যে নারীর রূপ-বর্ণনায় রূপ প্রত্যক্ষ করা দূরে থাক, মানবীকেই পাওয়া যায় না। অদৃষ্ট খঞ্জনের মতো আঁখি, বাজের চঞ্চুসদৃশ নাসা, হেমকুম্ভ স্তন, মৃণাল ভুজ, রামরম্ভাতরুর মতো উরু, কামধনুর মতো ভ্রূ, তীরের মতো পক্ষ্ম, ঘটের মতো নিতম্ব, পদ্মের মতো পা, শকুনির ন্যায় গ্রীবা, পদ্মকোরকের ন্যায় নাভি, মেঘবর্ণ চুল, কুঁচবর্ণ রঙ, দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় কপাল, বিম্বফলের ন্যায় অধরোষ্ঠ, প্রভৃতি এমন কী সুপ্রযুক্ত উপমা যে স্মরণ মাত্র সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য অন্তরে 'শেলসম' বিদ্ধ হয়ে থাকবে ? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রূপবর্ণন পদ্ধতি কী একালে টিকল ? সুন্দরীর রূপ-মহিমা একালের ভাষায় 'একবার দেখলে পিছন ফিরে আবার দেখতে হয়' বা 'একবার তাকালে চোখ ফিরানো যায় না' বা 'বারবার তাকাবার মতো রূপ' বললে কী বর্ণনার আর কিছু বাকি থাকে ! কিম্বা, খঞ্জন-হরিণ-পদ্মের উল্লেখ না করে 'পটল-চেরা কী টানা টানা চোখ' বললে কী কিছু কম বলা হয় ! রুক্ষ চুলের সঙ্গে মেঘের তুলনা চলে, কিন্তু কালো চুল নিশ্চয়ই মেঘের বর্ণ নয়, তার চাইতে 'ভ্রমরকৃষ্ণ', 'চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা' কিম্বা আলকাতরার, টেলিফোনের রিসিভারের, মোটরগাড়ির নয়া কালো টায়ারের বা প্লাস্টিকের কালো পাতের তুলনা আপাতত vulgar মনে হলেও অনেক বেশি সুপ্রযুক্ত। কাক পোষা পাখি নয় যে 'কাকচক্ষু' বললেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অবশ্য পুরোনো রূপপ্রতীক মাত্রেই পুরোনো নয়, বেণীর সঙ্গে সাপের উপমা চিরনতুনই বটে ! তেমনি চিরকালই উপমার অবলম্বন হয়ে থাকবে রাত্রির তমসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে নতুন ভাব-চিন্তা-জ্ঞান-বস্তু পেলাম, অথচ নতুন অলঙ্কার তৈরি হবে না, এমন কথাই হতে পারে না। আগের কালে যেমন মানুষ নিজের জানা-ভুবন থেকে রূপ-প্রতীক সংগ্রহ করেছে, আজও তা-ই শুধু করা হচ্ছে। আগের মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জগৎ আজকের চেয়ে অনেক ছোট ছিল, তাই তার ভাষণে থাকত পরিমিত ও স্বল্প-পরিচিত এমনকি কল্পজাত রূপ-প্রতীক। আজকের মানুষের পায়ের নিচে বিশাল ভুবন, মাথার উপরে বিস্তৃত জগৎ। আজ এদের সঙ্গে তার পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ, কত স্পষ্ট ! সে মুখ খুললেই কত কথা, কত চিত্র, কত রূপপ্রতীক এসে ভিড় জমায় স্মৃতির সরণিতে—জিহ্বার ডগায়, এদের সে অস্বীকার করে কীভাবে ! কাকে ছেড়ে কাকে নেবে তা-ই দাঁড়ায় সমস্যা হয়ে ! শুধু কী তাই, নতুন সূর্যের উদয়ে নতুন ভাব-চিন্তা আসবেই, তাকে রোধ করবে—সাধ্য কার ! রবীন্দ্রনাথও পয়ার-ত্রিপদীতে অনেক কবিতা রচনা করেছেন, ছন্দ একই হওয়া সত্ত্বেও ভাবে, ভাষায়, অর্থব্যঞ্জনায় ও ধ্বনি-মাধুর্যে পূর্বেকার পয়ার-ত্রিপদীর সঙ্গে কী এদের তুলনা চলে ? ভাবের ও চিন্তার বৈচিত্র্যে যে বাকভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে, এর চেয়ে আর উৎকৃষ্ট নজির আর কী দেওয়া যায় ! আবার ভাব-চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু নবীনেরাই নন, রবীন্দ্রনাথও পয়ার-ত্রিপদী ছেড়েছিলেন। কাজেই প্রয়োজনমতো প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকও বদলায়।

লঙ্ঘিয়ে সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে।

চলন্ত নৌকার কী চমৎকার বর্ণনা ! কিন্তু কোনো অরসিক যদি বলে বসে —কাঠের তৈরি নৌকায় চিত্ত কোথায় ! তবে তো 'সকলি গরল ভেল'। তেমনি 'চোখ হাসে মোর, বুক হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে'—তখন আমদের কানে-মনে খটকা লাগে না। প্রশ্ন জাগে না যে খুন নাচতে পারে, হাসে কী করে ? আকাশ আচ্ছন্ন করে মেঘ উঠলে তাকে নারীর এলোচুল বলতে আপত্তি থাকে না।—'কে এসেছে কেশ এলায়ে কবরী এলায়ে ?' কিন্তু জীবনানন্দ দাস যখন লেখেন—'রৌদ্র মাথা রেখে ধানক্ষেতে শুইয়ে আছে' তখন আমাদের অবজ্ঞার অন্ত থাকে না। কিন্তু ভেবে দেখি না যে, আমাদের অতিপরিচিত একটি পুরোনো ভালো ইংরেজি কবিতায় অর্থাৎ Keats-এর 'Ode to Autumn'-এধরনের প্রতীকই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—The (Autumn) sitting careless on a granary floor' 'on a half reaped furrow sound asleep' 'Steady they laden head across a brook' 'by a ciderpress, with patient look thou watchest the' 'last oozings hours by hours' প্রভৃতি।

আবার 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' উপমার এখন দেখছি আদর-কদর বেড়েই চলেছে। 'তাজমহল' যখন 'কালের কপোলতলে একবিন্দু নয়নের জল' কিংবা 'মেঘদূত' কাব্যে মেঘ দূতরূপে বর্ণিত হয়, কিংবা 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ' অনুভূত হয়, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু উনিশ শতকে হলে জাগত !

আসল কথা, নতুন কিছু কানে-মনে খাপ খাওয়ানো সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। তাই কেউ সমকালীন সমাজে নতুন কিছু করে স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু উত্তর-পুরুষ ঐ আওতায় লালিত হয় বলে তার কাছে এককালের বেয়াড়া নতুনও গা-সহা এবং কান-সহা হয়ে ওঠে শুধু নয়, রস-কল্পনার সহায়কও হয়ে উঠে।

আজকের দিনে 'ঝলসানো রুটিস্বরূপ' চাঁদ, বোমা, টর্পেডো, স্পুটনিক (এমনকি লাইকাও), কুইসলিং প্রভৃতি আমাদের রচনার রূপপ্রতীকরূপে ব্যবহৃত না হয়ে যেমন পারে না ; তেমনি আমাদের নতুনতর ভাব, চিন্তা ও দৃষ্টির প্রভাবে বাকভঙ্গিও বদলাবে, তার সঙ্গে বদলাবে আটপৌরে ব্যবহারের শব্দের ব্যঞ্জনাও। বিবেকে বৃশ্চিক দংশন বা বিছার কামড় যদি সম্ভব হয়, তাহলে 'হৃদয় আমার ছেঁড়া কাঁথা আর তুমি তার মাঝে ছারপোকা'—আজ যতই vulgar মনে হোক, আমাদের উত্তরপুরুষদের কাছে তা কদর পাবে। আগেকার যুগের রূপপ্রতীকগুলো বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, বহু অদ্ভুত প্রতীক আমাদের চিত্তবিনোদনের সহায়ক হয়েছে,—'চাঁদপানা মুখ' যখন বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমরা চাঁদের প্রভাটাই নিই, চাঁদের থালা-আকৃতি বাদ দিই। যোগ-বিয়োগ এত সহজ-সাধ্য নয়, অভ্যাসবশে যত সহজভাবে আমরা উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতার রথী রাজভিখারিটি কোনো বাস্তব চিত্রের সঙ্গে মেলে না, কাজেই বাস্তব প্রতীক হতে পারে না, তবু ভালো কবিতা বলে এটি কদর পেয়ে আসছে।

জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ যেমন বদলাচ্ছে, অর্থাৎ নতুন মানুষকে ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে পুরোনো মানুষ বিদায় নিচ্ছে, ;তেমনি মানুষের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প আর ভঙ্গিও বহতা নদীর মতো চিরকাল গড়িয়ে চলেছে, চলেছে এগিয়ে। কাজেই তাদের কোনো স্থায়ী নিগড়ে বেঁধে স্থির রাখা যাবে না। এ সহজ সত্যটি মনে মেনে নিলে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। কেননা পৃথিবীটা পুরোনো বটে, কিন্তু তার জনপ্রবাহ নতুন। তাই তার অধিবাসীদের চোখে এ ভুবন চিরনতুন। জীবনযাত্রায় তারা নতুনভাবে আবিষ্কার করে জগৎকে, অনুভব করে জীবনকে, রচনা করে ভবন, বিকশিত হয় জীবন। এ চলার পথের উল্লাস কিংবা যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা কিংবা অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি পায় তাদের কাজে, কথায় অথবা লেখায়।

অতএব মানুষের মনটি তাজা আর অনুভূতি মাত্রই চিরনতুন। এই পুরোনো বিলাসী জগতের প্রতিবেশ প্রাণে প্রাণে যে-সাড়া জাগায়, চোখে-চোখে সুন্দরের যে-অঞ্জন মেখে দেয় তাতে হৃদয়-মন মুখর হয়ে ওঠে। সে-ই উচ্ছল আবেগই প্রকাশ পায় কবিতায়—নতুন মানুষের নতুন অনুভবের আনন্দ-বেদনা নবতর ভাষায়, ছন্দে ও রূপকল্পে প্রকাশিত হবে—এ-ই তো বাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিক। নতুন অনুভবে যদি 'তিলে তিলে নতুন হয়ে' নতুন তাৎপর্যে ও লাবণ্যে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা না গেল, তা হলে চকিত ও চমৎকৃত করার অসামর্থ্যে পুরোনো পৃথিবী মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের রূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে আজকালকার লোকের প্রশ্ন ও গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু চিরকাল এমনটি ছিল না। পড়তে শুনতে বা ভাবতে ভালো লাগলেই আগেরকার দিনে যে-কোনো রচনাকেই নির্বিচারে সাহিত্য বলে গ্রহণ করা হত। আজকের যুগে মানুষ বড় সচেতন, অত্যন্ত হিসেবী। তাঁরা লাভ-ক্ষতির তৌলে সবকিছুর মূল্য ও সারবত্তা যাচাই করতে চান। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে যা-কিছু মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়, তা-ই সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করাই বিধেয় বলে ফতোয়া জারি হচ্ছে। মনোজীবন বলে ব্যবহারিক জীবন-নিরপেক্ষ কোনো জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা তাঁদের যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমুখী মন ও মননে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। আজকের দিনে ব্যবহারিক জীবন-সমস্যা এমন উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে যে নিতান্ত বেঁচে থাকার সাধনা অন্য সর্বপ্রকার জৈব-সাধনাকে ছাপিয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, কলকারখানার স্থাপন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং যন্ত্রশক্তির বদৌলত বিশাল পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে পৃথিবী হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র ও একাকার। জীবন ধারণের প্রয়োজনানুরূপ সামগ্রীর অভাবে পারস্পরিক হানাহানি কাড়াকাড়ি লেগেই আছে। মূলত সবদেশের সবলোকের সংগ্রামের রূপ একই—তা হচ্ছে জীবন-সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার আকুল আগ্রহে-ই তাঁদের চিত্ত হয়ে উঠছে বিদ্বিষ্ট ও হিংস্র। এই সমস্যা-বিমূঢ় সমাধান-কাতর জগতে তাই জাগতিক ও জৈবিক সর্বব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথ। এমনি অবস্থায় কারো দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকার কথা নয়। নির্লিপ্ত আর অনাচ্ছন্ন বিবেক ও চিন্তাপ্রসূত নয় বলেই বিভিন্ন মত ও পথগুলো দেখা দিয়েছে পরস্পরের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। স্বার্থপ্রসূত এই বিভিন্ন আদর্শগুলোর সমন্বয় সাধন তাই একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না।

সাহিত্যেও তাই প্রধানত দুটো আপোষহীন নীতি ও আদর্শের সংঘাত দেখা দিয়েছে। একটা হচ্ছে বাস্তবতা, অপরটা কল্পনা সর্বস্বতা ; একটা প্রয়োজনানুগ অপরটা রসবিলাস, একটা গণসাহিত্য অপরটা বুর্জোয়া সাহিত্য ; একটি প্রগতিকামী অপরটি রস-লীলাপরায়ণ ; একটা ধর্ম ও স্থানীয় বা জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারক অপরটা নৈর্ব্যক্তিক সংস্কৃতির স্ফুরক।

আমরা এই আলোচনার বিষয়টা খোলাসা করে বুঝে নেবার চেষ্টা করব মাত্র কোনো সমাধান পাবার আশা না রেখেই।

প্রথমত. সাহিত্য হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। তা কাব্য হোক, নাটক হোক বা প্রবন্ধ হোক। অনভূতিসঞ্জাত যে-ভাব আমাদের মনে ও মাথায় (তথা হৃদয়ে) আলোড়ন জাগায়, তা-ই বাণীরূপ লাভ করে হয় সাহিত্য। অবশ্য আমাদের সবকথার মূলে ভাব থাকে এবং তার পশ্চাতে থাকে অনুভূতি অর্থাৎ সব প্রকারের ভাবের মূলে থাকে Cognition, Volition ও emotion বা feeling. তথাপি সব বাণীই আমরা যথাযথ সচেতনতা ও যত্নের সাথে প্রকাশ করিনে। সুতরাং যা-কিছু সযত্নে ও স্বচৈতন্যে প্রকাশ করি তা-ই আমাদের সাহিত্য। কারণ তখন আমাদের বাণী অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হয় অর্থাৎ তা বিশেষ অর্থে রসাত্মক হয়ে ওঠে। যত্ন ও প্রয়াসের সাথে শক্তি যোগ না হলে তা অপর হৃদয়ে অনুরূপ ভাব বা অনুভূতি সঞ্চারের সামর্থ্য পায় না, তাই সব রচনা সর্বজনগ্রাহ্য সাহিত্য হয় না। এখানে এ-কথা স্বীকার করা ভালো যে সব-রচনাই পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত হয়।

দ্বিতীয়ত. অনুভূতি মাত্রেই ভাবের সত্য অর্থাৎ বিশেষ মনের বিশেষ অবস্থার সত্য। সে-সত্যের সাথে বহির্জীবনের সম্পর্ক থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন 'আজি ঝড়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

রাতে তোমার অভিসার, প্রাণ-সখা বন্ধু-হে আমার' অথবা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে।' এসব হচ্ছে অনুভূতিজাত ভাবের সত্য—বাস্তবের সত্য নয়। তেমনি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বা রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পদ্বয়ে বর্ণিত অবস্থাও ভাবের সত্য। বাস্তবে কত গফুর, কত রতন—কার খবর কে রাখে ? কিন্তু লেখকের হৃদে-মনে-মাথায় এমনি অবস্থার অনুভূতি যে-ভাব-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তা-ই প্রকাশিত হয়েছে রচনায় এবং সে-রচনা সযত্নে ও স্বচৈতন্যে সম্ভব হয়েছে। শুধু বাস্তব নয়, শুধু কল্পনাও নয় ; বাস্তবে-অবাস্তবে, সম্ভব-অসম্ভবে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-বোধি সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে এ সৃষ্টি। দার্শনিক তত্ত্বগুলো যেমন বাস্তব-নির্ভর হয়েও বাস্তব নয়—অনুভূতি ও প্রজ্ঞার সত্য ; সাহিত্যও তেমনি অনুভূতি-উপলব্ধির সত্য, বাস্তব থেকে পাওয়া কিন্তু বাস্তব-সত্য নয়।

অতএব অনুভূতি বাস্তবাহৃত, বাস্তব-নির্ভর ও বাস্তবানুগ হয়েও তা বাস্তবাতিরিক্ত এবং কল্পনা-নির্ভর হয়েও কল্পনা-সর্বস্ব নয়। মূলত তা জীবন-চেতনা-প্রসূত—প্রত্যক্ষভাবে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রচেতনা জাত নয়। কারণ, তা অনুভূতির জারক রসে রসায়িত হয়েই অভিব্যক্তি লাভ করে, তার আগে নয়।

তৃতীয়ত. মানুষের মন স্বভাবত ভাবগ্রাহী, বৃহত্তর অর্থে মানবজীবন ভাবসর্বস্ব। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি—সবকিছুই অনুভূতি মাত্র। অনুভব করি তো কোনো ঘটনা পর্বত-প্রমাণ মনে হবে, আর অনুভব না করি তো তৃণবৎ তুচ্ছই থেকে যাবে। যেমন, শিশুটি উঠানে একপাত্র প্রয়োজনীয় পানি ফেলে দিলে আমার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নেই, তাই আমি নির্বিকার; কিন্তু যদি একপাত্র সদ্যকেনা দুধ ফেলে দেয় তখন ? একটি বাঘ নিহত হলে মানুষ খুশি হয়, একজন মানুষের অপমৃত্যু হলে তখন ? তখন যে-দুঃখ যে-ক্ষোভ আমি অনুভব করছি তা তো স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা হচ্ছে বিবেচনাপ্রসূত। মানুষের মনন ও অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই অনুভূতির জীবন বিস্তৃত হয়েছে। তাই বলে কোনো অনুভূতি বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ নয়, বস্তুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকেই সব অনুভূতি আসে। কারণ যা স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার কল্পনাও সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষের সব কর্ম-চিন্তা ও কামনা-বাসনার মধ্যে 'জীবন-চৈতন্য' রয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা আমরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ লাভ করি। এর ফলে আমাদের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসা, আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হরেক রকম বোধ জন্মে। বস্তুত এইসব বোধ বা ভাব কিন্তু অনুভূতি বা ভাবরাশির সঙ্গে আমাদের জীবন-চৈতন্যের কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। অন্য কথায় জীবন-চৈতন্য মানে দাঁড়ায় বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে মনের গভীরতর যোগ-চৈতন্য। এই ব্যাখা যদি মেনে নিই, তবে আমরা দেখতে পাই জীবনচৈতন্য ও সমাজচৈতন্য বলে আলাদা কিছুই নেই। ব্যবহারিক জীবনের অভাব-অভিযোগ, বাধাবিঘ্ন মানসলোকে অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির জগতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার বিশিষ্ট রূপ যদি সাহিত্যে বিধৃত না হয়, তবে তা রসগ্রাহী তথা ভাবসর্বস্ব মনে ভাব বা অনুভূতি সঞ্চার করতে সমর্থ হবে না; এক কথায় বহিরোত্থিত ঘটনার সংঘাতে আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রক্রিয়া কী বিচিত্র রূপ ধারণ করে, তা কার্যকারণপরম্পরায় চিত্রিত না হলে, সব সৃষ্টি-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই ব্যাখ্যার আলোকে যাচাই করলে আমরা দেখতে পাই সাহিত্যে বাস্তব-অবাস্তব, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বা গণ-বুর্জোয়া বলে কোনো বিশিষ্ট ধারা নেই। তবে বস্তুভেদে অনুভূতিভেদ আছে। তা হচ্ছে নিতান্ত স্তরভেদ সুতরাং রূপগত নয় রসগত। শাকের স্বাদ মাছে নেই, আবার মাছের স্বাদ মাংসে অসম্ভব। তাই বলে শাক ও মাছে স্বাদ আছে, মাংসে নেই ; অথবা মাছে বা মাংসে স্বাদ আছে, শাকে নেই—এমন কথা কোনোক্রমেই বলা চলে না। প্রত্যেকটাই বিশিষ্টরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবু এদের মধ্যে স্তরভেদ আছে। তেমনি সাহিত্যেও বিষয়বস্তু অনুসারে স্তরভেদ আছে। আমি দেশী সাহিত্য থেকেই কয়েকটি উদাহরণ নিচ্ছি। যেমন জসীমউদ্‌দীনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যে রস আছে, তা পাঠকচিত্ত আকৃষ্ট করে। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের বলাকার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তেমনি নজরুলের 'সাম্যবাদী' আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু এর সঙ্গে নক্সীকাঁথার মাঠের কোনো বিষয়গত ও ভাবগত ঐক্য নেই। তবু আমরা এই তিন প্রকারের কাব্যকেই স্বীকার করে নিয়েছি এবং এই তিন প্রকার রচনায় তিনটি স্তরও স্বীকার করেছি, কিন্তু রসহীন বলিনি। রসের তারতম্য দিয়ে উৎকর্ষ -অপকর্ষ বিচার চলে, কিন্তু অন্য নামে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা চলে না।

আগেই বলেছি সৃষ্টি মাত্রেই কল্পনাধর্মী। কুলি-মজুরের কথাই লিখি, বা রাজপুত্র-রাক্ষসের গল্পই বলি, বসন্তের জয়গানই করি বা বর্ষার চিত্রই আঁকি—সবকিছুই মূলত অনুভূতিজাত ভাবেরই অভিব্যক্তি; বাস্তবের প্রতিকৃতি নয়। তবে অনুকৃতি বটে; তা' রাক্ষসের গল্পও বাস্তবের অনুকৃতি বই তো নয়; কারণ পূর্বেই বলেছি-ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব। এই অর্থে সাহিত্যে বাস্তবতা বলে কিছুই নেই এবং এই অর্থেই সাহিত্য মাত্রেই কল্পনা বা ভাব বা অনুভূতি আশ্রয়ী। এই কল্পনা, ভাব বা অনুভূতির বৈচিত্র্যানুসারে সাহিত্যে রসবৈচিত্র্য ঘটে। এই বৈচিত্র্য আসে স্রষ্টার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বোধ-বুদ্ধি, রুচি-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য থেকে। একই পরিবেশ বা প্রকৃতি থেকেও বিভিন্ন মনোভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে। তাই মন ও মননের পার্থক্যবশত সাহিত্যেও রসবৈচিত্র ঘটে, আদর্শ-বৈচিত্র্যও এর আনুষঙ্গিক ফল। সুতরাং সৃষ্টি পরিকল্পনায় কোনো সচেতন প্রয়াস বিশেষ কার্যকর হয় না—মগ্নচৈতন্যের উপলব্ধি—যা অন্য অর্থে লেখকের জীবন-বোধ বা জীবন-চৈতন্য তা-ই রচনায় ব্যক্ত হয়ে পড়ে। অতএব গণসাহিত্য বা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে আসলে কিছুই নেই। লেখক বিশেষের স্বকীয় মনোভঙ্গিরই অর্থাৎ রুচি-সংস্কারের রূপ বৈচিত্র্য বিশেষ। লেখকের কলমের ডগায় যে বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মত, পথ বা ধর্মীয় আদর্শ প্রকাশিত হয়, তা নিতান্ত আকস্মিক নয়। আকস্মিক নয় এইজন্যে যে, সেটা লেখকের উপরি পাওয়া জিনিস নয়—মর্মমূল নিঃসৃত সত্য বিশেষ। তথাপি তা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে, কারণ লেখক ও পাঠক নির্বিশেষের শিক্ষা, রুচি, সংস্কার ও পরিবেশ এক রকমের হয় না। যেমন আবর্জনা দেখলে আমাদের গা ঘিনঘিন করে, কিন্তু একজন মেথরের তেমন হয় না। একজন মুসলিম তরুণীর কাছে বৈধব্য তেমন বড় সমস্যা নয়, কিন্তু হিন্দু তরুণীর বৈধব্য মানে নিজেরও অপমৃত্যু। অতএব উপরোক্ত অবস্থায় উদ্ভূত দুই অনুভূতিতে রসবৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী।

তারপর কোনো সাহিত্য বা অনুভূতি সর্বজনগ্রাহ্য হতে হলে তা জীবনের তথা হৃদয়ের গভীরতর বৃত্তি-প্রবৃত্তির সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ তা দেশ, কাল ও পাত্রের ছাপবিহীন একটি সর্বজনীন রূপ লাভ করবে। যতক্ষণ তা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ তা দেশ-কালের গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে আবদ্ধ। যেমন পানি বলতে জগতে যেখানে যত পানি আছে সবগুলোকে বুঝায়। কিন্তু তবু ডোবার পানি, নদীর পানি, দীঘির পানি, পুষ্করণীর পানি বা সমুদ্রের পানি এক নয়। এদের কারো সব-পানির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা নেই, কারণ এগুলো আধারের ছাপ-মুক্ত নয় ! কিন্তু distilled water-এর সঙ্গে সব পানির ঐক্য আছে। অর্থাৎ ঐ পানি নির্বিশেষ পানির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতাসম্পন্ন—কারণ তা বিশেষ আধারের ছাপমুক্ত। সাহিত্য সম্পর্কেও এই নিয়ম। দেশ-কাল জাতি ও ধর্মের ছাপমুক্ত সর্বজনীন অনুভূতি বা ভাব যে-সাহিত্যে প্রকাশ পাবে তা হবে চির-মানবের সাহিত্য। অন্য প্রকারের সাহিত্য হবে বিশেষ দেশের, জাতির, কালের বা ধর্মসম্প্রদায়ের। আধুনিক সাহিত্যে Yeats, রবীন্দ্রনাথ, T.S. Elliot ও ইকবাল—এই চারজনই অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু Yeats ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ জীবন-রহস্য উদঘাটনের প্রয়াসপ্রসূত। পক্ষান্তরে T.S. Elliot ও ইকবালের সাহিত্য বিশিষ্ট আদর্শের ছাপযুক্ত সেজন্যে তা নির্বিশেষ পাঠকের গ্রাহ্য নয়। সুতরাং T.S. Elliot ও ইকবাল বিশেষ দেশ-কাল ও জাতি-ধর্মের কবি ও শিক্ষক; আর Yeats ও রবীন্দ্রনাথ দেশ-জাত নিরপেক্ষ আস্তিক মানুষের কবি।

তারপর আসে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা। এক হিসেবে সাহিত্য-মাত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। কারণ সাহিত্য হচ্ছে মূলত মানুষের ভাবলব্ধ সত্য—অনুভূতি ব্যতিরেকে বাস্তবে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিচ্ছবি পাওয়া অসম্ভব এবং সাহিত্য কোনো বাস্তব-প্রয়োজন প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধ করে না। আর এক হিসেবে সাহিত্য—মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। যে-প্রেরণায়, যে-অব্যক্ত-প্রয়োজনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সে-প্রয়োজন পরিহার করে চলা মানুষের পক্ষে তেমনি অসম্ভব। আমরা যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, বাল্মীকি, ফেরদৌসী-রুমী-জামীকে স্মরণে রেখেছি, তাঁদের রচনা পড়ে চলেছি—তা-ই আমাদের প্রয়োজনের যথেষ্ট প্রমাণ নয় কী? পক্ষান্তরে অগ্নি যিনি আবিষ্কার করলেন, কয়লা যিনি যোগালেন, রেডিও-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-টেলিভিশন যাঁরা দান করলেন তাঁদের কেন আমরা স্মরণে রাখার গরজ বোধ করিনে! এতেই প্রমাণিত হয় এসবের ব্যবহারিক প্রয়োজন যেমনই হোক, তার সঙ্গে আমাদের অন্তর্জীবনের সম্পর্ক অকিঞ্চিৎকর; পক্ষান্তরে অন্তর্জীবন তথা আমাদের অনুভূতির জীবন যতই অবাস্তব মনে হোক, তা-ই আমাদের জীবনসর্বস্ব। তবু তা শিল্প মাত্র! অন্য দশ শিল্পকর্মের মতো এ-ও আমাদের প্রয়াসপ্রসূত সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সাহিত্যে বাস্তবতা ও কল্পরসবিলাস সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কোনো বিষয়বস্তুই সাহিত্যে নিরর্থক নয়, কারণ যে-কোনো ব্যাপারে মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্ফূরণ হয়। হৃদয়-সংযুক্ত বহির্জীবনের সমস্যার সমাধান-চিত্র যেমন মানুষকে জীবন-পথে প্রেরণা দান করে, তেমনি রাক্ষস-রাজপুত্রের কাহিনীতেও মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি রূপায়িত হয়দুটোরই প্রয়োজন আছে। ফলত বুর্জোয়া ও গণসাহিত্য বলে সাহিত্যকে দ্বিধা- বিভক্ত করা নিরর্থক। কারণ আমরা বলেছি, মূলত মানুষের জীবন ভাবসর্বস্ব বা অনুভূতি-সমষ্টি মাত্র। কাজেই অনুভূতির জগতে স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রবণতানুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং মনোভঙ্গির পার্থক্যবশতই আমরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে ও রসে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা টানতে প্রয়াসী হই। আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা ও মতগত অনৈক্যের মূলও এখানে। সাহিত্যে রস-সর্বস্বতা, জীবন-সর্বস্বতা, সমাজ-সর্বস্বতা, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা বা প্রয়োজন-সর্বস্বতা বলে কিছুই নেই—যা আছে তা অনুভূতি ও উপলব্ধির সর্বস্বতা। এর প্রকার-ভেদেই আদর্শ, নীতি, রস ও বিষয়-ভেদ ঘটে।

এ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি, তা সংক্ষেপে এই—সাহিত্য হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র! সাহিত্যে রসভেদ আছে কিন্তু রূপভেদ নেই! কারণ মানুষের জীবন হচ্ছে অনুভূতির সমষ্টিমাত্র অর্থাৎ ভাবসর্বস্ব সুতরাং সাহিত্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বাস্তব-অবাস্তব, গণ-বুর্জোয়া বলে কোনো সীমারেখা টেনে দেওয়া নিরর্থক। তারপর বলেছি, মানুষের মানস-সংস্কৃতি যখন দেশ, কাল, ধর্ম ও জাতীয়তার ছাপ মুক্ত হয়; তখন সাহিত্যে যে-অনুভূতি বিধৃত হয়, তা হয় সর্বকালের, দেশের ও চিরমানবের সম্পদ। অতএব সাহিত্যে একমাত্র কাম্যবস্তু হচ্ছে বহির্ঘটনার সঙ্গে হৃদয়ের গভীরতর সংযোগ সন্ধান। বাস্তবের ঘটনা সংঘাতে মনে দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-উল্লাসের যে-আবেগ সৃষ্টি হয়, তা যতক্ষণ যথার্থরূপে বাণী লাভ না করবে, ততক্ষণ তা মনান্তরে বা হৃদয়ান্তরে সহানুভূতি সঞ্চারে সমর্থ হবে না। এইজন্যে সৃষ্টিমাত্রই নিরর্থক—'সাথে হৃদয় নহিলে'। অনুভূতি বা ভাবের যথার্থ প্রকাশ মানেই হৃদয়ের বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাণী-চিত্র দান করা। এক কথায়, বাহ্যবস্তু বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অন্তর্নিহিত রূপ সাহিত্যে বিধৃত হওয়া চাই। একমাত্র এরই নাম সাহিত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে আর্দশবাদ বা অর্ডিন্যান্স

সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক অভিব্যক্তি দেওয়া আজো সম্ভব হয়নি, যদিও এ পথে সাহিত্য সৃষ্টির সাথে সাথেই চেষ্টা চলে আসছে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্য মূলত উপভোগের বস্তু; অনুভূতিজাত উপলব্ধিই এর চরম কথা; ব্যাখ্যা করে বুঝে নেয়া বা বুঝিয়ে দেয়ার বস্তুই এ নয়। এমনও অনেক রচনা আছে যার বস্তু আছে—ভাষাও ক্রটিহীন অথচ তা সাহিত্যই নয়! যেমন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলি। সুতরাং সাহিত্য যে কী বস্তু, তার স্বরূপ কী প্রকার, তা ব্যক্ত করা ব্যাখা করা সম্ভব নয়। শুধু বলা চলে, সাহিত্য রস-স্বরূপ। সে-রসের বহু সংজ্ঞা প্রচলিত আছে সত্যি, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য একটিও নয় ; শুধু উপলব্ধি এবং উপভোগ-সম্ভাব্যতাই এর একমাত্র পরিচয়। এছাড়া প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও রসগ্রাহিতামূলক যত সংজ্ঞা আছে সবগুলোই বাহ্য—অন্তরপরিচয়বাহী নয়। এগুলোকে আহা-আহা মরি-মরি ধাঁচের আবেদনমূলক সংজ্ঞা বললে একটু খটকার কারণ ঘটে বটে—কিন্তু আসলে এগুলো তা-ই।

অতএব, সাহিত্য বিচারে সার্বজনিক কোনো নিরিখ নেই। পাঠকের রুচি, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও প্রকৃতি-প্রবৃত্তি অনুসারে সাহিত্যের রসরূপ উপলব্ধ হয়। এখানে ভালো লাগাটাই বড় কথা। ইংরেজি গানের সুর-তাল যতই উৎকৃষ্ট হোক, সাধারণ বাঙালির কাছে তার কোনোই আবেদন নেই। তার কাছে—বাঙলা গান জগতের সর্বসঙ্গীতের বাড়া। তেমনি শেলির কবিতার বা শ'র নাটকের তীক্ষ্ণ মনীষাদীপ্ত সংলাপের মূল্য ইংরেজি ভাষার ব্যুৎপত্তিহীন পাঠকের কাছে কানাকড়িও নয়। এমন পাঠকের কাছে নজরুল কী দ্বিজেন রায়েরই কদর। শেলি বা শ' অপাঠ্য, অন্তত দুষ্পাঠ্য তো বটেই। সুতরাং পাঠকসাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করে সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে ডিগ্রি-ডিসমিস দেয়া চলে না। এমন দেখা গেছে, সবেচেয়ে ভালো বইয়ের কদর সবশেষে হয়েছে। তবে সাহিত্য ব্যাপারে প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে—যেসব পাঠকের বিদ্যা-বুদ্ধি, রুচি-প্রকৃতি ও রস-জ্ঞানে বিশ্বাস ও ভরসা আছে, তাদের মতামতকে চরম এবং যথার্থ মনে করে সাহিত্যের সাধারণ পাঠকগোষ্ঠী বুঝে বা না-বুঝে রচনা-বিশেষের সমাদর করে। কিন্তু এমন বিজ্ঞ সমালোচক ও রসবেত্তারাও শুধু ভালো লাগা বা মন্দ লাগার বড় জোর কারণ দর্শাতে পারেন, কিন্তু নির্দেশ দিয়ে সৃষ্টি করাতে পারেন না—যেমন যেসব উপাদানে বৃক্ষের জীবন ও দেহ গঠিত, সে-সব বিশ্লেষণ করা সম্ভব, কিন্তু বৃক্ষ তৈরি করা অসম্ভব।

এ পর্যন্ত গেল রসের কথা। তারপর আসে আদর্শবাদের বিষয়।

স্রষ্টা নিজের ভাব-চিন্তা এবং বুদ্ধি ও বোধি দিয়ে সৃষ্টি করেন। তাঁর স্বকীয় অনুভূতি-উপলব্ধি বাণীরূপ লাভ করে হয় সাহিত্য। বস্তুত মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধি বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ নয়। লেখক তাঁর রুচি, প্রকৃতি-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-বোধিজাত আত্মদৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন এবং এভাবে সর্বসমন্বয়ে মনের মধ্যে জগৎ ও জীবনের যে একটি সংহতরূপ গড়ে উঠে, তা-ই প্রকাশিত হয় তাঁর রচনায়। তাঁর মতামতও একান্তভাবে তাঁরই। অপরের সাথে সে মতামতের মিল ঘটে নিতান্ত আকস্মিকভাবে। অতএব ব্যক্তি-বিশেষের মনের উপর বাহ্য প্রভাব যতই গভীর ও ব্যাপক হোক না কেন, তা যদি স্বাঙ্গীকরণ ব্যতীত প্রকাশিত হয়, তবে একে অজীর্ণরোগের সাথেই তুলনা করা উচিত। তা রচনা হবে—রসায়ত্ত সাহিত্য হবে না। সুতরাং তার জন্যে কারো ভাবনার প্রয়োজনই নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে—লেখক-বিশেষের স্বকীয় ভাব-চিন্তা-জ্ঞান ও প্রজ্ঞালব্ধ যে মতামত রচনায় প্রকাশিত হয়, তা-ই লেখকের আদর্শ। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব—প্রত্যেক লেখকেরই এক একটি আদর্শ রয়েছে। কারো রয়েছে সমাজাদর্শ, কারো রাষ্ট্রাদর্শ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো বা ধর্মাদর্শ। তবে এ-কথায় বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, হোমার থেকে শ' অবধি কেউ সভা ডেকে পরামর্শ করে তাঁদের সাহিত্যাদর্শ স্থির করেননি। তাঁদের যিনি যেভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন-বুঝেছেন, সেভাবেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এ যুগে যে-কোনো আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা মানেই বিপদ ঘাড়ে করা। সুতরাং আমি সে-চেষ্টা করব না। আমি অন্য উপায়ে আমার বক্তব্য পেশ করব। এতে অবশ্য কথাগুলো কিছুটা অবৈজ্ঞানিক হবে, তবু হয়তো বুঝতে কষ্ট হবে না।

পূর্বেই বলেছি, সমাজে-ধর্মে-রাষ্ট্রে বা সাহিত্যে যখন যিনি যা প্রচার করেন তাতে বাহ্য প্রভাব যতই থাক না কেন, তাকে প্রচারকের নিজের অনুভূতি-উপলব্ধি বা বিশ্বাসের ফল বলেই ধরে নিতে হবে। বহু পুরাতন পরিত্যক্ত আদর্শ কেউ যদি নতুন করে প্রচার করে, তবে বুঝতে হবে তা পুরাতনের পুচ্ছগ্রাহিতা নয়, স্বকীয় নতুন উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র। এখানে আমাদের আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মানুষের রুচি-প্রকৃতির যতই বৈচিত্র্য থাক না কেন, মানুষের বুদ্ধি-প্রজ্ঞা অপরিসীম নয়। ফলে মানুষ এ-পর্যন্ত জগৎ ও জীবন ব্যাপারে যে-কয়টি মৌল-শক্তির উৎসের ধারণা করতে সমর্থ হয়েছেন, আমার অবৈজ্ঞানিক অভিধায় সেগুলোর নাম দেওয়া যাক সমাজসত্তা, ব্যক্তিসত্তা, রাষ্ট্রসত্তা, ধর্মসত্তা, নাস্তিক্যসত্তা, নীতিসত্তা, নৈর্ব্যক্তিক রসসত্তা (মানে দার্শনিকতা), নীতিলেশহীন বিচিত্রসত্তা ইত্যাদি। স্ব স্ব জ্ঞান-মনীষা দিয়ে কেউ ব্যক্তি-মহিমা, কেউ ধর্ম-মহিমা, কেউ রাষ্ট্র-মহিমা, কেউ সমাজ-মহিমা, কেউবা নাস্তিক্য-মহিমা, আবার কেউ বা ব্যষ্টির বিচিত্র অনুভূতিরস-মহিমা প্রচার করেছেন। এ-কথা যথার্থ যে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব উপলব্ধিরই অভিব্যক্তি দিয়েছেন, কেউ কারো আদেশ-নির্দেশ বা উপদেশ-পরামর্শ গ্রহণ করেননি। কেননা নিজের বুদ্ধিগ্রাহ্য বা হৃদয়গ্রাহ্য না হলে কেউ কারো অনুকরণও করতে পারে না। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো হয় আমরা সবাই ভুল ধারণা পোষণ করছি অথবা আমরা সবাই সত্য কথাই বলছি। এ-নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু মীমাংসা পাওয়া যাবে না, সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব। কাজেই ধরে নেয়া যাক মানব-বুদ্ধি ও প্রকৃতি যেমন বিচিত্র, সত্যও তেমনি একক নয়—বহু ও বিচিত্র এবং সত্য অরূপ অর্থাৎ তার বিশিষ্ট কোনো রূপ নেই। কেননা জগৎ, জীবন, বস্তু ও অনুভূতি নিছক বাস্তব নয়, বাস্তব সম্পর্কে ব্যক্তিক ধারণার প্রসূনমাত্র। তাই কোনো দুইজনের দুনিয়া এক রকম নয়।

অতএব, যে-কেউ কিছু বলবেন বা লিখবেন তাতে তাঁর অচেতন, অবচেতন বা সচেতন মনের বিশেষ দৃষ্টি বা মত বা আদর্শ প্রকাশ পাবে। এ হচ্ছে নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি—প্রয়াস বা প্রভাবপ্রসূত নয়। মানুষের ব্যবহারিক গতিবিধিকে অর্ডিন্যান্স যোগে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব তো বটেই, সহজও। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত মনন-চিন্তন ধারাকে কোনো আদেশ-নির্দেশ-উপদেশের অর্ডিন্যান্স প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করলে মননধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কোনো বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত তো হবেই না, বরং বলপ্রয়োগে তা লুপ্ত বা ধ্বংস হতে বাধ্য। মানুষের মন-মননের উপর অর্ডিন্যান্স মারাত্মক অভিসন্ধি। আগের যুগেও এরূপ অর্ডিন্যান্স জারির লিপ্সা কারো কারো হয়েছিল। ফল কী হয়েছিল কারো অজানা নেই।

এ যুগে—এই জ্ঞানপ্রবুদ্ধ যুগেও নানা দেশে যেসব বিজ্ঞলোক মানুষের মনন-চিন্তনের উপর অর্ডিন্যান্স প্রয়োগে প্রয়াসী, তাঁদের বিজ্ঞতায় অশ্রদ্ধা জাগা অস্বাভাবিক নয়। কারণ আমার কাছে যা সত্য ও সুন্দর, তা-ই একমাত্র সত্য এবং একমাত্র সুন্দর, আর সব মিথ্যা ও ক্ষতিকর—এমন ধারণা যাঁর মনে বাসা বাঁধে, তাঁর জ্ঞান-মনীষায় আস্থা বা শ্রদ্ধা রাখা কোনো সুস্থমস্তিষ্ক লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অপরাপর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধানের মতো সাহিত্যেও বিধিবিধান প্রয়োগের ধৃষ্টতা দেখা দিয়েছে। কোনো্ আদর্শে কী বিষয়বস্তু নিয়ে কিরূপ ভাষায় কোনো্ ছাঁদে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, পূর্বাহ্নে তার permit নিতে হবে নীতিবেত্তা ও নিয়ামকদের কাছ থেকে!

যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্টির মূলে রয়েছে একাগ্র ধ্যান, অবিচলিত নিষ্ঠা, একান্ত বিশ্বাস এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মনন ও প্রকাশের স্বাধীনতা জীবনের অন্যক্ষেত্রে স্বীকৃত না হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই-ই হচ্ছে সৃষ্টির উৎসমুখ। এই স্বাধীনতা যদি না থাকে, তবে সাহিত্য-সৃষ্টি অসম্ভব। হোমার, শেকস্‌পিয়ার, শ' বা সাদী-রুমীর সৃষ্টি এক আদর্শপ্রসূত নয় ; তাতে মানুষের চিন্তা রাজ্যে সংঘাত ঘটেনি বরং মনোসঞ্চরণের ক্ষেত্র বিচিত্রতর ও প্রশস্ততর হয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে জ্ঞানরাজ্যের সীমা-পরিসীমা নেই। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পথে সে-জ্ঞান আহরণেই আরাম, আনন্দ এবং কল্যাণ। সে-কল্যাণ মানবসাধারণের। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা বিধাতার আসনে বসে নির্দেশে ফরমায়েশি সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান, তাঁরা জাতির—বৃহত্তর অর্থে মানুষের—রসের ও উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে মনুষ্যসাধারণের সাংস্কৃতিক তথা মানবিক অধিকারই হরণ করছেন। লেখক-পাঠকের প্রতি এরচেয়ে বড় অবিচার, সাধারণভাবে মানুষের কাছে এরচেয়ে বড় বিপত্তি আর কিছুই নেই।

মানুষ প্রতিমুহূর্তে নিজেকে এবং জগৎকে নতুনভাবে উপলব্ধি করছে। তার সেই অপূর্ব বিচিত্র উপলব্ধির প্রকাশে জগৎ ও জীবন বৈচিত্র্যে সুন্দরতর ও বিস্তৃততর হচ্ছে। এভাবে মনোজগতে যে-বিপ্লব অহরহ ঘটছে তাকে রোধ করা মানেই জীবনের অপমৃত্যু ঘটানো। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন আজকের নতুন ব্যাপার নয়। চিরকাল এমনিই হয়ে আসছে। যারা বিবর্তনকে বাধা দিয়েছে, সহজভাবে অভিনন্দিত করতে পারেনি, তারাই হতভাগ্য। কারণ পরিণামে তারাই ঠকেছে। যা আসবার তা আসবেই, যা ঘটবার তা না ঘটে যাবে না—তা বাধা যত বড়ই হোক, আর সাবধানতা যতই নিখুঁত থাক ! সেজন্যেই সাহিত্যে যে-কোনো মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং বিশেষ আবশ্যক—তা ঈশ্বরবাদ হোক, অথবা ব্যক্তিবাদ, সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ বা ধর্মবাদ হোক ! এর মধ্যে যা রসায়ত্ত, যা সাহিত্য তা টিকে থাকবে, অন্য দশজনকে প্রভাবিতও করবে ; যা নিঃসার তা যাবে—আবর্জনার মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকা পড়বে, তার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কারো নিজের বিশ্বাস ও খেয়ালখুশিমতো বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবকে কোনো বিশেষ নিয়ম-নিগড়ে বাঁধতে যাওয়া শুধু বাতুলতা নয়, অদূরদর্শিতা এবং মূর্খতাও বটে।

তবু যদি কারো মন বুঝ না মানে, তবে বাধা দেয়া উচিত নিজের কণ্ঠ আরো চড়িয়ে—অন্যের কণ্ঠরোধ করে নয়। আগাছা যদি নষ্ট করতে হয়, তবে নিজেকে বটগাছ হতে হবে, অন্যথায় আস্ফালন ব্যর্থ ও দুঃখবহ হতে বাধ্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের মূল্য

সুর মানুষের আদিম সৃষ্টি। যা কিছু মহৎ, সুন্দর, শোভন ও কাম্য—তাকেই মানুষ সুরের বন্ধনে সুন্দর করেছে। বিলাপে, ভ্যাংচিতে, গানে, কথায়—এক কথায় সর্বপ্রকার হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তিতে মানুষ তাই সুরের আশ্রয় নেয়।

ফলে আবহমান কাল থেকে মানুষের সুখ-হর্ষ, ভয়-ভাবনা, সখ-শঙ্কা প্রভৃতি আবেগময় সবকিছুই সুরে বিধৃত।

কিন্তু চিরকাল মানুষের মন আদর্শপ্রবণ ও আদর্শানুগ। নীতি ও আদর্শের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ রয়েছে। সেকালে ধর্মই ছিল লোকজীবন ও সমাজের ভিত্তি আর দিশারী। যে-যুগে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মত ও আদর্শ গড়ে উঠত ধর্ম ভিত্তি করে। তাই ধর্মকথা বা নীতিবার্তাই ছিল সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। এ না হলে রচনার সামাজিক মূল্য থাকত না।

এ-যুগে এ ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস কার্যকর নয় বটে, তবে এ-যুগেও নীতি আর আদর্শ ছাড়া কোনো মত গড়ে ওঠে না। সমাজে, সাহিত্যে বা রাজনীতিতে মতাদর্শ লোক-যাত্রার অবলম্বন,—তা সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক বা মানবতার আদর্শের যে-কোনোটিই হোক না কেন।

সে-যুগের ধর্মের স্থান দখল করেছে এ-যুগে 'মতবাদ।' সে-যুগে জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রী ও সংস্কার-প্রবণ। এ-যুগে জীবন মত-ভিত্তিক। অতএব নামান্তরে বা কেন্দ্রান্তরে আমাদের অদৃশ্য নিয়ন্তা রয়েইছে।

বলছিলাম, সে-যুগে জীবন ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। ফলে যা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সহায়ক নয়, তা ছিল একান্তই অবহেলিত। এ কারণেই সে-যুগের ধর্ম ও নীতি-নিরপেক্ষ রচনা বর্ণে-বিধৃত হয়ে কালজয়ী রূপে এ-যুগে আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। এখানে আমাদের উপাখ্যান-সাহিত্যের প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত. রোমান্স বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুবাদ। দ্বিতীয়ত. এগুলো পনেরো-ষোলো শতকের পূর্বের নয়। তৃতীয়ত. এগুলো অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত মুসলিম-মনেরই অভিব্যক্তি। তবু রোমান্স-সাহিত্যে ধর্ম না থাকলেও ধর্মবোধ ছিল; ছিল আদর্শানুগত্য। তাই ওগুলো টিকে রয়েছে।

সে-যুগে মানুষ ছিল, অথচ মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ রস-চেতনা ছিল না—এমন হতেই পারে না। তার প্রমাণও পাচ্ছি ছড়ায়, রূপকথায়, গানে-গাথায়, প্রবাদে-প্রবচনে, হেঁয়ালিতে। যে-যুগে লাখে একজন শিক্ষিত ছিল না, সে-যুগে প্রাকৃতজন-সৃষ্ট এসবই মানুষের রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছে শত শত বছর ধরে। শিক্ষার প্রসারের ফলে, আজ এদের রস-মূল্য কমে গেছে। সাহিত্যমূল্যও হয়তো নেই। তাই এসব লোক-সৃষ্ট সাহিত্য লোকস্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে। তবু লোকশ্রুতিতে কতকটা বেঁচে আছে। কিন্তু এ-যুগে এসব আর বুঝি টিকে থাকতে পারছে না। লোকমুখের আশ্রয় হারিয়ে ওগুলো নদীর চরের মতো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে ঠাঁই করে নিচ্ছে। যদি সবগুলো সযত্নে সংগৃহীত হয়, তাহলে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকে না।

শিক্ষা-সভ্যতার বিকাশ ও প্রসারের ফলে আজ আমাদের কাছে এসব অবহেলিত রচনার মূল্য অপরিমেয়। কেননা, এর থেকেই আমরা আমাদের সর্বপ্রকার ঐতিহ্যের সন্ধান পাব—পাব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক এমনকি নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের উপাদান। আরো একদিক দিয়ে এসবের মূল্য অপরিসীম, কেননা সে-যুগে বিদ্বান লোকেরা দরবারি ভাষা সংস্কৃতের (মুসলমান আমলে ফারসিও) চর্চা করতেন। প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। কাজেই আমাদের ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, গান, গাথা ও রূপকথা নিশ্চিতই প্রাকৃতজনের সৃষ্টি। তাই আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীত জীবনধারার স্বরূপ উপলব্ধি ও উদ্ঘাটনের পক্ষে এগুলো আরো মূল্যবান, কারণ এতে আর যা-ই থাক, সাহিত্যিক বা নৈতিক কৃত্রিমতা নেই।

ভাষার ভিত্তি শব্দ। কাজেই জাতির পরিচয়ে শব্দের মূল্য কম নয়। এর থেকেই জাতির আচার-আচরণের বাহ্যরূপ চিত্রিত হতে পারে। এ শব্দ দিয়েও জাতির ইতিহাসের কাঠামো খাড়া করা যায়। যেমন ধরুন 'স্বতন্ত্র' শব্দটি। এ প্রাচীন শব্দটিই বলে দেয়—এককালে এদেশে কাপড় বুনবার জন্যে আলাদা সম্প্রদায় ছিল না, প্রত্যেক পরিবারেই কাপড় বোনা হত। যাদের নিজস্ব তাঁত থাকত, তারাই সমাজে ধনী ও মানী বলে মর্যাদা পেত। প্রতিপত্তি ছিল তাদেরই। যেমন ধরুন, প্রাচীনকালের কথা বলতেই আমরা যতই গদগদ কণ্ঠে, গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গানের বর্ণনা দিই না কেন, 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটিই বলে দিচ্ছে—আমরা যেমন কল্পনা করছি, অবস্থাটা নিতান্ত তেমনি ছিল না। সে-সোনার যুগেও ভিক্ষা দিতে হত, 'কাঙালি-বিদায়' পার্বণও ছিল, ছিল 'ডাল-ভাতের' চোরও।

তারপর আমাদের বাগ্বিধির বিচার করলে দেখা যাবে তাতেও বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির উপাদান। যেমন 'পান দান।' এটা সম্মতি, খাতির, মিত্রতা ও প্রীতির স্বীকৃতি সূচক।

যেমন 'কল্‌কে পাওয়া'—গাঁজা, 'চরশ' তামাক প্রভৃতির দেশে সমাজে মর্যাদা বা খাতির পাওয়ার কথা এর থেকে উৎকৃষ্ট ভাবে বলা যায় না। আর একটি উদাহরণ নিন 'তেলা মাথায় তেল'—এককালে যে আমাদের দেশে তেলাভিষিক্ত করে অভিনন্দিত বা বরণ করা হত—এ তারই স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। উৎসবাদিতে 'তেলোয়াই' দেয়ার প্রথা আজো উঠে যায়নি।

ছড়াতেও রয়েছে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো যতই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন বলে মনে হোক না কেন, এগুলোতেও রয়েছে আমাদের নানা আচার-আচরণের ছিটেফোঁটা, মন-মননের নানা ইঙ্গিত। যেমন—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম্ ঘোড়াডুম সাজে।
ঝাঁঝর কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে ॥

আগ্‌ডুম—অগ্রগামী ডোম, বাগ্‌ডুম—পার্শ্বগামী ডোম আর অশ্বারোহী ডোম সেনার কথা বলা হয়েছে এখানে। রাঢ় অঞ্চলে একসময় রাজা ও জমিদারদের ডোম-সৈন্য থাকত। ডোম-সেনার চতুরঙ্গ বাহিনীর রূপটিই এ প্রাচীন ছড়ায় বিধৃত হয়েছে।

হেঁয়ালির মধ্যে আমাদের মনোভঙ্গি ধরা দিয়েছে বিচিত্ররূপে। "বুদ্ধির দীপ্তি, সৌন্দর্যবোধ, রসচেতনা ও রসিকতা, মননশীলতা, প্রতীকপ্রিয়তা, তত্ত্বপ্রবণতা প্রভৃতিই হেঁয়ালি বা ধাঁধার মৌলিক লক্ষণ।" এ ধাঁধা যে কেবল ছেলে-হাসানো বা ইয়ার-ঠকানো রচনা, তা নয়—বঙ্গ-ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মরমীয়া বাণী বা অধ্যাত্মতত্ত্বও এর মারফতে পরিব্যক্ত। যেমন চর্যাপদে আছে :

'দুলি দুহি পিঠা ধরণ ণ জাই
রুক্ষের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।

তেমনি বাউল-মারফতি গানে রয়েছে :

সোল হাত্যা বাঁশের ঘর না কুলাইল জনম ভর।
পাঁচপো হাত্যা পিঁজরা কলে থাক্‌বি কিরে মরণ পর ॥

অথবা— দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

অথবা— খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম পাখির পায়।

সাধারণ ধাঁধা— 'তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন ॥

প্রবাদ আর প্রবচনে ধরা পড়েছে আমাদের চিরকালীন বিশ্বাস, সংস্কার, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, চিন্তা ও মনন-লব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব। প্রবাদ ও প্রবচনে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রবাদে মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্য, মানুষের বাহ্যাচরণের সঙ্গে মনের সংযোগের স্বরূপ; ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সম্বন্ধীয় ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি—এক কথায় জগৎ, জীবন, লোক-চরিত্র ও সমাজমনের তথ্য ও তত্ত্ব প্রবাদে বিধৃত থাকে। আর প্রবচনে থাকে নীতি, আদর্শ, কৃষি, জ্যোতিষ, সামাজিক সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান ও আচরণীয় বিষয় সম্বন্ধে উপদেশমূলক হিতকথা। আর একটি স্থূল পার্থক্য আছে। প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, প্রায়ই বাক্যে বা পদে সমাপ্ত। প্রবচন ছন্দোবদ্ধ ছড়া-জাতীয় রচনা— প্রায়শ একাধিক পদে সমন্বিত।

প্রবাদ যেমন, পিরীত আর গীত—জোরের কাজ নয়
বা, নারীর বল, চোখের জল।
বা, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

এবার প্রবচন দেখুন : কানে কচু চোখে তেল।
তার বাড়ি না বৈদ্য গেল ॥
অথবা খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কী বৈদ্যে খায় ?
অথবা তাল, তেঁতুল, কুল—তিনে বাস্তু নির্মূল।

এসব প্রবচনে প্রাচীন স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিদ্যার কথা বিধৃত। আমাদের মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাকের বুলিগুলোতেও রয়েছে আমাদের সংস্কারপুষ্ট মন ও অজ্ঞতাদুষ্ট মননের পরিচয়। এছাড়া প্রণয়গীতি, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকগীতি; বাউল-মুর্শিদী-মারফতি প্রভৃতি অধ্যাত্মসঙ্গীত; ঝুমুর, সামা, কীর্তন প্রভৃতি নৃত্যসঙ্গীত এবং গাথা, রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা প্রভৃতির সাহিত্যিক মূল্য আজো নেহাত কম নয়।

আধুনিক অর্থে আমরা জাতি হিসেবে আজো গড়ে ওঠার মুখে। এজন্যেই আমাদের কাছে এসব লোকশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মূল্য অপরিমেয়। এর থেকেই জাগবে আমাদের ঐতিহ্যবোধ। এখানেই দেখতে পাব আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ। আমাদের জাতীয় মন-মননের গতি-প্রকৃতির ও ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিশ্চিত পরিচয় ঘটবে এসবেরই মাধ্যমে। জাতীয় সাহিত্য যদি জাতীয় জাগরণের অবলম্বন হয়, সাহিত্যকে যদি জাতির প্রাণরসের উৎস বলে মনে করি, তবে এগুলোর মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

ছড়ায়-প্রবাদে-প্রবচনে যেমন ; তেমনি এসব গান, গাথা, রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথায় আমাদের জগৎ-জীবন, ঘর-ঘাট, মাঠ-বাট, মন-মনন, আচার-আচরণ প্রভৃতির স্বরূপ কোথাও চিত্রে, কোথাও ইঙ্গিতে বিধৃত আছে। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক ইতিহাস লিখিত হবে এসব উপাদান সম্বল করেই। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বিরাট ইতিহাস রচিত হয়েছে এভাবে। ডা. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থটি এরূপ আপাত নগণ্য উপাদান ভিত্তিক।

অতএব আমাদের জাতীয় গরজে এসব লোকসাহিত্যের সন্ধান, সংগ্রহ, সরক্ষণ ও গবেষণাকার্য অবিলম্বে শুরু হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আজো যা-কিছু পল্লী-মানুষের মুখে ও স্মৃতিতে টিকে আছে, তাও আমরা হারাব। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যৎসামান্য বিধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রাচুর্য ও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। এদিক দিয়ে ডক্টর সুশীল কুমার দে'র 'প্রবাদ সংগ্রহ' ও ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'লোকসাহিত্য'র বিশেষ অবদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা

মুসলমানদের ভারত অধিকার ভারতবর্ষের সামাজিক ও কৃষ্টির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে 'শক-হূণদল' এসেছিল; ভারতবাসীরা অনায়াসে তাদের গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু বহিরাগত 'পাঠান-মুঘল'কে এদেশীয় সমাজ আত্মস্থ করতে পারেনি। তার কারণ মুসলমানেরা শুধু বিশেষ আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহুবল সম্বল করে আসেনি, এনেছিল যুক্তি-নির্ভর এবং প্রত্যয়-দৃঢ় ধর্ম, সমাজ, আচার আর রাষ্ট্রাদর্শ—যার সামাজিক ও পারমার্থিক প্রভাব ছিল অসাধারণ—এত অসাধারণ যে, তা আজকের দিনের বোলশেভিকবাদের চাইতেও সর্বগ্রাসী এবং আণবিক বোমার চাইতেও বিস্ময়কর। ফলে মুসলমানদের 'এক দেহে লীন' করা সম্ভব হয়নি কোনোমতেই। কিন্তু আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যধর্মও পর্যুদস্ত হবার নয়; এর অন্তর্নিহিত শক্তিই এই নবশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্য ছিল। তাই ভারতীয় সনাতন ধর্ম জখম হল নানাভাবে কিন্তু লুপ্ত হল না। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম না হল ইসলামে বিলীন, না পারল মুসলমানদের বিলীন করতে। বিজেতা ও বিজিতদের তথা শাসক ও শাসিতদের মধ্যেকার এ স্নায়ুবিক দ্বন্দ্ব দেখা দিল বড়ই তীব্র হয়ে। কেউ কাকেও না পারে গ্রহণ করতে, না পারে গ্রহণ করাতে। অবস্থাটা যেন 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান।' উভয় পক্ষই বুঝল—এ অবস্থা অসহ্য, এর আশু সমাধান প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম কণ্টকিত অনুদার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজেও ভাঙন ধরল ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের চুম্বকাকর্ষণে।

এ সমস্যার সমাধানার্থ শুরু হল সমাজ-চেতন মনীষীদের সাধনা। ধর্ম সমন্বয়ের ও ঐক্যের বাণী ভারতের সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রামানন্দ, নানক, কবির, একলব্য, দাদু, চৈতন্য ও সম্রাট আকবর থেকে গান্ধী পর্যন্ত এ ধারার সাধনা অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধূন' সঙ্গীতকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া চলে। এইসব মনীষীদের যা ছিল সচেতন প্রয়াস, অশিক্ষিত জনসাধারণের অবচেতন মনে তার প্রতিক্রিয়া ছিল শ্লথ ও মন্থর। তাই সাতশ বছরের এ একাগ্র সাধনা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়নি। মনীষীদের দূরদৃষ্টি জনসাধারণের মধ্যে ছিল একান্তই দুর্লভ। তাই সমঝোতা হল, বন্ধুত্ব হল, আত্মীয়তাও না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ বন্ধনসূত্র দৃঢ় ছিল না কোথাও। ফলে যেহেতু 'গড়ন ভঙ্গিতে পারে আছে কত খল,' সেহেতু অল্লোপরিষদ থেকে রামধূন সঙ্গীত পর্যন্ত সবকিছুর আবেদন কার্যক্ষেত্রে বারবার ঠুন্‌কো কাচের মতো অসার প্রতিপন্ন হয়েছে।

বলেছি, অশিক্ষা ও অদূরদর্শিতার দরুন জনসাধারণের মনে ঐক্য ও সমন্বয় প্রয়াস সচেতনভাবে কার্যকর হয়নি। সেইজন্যে যদিও এখানে সেখানে পারস্পরিক প্রভাবে অজান্তে সংস্কার ও কৃষ্টিগত সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তথাপি আচরণে না হোক উভয়পক্ষের স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বধর্ম মাহাত্ম্যগর্ব প্রবল ছিল। ফলে তারা ঘাটে-মাঠে ও হাটে-বাটে মিলেছে, কেননা জীবিকা ছিল তাদের অভিন্ন, কিন্তু জীবনদর্শনে মেলেনি। কাজে মিলেছে, ভাগ্যও ছিল একসূত্রে গাঁথা ; তাই পণ্য দিয়েছে, কিন্তু প্রেম দেয়নি ; সহায়তা করেছে কিন্তু সোহাগ দেখায়নি। একে অপরের পাশে ছিল, কেউ কেউ কাকেও মনের কাছে পায়নি। কেননা মন ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতমুখী।

এইরূপে অধিকাংশের গোঁড়ামির ফলে স্বল্প-সংখ্যকের উদারতার ক্ষীণধারা কখনও সুপ্ত কখনও বা লুপ্তই হয়ে গিয়েছে। তবু যাঁরা আশাবাদী, তাঁরা কোনোদিন হাল ছাড়েননি। তাই মধ্যযুগের ধর্মসাধকগণ থেকে বাঙলাদেশের বাউল-মুর্শিদপন্থীরা পর্যন্ত এবং সে-যুগের রাষ্ট্রসাধক আকবর থেকে এ যুগের গান্ধী তক সকলেই আন্তরিকভাবে সমঝোতা-সমন্বয় সাধনা করে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণ্ডীদাস বলেছেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আর একজন লোক-সঙ্গীতকার বলেছেন :

নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
জগৎ ভ্রমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত ॥

কিন্তু জনসমাজে এসব বাণী আশানুরূপ সমাদর পায়নি। নাড়া দেয়নি মস্তিস্কে, সাড়া জাগায়নি হৃদয়ে, আলোড়ন আনেনি সমাজে। তাই হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের কাহিনী মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে উদারপন্থীরা প্রবল বাধা পেয়েছিলেন—[অষ্টাদশ পুরাণানি রামশ্চ চরিতানি চ ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।] তেমনি মুসলমান লেখকরাও স্বজাতি থেকে কম ধমক খাননি। ষোলো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান বলেন—'না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবি বচন' তাই 'আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।' এবং

'যে সবে (মৌলবীরা) আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুঁ করি আছএ দূষিতে ॥
মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেতু কাড়ি।
কিতাবের কতা দিলুম হিন্দুয়ানি করি ॥ ....
তেকারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে।
কিতাব ভাঙ্গিলুঁ করি দোষএ আমারে।'

কিন্তু কোনো বাধাই টিকল না, কারণ কবির আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ় এবং সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে ছিলেন স্বয়ং নিঃসন্দেহ—'মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।' এবং এজন্যেই তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন—নবীবংশ ও সবে মে'রাজ —

এ দুই পুস্তক যেই পালিবারে পারে।
আল্লার গৌরব হৈব তাহার উপরে ॥

এমনি বিশ্বাস নিয়ে মালাধর বসুও বলেছেন :

পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার।
(তাই) পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার ॥

এইরূপে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মধ্যযুগে জায়নুদ্দিন, সৈয়দ সুলতান মোহাম্মদ খান, শেখচান্দ, সাবিরিদ খান, আবদুল হাকিম প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি একদিকে যেমন রসুল ও ইসলাম বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি আবার তাঁরা গোরক্ষবিজয়, জ্ঞানপ্রদীপ, সুরতনামা, যোগকালন্দর, হরগৌরী-সংবাদ, নুরজামাল, জ্ঞানসাগর প্রভৃতি তত্ত্ব-সাহিত্য এবং রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী রচনা করে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মৌলিক ঐক্য সন্ধানে প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং সেইযুগে একদিকে উদারপন্থীদের সমন্বয় ও মিলন মোহ এবং অপরদিকে গোঁড়াদের বঙ্গভাষাপ্রীতির অভাব বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখিনতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্যাদর্শে আধুনিক সাহিত্যধারা শুরু হল। এই যুগেও আমরা মীর মশাররফ হোসেন প্রভৃতির মধ্যে স্বধর্ম ও স্বজাতিনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তা আর সংস্কারের প্রভাবও দেখতে পাই। বিষাদ-সিন্ধুতে স্বর্গমর্ত্যের হিন্দুয়ানি কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে। তাঁরই সমসাময়িক কবি শামসুদ্দিন সিদ্দিকীর 'ভাবলাভ' কাব্যের পারমার্থিক সংগীতের 'কালা'র সাক্ষাৎ মিলে। আশ্চর্য এই যে, এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ের হলেও বঙ্কিমের তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দুর অকল্যাণ কামনা করেননি।

আবার সৈয়দ সুলতান সে-যুগে যে-বাধা পেয়েছিলেন, এ-যুগে কোরআনের বঙ্গানুবাদেও সে-বাধা বেশ কিছুকাল প্রবল ছিল। তাই আধুনিক যুগে কোরআনের প্রথম অনুবাদ ও রসুলের জীবনী রচিত হয় হিন্দুর দ্বারা। কৃষ্ণকে মুসলমান-লেখক অন্যতম পয়গম্বর বলে স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এভাবে নজরুল ইসলামের কাব্যে আমরা শেষবারের মতো হিন্দু-মুসলিমের মিলন-প্রয়াস লক্ষ্য করি। তবু এ-যুগের বিকাশোন্মুখ ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের ফলস্বরূপ আমরা মোজাম্মেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হকের জাতীয়ফোয়ারা, কায়কোবাদের অমিয়ধারা এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মুসলিমঐতিহ্যপ্রধান স্পেনবিজয়, অনল প্রবাহ প্রভৃতি কাব্য-কবিতা পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের এ প্রয়াস খুব সচেতন ছিল না, মূলত হালীর 'মুসদ্দস' ও সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবেই তাঁদের সাধনা শুরু হয়। কিন্তু মুসলমানদের আচরণে না হোক, আস্থার দিক থেকে এতটুকু স্বধর্মচ্যুতি ঘটেনি কোনোদিন। এই সময়েই ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া-ই সা'দৎ'এর অনুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'ও প্রচারিত হল। শুধু তাই নয়, তিতুমিরের আযাদীস্বপ্নের এবং যুক্তিবাদীদের ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবও তাঁদের উপর কিছু কম ছিল না।

এইরূপ দুই বিরুদ্ধ আদর্শের ঠেলাঠেলিতে অবশ্য ইসলামও টিকে ছিল, মুসলমানও বেঁচে ছিল, কিন্তু ইসলামমুখী মনোভাবের তীব্রতা কোথাও ফুটে ওঠেনি। তাই আমাদের সাহিত্যে সাম্প্রত পূর্বযুগে নিরবচ্ছিন্ন ইসলামমুখিতার নিদর্শন নেই।

অত্যাধুনিক যুগে নজরুল ইসলাম ইসলামবিষয়ক অনেকগুলো গান এবং কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। এগুলো থেকে অনেক মুসলমান পাঠক ও কয়েকজন লেখক ইসলামী প্রেরণা পেয়েছেন। তবে অপ্রিয় হলেও এখানে বলা আবশ্যক যে, নজরুল ইসলাম প্রথমত বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তায় (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাবোধ ছিল না। তার কারণ, তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস ও লক্ষ্য ছিল মানবনিষ্ঠা। তাঁর ধর্মবোধও ছিল মানবনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন একান্তভাবে স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতি (ভারতবাসী)-নিষ্ঠ ও নিপীড়িত মানবতার দরদী কবি। এই স্বদেশ ও মানবনিষ্ঠ কাব্যসাধনার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ আমরা তাঁর কাছে ইসলামী কবিতা ও গানগুলি পেয়েছি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও প্রেরণা ইসলাম-প্রীতিপ্রসূত নয় বরং তীব্র আযাদী-বাঞ্ছা ও মানবতাবোধের পরিচয় ও পরিপূরক। সুতরাং কবির 'জিঞ্জির' মুসলিম কবিতার সমষ্টি বলে বিজ্ঞাপিত হলেও আসলে ওটা তা নয়।

যা হোক, কয়েকজন লেখক এর মধ্যে থেকেই ইসলামের শিক্ষায় ও মুসলিম ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে নজরুলের সমসাময়িক গোলাম মোস্তফাই প্রথম। কিন্তু তাঁর রচনায় গণচিত্তে প্রেরণার তরঙ্গ তুলবার মতো তীব্রতা ছিল না। তিনি নিজে উদ্বোধিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঠকসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবার সামর্থ্য ছিল না তাঁর কলমের। শাহাদৎ হোসেনের লেখার আবেদনও পাঠকচিত্ত স্পর্শ করেনি। তারপর অনেক পরে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন বেনজীর আহমদ। তিনি বিপ্লবী কবি বলে একসময় পাঠকসাধারণের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছেন। তাঁর ইসলাম ও মুসলমান বিষয়ক কবিতাগুলো কিশোর ও তরুণ-হৃদয়ে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। ভাবে ও ভাষায় তিনি নজরুলেরই মানসসন্তান। কিন্তু নজরুলের মতো অফুরন্ত প্রাণময়তা ও উচ্ছ্বাস-প্রাচুর্য তাঁর ছিল না। ফলত তিনি যেমনি অতর্কিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ যেন আত্মগোপন করেছেন। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যানুসারী আর দুজন কবি হচ্ছেন ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসান। ফররুখ আহমদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যমোহ তীব্র আবেগ জাগিয়েছিল। অনুরাগের সঙ্গে অবচেতন ভাবালুতা তাঁকে আবেগমুখর এবং সংবেদনশীল সৃষ্টিপ্রবণ করেছে। ইসলামের উন্মেষযুগের মুসলমানদের প্রাণময়তা ও জীবনবাদ মুগ্ধ করেছে তাঁকে। তাই তিনি 'হেরার রাজ তোরণের ও নারঙ্গীবনের' স্বপ্ন দেখেন এবং সে-স্বপ্ন আজকের দিনে বাস্তবে রূপায়িত করবার অভিলাষও যেন পোষণ করেন। এইজন্যে তাঁকে Revivalist বলা যেতে পারে। কোনো জিনিসের Form ও Spirit এক বস্তু নয় এবং তাদের অনন্যাপেক্ষ সত্তা উপলব্ধি সম্ভব। ইসলামকে যে-অর্থে আমরা চিরকালের সর্বদেশের চিরমানবের ধর্ম বলি, তা হচ্ছে ইসলামের spirit বা শিক্ষার মূলসূত্রগুলোর চিরমানবের সমাজে প্রযোজ্য হবার যোগ্যতা। অর্থাৎ আমাদের প্রয়োগবিধি ও জীবনপ্রণালী বদলাবে কিন্তু আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নীতি অপরিবর্তিত থাকবে। কালে কালে প্রয়োগ-ধারা পালটাবে, কিন্তু নীতি ও লক্ষ্য থাকবে স্থির-অচঞ্চল। কাজেই Revival-এর প্রয়াস শুধু অবান্তর নয়, অনভিপ্রেতও বটে। যাঁরা শুধু আত্মা (spirit) নয়, বহিঃরূপেরও (Form) পুনরাবর্তনের পক্ষপাতী, আজকের দুনিয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের অভিলাষ হয়তো পূর্ণ হবার নয়। ফররুখ ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর আরবি ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বী। ফররুখের এই আরব ঐতিহ্য-প্রেরণাজাত সাতসাগরের মাঝি, হাতেম ও নৌফেল, হাতেমতায়ী, সিরাজুম্‌মুনিরা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যে-ঐতিহ্যানুগ অবচেতন ভাবালুতা ফররুখের কাব্যপ্রেরণার উৎস, সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যে সে-ভাবালুতা ছিল না, অর্থাৎ তিনি ইসলাম বা মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি মোহগ্রস্ত নন, তাঁর কাব্যসাধনা ছিল আদর্শানুশীলনের সচেতন প্রয়াস মাত্র। এ কারণে তাঁর কবিতা আবেগমুখর নয় বরং বিদগ্ধমনের প্রয়াসচিহ্নিত। এজন্যেই বোধ হয় তাঁর এ ধারার কাব্যসাধনা চাহার দরবেশের সাথী হয়ে গহন বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

এঁদেরই প্রায় সমসময়ে আমরা তালিম হোসেনকে পেলাম। তাঁর প্রেরণার উৎস ইসলাম বা মুসলিম ঐতিহ্যবোধ নয়—বরং মুসলিম জাতীয়তাবোধ। তাঁর আযাদীর স্বপ্ন ও উল্লাসজাত পাকিস্তানী কবিতা ও গান বিভাগপূর্ব বাঙলাদেশে পাঠকসাধারণের অজস্র প্রশংসা অর্জন করেছে।

নজরুলোত্তর এ ধারার কবিগণ ১৯৩০ সালের মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ১৯৪০ সালের পাকিস্তান পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যসাধনা আরম্ভ করেন। এইক্ষেত্রে ইকবালের কাব্যসমূহ তাঁদের প্রেরণার পরিপোষক ছিল। ধর্মবোধের পরিসরে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তা ও সমাজবোধ অর্জনই ছিল ইকবাল-কাব্যের মূল সুর। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন—আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম সবসময় সমাজকেন্দ্রিক; এবং পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সাধনা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভের সহায়ক। আমরাও স্বীকার করি যে, ধর্মবোধ সামাজিক প্রয়োজনে অপরিহার্য। ইকবালের শেকওয়া, আস্‌রারে খুদী ও রমুজে বেখুদী প্রভৃতির লক্ষ্যও এই। ইকবালের কর্ম ও কাব্য-প্রেরণায় হালী ও সৈয়দ আহমদের প্রভাব প্রবল ও প্রকট। বস্তুত তিনি তাঁদের স্বপ্নকেই সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। ইকবাল তাঁদের যোগ্যতম মানস-সন্তান।

মধ্যযুগে ও নজরুলপূর্ব আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যের ইসলামমুখী যে-ধারার কথা উল্লেখ করেছি, তা মুখ্যত ধর্মানুরাগজাত। নজরুলের সম-সময়ে তা ছিল প্রধানত সমাজবোধানুষঙ্গিক এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ বেনজীর আহমদের কাল থেকে তা হল নিছক জাতীয়তা, সমাজবোধ ও আযাদী প্রেরণাপ্রসূত। আযাদী-উত্তর যুগে এ আবার শুধু রাষ্ট্র ও সমাজাদর্শের বাহনই যে হয়েছে, তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ ধারার কাব্য-সাহিত্যকে যদিও আমরা ইসলামমুখী ধারা নামে অভিহিত করেছি, তবু বিভিন্ন যুগে এ সাহিত্যের প্রেরণা, ব্যঞ্জনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অতএব আপাতদৃষ্টিতে বিষয়সাদৃশ্যে এ সাহিত্য একক ধারার অন্তর্গত বলে মনে হলেও আসলে বিভিন্ন যুগের এ সাহিত্যের মধ্যে কোনো ভাবগত মৌলিক ঐক্য নেই।

পাকিস্তান অর্জনের পর থেকে জনসাধারণের ইসলাম ও মুসলিম তমদ্দুন-প্রীতি সর্বত্র আলোড়ন জাগিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামমুখী কর্মপ্রেরণা ও সাহিত্য সাধনার অভাবে ঘোচেনি। আজকের যুগে জীবন-সমস্যা উৎকট আকারে দেখা দিয়েছে, তাতে নিতান্ত বেঁচে থাকার সাধনা ছাড়া অন্য সাধনা ঠাঁই পাবার কথা নয়। জাতি ও শ্রেণীসংগ্রামে আজকের পৃথিবী জর্জরিত ও মুমূর্ষু। যে-দেবতা বর দিতে পারে না, তার পূজা হয় না। আজকের অধার্মিকতা আস্থাহীনতার জন্য তত নয়, যতটা ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও জেদজাত ! এই সব কারণেই ইসলামমুখী সাহিত্য-সাধক আজ দেশে নিতান্ত বিরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোভাষী পুথির ভাষা

ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার পূর্বেকার হস্তলিখিত পুস্তকমাত্রেই পুথি নামে পরিচিত ছিল। পুথি শব্দ সংস্কৃত পুস্তিকা শব্দজাত। কাজেই পুথি বলতে প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থাবলীকেই বোঝানো উচিত। কিন্তু অধুনা কেউ কেউ আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা-হিন্দুস্তানী মিশ্রিত ভাষায় রচিত দোভাষী (দ্বিভাষী) কাব্যগুলোকেই বিশেষ অর্থে পুথি নামে অভিহিত করেন। সেজন্যে আমরাও 'পুথি সাহিত্য' অর্থে দোভাষী পুথিই বুঝব।

দোভাষী পুথির ভাষা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। আর্য-পূর্ব যুগে বাঙলা দেশে বিভিন্ন গোত্রের যে-সব লোক বাস করত, তাদের স্ব স্ব ভাষা ছিল বা সর্বজনীন একটি মিশ্রভাষায় (অস্টিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল ও অন্যান্য অনার্য ভাষার মিশ্রণজাত) তারা কথা বলত—এটা আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ খ্রীস্টীয় আট শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড় পুণ্ড্রোদভবা সদা।"—অসুরেরা গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধন জাত ভাষা ব্যবহার করে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নিয়ে যখন ধর্মপ্রচারক ও শাসক হিসেবে মুখ্যত আর্য সংস্কৃতিবাহী ও আর্যভাষা (প্রাকৃত)-ভাষী একদল লোক বাঙলা দেশে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করলেন, তখন এদেশীয় প্রাচীন অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত উন্নত আর্যধর্ম, দর্শন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে নিল, এও আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ, সবল ও উন্নত শাসকজাতির কাছে দুর্বল, বিজিত ও শাসিত জাতির সংস্কৃতির পরাজয় ও বশ্যতা চিরকালীন ঐতিহাসিক সত্য ব্যাপার।

বাঙলা দেশে যে-আর্যভাষা প্রথম প্রবেশ করেছিল তা বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা নয়—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বাণীবাহক পালি বা প্রাকৃত। ভারতের নানাস্থানে যূরোপীয়দের হাতে দীক্ষিত ভারতীয়গণ যেমন ইংরেজিকে তাদের নিজেদের ভাষারূপে গ্রহণ করে; বাঙালিরাও তেমনি পালি-প্রাকৃতকে মাতৃভাষারূপে বরণ করে। কারণ, তাদের নিজেদের কোনো লিখিত ভাষা ও সাহিত্য ছিল বলে কোনো প্রমাণ মেলে না। এখনো কোল, মুণ্ডা, কুকী ও নাগাদের কোনো বর্ণমালা বা লিখিত ভাষা নেই। কাজেই বাঙালিরা পালি-প্রাকৃতকেই গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করা চলে। সংস্কৃতের সঙ্গে তাদের পরিচয় হতে পারেনি।

উক্ত পালি-প্রাকৃত ভাষায় তাদের নিজেদের ভাষার যেসব শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায়নি, অথবা পালি-প্রাকৃতের যেসব শব্দ তাদের কাছে শ্রুতিসুখকর বা প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ বলে মনে হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শব্দসম্পদ বর্জন করেনি। ফলে আজো বাঙলা ভাষায় আমরা বহু দেশী তথা অপ্রাকৃত শব্দ পাচ্ছি। কালক্রমে যে আরো বহু শব্দ লুপ্ত হয়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর বিদেশী মৌর্য ও গুপ্ত শাসনকালে এবং পাল রাজাদের আমলে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ আমদানি হয়ে বাঙালির ভাষায় স্থায়ীভাবে ঠাঁই পেল। এরপর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের আমলে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার ধুম পড়ে গেল। সে সময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙালির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালির ভাষা সংস্কৃত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

এরপর আসেন মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও শাসকগণ। এসময় অনিবার্য কারণে বহু ফারসি, তুর্কী ও আরবি শব্দ ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করে।

এ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলেছে পদ্যে। পদ্য আর গদ্য ভাষায় পার্থক্য বিস্তর। পদ্যে অল্পকথায় স্বল্প শব্দে অস্পষ্ট অন্বয়ে কাজ চলে, কিন্তু গদ্যের বাঁধন শ্লথ হলে চলে না। এজন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আমরা মুসলমান আমলের দলিল-দস্তাবিজে, চিঠিপত্রে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত বাঙলাগদ্যের সাক্ষাৎ পাই। কারণ তখনো গদ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা চালু না হওয়ায়, বাঙলা ভাষায় গদ্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস কেউ করেনি। আর এ-কথা কে না স্বীকার করবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কোনো ভাষাই মার্জিত ও শালীন হয়ে উঠতে পারে না। কেননা মুখের বুলি চিরকাল অপূর্ণ ও ত্রুটিবহুল, তাকে লিপিবদ্ধ করতে হলে অনেককিছু যোগ করতে হয়—অনেক পরিশোধনের প্রয়োজন। কারণ শিক্ষিত ও ভাবুক লোকের ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে অনেক বেশি শব্দের প্রয়োজন যা মননহীন অশিক্ষিত লোকের ঘরোয়া বা ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না। এজন্যেই ভাবুক, পণ্ডিত আর মূর্খ-লোকের ভাষায় পার্থক্য থাকে—একটা ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, অপরটা বাক্যার্থ-সর্বস্ব। এ কারণেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পরেও আমরা প্রয়োজনের তাগিদে বহু সংস্কৃত শব্দ অবচেতনভাবে বাঙলা-ভাষায় ব্যবহার করেছি। চর্যাপদের পর থেকে ভারতচন্দ্র বা তৎপরবর্তীকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধারার বাঙলাসাহিত্য সর্বাঙ্গে বহন করছে তার প্রমাণ।

এ পর্যন্ত ক্বচিৎ সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় কাব্য রচনা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বাঙালি চিরকাল গদ্যভাষায় কথা বললেও গদ্য রচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, শব্দসম্পদের প্রচুর অভাব রয়েছে। আরো রয়েছে শব্দের পারস্পরিক অন্বয়সাধক প্রত্যয় ও বিভক্তির অপ্রতুলতা। তাই য়ুরোপীয় মিশনারি ও বাঙালি পণ্ডিতগণ যখন ধর্মপ্রচারে, শাসনকার্যে ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাঙলা গদ্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন, তখন এ দুটো সমস্যা তাঁদের কাছে দেখা দেয় তীব্রভাবে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, দুনিয়ার কোনো লিখিতভাষা তথা সাহিত্যের ভাষা অকৃত্রিম নয়। বাঙলা পদ্যের ভাষাও অকৃত্রিম ছিল না; অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় তথা লিখিত ভাষায় কোনো কালে, কোনো দেশে কেউ ঘরোয়া কথা বলেনি।

আমাদের যে-চলিতভাষা বা কথ্যভাষায় সাহিত্য রচিত হয়, তাও কী অকৃত্রিম ? কাজেই নিতান্ত প্রয়োজনে বাঙলায় কৃত্রিম গদ্য সৃষ্টি হল 'সাধুভাষা' নামে।

বাঙলা গদ্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ আরবি-ফারসি বা ইংরেজি ভাষার সাহায্য নেবে তা ভাবা অস্বাভাবিক নিশ্চয়ই। তাই কেরী-রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রভৃতি সবাই সংস্কৃতের আশ্রয় নিলেন। প্রাকৃতজাত বাঙলাকে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে তার প্র-প্র-প্রমাতামহী সংস্কৃতের উত্তরাধিকারিণী দাঁড় করিয়ে তাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দসম্পদ সংস্কৃতানুগ করে তুললেন। এছাড়া ব্যবসাদারী ও অনভিজ্ঞ নূতন লেখকদের উপায়ই বা কী ছিল ! বরং এরূপ না করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করলে অস্বাভাবিক হত। বস্তুত সে-যুগে সে-অবস্থায় সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যকে একটা সুষ্ঠু ও শালীন রূপদান করা ছিল অসম্ভব। সে-যুগের কথাই বা বলি কেন, এ-যুগে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত 'চলতি ভাষায়'ও কী সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? এ ব্যাপারে আমরা উড়িয়া ও আসামী ভাষার দিকে লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারব, সংস্কৃত শব্দ আমদানি কেরী-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের স্বেচ্ছাচারিতার ফল নয় ! ভাষাকে সাবলীল করার জন্যে অপরিহার্য ছিল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য। অনাত্মীয় আরবি-ফারসি-ইংরেজির চেয়ে রক্তসম্পর্কিত সংস্কৃতির সম্পদ আত্মস্থ করা যে সহজ ও শোভন হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে ? এখানে স্মরণীয় যে, বাঙলা ভাষার আদিকাল থেকেই আমাদের পদ্যরচনায় প্রয়োজনমতো সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে। আজকের দিনে ইংরেজি শব্দের পরিভাষাও সংগৃহীত হচ্ছে সংস্কৃত থেকেই।

কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আর সংস্কৃত রীতির আমদানি যে এক কথা নয়, তা' প্রথমদিককার লেখকগণ সহজে বুঝে উঠতে পারেননি। আমি Daily morning walk করি—এতে অধিকাংশ শব্দ ইংরেজি হলেও এ বাঙলা; 'Daily he walks in the প্রভাত' বাংলা মিশ্রিত হলেও যে ইংরেজি তা কোনো শিক্ষিতলোককে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

তাই ইংরেজদের প্রয়োজনে ফরমায়েশি গদ্য রচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে শব্দ বের করে সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ যে-গদ্য সৃষ্টি করলেন, তা সেকালের বাঙালি জনসাধারণও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ "গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব-জাতের শিক্ষার্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পণ্ডিত (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) প্রবোধচন্দ্রিকা নামে যে গ্রন্থ রচিতে ছিলেন" তাঁর ভাষা এবং সংস্কৃত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিম্নরূপ :

"অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরী রূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্বধোভাবাস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত এতদ্‌রূপে প্রবর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষি ভাষা হইতে বহুত-রাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা ইহা নিশ্চয় ... ।"

কিন্তু আশ্চর্য যে, এমন ওকালতির পরেও স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ও এ ভাষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তার প্রমাণ পাচ্ছি তাঁরই অন্য রচনায় :

"মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলে পিলাগুলিন পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়ি ধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাকপাতা শামুকগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। .... এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা, হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়াগণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না। এক আধ দিন আগে পিছে সহে না, যদ্যাপিস্যাৎ কখন হয়, তবে তার সুদ দাম বুঝিয়া লয়, কড়াকপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার ক্ষেতে না হয়, তবে সোনা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইকপেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোঁয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর-বকনা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচুনী পর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারিনা। কত বা সাধ্য সাধনা করি—হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, হাত জুড়ি, দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লিখিস। তোর কী ভাতের পাতে আমরা ছাই দিয়াছি ?"

শুধু বিদ্যালঙ্কারই নন ; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সবাই বাঙলা গদ্যকে স্বাভাবিক ও শালীন করে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

রাজা রামমোহন রায় যথার্থই বুঝেছিলেন—"প্রথমতঃ বাঙলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্বাহযোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের Sentence গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।" (বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠান প্রকরণ)।

"ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।" (বাঙলা ব্যাকরণ)

অতএব রামমোহন 'এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়' অর্থে সংস্কৃত অভিধানের অধীনতার কথা বলেছেন, ব্যাকরণের নয়। সুতরাং তিনি বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণের অপর দুটো উদ্ধৃতি থেকে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে : ১. "সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।" ২. এরূপ (দীর্ঘ সমাসবদ্ধ) পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য মতে ব্যবহারে আসে না।" এমনকি, অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকেও সংস্কৃত রীতির অনুসরণ বলে আখ্যাত করা চলে না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় না, সন্ধি ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ হয়েই পদ্যে ও গদ্যে ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় দুয়ের অধিক শব্দে সন্ধি বা সমাস সাধারণত হয় না। সুতরাং বাঙলাকে সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত করা চলে কিন্তু সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুগত করা সম্ভব নয়।

এসব দেখেশুনেই রামমোহন তাঁর রচনাবলীতে, মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকার কোনো কোনো কুসুমে, কালীপ্রসন্নসিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য়, বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি'তে, প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলালে', বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' বাঙলা গদ্যের একটা বিশিষ্টরূপ দানের প্রয়াস পেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিপূর্বেও সহজিয়াদের 'জ্ঞানাদি সাধনা,' গোলক শর্মার 'হিতোপদেশ', কেরীর 'ইতিহাসমালা', গৌরীকান্তের 'কামিনী কুমার', রজীব লোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', প্রমথ নাথ শর্মার 'নব বাবুবিলাস', ও 'নববিবি বিলাস', বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাপ্ত 'রূপকথা', (ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত), রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত', তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈসপের গল্পাবলী', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা', রামকিশোর তর্কালঙ্কারের 'হিতোপদেশ', ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থে ও মার্সম্যান, জোন্স, ভরস্টার উইলকিন্স প্রমুখ সাহেবদের ভাষায় সংস্কৃতানুগত্যের নিদর্শন দুর্লক্ষ্য। ইতিপূর্বেকার চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবিজের ভাষায় ব্যতীত এ সময়কার সাহিত্যিক রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্যও দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু 'প্রতাপাদিত্য চরিতে' মাত্রাতিরিক্ত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কেরী প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের জন্যে ও রাষ্ট্রীয় কারণে জনসাধারণের সহজবোধ্য রীতির যে পক্ষপাতী ছিলেন, সে-যুগের ইতিহাস তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। অতএব, সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতগণের সৃষ্ট ভাষা বাঙলাদেশে স্থায়ী হয়নি।

এ পর্যন্ত যা বললাম তাতে বোঝা যাবে বাঙলাভাষার গদ্যে ও পদ্যে একটা নিজস্ব রীতি বা শৈলী ছিল। তাতে মাত্র দুবার বিপর্যয় আসে—একবার দোভাষী রীতির প্রচলনে, আর একবার সংস্কৃত ব্যাকরণানুগ গদ্য রচনার ফলে। সৌভাগ্যবশত কোনোটাই স্থায়ী হয়নি।

প্রাগুক্ত গ্রন্থসমূহের ভাষায় গ্রাম্যতাদুষ্ট (Slang) শব্দ আর কিছু আরবি-ফারসি শব্দও রয়েছে, কিন্তু সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নেই। অপরিহার্য রূপে কয়েক হাজার আরবি-ফারসি শব্দ বাঙলাভাষায় চালু আছে। আরো দু-দশটা শব্দ হয়তো আসবে কিন্তু তা প্রয়োজনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবেই আসবে, জোর করে চালু করলে চলবে না।

বিদেশাগত মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ঘরে তুর্কী, দপ্তরে ফারসি, মসজিদে আরবি এবং সামাজিক ব্যবহারে আরবি-তুর্কী-ফারসি মিশ্রিত হিন্দুস্তানী ভাষা ব্যবহার করতেন। তাই মুসলমান আমলে যেমন ব্যবহারিক ও দরবারি জীবনে আরবি-ফারসি-তুর্কী শব্দ ঘরোয়া ও পোশাকি কথায় প্রতিশব্দ বা পরিভাষার অভাবে অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, ইংরেজ আমলেও তেমনি আমাদের কথাবার্তায় অসংখ্য ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ক্রমে ক্রমে পরিভাষা সৃষ্টি করে বা সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহ করে আমরা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার সংকুচিত করেছি, অন্তত সাহিত্যের ভাষায় আমরা পারতপক্ষে ইংরেজি ব্যবহার করিনে। হাসপাতালে Admission নেওয়া, স্কুল-কলেজে পড়া, Examine দেওয়া, পাস করা, Refer করা, Report বা Return দেওয়া, Graduate হওয়া point বলা, Suggestion নেওয়া প্রভৃতি আজো শিক্ষিত বাঙালির ঘরোয়া কথাবার্তার ও চিঠিপত্রের ভাষার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সাহিত্যে এদের যে-পরিভাষা গ্রহণ করেছি, তার একটাও বাঙলা বা দেশী শব্দ নয়—সবগুলোই সংস্কৃত। যেমন ভর্তি, পরীক্ষা, স্নাতক, প্রবেশিকা, উত্তীর্ণ, বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। এমনকি আরবি-ফারসি ভাষার ঐতিহ্যবাহী মুসলমানদের সৃষ্ট পরিভাষাও আরবি-ফারসি নয়, বরং সংস্কৃত। এখন যেমন অসাহিত্যিক বাঙালি জনসাধারণ কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে প্রায় প্রতি বাক্যে দু-একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে, তেমনি পূর্বে এরূপক্ষেত্রে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করা হত। এখনকার যুগের জনসাধারণের কথাবার্তার বা চিঠিপত্রের ভাষা যেমন সাহিত্যে স্থান পায়নি, তেমনি তখনকার যুগেও মিশ্রভাষাও সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারেনি, তার প্রমাণ আমাদের সেকালীন পদ্যসাহিত্য। যে-সব আরবি-ফারসি বা ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ বাঙলা-সংস্কৃতে পাওয়া যায়নি অথবা পরিভাষা সৃষ্টি সম্ভব হয়নি সেগুলো এখনও আমাদের সাহিত্যের ভাষায় চালু রয়েছে এবং খুব সম্ভব থাকবেও।

সুতরাং চিঠিপত্র বা দলিল-দস্তাবিজের অসাহিত্যিক ভাষার দ্বারা কোনো ভাষার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যাওয়া অসমীচীন। অতএব কেরী-বিদ্যাসাগরী প্রচেষ্টার পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি মিশ্রিত হবার প্রবণতা লাভ করেছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা তথ্যভিত্তিক নয়। এ যুগে কেউ বলে যে বাঙলা ভাষা ইংরেজি শব্দের দ্বারা পুষ্ট ও সুষ্ঠু হবার প্রবণতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাচ্ছে, তা যেমন ভুল, পূর্ব-ধারণায়ও রয়েছে তেমনি ধরনের অসঙ্গতি। বস্তুত বিদেশী বিভাষার শব্দ গ্রহণ যে-কোনো ভাষার দীনতারই পরিচায়ক। সগোত্রীয় সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করে বাঙলা সে-দীনতা ঘুচিয়েছে; কাজেই বিদেশী শব্দে তার প্রয়োজন সামান্য।

২

এবার আঠারো শতকের শেষার্ধে আমাদের জাতীয় অধঃপতন যুগে উর্দু-বাঙলা মিশ্র শৈলীতে রচিত দোভাষী পুথি সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান-লব্ধ ধারণা পেশ করে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

নবাব সরফরাজ খান রাজ্যশাসনে উদাসীন ছিলেন। তাঁর শাসন-শৈথিল্যের সুযোগে রাজ্যের প্রধানগণ উচ্ছৃঙ্খল, লোভী ও আত্মপরায়ণ হয়ে উঠে। খলশ্রেষ্ঠ জগৎ শেঠের নেতৃত্বে স্বার্থপর অমাত্যগণ উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদার আলীবর্দী খাঁকে বসালেন বাঙলার মসনদে। এঁদের সহায়তায় নবাবী লাভ হল বলে তিনি এঁদের মন যুগিয়ে চলতেন। ফলত এসব স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী সামন্তগণই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা। তদুপরি বর্গীয় উৎপাত তো ছিলই। শাসক যেখানে দুর্বল, শাসিতগণ সেখানে যথেচ্ছাচারী হবেই। সিরাজদ্দৌলা আমীরদের মন ও মান রক্ষা করে চলতে জানলেন না বা পারলেন না। কাজেই পলাশীতে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ঘটল।

মানুষ চিরকাল আদর্শপ্রবণ ও পরানুকারী। ধনে-জনে-মানে যারা প্রধান, জনজীবনে তাদের আচার-আচরণই অনুকৃত হয়। ফলে এ সময় দেশব্যাপী স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা এবং ভোগ ও নগ্ন লালসার স্রোত বয়ে চলেছিল। এ কদর্যতার স্রোত অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রবেশ করেছিল সাহিত্যেও। এজন্যেই তারল্য, কৃত্রিমতা, বর্ণনায় নির্জীবতা—অলঙ্কারের ঘটা ও ছন্দের বহু বিচিত্র সম্ভার সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের রচনাকে করেছে কলঙ্কিত। ভারতচন্দ্রের পরে বাংলার রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আরো খারাপ—আরো ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল, সে-প্রমাণ শুধু ইতিহাস থেকেই নয়, সাহিত্য থেকেও পাচ্ছি। আঠারো শতকের এই শাসনতান্ত্রিক শৈথিল্যের, রাষ্ট্রিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের এবং নীতি-নিষ্ঠাহীন বাঙালির অবনতি-প্রবণ সমাজের বিকৃতির অভিব্যক্তি স্বরূপ আমরা হিন্দু রচিত 'কবি গান', 'পীর পাঁচালী' এবং মুসলমান রচিত 'দোভাষী পুথি'গুলো পাচ্ছি। হিন্দুকবি রচিত পীর পাঁচালীর অনেকগুলোই দোভাষী পুথির অন্তর্গত। নির্বীর্য বাঙালির সামাজিক রুচিবিকৃতি ও নৈতিক অধঃপতনের দিনে মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সুযোগে নতুন বন্দর কলকাতা এবং পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানের গড়ে উঠে যথাক্রমে উক্ত দু-ধারার সাহিত্য। হিন্দুদের যেমন ধর্মসংপৃক্ত কবিগান, সত্যনারায়ণ পাঁচালী, মুসলমানদেরও তেমনি হামজা-হোসেন-হানিফা প্রভৃতি জেহাদ কাহিনী ও পীর-দরবেশের উপকথা নিয়ে গড়ে উঠে এ সাহিত্য। তখন রাজশক্তির লীলাভূমি কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও এদের সন্নিহিত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানদের আধ্যাত্মিক দেউলে ভাবও প্রকট হয়ে উঠে। মানুষ যখন উচ্চ নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ হারিয়ে ফেলে তখন আত্মবিশ্বাস রক্ষা করে আত্মনির্ভর হতে পারে না। তখন সে হয়ে পড়ে একান্তভাবে দৈবনির্ভর, ভীরু এবং শক্তি-পূজক। এজন্যে এসময় এখানকার হিন্দুদের মধ্যে দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ, কালুরায় ও ধর্মঠাকুরের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, মুসলমানদের মধ্যেও সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী, মোবারক গাজী, বনবিবি প্রভৃতি মানবভাগ্য-নিয়ন্তা বলে শ্রদ্ধা-শিরনি পেতে থাকেন। রাজধানীর অধিবাসীরাই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দুটোই সমভাবে ভোগ করে। বাঙলার কলঙ্কিত দুর্দিনের সাক্ষ্যও রেখে গেছে এরাই।

ইতিপূর্বেও পালদের পতন-যুগে আমরা বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজ যান (তন্ত্র ও যোগ) প্রভৃতি পেয়েছি। সেন-রাজাদের দুর্দিনে পেয়েছি একদিকে চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি, অপরদিকে শেখশুভোদয়া, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি। (রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হল বৈষ্ণব মত)। পাঠান পরাজয়ে পেলাম ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড়গাজী, সত্যপীর প্রভৃতি আর মুঘল-শক্তির পতনে পেলাম বিদ্যাসুন্দর, কবি-গান, পুথিসাহিত্য। এ হচ্ছে স্রোতে ভেসে যাওয়া লোকের তৃণ ধরে বাঁচবার প্রয়াস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবাবী আমলে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা শহরে, শহরতলীতে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সিপাহী, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং আরো নানা পেশার অবাঙালি লোক-লস্কর এসে বসবাস করেছে ! উর্দু-হিন্দি তথা হিন্দুস্তানীই ছিল তাদের মাতৃভাষা, স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে ও দেশীলোকের প্রভাবে বিকৃত হয়ে গেল তাদের বুলি। ঐ ভাষা এদেশে অবজ্ঞার্থে খ্যাত হল 'খোট্টাভাষা' নামে। এসব খোট্টাভাষী বিদেশীরা প্রাত্যহিক জীবনের গরজে এদেশীয় লোকের ভাষাও আয়ত্ত করল অপটুভাবে। ফলে যে-কারণে [অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ শব্দসম্পদ আয়ত্ত করতে না পারার ফলে] ফরাসি-হিন্দির মিশ্রণে উর্দুর সৃষ্টি হল, অনুরূপ কারণে খোট্টাদেরও একটি বাঙলাভাষার উৎপত্তি হল। এর বিশেষত্ব হচ্ছে বাঙলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ এবং অপরিমেয় হিন্দুস্তানী শব্দের ব্যবহার ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ। এ ভাষা এখনো চালু রয়েছে উক্ত শহরগুলোতে।

হিন্দুস্তানী ও বিদেশাগতদের পারস্পরিক অক্ষমতার ফলে ফারসি-হিন্দি মিশ্রিত যে ভাষা চালু হল Linguafranca হিসেবে, তা ফারসি অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে নতুন নামে আলাহিদা ভাষারূপে দাঁড়িয়ে গেল। উর্দুর (তাঁবু) ভাষা পরিণামে কয়েক কোটি লোকের ঘরোয়া বুলিতে পরিণত হল। কালে সাহিত্যের বাহন হবার গৌরবও অর্জন করেছে উর্দু।

এভাবে দক্ষিণভারতেও সৃষ্টি হয়েছে দাখিনী উর্দু। খোট্টা বাঙালিরাও হয়তো ফারসি হরফে তাদের মিশ্রবাঙলা লিপিবদ্ধ করে উর্দুর মতো পৃথক একটা ভাষা তৈরি করতে পারত; কিন্তু বাঙলা দেশে বিদেশাগত হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাল্পতার দরুন এবং বাঙলা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি কিংবা এর জন্য নওয়াবী আমল দীর্ঘায়িত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে আরবি-হরফে অনুলিখিত যে-কয়টি বাঙলা পুথি মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলো দোভাষী পুথি নয়, সুতরাং 'একে উর্দুর মতো আলাহিদা ভাষা' সৃষ্টির প্রয়াস বলে মনে করবার হেতু নেই। আরবি হরফে বাঙলা লিখবার অন্য স্থানীয় ও পারিবেশিক কারণ ছিল। ওগুলো বাঙলা বর্ণজ্ঞানহীন মাদ্রাসা-শিক্ষিত মৌলবাদীদের জন্যই প্রতিবর্ণীকৃত। সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

সুতরাং খোট্টা বাঙালির শহুরে বাঙলায় যে-সাহিত্য পলাশীযুদ্ধের পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রচিত হতে থাকে, তার সাথে বাঙালির কোনো যোগ ছিল না। চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকে বিশুদ্ধ বাঙলায় যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছিল এরা সে ভাষাশৈলীই সাম্প্রত কাল পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছে। দোভাষী পুথির কোনো প্রভাব যে পল্লীবাসী মুসলমানদের উপর পড়েনি, তার প্রমাণ এদের রচিত পুরোনো বা নতুন গানে, গাথায়, ছড়ায়, রূপকথায়, কাহিনী-কাব্যে সে ভাষার কোনো নিদর্শন নেই। আমাদের উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে 'হারামণি, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা' 'প্রবাদ-সংগ্রহে' এবং পাঁচালিগুলোতে।

পল্লী অঞ্চলে দোভাষী পুথি বহুলপঠিত হত বলে বিশ্বাস করবারও কারণ নেই। চকবাজার ও শহুরে বস্তিতে এর উদ্ভব ও প্রচার সীমাবদ্ধ বললে সত্যের বিশেষ অপলাপ হবে না। উনিশ-বিশ শতকের দোভাষী উপাখ্যানগুলো কারা, কাদের আদেশে, কোনো প্রেরণায় রচনা করেছেন ও করছেন তার উল্লেখ অনেক পুথির সমাপ্তিভাগে রয়েছে—বটতলার প্রকাশকের আদেশ, আর্থিক প্রেরণা এবং খোট্টা পাঠকদের চাহিদাই রয়েছে এগুলো রচনার মূলে। অতএব এ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির আন্তর বা বাহ্য যোগ কোথায় ? অবশ্য বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত ছাপা পুথির অভাবে গাঁয়ের লোকেরাও দোভাষী পুথি পড়েছে—শুনেছে কিন্তু সে-ভাষা অনুকরণ করেনি। কাজেই দোভাষী পুথি সাহিত্যের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের প্রশ্নই অবান্তর। কল্যাণকর ইসলামী আবেশ বা মুসলিম ঐতিহ্যের আবহ পুথিতে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। দোভাষী পুথির আদি রচয়িতা ফকির গরীবউল্লাহ্ স্বয়ং ছিলেন পীর-পূজারী। দেবগুণাধিকারী বড় খান গাজী ছিলেন তাঁর জীবন-নিয়ন্তা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মুঘল আমলে আগত ধনিক ও বণিক অভিজাত মুসলমানগণের ঘরোয়া ভাষা আজো উর্দু, এবং বাঙালি মুসলমানদের মুখপাত্র হয়ে তাঁরাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রচার করেছিলেন যে, বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর রায়মঙ্গলে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে সংলাপে বাস্তবরূপ দান করবার বাসনায় সত্যপীরের মুখে হিন্দুস্থানী ভাষা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র 'রায়মঙ্গলে'র সে দৃষ্টান্ত স্মরণ করেই লিখেছেন :

মানসিংহ পাদসায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবি পারসী হিন্দুস্তানী ॥
পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥

ভারত চন্দ্র-রামপ্রসাদ ছাড়া বিদ্যাপতি, শ্রীকবি বল্লভ, কৃষ্ণহরি দাস প্রভৃতি সত্যনারায়ণ পুথি-রচয়িতাগণ এবং 'জঙ্গনামা' রচয়িতা রাধাচরণ গোপ তাঁদের পাঁচালিতে মিশ্রভাষা প্রয়োগ করেছেন। বলা বাহুল্য, এঁরাও কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলের লোক।

কৃষ্ণরামদাসের হিন্দির নমুনা :

শোন্‌তে হো দক্ষিণরায় এছা দাগাবাজী।
বাঁধকে নে আনেছে তবে হাম গাজী ॥
কালানল শেরকু তোড়নে কহে কান।
সিতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান ॥

বিদ্যাপতির রচনা :

হইআ বান্দার বান্দা নুঙাইয়া শির।
বন্দিব বড় খাঁ গাজী পীর দস্তগীর॥
একদিলে বন্দিব দরদস্ত পীর।
বড় খাঁ গাজী যেই করিল জাহির ॥

শ্রীকবি বল্লভের রচনা :

শুনহ বেইমান রাজা বাত কহুঁ তোরে।
রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে ॥
সাত হাজারের মার্তা লইয়াছে ভাঁড়্যা।
মহল ভিতরে নাচে সাতশত ন্যাড়া॥

জঙ্গনামা রচয়িতা রাধাচরণ গোপের রচনা :

ইলাহি কহেন জীবরিল কর আর কি।
আছামান জমীন ডুবাইছেন রসুলের ঝি ॥
সিতাব করিয়া এখন দুনিয়াকে যাও।
বিবি ফাতেমাকে তুমি যাইঞা সমজাও ॥

সম্ভবত এঁদেরই অনুকরণে গরীবউল্লাহ্ ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন। দ্বিতীয় কবি মুহম্মদ এয়াকুব (?) গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত 'হোসেন মঙ্গল বা জঙ্গনামা' সমাপ্ত করেন ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে। তৃতীয় কবি সৈয়দ হামজা ১৭৮৯-১৮০৫-৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে মাত্র এই তিনজন দোভাষী পুথি লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। উনিশ শতকে, বিশেষ করে বিশ শতকে প্রায় শতাধিক কবি বটতলার প্রকাশকদের অনুরোধে অর্থের বিনিময়ে নানা বিষয়ক পুথি রচনা করে দিয়েছেন। এঁদের অনেকেই পেশাদার লেখক। তাই পুথিগুলো প্রায় সবদিক দিয়েই বিশেষত্ব বর্জিত। পদ্যে কোনোরকমে কাহিনী বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে মাত্র। বহুগ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে এঁদের মধ্যে উড়িষ্যার অবদুল মজিদ খাঁন ভূঁইয়া, জনাব আলী, মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আবদুর রহিম, মুহম্মদ মুনশী, শেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়েজুদ্দিন, মনিরুদ্দিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এবং এঁদের অনেকেরই নিবাস দক্ষিণরাঢ়ে তথা হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগনাঞ্চলে।

এসব দোভাষী পুথি কাদের জন্যে লিখিত হয় তার আভাস পাওয়া যাবে কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে।—কবি মালে মুহম্মদ তাঁর 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' পুথি রচনার কারণ স্বরূপ বলেছেন:

এই পুথি সায়ের ছিল আগুন যমানায়
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হৈল তৈয়ার ॥
পড়িতে বুঝিতে লোকে বড়ই কাছেল্লা।
তেকারণে অধীন করে চলিত বাঙ্গালা।
রসিক লোকের দেখে বহুত কাগতি।
বারশও পঁয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুথি ॥

বারোশ পঁচাত্তর বাঙলা সনে হুগলী সন্তোষপুর নিবাসী কবি বেলায়েতকে তাঁর 'ফেসানায়ে আজায়েব বা আঞ্জুমান আরা জানে আলম' রচনাকালে তাঁর বন্ধু ভাষা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এরূপ :

বোলচাল সব তুমি লেখ আমাদের।
সকলের বুঝিতে পারে কী কহিব ফের ॥
রঙ্গিন করিতে তুমি এই যে কাহিনী।
শক্ত শক্ত লভ্জো কিছু না লেখ আপনি ॥
এমত না হয় যেন আমা সবাকায়,
মানে পুছে ফিরি মোরা পণ্ডিত সবায় ॥

কলকাতা শহরের কড়োয়া নিবাসী কবি শেখ আমীরুদ্দিন 'মনসুর হাল্লাজ' পুথির প্রারম্ভে লিখেছেন :

মাসাএখ মনসুরের কেচ্ছা ফার্ছিতে।
লিখিয়াছিলেন কোনো ফাজেল লোকেতে।
সেই তো রেছেলা ফের এছলামি বাঙ্গালায়।
লিখিতে এরাদা হইল খাহেস আমায় ॥
বাঙ্গালা লোকের কেচ্ছা শুনিতে বাসনা।
তেকারণে বাঙ্গালাতে করিনু রচনা ॥

এতেই বোঝা যাবে এঁরা কোনো বাঙালির জন্যে কোনো বাঙলায় পুথি রচনা করেছেন। আজ পর্যন্ত যাঁরা দোভাষী পুথি রচনা করে চলেছেন, যাঁরা এ-পুথির প্রকাশক আর যাঁরা পাঠক, তাঁদের সঙ্গে যে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙালির সাংস্কৃতিক ও ভাবগত কোনোপ্রকার সম্পর্ক নেই তা কে না স্বীকার করবেন?

এসব পুথি দেখেই সম্ভবত উনিশ শতকের হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমান লেখকের রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে—'মুসলমান হইয়া এমন বিশুদ্ধ বাংলা লিখিয়াছেন' ইত্যাদি উক্তি করতেন। অবশ্য দোভাষী পুথির অধিকাংশ উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ। বাঙলা তর্জমায় উর্দুভাষার প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গি রক্ষা করার ফলে কবিগণের পক্ষে অনুবাদ কার্য সহজ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পুথিকারদের কেউ কেউ উর্দু-হিন্দি শব্দ এতই বেশি প্রয়োগ করেছেন যে, তাঁদের রচনার কোনো কোনো অংশ বিকৃত হিন্দুস্তানী বলে ভ্রম হয়।

এখানে আমরা 'ব্রজবুলি' নামক কৃত্রিম ভাষার কথা স্মরণ করতে পারি। মৈথিল ভাষার অনুকরণে বৈষ্ণব যুগে (১৬১৭ শতকে) ব্রজবুলি (বাঙলা-মৈথিল মিশ্রিত) ভাষায় পদ রচনার রীতি দেখা দেয়, কিন্তু কৃত্রিম বলে তা বাঙলা সাহিত্যে টিক্‌তে পারেনি। শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো সময়েই বাঙলাদেশে এর বহুল প্রচলন হয়নি। কেবল গোবিন্দ দাসই মনেপ্রাণে সাধনা করেছিলেন ব্রজবুলির। ফলে তাঁর রচনা (পদাবলী) হৃদয়াবেগহীন বাক্‌সর্বস্ব বাক্‌চাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে—ভাষার ঐশ্বর্য ঘুচাতে পারেনি ভাবের দীনতা। ভাষার জাদুকর হয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তিনি আন্তরিকতার অভাবে কবিপ্রাণতায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের সমকক্ষ হতে পারেননি। অথচ মৈথিল ভাষা (তথা ব্রজবুলি) ছিল বাঙলা ভাষার বৈপিত্রেয় বোন—সহোদরা। এজন্যেই এ-যুগে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীও অনুকৃত হয়নি। কৃত্রিম ভাষায় হালকা রচনার বিলাস করা চলে, কিন্তু সারবান মহিমময় সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। অক্ষম লোকের কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগের ফলে পুথি-সাহিত্য সৌন্দর্য ও শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে। গাম্ভীর্যের কথা তো ওঠেই না। বাঙালির 'ব্রজবুলি'-চর্চার পরিণতি থেকে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। ইতিহাসের ইঙ্গিত অবহেলার ফল কখনো শুভ হয় না।

বৈষ্ণব আমলের কৃত্রিম 'ব্রজবুলি' টেকেনি, পুথির কৃত্রিম মিশ্ররীতিও কোথাও স্বীকৃতি পায়নি।

এখানে ভাষা সম্বন্ধে দুটো কথা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোনো ভাষায় বিদেশী শব্দ আসে দুপ্রকারে। প্রথমত. নতুন বস্তু নির্দেশক হয়ে, দ্বিতীয়ত নতুন ভাব প্রকাশক রূপে। বাঙলা দেশে যে-বস্তু ছিল না বা নেই, সে-বস্তু যদি দেশে আসে, তবে তার নামবাচক বিদেশী বিভাষার শব্দগ্রহণ করতে বাধ্য হই আমরা। দ্বিতীয়ত বাঙালির মন-মননে যে-চিন্তা বা ভাব পূর্বে জাগেনি—যা ব্যক্ত হয়নি, সে-সব ভাব-চিন্তাব্যঞ্জক শব্দও বিদেশী ভাষা থেকে ধার না করে উপায় নেই আমাদের। অকারণে মূল-না-জানা ঐতিহ্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন কতগুলো বোবা শব্দ এনে নিজের মুখের বুলিকে—সাহিত্যের ভাষাকে জড় করে তুলে লাভ কী? বিশেষত ঋণমাত্রেই দৈন্যের পরিচায়ক।

তবে রসবৈচিত্র্য দান করবার জন্যে এক-আধটা চরিত্র-মুখে মিশ্রভাষা বা প্রাদেশিক 'বুলি' বলানো সমর্থন করা যায়। এ রীতিও প্রচলিত আছে—যেমন নাটক, গল্প ও উপন্যাসের সংলাপে দেখা যায়। এতে অবশ্য গভীর ও গুরুতর ভাব প্রকাশ করা চলে না। চরিত্রকে হাস্যাস্পদ করে তোলাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিদেশী কাহিনী বর্ণনার জন্যে বিদেশী ভাষাও আমদানি করলে স্বদেশী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের দোভাষী পুথিও তাই শালীন ভাষায় শালীন সাহিত্য বলে শিক্ষিতসাধারণের স্বীকৃতি পায়নি। যারা বাঙলাকে সংস্কৃতানুরূপ বা ফারসি-ঘেঁষা করতে চান, তাঁরা বাঙলাভাষাকে রেহাই দিয়ে সহজেই যথাক্রমে হিন্দি বা উর্দুকে বরণ করে নিতে পারেন, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়।

অবশ্য যে-পটভূমিকায় কাহিনী বিবৃত হবে, তার স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বস্তুবাচক বা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ শব্দপ্রয়োগে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। য়ুরোপীয় কথা বর্ণনায় পদ্ম, চকোর, খঞ্জন আঁখি, মেঘবরণ কেশ, আলতা-রাঙা পা, কাজল-কালো চোখ প্রভৃতি কেউ আশা করে না। তেমনি ইরানি কাহিনীতে সবাই গোলাপ, বুলবুলি, সুর্মা, দ্রাক্ষা প্রভৃতির প্রত্যাশা করে। এতে ভাষা- বিকৃতির আশঙ্কা কেউ করে না।*

* ইরানী ভাষায় ইসলামধর্মের মৌলিক শব্দেরও অনুবাদ হয়েছিল—যেমন : আল্লাহ—খোদা, সালাত-নামাজ, সিয়াম—রোজা, জান্নাত—বেহেস্ত, জাহান্নাম—দোজখ, মলক—ফিরিস্তা ইত্যাদি। ইরানের মাধ্যমে এগুলো এদেশেও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইমানের ভিত্তি নষ্ট হল বলে কেউ ভাবেনি। মুসলিম তমদ্দুনও এতে খর্ব হয়েছে বলে কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুথি সাহিত্যের ইতিকথা

১

'পুস্তিকা'র বিকৃতিতে 'পুথি' শব্দের উদ্ভব। নাসিক্য উচ্চারণে হয় 'পুঁথি'। ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার আগে গ্রন্থমাত্রই 'পুথি' অভিধায় চিহ্নিত হত। বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত অথবা জ্যোতিষ-বৈদ্যক-গণিতশাস্ত্রের গ্রন্থ কিংবা পদ্মাবতী-সতীময়না-সয়ফুলমূলক প্রভৃতি সর্বপ্রকারের গ্রন্থেরই সাধারণ নাম ছিল পুথি। অতএব পুথি ছিল সেকালের গ্রন্থের বা একালের 'বই'-এর প্রতিশব্দ।

ছাপাখানার বহুল ব্যবহার এবং প্রসারের ফলে এদেশে ছাপাবই 'গ্রন্থ', 'পুস্তক' কিংবা 'বহি' নামে অভিহিত হতে থাকে, আর হাতে-লেখা পুরোনো গ্রন্থগুলো 'পুথি' অভিধায় নতুন তাৎপর্য লাভ করে। যেমন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছাপাকপি হল পুস্তক, গ্রন্থ কিংবা বহি, এবং এর হাতে-লেখা পুরোনো প্রতিলিপি অভিহিত হলে 'পুথি' নামে। এমনি করে, পুথি হয়ে উঠল ইংরেজি Manuscript-এর বাঙলা পরিভাষা। হিন্দুসমাজে নতুন-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিধা-নিরূপণ পর্ব এখানেই শেষ হল। যদিও সাধারণ অর্থে Manuscript বা Script নামে যে-কোনো আধুনিক রচনার পাণ্ডুলিপি নির্দেশ করাও অবিহিত নয়।

কিন্তু মুসলমান সমাজে নাম-নিরূপণের জের চলে ১৯৪০ সাল অবধি। তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত ১৮৫০-এর পরে বটতলার মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বহু মুসলমান এগিয়ে আসেন। মুসলমান সমাজে তখনো ইংরেজিশিক্ষার প্রসার ঘটেনি বলে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কাজেই স্বল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের চাহিদা মেটানোর জন্যে তারা মধ্যযুগের সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় রসে ও আঙ্গিকে রচিত ফরমায়েশি গ্রন্থ ছেপে বাজারে ছাড়তে থাকেন। আবার একই গ্রন্থ শায়েরের নাম পালটে তথা ভণিতা বদল করে ছাপানো অর্থলোভী প্রতিযোগী প্রকাশকদের পেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ছাপাগ্রন্থেও 'ছহি বড়—পুঁথি' কথাগুলো মুদ্রিত থাকত। তাই এই ছাপাপুথি আর হাতে-লেখা পুরোনো প্রতিলিপি বা পাণ্ডুলিপির পার্থক্য নির্দেশক শব্দ নির্মাণের কিংবা চয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে ছাপাপুথি অর্থে 'পুঁথি' আর হাতে-লেখা পুথি বলতে 'কলমীপুঁথি' নাম চালু হল। আবার 'বটতলার পুথি' বলতে মধ্যযুগের এবং মধ্যযুগীয় ধারার যাবতীয় ছাপাগ্রন্থকেই নির্দেশ করে।

তাছাড়া অবিমিশ্র বাঙলায় রচিত পুথি এবং মিশ্রভাষারীতিতে লিখিত পুথির পার্থক্য বোঝানোর জন্যে শেষোক্তরীতির পুথিগুলোকে 'দোভাষী পুথি' নাম দেয়া হয়। এই নাম কবে থেকে চালু হল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না—তবে মুনশী রিয়াজউদ্দীন আহমদ ও মীর মশাররফ হোসেনকে 'দোভাষী পুথি' কথাটি যেভাবে ব্যবহার করতে দেখি, তাতে মনে হয় উনিশ শতকের শেষ দশকেও তা নিত্য উচ্চারিত নাম। অবশ্য পাদ্রী লঙ এর নাম দিয়েছিলেন 'মুসলমানী বাঙলা—মাঝি-মাল্লার ভাষা।' ক্রুমহার্ট, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ মৃত ও জীবিত অমুসলমান বিদ্বানেরা এই নামেই এই রীতির উল্লেখ করেছেন, আজো করেন।

২

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে কাজী দৌলত, আলাউল, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, আবদুল হাকিম, হায়াত মাহমুদ প্রভৃতির অবিমিশ্র বাঙলায় রচিত কাব্যগুলোর প্রকাশনার আগ্রহ দোভাষীরীতি-প্রিয় প্রকাশকদের কমে যায়, সম্ভবত পাঠক-শ্রোতা মহলেও এগুলো জনপ্রিয়তা হারায়। এর অনুমিত কারণ দুটো। এক. এসব কাব্যের কলেবর স্থূল, ভাষা পরিস্রুত ও সংস্কৃতঘেঁষা, ভাব ক্ষেত্রবিশেষে

amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুরূহ, এবং অলঙ্কার বৈদগ্ধ্যাঙ্কিত। দুই. দোভাষীরীতি-প্রিয় প্রকাশকরা তর্জমা নয়—উর্দু রোমান্সগুলোর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পদ্যায়ন প্রকাশ করে ছাড়লেন বাজারে। পাঠক ও শ্রোতারা বিকল্প পাঠ্য-উপকরণের অভাবেই হয়তো নতুন রীতির পুথিগুলো কিনতে বাধ্য হল, কিংবা দোভাষী পুথির আদর বেড়ে গিয়েছিল তাদের কাছে। কেননা এগুলো অবসরের এক বৈঠকেই শেষ করা সম্ভব, ভাবের দুর্বোধ্যতাও ছিল না, ছিল না শব্দের দুরূহতা। (কারণ শতেক হিন্দুস্তানী শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগেই এসব পুথি রচিত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রয়োগের আনুমানিক হার শতকরা ৩২টি)। তারপর এই আদলে নানা বিষয়ে কয়েকশত গ্রন্থ রচিত হয়েছে গত দেড়শ বছরের মধ্যে। আলাউল প্রভৃতির কাব্যগুলোকে বাজারছাড়া করে এগুলোই।

গণচাহিদা মিটানোর জন্যে রচিত প্রাকৃত-জনের এ সাহিত্য যখন নগর-গ্রামের সর্বত্র চালু, তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক জীবনচেতনা প্রবল হয়ে উঠে বাঙালি মুসলিম সমাজে। এই শতকের চতুর্থদশকেই তার শুরু। মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য, মহাজনি, জমিদারি ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজের একাধিপত্য এবং সুদে-ঘুষে হিন্দু-সাধারণের সাচ্ছল্য মুসলমানদের ক্ষোভ, ঈর্ষা ও দারিদ্র্যদুঃখ বৃদ্ধি করে।

অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে এই অসম প্রতিযোগিতা হৃতসর্বস্ব পরাভূত মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনা করে তীক্ষ্ণ আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়ে ওঠে তীব্র। তখন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য-সূত্র আবিষ্কারের প্রেরণাবশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে এবং 'আজাদ' পত্রিকা-অফিসে গড়ে ওঠে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এখানেই শুরু হয় পুথির চর্চা। তাঁরাই মুসলিম রচিত আধুনিক সাহিত্য থেকে দোভাষী পুথির পার্থক্যজ্ঞাপক 'পুথি-সাহিত্য' নামটি চালু করেন। এর প্রয়োজন ছিল, কেননা এ ভাষাকেই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা তথা ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা বলে প্রচার করলেন তাঁরা ! কাজেই 'দোভাষী পুথি' বলার আর উপায় ছিল না, সেক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন ও উদ্দেশ্য দু-ই হত ব্যর্থ !

সেই থেকে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে 'পুঁথি সাহিত্য' বলতে মুসলমানেরা দোভাষী পুথিকেই নির্দেশ করে। অভিধার দিক দিয়ে 'পুঁথি সাহিত্য' কথাটি অর্থহীন। কেননা, 'বই সাহিত্য' যেমন হয় না, 'পুথি সাহিত্য'ও হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এটি এখন একটি যোগরূঢ় বিশেষ নাম। সেজন্যে আর আপত্তি করা চলবে না। আজ 'পুথি সাহিত্য' আর 'দোভাষী পুথি' সমার্থক এবং একটি অপরটির প্রতিশব্দ।

ইদানীং 'দোভাষী পুথি' নামটার ব্যবহার বেড়ে গেছে। কেননা যে প্রয়োজনে এ নামটি পরিবর্তিত বা লোপ করবার প্রয়াস ছিল, পাকিস্তানোত্তর যুগে তা অনুপস্থিত। কিন্তু এ রীতিকে 'দোভাষীরীতি' বলতে কোনো কোনো বিদ্বানের আপত্তি আছে। তাঁদের মতে তথাকথিত দোভাষীরীতিতে মিশ্রণ ঘটেছে আসলে,—আরবি-ফারসি-তুর্কী, হিন্দুস্তানী ও বাঙলা শব্দের—অতএব দ্বিভাষা নয়, অন্তত পঞ্চভাষার মিশ্রণ রয়েছে। কাজেই একে 'মিশ্ররীতি' আখ্যাত করাই যৌক্তিক।

কিন্তু তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়। কেননা এ-কথা আজকাল কেউ অস্বীকার করে না যে ভারতীয় ভাষায় কোনো আরবি শব্দই সোজাসুজি আসেনি, এসেছে ফারসির মাধ্যমে। ফারসি ও তুর্কী এদেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে শাসকদের প্রয়োগে ও প্রভাবে। ফারসি (কিছু তুর্কী) শব্দের আধিক্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা, আর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে হিন্দিভাষায়। এ দুটোর আদি সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্তানী এবং মুসলিম আমল থেকেই দিল্লী সাম্রাজ্যে Lingua Franca হিসেবে চালু ছিল এ ভাষা। এই হিন্দুস্তানী তথা উর্দুর সঙ্গে বাঙলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষীরীতি। অতএব, 'দোভাষীরীতি'ই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। যদি বলি : There stands a rickshaw in front of Gulistan restaurant in the Jinnah Avenue.—এ বাক্যে জাপানি, ফরাসি, গুজরাটি, ফারসি ও ল্যাটিন শব্দ থাকা সত্ত্বেও একে ইংরেজি বলে জানি ও মানি। শব্দের জাতিনির্ণয় কিংবা ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করা বক্তা কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রোতার সাধ ও সাধ্যের অন্তর্গত নয়। অপর ভাষার শব্দ আত্মস্থ করেনি, তেমন ভাষা জগতে নেই। কিন্তু তাতেই কোনো ভাষা মিশ্রভাষা হয় না। দোভাষীরীতিতে মিশ্রণ ঘটেছে বাঙলা ও হিন্দুস্তানীর। আর হিন্দুস্তানীতে আগেই মিশেছিল প্রচুর আরবি-ফারসি-তুর্কী শব্দ ফারসির মাধ্যমে। এখন বিদ্বানের বিশ্লেষণে যদি দোভাষীরীতির ভাষা অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট আরবি, ফারসি ও তুর্কীশব্দ বের হয়, তাতে এ রীতির নাম পালটানোর কারণ ঘটে না। রচনায় আরবি-ফারসি তথা বিদেশী শব্দের বাহুল্যই রচনাশৈলীকে 'দোভাষী' করে না, যদি তা-ই হত তাহলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ—সবাই দোভাষী শায়ের বলে পরিচিত হতেন। অতএব দোভাষী রীতির বৈশিষ্ট অন্যবিধ। একে 'মুসলমানী বা ইসলামী বাঙলা' কিংবা খিচুড়ি বাঙলা বলাও ঐ একই কারণে অসঙ্গত।

৩

সত্যনারায়ণ এদেশের লৌকিক দেবতা। মুসলিম প্রভাবেই এ দেবতার উদ্ভব। শাসিত হিন্দুশাসক মুসলমানের প্রীতি ও প্রসন্নদৃষ্টি লাভের বাঞ্ছাবশে এ দেবতা সৃষ্টি করেছে। মুসলমানেরা এঁকে পীরের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেনি। আসলে প্রমূর্ত 'সত্য'ই (Truth) সত্যনারায়ণ তথা সত্যপীর। সত্যপীরের পূজা-শিরনী উপলক্ষে এদেশের দুঃখী জনগণ এক মিলন-ময়দানে একত্রিত হতে চেয়েছে, খুঁজেছে দুর্যোগে-দুর্ভোগে যন্ত্রণায়-নির্যাতনে নিশ্চিত আশ্রয়,—জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা। সত্যনারায়ণ মূলত মুসলমান পীর, সে কারণে অবাঙালি,—এ ধারণা ছিল হিন্দুমনে বদ্ধমূল। তাই সতেরো শতকে কবি কৃষ্ণরামদাস যখন রায়মঙ্গল (১৬৮৬) রচনা করেন, তখন দক্ষিণরায়ের প্রতদ্বন্দ্বী বড় খাঁ গাজী এবং উভয়ের মান্যজন সত্যনারায়ণের উক্তিতে ভাঙা হিন্দুস্তানী ও বিকৃত বাঙলা ব্যবহার করেন তিনি। পাত্রপাত্রীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সংলাপের ভাষা প্রয়োগ নাটকের বিশেষ আঙ্গিক। কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গলে এই নাট্যরীতির অনুসরণ ছিল ! তাঁর প্রদর্শিত রীতি প্রায় নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন সত্যনারায়ণ পাঁচালির পরবর্তী রচয়িতারা। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যেও মাধবভাটের জবানিতে এমনি ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যখন মাধবভাট বিদ্যার পণের কথা ঘোষণা করেছে উত্তরভারতীয় রাজদরবারগুলোতে। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' খণ্ডেও মানসিংহ-জাহাঁগীরাদির সংলাপের ভাষা এমনি মিশ্র করে তৈরি। এখানে উল্লেখ্য যে কৃষ্ণরাম, ভরতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বিদ্যাপতি, রাধাচরণ গোপ প্রভৃতি হুগলী, বর্ধমান, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার লোক তথা বন্দর এলাকার অধিবাসী।

এভাবে দোভাষীরীতি হিন্দুকবিদের লেখনীপ্রসূত হলেও এর বহুল প্রচলন ও জনপ্রিয়তার জন্যে ফকির গরীবুল্লাহর (১৭৬০-৮০) প্রতিভা ও পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল। তিনিই প্রথম দোভাষীরীতি প্রয়োগে তাঁর সব-কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। একে তো তাঁর নিজের বুলি ছিল এ রীতির পরিপোষক, তার উপর ব্রজবুলির মাধুর্য আর উপযোগও হয়তো তাঁর অবচেতন প্রেরণার উৎস ছিল। তাঁকে প্রথম অনুসরণ করেন সৈয়দ হামজা (১৭৮৮—১৮০৫)। তারপরে মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, জনাব আলী, আবদুর রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মুহম্মদ মুন্শী, তাজউদ্দিন, দানিশ, আরিফ, রেজাউল্লাহ, সা'দ আলী, আবদুল ওহাব প্রভৃতি প্রায় শতাধিক শায়ের আজ অবধি কয়েকশ কাব্য রচনা করেছেন এ ভাষা-শৈলীর প্রয়োগে।

৪

হ্যালহেড ১৭৭৮ সনে রচিত তাঁর বাঙলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, বাঙলা ক্রিয়াপদযোগে আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাক্য ব্যবহারই ছিল তাঁর সমকালে সংস্কৃতিবানতার পরিচায়ক।

আবার ১৮৫৫ সনে পাদ্রী লঙ তাঁর গ্রন্থ-তালিকায় (Descriptive catalogue of Bengali Books) লিখেছেন : আরবি-ফারসিবহুল ভাষা মাঝিমাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত এবং এটি মুসলমানী বাঙলা, আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্য 'মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে দুটো তথ্যই নির্ভুল বলে মানা যাবে। ১৭৭৮ সনেও দেশে মুসলিম প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল, তাই সে-যুগের শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ফারসি মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে গৌরববোধ করত, আর তা দরবাররি ভাষার বহুল চর্চায় স্বাভাবিকও হয়ে উঠেছিল, যেমনটি একালে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি মিশানো বাঙলা বলে : 'ডাক্তার blood examine করে report দিয়েছেন, একটা medicine ও prescribe করেছেন। কিন্তু তবু মনে হয় exact diagonosis হয়নি। আজকাল হাসপাতালে admission না নিলে ভালো treatment আর regular diet ও নিখুঁত nursing-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।' রাজনারায়ণ বসুদের মতো রুচিবান রক্ষণশীলদের নিন্দা সত্ত্বেও আজও শিক্ষিত লোকমাত্রই ঘরে-বাইরে এমনি মিশ্রভাষাতেই কথা বলে। ১৮৩৫ সনে ফারসি নিঃশেষে হারায় দরবাবি ভাষার মর্যাদা ও অধিকার। আর ১৮৫৫ সনে কলকাতা শহরে নগণ্য ছিল না ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা। তার উপর সুন্দর গদ্যশৈলী সৃষ্টি-লক্ষ্যে কেরী থেকে বিদ্যাসাগর অবধি লিখিয়ে লোকদের অর্ধশতাব্দব্যাপী সচেতন ও সুপরিকল্পিত সাধনা বাঙলাকে কেবল সংস্কৃত-ঘেঁষা নয়—করে তুলেছিল প্রায় সংস্কৃত-সম। কাজেই নগরের মুসলমান ও গঙ্গাভাগীরথীর মাঝিমাল্লাদের মুখেই এ এককালের নগরবন্দরের বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় ভাষা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, তাতে বিস্ময়ের নেই কিছু।

৫

দোভাষীরীতির উদ্ভবের একটি অনুমিত ইতিহাস আছে। যে-কারণে এবং যেভাবে উর্দুভাষা অবয়ব পেয়েছে, এও গড়ে উঠেছে অনেকটা সেভাবেই।

তুর্কী বিজয়ের পর থেকেই ধীরে ধীরে মুসলিম সংস্কৃতির ও ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকে এদেশে। তেরো-চৌদ্দশতক থেকেই ফারসি দরবারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। ফলে, জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের বুলিতেও নতুন ভাব ও বস্তু নির্দেশক কিছু সংখ্যক ফারসি-তুর্কী এবং সেগুলোর মাধ্যমে আরবি শব্দ মিশে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্যিক ভাষাতেও আমরা পাচ্ছি গোটা বারো ফারসি-তুর্কী শব্দ। এদেশে ফারসির চর্চা বৃদ্ধি পায় মুঘল শাসনকালে; শিক্ষিতমাত্রই একালের ইংরেজি-জানা লোকের মতোই জানত ফারসি। তার উপর প্রশাসক ও পদস্থ চাকুরেরা ছিল সাধারণত উত্তরভারতীয় ও ইরানি। এদিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় বিপুল হয়ে উঠে ফারসি প্রভাব এবং কথ্য উর্দু চালু হয় সতেরো শতকেরও আগে, আর শালীন সাহিত্যের বাহনের মর্যাদা পায় উর্দু সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকেই। দক্ষিণভারতে দাখিনী উর্দুর উদ্ভবও ঘটে এভাবে।

আবার গৌড়, পাণ্ডুয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নতুন-পুরোনো শাসন-কেন্দ্রের মতো নতুন-জাগা বন্দর হাওড়া-হুগলী-কলকাতায়ও ঘটে বিদেশী লোকের সংখ্যাধিক্য ! স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে যায় এদের অনেকেই। ফারসি-উর্দুভাষী বিদেশীর প্রভাবে স্থানীয় জনগণের মাতৃভাষাও হতে থাকে বিকৃত। আজো সেই বিকৃত বাঙলা ও বিকৃত হিন্দুস্তানী চালু রয়েছে উক্ত সব অঞ্চলে—বিশেষ করে মুসলিম সমাজে। বড়র অনুকরণ করা মানুষের স্বভাব। এজন্যেই বন্দর এলাকায় একদা পর্তুগীজ ভাষাও শিখেছিল আত্যন্তিক আগ্রহে। হুগলীতে নাকি ইরানি ব্যবসায়ী শিয়াদের আড্ডা ও বসতি শুরু হয় মুর্শিদাবাদেরও আগে এবং ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেও হুগলীর খ্যাতি ছিল দূর-বিস্তৃত। উল্লেখ্য যে, দোভাষীরীতির আদিকবি ফকির গরীবুল্লাহও ছিলেন হুগলীর বালিয়া হাফিজপুরের লোক।

ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক হয় আঠারো শতকে যখন উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ডের মতো বাঙলার শাসনভার পেলেন শিয়া-মুর্শিদকুলি খান্। বংশানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয় তাঁর সুবাদারী। ইরানে শিয়া সাফাভী বংশীয় রাজত্বের অবসান ঘটে সতেরো শতকে। ফলে কৃপাবঞ্চিত ও পীড়ন-ভীত বহু শিয়া তখন দেশত্যাগ করে। শিয়া মুর্শিদকুলি খানের অনুগ্রহকামী বহু ইরানি শিয়া আশ্রয় নেয় বাঙলাদেশে। এ সময়ে শহর অঞ্চলে তথা মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া-হুগলী বন্দর এলাকায় ফারসি-উর্দু ও শিয়া-সংস্কৃতির প্রভাব হয় গভীর ও ব্যাপক। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবেরই সাক্ষ্য রয়েছে হ্যালহেডের উক্তিতে, চিঠিপত্রের ভাষায়, সত্যনারায়ণ পাঁচালি ও মর্সিয়ার জনপ্রিয়তায় এবং পাঞ্জাতন, পাঁচপীর প্রভৃতির সংস্কারে, মহররমের তাজিয়া-উৎসবের পার্বণিক-প্রতিষ্ঠায় এবং ফকির গরীবুল্লাহ প্রবর্তিত দোভাষী রীতিতে। উত্তরভারতীয় আদলে যখন একটি দেশী মুসলিম সংস্কৃতি প্রকাশমান এবং উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা সৃজ্যমান, তখন হঠাৎ নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল পলাশীর প্রান্তর। পালে লাগল সেই দিগন্তমুখী বাতাস। পরিণামদর্শী স্বস্থ হিন্দুরা বরণ করে নিল নতুনকে; দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমান আকর্ষণ হারাল পুরাতনে, কিন্তু আগ্রহ জাগল না নতুনেও, তাই অর্ধ শতাব্দ ধরে তারা রইল নিঃস্ব ও বিমূঢ়। তখন তারা মনেও কাঙাল, ধনেও কাঙাল। যে-নওয়াবীর প্রচ্ছায় একদা শহর-বন্দরের মুসলমানরা নতুন জীবনস্বপ্ন রচনা করছিল, তা অলক্ষ্যে লাটগিরিতে পরিণত হওয়ায় এভাবে ব্যর্থ হল তাদের স্বপ্ন। স্বপ্ন উবে গেল, কিন্তু ঘোর কাটল না অনেকদিন। যদিও সম্ভাবনাটা উদ্ভাসিত হয়েছিল উত্তরভারতীয় আদলেই, কিন্তু সৌভাগ্যটা আর মিলল না। কেননা রূপায়ণের আর সাফল্যের সব আয়োজন যখন সমাপ্ত, তখন আকাশে দেখা দিয়েছে নতুন সূর্য। নতুন দিনে পুরোনো রচনা অতীতের ঘটনা।

অতএব দোভাষীরীতির উদ্ভব, পরিচর্যা ও বিকাশক্ষেত্র হচ্ছে কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বন্দর এলাকা। এখানকার এটিই ছিল চলিত বাঙলা। রেজাউল্লাহ (১৮৬১), মালে মুহম্মদ, বেলায়েত ও দানিশ তাই দোভাষী রীতিকে বলেছেন 'এছলামি বাঙলা', কেউ অভিহিত করেছেন 'চলিত বাঙলা' বলে, আর এর বিকাশ ও বিস্তারকাল হল ইংরেজ আমল। যা উচ্চবর্গের অভিজাতের পরিচর্যার অপেক্ষা রাখত, তা-ই নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত লোকের অনুশীলনে টিকে রইল শহরের সংকীর্ণ-সীমায়। এ যেন দুধের প্রত্যাশায় ঘোলের সাধনা অথবা দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। কেননা এ সাধনায় যাঁরা ব্রতী রইলেন, তাঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অপরিস্রুত শিল্পরুচি যোগ্য ছিল না কোনো সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার। সামর্থ্য ছিল না তাঁদের লক্ষ্য-চেতনা মনে জাগিয়ে রেখে এগিয়ে যাবার। এভাবে ব্যর্থ হল একটি জাতীয় স্বপ্ন, একটি ইপ্সিত সম্ভাবনা ও একটি মহৎ প্রয়াস।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই কেবল কলকাতা, হাওড়া ও হুগলী অঞ্চলের বাইরের লোক বটতলার প্রকাশকদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ফরমায়েশি রচনায় দোভাষী রীতি প্রয়োগ করতে থাকেন। এ রীতি আজো অনুসৃত হচ্ছে প্রাকৃত মুসলমানদের জন্যে সৃষ্ট বটতলা সাহিত্যে—এমনকি মাওলানা আকরম খানের 'পাকিস্তান নামা'য় কিংবা কাজী আবুল হোসেনের 'জিন্নানামা'য় এবং আবুল মনসুর আহমদের 'আসমানি পর্দা'য়ও।

গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাওড়া, হুগলী, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শাসনকেন্দ্র ও বন্দর এলাকা ছাড়া, অন্যান্য অঞ্চলের দেশজ মুসলমানের কথ্য ভাষা তো বটেই, লেখ্যভাষাও চিরকাল অবিমিশ্র বাঙলা।

৬

বিদেশী শব্দের বহুল প্রয়োগ নয়—হিন্দুস্তানী বাক্‌ভঙ্গির অনুকৃতিই এ রীতিকে দোভাষী করেছে :

সর্বনাম—তেরা, মেরা, তুঝে, মুঝে ইত্যাদি।

বিশেষণ—এয়ছা, যেয়ছা, তেয়ছা, কেয়ছা, কব, কাহে, এত্তা, কেত্তা, থোড়া, ভি, আভি।

সংখ্যাবাচক—পয়লা, দোছরা, তেছরা প্রভৃতি।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়—বিচে, খাতেরে, হুজুরে ইত্যাদি।

হিন্দুস্তানী ক্রিয়াপদ—তোড়, ডাল, ছোড়, নিকাল, গির, উতার, ভেজ, কিয়া, পাকড়, ঘুম ইত্যাদি।

ফারসি নামধাতু—খেসালিত, নেওয়াজিয়া, গোজারিয়া ইত্যাদি।

আরবি-ফারসি বহুবচন—বেরাদরান, এজিদান, শহীদান, মোমেনিন, চাকরান!

পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় প্রয়োগ—বালা, প্রিয়া, উদাসিনী।

পুরো হিন্দুস্তানী বাক্যের প্রয়োগ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরা মেরা শাদী হোগা আয়েন্দা জুমারাত
কাদের রহিম আল্লা রহমানের রহিম,
আলমের পালনে ওয়ালা হক্কের হাকিম।
নেক কামে রাজি সেহ বদি কামে দেক।
পহেলা দাওত ভেজে রসুল খাতেরে।
খানা বেগর দো ইমাম বড়া পেরেসান।
সেতাবি এ মোছাফেরে লেহ পাকড়িয়া।

সুন্দর করে বলা কথাই কাব্য তথা সাহিত্য। শায়েরদের রচনায় সে-সৌন্দর্যের অভাব। কে না জানে, ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয় সূচিত শব্দের সুবিন্যাসেই। এ চেতনা স্বল্পশিক্ষিত পুথি শায়েরদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। তাই অনবরত শব্দের নির্লক্ষ্য বিশৃঙ্খল প্রয়োগে বক্তব্যের অনর্গল প্রকাশই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ফলে, অমার্জিত স্থূলরুচির প্রলেপে ঐ ভাষায় এবং ভঙ্গিতে একটা সামগ্রিক অশ্লীলতা যেন প্রকাশমান। অবশ্য এ হচ্ছে বিরূপ শিক্ষিত মনের কথা। কিন্তু যাঁরা এ সাহিত্যের লেখক আর যাদের জন্যে লেখা তাদের মধ্যে এসব ব্যাপারে কোনো বিচলন হয়তো নেই। বহুকালের অনুশীলনে এটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বীকৃত ও সমাদৃত রীতি, বিশেষত বিকল্প রীতি যখন অনুপস্থিত এবং পাঠকেরও শিক্ষা আর রুচির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি।

মিশ্রভাষায় হালকা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনারীতির ঐতিহ্য এদেশেও সুপ্রাচীন। আমীর খুসরু (ফারসি-হিন্দি), ভারতচন্দ্র (বাঙলা-ফারসি-হিন্দুস্তানী), দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন (বাঙলা-ইংরেজি), আহসান হাবীব (দোভাষীরীতি : ফরমান, হরকাম ভরসা, জঙ্গনামা), আবুল মনসুর আহমদ (দোভাষী রীতি : আসমানী পর্দা) প্রমুখ কবির রচনা তার সাক্ষ্য।

আবার ইরানি কবি নিজামীর সিকান্দরনামা এবং বাঙালি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবির বহু উৎকৃষ্ট কবিতা বিদেশী শব্দবহুল।

অতএব, শব্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্য বা কুশলতার উপরই কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে এবং ব্যবহার-যোগ্যতাই ঔচিত্য ও উপযোগের নিয়ামক ও পরিমাপক।

দোভাষী শায়েরা প্রাকৃতজনের কবি। তাই পরিশীলিত মানসের শিল্পরুচি এবং সুন্দর ও মহৎ জীবনের মাহাত্ম্যচেতনা কিংবা জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত।

AMARBOI.COM

৭

দোভাষী সাহিত্য পাঁচটি ধারায় বিভক্ত ঃ

(ক) প্রণয়োপাখ্যান : সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, ইউসুফ জোলেখা, চন্দ্রভান, চন্দ্রাবতী, গুল-হরমুজ, গুল-সনোবর, গুলে বকাওলি, মধুমালতী, মৃগাবতী-যামিনীভান, লায়লী মজনু, আলেফ লায়লা প্রভৃতি। এগুলো উর্দু গ্রন্থের—ক্বচিৎ ফারসি ও হিন্দি-অওধী কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ তথা কাহিনীর স্বাধীন অনুসৃতিমূলক। এগুলোর মধ্যে রূপকথা শ্রেণীর গল্প-কথন প্রয়াস আছে, বাস্তব জীবনবোধের কোনো পরিচয় বা জীবনের কোনো তাত্ত্বিক চেতনার বা রূপের উদ্ভাস নেই। বাঙালি রচিত বা অনূদিত এ সাহিত্যে বাঙলার প্রকৃতি বা সমাজ, বাঙালি জীবনের সমস্যা কিংবা যন্ত্রণা বা উল্লাসের কোনো ছাপ নেই। আছে কেবল আঙ্গিকের ও রসের গতানুগতিকতা এবং ব্যক্তিমনের স্পর্শনিরপেক্ষ যান্ত্রিক পরিচর্যা।

(খ) যুদ্ধকাব্য : জঙ্গে খয়বর, জঙ্গে ওহুদ, জঙ্গে বদর, শাহনামা, আমির হামজা, সোনাভান, জৈগুন, কারবালা যুদ্ধ, কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতি কাব্যে রসুল, আলি, হামজা, হানিফা, হোসেন প্রমুখ ইসলামের উন্মেষযুগের বীরদের কাফের-দলন এবং ইসলাম প্রচারকাহিনী বিবৃত। এসব যুদ্ধকাব্যে রোমান্সের তথা প্রণয়-রসের অবতারণা থাকলেও এগুলো মূলত জেহাদী প্রেরণার কাব্য। কোনো স্বার্থবুদ্ধি নয়—ইসলাম প্রচার-প্রীতিই প্রেরণার উৎস। তাঁদের এক হাতে কোরআন আর এক হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরবারি, মুখে রয়েছে বেদীনের প্রতি তাঁদের আহ্বান : 'হয় কোরআন বরণ কর, নয়তো তরবারির মোকাবেলা কর।' তাঁরা কাফের-পূজ্য দেবতাদের বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী। এসব কাব্যে স্বধর্মের ও স্বজাতির অতীত গৌরব স্মরণে উল্লাসবোধের আভাস আছে, অবশ্য সে-উল্লাস হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়হীন নিঃস্ব দুর্বলের আত্মীয়-গৌরবে আত্মপ্রসাদলাভের বাঞ্ছাজাত এবং এতে রয়েছে বর্তমান আর্তনাদকে অতীত আস্ফালনে ঢাকা দেবার প্রয়াস—দুর্দিনে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা।

(গ) পীর পাঁচালী : পীর পাঁচালিগুলো শায়েরদের মৌলিক সৃষ্টি, যে-অর্থে মঙ্গল কাব্যগুলো মৌলিক সে-অর্থেই অবশ্য। কেননা এখানেও রয়েছে পুচ্ছগ্রাহীর অনুসৃতি। পীর পাঁচালি দুই শ্রেণীর : (১) ঐতিহাসিক ব্যক্তি নির্ভর ও (২) কাল্পনিক।

(১) মোবারক, গোরাচাঁদ, ইসমাইল গাজী, খাঞ্জা খাঁ গাজী (খান-ই জাহাঁ খান), সফি খাঁ গাজী [শাহ্ শফিউদ্দিন (খাঁ ?)] ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁরা হিন্দুর লৌকিক দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী কাফের-মর্দন ও ইসলামপ্রচারক পীররূপে কল্পিত। অতএব এঁরা মঙ্গল কাব্যের দেবতার আদলে সৃষ্ট এবং এঁদের ভূমিকাও অভিন্ন।

(২) শাসক-শাসিতের তথা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম সমন্বয়, সদ্ভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এসব মৌলিক তথা কাল্পনিক পীর সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকার এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলন-প্রয়াসের জন্ম। তাই এসব পীর হিন্দুদেবতারই প্রতিরূপ : সত্যনারায়ণ-সত্যপীর, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, মছন্দর-মছলন্দি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, উদ্ধারদেবী-উদ্ধার বিবি, বাস্তুদেবী-বাস্তুবিবি। এঁদের মধ্যে সত্যপীরই আদি ও প্রধান ঐক্যদূত। তাঁকে কেন্দ্র করে তৈরি হল মিলনসেতু। মিলন-ময়দানের তিনিই ইমাম।

(ঘ) ধর্মশাস্ত্রীয় রচনা : শরীয়ত ও মারফত বিষয়ক বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন এঁরা ঃ মোহাম্মদী বেদতত্ত্ব, ফকির বিলাস, নসিয়তনামা, মুর্শিদনামা, তম্বিয়াতুন্নেসা, আহকামুল জুমা, সেরাতুল মুমেনীন, একশত বত্রিশ ফরজ, নামাজ মাহাত্ম্য, হাজার মোসায়েল, তরিকতে হক্কানি, হকিকতে সিতারা প্রভৃতি এ শ্রেণীর গ্রন্থ।

(ঙ) বিবিধ :তাজকিরাতুল আউলিয়া, আবু সামা, ইব্লিস নামা, যুগীকাচ, ফালনামা, গান, কিয়ামতনামা প্রভৃতি।

প্রণয়োপখ্যান ছাড়া অন্য শ্রেণীর রচনাগুলো কম-বেশি ধর্ম-সংপৃক্ত। এবং প্রাকৃতজনের এ ইসলাম হচ্ছে লৌকিক ইসলাম। অর্থাৎ স্থান-কালে প্রভাবজ এবং দেশী মুসলমানের মানস-প্রসূত এ ইসলাম নতুন অবয়বে প্রকাশমান। এই তথ্য মনে রেখে বলা যাবে দোভাষী সাহিত্য স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক কবির রচনা। অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরুন নীতিবোধ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই এঁদের রচনায়। দেশ, জাতি ও ধর্মের ইতিকথা এবং সমাজ-সংস্কৃতির একটি অতি স্থূলবোধ ও রূপ এ সাহিত্যে প্রতিফলিত।

অতএব, আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ ! এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি, শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমেয় ! এ ভাষাও দাখিনী উর্দু ও উত্তরভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত—এ উল্লাসবোধ, কিন্তু হল না—এ ক্ষোভই দোভাষী রীতি চিরকাল জাগিয়ে রাখবে স্বজাতি ও সংস্কৃতিপ্রিয় মুসলিম ঐতিহাসিকের মনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান

মানুষের জীবন-জীবিকা স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। তাই মানুষের চলনে, বলনে ও আচরণে স্থানিক ও কালিক প্রভাব থাকে অনেকখানি। এজন্যেই স্থান ও কালভেদে মানুষের ভাব-ভাবনায় এবং জীবন-জীবিকায় দেখা যায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, এই বিচিত্রতা ও বিশিষ্টতাই এক এক স্থানিক গোত্রের বা জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। টুকরো টুকরো তুলো দিয়ে যেমন তৈরি হয় অবিচ্ছিন্ন সূতো, তেমনি ব্যষ্টির খণ্ড-ক্ষুদ্র-চিন্তা ও কৃতির সমবায়ে গড়ে উঠে জাতীয় ঐতিহ্য। Politics পুরোনো হলে হয় ইতিহাস আর পুরোনো সংস্কৃতির নাম ঐতিহ্য। এরই সর্বাত্মক সাধারণ অভিধা 'সভ্যতা'।

ঐতিহ্য জাতীয় জীবনে প্রেরণার উৎস ও সংস্কৃতির নবনব বিকাশের ভিত্তি। শিকড় দিয়ে মাটির রস, আর পাতা দিয়ে আলো বাতাসের উপাদান গ্রহণ করে যেমন বেড়ে ওঠে গাছ, জাতিও তেমনি ঐতিহ্য থেকে প্রাণরস এবং সমকালীন পরিবেশ থেকে মানস- সম্পদ আহরণ করে প্রয়াসী হয় আত্মবিকাশে, নতুন পাতার উদ্‌গমে ঝরে পড়ে পুরোনো পাতা, নতুন চিন্তার উন্মেষে অবহেলিত হয় পুরোনো চিন্তা। পুরোনো অকেজো হল বটে, কিন্তু তাই বলে অসার্থক নয়, কেননা তা নতুনে উত্তরণের সোপান। তার কালে সেও ছিল আজকের সংস্কৃতির মতো জীবন-প্রচেষ্টার সম্বল ও বাহন। বহতা নদীর স্রোত যেমন নিজে এগিয়ে যায় আর টেনে আনে পেছনের পানি, ঐতিহ্যও তেমনি নিজের কোলে জন্ম দেয় নতুনের। পাকানো রশিতে কিংবা বহতা নদীতে আর ঐতিহ্য- পরম্পরায় তফাৎ নেই কিছুই।

চলমান জীবনে আর উত্তরাধিকারের মতো সাহিত্যের উত্তরাধিকারও বিশেষ মূল্যবান সম্পদ। ঐতিহ্যের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বিধৃত থাকে সাহিত্যে। তাই জাতীয় জীবনে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাব অসামান্য। গ্রীকদের উপর হোমারের ইলিয়াড-ওডেসির প্রভাব, ইরানিদের জীবনে শাহ্‌নামার গুরুত্ব আর পাক-ভারতের হিন্দুর আচারিক ও মনো-জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রেরণা অপরিমেয়।

হোমারের রচনা অবলম্বন করে য়ূরোপে, শাহ্‌নামা সম্বল করে মুসলিম জগতে এবং রামায়ণ-মহাভারত ভিত্তি করে হিন্দু-ভারতে বিচিত্র রস ও রূপে গড়ে উঠেছে বিপুল আধুনিক সাহিত্য।

পুরোনো কিস্‌সায় নতুন আঙ্গিক ও অভিধা আরোপিত হলে সে কিস্‌সার জলুস কত বাড়ে এবং কেমন রসস্ফূর্তি ঘটে তার দৃষ্টান্ত মিলবে মিল্‌টনের Paradise Lost-এ, টেনিসনের Ulysses-এ, শেলীর Prometheus Unbound-এ আর ম্যাথু আরনল্‌ডের 'Sohrab and Rostum'-এ। আমাদের দেশে পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে রচিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক, কুমারসম্ভব কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীন সেনের ত্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তীসংবাদ, বিদায় অভিশাপ প্রভৃতি বহু রচনা এর প্রমাণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে উনিশ শতকের হিন্দু রচিত আধুনিক বাঙলা কাব্যের বারো আনা উপাদানই রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেয়া। আর বাঙলা সাহিত্যের উপমাদি অলঙ্কারের চৌদ্দ-আনা মহাভারতের কাহিনী থেকে পাওয়া।

এদেশে মুসলমানেরাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না এ ব্যাপারে। তাঁরাও আমাদের মধ্যযুগীয়-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন পুরোনো সাহিত্য থেকেই। ফারসি ও হিন্দুস্তানী প্রণয়োপখ্যানগুলো কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অনুসরণ যেমন করেছেন, তেমনি রচনা করেছেন ইসলামের উন্মেষ যুগের হযরত আলী, আমির হামজা, হানিফা প্রভৃতির বীরত্বের উপকথা নিয়ে 'জঙ্গনামা'গুলো। আলেফলায়লা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহনামার নানা কাহিনীও হয়েছে আমাদের পুথি-সাহিত্যের অবলম্বন। এসব উপাদানে গড়ে উঠেছিল আমাদের বিপুল সাহিত্য।

এ যুগেও আরবি-ইরানি-উর্দু সাহিত্য এবং আমাদের পুথি অবলম্বনে আধুনিক ভাব-চিন্তার অনুগ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ও করছেন কোনো কোনো কবি। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু, কায়কোবাদের মহরম শরীফ, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মহাশিক্ষা কাব্য, হামিদ আলীর 'কাসেমবধ' ও 'জয়নাল উদ্ধার' প্রভৃতি কারবালা যুদ্ধভিত্তিক রচনা। সৈয়দ আলী আহসানের অসম্পূর্ণ 'চাহার দরবেশ', ফররুখ আহমদের 'নৌফল ও হাতেম', শাহরিয়ার, হাতেমতায়ী, আব্দুর রশিদ ওয়াসেকপুরীর আমীর সওদাগর, আজিমুদ্দিনের 'মহুয়া' প্রভৃতি পুরোনো সাহিত্যেরই আধুনিক রূপায়ণ।

এ কয়জনের গুটিকতক রচনাতেই উজার হয়ে যায়নি সে বিপুল ভাণ্ডার। বলতে গেলে আজো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে এর উৎকৃষ্ট সম্পদ। এ কাজে যে শ্রদ্ধা, শ্রম ও সংবেদনশীল মনের প্রয়োজন, তা আমাদের মধ্যে আজো বিরল। অথচ পুরোনো সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের সুপ্রয়োগেই সমৃদ্ধ হয় নতুন সাহিত্য ও সুপ্রকট হয় মনন। এজন্যে পুরোনো সাহিত্যের উপাদানই হয়েছে চিরকাল উৎকৃষ্ট কাব্যের অবলম্বন। ঐতিহ্য সচেতনতার ও পুরোনো সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আমদের আজকের সাহিত্যের অপূর্ণতা ও দীনতার অন্যতম কারণ। আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠন শিক্ষিত সাধারণ্যে নিতান্ত কম। অথচ এর বহুল চর্চা না হলে একে বুনিয়াদ করে সাহিত্যসৃষ্টির চর্যাগ্রহণ করা সম্ভব নয় কিছুতেই। আমাদের পুথি-সাহিত্যের আধুনিক রূপায়ণের সম্ভাব্যতার একটু আভাস দিয়েই আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই। এর সম্ভাবনা যেমন বিপুল, যাঁরা এ পথে এগিয়ে আসবেন তাঁদের কৃতির ভবিষ্যৎও তেমনি উজ্জ্বল।

সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' একটি বিরাট কাব্য। হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ (দ.) অবধি সব জ্ঞাত নবীর কাহিনীই রয়েছে এতে। হযরত আয়ুব-রহিমা, ইব্রাহিম ও আল্লার অভিজ্ঞান, ইব্রাহিম-সারা-হাজেরা, মুসা-কারুন, নূহ-কেনান, সোলায়মান-জাদু আঙটি প্রভৃতি চমৎকার অবলম্বন হতে পারে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার তত্ত্ব-ভাবনার। হযরত আদমের পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাহিনীও আধুনিক পরিবারের দ্বান্দ্বিক জীবনের প্রতীক হতে পারে। এ যুগের রোমান্টিক কবি-কল্পনার সবচেয়ে সুন্দর অবলম্বন হতে পারে আদমের জীবন-স্বপ্ন। বেহেস্তে সদ্য-তৈরি আদম একাকিত্বের অস্পষ্ট বেদনার উন্মন। নতুন-দেখা প্রকৃতি যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে সে বেদনা। ক্লান্তমনে ঘুমিয়ে পড়েছেন আদম, ঘুমের ঘোরে অনুভব করছেন তিনি : তাঁর বাম পাশের 'রগ' থেকে কী যেন গড়ে উঠছে, কী যেন জেগে উঠল, দাঁড়িয়ে গেল। তাঁকে যেন ইশারায় ঐ নতুন সত্তা ডাকছে। তিনি চোখ খুললেন, দেখলেন এক অপরূপ রূপসী তাঁর অপেক্ষায় পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর স্বপ্নের, তাঁর অবচেতন কামনার ধন পেয়ে ধন্য হলেন তিনি। এই-যে আদি মানবের প্রথম জীবনস্বপ্ন, একে প্রেম বলুন, 'মৈথুন তত্ত্ব' বলুন—একেই কেন্দ্র করে বিকশিত হচ্ছে জীবন। জীবনবৃক্ষে ফুল ফোটানো, ফল ধরানো আর রঙ চড়ানো—সবকিছুর মূলে রয়েছে এ স্বপ্নের দান। আমাদের পসন্দ-সই আবহ সৃষ্টি করতে পারেননি মধ্যযুগের কবি। কিন্তু বীজ বুনে গেছেন, তা আজকের শক্তিমান কবির হাতে প্রকটিত হতে পারে অসামান্য রসে-রূপে। 'কাসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতির নানা কাহিনী অবলম্বন করেও অভিব্যক্তি পেতে পারে আমাদের আজকের জীবনতত্ত্ব।

ইউসুফ-জোলেখা আমাদের প্রণয়—জিজ্ঞাসার চিরন্তন প্রতীক—প্রণয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আদর্শের আকর। আমাদের শাহ মুহম্মদ সগীরের কিংবা আবদুল হাকিমের ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে ইউসুফের অলোকসামান্য সংযম ও চরিত্র-মাহাত্ম্য, জোলেখার প্রণয়াবেগ ও কৃচ্ছ্রসাধনা যে মহিমান্বিত রূপ পেয়েছে এমনটি আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেও দুর্লভ। একদিকে Passions ও emotions-এর দুর্বার বেগ, অপরদিকে সংযম, সততা ও আদর্শানুগত্যের প্রমূর্ত রূপ যে-কোনো কালের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অবলম্বন হবার স্পর্ধা রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মালিকার সওয়াল' 'মুসার সওয়াল' বলে আমাদের সাহিত্যে যে একপ্রকার তত্ত্বগ্রন্থ আছে, তাকেও এ-যুগের জীবন-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া যায় চমৎকার আধুনিক রূপ, যোগ্য হাতে পড়লে রূপে-রসে মস্‌নবীর মতো হতে পারে এগুলো।

হামজা-হানিফা-রুস্তম-সোহ্‌রাব প্রভৃতি যে শুধু আমাদের আধুনিক কিশোর-সাহিত্যে নায়ক হতে পারেন তা নয়, তাঁদের দিগ্বিজয় কাহিনীর মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে, যা রোমান্টিক কাহিনীর কিংবা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার হতে পারে বিষয়বস্তু!

এমনি আরো কত বিষয় রয়েছে ছড়িয়ে। আমরা অনধিকারী, তা আমাদের চোখে পড়বার কথা নয়। কোথায় কোনো সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে, কোথায় কোনো সাহিত্য-রত্নের টুকরো রয়েছে পড়ে তা সহজে নজরে পড়তে পারে সৃষ্টিশীল লিখিয়েদেরই। আমাদের অনুভূতিহীন স্থূলদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ, তা-ই যোগ্য লোকের মহৎ সৃষ্টির উপাদান হতে পারে হয়তো। আমাদের কেবল বলবার কথা এই যে ঐতিহ্যানুগত্য ছাড়া জাতি যেমন অবাধে বড় হয় না, তেমনি সাহিত্য-ঐতিহ্য অবহেলা করলে সহজে তৈরি হতে পারে না মহৎ সৃষ্টির ক্ষেত্র। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ যেমন তৈরি করে দেয় নতুন ভাষা ও সাহিত্যের বুনিয়াদ, তেমনি সাহিত্যের বিকাশ ও মননের প্রসার দ্রুততর হয় পুরোনো সাহিত্যের নব রূপায়ণে। টি. এস. এলিয়ট পুরোনো উপমাদি পর্যন্ত নতুন ব্যঞ্জনায় প্রয়োগ করে অর্জন করেছেন অসামান্য সাফল্য এবং এ বিষয়ে নয়া ব্রতীদের দিয়েছেন দিশা।

সাহিত্যক্ষেত্রে আগেও নিঃস্ব ছিলাম না আমরা। গর্ব ও গৌরব করবার মতো সাহিত্যিক ঐতিহ্য আমাদের ছিল বরাবরই। কিন্তু প্রয়োজনমতো কাজে লাগাইনি তা। তাই আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের দীনতা যতটুকু ঘুচতে পারত তা-ও ঘোচেনি। আমাদের অক্ষমতা নয়, উদাসীনতাই এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। আশার কথা, আমাদের অনেক লিখিয়েই সচেতন হয়েছে এ ব্যাপারে এবং পুথির উপাদান নিয়ে লিখতে হয়েছেন উদ্যোগী। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা পুরাতনের উদ্বর্তন চাইনে, পুরাতন সামগ্রী নিয়ে নয়া ইমারত তৈরি করে নতুনের আবাহন ও প্রতিষ্ঠাই কামনা করি তাতে। কিন্তু জীবন যে মুখ্যত মৃত্তিকা-আশ্রয়ী তা ভুললে চলবে না। স্বদেশের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে জীবন, প্রাণ-রস পায় মানুষ দেশের ঐতিহ্য থেকেই। কেননা, এ ঐতিহ্য হচ্ছে তারই পূর্বপুরুষের অর্জিত বা সৃষ্ট কিংবা কৃতির ফসল। ধর্মীয় জীবন হচ্ছে বাইরের থেকে পাওয়া আদর্শের কৃত্রিম রূপায়ণ। তাই দেশী ঐতিহ্যকে অবহেলা করে কেবল ধর্মীয় কিংবা ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে পাওয়া বিদেশী ঐতিহ্যের প্রয়োগে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা হবে তাসের ঘরের মতো অকেজো ও অসার্থক। তা কখনো হবে না প্রেরণার কিংবা অনুভবের উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য

মানুষের চেতনা নিরবয়ব নয়। তার রঙ দেশ ও কালের, তার বিকাশ বিশ্বাসে, বোধে ও বিচারে, তার বিচরণ ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে, আর তার স্থিতি প্রত্যয়ে ও আনন্দে।

সাহিত্যও আনন্দের সৃষ্টি। যেখানে আনন্দ, সেখানেই প্রাণের প্রকাশ। সাহিত্যেও তাই অনুভব করি প্রাণের সাড়া।

ঐতিহ্য মানুষের প্রেরণার উৎস, তার জীবন রসের আকর। কাজেই সাহিত্যের অন্যতম অবলম্বন ঐতিহ্য, জাতীয় ঐতিহ্যই জাতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সাক্ষী। জাতির জীবনাদর্শের, আনন্দিত দিনের ও গৌরবময় কৃতির স্মৃতিই ঐতিহ্য। তাই জাতীয় জীবনে ঐতিহ্য বহু এবং বিচিত্র ; তার আদর্শের ও আচরণের, চিন্তার ও কর্মের, ধর্মের ও সংগ্রামের, প্রেমের ও সেবার, গর্বের ও গৌরবের যা-কিছু সবই ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য।

মোটামুটি ভাগে ঐতিহ্য দুই শ্রেণীর : একটি দেশজ, অপরটি ধর্মবিশ্বাস প্রসূত।

অতএব একটি কর্মের, অপরটি চিন্তার ও আদর্শের। মানুষের কোনো চিন্তা, আচরণ বা কর্ম দেশ, কাল ও বিশ্বাস নিরপেক্ষ নয়। চিন্তা, ধর্ম ও আচরণের রসাত্মক অভিব্যক্তিই সাহিত্য। অতএব সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব না-থেকেই পারে না-মহাকবি হোমার থেকে আজকের কিশোর সাহিত্যিক অবধি যে-কোনো লিখিয়ের রচনায় ঐতিহ্যের দেদার ব্যবহার চোখে পড়বে।

হিন্দুর লেখা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বারোআনাই তো পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও স্বধর্মী রাজপুতদের ইতিকথা অবলম্বনে রচিত। কাজেই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে জাতীয় ঐতিহ্য একটি বড় সম্পদ। মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্যেও মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে।

বাঙলাদেশের সাহিত্যেও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সুপ্রকট। কিন্তু আমরা বেশি করে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রয়োগ কামনা করছি ইদানীং। তেরোশ বছরের পুরোনো ধর্ম ও সংস্কৃতির, আচরণ ও আদর্শের, কর্মের ও চিন্তার, সংগ্রামের ও জয়ের নানা ঐতিহ্য ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধ পৃথিবী ব্যাপী। তাই মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে লিখিয়েদের। পড়াশোনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে মুসলিম ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান। কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, শাহনামা, আলেফ লায়লা এবং অন্যান্য জীবনী ও যুদ্ধকাহিনী থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে নতুন তাৎপর্যে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস রচনা করলে অচিরে মুসলিম ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের সাহিত্য।

শব্দ মাত্রই বোবা। বক্তার অভিপ্রায়ই শব্দকে দান করে অর্থ। কাজেই শব্দে ঐতিহ্যের কিংবা সংস্কৃতির সন্ধান চিন্তার ও আদর্শ-চেতনার দৈন্যই ঘোষণা করে। আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক ও পাঠকের ঐতিহ্যানুরাগ আরবি-ফারসি শব্দ প্রীতিতেই অবসিত। অথচ তাৎপর্য-চেতনা নিয়ে বিষয় নির্বাচন ও তার রসাত্মক প্রকাশের মধ্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব জাতীয় সত্তার স্বরূপ। এতে জাতির আশা-আদর্শের রূপায়ণও হবে সহজ। মননের ব্যাপ্তি, চিন্তার দীপ্তি, কর্মের প্রেরণা ও আদর্শের ঔজ্জ্বল্য এভাবেই আসা সম্ভব ও সহজ। জাতীয় গৌরব-গর্ব, জাতীয় সংহতি ও জাতীয় জাগরণ আসবে এ পথেই। ব্যক্তির হৃদয়ে এভাবে যে আবেগের সৃষ্টি হবে, জাতীয় জীবনে তা-ই সঞ্চার করবে কর্মের ও জ্ঞানের, আদর্শের ও শক্তির বেগ। স্থির লক্ষ্যে সামনে এগুবার প্রেরণা পাবে জাতি এভাবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার সাহিত্যে ঐতিহ্যের প্রয়োগের দু-একটা উদাহরণ দিই। ধর্মবুদ্ধি বশে পরশুরাম পিতৃহত্যা করেছিলেন, গান্ধারী কামনা করেছিলেন নিজের সন্তানের পরাভব। এই ধর্মবুদ্ধিই হযরত ওমরকে অনুপ্রাণিত করেছিল পিতাকে হত্যা করতে এবং পুত্রের প্রতি হতে স্নেহহীন। পশুর প্রতি প্রীতিবশে অশেষ দুঃখ পেয়েছিলেন রাজা ভরত। বৎস-বিচ্ছেদ কাতর হরিণীর প্রতি অনুকম্পা বশে আমাদের রসুল বিপন্ন করেছিলেন নিজের জীবন। রূপহীনা চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অর্জুন ব্রহ্মচর্যের মিথ্যা অজুহাতে। দেবতার বরে রূপবতী হয়ে সে তাচ্ছিল্যের শোধ নিয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা। কুরূপা ধীবর-কন্যাকে অবজ্ঞা করেছিলেন নবী সোলায়মান। আল্লাহর সৃষ্টির এ নিন্দা সহ্য করেননি আল্লাহ। তিনি মেছুনিকে রূপসী করে সোলায়মানের দয়িতা ও পত্নীর মর্যাদা দিয়ে জব্দ করেছিলেন সোলায়মানকে। নবী দাউদ ও উরিয়ার কাহিনী তো অবিকল জাহাঙ্গীর-মেহেরুন্নিসার ইতিহাসের মতো! রাজা ও নবী দাউদ তাঁর সেনানী পত্নী উরিয়ার ললাম সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে উরিয়ার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হত্যা করলেন কৌশলে আর উরিয়াকে করলেন পত্নী।

আবু জেহেল যুদ্ধে আহত ও পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন রসুলের হাতে। তাঁকে ইসলাম কবুল করতে আহ্বান জানালেন রসুল। আবু জেহেল তার আগে জানতে চাইলেন শাদা পোশাক-পরা রসুলপক্ষীয় সৈন্যদের পরিচয়। রসুলের মুখে তিনি যখন শুনলেন যে ওঁরা আল্লাহ্-প্রেরিত ফেরেস্তা, তখন ঘৃণায় মুখ ফেরালেন আবু জেহেল আর বললেন, 'যে আল্লাহ তোমার সাহায্যে ফেরেস্তা পাঠিয়েও আমার সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না, আমাকে পারলেন না প্রাণে মারতে—তিনি আমার চেয়ে এমন কী শক্তিমান যে আমি তাঁর বন্দনা করব?' এ ঘটনা ও চরিত্র শ্রেষ্ঠ নাটকের কিংবা কাব্যের অবলম্বন হতে পারে।

এমনি সব চমকপ্রদ কাহিনী ও চরিত্র পুরোনো সাহিত্য ঘেঁটে বের করা যাবে যা আজকের সাহিত্যেরও হতে পারে উৎকৃষ্ট উপকরণ।

সাহিত্য যে বিজ্ঞান-দর্শন নয়, জ্ঞানলাভের জন্যে যে আমরা সাহিত্য পড়ি না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাহিত্যে জীবনযাত্রীর জীবনচেতনার উদ্ভাস কামনা করি আমরা। সে চেতনা প্রকটিত হয় কর্মে, চিন্তায় ও অনুভবে। তা জেনে বুঝে আমরা জীবন সম্বন্ধে পাই প্রজ্ঞাদৃষ্টি। কাজেই সাহিত্য হবে সমকালীন জীবনচেতনার আধার। জীবনযাত্রীর পরিবেশ-প্রতিবেশের পটে অঙ্কিত হবে মন-মানসের, পথ-পাথেয়ের ও ভাব-ভাবনার ভুবন। কাজেই অনুভবকে তথা বক্তব্যকে অবয়ব দানের গরজেই আমরা খুঁজব উপাদান-উপকরণ। তা প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেয়া শ্রেয়, নিদেনপক্ষে নেব অতীতকালের কাহিনী থেকে। কথায় বলে : 'আগে খেশ পরে দরবেশ।' কাজেই আগে খুঁজব দেশজ কাহিনী বা ঐতিহ্য, তারপরে সন্ধান নেব স্বধর্মীর ঐতিহ্যের। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিদেশীর বা বিজাতির বলে গ্রহণবিমুখ হব না। অভিমানবশে প্রয়োজনকে ও কল্যাণকে অস্বীকার করব না কখনো। গরজে ও শ্রেয়োবোধে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করব যে-কোনো উপকরণ—তা কম্বোডিয়ার কি ক্যানাডার—সে বিচার করব না। ইট-পাথর আর চূণ-সুরকি যেখান থেকেই আসুক, তাজমহল রচনার গৌরব থাকবে আমারই। আর এতে বৃদ্ধি পাবে আমার ভুবন, প্রসারিত হবে আমার গগন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাময়িকপত্র

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ও মফস্বল থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। পাঠকসংখ্যা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় কম হলেও এদেশের পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে। কিন্তু এসব পত্রিকার বৈচিত্র্যহীনতা রসজ্ঞ সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক—এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য।

প্রথমেই ধরা যাক, ধর্মসম্বন্ধীয় পত্র-পত্রিকাগুলোর কথা। আমাদের বাঙলা ভাষায় ধর্মসম্বন্ধীয় যেসব পত্রিকা বের হয়, তার ভেতরকার লেখাগুলোতে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারার অবতারণা করা হয় না। ভাবপ্রবণতা, একদেশদর্শিতা, মনোমতো সত্য ও অর্ধসত্য শাস্ত্রবচন উদ্ধৃতির কচকচি, যুক্তিহীন বিশ্বাসপ্রবণতা, অলৌকিকতা প্রভৃতির জাল-জঞ্জালে ওসব লেখা প্রায় সুরুচিসম্পন্ন লোকের অপাঠ্য। এ পর্যন্ত 'ইসলামিক রিভিয়ু' ধরনের একটি পত্রিকাও বাঙলার মুসলমান সমাজে বের হয়নি, ফলে ধর্মকথা সম্বলিত যে-কোনো কাগজের প্রতিই ভদ্রলোক মাত্রই বিরূপ।

তারপর সাহিত্য পত্রিকা। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকাই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি চলে। কিন্তু নিছক সাহিত্য-আলোচনায় সীমিত থাকে না এসব কাগজের লেখাগুলো। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও ইতিহাস প্রভৃতি হরেক রকমের বিষয়বস্তু এতে সন্নিবেশিত হয়, ফলে এসব পত্রিকা এমন একটা রূপ ধারণ করে যে, বিশেষ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো চোখে এগুলোর বিকৃতি ধরা পড়ে না। প্রথমেই হয়তো প্রেম-সম্পর্কিত একটা কবিতা পড়লেন, পরপৃষ্ঠায় দেখলেন 'কোয়ান্টাম থিওরি' সম্বন্ধে এক আলোচনা যেখানে আপনি সম্পূর্ণ অনধিকারী। এর পরেই হয়তো পড়লেন একটি রোমান্টিক গল্প; গল্পের রেশ হয়তো আপনার মনে লেগেই আছে; এমনি সময়েই পরপৃষ্ঠায় দেখলেন 'শাহজাহানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ' অথবা 'ইসলামে পর্দার বিধান' গোছের কোনো আলোচনা। তারপর আবার পেলেন কবিতার সাক্ষাৎ যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সর্বহারার নিপীড়িত হৃদয়ের মর্মান্তিক বিক্ষোভ। কোনো কোনো পত্রে, শেষের দিকে রাজনীতিচর্চার কসরৎও দেখা যায়। এমনি করে আমাদের মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো এক বিচিত্র বস্তুতে পরিণত হয় !

এমন লোক আছেন, যাঁদের কেউ শুধু গল্প পড়েন, কেউ শুধু কবিতা পড়েন, কেউ বা শুধু প্রবন্ধ পড়েন আর কেউবা রাজনৈতিক আলোচনা পড়েন ; অন্যকিছু পসন্দই করেন না। এতে অসুবিধাটা দেখুন। হয়তো আপনি গল্প পড়তে ভালোবাসেন, অথচ কাগজে গল্প আছে মাত্র দুটো। এখন দুটো গল্পের জন্যে আট আনা পয়সা খরচ করা উচিত কি-না, তা-ই আপনাকে পাঁচ মিনিট ভাবিয়ে তুলল। যদি কিনলেন হয়তো পরে পস্তালেন, না কিনেও হয়তো আপনার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তেমনি যাঁরা কবিতা পড়তে চান, তাঁরা দেখেন মাত্র চারটে কি পাঁচটা কবিতা আছে, এর জন্যে আটআনা খরচ করলেও পোষায় না, আবার না-পড়েও উপায় নেই। ধরুন, বিজ্ঞান কি ইতিহাসের কোনো একটিমাত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে, বিষয়টা আপনার প্রিয়, কিন্তু শুধু ঐ একটা বিষয়ের জন্যে ছা-পোষা গরিব লোক আপনার পক্ষে আট আনা ব্যয় করা সম্ভব হল না, ফিরেই গেলেন—কিন্তু মনে মনে আফসোস রয়ে গেল। সেদিন আট আনা দিলেন না, অথচ আর একদিন তিন-চার আনা 'বাসভাড়া' দিয়ে কোনো Public Library-তে পড়ে এলেন। লাভ-ক্ষতি মিলিয়ে দেখুন। সমস্যাটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রকাশক ও পাঠক উভয়পক্ষেরই ক্ষতি, তলিয়ে দেখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কোনো সাহিত্য-পত্রিকার প্রথমে একটা চিত্রও সন্নিবেশিত হয়। চিত্রকলার এমন কী সার্থকতা, বুঝা দুঃসাধ্য। যদি চিত্রটি ব্যাখ্যা করে দেবার ব্যবস্থা থাকত, তবু নাহয় চিত্রকলায় হাতেখড়ি দেবার প্রয়াস বলে ধরে নেয়া যেত।

শুধু বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে এদেশে কোনো কাগজ আগে বের হত না, এখন হয়, কিন্তু চলে না। দর্শন বা ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে পত্রিকা বের করার কথা চিন্তাও করা যায় না। তবে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মতো প্রত্নতত্ত্বমূলক আলোচনার বিশেষ পত্রিকা আছে; কিন্তু দু-একটি মাত্র।

সম্প্রতি চলচ্চিত্র ও যৌনবিষয়ক বিশেষ পত্র বের হচ্ছে। রুচি ও আদর্শ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাইনে, তবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্যে বিশেষ বিশেষ পত্রিকার প্রকাশ-রুচি ও রসবোধের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু গল্প বা শুধু কবিতার জন্যেও কাগজ বের হতে দেখা যায়, এ অবিমিশ্র একাগ্র সাধনা মার্জিত মনের পরিচায়ক।

তারপর আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও দুর্লক্ষ্য নয়; এজন্যে কয়েকখানা মাসিক বের হয়েছে, দৈনিক পত্রে সাপ্তাহিক আসরও রয়েছে। কিন্তু এদেশে শিশু-সাহিত্যের লেখক ও সম্পাদকের এত অভাব যে, শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনো নির্দিষ্ট পথ করে নিতে পারেনি। দুই বঙ্গে মাত্র জনকয়েক লেখক অবশ্য কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেন, কিন্তু বাঙলাভাষী বিশাল শিশুসমাজের পক্ষে তাঁদের দান নিতান্ত সামান্য। যে-প্রতিভা ও সাধনা এ ব্যাপারে প্রয়োজন, এ-পর্যন্ত তা আমাদের দেশে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে যে অভাবটা বেশি চোখে পড়ে, তা হচ্ছে কাগজগুলো আকর্ষণীয় করে বের করার অসামর্থ্য। শিশু পত্রিকায় রঙ বেরঙ-এর কার্টুন, খবরের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি না থাকলে গল্প (যা প্রায় চির -পুরাতন), কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, জ্ঞানের কথা বা উপদেশের মুরুব্বিয়ানা শিশুচিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। য়ুরোপ-আমেরিকার কাগজগুলোতে চিত্র, কার্টুন ছাড়া একটা পৃষ্ঠাও নেই। আমাদের মনোভাবও এর অভাবের জন্যে দায়ী। আমরা বিজ্ঞতা দেখাতেই ব্যস্ত, বোকা সাজতে জানিনে। ফলে হালকা কথা, হালকা হাসি আমাদের মুখে ফোটেই না। জ্ঞানগর্ভ কথা ছাড়া অন্য কথা আমাদের মনোমতো হয় না। আমরা যা পসন্দ করি, তাই শিশুকে পরিবেশন করতে চাই। এজন্যে আমাদের দেশে উৎসাহী শিশুপাঠকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনেকেই অভিভাবকের উপদেশ রক্ষার জন্যেই শিশু-পত্রিকাগুলো নাড়াচাড়া করে।

AMARBOI.COM

ছোটদের কথা গেল, বড়দেরও চিত্র, কার্টুন ও ফটোর প্রতি আকর্ষণ কম নয়। আমাদের দেশে ইংলন্ড-আমেরিকা থেকে যে-সব কাগজ আসে, তাদের অধিকাংশই চিত্র, কার্টুন ও ফটোতে পূর্ণ। এজন্যে আমাদের দেশে Illustrated weekly-র এত কদর। অথচ আজ পর্যন্ত বাঙলাভাষায় এরূপ একটা কাগজের কথা কল্পনাও করতে পারি না। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে !

আমরা আগেই বলেছি, রুচি আদর্শের কথা বলব না; কেননা সম্পাদকের যোগ্যতা, রুচি ও আদর্শ পাঠকের রুচি ও আদর্শকে মার্জিত, সুস্পষ্ট ও বিকশিত করে তুলবে। স্বদেশী-বিদেশীর অনুকরণ-স্বীকরণ প্রভৃতি সম্পাদকের প্রতিভা ও যোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল এবং পাঠকগোষ্ঠীর রুচি ও আদর্শ গঠনও সম্পূর্ণ নির্ভর করে সম্পাদকের উপর।

আমাদের শেষ বক্তব্য হচ্ছে ; আমাদের দেশেও বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির জন্যে বাঙলাভাষায় পৃথক পৃথক সাময়িকপত্র বের হোক। সিনেমা, চিত্রশিল্প, যৌনবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সবকিছুরই আলোচনা হোক পাঠকের রুচি গরজ ও ঝোঁক অনুসারে। পাঠক এতে একান্তভাবে তার নিজের জ্ঞাতব্য নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর পরিবেশিত খিচুড়ি গেলার দায় থেকে পাঠকসাধারণ মুক্ত হোক—আমরা এ-ই চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র

১

বাঙালি যে গোত্র-সঙ্কর জাতি তা সবই স্বীকার করেন[১]। সঙ্করজাতির ভাষাও মিশ্রভাষা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি হয়নি। বাঙলা ভাষায় এদেশের সব গোত্রীয় অধিবাসীর বুলির উপাদান থাকলেও এর মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে আর্যভাষার এক বুলি ভিত্তি করে।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার না করে সাধারণভাবে বলা যায়, এদেশের অধিবাসী হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল গোত্রীয় লোক[২]। কাজেই অনুমান করতে হবে যে 'আধুনিক বাঙলা' নামের আর্যবুলির আগে এদেশে বিভিন্ন গোত্রীয় বুলিগুলো চালু ছিল; এবং গোত্রগুলোর পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ও লেনদেনের প্রয়োজনে হয়তো কোনো প্রবল কিংবা সংখ্যাগুরু গোত্রের ভাষা Lingua Franca-রূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তার কোনো আভাস পাইনে। এতে বোঝা যায় তাদের যে কেবল লিখন-পদ্ধতি জানা ছিল না তা নয়, তাদের সাংস্কৃতিক মানও নিতান্ত আদিম পর্যায়ে ছিল। মুণ্ডা, কুরুক, বোরো, সাঁওতাল, নাগা, খাসী, কুকী প্রভৃতি গোত্রের আজকের দিনের ভাষায় ও আচারে-সংস্কারে[৩] তার পরোক্ষ আভাস মেলে। কবে যে এদেশে আর্য-বসতি ও আর্যপ্রভাব শুরু হয়, ইতিহাস তা সঠিক বলতে পারে না। তবে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে[৪] বিশেষ করে জৈন-বৌদ্ধ মত প্রচারের জন্যেই বাঙলা দেশে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটে[৫]। সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—"এদেশে আর্যভাষা অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দী হতে প্রচলিত আছে।"[৬] তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি "ইরান হইতে ভারতবর্ষে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দুই বা ততোধিক ধারায় আসিয়াছিল[৭]" এবং অর্বাচীন ধারার কাছে ব্রাত্য নামে অভিহিত প্রাচীন ধারার "ব্রাত্যরাই বাঙলা দেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রথম বাহক ছিল বলিয়া" মনে করেন[৮]। অনার্য ভাষা ও সংস্কৃতির নিদর্শনের বিরলতাই তাঁকে সম্ভবত অনুমানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের ধারণায়, জৈন-বৌদ্ধমত প্রচারসূত্রেই বাঙলা দেশে উল্লেখ্য আর্যবসতি ঘটে এবং এ সময় থেকেই জৈন-বৌদ্ধমতের মাধ্যমে এদেশবাসী আর্যভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে[৯]। এই দুই মতবাদের উদ্ভব-ক্ষেত্র ছিল বিহার। আধুনিক বিহার গড়ে উঠেছে সেকালের অঙ্গ, বিদেহ ও মগধ রাজ্য নিয়ে। দেব-দ্বিজ ও বেদদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত হচ্ছে আর্য ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অনার্য অভ্যুত্থান[১০]। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং অনার্য বংশ-সম্ভূত; তা তাঁর জন্মস্থান, বংশের নাম ও চেহারা থেকে বোঝা যায়[১১]। অনেক জৈন তীর্থঙ্করের জন্মস্থান, সাধনা আর প্রচারক্ষেত্রও বাঙলা দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ[১২]। অতএব কারুর অস্বীকৃতির আশঙ্কা না করেই বলা চলে, আজীবক ও জৈন-বৌদ্ধমত সম্বল করেই উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্যভাষা ও সংস্কৃতি বাঙলা দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আর অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েই তা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়। জৈনমত সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যায়নি, কিন্তু বৌদ্ধমত বাঙলার সর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাল আমলে বৌদ্ধমত রাজধর্মের মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে বিচিত্র বিকাশের সুযোগ লাভ করে। এ কারণে পাল রাজত্ব বাঙলার ও বাঙালি সংস্কৃতির সোনার যুগ[১৩]।

তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে বাঙলা দেশে আর্যভাষা চালু হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ ভাষার নাম রেখেছেন প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত। তাঁর অনুমান গৌতম ও মহাবীর এ ভাষায় কথা বলতেন[১৪]। অতএব জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে এ ভাষারই লিখিত রূপ পাই। আমরা জানি কোনো বুলিরই লেখ্য ও কথ্যরূপ এক হতে পারে না। লেখ্যভাষা গভীর ও বিচিত্রভাববাহী হয়ে শালীন ও মার্জিত রূপ ধারণ করে। এ যদি সত্য হয়, তাহলে এ সময়কার কথ্য প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত কিছুটা বিকৃত ছিলই। ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্প্রতি অর্ধমাগধী ও মাগধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

প্রাকৃতের সমস্তরের গৌড়ী প্রাকৃতকেই বিহারী, উড়িয়া ও বঙ্গকামরূপী বুলির জননী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মতে :

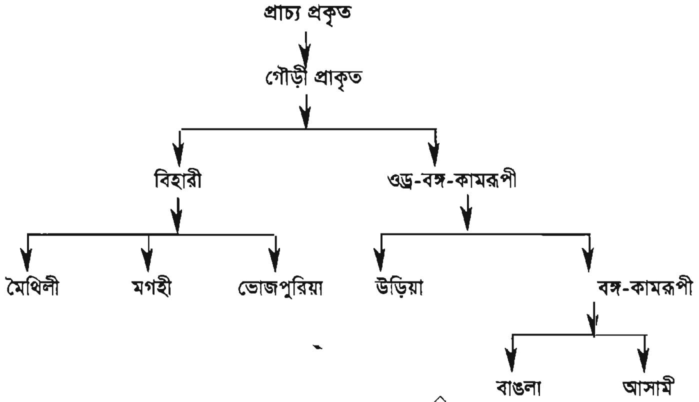

আর জর্জ গ্রিয়ার্সন ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাঙলা ভাষার উদ্ভব[১৬]। ডক্টর শহীদুল্লাহর গৌড়ী প্রাকৃতে ও অন্যান্য মাগধী প্রাকৃতে কেবল নামেই তফাৎ, কেননা ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বিহারকে গৌড়ী- প্রাকৃতের আওতাভুক্ত করেছেন। অথচ এই বিহারের এক অংশই ছিল মগধ। বিশেষ করে তাঁর গৌড়ী-প্রাকৃত এবং গিয়ার্সন ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলো অভিন্ন[১৭]। তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তিনি মাগধী প্রাকৃতকে দেশছাড়া করেছেন, বেদিয়া-জিপসির ভাষাতেই খুঁজেছেন এই ভাষার জীবন্ত বিবর্তন[১৮]। আর্যভাষা বাঙলা দেশে যখনই আসুক, এসেছে বিহার হয়েই[১৯]। মৌর্য ও গুপ্তবংশের শাসন-কেন্দ্র আর্যাবর্ত ঘেঁষা বিহারের আর্যসংস্কৃতি পুষ্ট ও আভিজাত্য-গর্বী অধিবাসীরা গৌড়ীয় 'আসুরিক' ভাষার প্রভাবে পড়েছিল, এই কথা ভাবতে অদ্ভুত ঠেকে। এমনকি পাল আমলে বাঙলার সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল বাঙলার বাইরে—বিক্রমশীলা, উড্ডিয়ানা ও নালন্দায়। কাজেই প্রাচ্য-প্রাকৃতের আদি মঞ্জিল মগধের নামে একে মাগধী প্রাকৃত বলাই সঙ্গত। ভাষা হচ্ছে বহতা নদীর মতো ; জনে জনে, যুগে যুগে ও অঞ্চলে অঞ্চলে তার বিচিত্র বিকৃতি ঘটেছে। সেই বিকৃতির উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ করেই[২০] ডক্টর শহীদুল্লাহ গৌড়ী-প্রাকৃত কল্পনা করেছেন এবং দণ্ডী প্রমুখ পণ্ডিতের উক্তিতে সমর্থন খুঁজেছেন[২১]। আজকের বাঙলা দেশের আঞ্চলিক বুলিগুলোর ধ্বনি ও রূপে এত তফাৎ যে, এগুলো যে একই জননীর সন্তান তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য; তাই বলে কি আমরা প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যে পৃথক প্রাকৃত, অপভ্রষ্ট ও অবহট্‌ঠ কল্পনা করব?

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "কথ্য সংস্কৃত হইতে কথ্য প্রাকৃত এবং তাহা হইতে বাঙলার উৎপত্তি। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কথ্য সংস্কৃতের যে রূপ চলিত ছিল তাহা ক্রমে প্রাচ্য-প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের আগেই। এই প্রাচ্য-প্রাকৃত কালক্রমে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহাকেই বলা হয় প্রাচ্য অপভ্রংশ।

এই প্রাচ্য অপভ্রংশের অর্বাচীনরূপ অবহট্‌ঠ। অবহট্‌ঠ পরে (আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) তিনটি আঞ্চলিক আধুনিক আর্যভাষায় পরিণত হয়। পশ্চিমে বিহারী, উত্তর-পশ্চিমে মৈথিলী এবং পূর্বে বাঙলার উড়িয়া। বিহারী ভাষা হইতে আধুনিক ভোজপুরী (পশ্চিম-বিহারে) ও মগহী (দক্ষিণ-বিহারে) আসিয়াছে। বাঙলা হইতে আরো পরে অসমীয়া উৎপন্ন হইয়াছে[২২]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সংস্কৃত' এ নামেই প্রকাশ এটি 'কথ্য' হতে পারে না। এ বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতই সুচিন্তিত ও সুযৌক্তিক বলে মনে করি। তাঁর মতে লেখ্যবৈদিক ভাষার পাশে কথ্য যে সমকালীন ভাষা ছিল[২৩], সেই প্রাচীন বুলি থেকে ক্রমবিবর্তনে আমাদের বাঙলা ভাষা গড়ে উঠেছে। পীঠিকায় এরূপ দাঁড়ায়[২৪] :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০ — ৮০০ খ্রী. পূ.)
২ প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য বা আদি প্রাকৃত (৮০০ — ৫০০ খ্রী. পূ.)
৩. প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত (৫০০ খ্রী. পূ. — ২০০ খ্রী.)
৪. গৌড়ী প্রাকৃত (অপর মতে মাগধী) (২০০ — ৪৫০ খ্রী.)
৫. গৌড়ী অপভ্রংশ (অপভ্রষ্ট) (৪৫০ — ৬৫০ খ্রী.)
৬. প্রাচীন বাঙলা যুগ (৬৫০ — ১২০০ খ্রী.)

ডক্টর সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে[২৫] :

১. ১৫০০/১২০০ — ৫০০ খ্রী. পূর্বাব্দ
২. ৬০০ — ২০০ খ্রী. পূর্বাব্দ
৩. ২০০ খ্রী. পূ. — ২০০ খ্রীস্টাব্দ
৪. ২০০ — ৬০০ "
৫. ৬০০ — ১০০০ "
৬. ১০০০ — ১২০০ "

কথ্যভাষা বিভিন্ন স্তরের, গোত্রের ও অঞ্চলের লোকের মুখে বিচিত্র বিকৃতি লাভ করে। আর কথ্য ভাষা যখন লিখিতও হয়, তখনো কথ্য ও লেখ্য কথায় তফাৎ কম থাকে না[২৬]। লিখিত কথ্যের ব্যাকরণ চেতনাজাত বিশুদ্ধি ও শব্দচয়ন ও বিন্যাস প্রসূত লাবণ্য কথ্য বুলিতে দুর্লভ এবং কথ্যভাষা বা বুলিই দ্রুত পরিবর্তনশীল। লেখ্য ভাষা কৃত্রিম উপায়ে অবিকৃত রাখার চেষ্টা চলে। তাই লেখ্য ভাষার রূপান্তর অত্যন্ত মন্থর। সেজন্যে আমাদের ধারণায় প্রাচীন ভারতিক কথ্য বুলি থেকে কথ্য প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত ; তার থেকে কথ্য মাগধী প্রাকৃত এর গৌড়ীয় বিকৃতি, অপভ্রষ্ট; তার থেকে অর্বাচীন অবহট্‌ঠ, তার থেকে প্রাচীন বাঙলা, উড়িয়া ও আসামী ভাষা উদ্ভূত হয়েছে।

আমাদের বাঙলা কিংবা সংস্কৃত অবিমিশ্র আর্যভাষা নয়। অনেক অনার্য শব্দ, ধ্বনি, রূপতত্ত্ব বা পদরূপ Morphology ও বাক্যরীতি বা পদক্রম syntax এ ভাষা গোড়া থেকেই আত্মস্থ করেছে[২৭]। এগুলোর উত্তরাধিকার তো রয়েইছে, তাছাড়া প্রাকৃত, অপভ্রষ্ট ও নব্য ভারতীয় বুলিও বিভিন্ন স্তরে নানা অনার্য উপকরণ-উপাদান নিয়ে হয়েছে পুষ্ট। এমনি করে সংস্কৃত যুগে উত্তরভারতীয় অনার্য, বিদেশী পহলভী ও গ্রীক শব্দ সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারকে ঋদ্ধ করেছে। বাঙলায় এসব ছাড়াও দেশী কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, মুণ্ডা, বিদেশী ফারসি এবং এর মাধ্যমে আরবি ও তুর্কী; আর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজি এবং এর মাধ্যমে ইয়োরোপীয় ল্যাটিন আদি যাবতীয় ভাষার শব্দ, একালে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠার ফলে পৃথিবীর উল্লেখ্য সব ভাষারই দু-চারটি করে শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে বা করছে। বাঙলা শব্দসম্পদকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়: তৎসম (সংস্কৃত সম), তদ্ভব (সংস্কৃত জাত), অর্ধ বা ভগ্ন তৎসম (বিকৃত সংস্কৃত সম), দেশী (কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, মোঙ্গল) ও বিদেশী। এদের মধ্যে ফারসি শব্দের সংখ্যা প্রায় চার হাজার, এবং বাঙলা শব্দকোষের শতকরা চার ভাগ, ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজি শতকরা প্রায় দুই ভাগ (চিকিৎসা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২
আশ্চর্যচর্যাচয় বা চর্যাগীতি

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ-গ্রন্থাগার থেকে এক পুথি আবিষ্কার করেন। এটি একটি পদ বা গীতির সঙ্কলন গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৩২৩ সন। পুথিটি মুনি দত্ত নামের এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা সম্বলিত। এই সঠিক গ্রন্থের টীকাকার-প্রদত্ত নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (অবস্য চর্যাচর্য বিনিশ্চয় রূপে লিপীকৃত)। এজন্যে পদসংগ্রহের শুদ্ধ নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়' ছিল বলে অনুমান[২৮] করা হয়। আমাদের আলোচনার ভাষায় চর্যাগীতি বা চর্যাকোষ। সঙ্কলন গ্রন্থে মোট একান্নটি গান ছিল[২৯]। মুনিদত্ত একটা বাদ দিয়েছেন। প্রাপ্ত পুথিতে তিনটি পদ খোয়া গেছে; অপর একটির অর্ধেক নেই। কাজেই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ ও তেইশ জন পদকারের নাম পাচ্ছি। তবে ভণিতায় যার নাম রয়েছে তিনিই রচয়িতা এমন অনুমান করা চলে না। কেউ কেউ গুরুর নামে ভণিতা দিয়েছেন। তা বুঝি নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা'-এর যোগে। কতগুলি স্পষ্টতই ছদ্মনাম। যেমন কুক্কুরী, বীনা, তন্ত্রী, ডোম্বী, তাড়ক, কঙ্কন, শবব্[৩০]। এঁদের কেউ কেউ প্রখ্যাত চোরাশী সিদ্ধার অন্তর্ভুক্ত [চোরাশী অঙুলি পরিমিত দেহে সাধনায় সিদ্ধ যে, সে-ই চোরাশী সিদ্ধা]।

চর্যাগীতি বৌদ্ধ মহাযান মতের উপশাখ তান্ত্রিক বজ্রযান সম্প্রদায়ের বামাচারী-সহজিয়া-যোগী-শৈব পন্থের সাধন-ইঙ্গিত সম্বলিত রূপক রচনা। এতে তৎকালীন বিভিন্ন মতের মিশ্রণ ঘটেছে[৩১]। এ রূপকাশ্রিত হেঁয়ালি 'সান্ধ্যভাষা'য় রচিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর নাম দিয়েছেন 'আলো আঁধারী' ভাষা। এই ধর্মমত, সাধনতত্ত্ব ও রচনারীতির অনুবর্তন রয়েছে নাথপন্থী, বৈষ্ণব সাহজিয়া[৩২] ও বাউলদের মধ্যে ! গোরক্ষ-বিজয়ে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে ও বাউল গানে তা আজও সুলভ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরে বিজয় চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মণীন্দ্র মোহন বসু, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর সুকুমার সেন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও উড়িয়া-আসামী বিদ্বানেরা চর্যাগীতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে লঘু-গুরু অনৈক্য রয়েছে বহুবিষয়ে। ডক্টর সুনীতিকুমার ও তাঁর অনুসারীরা চর্যার ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চর্যাগীতিকে দশ থেকে বারো শতকের রচনা বলে মত দিয়েছেন[৩৩]। ডক্টর শহীদুল্লাহ ও তাঁর মতের সমর্থকেরা তিব্বতী সূত্রে প্রাপ্ত চৌরাশী সিদ্ধার আবির্ভাবকালের উপর আস্থা রেখে মনে করেন সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যেই চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল[৩৪]।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস Dev-ther snon-Po-এর জর্জ রোরিককৃত অনুবাদ The Blue Annals আর Bu Ston Rin-Po. Che-এর E. Obermiller-কৃত অনুবাদের আলোকে সুখময় মুখোপাধ্যায় চর্যালেখক সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অনুমান ৭৫০-১০৫০ সনের মধ্যে চর্যাগীতিগুলো রচিত হয়েছিল[৩৫]। আমরাও তাঁর অনুমান যৌক্তিক বলে মনে করি।

৩

বাঙালি রা চর্যাপদকে বাঙলা বলেই জানে। এবং বারো শতক অবধি চর্যাপদের রচনাকাল বলে মানে। এর পরে তেরো শতক থেকে চৌদ্দশ' পঞ্চাশের মধ্যেকার কোনো বাঙলা রচনার নিশ্চিত নিদর্শন মেলে না; তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন. এ সময় বাঙলার কিছুই রচিত হয়নি এবং তাঁরা তুর্কী বিজয়কেই এজন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, বিজয়ের ফলে দেড়শ'-দু'শ কিংবা আড়াইশ' বছর ধরে বাঙলা দেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চলে। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির উপর বেপরওয়া ও নির্মম হামলা চলে। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর মধ্যে মাটি কামড়ে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন- রজনী গুনে গুনে রইল। কাজেই নতুন করে কিছু তো হলই না, সাহিত্য-সংস্কৃতির যা ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও লোপ পেল। এই হল তাঁদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। এসব উক্তির মূলে যে কোনো তথ্য নেই, তা বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করা চলে।

এক. উত্তরভারতে আগেই তুর্কী বিজয় ঘটেছিল, সেখানে শতাব্দব্যাপী রক্ত ও আগুনের বিভীষিকার কথা শোনা যায় না; বাঙলা তো দিল্লীর সুলতানের অভিপ্রায় ক্রমেই বিজিত হয়। লক্ষণসেন বাধা দেয়ার চেষ্টা না করেই পালিয়ে গেলেন, কাজেই বখতিয়ার বিনাযুদ্ধেই পেলেন উত্তরবাঙলার অধিকার। যেখানে রাজা কিংবা প্রজা রুখে দাঁড়ায়নি, সেখানে অহেতুক পীড়ন চালানোর কথা নয়। প্রায় একশ বছরেরও অধিককাল ধরে তুর্কীরা বাঙলা দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম অঞ্চলেই আধিপত্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের শাসনে আর পূর্ববঙ্গও ছিল সেন-সামন্তদের অধীনে। বাঙলা ভাষায় তখন সাহিত্যরচনার রেওয়াজ থাকলে হিন্দুশাসিত এসব অঞ্চলের সাহিত্য পাওয়া যেত।

দুই. ১২০৪ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি ৩৫৫ বছরের মধ্যে [বখতিয়ার খলজী থেকে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ ওর্ফে আবদুল বদর অবধি, History of Bengal vol II-এর অনুসরণে] হিন্দু পীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন বখতিয়ার খলজী (১২০৪-০৬), আলী মর্দান (১২১০-১৩), মালিক তাজুদ্দীন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫), সোনার গাঁয়ের ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৫০) এবং শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩)। এঁদের রাজত্বকালে একুনে বিশ বছর[৩৬]। অবশিষ্ট ৩১৫ বছরের ফসল কী!

তিন. সেনরাজারা নিম্নবর্ণের লোকদের লেখাপড়া করার সুযোগ দেননি[৩৭]।

চার. ব্রাহ্মণ্যবাদী ও উচ্চবর্ণের বৌদ্ধেরা সংস্কৃতেই লিখতেন, তাই তুর্কী বিজয়ের আগেকার কোনো বাঙলা রচনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

পাঁচ. শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোনো অবহট্‌ঠে লিখবার রেওয়াজ ছিল না[৩৮]। গৌড়ী অবহট্‌ঠে লিখবার রেওয়াজ চালু না হয়ে থাকলে বাঙলাতেও থাকার কথা নয়।

ছয়. এ সময় বাঙলা পদাদি রচিত হলে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' সংকলিত হত। অথবা এরূপ বাঙলা সংকলন থাকত।

সাত. মুসলমানেরা নিশ্চয়ই বেছে বেছে বাঙলা বইগুলোই নষ্ট করেনি, বাঙলায় বই থাকলে সেন-দরবারে রচিত কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে এগুলোও থাকত। তুর্কী অধিকারেও নিশ্চয়ই সব বাড়ি ও সব মন্দির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়নি। এছাড়া হিন্দুশাসিত অঞ্চল তো ছিলই।

আট. এ সময় বাঙলায় কিছু রচিত হলেও আগুন-পানি-উই-কীটে ধ্বংস করেছে অথবা জনপ্রিয়তা হারিয়ে তথা পাঠকের অভাবে অযত্নে লোপ পেয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, শেখ শুভোদয়া বা চর্যাগীতির একাধিক পুথি পাওয়া যায়নি।

৪

এবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি যে বাঙলা এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবীদার। ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকামার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালি বিদ্বানেরাও ওদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন[১]। সব সিদ্ধার বাড়ি বাঙলায় নয়, বাঙলা তখনো শালীন ও লেখ্য সাহিত্যের ভাষা নয়—আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যা, মিথিলা কিংবা আসামের লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব মানতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য (গৌড়ী ?) অবহট্‌ঠে রচিত। সে সময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা-আসামী অবহট্‌ঠ মোটামুটি অভিন্ন ছিল। নাথ-সহজিয়া পন্থের অন্যতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ। কাজেই মানিকচাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদের দেশে (আধুনিক কুমিল্লাদি জেলা) বহুল চর্চার ফলে (নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীশাদি পূর্ববাঙলার লোকেরাই নিয়ে যান) চর্যাগীতিতে বঙ্গ-গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে[৪]। এতেই জোরালো হয়েছে বাঙলার দাবী।

মুনিদত্তের টীকাযুক্ত চর্যাগীতি নেপালে পাওয়া গেছে নেওয়ারী হরফে লিখিত পুথিতেই। বিদেশে বিভাষীর পক্ষে ভিন্ন ভাষার অলিখিত শাস্ত্রের চর্চা সম্ভব নয়। কাজেই চর্যাগীতি নেপালে স্বাভাবিকভাবেই লিখিত ও টীকা-সম্বলিত হয়েছে। কিন্তু আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও তার লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। নাথ-সহজিয়া পন্থ যোগতান্ত্রিক বজ্রযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা। কাজেই এই উপসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি ছিল না এবং তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করেনি। অতএব সেকালের বাঙালি -বিহারী-আসামী-উড়িয়া সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবী বা যোগ্যতা এদের ছিল না। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। শাস্ত্রচর্চার ও শাসন পরিচালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহট্‌ঠেরও লেখ্যরূপ মেলে না। গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠেই যদি লেখার রেওয়াজ না থাকে, তাহলে তখনো নিতান্ত অবজ্ঞেয় আঞ্চলিক মুখের বুলি আসামী-বাঙলা-উড়িয়া-বিহারীতেই বা লেখ্য রচনার সম্ভাব্যতা কোথায়? কাজেই এদেশে চর্যাগীতির কোনো লেখ্যরূপ ছিল না এবং এগুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকসাহিত্য বা লোকায়ত শাস্ত্ররূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা।

অতএব আমাদের অনুমান এই যে, চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়—অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্‌ঠ এবং মৌখিক রচনা। কেবল ডক্টর শহীদুল্লাহ আর ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ই নন, ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন, "অসমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি বাঙলা ও অসমীয়া দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না[২]" এবং "উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে ওড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে[৩]।" কাজেই ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা, ওড়িয়া, মৈথিলি ও অসমীয়ার উদ্ভব। ডক্টর সুকুমার সেন এর নাম দিয়েছেন 'প্রত্ন-বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া[৪]'। এই সাধারণ স্তর আমাদের ধারণায় অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ স্ফুটনকালীন অবহট্‌ঠ। অতএব চর্যাগীতি কেবল বাঙলার নয়, উক্ত অপর ভাষাগুলোরও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সবকয়টি ভাষার জননী[৫]।

তবে অধিকাংশ চর্যাগীতি বাঙলা দেশের আবহে এবং বাঙালি র রচিত তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলাদেশ, বঙ্গাল জাতি, পঁউয়া (পদ্ম) খাল, বঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ, সাধারণের প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেয়া রূপপ্রতীক—তুলা-ধূনা, নৌকা চালান, মদ চোলাই করা, নদীঘাট থেকে জলভরা, সাঁকো তৈরি করা, দাবা খেলা, শবরবৃত্তি, গোয়ালবৃত্তি প্রভৃতির রূপক সেকালের নিম্ন ও নিঃস্ব শ্রেণীর সমাজ-চিত্র দান করছে[৬]। এমনটি বৈষ্ণব পদাবলীতেও মেলে না, সেখানে রাধা-কৃষ্ণ সমাজ ও বাস্তব জীবনকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন।

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্য-সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল পাক-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলে লোকের ভাব-বিনিময়ের বাহন। তাই কোনো অঞ্চলের মধ্যে আর্য-ভারতিক বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায়নি। বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—'পালি ও প্রাকৃত' সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্র শাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়[৭]।

এর পরে মুসলমান আমলে ফারসি হল দরবারি ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাববিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, কবীর, নানক, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভালো। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ, তন্ত্র ও শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্যভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল—চৈতন্য প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের, হিন্দু-সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানির শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেনি, কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

শিক্ষার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোকের ভাষা। সেকালে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বুলিতেই। এভাবে তারা গান, গাথা, ছড়া, বচন ও রূপকথা-রসবার্তা তৈরি করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। বহু মুখের স্পর্শে ওগুলো রূপ ও রস বদলায়, ফলে ও-সবকে ব্যক্তির রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই আজকাল ঐ সাহিত্যকে গণরচনা বলে নির্দেশ করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় ঐগুলোই লোক-সাহিত্য বা পল্লী-সাহিত্য। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লী-সাহিত্য সাহিত্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস-প্রসূতও নয়। তবু মানবমনের কোমল অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ বলেই এগুলো সুন্দর এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পুষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃতজনের রচনা লোক-সাহিত্যের মাধ্যমেই। বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে শেখশুভোদয়া ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কয়েকটা পদ, ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবচন, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, যোগাপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত (অপ্রাপ্ত), ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গীত, মীননাথ, গোর্খনাথ-হাড়িপা-কাহিনী, শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালি, ভারত কথা প্রভৃতি আর শিলা বা তাম্রলিপিতে এবং বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকা সর্বস্বে, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে, শূন্য পুরাণে প্রাপ্ত কিছু শব্দ। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাহিনীগুলো রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ কাহিনী ময়নামতী-গোপীচাঁদ কথা গাথা রূপেই রয়ে গেছে, এবং পালগীতি লোপ পেয়েছে।

অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন বা রাজ্যশাসনের বাহন কিংবা প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি[৮]। এখানে বলে রাখা ভালো, মুসলমান সুলতান-সুবেদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পোষকতা করেন। লেখ্য-ভাষা বইপত্র ছাড়া শেখা যায় না। কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেমনটি হয়েছিল। আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে! বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব আলোচ্য দু'শ বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না মেলার অনুমিত কারণ এই :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্য শাসনের বাহন হয়নি বলে বাঙলা তুর্কী বিজয়ের পূর্বে লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি।

খ. ফলে, তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা ভাষা উচ্চবিত্তের লোকের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। এ সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গান, গাথা ও ছড়া-পাঁচালিই চলত।

গ. সংস্কৃতেতর কোনো ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয়নি। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই প্রাকৃতজনেরা গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ও শৌরসেনী অবহট্‌ঠই ছিল। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ভাষায় রচন, পঠন ও শ্রবণ ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃতের মাধ্যমে বৌদ্ধশাস্ত্রেরও চর্চা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা ও সম্ভাব্যতা কোনো উচ্চশিক্ষিত লোকের মনে জাগেনি। পাল ও সেন আমলে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে এবং মুসলমান বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেককাল গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এতেই ভাষা বিকশিত হয়েছে; তার প্রমাণ মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তথা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে। এ গ্রন্থেই দেখা যায়, ইতিমধ্যে এক ডজন ফারসি-তুর্কী শব্দ বাঙলা-সাহিত্যের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ঘ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দুশাসিত মিথিলায়। তাই এ সময় বাঙলা দেশে সংস্কৃতচর্চা বিশেষ হয়নি, কেবল কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল। মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ূধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চার তথা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে।

ঙ. তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে আলোচ্যযুগে বাঙলায় কিছু কিছু পুথিপত্র রচিত হয়েছিল, তাহলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। যত্ন করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পায়। আগুন-পানি-উই-কীট তো রয়েইছে। কিন্তু আলোচ্য যুগে যে ভাষায় কিছু লিখবার রীতি ছিল না, তার বড় প্রমাণ পনেরো শতকের শেষাবধি নানা মঙ্গল গীতি, রামায়ণ গান, ভারত পাঁচালি এবং বিশ শতকেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়নামতীর গানের লিখিতরূপ পাওয়া যায়নি। অথচ এগুলো সুপ্রাচীন।

চ. আবার লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), শেখশুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তাহলে তেরো-চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠন-যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়ে কোনো লিখিত রচনা না থাকারই কথা। চর্যাগীতি ছাড়াও বারো শতকের বাঙলা-ঘেঁষা রচনার নমুনা মেলে 'শেখশুভোদয়া'র আর্যার ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোনো কোনো পদে। বাঙলা তখন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা বাঙলা কবিও দেখতে পেতাম। এবং পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়ের মতো হিন্দুশাসিত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যেত।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায়-লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কী বিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না। এবং মুসলিম বিজয়ে তাদের মূর্ছাহত হবার কথাও নয় বলে তাদের রচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবার কারণ ঘটেনি। কেবল তা-ই নয়, বাঙলা লেখ্য-ভাষা হলে গৌড় সুলতানের দরবারে রাজ্য-শাসনের প্রয়োজনে গোড়া থেকেই অন্তত বাঙলা ফরমান লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায়নি, লৌকিক দেবতার পূজা-প্রচার প্রয়াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দুর রচনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচার যতই তীব্র হোক, তা দেড়শ-দু'শ বছর অবধি চলতে পারে না। সাত-আট পুরুষ ধরে পীড়ন চালানোর পরেও দেশে হিন্দু প্রজা রইল ; তাদের খাওয়া-পরার, বিয়ে করার আর ধর্মরক্ষার অধিকারও রইল ; আর আনুষঙ্গিক উৎসব-পার্বণও চলছিল নিশ্চয়ই প্রাকৃত পৈঙ্গল, সদুক্তি কর্ণামৃতও সংকলিত হল এ-সময়ে ; কেবল বাধা পেল গান-গাথা রচনায় ও কথকতায়—এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণের জন্যে কল্পনার অতিপ্রাকৃত প্রসার প্রয়োজন। আমরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ আর দাঙ্গার দিনেও সাহিত্য রচিত হতে দেখেছি ; পারিবারিক ও সামাজিক আনন্দ-উৎসবও চলতে দেখেছি অবাধে। সাত-আট পুরুষ ধরে মানুষ ত্রস্ত ও স্তব্ধ থাকতে পারে না। বাঙলায় লিখিত রচনার রেওয়াজ থাকলে তার নিদর্শন আমাদের হাতে আসতই।

পরাধীনতার গ্লানি হিন্দুর মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চারশ বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয়নি, বাঙলা দরবাবি কিংবা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি বলেই।

অতএব আমাদের অনুমান এই যে : বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এই হচ্ছে বাঙলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।

৫

বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় পেতে হলে বাঙালি র পরিচয় নিতে হবে। নইলে এ সাহিত্যের স্বরূপ ধরা যাবে না।

আর্যেরা ছিল প্রাকৃত শক্তির পূজক। তাদের প্রভাবেই হয়তো এদেশে প্রাকৃত শক্তিকে জয় করবার প্রয়াস বিশেষ দেখা যায়নি। সে-শক্তিকে তোয়াজে তুষ্ট রেখে জীবন যাপনের চেষ্টাই হয়েছে চিরকাল। অরি ও ইষ্ট শক্তির পূজাই বাঙালি র ধর্ম। বাঙলা দেশের ভোগেচ্ছু অনার্য মানস একান্তভাবে জীবনমুখী। তাই এদেশে বৃহৎ ও মহৎ আদর্শচেতনা কিংবা আধ্যাত্মবোধ তত তীব্র ছিল না কখনো, যত প্রবল ছিল জীবনোপভোগের প্রয়াস। উপনিষদের মহৎ বাণী, নির্বাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব কিংবা গীতার জীবনবোধ বা শঙ্করের জ্ঞানবাদ তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারেনি[১]। তাই এদেশে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি আদর্শ এত বিকৃত হয়েছে ! অনার্য বাঙালি র প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারই বারবার বহিরারোপিত শাস্ত্র ও নীতিবোধের উপর জয়ী হয়েছে[২]। বাঙালি ভোগেচ্ছু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ, তাই দৈবশক্তি ও তুকতাকের উপরই তার ভরসা। পৌরুষ প্রয়োগে তার উদ্যোগ কম। ইহ-জীবনবাদী এসব মানুষের দেবতাও ইহকালীন জীবন-বিধাতা[৩]। মনসা, শীতলা, শনি প্রভৃতি অরি দেবতার পূজায় যেমন একদিকে পার্থিব অকল্যাণ এড়ানোর ভরসা পেয়েছে ; তেমনি লক্ষ্মী, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির সেবায় সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্যের আশ্বাস লাভ করেছে[৪]। তাই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের নিয়ন্ত্রী মহৎ ধর্মশাস্ত্রে তারা খেই পায়নি।

অতএব আদিকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে কোনো বহিরারোপিত ধর্মমত বা জীবনাদর্শ বাঙলা দেশে টেকেনি, বাঙালি রা সবসময় নিজেদের জীবন-জীবিকার গরজমতো ধর্মমত ইষ্টদেবতা এবং জীবনদর্শন তৈরি করে নিয়েছে[৫]। যখনই জীবন-জীবিকায় বিপর্যয় বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখনই বাঙালি নিজের পসন্দমতো দৈব আশ্রয় খুঁজেছে।

এতে বাঙালি চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়েছে। সাহিত্য মানুষের মানস-মুকুর। তাই সাহিত্য থেকেই জাতির অকৃত্রিম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালি চরিত্রের যেরূপ প্রতিফলন হয়েছে, তাতে নানা বিরুদ্ধ-গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধন ভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য[৬]।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালি সাহিত্যে বিশেষ করে বাঙালি র এই চরিত্র—এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্ট-দেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণপ্রাচুর্যের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তার স্বধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোনো ধর্ম, কোনো নীতি-আদর্শ সে মনেপ্রাণে বরণ করে নেয়নি। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে, কিন্তু হৃদয়ানুভূতি গোচর না হলে কিছুই গ্রহণ করে না। তাই সে মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায় কিন্তু আচরণে প্রয়োজনকেই কেবল স্বীকৃতি দেয়[৭]।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালি মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী, কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে আধ্যাত্মবাদীর ভাষায় বস্তুবাদী, গণভাষায় জীবনবাদী এবং নীতিবিদের ভাষায় ভোগবাদী। এজন্যেই নৈরাশ্য ও নিরীশ্বরবাদী নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালি স্বীকার করে নিলেও বৌদ্ধচৈত্য হয়ে উঠেছিল দেবদেবীর আখড়া।

বৌদ্ধযুগে নির্বাণের জন্যে নয়—অমরত্বরও চিরসুখের প্রত্যাশায় সুকঠোর যোগতান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে দৈবশক্তিধর হয়ে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে জীবনোপভোগের প্রয়াসী হয়ে উঠল বাঙালি । মহাজ্ঞান, তুকতাক, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা 'সিসম ফাঁক' আয়ত্ত করে খিড়কীদোর দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হল। যোগ ও সাংখ্য—এই দুই অনার্য দর্শনজাত যোগতান্ত্রিক সাধনাই হল একশ্রেণীর লক্ষ্য। এরই নমুনা পাচ্ছি চর্যাগীতিতে।

পাল আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসার লাভ করে তখন বাঙালি বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করল। কিন্তু মায়াবাদ, পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্মা-পরমারাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে সে চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে হয় নিশ্চিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দই প্রমাণ করে যে, এ সময় বৈষ্ণব মতবাদও জনপ্রিয় হয়ে উঠে[৮], যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়মূল করবার জন্যে সমাজকাঠামো স্থায়ীভাবে তৈরি করবার প্রয়াসে সেন রাজারা উচ্চবর্ণের লোক আমদানি করে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনে তৎপর হয়ে ওঠেন[৯]।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই লৌকিক দেবতারা তার পরলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন না। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "সেন-রাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য, কিন্তু এতকালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যত না হউক গৌণত হইলেও এই সমাজ-দেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙালি হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের নতুন আদর্শ—এই উভয়ের সংঘাত মুহূর্তে বাঙলা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা (বাঙালি রা) নূতনকে (ব্রাহ্মণ্যধর্মকে) যেভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল। এই দেশীয় প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গলকাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পরমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কীভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। ..... তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দুসমাজের পঞ্চোপাসক হিন্দুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি[১০]।"

একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলাদেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতা ও ইসলামের নির্দেশকে ছাপিয়ে ওঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনদেবী-বনবিবি, কালুগাজী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালুরায়, বড় খাঁ গাজী-দক্ষিণরায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি[১১] জীবন ও জীবিকার এবং নিরাপত্তা ও কল্যাণের ইষ্ট ও অরিদেবতা। মধ্যযুগে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম এবং গত শতকের রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্মমত এবং শিক্ষিত সাধারণের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনানুগত্য বাঙালি র এই বন্ধনমুক্ত মনোভাবের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অতএব কোনো বৃহৎ ও মহতের সাধনা বাঙালি র কোনোকালে ছিল না[১২]। সে একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মাপরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। এ কারণে বাঙলার সংস্কৃতি চিরকালই পনেরো আনা বাঙালি সংস্কৃতি[১৩]। চন্দ্রশাসনে ও পাল আমলে বৌদ্ধদের যোগতান্ত্রিক সাধনায় আগ্রহের প্রমাণ মেলে চর্যাগীতিতে, ডাকিনী ও যোগিনীর কিংবদন্তিতে, ময়নামতি-মাণিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গাথায়, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি পাঁচালিতে এবং 'যোগী'পাল, 'মহী'পাল, 'ভোগী'পাল গীতির ঐতিহ্যে। ['যোগী', 'মহী' ও 'ভোগী' নামেতেই রূপকাশ্রিত তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের আভাস রয়েছে।]

সেনদের স্বল্পকাল রাজত্বের সময়কার শূন্য-পুরাণতত্ত্বে, শেখ-শুভোদয়ায়, গীত-গোবিন্দে ব্রাহ্মণ্য-বিকৃতি লক্ষণীয়। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতে এসেছিল শিথিলতা। মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধিদৈবিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা এ যুগের প্রাসাদ ও কুটির বাসীর চিত্ত-দৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে[১৪]। বৌদ্ধদের উপর এ সময়ে উৎপীড়ন চলছিল; 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'ই তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধেরা তখন শৈব, সহজিয়া, নাথযোগী ও ধর্মপন্থী হয়ে হিন্দুসমাজে আত্মগোপন করতে প্রয়াসী হয়[১৫]। সেন আমলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। এ সময়ে "শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। ... এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ রহিয়া গেল[১৬]।" দেশীলোক ও দেশী ভাষার প্রতি অবজ্ঞাবশে সেনেরা বিদেশী ব্রাহ্মণ আনয়নে এবং সংস্কৃত-চর্চার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। এসব কারণে বাঙলাভাষায় লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হতে দেরি হল অনেক। তার জন্যে তুর্কী বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। কাজেই তুর্কী বিজয়ে কেবল সধর্মীদেরই পীড়নমুক্তির নিশ্বাস পড়েনি, বাঙলা ভাষারও সুদিনের শুরু হয়েছে। তুর্কী অধিকারে সেন-আমলের বৈষম্যমূলক শাসন রহিত হয়। "রাজ্য শাসনে ও রাজস্বব্যবস্থায় এমনকী সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল[১৭]।" "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুর হাতে ছাড়িয়া দিতেন। ... এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্ত ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন[১৮]।" "বাঙলা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল' এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ... এই পাঠান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুসমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড় পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করিলেন; তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্য শেষ করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদক ও শ্রোতাগিদের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ'। একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপরদিকে বাঙলা ভাষায় ধর্ম প্রচার—এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব্যভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরাজগণ তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্য শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগাইলেন। এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গালার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনোও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই[১৯]।"

অনার্য সংস্কার বশে নিম্নশ্রেণীর জনগণ কীভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে রাজশক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজেদের পূর্বতন ধর্ম, আচার ও সংস্কার জিইয়ে রেখেছিল, তা আমরা দেখেছি। বৌদ্ধ তারিতা, বজ্রতারা, অবলোকিতেশ্বর শিব কিংবা ধর্মঠাকুর লোক-মানস প্রশ্রয়ে বৌদ্ধ আবরণে যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূজিত হয়েছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য যুগে তাঁরা যথাক্রমে মনসা, চণ্ডী, লৌকিক বিষ্ণু, শিব, ধর্মঠাকুররূপে নতুন পোশাকে হিন্দুদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন; নাথ ও সহজিয়াপন্থও বৌদ্ধ এবং হিন্দুর সাম্প্রদায়িক মত রূপে গৃহীত হয়[২০]। এসব সুপ্রাচীন মতের উদ্ভবের স্থান ও কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এগুলো যে অতি প্রাচীন অনার্য মানস-সম্ভূত ও জাদুবিশ্বাস যুগের সৃষ্টি তাতে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না[২১]।

বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে রাজশক্তির বিরূপতায় বহিরাগত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যদের মধ্যে তথা অভিজাত ও উচ্চবর্ণের মধ্যে এসব লৌকিক মত ও দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল না। তুর্কী আমলে রাজভয় থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণ উচ্চবিত্তের সমাজেও তাদের ধর্ম ও দেবতার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠাদানে প্রয়াসী হয়। এ কারণেই তখন থেকে শুরু হয় দেব-মানবের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এককালে পুরুষ-দেবতা যিনি ছিলেন; তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নাই সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তারপর যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এইসকল উপায়ের জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে[২২]।" মনসা-চাঁদের দ্বন্দ্ব, কালকেতু-ধনপতির উপর চণ্ডীর অহেতুক নির্যাতন ও অনুকম্পা, লাউসেনের সৌভাগ্য, ঈছাই ঘোষের বিপর্যয় প্রভৃতি এরই ফল। কবিরাও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহিমা কীর্তনে তৎপর হয়েছেন। পাঠক-শ্রোতাও বংশনিপাতের ভয়ে শ্রদ্ধা নিয়ে পঠন-শ্রবণে মনোযোগী হয়েছে। এমনি করে উচ্চবর্ণের লোকেরা লৌকিক দেবতার কাছে হার মেনেছে। বাঙলা সাহিত্যের বারোআনা রচনাই নিয়োজিত হয়েছে এই লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে।

এভাবে তেরো-পনেরো শতকের মধ্যে বাঙলার নিম্নবর্ণের গণদেবতা জাতীয় ইষ্টদেবতার মর্যাদায় উন্নীত হলেন। তখন এসব লৌকিক দেবতায় আভিজাত্য দানের জন্যে আর্যীকৃত প্রাচীন দেবতা সূর্য ও শিবের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক পরিকল্পিত হল। এভাবে ধর্মঠাকুর হলেন স্বয়ং সূর্য; চণ্ডী বা কালী হলেন শিবপত্নী; মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী হলেন শিবকন্যা।

কাজেই বৌদ্ধযুগ থেকেই লৌকিক দেবতার পূজা-পদ্ধতি ও মাহাত্ম্য-কথা মুখে মুখে চালু ছিল। পাল আমলের শেষের দিকে তাঁদের কেউ কেউ পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করেন এবং তুর্কী শাসনকালে নির্বিঘ্ন প্রচার পেয়ে উন্নীত হন জাতীয় দেবতার স্তরে, সে-সঙ্গে তাঁদের মাহাত্ম্য-কথাও বৈচিত্র্য এবং বিপুলতা লাভ করে[২৪]। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে তাই —

> ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
> দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জন
> পুত্তলি করএ কেহ দিয়া বহু ধন।
> বাশুলী পূজএ কেহ নানা উপহারে
> মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
> যোগিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত
> ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত[২৫]।

কিন্তু পাল আমলে অবহট্‌ঠে কিংবা সেন আমলের বাঙলা বুলিতে এগুলো লিখিত হয়নি। একে তো সেনরাজারা নিম্নবর্ণের লেখাপড়া শেখার বিরোধী ছিলেন, তার উপর সমাজের উচ্চবিত্তের লোকেরা রাজশক্তির প্রভাবে পড়ে লৌকিক দেবতা ও প্রাকৃতজনের ভাষা এড়িয়ে চলতেন এবং তাঁদের সংস্কৃত-প্রীতিও এসময়ে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল; তাই জয়দেব, সন্ধ্যাকর নন্দী, সর্বানন্দ, হলায়ূধ মিশ্র, ধোয়ী, মুরারি মিশ্র প্রভৃতি অবহট্‌ঠের বাক্-রীতিতে রচনা করেছেন সংস্কৃত[২৬]।

কাজেই বাঙলায় লেখার রেওয়াজ যত আগে চালু হওয়া সম্ভব ছিল, তত আগে হয়নি। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী, কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট বড় গানে অথবা পাঁচালিতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে। ..... রামায়ণ মহাভারত কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা গান রাজসভায় ও সামন্তসভায় প্রধানভাবে অনুশীলিত ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে অর্থাৎ দেশী-ভাষাবলম্বী 'লোক'সাহিত্যে বিশেষভাবে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা চণ্ডী ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই অনুমানের সমর্থন মিলে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে। যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম দ্রৌপদী দশরথ রাম সীতা ইত্যাদি মহাভারত রামায়ণ কাহিনীর নামগুলি তৎসম (সংস্কৃত) রূপেই প্রচলিত। কিন্তু কানু বা কানাই (কৃষ্ণ), রাই (রাধিকা), আয়ান (অভিমন্যু), গোই, গুই (গোপী, গোপিকা), ফুল্লরা, খুল্লনা (ক্ষুদ্র), লহনা (লোভনা), বেহুলা (বিহ্বলা) ইত্যাদি নামগুলি তদ্ভবরূপেই মিলিতেছে। ইহা হইতে এ অনুমান অপরিহার্য যে শেষের সব কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্যে দিয়াই আসিয়াছে[২৭]।"

॥ লিখিত বাঙলা সাহিত্য ॥

বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ দেব-গাথাগুলো পাঁচালি পর্যায়ে উন্নীত হয়ে লিখিত রূপ পায়নি। কিন্তু হিন্দু দেব-কাহিনী চৌদ্দ শতক থেকে লিখিত রূপ পেতে থাকে। মানিকদত্ত, কানাহরি দত্ত প্রভৃতির নামসার স্মৃতি থেকে এবং শূন্য পুরাণের ভাষার কাঠামো থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ) পুঁথি প্রাপ্তি থেকে আমরা তা অনুমান করতে পারি। আমরা নাথ কাহিনী-বিধৃত সমাজ-পরিবেশের আভাস থেকেও আমাদের এ অনুমানের সমর্থন পাই। লিখিত বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে তথা আদি বাঙলা কাব্য হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাহিনী স্বীকৃতি পাচ্ছে সম্প্রতি। কিছুটা তথ্য ও কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন এটি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আযম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০) রচিত হয়। ভাষা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো প্রাচীন নয়। তবে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভাষা স্মরণে রেখে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না।

মহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার।
ঠাঁই ঠাঁই ইম্ছে রাজা আপনা বিজএ
পত্র সিস্য হস্তে তিহঁ মাগে পরাজএ।
মোহাজন বাক্য ইহ পুরন করিয়া
লৈলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া।

এর মধ্যেই সোনারগাঁয়ের যুদ্ধে পিতৃহন্তা গিয়াসুদ্দীন আযম শাহকে নির্দেশ করা হয়েছে বলে ডক্টর হক অনুমান করেছেন।

লিখিত বাঙলা সাহিত্যের সর্বজন-স্বীকৃত আদি নিদর্শন হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি সম্পাদক প্রদত্ত নাম। রচয়িতা বাসুলীর সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আনুমানিক রচনাকাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ বা পনেরো শতকের প্রথমার্ধ। জয়দেবের গীতগোবিন্দেই প্রথম রাধাকৃষ্ণলীলার পর্বানুগ বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রসানুগ লীলাবিভাগ এবং পর্ব বিন্যাস রয়েছে। এতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাগানুগ সুফী সাধনা-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন[২৮]। তবে এসময়ে যে শাসক-শাসিতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার আভাস পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্যিক ভাষায় তুর্কী-ফারসি-আরবি শব্দের মিশ্রণে। এই রাধাকৃষ্ণলীলা মহাভারতীয় নয়, লৌকিক কাহিনী প্রসূত। আভীর জাতির লোকগাথার নায়ক কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন। নয়-দশ শতক থেকেই এ লীলার লিখিত সাক্ষ্য মেলে[২৯]। যদিও লৌকিক ধামালী ভিত্তি করেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গীতিনাট্য রচিত এবং এর সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বের ভাব ও তত্ত্বগত তফাৎ বিস্তর, তবু পরবর্তী বৈষ্ণবতত্ত্বে ও সাহিত্যের এ গ্রন্থের প্রভাব বিপুল। এটি পৌরাণিক আবরণে লৌকিক প্রণয়-কাহিনী। নায়ক দেবকল্প বলে মধ্যে মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধ্যাত্মিকতার আভা আছে। কেবল পদাবলী নয়, রাধাকৃষ্ণ লীলারস কল্পনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদলে গড়ে উঠেছে। রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ আদি গোস্বামীর তাত্ত্বিক রচনায় এর প্রভাব দৃশ্যমান[৩০]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত আধ্যাত্মিকতা বর্জিত আদিরসাত্মক রচনা হলেও এর বিশেষ গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এটি গীতিনাট্য, বিভিন্ন ছন্দ ও রাগ-রাগিণীযুক্ত এবং ভাষা প্রাথমিকতার আড়ষ্টতা মুক্ত। এতে বোঝা যায়, এর আগে মুখে মুখে বাঙলা ভাষা শব্দে সমৃদ্ধি এবং প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও মূলত লোকসাহিত্য এবং কথকতারই লেখ্যরূপ। তাই বক্তব্যের ভাষা ও ভঙ্গি প্রায়ই পৌনপুনিকতা দোষে দুষ্ট।

এর পরের রচনা হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমাদের অনুমান কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বরবক শাহর প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন, যেমন পেয়েছিলেন গুণরাজখান মালাধর বসু[৩১]। কৃত্তিবাসের বিকৃত আত্মবিবরণীর অংশ পাওয়া গেছে। তা দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ও সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চল্‌ছে গত ষাট বছর ধরে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাই ভাষায় প্রাচীনতার কোনো ছাপ রক্ষিত হয়নি। বাঙালি র ধর্মবোধ মহাভারত প্রভাবিত এবং বাঙালি র উপর রামায়ণের ধর্মাচরণ সংপৃক্ত প্রভাব নিতান্ত সামান্য। বাঙলাদেশে রাম-মন্দির নেই। কোথাও কোথাও প্রথা-রক্ষাগোছের রামনবমী উদ্‌যাপিত হয়[৩২]। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালি হিন্দুর কাছে রামকে একান্ত আপন করে তুলেছে। বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক জীবনে রয়েছে এর সর্বাত্মক প্রভাব। বাঙালি হিন্দুর জীবনের আদর্শ হচ্ছে রামায়ণের পাত্রপাত্রীগণ। তাছাড়া আধুনিক হিন্দুর সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মননের উৎস হয়েছে রামায়ণ আর মহাভারত।

রামায়ণ তিনটে স্বাধীন কাহিনীর সমষ্টি। যোগসূত্র কেবল নায়ক রাম। প্রথমটিতে ঘরোয়া জীবনে ঈর্ষা-অসূয়া জাত বিপর্যয়, দ্বিতীয়টিতে গৃহবিবাদে বা ভ্রাতৃবিরোধকালে রাষ্ট্রিক জীবনে পরাশ্রিত হওয়ার পরিণাম এবং তৃতীয়টিতে দর্প ও দর্পিট বশে নারী সম্পর্কে নীতিভ্রষ্টতার পরিণাম স্বতোউদ্‌ঘাটিত। অবশ্য আর্য গৌরবগর্বী কবি বাল্মীকি স্বগণ-ও স্বদেশদ্রোহী সুগ্রীব-বিভীষণকে অনুগতের সম্মান দিয়েছেন যেমনটি সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদীরা এ-যুগে দিয়ে থাকে।

মালাধর বসু বরবক শাহর আগ্রহে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। বরবক শাহ তাঁকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন :

'স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।'
'তাঁর আজ্ঞামত গ্রন্থ করিনু রচন।'

আদিযুগে হিন্দুরা বাঙলা লিখতে গিয়ে সমাজের ভয় করেছেন। তাই স্বপ্নে প্রাপ্ত দেবাদেশের দোহাই পেড়েছেন, মুসলমানেরা করেছেন পাপের ভয়, তাই পাপ-ভয় খণ্ডন করতে চেয়েছেন যুক্তি দিয়ে। আর একটি তথ্য এই :

পুরান পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার
পাঁচালি পড়িয়া তর এ ভব সংসার ॥

পাঁচালি লেখার সাহস ও পড়ার এই অধিকার তুর্কী শাসনের দান।

কবি বলেছেন —'ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে ॥

কাব্যরচনার কাল—'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥

১৩৯৫-১৪০২ শক বা ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ। অতএব গ্রন্থ বরবক শাহর আমলে শুরু হয়ে সমাপ্ত হয় ইউসুফ শাহর আমলে। কবি ছিলেন বর্ধমানের কুলীনগ্রামবাসী কায়স্থ।

জৈনুদ্দীন নামের এক কবির 'রসুল বিজয়' কাব্যের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে। এতে রসুলের সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের কাল্পনিক যুদ্ধকথা বর্ণিত হয়েছে। ভণিতায় রাজরত্ন, সুনায়ক ও রাজেশ্বর ইউসুফ খানের প্রশস্তি আছে। কেউ কেউ এই ইউসুফ খান ও সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহকে অভিন্ন মনে করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরে পাচ্ছি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান। বরিশালের ফুল্লশ্রী গাঁয়ের কবি বিজয়গুপ্ত —

'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক ॥'

—এই শ্লোকে কাব্যরচনাকাল নির্দেশ করেছেন। এতে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪-৮৫ সন মেলে। অতএব এই 'হোসেন শাহ্' আসলে সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ যাঁর সাধারণ্যে ডাক নাম ছিল 'হোসেন শাহ্'। এঁর কোনো কোনো মুদ্রায় 'হোসেন শাহী' কথাটি লেখা রয়েছে[৩৩]।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য হিসেবে সুন্দর ও সুখপাঠ্য। বিদ্যাপতি কীর্তিলতায়, বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গলে, জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে একইভাবে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন, এতে মনে হয় শাসক-শাসিতের সম্পর্কসূচক একটা গৎবাঁধা কথা সর্বত্র চালু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাপতি মিথিলার হিন্দুরাজার আশ্রয়পুষ্ট কবি। মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী তাঁর কাছে শোনা কথা-মাত্র। অথচ 'কীর্তিলতার' বর্ণনা দেখে মনে হয় তাঁর চারপাশে এমনি ঘটনা অহরহই ঘটছে এবং তিনি নিজেও সে বিভীষিকায় ত্রস্ত। বিজয়গুপ্ত 'হাসন হোসেন' পালায় একইরূপ অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করেছেন; অথচ তিনিই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, 'রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত' এবং ফুলিয়া গাঁয়ের হিন্দু ও মুসলমান সবাই সজ্জন এবং সুখে বাস করে। জয়ানন্দও চৈতন্যদেবের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেও চৈতন্য-সমকালে হিন্দুপীড়নের বাঁধাগতে বর্ণনা দিয়েছেন অথচ 'চৈতন্যভাবগত' কিংবা চৈতন্যচরিতামৃতে' তেমনটি নেই।

পনেরো শতকের অপর কবি হচ্ছেন 'মনসা বিজয়' রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনি ছিলেন পশ্চিমবাঙলার কোনো অঞ্চলের বাদুড্যা বা নাদুড্যা গ্রামবাসী। তাঁর গ্রন্থ রচনাকাল —

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

এতে ১৪১৭ শক ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ হয়।

এই হোসেন শাহ্ অবশ্য সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)।

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ॥

বাংলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে নূতন জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিন্দুসমাজে যে মানস-আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী ও বিভাষীর ধর্মাদর্শ, বৈষম্য-মুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা ও মানবিকতার মোকাবেলা করতে গিয়ে হিন্দুসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দিল, তার সমাধান খুঁজলেন শঙ্কর তাঁর জ্ঞানবাদ বা মায়বাদ বলে পরিচিত অদ্বৈততত্ত্বে। ইসলাম অধ্যাত্ম হেঁয়ালি-মুক্ত প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহার বিধি। একেশ্বরবাদ তার শিক্ষার উৎস। শঙ্করের বৈরাগ্যবাদে বাস্তব জীবনের গুরুত্ব অস্বীকৃত রইল বটে, তবে অদ্বৈতবাদের আবরণে একেশ্বরবাদে ও মানবিক যুক্তিবাদে আস্থা রেখে ইসলামের মোকাবেলায় তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর এ মতবাদ জীবনচর্যার সহায়ক না হলেও সেদিন একদিকে ইসলামের প্রসার রোধে এবং অপরদিকে বৌদ্ধ উচ্ছেদে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রাবল্যের সহায়ক হয়েছিল। এবং তাঁর দর্শনের পরোক্ষ প্রভাবে অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বের ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্যে 'ভক্তিবাদ' প্রসার লাভ করতে থাকে। ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এ ধারার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ফল। "একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে। নবীন ইসলামধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণভারতে এই নূতন ধর্মের সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। .... ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। ...... ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈত্য বাদ থেকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। .... ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান-সাধকেরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করছেন ; রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতির স্তরে নেমে এলেন[৩৪]।"

মুসলিম বিজয়ের পরে উত্তরভারতেও ইসলামের সাম্যবাদ ও উদার মানবিকতা নিম্নশ্রেণীর নিপীড়িত জনমনে নতুন আশা জাগাল, এক নয়া সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে গেল তাদের সামনে। তারা বুঝল জন্মসূত্রে নয়, যোগ্যতা দিয়েই হবে জীবন নিয়ন্ত্রিত। তখন স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হল না, আবার ইসলাম গ্রহণেও ছিল সমাজ-সংস্কারের বাধা। ফলে ঘরের বাঁধন হল আলগা, কিন্তু গন্তব্য ছিল না স্থির, তাই দেখা দিল পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস।

রামানন্দ, কবীর, নানক, একলব্য, দাদু, রামদাস প্রভৃতি সন্তদের ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ লোপ, সমাজে ও শাস্ত্রে নিম্নবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মনুষ্য-সত্তায় মর্যাদা দান এবং সে-সঙ্গে শাসক-শাসিতের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণীও প্রচারিত হল। এরূপে দক্ষিণভারতে ভক্তিবাদের ও উত্তরভারতে সন্তধর্মের উদ্ভব ঘটে ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে[৩৫]।

বাঙলা দেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ইসলামের প্রভাবে হিন্দুসমাজে যে ভাঙন ধরে তা রোধ করবার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁরা শাস্ত্রের উদার ও শিথিল ব্যাখ্যায় জনচিত্ত আকর্ষণে প্রয়াসী হলেন। সমাজে নতুন মেলবন্ধনের সাড়াও পড়ে গেল। এই প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের প্রতি জনমনে আস্থা সৃষ্টির জন্যে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে' বলে ভবিষ্যদ্বাণীও রটিয়ে দেয়া হল, তবু এতে ভাঙন রোধ করা গেল না দেখে চৈতন্য দক্ষিণ ও উত্তরভারতের সন্তদের অনুসরণে এখানেও ভক্তিধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলেন। চৈতন্যের সাধনাতেই ভক্তি প্রেমরূপে মহিমান্বিত হল।

১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় নবদ্বীপে এবং ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু ঘটে। চৈতন্যদেব অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য, তর্কপটুতায়, চরিত্র-মাধুর্যে ও ব্যক্তিত্বে নদীয়ার গুণী-জ্ঞানী বয়স্কদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর পিতামহের বয়সী অদ্বৈতাচার্য, বয়োজ্যেষ্ঠ রামানন্দ প্রমুখ গুণীব্যক্তিদের আনুগত্যই তার প্রমাণ। যখন তিনি হরি সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর নব মতবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন, তখন তাঁর বয়স বিশ-বাইশের বেশি নয়। এতেই তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অসামান্যতা বোঝা যায়। মুসলিম রাজশক্তি পাছে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এই ভয়ে তিনি হিন্দুরাজ্যান্তর্গত নীলাচলে গিয়ে আখড়া করলেন। পদস্থ রাজ-কর্মচারী রূপ-সনাতন প্রমুখ অনেক গুণী-জ্ঞানী তাঁর শিষ্য হয়ে দেশে দেশে নতুন প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। বাঙলা দেশে অদ্বৈতাচার্য ও রামানন্দ রয়ে গেলেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে। বাস্তব জীবনকে আড়াল করে চৈতন্যদেব এক অধ্যাত্ম-মনোজীবন সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। এ কারণেই সম্ভবত বাঙলায় বৈষ্ণব মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্য একসময়ে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনে রসের তরঙ্গ তুলেছিল। মুসলমান সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বুনিয়াদ তৈরি হয়, আর বৈষ্ণব রচনার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ও বিকাশ ঘটে। কেবল সাহিত্য সৃষ্টি ও ভাষার পুষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি এবং মননেও এর প্রভাব ও দান অপরিমেয়। পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য প্রভাবের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলতে পারে। বৈষ্ণবের প্রেমবাদের মাধ্যমে নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্ম-দর্শনের দীক্ষা পেল বাঙালি। এই প্রীতিধর্মের প্রভাবে বাঙালি র মানবতাবোধ হল তীব্র, তীক্ষ্ণ ও উদ্দীপ্ত। ষোলো শতক তাই বাঙালি র ও বাঙলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের যুগ। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে এদেশের হিন্দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান[৩৬] বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করে। এ মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সহজিয়া ও বাউল মতবাদ পুষ্ট হয়। বৈষ্ণব-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শাক্ত-সম্প্রদায়ে ভক্তিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে এবং প্রধানত বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্ত পদাবলী রচিত হয়[৩৭]। মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণকে আত্মা-পরমাত্মা, দেহ-মন এবং ভক্ত-ভগবানের রূপক হিসেবে গ্রহণ করে পদ রচনা ও আস্বাদন করেছে। লৌকিক প্রণয়গীতিতেও নায়িকা অর্থে 'রাই' এবং নায়ক অর্থে 'কালা' সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। ব্রজবুলি নামে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টিও হয় এ সময়ে। ভাগবতাদির কথা বাদ দিলে চোখে-দেখা রক্ত-মাংসের মানুষের চরিতাখ্যান রচনাও শুরু হয় এ সময় থেকেই। বাঙলায় গীতিকবিতা রচনার এবং অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাতও করেন বৈষ্ণবেরাই। বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও উদার মানবিকতার প্রভাবে ক্রূর, নিষ্ঠুর, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ লৌকিক দেবতাও বৈষ্ণবোত্তর যুগে উদার কৃপাশীল এবং ভক্তবৎসল রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

চৈতন্যপূর্ব যুগের রাধাকৃষ্ণলীলার পদকার ছিলেন সংস্কৃতে জয়দেব এবং বাঙলায় বড়ুচণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, হোসেন শাহর কর্মচারী যশোরাজ খান এবং ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। চৈতন্যোত্তর যুগে প্রায় দশ হাজারের মতো বাঙলা ও ব্রজবুলি পদ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচ-ছয়শ পদই গীতিকবিতা হিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছে, বাকি পদগুলো পুষ্পগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট ও কৃত্রিম অনুশীলনে আড়ষ্ট। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদও বাঙালি র মুখে মুখে বাঙলা পদে পরিণত হয়েছে। ফলে বিদ্যাপতিও এখন বাঙলার ও বাঙালি র প্রিয় কবি।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রামানন্দ বসু, বংশীবদন, জগদানন্দ, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, নরহরি দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি এবং মুসলমানদের মধ্যে ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, আলাউল ও সৈয়দ মর্তুজা শ্রেষ্ঠ পদকার। প্রেমানুভূতির ও প্রেমের আনুষঙ্গিক ভাবের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অভিব্যক্তির আধার হয়ে পদাবলী হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে অতুল্য।

চৈতন্যদেবের বাঙলা জীবনীগ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' (১৫৪১-৪২) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' (১৫৬০-৮০) শ্রেষ্ঠ। চরিতামৃতের মূল্য বৈষ্ণবতত্ত্বগ্রন্থ হিসেবেই সমধিক। লোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'ও জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' (১৫৫০-৬০) অতিরঞ্জিত বর্ণনায় দুষ্ট। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়ে'র খণ্ডাংশও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বৈষ্ণব মোহান্ত তথা চৈতন্য পার্ষদাদির জীবনীগ্রন্থও আছে—অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত প্রকাশ ও সীতা চরিত্র প্রভৃতি। সতেরো শতকে রচিত হয় প্রখ্যাত প্রেম বিলাস, বীর রত্নাবলী, রসিক মঙ্গল, জগদীশ বিজয়, অনুরাগ বল্লী, অভিরাম লীলামৃত প্রভৃতি; আবার আঠারো শতকে পাচ্ছি চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী, উদ্ধব দাসের 'ব্রজমঙ্গল', 'ভক্তিরত্নাকর'. 'নরোত্তম বিলাস' প্রভৃতি।

॥ মহাভারত ॥

আগেই বলেছি বাঙালি হিন্দুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে বলে রামায়ণ বা রাম পাঁচালি তাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মহাভারত যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শের কুঞ্জী তবু তা ধর্মাদর্শের উঁচু মঞ্চ থেকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে নেমে আসেনি। কেননা মহাভারতের কুন্তী, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির কাহিনী এবং অন্য নানা উপকাহিনী বাঙালি র নীতিবোধের অনুকূল নয়। তাই গোটা মহাভারত অনেককাল বাঙলায় অনূদিত হয়নি। পরেও তুলনায় কম হয়েছে। অথচ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বারোআনা উপকরণই মহাভারতীয়। রাজকীয় কূটনীতি ও যুদ্ধশাস্ত্র সম্বলিত হওয়ায় মহাভারত রাজা ও রাজপুরুষদের প্রিয় ছিল। এরূপ কৌতূহলই ছিল পরাগল ও ছুটি খানের। তাই অশ্বমেধাদি পর্বই তাঁরা শুনতে চেয়েছেন। কামতা দরবারেও তাই এর আধিক্য দেখতে পাই। পরাগল পরমেশ্বরকে বলেছেন :

কুতুহল বহুল ভারত কথা শুনি
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর ...
কেমত পৌরুষে পাইল নিজ বসুমতী
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালি পড়িয়া !

তাই এর কাব্যের নাম 'পাণ্ডব বিজয়।'

বাঙলা ভাষায় আদি মহাভারত অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী। গৌড় সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর উত্তর-চট্টগ্রামস্থ সেনানী শাসক পরাগল খানে (আনু. ১৫১৩-৩২) আগ্রহে পরমেশ্বর সংক্ষেপে মহাভারত কাহিনী বর্ণনা করেন এবং সম্ভবত তাঁর পুত্র নসরত খানের ওরফে ছুটিখানের প্রবর্তনায় শ্রীকর নন্দী অনুবাদ করেন অশ্বমেধ পর্ব। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টাও পরাগল—ছুটিখান নন[৩৮]।

মহাভারতের তৃতীয় অনুবাদক সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলের রামচন্দ্র খান। ইনি সম্ভবত ১৫৫২-৫৩ সনে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এ তিনজনের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙলা দেশের সর্বত্র এঁদের পুথি পাওয়া গেছে। সম্ভবত সতেরো শতকের কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত এঁদের কাব্যযশ ম্লান করে দেয়।

কামতা-কামরূপের রাজসভায় মহাভারতের চর্চা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অনেক কবিই বাঙলায় মহাভারত অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন রাজা ও রাজকুমারের আগ্রহে। কামতা-কামরূপের রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র সমরসিংহের অভিপ্রায় অনুসারে কবি পীতাম্বর উষাপরিণয় (১৫৩৩) ও নলদময়ন্তী (১৫৪৪) রচনা করেন। দুটোই যথাক্রমে বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত। পীড়াম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণ কাহিনীও (১৫০৩) বাঙলায় লিখেছিলেন। এছাড়া কামতা-কামরূপের পরবর্তী রাজা শুক্লধ্বজের সভাকবি অনিরুদ্ধ মহাভারত, তাঁর পুত্র গোপীনাথ মহাভারতের দৌণপর্ব এবং অনিরুদ্ধের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবিচন্দ্রও নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কামতা রাজ্যে মহাভারত রচয়িতা আর আর কবি হচ্ছেন বিশারদ চক্রবর্তী, রুদ্রদেব, গোবিন্দ কবিশেখর (১৬২৭-৩২), শ্রীনাথ (১৬৩২-৬৫), দ্বিজ রঘুরাম, জয়দেব, হরেন্দ্র নারায়ণ, ব্রজসুন্দর কৌশারি, দ্বিজ বলরাম, বৈদ্যনাথ, পরমানন্দ, মহীনাথ, রামবল্লভদাস, লক্ষ্মীরাম, বৈদ্য পঞ্চানন, রামনন্দন প্রভৃতি।

এদিকে মহাভারত কাহিনীর অনুসরণ পাচ্ছি সতেরো শতকে। এই শতকের কবিদের মধ্যে কাশীরামদাস সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর কাব্য আজো হিন্দু বাঙালি র ঘরে ঘরে পরম আগ্রহে পড়াশুনা হয়। কাশীরামের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহ সুধাকর ও প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর। নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি বা সিদ্ধি গ্রামে। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গদাধরও কবি ছিলেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণ বিলাস এবং গদাধর লেখেন জগন্নাথ মঙ্গল। কাশীরাম বিরাট-পর্বের কতকাংশ অবধি লিখে পরলোক গমন করেন।

'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।'

তারপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। তাঁর উক্তি এরূপ :

ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহোঁ খুল্লতাত
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।
রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নন্দরাম দাস অবশিষ্টাংশ পুরো রচনা করেছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা কাশীদাসী মহাভারতের শান্তি পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুথির পাঠে যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও কাশীরামের পুত্র জয়ন্ত দাসের ভণিতা মেলে। কাশীদাসের কাব্যের মাধ্যমেই মহাভারত ও তার ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি র পরিচয়। সেজন্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো কাশীরাম দাসের মহাভারতের দানও বাঙালি জীবনে অপরিমেয়। মহাভারতের অপর এক রচয়িতার নাম বিশারদ। রচনাকাল ১৬১৩ সন। সতেরো শতকে মহাভরাতের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বসু, রামনারায়ণ দত্ত, অনন্ত মিশ্র, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম দাস, দ্বিজ প্রেমানন্দ, দ্বিজ অভিরাম, কৃষ্ণরামদাস, জ্ঞানদাস, ষষ্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, রামেশ্বরী নন্দী, রামলোচন প্রভৃতি। এঁরা সম্ভবত মহাভারতের খণ্ডাংশের অনুবাদক।

আঠারো শতকের কবি দুর্লভসিংহ, গোপীনাথ দত্ত (বা নন্দী বা পাঠক), সুবুদ্ধি রায়, অম্বষ্ঠ বল্লভ, পুরুষোত্তম দাস, ভবানী দাস, দ্বিজরাম লোচন, দ্বিজ গোবর্ধন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ, অকিঞ্চন দাস, বসুদেব, নিমাই, রাজীব সেন প্রভৃতির কাব্যের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে।

মানুষের চরিত্রের, আচরণের, সমস্যার ও সম্পদের হেন দিক নেই, যা মহাভারতে চিত্রিত ও বর্ণিত হয়নি। তাই বলা হয়—'যাহা নাই 'ভারতে', তাহা নাই জগতে।' "পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা কাহিনীভারে ভারী বলেই নাম মহাভারত ! 'গীতা'ও" মহাভারতের একটা সর্গ।

॥ রামায়ণ ॥

কৃত্তিবাসের পরে পনেরো-ষোল শতকে রামায়ণ কেউ রচনা করেননি। বৈষ্ণব প্রভাবে তখন সবাই কৃষ্ণলীলা-রসের তরঙ্গাঘাতে দিশাহারা। কাজেই রামায়ণ রচন-শ্রবণের দিকে কারুর উৎসাহ ছিল না। সতেরো শতকে যখন বৈষ্ণবীয় নেশা কিছুটা মন্দা হল তখন আবার নতুন করে রামায়ণ গান শুরু হয়েছে। এ সময়কার উত্তরবঙ্গের খ্যাতিমান রামায়ণ-রচক হলেন নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন, পৈত্রিকনিবাস পাবনা জেলার বড়বাড়ী বা অমৃতকুণ্ডা। ইনি সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি। 'অদ্ভুত রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত বলে এই গায়েন-কবিও 'অদ্ভুতাচার্য' নামে পরিচিত হন। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে রামশঙ্কর দত্ত নামের এক কবিও 'অদ্ভুতাচার্য' বলে কলমী নাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিজ ভবানী নাথ, দ্বিজ লক্ষ্মণ প্রভৃতিও রামায়ণ রচনা করেন আঠারো শতকে।

॥ ভাগবত ও কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা ॥

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের পরে ষোলো ও সতেরো শতকীয় অনেক কবিরই ভাগবত ও কৃষ্ণ বিষয়ক বাঙলা রচনা পাওয়া গেছে। বৈষ্ণবেরা তো লিখেইছেন, তাঁদের প্রভাবে পড়ে অবৈষ্ণবেরাও পৌরাণিক ও মহাভারতীয় কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন উচ্চকণ্ঠে।

সম্ভবত ষোলো শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয় দ্বিজ গোবিন্দের 'কৃষ্ণমঙ্গল', এটি ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা। এ শতকের দ্বিতীয় রচনা রঘু পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী।' মাধব আচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল', কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়', শ্যামদাসের 'গোবিন্দ মঙ্গল', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল'ও ষোলো শতকের রচনা। এ সময়কার একটি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ তথা তাত্ত্বিক গ্রন্থ হচ্ছে কবিবল্লভের 'রসকদম্ব'। সতেরো শতকে এই ধারায় আরো কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলোতে পৌরাণিক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে বৈষ্ণবীয় প্রভাবই প্রকট হয়েছে বেশি। সতেরো শতকের বৈষ্ণবতত্ত্বগ্রন্থ হচ্ছে ব্রজমোহনদাসের চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ। এ শতকের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হচ্ছে ভবানন্দের 'হরিবংশ'। পরশুরাম, জীবন, অভিরাম দাস, হরিদাস, যশশ্চন্দ্র, বাণীকণ্ঠ, বংশীদাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ণ বা খণ্ড বিবরণ-কাব্য রচনা করেছিলেন। আঠারো শতকের কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে বলরাম দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত', দ্বিজ রামনাথের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', শঙ্কর চক্রবর্তীর 'গোবিন্দ মঙ্গল', মাধবেন্দ্রের 'ভাগবত সার', দ্বিজ রামেশ্বরের 'গোবিন্দ মঙ্গল, প্রভুরামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল', গঙ্গারামের 'গোপাল চরিত', রামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত', শিবানন্দের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', যুগল কিশোরের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ও মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এবং এমনি আরো অনেকের কাব্যের সন্ধান মিলেছে। এ ধারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অব্যাহত ছিল।

॥ লৌকিক দেবতার পাঁচালি ॥

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত হচ্ছে আদর্শ অনুশীলনের কৃত্রিম প্রয়াসজাত সৃষ্টি। তাই গোটা মহাভারত অনেককাল জনসমাজে সমাদৃত হয়নি। রামায়ণ বৈষ্ণব-প্রভাবের যুগে বিস্মৃত-প্রায় কাব্য, এবং যদিও ভক্তিবাদ সুফীমতের মিশ্রণে প্রেমরূপের মহিমান্বিত রূপ লাভ করে চৈতন্যমতবাদে, তবু তা জীবনকে আড়াল করে অধ্যাত্মলোক সৃষ্টির প্রয়াস বলে বাঙালি র স্বভাব-ধর্মের সঙ্গে এর অকৃত্রিম সঙ্গতি ছিল না। তাই বাঙালি চরিত্রের খাঁটি পরিচয় রয়েছে তার মানসপ্রবণতার অনুগ লৌকিক দেব-কল্পনায়। তার জীবন-জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতা সৃষ্টির কল্পনায়, আদর্শে ও তত্ত্বে প্রকটিত হয়েছে তার চারিত্রিক স্বরূপ লক্ষণ, অঙ্কিত হয়েছে তার সমাজ-সংস্কৃতির নকশা। এখানে দেবতাও প্রবল-প্রতাপ মানুষ। মঙ্গলকাব্যে তাই মানুষ আর মানবিক রসই মেলে। মঙ্গল কাব্যগুলো বাঙালি হিন্দুর মন-মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন।

অর্থই হচ্ছে শক্তির উৎস, ধন যার আছে মান তারই। ধনী বলেই তো রাজা শক্তিমান, রাজার পরে সমাজে সদাগরই ধনী। তাই মধ্যযুগের বাঙলায় বণিক চাঁদ সদাগর-ধনপতি সদাগরেরাই ছিল সমাজের নিয়ামক। বহির্বাণিজ্যে তাদের বাধা ছিল না। তারাই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ধারক ও রক্ষক। তাই লৌকিক দেবতার লক্ষ্যও তারা। মানুষ মুখে যতবড় মহৎ কথাই বলুক, বুকে পোষণ করে জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তার ভাবনা। তাই প্রাকৃত শক্তির প্রসন্নতাকামী কৃষি-নির্ভর, রোগভীরু, অজ্ঞ এবং অসহায় মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিরূপ দেবতার প্রভাব অনুভব করল যখন, তখন দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে উপায় রইল না তাদের। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ধর্মের ইতিহাস হচ্ছে এই পার্থিব জীবনে সুখ ও নিরাপত্তাকামী মানুষের উপ ও অপদেবতা সৃষ্টির ও পূজার কাহিনী। এর ভিতরে কোনো অপার্থিব সুমহৎ আদর্শ বা লক্ষ্য নেই। আছে এই মাটিকে—এই জীবনকে ভালোবাসার স্বাক্ষর; সুখ ও শান্তি লাভের নিদারুণ প্রয়াস। মঙ্গলকাব্যগুলোতে তাই দেবলীলার আবরণে বর্ণিত হয়েছে সমকালীন বাঙলাদেশের ও বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিকথা। ফুল্লরা-খুল্লনা-বেহুলা-রঞ্জাবতী-লখাই-গৌরী, কিংবা লহনা-দুর্বলা-হীরা-মনসা-চণ্ডী অথবা শিবচাঁদ-ধনপতি-শ্রীমন্ত-কালকেতু-লাউসেন-কর্ণসেন-কালুডোম আর মহামদ-মুরারিশীল-ভাঁড়ুদত্ত ভালোয়মন্দয় নামভেদে আমাদেরই প্রতিবেশী—আমাদেরই ঘরের লোক।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥

চণ্ডীদেবী এক নন, অনেক। তাঁদের মধ্যে যিনি পরে তারা-গৌরী-পার্বতী-দুর্গা প্রভৃতি নামে পৌরাণিক আভিজাত্য লাভ করেন, সেই শিবপত্নী চণ্ডীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। চণ্ডী কাব্যের দুটো উপাখ্যান। একটি আদি, যা নিম্নবর্ণের কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনতে রূপ পেয়েছে। আর একটি পরবর্তী—'ধনপতি সদাগর' নামেতেই তা তুর্কী আমলের প্রভাব স্বীকার করেছে। চণ্ডী মাহাত্ম্যের 'জড়' পাই 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে'। আসলে এক অনার্য নারীদেবতা—'চণ্ডী' নামই যার সাক্ষ্য বহন করছে—বৌদ্ধসমাজে বজ্রতারা রূপে পূজিতা হন, সেই বজ্রতারাই ব্রাহ্মণ্য সমাজে তারা বা চণ্ডী নামের আবরণে গৃহীতা হয়েছেন।

প্রাচীন অনার্য নারীদেবতা এই চণ্ডী, ইনি শক্তিস্বরূপা, শতাধিক[৪০] নামে চণ্ডী অনার্যসমাজে পূজিতা হতেন। ক্রমে আর্যসমাজে তিনি শিব বা হর-গৃহিণীরূপে শিবানী, উমা, গৌরী, তারা প্রভৃতি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, পৌরাণিক যুগে এঁর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অসামান্যরূপে বেড়ে যায়। দশ প্রকার শক্তির আধার-রূপে তাঁর দশ মহাবিদ্যার দশমূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে, যথা : কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী. ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। চণ্ড-চণ্ডী নামের মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদেরকে প্রচণ্ড শক্তির আধার-রূপে স্বীকার করা হয়েছে। চণ্ডী মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গীয় তথা রাঢ় অঞ্চলের দেবতা।

একসময় ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শিব আশুতোষ-ভোলানাথ নামে যোগী-তপস্বী হিসেবে নির্গুণ শক্তি স্বয়ম্ভূরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। আর চণ্ডী কালো বলে কালিকা, কালী বা শ্যামা নামে শক্তিদেবতারূপে পূজিতা হতে থাকেন। সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে পরে পরে তাঁর উগ্র রৌদ্র-রূপ কমনীয় করুণাময়ী-রূপে পরিণত হয়। তখন তিনি অন্নপূর্ণা, কমলা ও দুর্গারূপে বাঙলা দেশে পূজিতা হতে থাকেন। দূর্গারূপে দশদিক রক্ষার প্রতীক দশপ্রহরণধারিণী হিসেবে তাঁর দশভূজা মূর্তি পরিকল্পিত হয়। দুর্গারূপে তিনি শ্যামা নন—গৌরী। অনার্য প্রভাবে এককালে তিন-অনার্য দেবতা—বিষ্ণু, শিব ও কালী (চণ্ডী) সর্বভারতিক দেবতারূপে পূজিত হন। ফলে ব্রাহ্মণ্যসমাজ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবীয় প্রেমবাদের প্রভাবে বাৎসল্য রসাশ্রিত শাক্ত মত তথা সন্তানবৎসল জননী রূপিণী শ্যামা-ভক্তিবাদ বাঙলা দেশে আঠারো শতক থেকে প্রসার লাভ করতে থাকে। এভাবে চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক 'চণ্ডীমঙ্গল', কালিকা মাহাত্ম্যসূচক 'কালিকামঙ্গল', গৌরী পরিচায়ক 'সারদামঙ্গল' ও গৌরীমঙ্গল দুর্গামহিমা জ্ঞাপক 'দুর্গামঙ্গল' এবং মাতৃরূপিণী শ্যামার স্তুতির জন্যে 'শ্যামাসঙ্গীত' রচিত হয়েছে। এতে গৌরী-দুর্গা-উমা-কালী এ চার স্বরূপে তাঁর মহিমা বর্ণিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন মধুর রসের প্রাধান্য, এখানে তেমনি মান-অভিমানের সুরই প্রবল। এই শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠকবি রামপ্রসাদ সেন।

চণ্ডী মুখ্যত রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। পশুর ইষ্টদেবী চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানে ব্যাধের ইষ্টদেবীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বাহন গোধিকা। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কাহিনী পাঁচালিরূপে লিখিত হওয়ার আগে কথকতার মাধ্যমে চালু ছিল :

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে.
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জন.....
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
এই সব শুনিতে লোক আনন্দিত।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম লিখিত পাঁচালির উল্লেখ রয়েছে মুকুন্দরামের ও মাণিক দত্তের কাব্যে। তাঁরা এক মাণিক দত্তকে চণ্ডীগীতির আদি রচয়িতা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় এক মাণিক দত্তের পাঁচালি পাওয়া গেছে। ইনি মালদহ অঞ্চলের কবি। তাঁর কবিত্ব-সম্পদ ছিল না বটে, তবে চণ্ডী পাঁচালির প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তাঁর কাব্যেই পাচ্ছি। তাঁর কাব্যও রচিত হয় দেবীর স্বপ্নাদেশে এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই যে, কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি স্বয়ং দেবীর বরপুষ্ট নায়ক। ইনি সম্ভবত আঠারো শতকের লোক[৪১]। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য হচ্ছেন চণ্ডী পাঁচালির তৃতীয় কবি। এঁর কাব্য রচনাকাল ১৫০১ শক বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ।

'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে কহে সারদা চরিত।'

তাঁর কাব্যে অর্জুন-তুল্য বাদশাহ আকবরের স্তুতি আছে।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং ষোলো শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের যুগ রূপকথার আমল। আলৌকিক দেব-মহিমার কাহিনী বর্ণনা করতে বসেও মুকুন্দরাম তাঁর প্রতিবেশ ভুলতে পারেননি। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এখানেই। তিনি কাব্যে এক গ্রাম্য পরিবেশে যুগদুর্লভ ঘরোয়া আবহ সৃষ্টি করেছেন। এ হয় তাঁর কল্পনাশক্তির অভাবপ্রসূত, নয়তো তাঁর যুগোত্তর অসামান্য জীবনবোধ, লোকচরিত্র জ্ঞান ও শিল্পীসুলভ তীক্ষ্ণ রসিকদৃষ্টির সুফল। চিত্র, নকশা এবং আধুনিক উপন্যাসের আদল এতে আশ্চর্য নৈপুণ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা নাট্যকার দীনবন্ধুর মধ্যে এমনি কবি-দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছি। জীবনে-রসে রসিক এই কবির কাব্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুষমা তাই আজো অম্লান। বৈষ্ণব প্রভাব-পুষ্ট কবিচিত্তের স্নিগ্ধ সহানুভূতির প্রলেপে চণ্ডীমঙ্গল রসশ্রীমণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবাচর্যের কাছে নানা বিষয়ে ঋণী। মুকুন্দরাম ষোলো শতকের শেষপাদে কাব্য রচনা করেন।

এরপর সম্ভবত বৈষ্ণবমতের ও সাহিত্যের প্রভাববশত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করেনি। রামানন্দ, যতি লালা, জয়নারায়ণ রায়, দ্বিজ কমললোচন, দ্বিজ জনার্দন প্রভৃতি দু-চার জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাই সতেরো শতকে এই ধারার ক্ষীণ ও ম্লান অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। হরিরাম, ভবানী শঙ্কর, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, রামদেব প্রভৃতিও চণ্ডীর মাহাত্ম্য-কথা রচনা করেছেন।

এরপর 'চণ্ডী' নাম ও কালকেতু-ধনপতি-উপাখ্যান বর্জিত হয়েছে। 'কালিকা' নাম ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়োপাখ্যান দিয়ে নতুন করে 'কালিকা মঙ্গল' রচিত হতে থাকে। এতে মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। কেবল কালিকার বরে সন্তান লাভ এবং কালিকার স্তুতির দ্বারা 'সুন্দরের জীবন রক্ষা' ছাড়া এতে কালিকার মঙ্গলকাব্য-সুলভ কোনো ভূমিকা নেই। এখানে কালিকা সুপ্রতিষ্ঠিত তথা স্বীকৃত ইষ্ট দেবতা মাত্র।

অবশ্য কালিকামঙ্গলও ষোলো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই রচিত হয়েছে। এর প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ যুবরাজ (ও সুলতান) ফিরোজ শাহর (১৫৩২-৩৩) প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। আর শা'বারিদ খানও এই শতকের প্রথমার্ধে কাব্য রচনা করেন। আঠারো শতক অবধি কালিকামঙ্গলের অন্যান্য কবি হচ্ছেন বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, রাধাকান্ত মিশ্র, রামপ্রসাদ সেন, কবীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাণরাম চক্রবর্তী, নিধিরাম আচার্য প্রভৃতি। ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল'ও একটি কালিকামঙ্গল। তাঁর কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত—দেবী খণ্ড, বিদ্যাসুন্দর খণ্ড ও মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড। শেষোক্ত কাহিনী তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। গোটা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান নানা কারণে অনন্য। তাঁর কাব্যের নামও অভিনব। আঠারো শতকে বর্গী-হার্মাদের হামলা, য়ুরোপীয় বেনের দৌরাত্ম্য, পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল শাসন, অমাত্য ও সামন্ত প্রাধান্য ও তজ্জাত স্বৈরাচার প্রভৃতি যখন জন-জীবনে অভিশাপরূপে নেমে এসেছে, তাদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ব্যাহত করেছে, তেমনি পরিবেশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। তিনি নিজেও প্রথম জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে নানা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। তাই তাঁর দেবী অন্নদা—অন্নপূর্ণা। আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিকথা দেবীমাহাত্ম্যের আবরণে রচনা করেছেন। কিন্তু অখ্যাত ভবানন্দের ঘটনা-বিরল জীবন-কাহিনী কাব্যরস সৃষ্টির অনুকূল নয় বলেই ইনি দেবী খণ্ড এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সুকৌশলে কাব্যান্তর্ভুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি, শহুরে কবি, দরবারি কবি, রসিক কবি। তার চেয়েও বড় কথা—ভাব, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির উপর তাঁর অসামান্য কর্তৃত্ব। জগৎ ও জীবন, সমাজ ও ধর্ম, মানুষের দোষ ও গুণ, আশা ও হতাশা তাঁর বিকারহীন রস-দৃষ্টিতে তামাশার মতো প্রতিভাত হয়েছে। উদার ও সহিষ্ণু রসিকের মতো তিনি জনজীবনের সর্বপ্রকার অসঙ্গতি থেকে কেবল বিদূষক-সুলভ রসিকতার উপাদানই খুঁজে পেয়েছেন। বলা চলে এক বেপরোয়া বাচালতার কাব্য এই অন্নদামঙ্গল। এ কাব্য রচিত হয় :

> বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
> সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥

১৬৭৪ শকে বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।'

মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল (১৬৬৯ শকে বা ১৭৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দে), কৃষ্ণজীবন দাসের দুর্গামঙ্গল (১৭ শতকের শেষার্ধে), কবিচন্দ্র মিশ্র (১৪৯৩-১৫১৯) ও দ্বিজ শিব-চরণের গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি চণ্ডীরই বিভিন্ন রূপ ও গুণের পরিচায়ক কাব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ শিবায়ন ॥

এই চণ্ডীমঙ্গল ও নাথসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিবের স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য-কাহিনী 'শিবায়ন' নামে রচিত হতে থাকে। শিব অতি প্রাচীন সর্বভারতীয় অনার্য দেবতা। তাই তাঁকে কেন্দ্র করে নানা গোত্রীয় ধারণা অসমন্বিত ও বিচিত্ররূপে প্রকটিত হয়েছে। এ জন্যে শিব নানা বিরুদ্ধ-গুণে, বিভিন্ন আকারে ও অসংলগ্ন জটিল তত্ত্বে অদ্ভুত মূর্তি লাভ করেছেন। বাঙলা শিবায়নে তাঁর দুইরূপ—দুইধারা। একটি পৌরাণিক, অপরটি লৌকিক। পৌরাণিক ধারায় শিব-চতুর্দশীর গুরুত্ব জ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চট্টগ্রামের রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪) ও রাম রাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' এই ধারার রচনা।

কৃষির দেবতা চাষী শিবের লৌকিক কাহিনীতেই দরিদ্র বাঙালি র গার্হস্থ্য জীবনের অকৃত্রিম আলেখ্য বিধৃত। মেনকা কন্যাবিদায়কালে জামাতা শিবকে মিনতি করে বলছেন : কুলীনের পো-কে অন্য কী বলিব আমি, (আমার মেয়েকে) আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত'—কন্যার ভাগ্য সম্বন্ধে পিতামাতার চিরন্তন উৎকণ্ঠার এমন মর্মস্পর্শী আন্তরিক প্রকাশ সুদুর্লভ। এই লৌকিক শিবায়ন কাব্যের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের (১৭১০ খ্রী.) কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর, কবিচন্দ্র, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মনিরাম প্রভৃতিও শিবায়ন রচনা করেছেন। মধ্যযুগে দেবকাহিনী প্রায়শ 'মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। আলোচ্য প্রধান শাখাগুলো ছাড়াও বহু উপ ও অপদেবতার মঙ্গল রচিত হয়েছে, যেমন গঙ্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, সরস্বতী মঙ্গল, লক্ষ্মী মঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, কপিলা মঙ্গল, শনি মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল প্রভৃতি।

AMARBOI.COM

॥ মনসামঙ্গল ॥

মনসামঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের ইতিকথা। সে-সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু মানব ও মানবিকতা হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ সদাগর ও বেহুলা গোটা বাঙলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। মনসামঙ্গল কাব্য মুখ্যত পূর্ব বাঙলারই দান। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র তীরের সংগ্রামী মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের ও মুসলমানের একেশ্বরবাদের প্রভাব রয়েছে চাঁদ-বেহুলার চরিত্র কল্পনায়। চাঁদ দেবীর কাছে মাথা নত করেনি, সে আত্মসমর্পণ করেছে এক বালিকার অসামান্য সাহস, অধ্যবসায় ও কৃচ্ছ্রসাধনার কাছে। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও কৃতসঙ্কল্প মানুষের ও মনুষ্যত্বের এমনি চিত্র সাহিত্যে বিরল।

পনেরো শতকের কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাইর পরে ষোলো শতকে কোনো মনসার ভাসান রচয়িতার সন্ধান পাইনে; আমাদের বিশ্বাস বৈষ্ণবপদাবলীর রস-বন্যায় কিছুকালের জন্যে অন্য তত্ত্বচিন্তা চাপা পড়েছিল। তাই আবার সতেরো শতক থেকেই মনসামঙ্গল রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। এই শতকে আমরা দ্বিজ বংশীদাস [রামায়ণের কবি চন্দ্রাবতী এঁরই কন্যা] নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, কালিদাস, রসিক মিশ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র, সীতারাম দাস প্রভৃতি কবিদের পাচ্ছি। এঁদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস, নারায়ণ দেব ও ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠ।

আঠারো শতকের কবি হচ্ছেন জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, হরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, জানকীনাথ, জগন্নাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, বাণেশ্বর প্রভৃতি।

॥ পীর পাঁচালি ॥

সত্যপীর মাহাত্ম্য-কথা ষোলো শতক থেকেই রচিত হতে থাকে। ষোলো শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর বিজয়', কঙ্ক 'বিদ্যাসুন্দর' এবং কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। সত্যপীরের হিন্দু-চেলা দক্ষিণের রায় (রাজা) এবং মুসলমান-ভক্ত বড় খাঁ গাজী। প্রায় ষাট-সত্তর জন হিন্দু কবি ও কিছু মুসলমান কবি সতেরো থেকে উনিশ শতক অবধি সত্যপীর পাঁচালি রচনা করেছেন। 'সত্যপীর' তত্ত্বের প্রভাবে অনেক লৌকিক দেবতা বা কাল্পনিক পীর কাহিনীও লিখিত হয়েছে, যেমন বনবিবি-বনদেবী, শীতলা, ওলা, দক্ষিণরায়-বড়খাঁগাজী, ষষ্ঠীদেবী, কালুগাজী-কালুরায় প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রী পীর-পাঁচালি যথা—মোবারক, গোরাচাঁদ, ইসমাইল গাজী, খাঞ্জা খাঁ, সফী গাজীর কাহিনী প্রভৃতিও রচিত হয়েছে এ সূত্রে। পীর পাঁচালি নিম্ন ও পশ্চিম বঙ্গের সৃষ্টি। বাউলমতের মতো পীর-নারায়ণ সত্যকে কেন্দ্র করেও নিম্ন ও পশ্চিম বাঙলার সাধারণ ও দুস্থ হিন্দু-মুসলমানের এক মিলন-ময়দান তৈরি হচ্ছিল। 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুইকুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।' পীর-নারায়ণ সত্য এমনকি অল্পোপরিষদের মতো একসময়ে সর্বভারতীয় ও সর্বজনীন দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, ফকির রাম দাস, বিকল চট্টো, কৃষ্ণকান্ত, শিবচরণ, রামশঙ্কর, গিরিধর, অযোধ্যারাম, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, জনার্দন, ফকির চাঁদ, ভারতচন্দ্র রায়, ফকির গরীবুল্লাহ, কঙ্ক, আরিফ, ফৈজুল্লাশাহ প্রভৃতি অনেকেই সত্যনারায়ণ পাঁচালি লিখেছেন উনিশ শতক অবধি।

॥ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য ॥

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে যে রেনেসাঁস আসে তার ফলে নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ বিলুপ্তি তার অনিবার্য ফল। বাঙলাদেশের বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজ যানভুক্ত বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুয়ানি আবরণ গ্রহণ করেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্মে সুস্থির থাকতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টারই পরিণতি দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্ম'মতবাদে, নাথ-যোগী-পন্থে, বৈষ্ণব সহজিয়াবাদে ও বাউল মতে।

বৌদ্ধ বিলুপ্ত সত্ত্বেও নাথ-সাহিত্য লুপ্ত হয়নি, কারণ যোগতাত্ত্বিক বিষয় বলে হিন্দু যোগী ও মুসলমান সূফীর কাছে তা সমাদৃত ছিল। তাই ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদের গান, গোরক্ষবিজয়-যোগীকাচ প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক রচিত হয়েছে। ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় (১৫৭৫), সতেরো শতকের কবি ভবানীদাসের ময়নামতীর গান, আঠারো শতকের দুর্লভ মল্লিক ও শুকুর মুহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' এবং পুরোনো গাথা প্রভৃতি এই ধারাকে প্রবহমান রেখেছে।

সহজযানপন্থী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা এই সময়ে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়[৪২]। কিন্তু তাদের বিশ্বাস-সংস্কার তখনো তারা জিইয়ে রাখে। ফলে বৈষ্ণব থেকে বৈষ্ণব-সহজিয়া, মুসলমান ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ থেকে বাউল মত গড়ে উঠে। চর্যাগীতি এদেরই ঐতিহ্য এবং বৈষ্ণব সহজিয়াপদ ও বাউল গান চর্যাগীতিরই আধুনিক রূপান্তর। হিন্দু সমাজের নাথ-যুগীরা (পেশায় তাঁতি) পুরোনো বৌদ্ধ নাথপন্থেরই ধারক।

বৌদ্ধ আদিনাথ ও বজ্রতারাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা শিব-তারা নামের আবরণে পূজা করতে থাকে এবং গোরক্ষনাথ, মীন নাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধা প্রবর্তিত সাধনপন্থও শৈবনাথপন্থরূপে পরিচিত হয়। ফলে এগুলো শৈবমতের শাখারূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর পূজারীর ধর্মঠাকুর মূলত অনার্য সূর্যদেবতা। বৌদ্ধ আমলে বৌদ্ধের ত্রিশরণের অন্যতম প্রমূর্ত 'ধর্ম'রূপে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের পর নিম্নবর্ণের দেবতা ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হচ্ছেন। তাঁর মাহাত্ম্য-কথাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের পার্থক্য এই যে, ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত নির্বিবাদী দেবতা। কাহিনীতেও বৈচিত্র্য এবং বিস্তার আছে। এক বিস্তৃত পরিসরে রাজা আর ভিখারি, অভিজাত ও ডোম, ন্যায়নিষ্ঠা ও শাঠ্য, বাহুবল ও কূটকৌশল, বিদ্রোহ ও বিগ্রহ, গার্হস্থ্য সমস্যা ও রাজসভার দুশ্চিন্তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসব কারণে ধর্মমঙ্গলগুলো বিশিষ্ট রচনা। এখানে বাঙলার বিশেষ করে প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের সর্বস্তরের নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র বিধৃত রয়েছে। রাজসভার ছল-চাতুরী, প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন-বিদ্রোহ, সন্ধি-বিগ্রহ, বীরত্ব-মহত্ত্ব প্রভৃতির চিত্র যেমন আছে, তেমনি রয়েছে ধনী-নির্ধনের ঘরোয়া জীবনের প্রেম-ঈর্ষা, ক্ষমা-প্রতিহিংসা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উল্লাস-যন্ত্রণা ও আশা-হতাশার আলেখ্য। কাহিনী সুসংবদ্ধ নয় বটে, কিন্তু মহামদ-কর্ণসেন-কালু-লখাই-রঞ্জাবতী- লাউসেন-ইছাই প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যের লিখিতরূপ অর্বাচীন। কিন্তু এগুলোতে যেসব কাহিনী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র রয়েছে , তা প্রাচীন। এদিক দিয়ে এ সাহিত্য বাঙলা ও বাঙালি র প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ।

রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্যপুরাণ' ও 'ধর্ম পূজাবিধান' হচ্ছে এ মতের শাস্ত্রগ্রন্থ। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'টি [কলিমা জলাল] এই শূন্যপূরাণেই পাওয়া গেছে। ফিরোজ শাহ তুগলকের উড়িষ্যা বিজয় উপলক্ষে এটি রচিত। এ উপাখ্যানে কেউ কেউ বিস্মৃত সামাজিক ইতিহাসের ছায়া লক্ষ্য করেন। ধর্মমঙ্গলের আদি লেখক বলে ময়ূর ভট্ট নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। যাঁদের পাঁচালি পাওয়া গেছে তাঁদের অনেকেই ব্রাহ্মণ। উচ্চবর্ণ থেকে ধর্মঠাকুরের স্বীকৃতি আদায়ই হচ্ছে এসব মঙ্গল রচনার পরোক্ষ উদ্দেশ্য। সতেরো শতক থেকেই ধর্মমঙ্গল রচিত হতে থাকে। খেলারাম চক্রবর্তীও ধর্ম পাঁচালরি আদি লেখক বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর কাব্যও পাওয়া যায়নি। সতেরো শতকের আর যে-সব কবির নাম মেলে তাঁরা হচ্ছেন শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, যাদবনাথ, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতা রামদাস প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী প্রধান। আঠারো শতকে পাচ্ছি ঘনরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামচন্দ্র, নরসিংহ বসু, দ্বিজ প্রভু রাম, হৃদয়রাম সাধু, শঙ্কর চক্রবর্তী, নিধিরাম গাঙ্গুলী, দ্বিজ গোবিন্দ রাম, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, রামকান্ত রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী কবিত্বে ও জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ।

৬

॥ লোকসাহিত্য ॥

বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাগীতি, ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবচন, প্রবাদ, রূপকথা, ব্রতকথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত (অপ্রাপ্ত), ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ গীত, মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা কাহিনী, ধর্মঠাকুরের কথা, চণ্ডী-মনসার কথা, যজ্ঞকথা, শিবের পাঁচালি, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালি, ভারত পাঁচালি[৪৩] প্রভৃতি। এগুলো মুখে মুখে ফিরেছে বলে এগুলোর ভাষা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু কাহিনী প্রাচীন। তেমনি তুর্কী-মুঘল আমলের নিদর্শন হচ্ছে ব্রত কথা, গাজীর গান, সত্যপীর, ওলা বিবি প্রভৃতি কাহিনী, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পীর-মাহাত্ম্য কথা, বাউলগান, আদ্যের গম্ভীরা, ঝুমুর, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি এবং ব্রিটিশ যুগের ও হাল আমলের লোক-সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাউল, ভাটিয়ালী ও কবিগান এবং সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নানা গান, গাথা, কবিতা ও লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। এর মধ্যে কবিওয়ালার ও কবিগানের উদ্ভবের আলাদা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এ হচ্ছে যুগসন্ধিকালের বিপর্যস্ত জীবনের সাক্ষ্য অথবা পূর্ব-প্রাভাতিক অন্ধকারের (Predawn darkness-এর) প্রতিরূপ।

স্থানীয় কবি, গায়েন ও কথক কর্তৃক আঞ্চলিক বুলিতে স্থানীয় নিরক্ষর লোকের উদ্দেশে মুখে মুখে রচিত বলে লোকসাহিত্য অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে সর্ববঙ্গীয় হতে পারেনি। এজন্যে লোকসাহিত্য মাত্রই আঞ্চলিক এবং কালে কালে বহু মুখের স্পর্শে ও পরিচর্যায় এগুলো ভাবে বিচিত্র, ভাষায় কালোপযোগী, ভঙ্গিতে চাহিদানুসারী এবং কল্পনায় পল্লবিত হয়েছে বলে লোকসাহিত্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ গণরচনা-রূপে পরিচিত। অতএব ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে ও কাহিনী বিন্যাসে লোকসাহিত্য যুগে যুগে নবকলেবর পরিগ্রহ করে যুগের চাহিদা মিটিয়েছে, এবং নতুন বিষয়ে হয়েছে পুষ্ট।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা লোকসাহিত্যের তথা বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাস্তবতায়, মানবিকতায় ও জীবনচেতনায় এগুলো অনন্য। এতে ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ মেলে গাথাগুলোতে। গীতিকাগুলোর রচনাকালের পরিধি ষোলো থেকে আঠারো শতক অবধি বিস্তৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি, এদেশে তুর্কী-মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ধর্মচর্চার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাঙলা তখনো মুখের বুলির স্তর পার হয়নি। এ ভাষায়-যে কিছু লেখা যায়, এ ভাষাও-যে সাহিত্যের ভাষা হতে পারে তা কখনো কোনো গুণীজন ভাবেননি। অশিক্ষিত জনগণ তাদের বুলিতে মুখে মুখে গান, গাথা, ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা ও উপকথা রচনা করে মনের ভাব প্রকাশ করত। এছাড়া দেবতার পূজা করবার কিংবা তাঁর কাছে সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা নিজে নিবেদন করবার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র রচনে-পঠনে-শ্রবণে শূদ্রের ও নারীর অধিকার ছিল না বলে জনগণ কথকতার মাধ্যমে দেবকথা ও ধর্মকথা জানবার চেষ্টা করত। এভাবে রামের ছড়া, ভারতকথা, কৃষ্ণ ধামালী, মনসা ও চণ্ডীর কথা, ব্রতকথা প্রভৃতি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল। কিন্তু 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'—ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিদের এরকম কঠোর পাঁতি ছিল বলে কেউ সেসব লিখবার ও পড়ে শুনবার সাহস পায়নি।

তাছাড়া সেন আমলে সাধারণ লোকের বিশেষ করে শূদ্রের লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না[৪৪]। অতএব মুসলিম বিজয়ের আগে এদেশে বাঙলায় কিছু লিখিত হয়নি। চর্যাগীতিরও এদেশে লিখিত রূপ চালু ছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। কাজেই "আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার [এই লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হইবার] সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল[৪৫]।" তাই নিরঞ্জনের রুম্মাতে[৪৬] কেবল নিপীড়িত বৌদ্ধদের স্বস্তি ও উল্লাস ধ্বনিত হয়নি, বাঙলা ভাষারও সুদিনের আভাস সূচিত হয়েছে। মুসলিম শাসকের প্রশ্রয়ে ও প্রতিপোষণে সম্ভবত চৌদ্দ শতকের শেষ বা পনেরো শতকের গোড়া থেকেই বাঙলা রচনা লিখিত রূপ পেতে থাকে। এজন্যে এ সময় থেকেই কৃষ্ণ ধামালী, মনসার ভাসান, রামায়ণ কথা ও ভারতকথা পাঁচালিরূপে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ 'পাল গীতি' লুপ্ত হয়েছে এবং ময়নামতী-গোপীচাঁদকথা যোগ-সম্বন্ধীয় হওয়ায় যোগীপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান দ্বারা রক্ষিত হয় এবং মুসলমানদের হাতে যোগীর কাহিনী বলে গোরক্ষ কাহিনী কিংবা ময়না-গোপীচাঁদ কাহিনী যথাক্রমে ষোলো ও আঠারো শতকে পাঁচালি পর্যায়ে উন্নীত হল[৪৭]। মৌখিক রচনায়ও ভাষা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছিল। নইলে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) কিংবা শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ভাষার এমন অর্থবহ বিকশিত রূপ পেতাম না। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে ব্যবহৃত গোটা বারো আরবি-ফারসি শব্দ[৪৮] থেকে বোঝা যায় এ সময়ে দরবার আর দরবারি ভাষাও লোকপরিচিত এবং লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব মুসলমানেরাই লেখ্য বাঙলার সৃষ্টি সহায় ও পোষ্টা।

৭

॥ রাজকীয় প্রতিপোষণ ॥

এ-কথা না বললেও চলে যে মুসলিম সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য লেখ্যরূপ লাভ করে। যেমন ধর্মপ্রচার ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলে বাঙলা গদ্যের চর্চা হয়।

গঠনযুগে ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসলমান সুলতান-সুবাদারের আগ্রহে সংস্কৃত, ফারসি ও হিন্দি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলোর বাঙলা অনুবাদ শুরু হয়। কেবল তা-ই নয়, এ ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানও অগ্রণী ছিল। গৌড় সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর আমলে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রী.) তাঁর কর্মচারী শাহ মুহম্মদ সগীর 'কিতাব চাহিয়া ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। রুকনউদ্দীন বরবক শাহর (১৪৫৯-৭৪) অভিপ্রায় অনুসারে কৃত্তিবাস অনুবাদ করেন 'রামায়ণ' [৫০]। বরবক শাহ ও তাঁর পুত্র সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর আমলে গুণরাজ খান মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে ভাগবতের অংশবিশেষের অনুবাদ করেন (১৪৭৪-৮০ খ্রী.) আর জায়নুদ্দিন রচনা করেন 'রসুল বিজয়'[৫১]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশালের ফুলিয়া (ফুল্লশ্রী) গাঁয়ের বিজয় গুপ্ত (১৪৮৫ খ্রী.)[৫২], জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ওর্ফে হোসেন শাহর আমলে (১৪৮২-৮৬ খ্রী.) পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে মনসার ভাসান রচনা করেন। মধ্য বঙ্গে বিপ্রদাস পিপলাই (১৪৯৪ খ্রী.) মনসামঙ্গল ও কবিচন্দ্র মিশ্র 'গৌরীমঙ্গল' রচনা করেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে। সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর চট্টগ্রামস্থ অধিকারের সেনানী শাসক (Military Governor) পরাগল খানের সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'পরাগলী মহাভারত' এবং তাঁর পুত্র ছুটি খানের সভাকবি শ্রীকর নন্দী 'ছুটি খানী অশ্বমেধ পর্ব' রচনা করেন। হোসেন শাহর পৌত্র ফিরোজ শাহর আদেশে সংস্কৃত কাহিনীর অনুসরণে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫১৯-৩৩ খ্রী.)[৫৩]। কবিশেখর বিদ্যাপতি আর যশোরাজও তাঁদের পদে নাসির শাহ (নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ) ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহর স্তুতি করেছেন।

চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত। আর আরাকানের রাজধানী ছিল ম্রোহং (Mrauhang) । এর বিকৃত বাঙলা নাম রোহাং বা রোসাঙ। রোসাঙের বাঙালি মুসলমান রাজসচিব আশরাফ খানের আগ্রহে কাজী দৌলত (১৬২২-৩৫) অনুবাদ করেন হিন্দি কবি মিয়া সাধনের[৫৪] অধ্যাত্ম-রূপক কাব্য 'ময়নাসৎ'। এর বাঙলা নাম 'সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী'। মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান, নবরাজ মজলিস প্রমুখ রাজসচিবের আদেশে পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, রতন কলিকা-আনন্দ বর্মা, তোহফা, সপ্ত পয়কর ও সেকান্দর নামা অনুবাদ করেন আলাউল। এভাবে কারো-না-কারো প্রতিপোষকতায় মধ্যযুগীর ধারায় অনুবাদের কাজ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি চলেছে।

মধ্যযুগে পাক-ভারতের হিন্দুরা সংস্কৃতের ভাষাকে ধর্মকথা তথা লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায় 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালি পড়িয়া তর এ ভব সংসার।' এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হননি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করাবার জন্যে তাঁরা প্রেম ও বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয় মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক সম্ভাব্য কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিতমাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেনি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম সংপৃক্ত পাঁচালি রচনা করতেন। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। কেবল আঠারো শতকেই কয়েকজন হিন্দু-প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি[৫৫]।

আর্যেরা প্রকৃতিপূজক ছিল। আর্যপ্রভাবে পাক-ভারতিক জনগণ প্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তোয়াজে-তারিফে তুষ্ট করে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা খুঁজেছে চিরকাল। ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পদানত করে জীবনকে বিপন্মুক্ত করবার চেষ্টা দেখা যায়নি কখনো। এভাবে বাঙালি হিন্দুর মন-মানসে সাহস স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে পারেনি। ফলে দেবতা ও অপদেবতার কাল্পনিক অনুকম্পানির্ভর জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে অনেকাংশে। এ বিকৃত মনমানসের স্বাক্ষর রয়েছে পুরাণমিশ্রিত মঙ্গলকাব্যে ও অন্যান্য পাঁচালিতে। সংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদী মুসলমানের সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশী হিন্দুর প্রাণে-মনে মানবাত্মার মহিমা এবং মানবিক শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অভিনব বোধ জাগে। মুসলিম প্রভাবে এই মানব মহিমা ও মানবিকতার উদ্বোধনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে মানবাত্মার অপরিসীম মহিমা ও সম্ভাবনার বাণীবাহী বৈষ্ণব মতের, আর পূর্ব বাঙলার নদী-নির্যাতিত সংগ্রামী মনে জেগেছে পৌরুষ, দেবদ্রোহিতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও মর্যাদাবোধ ; যেমন হয়েছিল দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিভিত্তিক সন্তধর্মের উদ্ভব। তাই মনসামঙ্গলের বিকাশ-ভূমি পূর্ব বাঙলা। মনসার ভাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার আত্মা হয়েছে মহিমান্বিত। চাঁদ সদাগর আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক শক্তির প্রতীক। তিনি মাথা নোয়ালেন দেবতার পায়ে নয়, একটি কিশোরীর অনমনীয়কৃচ্ছ্র সাধনার কাছে। চাঁদ বেনে ও বেহুলা বাঙালি পুরুষ ও নারী। মানুষকে এ স্বরূপে ইতিপূর্বে বাঙালি র রচনায় আর দেখা যায়নি[৫৬]। ইসলামি সংস্কৃতির বিস্তার যে বাঙালি র চিত্তলোকে বাসন্তী হাওয়া বয়ে আনে, তাদের মানস জগৎ যে নবজীবনের সংস্পর্শে বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল হয়ে উঠে, তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্য আর বৈষ্ণব মতবাদ ও সাহিত্য। মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য দেশ-দুর্লভ নতুন ভাব, চিন্তা, রস ও আত্মবিশ্বাস-পুষ্ট জীবনবোধের আকর।

৮
॥ মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্য ॥

বাঙলা দেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান[৫৭]। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ- যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষকতা পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, মুসলমানেরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানগণের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে ধর্মপ্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য আমরা তাঁদের হাতেই পেয়েছি। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য দানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব-রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এদেশের হিন্দু ও মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ তাদের ইরানি সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও সাঙ্গীকরণে সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু গোঁড়ামিপ্রবণ হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান-কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য—প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছিলেন, হিন্দু-লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি।

মুসলমান-রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা, যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে অর্থাৎ বিস্ময়-ব্যাকুল কল্পচারী মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানস-সৃষ্ট দেব-দানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতূহল চোখে-দেখা মানুষের প্রতি নিবদ্ধ হল। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল, মানুষকেও জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ন ও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোনো সীমারেখা স্বীকৃত নয় এ জগতে। নদী-নগরী, গিরি-মরু-কান্তার ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দেব-দানব-রাক্ষস, ভূত-প্রেত-জ্বিন এবং বুনো পশুপাখি-সরীসৃপের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ। বাহুবল, মনোবল, আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ, সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায় সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে পরিব্যক্ত।

পাক-ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালি রা ইরানি ও হিন্দুস্তানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

৯
॥ উপাখ্যান ॥

হিন্দুরচিত সাহিত্য যেমন মুখ্যত অনুকৃতি, বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যও প্রধানত অনুবাদ। গোটা মধ্যযুগব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের বাঙলা রচনা অনুকৃতি ও অনুবাদে সীমিত। এ অসম্পূর্ণ শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অসামর্থ্যেরই সাক্ষ্য। এঁদের রচনা পরিমাণে প্রচুর কিন্তু উৎকর্ষে বিশিষ্ট নয়। আমাদের মুকুন্দরাম যখন চণ্ডীমঙ্গল লিখছেন তখন শেক্সপিয়র লিখেছেন তাঁর কালজয়ী নাটক। এতেই বোঝা যায় উনিশ শতকের আগে বাঙলা কখনো প্রতিভার পরিচর্যা পায়নি। তাই তারা লাটিমের মতো কেবলই ঘুরেছে, কিন্তু পাঁচশ বছরেও ভাষায় ও সাহিত্যে এতটুকু অগ্রসর হয়নি। মূলত, ফরাসি ও হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমাদের উপাখ্যান-সাহিত্য এবং আরবি ও ফারসি থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ধর্ম ও যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থগুলো। অনুবাদ সাধারণ তিন প্রকারের হত— কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অর্থাৎ আক্ষরিক, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবানুসরণ। সেকালে অনুবাদ ক্বচিৎ আক্ষরিক হত। হিন্দি ও ফারসি প্রণয়োপাখ্যানগুলো সাধারণত সূফীতত্ত্বের তথা জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান রূপেই। তত্ত্বকথাকে এভাবে রস-কথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে ঐহিক জীবনবাদী বাঙালি মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবগান, বাউল-মুর্শিদা-মারফতি প্রভৃতি অধ্যাত্মগীতির দেশে এ মানবিক রস-প্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বাঙালি চরিত্রের একটি নতুন দিগদর্শন। এদিক দিয়ে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রী.) 'ইউসুফ-জোলেখা'ই সম্ভবত গোটা আধুনিক পাক-ভারতিক সাহিত্যে প্রথম লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান।

সে-যুগের হিসেবে বাঙলা রোমান্টিক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র নয়। চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ অবধি তার ইতি ঘটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ আর ভাবে-ভঙ্গিতেও বৈশিষ্ট্যহীন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ওসব রচনার আর কোনো সাহিত্যিক মূল্যই নেই। আর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো শতক অবধি রচিত জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি।

AMARBOI.COM

চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা। ষোলো শতকে পাচ্ছি দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শা বারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে দোনা গাজীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'; কাজী দৌলতের 'সতীময়নালোর-চন্দ্রানী', আলাউলের 'পদ্মাবতী' 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', 'সপ্ত পয়কর', 'রতন কলিকা'; মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমতি সয়ফুলমুলক', 'ইউসুফ জোলেখা' ; নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাউলি', পরাগলের 'শাহ পরী', মঙ্গলচাঁদের 'শাহজালাল-মধুমালা', সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মূলক সামারোখ', আবদুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', শরীফ শাহর 'লালমতি সয়ফুলমুলুক'। আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে মুহম্মদ মুকিমের 'কালাকাম', 'মৃগাবতী', 'গুলে বকাউলি'; মুহম্মদ রফিউদ্দিনের 'জেবল মূলক শামারোখ', শাকের মাহমুদের 'মনোহর মধুমালা', নুর মুহম্মদের 'মধুমালা', ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা'; সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা' ; মুহম্মদ আলী রজার 'তমিম গোলাম চতুন্নছিলাল', 'মিশরীজামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহপরী মল্লিকাজাদা', 'হাসান বানু' ; আবদুর রাজ্জাকের 'সয়ফুলমুলুক লালবানু', শমসের আলীর 'রেজওয়ান শাহ' এবং মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহরাম গোর', 'কামরূপ-কালাকাম', খলিলের 'চন্দ্রমুখী' প্রভৃতি। মুসলিম প্রভাবে আঠারো-উনিশ শতকের কয়েকজন হিন্দুও প্রণয়োপাখ্যান লিখেছেন। সুশীল মিশ্রের 'রূপবান-রূপবতী' উপাখ্যান, বাণীরাম ধরের 'শীত-বসন্ত' কাহিনী, রামজী দাসের 'শশিচন্দ্রের পুথি', দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী', মহেশ চন্দ্র দাসের 'সয়ফুল তমিজ জরুখভান', গোপীনাথ দাসের 'মনোহর মধুমালতী', এ যাবৎ আমাদের হাতে এসেছে। এসবের মধ্যে 'ইউসুফ জোলেখা', 'লায়লীমজনু', 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী', 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক', 'লালমতী সয়ফুলমুলুক', 'মধুমালতী', 'গুলেবকাউলি' ও 'চন্দ্রাবতী' কাব্যগুণে, কাহিনী-মাধুর্যে কিংবা বৈদগ্ধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০
॥ তত্ত্বসাহিত্য ॥

মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন জিজ্ঞাসা রয়েছে তারই মনোময় জবাব খোঁজা হয়েছে আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কিত রচনায়। বাস্তবধর্মী শক্তিমানের জিজ্ঞাসা মানুষকে করেছে বিজ্ঞানী ; ভাববাদী দুর্বলকে তা-ই করেছে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। একই জিজ্ঞাসা আপাতবিরোধী দু-কোটির চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা ও জন্ম দিয়েছে। এই একই জিজ্ঞাসা কাউকে দিয়েছে বহির্দৃষ্টি, কাউকে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। বহির্দৃষ্টি মানুষকে করেছে বিষয়ী ও বিজ্ঞানী। অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে করেছে রহস্যবাদী ; গড়ে তুলেছে আধ্যাত্মবাদ, দিয়েছে বৈরাগ্য বা ইহবিমুখতা, জাগিয়েছে জীবনেতর জীবনের পিপাসা। বৈরাগ্য প্রাচ্যের মানস-সম্পদ আর বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য। দু-টোরই মূল প্রেরণা জিগীষা। একটার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, অপরটার কাম্য দুনিয়ার জয়। একটা সম্বল হৃদয় ও মনোবল, অপরটার হাতিয়ার বুদ্ধি ও বাহুবল। একটি হৃদয়বৃত্তিক লীলা, অপরটি প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি।

তত্ত্বচিন্তা মানুষকে তিন মার্গের সন্ধান দিয়েছে—জ্ঞানের, কর্মের ও ভক্তির। জ্ঞানবাদ আস্তিক্য, নাস্তিক্য ও সংশয়প্রবণ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। কর্মবাদ সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলেছে। আর ভক্তিবাদ হয়েছে নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের উৎস এবং ভক্তিবাদের উপজাত (by product)—কারুর কারুর মতে পরিণতি হচ্ছে প্রেমবাদ।

বাঙলা ভাষারও এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হয়েছে, এগুলো: ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও অধ্যাত্ম প্রেমগীতি।

ক. ধর্মসাহিত্যে উল্লেখ্য হচ্ছে : নেয়াজ ও পরানের (১৬ শতক) কায়দানী কেতাব; খোন্দকার নসরুল্লাহর (১৭ শতক), হেদায়তুল ইসলাম, শরীয়তনামা ; শেখ মুতালিবের (১৬৩৯ খ্রী.) কিফায়তুল মুসল্লিন, আলাউলের তোহফা, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৮ শতক) হাজার মোসায়েল, দুল্লামজলিস ; আশরাফের (১৭ শতক) কিফায়তুল মুসল্লিন, আবদুল্লাহর (১৮ শতক), নসিয়ত নামা, আলী রজার (১৮ শতক) সিরাজকুলুব, কাজী বদিউদ্দীনের (১৮ শতক), সিফৎ-ই-ইমান, সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের (১৮ শতক) সিরাজ সবিল, বালক ফকির ও মুহম্মদ মুকিমের (১৮ শতক) ফায়দুল মুকতদী, সৈয়দ নূরুদ্দিনের (১৮ শতক) দাকায়েতুল হাকায়েক, রুহুনামা, রাহাতুল কুলুব ; মুহম্মদ আলীর (১৮ শতক) হায়রাতুল ফেকাহ্, হায়াৎ মাহমুদের হিতজ্ঞানবাণী, সর্বভেদ-বাণী প্রভৃতি।

খ. তত্ত্ব সাহিত্যে সাধারণত যোগ ও সূফী সাধন-তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। সমাজ ও ধর্মের আচারগত প্রভেদ সত্ত্বেও শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তরালে দুটো ভিন্নাদর্শ জাতির মধ্যে কী নিবিড় প্রাণের যোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে এ ধরনের রচনায়। জীবনের যে চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা, উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাত, ধর্ম ও সমাজচেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। মানস-সংস্কৃতির এরূপ লেনদেন, এমনি আত্মিক যোগাযোগ চিরকালই মানুষের চিত্ত-প্রসারের ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছে।

ইরানি সূফী সাধনাও যৌগিক প্রক্রিয়া-নির্ভর। পাক-ভারতের যোগসাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে সূফীদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়ে উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যিনি পাক-ভারতে মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁর নাম শেখ শরফুদ্দীন বু আলী কলন্দর শাহ (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রী.)। তাঁর প্রবর্তিত সাধনপদ্ধতির বাঙলা নাম 'যোগ কলন্দর'। পানিপথে তাঁর সমাধি আছে। উত্তরভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর তাঁর খ্যাতি আজো ম্লান হয়নি। একসময়ে বাঙলায় কলন্দরপন্থী বৈরাগীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, কলন্দর বলতে মুসলিম বৈরাগীই বোঝাত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে :

"কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি।"
'ঋণ কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর॥"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তত্ত্ব বা সূফী সাহিত্যে পাই ষোলো শতকের শেখ ফয়জুল্লাহার গোরক্ষ বিজয়, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, অজানা কবির যোগকলন্দর, কবি হাজী মুহম্মদের সুরতনামা বা নুরজামাল ; সতেরো শতকের কবি শেখচান্দের হর-গৌরীসম্বাদ, শাহ্‌দৌলপীর বা তালিবনামা, আবদুল হাকিমের শিহাবুদ্‌দীননামা ও চারিমোকামভেদ, মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা ; আর আঠারো শতকের কবি আলি রজার আগমজ্ঞানসাগর, কাজী মনসুরের শির্নামা, শেখ জেবুর আগম, শেখ জাহেদের আদ্য পরিচয়, রমজান আলীর আদ্য ব্যক্ত, মোহসীন আলীর মোকাম মঞ্জিলের কথা প্রভৃতি।

গ. সওয়াল সাহিত্য : এ ধরনের গ্রন্থে জগৎ ও জীবনের নানা রহস্য-চিন্তা, হেঁয়ালি ও সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, জীবতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর রয়েছে। শেখ সাদীর গদামল্লিকা, সেরবাজ চৌধুরীর ফক্করনামা বা মল্লিকার সওয়াল, এতিম আলমের আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, আবদুল হাকিমের নুরনামা, আকিলের নুরনামা, মুসানামা, সৈয়দ নূরুদ্দীন ও নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের মুসার সওয়াল প্রভৃতি এ জাতীয় গ্রন্থ।

ঘ. সাধন ও ভজনসঙ্গীতরূপে পাচ্ছি : রাধাকৃষ্ণরূপক গীতি, বাউল গান ও অন্যান্য আধ্যাত্ম সঙ্গীত।

রাধাকৃষ্ণ রূপকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমবিষয়ক সূফীমতের অধ্যাত্ম সঙ্গীত যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মীর ফয়জুল্লাহ, মির্জা কাঙালী, সৈয়দ মোর্তুজা, নসির মাহমুদ, সৈয়দ সুলতান, চাঁদ কাজী, আলাউল, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, সৈয়দ আইনুদ্দীন, মোহসেন আলী, আবাল ফকির, পীর মুহম্মদ, বকশা আলী, এবাদুল্লাহ, শেখ ভিখন, শেখ ফতন (ফতেহ), আলিমুদ্দিন, মনোহর, আফজল, শমসের আলী, আলি রজা এর্শাদুল্লাহ, সর্ফতুল্লাহ, আলি মিয়া, মোহাম্মদ হানিফ, কমর আলি, চম্পা গাজী, মোহাম্মদ হাসিম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাউল গান আমাদের তত্ত্ব-সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলিম প্রভাবে তথা সূফী মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও সংযোগে বাউল মতের আধুনিক রূপান্তর হয়েছে সত্য, কিন্তু এর মূল রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আদিকাল থেকেই যে-কোনো ধর্মে দৈহিক শুচিতাকে মানস শুচিতার সহায়ক বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। সাংখ্যে, যোগে, বৌদ্ধ দর্শনে ও সূফী সাধনতত্ত্বে দেহের বিশেষ মূল্য রয়েছে। দেহের আধারে যে-চৈতন্য, সে-ই তো আত্মা। এ নিরূপ-নিরাকার আত্মার স্বরূপ মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে—দেহযন্ত্র নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহ-যন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবেই সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়া অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এদেশের অধ্যাত্ম সাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র পাক-ভারতের আদিম অনার্য শাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা দেখা যায়। বাঙলার পাল আমলের তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখাই প্রাচীন যুগে সহজিয়া গানে ও মধ্যযুগে বৈষ্ণব-সহজিয়া পদে আর পরবর্তীকালে বাউলগানে রূপ পেয়েছে।

উনিশ শতকের আগে রচিত বাউলগান দুর্লভ। বাউলগানের প্রধান কবি ফকির লালন সাঁই, শেখ মদন, পাগলা কানাই, তিনু, আতর চাঁদ, শ্রীনাথ, নলিন চাঁদ, হীরালাল, মেছেল চাঁদ, সদাই সাঁই, খেদমত সাঁই, ইরফান সাঁই, শীতলাং সাঁই, গোপাল প্রভৃতি।

মুরশিদা-মারফতি গানের কবি হচ্ছেন সৈয়দ শাহানুর, মুন্সী হোসেন আলী, রহিমুদ্দিন ফকির, রজবউদ্দিন, মিয়াধন, মোতালেব, নজির হোসেন বুরহানি, ফজলুল শিকদার, সাওয়াল শাহ (রমজান আলী), খতিশাহ (আবদুল মজিদ), উসমান, উমর আলী, হেকিম আবদুল মালেক, সৈয়দ আবদুল বারী, হাসান উদাস, শেখ কিনু প্রভৃতি। এবং চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার খানকার ভক্তগণের রচিত গানগুলোও এ শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিকাংশ মুর্শিদা-মারফতি গানে বাউল প্রভাব লক্ষণীয়।

মুসলিম বিজয়ের পরে হিন্দু ও মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণভারতে পরে উত্তরভারতে এবং সবশেষে বাঙলা দেশে হিন্দুসমাজে যে আলোড়ন হয় তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহ্যরূপ ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ তজ্জাত ভক্তিবাদ ও ইসলামের সূফীতত্ত্বই এসব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, উত্তরভারতের সন্তধর্ম, এবং বাঙলার বৈষ্ণবধর্মও বাউল মত সূফীমতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। কাজেই আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা যায়। তাই দেহাধারস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত।

ক. সখীগো জন্ম-মৃত্যু যাহার নাই
তাহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব সার।
তীর্থব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব মিলে।

খ. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তাহার পায়॥

গ. এ দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

বাউলেরা তাঁদের ভাষায় 'অচিন পাখি' 'অলখসাঁই' (অলক্ষ্য স্বামী), 'মনের মানুষ' বা 'মানুষ রতন'-রূপ আত্মা তথা পরমাত্মাকে জানবার সাধনা করেন। বৈষ্ণব বা সুফীর মতো এঁরা প্রেমিক নন, যোগীর মতো তাত্ত্বিক। মুর্শিদা-মারফতি ও বাউল গান আমাদের লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। বাউলেরা উদার মানবতাবাদী। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। বাউল মত ও সত্যপীরকে কেন্দ্র করে বাঙলার নিম্নবিত্তের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব হয়েছিল।

AMARBOI.COM

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

মুসলমান কবিগণ এক বিরাট জীবনীসাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের চরিতকথাগুলো যেমন একাধারে জীবনী, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মকথা, ও কাহিনীকাব্য ; এসব চরিতাখ্যান তেমন নয়। এখানে বাস্তব-অবাস্তব, লৌকিক-অলৌকিক কিংবা প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সীমারেখা মানা হয়নি। এখানে কল্পনা ইতিহাসাশ্রিত নয়। চরিতাখ্যানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জৈনুদ্দিনের 'রসুল বিজয়' (১৪৭৩ খ্রী.) সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (১৫৮৬ খ্রী.), শাহ বারিদ খানের 'হানিফার বিজয়' ও 'রসুল বিজয়', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গাজী বিজয়', শেখ চাঁদের 'রসুলবিজয়', নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'জঙ্গনামা', আবদুল নবীর 'আমীর হামজা', গরীবুল্লাহ (পশ্চিমবঙ্গ) 'ইউসুফ-জোলেখা' ; 'আমির হামজা' ; সৈয়দ হামজার (পশ্চিমবঙ্গ) 'আমীর হামজা', 'হাতেম তাই'; উজীর আলীর 'নসলে উসমান ইসলামাবাদ' (ইতিহাসমূলক) এবং বিভিন্ন কবির কাসাসুল আম্বিয়া, সিফাতুল আম্বিয়া ও অন্যান্য আউলিয়া কাহিনী প্রভৃতি। এগুলো রচিত হয়েছে মুখ্যত মুসলমানদের মুসলিম ঐতিহ্য-গর্বে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই।

॥ জঙ্গনামা ॥

কারবালা কাহিনী নিয়েও অনেক যুদ্ধকাব্য ও মর্সিয়া-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এগুলো সাধারণত জারি ও জঙ্গনামা নামে পরিচিত। এ বিষয়ক ফারসি কেতাব 'মক্তুল হোসেন'কে আদর্শ করেই বাঙলা জঙ্গনামাগুলো রচিত হয়েছে। বাঙলায় মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামার আদি কবি দৌলত উজির বাহরাম খান (১৬ শতক)। দ্বিতীয় কবি শেখ ফয়জুল্লাহ, ইনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামে বিলাপ রচনা করেন। তৃতীয় কবি মোহাম্মদ খান। ইনিই জঙ্গনামার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'মক্তুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন'। এঁর পরে যাঁরা জঙ্গনামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হায়াত মাহমুদ, জাফর, গরীবুল্লাহ-ইয়াকুব, সফীউদ্দিন, সা'দ আলী, আলি মোহাম্মদ, জিন্নাত আলী, হামিদুল্লাহ খান, আবদুল ওহাব, রাধাচরণ গোপ, মুহম্মদ মুন্সী, আবদুল হামিদ ও জনাব আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কারবালা যুদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু আমাদের পুথিকারেরা অলৌকিক ও অপ্রাকৃত কাহিনী সংযোগে তাকে রূপকথায় পরিণত করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধকাহিনী রয়েছে—রসুল বিজয়, আলির জঙ্গনামা, জয়কুমরাজার লড়াই, হানিফার লড়াই, হামজার দিগ্বিজয়, জঙ্গে বদর, জঙ্গে খয়বর প্রভৃতি। ইসলামের উন্মেষযুগের এসব গৌরবগাথা রচনা করে মুসলমানকে স্বাজাত্যগর্বী ও স্বধর্মনিষ্ঠ করার প্রয়োস ছিল কবিদের।

॥ বিবিধ রচনা ॥

এ ছাড়া, রাগ-তাল, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তুক্‌তাক্‌ প্রভৃতি নানা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। বারোমাসী কিংবা চৌত্রিশা কোনো বিশেষ বিষয়ক রচনা নয়। বারোমাসীতে মাস ও ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে নায়িকার (কৃচিৎ নায়কের) হৃদয়ের বৃত্তি-প্রবৃত্তির রূপান্তরের, বিশেষ করে বিরহ ব্যথার, চিত্র অঙ্কিত হয়। আর বাঙলার চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তির আদ্যক্ষর রূপে প্রয়োগ করে যে-পদবন্ধ রচনা করা হয় তাকেই চৌত্রিশা বলে। প্রায় সব পুথিতে বারোমাসী ও চৌত্রিশা পাওয়া যায়। এগুলো সেকালের সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

॥ দোভাষীরীতি ॥

সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'রায় মঙ্গল' নামক কাব্যে বড় খাঁ গাজীর মুখে ভাঙা হিন্দি প্রয়োগ করেছিলেন, সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন সত্যনারায়ণ পাঁচালিকার ও ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি অবাঙালি পাত্র-পাত্রীর মুখে বিকৃত হিন্দুস্তানী ব্যবহার করেছেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে হাওড়াবাসী কবি ফকির গরীবুল্লাহই (১৭৫৭-৮০ ?) প্রথম বাঙলা ও হিন্দুস্তানী বাকধারার মিশ্রণে তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা', 'সোনাভান', 'মদন কামদেব পালা' (সত্যপীরের পাঁচালি) ও 'জঙ্গনামা' (হোসেন মঙ্গল) রচনা করেন। এই রীতির নাম দোভাষী রীতি। এ ভাষার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ আরবি-ফারসি ও হিন্দি শব্দাধিক্য) শব্দ এবং হিন্দি বাক্য-গঠন-রীতির প্রভাবপ্রসূত তেরা, মেরা, এয়সা, যেএসা প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ। আঠারো শতকে 'গরীবুল্লাহ অনুসরণ করেন হাওড়াবাসী সৈয়দ হামজা (১৭৮৮-১৮০৫ খ্রী.)। উনিশ-বিশ শতকে হাওড়া-হুগলীবাসী কবি মালে মুহম্মদ, জনাব আলি, মুহম্মদ খাতের প্রমুখ বহু কবি দোভাষী রীতিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু হাওড়া, হুগলী ও কলকাতা অঞ্চলের বাইরে কোথাও মুসলমানেরা এ রীতির অনুকরণ বা চর্চা করেনি[৫৯]।

কাজেই দোভাষী রীতি ব্রজবুলির মতো একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। নতুন বন্দর কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব এবং তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরাই এর স্রষ্টা এবং ধারক। দোভাষী সাহিত্য ইংরেজ আমলের রাজধানী ও বন্দর অঞ্চলের অর্থাৎ কলকাতা-হাওড়া-হুগলী এলাকার নির্জিত আধাবাঙালি মুসলমানের মন, মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। রোমান্স থেকে শরিয়ত-কথা অবধি সব বিষয়েই দোভাষী গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু এগুলো ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গিতে সাহিত্য হয়নি। তবু গত দেড়শ বছর ধরে বাঙলার অশিক্ষিত জনসাধারণের রস-পিপাসা ও জিজ্ঞাসা মিটিয়ে আসছে এ সাহিত্য। বিকল্প পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সবাইকে পড়তে-শুনতে হয়েছে বলে একে জনপ্রিয় সাহিত্য বলে মনে করার হেতু নেই। অকালে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মানুষ যা খায়, তাকে পুষ্টিকর সুখাদ্য বলে না ওতে ধড়ে প্রাণ যদি-বা টিকে থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। দোভাষী পুথিও মানস-আকালের সাহিত্য। যাঁরা এ সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের বর্তমান ছিল অনিশ্চিত আর ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। তাই তাঁরা আশ্রয় খুঁজেছেন কল্পলোকে এবং অতীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরবময় ও আনন্দোচ্ছল জগতে একটু শ্রান্তিহর ও গ্লানিমুক্ত স্বস্তির ভরসায়। অতএব, জীবনবিমুখ কল্পনাশ্রয়ী এ সাহিত্যের সঙ্গে মন বা মাটির যোগ ছিল না, এ হল পরগাছা।

দোভাষী পুঁথিতে কেউ কেউ মুসলমানদের গৌরবের সামগ্রী খুঁজে পান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গরীবুল্লাহর আবির্ভাব পলাশী যুদ্ধের পরে এবং তাঁর গ্রন্থগুলি রচিত হয় ১৭৬০-৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের এবং রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক ভাঙাগড়ার এ সময়টিতে জীবন-জীবিকায় যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, বর্গীর হাঙ্গামা ও কোম্পানির দেওয়ানী লাভের ফলে ধন-প্রাণের উপর আকস্মিক বিপদপাতের যে-শঙ্কা জেগেছিল তাতে কারো পক্ষেই রসচর্চা করা সম্ভব ছিল না। তবু মানুষ যেহেতু স্থবির নয় এবং নাড়ির ক্ষুধার মতো মানস-ক্ষুধাও মিটাতে হয় সেহেতু নিতান্ত গরজে পড়ে কাজ চালানো গোছের রসচর্চা তাকে করতেই হয়েছে। সুখ-সৌভাগ্যে যেমন রাজধানীর লোকেরই অগ্রাধিকার, দুঃখ-নির্যাতনেরও তেমনি তারাই প্রথম শিকার। এ রাষ্ট্রিক, আর্থিক, তজ্জাত নৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদ ও নতুন বন্দর কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের লোক যখন দিশেহারা, তখনো দূরাঞ্চলে সে হাওয়া পৌঁছেনি। কলকাতায় তখন বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী কিন্তু চরিত্রহীন, ঘরছাড়া, বেপরোয়া লোকের ভিড় জমেছে। কলকাতা তখন দালাল, বেনিয়া, জোচ্চোর ও ঠকের আড্ডা। এ বাজারে ইংরেজ-বাঙালি র চারিত্রিক ভেদ ছিল না। অযোগ্য ও দুশ্চরিত্র লোকের হাতে টাকা এলে যা হয়, তাই হল; এসব হঠাৎ-নবাবেরা ধরাকে সরা-জ্ঞানে উদ্দাম হয়ে উঠল। স্বল্প লোকের এ শ্রেণীটা ছাড়া বাকি লোকের জীবন তখন সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তায় ম্লান। এমনি পরিবেশে কলকাতার হিন্দুসমাজে 'কবিওয়ালা' আর মুসলমান সমাজে 'শায়ের'-এর উদ্ভব। দুটো নামই তাচ্ছিল্য-জ্ঞাপক। প্রশ্ন হতে পারে, কোম্পানির প্রত্যয়-পুষ্ট, কৃপা-জীবী হিন্দুরা যখন কোম্পানির অযাচিত অনুগ্রহে উদ্দাম হয়ে উঠছিল, তখন হিন্দুসমাজে কেন বন্ধ্যা যুগ এল ? উত্তরে এটুকু বললেই চলে যে আপামরে বিলাবার মতো কৃপার পুঁজি তখনো কোম্পানির হাতে আসেনি; বিশেষত দেশের কোটি মানুষের জীবনে যখন দুর্যোগ-দুর্দিন নেমে এসেছে, তখন গুটিকয় সুখী মানুষের অন্তর্জীবনেও স্বস্তি থাকতে পারে না। দূষিত আবহ তাঁদের অবচেতন মনে নিশ্চিতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলা যায় 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?'

দোভাষী পুঁথিতে যে ইসলামি আবহ সৃষ্টির তথাকথিত প্রয়াস আছে, তাও লজ্জাকর। নিন্দা বা প্রশংসা করবার জন্যেও যোগ্যতা চাই। অযোগ্য মুখে নিন্দা বা প্রশংসা দু-ই ব্যাজস্তুতি হয়ে পড়ে। ফকির গরীবুল্লাহ ছিলেন পীর-পূজারী, তাও লোক-শ্রুতির কাল্পনিক পীর দেবকল্প বড় খাঁ গাজী। তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সত্যপীরও তাঁর অন্যতর জীবন-নিয়ন্তা। দোভাষী শায়েরেরা ইসলামের উন্মেষ যুগের নানা বীরের ও দেবকল্প নানা পীরের কাহিনী নিয়েই প্রধানত পুথিগুলি রচনা করেছেন। যে-কথা বিজাতিরা বললে মুসলমানেরা রুষ্ট হয়, 'সেই একহাতে কোরআন আর হাতে তরবারি নিয়ে' রসুল, হযরত আলী, হামজা, হানিফা প্রমুখ দিগ্বিজয়ীরা পরাজিত রাজা ও অধিকৃত রাজ্যের মানুষকে বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে মুমিনের কর্তব্য করলেন বলে উল্লাস ও কৃতার্থ বোধ করেছেন, তাঁদের পুরনারীরা পরপুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মল্লযুদ্ধে নেমেছেন। হিন্দুর দেব-কাহিনীর অনুকরণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পটভূমিকায় আল্লাহ, রসুল ও ফেরেস্তার সমবায়ে দেবকল্প মুসলিম বীরের ও পীরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ যেন বাস্তবজীবনে গ্লানি ভুলবার জন্যে ইসলামের গৌরবদিনের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে পর-পীড়িত জাতির আত্মপ্রবোধ লাভের অপপ্রয়াস।

সূফীভাবের নানা কাহিনী রচনায়ও আদর্শচেতনা সর্বত্র দেখা যায় না। আবার শঙ্কা ও অনিশ্চয়তাবোধ থেকে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার সহায় হিসেবে উপদেবতার উদ্ভব হয়েছে। কেবল সত্যপীর নয় ; বনবিবি, ওলাবিবি, কালুগাজী, বড় খাঁ গাজী, উদ্ধার বিবি, বাস্তুবিবি প্রভৃতির পূজা-শিরনীও চালু হল একেশ্বরবাদী মুসলমান সমাজে। এঁদের সম্বন্ধে কাহিনী গড়ে উঠে ষোলো শতকে, কিন্তু এঁদের মাহাত্ম্যকথা তথা পীর-পাঁচালি রচিত হয়েছে মুখ্যত উনিশ-বিশ শতকে। কাজেই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্যোগ-দুর্দিনের ঐতিহাসিক দলিল—গৌরবের কিংবা গর্বের সামগ্রী নয়। এ Predawn darkness নয়—অমাবস্যার তমিস্রা। রেনেসাঁসের নয়—পতনের ও গ্লানির প্রতিচ্ছবি। অতএব, এ আত্মবিকাশকল্পে আত্মবিস্তার-প্রয়াস নয়। এমনি দুর্দিনের সাক্ষ্য বাঙলার ইতিহাসে আরো রয়েছে, এমনি দুর্যোগের ঘনঘটা আগেও বাঙালি র ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছে, তখনো অসহায় বিমূঢ় বাঙালি অনুরূপ দিশেহারা ভাব দেখিয়েছে।

॥ বাঙালি র জীবন ও মননধারা ॥

যখনই সামাজিক ও আর্থিক জীবনে নিরাপত্তা ও স্বস্তির অভাব ঘটেছে, তখনই বাঙালি অধ্যাত্মজীবনের বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ ত্যাগ করে জীবন-জীবিকার সহায় শক্তিদেবতার সন্ধান করেছে; আর দেবতার কৃপাজীবী হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তাই আমরা পালরাজাদের পতন যুগে নৈরাত্ম-নিরীশ্বরবাদী নির্বাণকামী বৌদ্ধসমাজকে অসংখ্য দেব-দেবীর স্তব-স্তুতিতে মুখর দেখতে পাই। মাটির মায়ামুগ্ধ জীবনবাদী বৌদ্ধেরা অমরত্বের ও চিরসুখের প্রত্যাশায় যোগতান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে দৈবশক্তিধর হয়ে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে জীবনোপভোগের প্রয়াসী হয়ে উঠল। তুক-তাক-দারু-টোনার শক্তি আয়ত্ত করে বৌদ্ধ ডাকিনী-যোগিনীরা কামাচার-সর্বস্ব যে বীভৎস জীবনলীলা শুরু করল, তা রূপকথার আকারে আজো ভয়ঙ্কর, চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর হয়ে চালু আছে। রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ বৌদ্ধের জীবন-জীবিকার সহায়ক দেবতা হিসেবে এক আদিম সূর্যদেবতা ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হতে থাকেন।

শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানবাদের প্রভাবে বাঙলাদেশেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-শাসনকালে তাঁদের প্রতিপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলার লোকধর্মে পরিণত হল, আর তাঁদের বিরূপতায় বৌদ্ধমত লোপ পেল। এই সেনদের মন্দার দিনে তুর্কী বিজয়ের কিছু আগে থেকেই সুমহৎ বেদান্ত দর্শনে আস্থা হারিয়ে বাঙালি জনসাধারণ আবার তাদের অনার্য সংস্কারানুসারী পার্থিব জীবন-জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজায় ব্রতী হয় আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের গরজে। মনসা ও চণ্ডীই এঁদের মধ্যে প্রধান। অপরদিকে গীতগোবিন্দে ও শেখ শুভোদয়ায় বাঙালি র চারিত্রিক শৈথিল্য ও কাঙাল মনের পরিচয় পাচ্ছি।

তুর্কী পরাজয়ে পেলাম সত্যপীর, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, কালুরায়-কালু গাজী, বনদেবী-বনবিবি, শীতলা-ওলা-ষষ্ঠী-বাস্তুদেবী প্রভৃতি ; আর মুঘলশক্তির পতনে পেলাম বিদ্যাসুন্দর ও পীর-পাঁচালি আর কবিওয়ালা ও শায়ের।

বাঙলা দেশে তথা পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রথমত ও প্রধানত সূফী সাধকদের মাধ্যমে[৬০]। দেশী প্রাকৃতজন ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, দরবেশ প্রচারকদের কেরামতির আকর্ষণে ও প্রভাবেই ইসলাম বরণ করেছিল। কাজেই শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় হয়নি। তবু গৌড় সুলতানদের আমলে ইসলাম জনমনে কিছুটা জাগ্রত ছিল। কিন্তু ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশে নামত মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্তশক্তির মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল এবং তার ফলে যে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা দেখা দিল [আসলে শেরশাহর বঙ্গবিজয় (১৫৩৯ খ্রী) থেকেই এর শুরু] তাতে প্রাকৃতজনের ধন-প্রাণ নিরাপদ ছিল না। আকবর-জাহাঙ্গীরের আমল এভাবে কেটে যাওয়ার পর যদিও শাহজাহান-আওরঙ্গজীবের আমলে দেশে শক্তির দ্বন্দ্ব ছিল না, তবু সাত সমুদ্র না হোক, তেরো নদীর ওপারের দিল্লী শাসনে জনগণের আর্থিক দৈন্য ঘোচেনি। কেননা আর সব সাম্রাজ্যবাদীর মতো মুঘলেরাও ছিল কেবল শাসনে তৎপর ও শোষণে উৎসুক, প্রজার হিতসাধনের দায়িত্ব নেয়নি তারা। শাহজাহানের আমলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং মগ-হার্মাদ দৌরাত্ম্যে মানুষ ত্রাসের মধ্যে বাস করত আর আওরঙ্গজীবের আমলে বেনে স্বেচ্ছাচার বেড়ে গিয়ে নতুন উপসর্গ হয়ে চেপেছিল, এসবের সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হল বিদ্রোহ-বিগ্রহ, বর্গী বর্বরতা, সুবাদারের স্বেচ্ছাচার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্ত স্বৈরাচার ও বেনে দৌরাত্ম্য। তারপর পলাশী-উত্তর অর্ধ-শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও আর্থিক দুর্গতি মারাত্মক হয়ে দেখা দিল।

এমনি বিপর্যয়ের মুখে দেশজ মুসলমানেরা ও হিন্দুরা রাজশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে অগত্যা জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে উপদেবতা সৃষ্টি করে পূজা-শিরনী দিতে থাকে। এরূপে ষোলো শতকের শেষপাদ থেকে সত্যনারায়ণ-সত্যপীর, বনদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালুগাজী, দক্ষিণরায়-বড় খাঁ গাজী, শীতলা-ওলা, ষষ্ঠী-উদ্ধার-বাস্তুদেবী হিন্দু-মুসলমানের পূজা পেতে থাকে। অন্যদিকে নিম্ন ও উত্তর-পশ্চিম বাঙলার কিছুসংখ্যক বাঞ্ছাহত লোক বাউল-বৈরাগী জীবনে আত্মপ্রসাদ খুঁজতে থাকে। অবশ্য রাজধানী থেকে দূরে এবং সুফলা বলে পূর্ববাঙলায় এসব উপদেবতার প্রভাব কমই পড়েছে এবং চট্টগ্রামে শরীয়ত-অনুগ ধর্মসাহিত্য ষোলো শতকের শেষপাদ থেকেই রচিত হতে থাকে। অবশ্য ১৬৬৬ সন অবধি উত্তর চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ সন অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্তই ছিল, কাজেই সেদিক দিয়ে চট্টগ্রাম বাঙলার বাইরে এবং সে কারণে উপদ্রুত অঞ্চলও নয়।

ষোলো শতক থেকে বাঙালি র প্রধান দেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর। হিন্দু যে-কিছুকে 'নারায়ণ' ভাবতে পারে, কিন্তু একেশ্বরবাদী মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই মুসলমান নারায়ণকে পীরের মর্যাদা দিয়েছে। এঁকে অবলম্বন করেই মুঘল আমলে দুঃখী ও বিমূঢ় হিন্দু-মুসলমান জীবনের ও জীবিকার দুর্দিনে এক মিলন-ময়দানে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তাদের এ মিলন-রাখী হল 'সত্য' (Truth) এবং প্রমূর্ত সত্যই যুগপৎ সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর নামে পূজা-শিরনী পেতে থাকেন দুঃখীর দেবতারূপে। ষোলো শতক থেকে আজ অবধি ষাট-সত্তর জন সত্যনারায়ণ পাঁচালিকারই এঁর অপ্রতিহত প্রভাবের সাক্ষ্যদান করছেন। অল্লোপনিষদের মতো সত্যপীরও হিন্দুর মানস-প্রসূত। শাসক-শাসিতের মধ্যেকার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ঘোচানোর উদ্দেশ্যেই শাসিত হিন্দু কর্তৃক এ মুসলিম-দেবতা পরিকল্পিত। এমনি সমন্বয় প্রয়াস বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করি। চৈতন্যাবতার মুসলিম ফকির আউলচাঁদ ও মদিনার মাধব বিবিই তাঁদের সাধন-পন্থার প্রবর্তক ও প্রচারক বলে পরিকীর্তিত। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলেছেন :

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে .....
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।
[বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা]

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আপোস ও ঐক্যের এ প্রয়াস নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। দেশজ মুসলমানেরাও ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সহজপন্থা হিসেবে হিন্দুর দেবতার গুণসম্পন্ন কিন্তু প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাল কয়েকজন কাল্পনিক পীর ও কয়েকজন ঐতিহাসিক বীর-যোদ্ধাকে, যাঁরা দেবকল্প পীরের মর্যাদায় তাদের জাতীয় বীর ও ধর্মীয় নেতারূপে পরিকল্পিত। জাফর খাঁ গাজী (দরাফ খাঁ), মোবারক গাজী, ইসমাইল গাজী, খানজাহাঁ খাঁ গাজী, সফীউদ্দিন গাজী প্রভৃতি সেননী-শাসক এবং গোরাচাঁদ, বাবা আদম, পীর বদর প্রমুখ দরবেশ আর বড়খাঁ গাজী, কালুগাজী, মানিক পীর, মছলন্দ পীর, বনবিবি প্রভৃতি কাল্পনিক পীরের সঙ্গে হিন্দু রাজার ও দেবতার দ্বন্দ্ব-মিলনের উপাখ্যান মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমঝোতা ও মিলন সম্ভব হয়েছিল। দরাফ খাঁর মহাত্ম্যকথা, মানিকপীরের কেচ্ছা, গাজীকালু চম্পাবতী উপাখ্যান কিংবা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, সত্যপীর প্রভৃতির কাহিনী তার সাক্ষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু স্বার্থসচেতন, জাত্যভিমানী, বিত্তবানেরা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই খুঁজেছেন স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা। যেহেতু এঁরাই দেশের ধন-জনের মালিক, জয় হল তাঁদেরই। সত্যনারায়ণ মুসলমান পীর, তাই শিরনীই তাঁর ভোগ। বাঙলার বাইরেও এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। 'লালমনের কিসসা'য় গৌড় সুলতান হোসেন শাহ্র (১৪৯৩-১৫১৯) উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ সত্যপীরকে হোসেন শাহ্র রক্ষিতা গর্ভজাত বাস্তবপুরুষ বলে বিশ্বাস করে। সতেরো শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মকে করেছেন 'আদর্শপীর' আর নিজে হয়েছেন ফকির। হিন্দুদের ফকির চাঁদ, ফকির দাস, ফকির রায় প্রভৃতি নাম থেকেও হিন্দুসমাজে মুসলমান ফকিরের প্রভাব অনুমান করা যায়। 'সত্যপীর' রচয়িতা উত্তরবঙ্গের কবি কৃষ্ণ হরিদাসের গুরু ছিলেন মুসলমান কবি তাহের মুহম্মদ। ইনিও সত্যপীর পাঁচালির রচয়িতা :

তাহের মামুদ গুরু শমস নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণ হরি গান।

এভাবে দক্ষিণ রায়, কালুরায়, সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিম দেবতা-পীরের বিরোধ-মিলনের মধ্যদিয়ে বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান সামাজিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের রফা খুঁজেছে—'বিষ্ণু আর বিসমিল্লাহ কিছু ভিন্ন নয়।' কর্মকুণ্ঠ, পরনির্ভরশীল, ভীরু ও ভোগবাদী বাঙালি চিরকালই শক্তির উপাসক। যেখানে ইষ্ট বা অরি শক্তির প্রকাশ দেখেছে সেখানেই সে পূজায় তৎপর রয়েছে। অপ্রত্যক্ষ দেবতার সঙ্গে তাই অসামান্য শক্তিধর মানুষকেও সে পূজা করেছে। ঐতিহাসিক যুগে এর আরম্ভ জৈন-বৌদ্ধ ভিক্ষু-সাধু সেবায় এবং সমাপ্তি বীর-পূজায়। এদেশে ইসমাইল গাজী, খানজাহান খান, জাফরখান প্রভৃতি সেনানী-শাসক পর্যন্ত দেবকল্প হয়ে পূজা-শিরনী পাচ্ছেন।

কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে নানাদিকে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা সেদিন নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল প্রচুর। সাহিত্যে-শিল্পে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে সর্বত্র এর সাক্ষ্য মেলে। এ ধারায় চললে আজ বাঙলার সংস্কৃতি কী রূপ নিত কল্পনা করা সম্ভব কিন্তু নিরর্থক। কারণ ইংরেজ আমলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেষ্টায় রামায়ণ-মহাভারত ও বেদান্তের বহুল চর্চা হিন্দু-মানসকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদমুখী করে দিল, আর ওহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানেরাও শরীয়ত-অনুগ জীবনাদর্শ গ্রহণে প্রয়াসী হল এবং আরব-ইরানি তমদ্দুনের প্রতি অনুরাগ তাদের রক্ষণশীল করে তুলল। অথচ এখানেই একদা মানবতার মহত্তম বাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

নানাবরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

নিম্নবিত্তের এ মিলনমুখী প্রাকৃত মননধারা প্রবল হলেও অভিজাতদের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বধর্ম রক্ষার একটি সদা সচেতন প্রয়াস ছিল। উনিশ শতকে খ্রীস্টধর্ম প্রচার প্রতিরোধে ব্রাহ্মমতের যে ভূমিকা ছিল, পনেরো শতকে স্মার্ত রঘুনন্দনাদি প্রবর্তিত নবস্মৃতি তজ্জাত নবশাখ ব্রাহ্মণ্যমতও ইসলামের মোকাবেলায় সে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মুসলমান বিতাড়নও নাকি তাঁদের লক্ষ্য ছিল, যথাসময়ে গৌড়-সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ তা টের পেয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলেন। এ ব্যর্থতা থেকেই হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ রক্ষার নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন শ্রীচৈতন্য। যদিও হিন্দুসমাজে বাহ্যত বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি হবে বলে সুলতান খুশি হয়ে শ্রীচৈতন্যকে প্রশ্রয় ও সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবু ইসলামের প্রসার-প্রতিরোধই লক্ষ্য ছিল বলে চৈতন্যদেব মুসলিম অধিকারে থেকে তাঁর মত প্রচারে সাহসী হননি। তাই উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্যে (নীলাচলে) বসেই তিনি তাঁর মত প্রচার করেন। এজন্যে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য যত প্রসার লাভ করেছে, বৈষ্ণব মত তত গৃহীত হয়নি। তবু চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম সত্য সত্যই আর প্রসার লাভ করেনি বরং কিছুসংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণবমত গ্রহণ করে। বৈষ্ণবমত মুসলমান সমাজ-মানসকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আগেই বলেছি সূফীমতের অনুকরণেই বৈষ্ণব মতের উদ্ভব; সে সাদৃশ্যের ছিদ্রপথেই মুসলিম-মানসে 'রাধাকৃষ্ণ' সূফীতত্ত্বের দেশী রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এদিকে শিক্ষিত মুসলমানেরা ইসলামের প্রতি মুসলমানের আনুগত্য দৃঢ়মূল করবার উদ্দেশ্যে, ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করবার প্রয়াস পায়। তাই নবী বংশ, রসুল চরিত, ও নানা মসলা-মসায়েল গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ সঙ্গে তাদের ধর্মের ও সংস্কৃতির উৎসভূমি আরব-ইরানপ্রীতি জাগানোর চেষ্টাও ছিল। হয়তো এভাবে মুসলমানদেরকে বহির্মুখী করে রেখে তাদের ধর্মানুরাগ ও আরব-ইরান প্রীতির সুযোগে শাসকরা নির্বিঘ্ন শাসন কায়েম রাখার প্রয়াসী ছিল। এর আভাস মেলে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষার প্রতি বিরূপতায় এবং সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রভৃতির মাতৃভাষার প্রতি প্রীতিজাত বিদ্রোহে এবং মাতৃভাষা ও উর্দু নিয়ে উনিশ-বিশ শতকের শিক্ষিত মুসলমানের মানসদ্বন্দ্বে ও বাহ্যাচরণে[৬২]। পুরুষানুক্রমে তাদের মুখের বুলি বাঙলা। তারা উর্দু জানত না, দু-চারজন উর্দুভাষী বিত্তবানের নেতৃত্বে তারা স্বপ্ন দেখত উর্দুর। এবং সভা ডেকে এই বাঙালি রাই বাঙলা বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করত—উর্দুই তাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় জবান। কেবল বিজাতির ষড়যন্ত্রেই তাদের এ সাময়িক বিস্মৃতি ঘটেছে। শেষ অবধি এই অভিজাত দলেরই জয় হল। কেননা আজো হিন্দু ও মুসলমান স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুন্নত রয়েছে।

কিন্তু উচ্চবিত্তের মুসলমানের এ প্রয়াস বাঙালি মুসলমানের মানস ও সাংস্কৃতিক জীবন আটশ বছর ধরে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা আজো স্বদেশে প্রায় প্রবাসী হয়েই আছে। অজ্ঞতা-অশিক্ষার জন্যে আরব-ইরানি সংস্কৃতিও তারা আয়ত্ত করতে পারেনি, মানস-বিরূপতা বশত দেশী সংস্কৃতিও স্বাভাবিক বিকাশ পায়নি তাদের জীবনে। তাই কোনো মৌলিক চিন্তা, মননের কোনো ঐশ্বর্য তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাদের ভাব-ভাবনা কোথাও কোনো স্পষ্টরেখায় ফুটে উঠেনি। এজন্যে তারা আজো 'না ঘরকা, না ঘাটকা' অবস্থায় রয়েছে, আজাদী-উত্তর এ বিশ বছরেও তাদের মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘোচেনি এবং যদিবা মাতৃভাষা সম্পর্কে দ্বিধামুক্ত হয়েছে, তবু তার রূপ সম্পর্কে নির্দ্বন্দ্ব হয়নি। তাই রব উঠেছে : হরফ বদলাও, শব্দ বদলাও, নাম বদলাও, বদলাও ভাব, বদলাও ভঙ্গি, বদলাও বিষয়। তারা বাঙলার মানুষ, কিন্তু দৃষ্টি তাদের আরব-ইরানে। অস্বীকৃত বাস্তব ও অসফল স্বপ্নের টানাপড়েনে তারা আজো দিশেহারা। এ বিশ বছরেও তারা দেশ ও ধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে সাহিত্যে, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মননের ক্ষেত্রে পথ ও পাথেয় খুঁজে পেল না। এমন মানস-বিপর্যয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের মুসলমানের জীবনে দেখা যায়নি।

কেউ কেউ মুসলমানের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকেন। এ-কথা মোটামুটি স্বীকার্য যে হিন্দু-মুসলমানের রচনায় আঙ্গিক ও ভাষাগত প্রভেদ ছিল না। এর কারণ, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালি অবিশেষের জন্যে বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে যেয়ে মুসলমান লেখকেরা ভারতের classic ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। জনগণের অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের শরণাপন্ন হয়নি। যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও রূপ-প্রতীক প্রয়োগে রচনা ব্যর্থ হত। এজন্যেই আমরা আজো পারত পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের রূপ-প্রতীক বাঙলায় ব্যবহার করিনে। এক কথায় খ্রীস্টান য়ুরোপ যে-গরজে ও যে-মনোভাব নিয়ে সাহিত্যে Pagan Greek ও Latin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান লেখকগণও অনুরূপ কারণে অতিপরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাঙলায় সাহিত্য-সৌধ গড়ে তুলেছেন। একে হিন্দুয়ানী প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব নয়, দেশী উপাদান গ্রহণ—যাতে এঁদেরও উত্তরাধিকার ছিল। বাঙলা ভাষা তার পুষ্টির জন্যে জ্ঞাতি সংস্কৃতের থেকে ঋণ নেবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। তা চর্যাপদের কাল থেকে চলেও আসছে। আজকের দিনে পরিভাষা নির্মাণের কাজেও লাগছে সংস্কৃতই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ব্যবহারিক জীবনের চিত্র না হোক, চিরকালই মানস-জীবনের আলেখ্য। এ অর্থেই সাহিত্য জীবন-মুকুর। এক এক দেশ, কাল ও মানুষের বিচিত্র জীবনের রূপ ফুটে উঠে সাহিত্যে। সে সে দেশ, কাল ও মানুষের পটভূমিকায় বিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহে সমাজ ও সংস্কৃতি যেখানে যখন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সাহিত্যের আঙ্গিকে, বিষয় নির্বাচনে, ভাবকল্পে আর ভঙ্গিতে অনুরূপ পরিবর্তন আসছে। আগের যুগের মানুষ ভূত-প্রেত-দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখত, ঝাড়-ফুক-তুক-তাক-দারু-টোনাতে ভরসা পেত ; তাই তাদের রচনায় এ সবের ভয়, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধানিষ্ঠ চিত্র পাই। যেহেতু মানুষের কোনো আচরণ কিংবা মানস-অভিব্যক্তিই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাবমুক্ত নয়, সেহেতু আগের কালের মানুষের রচনায় তাদের বিশ্বাস-ভরসা-ভয়-ভাবনা-আশা-আরজু, ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। সেদিক দিয়ে তাঁদের সাহিত্যও বাস্তব আর জীবনানুগ। বিশ্বাস-সংস্কার ভেদে তা আজ আমাদের কাছে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক। আজ আমরা তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর, অনেক ব্যাপারেই তাঁদের সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছি জ্ঞাতিত্ব, যোগসূত্র হয়ে এসেছে ক্ষীণ ও স্বাজাত্যবোধও হয়ে উঠেছে আবছা ; তাই তাঁদের রচনা আজ আমাদের নিকট আজগুবি। মাটির মায়ামুগ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তত্ত্ব প্রিয় ও জীবনরসিক আজকের পাঠক তাই সেকালের অলৌকিক-অবাস্তব জগতের বিবরণ পড়তে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। সেকালের বিস্ময়বোধ আমাদের উপহাসের সামগ্রী, সেকালের রোমান্টিক ভাব-কল্পনা আমাদের চোখে অজ্ঞ-অপরিণত শিশুমনের হাস্যকর বিলাসমাত্র। তাঁদের স্থূলতা পীড়াদায়ক এবং তাঁদের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল বর্ণনভঙ্গিও বাল-ভাষণের মতো তুচ্ছ মনে হয়। এছাড়াও আজকের পাঠকের কাছে মধ্যযুগের সাহিত্য পরানুকরণ আর পুচ্ছগ্রাহিতা দোষে ক্লান্তিকর। তবু কালিক ব্যবধান মনে রেখে যদি শ্রদ্ধা নিয়ে মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন সাহিত্য পাঠ করি, তাহলে সেকালের কবি ও কাব্যের প্রতি পুরো না হোক, কিছুটা সুবিচার করা সম্ভব হবে। তখন দেখা যাবে এ পুচ্ছগ্রাহিতার মধ্যেও কোনো কোনো কবি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ।

সবচেয়ে বড় কথা—বাঙালি র চরিত্র, মানস ও জীবনধারার অন্তরঙ্গ ঐতিহাসিক ক্রম বিধৃত রয়েছে এ সাহিত্যে। কাজেই নিজেদের জানবার-বুঝবার জন্যেই এ সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় প্রয়োজন।

বাঙালি র জীবনের ও স্বভাবের পটে আমরা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে পরিক্রমা শেষ করলাম। অবশ্য একই সঙ্গে এ সাহিত্যের মুকুরে বাঙালি কে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগও পেলাম। কেননা ফল দিয়ে কর্মের এবং কর্ম দেখে কর্তার ধারণা পাওয়া সম্ভব। পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোনো জাতিকে তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাধ্যমেই জানতে হয়। কেননা মানুষের যথার্থ প্রকাশ ও পরিচয় থাকে তার মানস-অভিব্যক্তির মধ্যেই। দূরের ও অতীতের মানুষকে জানবার এছাড়া অন্য উপায় নেই। আমরা দেখলাম—বাঙালি র চেতনা-চঞ্চল জীবন, বুদ্ধির চমক, অনুভবের বৈচিত্র্য, মননের দ্যুতি, তরঙ্গিত জীবন-ভাবনার অভিনবত্ব, সৃজনশীলতা ও গীতোচ্ছ্বাস এ সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তা কখনো সার্থক ফলপ্রসূ হয়ে তাদের জীবনে ও সমাজে সুষ্ঠু অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। তার কারণ, যারা দেশের নেতা ও সমাজের প্রতিভূ, তাদের জাত্যভিমান তাদের দেশাত্মবোধকে ছাপিয়ে উঠেছিল। বর্ণহিন্দু ছিল উত্তর ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুধ্যানে নিরত, আর বিত্তবান মুসলমান ছিল আরব-ইরানির জ্ঞাতিত্ব স্বপ্নে বিভোর আর হয়তো তুর্কী-মুঘল গৌরবগর্বেও স্ফীত। দেশগত জীবন ও পরিবেষ্টনীগত প্রয়োজন সম্পর্কে কেউ তেমন সচেতন ছিল না। ফলে স্বাদেশিকবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা কখনো জাগেনি তাদের মনে। কাজেই আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা দেশ-নির্ভর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম কখনো নিয়ন্ত্রিত হয়নি। তারা সুস্থ ছিল না, কাজেই সুস্থ চিন্তা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। এর ফলে পরিণামে পূর্ববঙ্গ হয়েছে পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে উত্তর-ভারতের কাছে বিক্রিত।

তবু বাঙলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তারই যে বাঙালি র মনোরাজ্যে নবচেতনা এনে দিয়েছিল এবং এতে যে তাদের মানস-জগৎ বিপ্লবমুখী ও সৃজনশীল হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তুর্কী মুসলমানের সান্নিধ্য যে এ চেতনার ও প্রেরণার উৎস তা অস্বীকার করা যাবে না। এ ছিল অনেকটা এ যুগের প্রতীচ্য প্রভাবের মতো।

প্রতীচ্য প্রভাবে ও প্রতিভার পরিচর্যায় মাত্র চৌত্রিশ বছরে—১৮৪৭ সনে বিদ্যাসাগরের হাতে শুরু হয়ে ১৮৮০ সনে রবীন্দ্রনাথে উত্তরণে—আধুনিক বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের যে-বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব হয়েছে, সেরূপ প্রতিভার স্পর্শ পায়নি বলে আটশ বছরেও মধ্যযুগের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের তেমন দ্রুত ও বিচিত্র বিকাশ হতে পারেনি। তবু এ ভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দু-মুসলমানের মানস-ফসলরূপে গ্রহণ করব।

মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালি মুসলমানের বিশেষ গর্বের অবলম্বন হতে পারে। কেননা, এ ভাষা ও সাহিত্যের চর্যায় বাঙালি কে প্রবর্তনা দেন সুলতান-সুবাদার। এর অন্যতম আদিকবি ও প্রণয়োপখ্যানের আদি-লেখক শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রী.)। রোমান্সের সর্বশ্রেষ্ট রচক ও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাজী দৌলত। বাঙলার প্রথম মৌলিক ও রূপক কাব্য 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ'-এর (১৬৩৫ খ্রী.) রচয়িতা মুহম্মদ খান। বাস্তব প্রতিবেশে মাটির মানুষের জীবনচিত্র ও প্রণয় কাহিনী রচনা করেছেন 'লায়লীমজনু'র কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ও পূর্ব-বাঙলার গাথাকারগণ। বাঙলাকাব্যের ভাষাকে পরিস্রুত ও নাগরিক লাবণ্যদান করেন শা'বারিদ খান ও আলাউল। মুসলমান কবিও সংখ্যায় হয়তো অমুসলমান কবির চেয়ে কম ছিলেন না। এভাবে বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে মুসলমানের বিশেষ সাধনা ও দান।

তথ্যকুঞ্জী

AMARBOI.COM

পর্ব ১—২

১. ক. Origin and Development of Bengali Language (ODBL)—Dr. S. K. Chatterjee.
   খ. বাঙালি র ইতিহাস (আদিপর্ব)—ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় পৃ. ২৯-৫০।
২. ক. ODBL ,বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, প্রথম অধ্যায়।
   খ. বাঙালি র ইতিহাস।
৩. বাঙালি র ইতিহাস পৃ. ২৯-৫০।
৪. Bengali Literature— J. C. Ghose. P. 5.
৫. ক. ibid
   খ. বাঙালি র ইতিহাস পৃ. ৪৯২।
৬. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড / পূর্বার্ধ / ৩য় সং / পৃ. ৬। (বা. সা. ইতি.)
৭. ঐ পৃ. ১০।
৮. ঐ পৃ. ১১।
৯. ক. Bengali Literature —P. 5
   খ. বাঙালি র ইতিহাস—পৃ. ৫৯২।
১০. বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা: জিন্নাহ ইনস্টিট্যুট বার্ষিকী ১৯৬০, আহমদ শরীফ।
১১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১/ পূ / ৩/ পৃ :৭।
১২. ক. বাঙালি র ইতিহাস পৃ. ৫৯২।
   খ. Bengali Literature P. 8.
১৩. ক. Bengali Literature P. 9.
   খ. বাঙালি র ইতিহাস— পৃ. ৫৯২-৯৭।
১৪. বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: (সাহিত্য পত্রিকা ১৩৬৫ সন পৃ. ১৩৯-৪০।)
১৫. ঐ পৃ. ১৫০-৫৭, পীঠিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. ক. Linguistic servey of India.
খ. ODBL
১৭. বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, পীঠিকা পৃ. ১৫৬-৫৭।
১৮. ঐ
১৯. Bengali Literature P. 8.
২০. বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৫১-৫৫।
২১. ঐ পৃ. ১৩৯, ১৫৪।
২২. বা. সা. ইতিহাস: ১ / পূ / ৩ পৃ. ৯।
২৩. ODBL P, 36.
২৪. বা: ভা: ইতিবৃত্ত পৃ. ১৪০, ১৪৫, ১৪৭-১৪৮।
২৫. ODBL : P. 17 - 19.
২৬. History of Bengali Language : P. 214.
২৭. ক. ODBL : PP. 38-39, 41-42, Appendix B.
খ. বা: ভা: ইতিবৃত্ত
গ. Bengali Literature P. 2.
২৮. ক. বা: ভা: ইতিবৃত্ত পৃ. ১৩৬।
খ. বা. সা. ইতি. ১/ পূ / ৩ / পৃ. ৫৯।
২৯. বা. সা. ইতি. ঐ পৃ. ৬০।
এবং Dr. P. C. Bagchi's Translation of Newari version
৩০. বা. সা. ইতি, ১ / পূ / ৩ / পৃ. ৬০-৬১।
৩১. Hist. of Bengali Literature: Dr. Sukumar Sen P. 28.
৩২. ক. ODBL , PP. 120, 112.
খ. বা. সা. ইতি, ১ / পূ / ৩ / পৃ. ৬৯-৭০।
গ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য, পৃ. ১৬-১৯।
ঘ. প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালি —সুকুমার সেন।
৩৩. ক. ODBL (950-1200 A.D.) P. 123.
খ. S.K. Sen : 1100-1200 A.D.
গ. P. C. Bagchi-1100-1200 A.D.
৩৪. বা. সা. কথা. ও বা: ভা. ইতিবৃত্ত ৬৫০-১১০০ খ্রী.।
৩৫. ক. বাঙলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৪-১৫।
খ. সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ : পৃ. ৩১১-১২।
৩৬. পূবালী , ফাল্গুন ১৩৬৭।
৩৭. বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা, আহমদ শরীফ।
৩৮. ODBL : P. 113

পর্ব ॥ ৩ ॥

১. ক. ইসলামি বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৪, বাঙলা প্রভৃতি নবীন আর্যভাষা দশম শতাব্দী হতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপলাভ করতে থাকলেও সামনে কোনো আদর্শ ছিল না বলে তা সাহিত্যে সদ্যস সদ্যস গৃহীত হয় নাই। তবু কথ্যভাষার পদ ও বাক্‌রীতি সমসাময়িক অবহট্‌ঠ রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। "সুতরাং কালানুক্রম ও বিষয় ধরিয়া নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্‌ঠ সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাস উপেক্ষিত হয়।" বা. সা. ই. ১/৩ পূর্বার্ধ সুকুমার সেন পৃ. ৪৬। "চর্যাগীতিগুলি" প্রাচীন বাঙলায় লেখ্য হলেও এতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবহট্‌ঠের ছাপ ও ছাঁদ থাকায় ..... কোনো কোনো বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বললেও অন্যায় হয় না; পৃ. ৬০। খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/২, পৃ. ৭৬-৭৭; গ. চর্যাগীতি পদাবলী; পৃ. ৩৯; ঘ. ভাষার ইতিবৃত্ত পৃ. ৯৫ (৪র্থ সং); ঙ. ওড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন, পৃ. ৮, চ. বিজয়চন্দ্র মজুমদার—The History of the Bengali Language PP.- 2,441-43, ডক্টর শহীদুল্লাহ, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা—পৃ. ২-৩; আর্যদেবের পদ উড়িয়া এবং শান্তিপাদের গান মৈথিলী ভাষায় রচিত বলে স্বীকার করেছেন; ODBL-P. 108 ১২-১৩ শতক থেকে গৌড়ীয় বুলি থেকে উড়িয়ার উদ্ভব বলে অনুমান করেছেন 105–06.

২. ODBL 105, P. 108 P. 191 ক. বা. ভা. ইতিবৃত্ত, শহীদুল্লাহ খ. সাঃ পত্রিকা ১ম সংখ্যা পৃ. ২-৩।

২. চর্যাগীতি পদাবলী পৃ. ৩৯।

৩. ভাষার ইতিবৃত্তঃ ৪র্থ সংঃ, পৃ. - ১৫।

৪. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পূর্বার্ধঃ পৃ. ১।

৫. প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কালক্রম পৃঃ ৩।

৬. ক. বাঃ সাঃ ইতিঃ ৩/১/ পৃ. পৃঃ ৭০, খ. প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কথা।

৭. ODBL — P 113.

৮. ক. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৩য় সং পৃ. ৫৮।
খ. ODBL—P113.
গ. প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কথা, পৃ. ২—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৯. ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, "ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে দুই-চারিটি ছড়া এবং এক-আধটি গান ছাড়া এমন কিছু কালের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বড় গোছের কোনো রচনা এ সময়ে লেখা হইয়া থাকিলে তাহার স্মৃতিরেশও বোধ করি থাকিয়া যাইত। তবে পরবর্তীকালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি বিচার করিয়া বলিতে পারি যে, এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট বড় গানে অথবা পাঁচালিতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে। অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকায়তিক (Secular) এমন ছড়া ও গানও এই সময়ে চলিত ছিল,—এই অনুমান করিবার কারণ আছে।" বা. সা. ইতি— পৃ. ১/৩ পূর্বার্ধ। পৃ. ৭৭-৭৮।

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও সাহিত্যের একটি মাত্র আদর্শ ঐ পৃ. ৮০। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ অবধি যাঁহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করিত তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃতশাস্ত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন তখন যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি— রাজসভাসদ অথবা সমাজপতি। ঐ পৃ. ৭৬।

১০. কবি মুহম্মদ জীবন—বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম পত্রিকা। ইসলামি বাঙলা সাহিত্য পৃ. —৫।

পর্ব ॥ ৪ ॥

১. Bengali Literature : J. C. Ghose : P 22.

২. ibid P. 7.

৩. বাঙালি র ইতিহাস :পৃ.৮৫০-৬০।

৪. ক. Bengali Literature : P. 7
খ. বাঙালি র ইতিহাস:পৃ.৮৫০-৬০।

৫. Bengali Literature : P. 8.

৬. বাঙালি র ইতিহাস : পৃ.৮৫০-৬০।

৭. Bengali Literature : P.8.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. ibid P.6.
৯. ibid PP. 6 – 7
১০. ক. বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, (১ম সং) আশুতোষ ভট্টাচার্য,
খ. Bengali Literature : P. 14.
১১. ibid PP. 7– 8, 17
১২. ibid PP.7, 14, 17, 22
১৩. ক. বাঙালি র ইতিহাস, পৃ.৮৫০-৬০।
খ. Bengali Literature : P. 9, 17, 22.
১৪. মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালি, পৃ.১-২।
১৫. প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালি — ডক্টর সুকুমার সেন।
১৬. বৃহৎবঙ্গ, দীনেশ চন্দ্র সেন, বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত।
১৭. ক. মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালি, পৃ.২৪-২৬।
খ. বা. সা. ইতিহাস ১ম খণ্ড / ২ সং পৃ.১৫৫।
১৮. History of Bengal : Stuart.
১৯. ক. বৃহৎবঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন, বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত।
২০. ক. Bengali Literature : PP 14-15, 17, 32.
খ. বা. সা. ইতিহাস:১/ পূ / ৩ / পৃ.৭৭।
২১. ক. বাঙালি র ইতিহাস, পৃ.৭৫, ৫৭৯-৯২।
খ. Bengali Literature : PP. 14-15, 17, 32.
গ. লোকায়ত দর্শন, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
২২. প্রাচীন সাহিত্য
২৩. Bengali Literature : P. 16.
২৪. ক. ibid P. 14-15
খ. বা:সা:ইতিহাস:১/ পূ / ৩ / পৃ.৭৭-৭৮।
২৫. চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস।
২৬. বা. সা. ইতিহাস —১/ পূ / ৩ / পৃ.৪৩, ৭৮।
২৭. ঐ পৃ.৭৭ - ৭৮।
২৮. মাহে নও (কাগমারী সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ) ১৯৫৫।
২৯. ক. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ:দর্শনে ও সাহিত্যে:ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত।
খ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : ভূমিকা।
৩০. বা. সা. ইতিহাস —১/ পূ / ৩ / পৃ.১৩৩।
৩১. বাঙলার ইতিহাসের দু'শ বছর :সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৩২. বা. সা. ইতিহাসে—১/ পূ / ৩ / পৃ.১২০।
৩৩. ক. বাঙলার ইতিহাসের দু'শ বছর পৃ.১২৫, ১২৭।
খ. Hist of Bengal D.U. vol. 11 P. 136.
৩৪. ক. বাঙলার নবজাগৃতি:বিনয় ঘোষ পৃ.১২১-২৪।
খ. Influence of Islam on Indian culture : Dr. tarachand. PP 111-12, 114-15, 119-120.
গ. ভারত দর্শনসার, উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য:পৃ.৬৪-৬৭, ২৬৭, ২৯২।
ঘ. বা. সা. ইতিহাস :১/ পূ / ৩ / পৃ.২৪৫।
ঙ Hist of Bengali Literature : Dr. Sukumar Sen P. 82
৩৫. প্রাগুক্ত পঞ্জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬. বঙ্গে সূফী প্রভাব ও পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
৩৭. বা. সা. ইতি:১/২ সং / পৃ.৩০৯
৩৮. ঐ ১/ পূ / ৩ / পৃ.২৫১-৫২।
৩৯. ঐ ১/ ২ সং / পৃ.৪৫৯।
৪০. বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস :আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৪১. বা. সা. ইতি : ১/ পূ / ৩ / পৃ.৪৯০।
৪২. মুসলিম কবির পদসাহিত্য:ভূমিকা।
৪৩. বা. সা. ইতি :১/ পূ / ৩ / পৃ.৭৭-৭৮।
৪৪. বৃহৎবঙ্গ :দীনেশ চন্দ্র সেন।
৪৫. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বৃহৎ বঙ্গ।
৪৬. শূন্য পুরাণ :রামাই পণ্ডিত।
৪৭. ফয়জুল্লাহ, দুর্লভ মল্লিক, শুকুর মুহম্মদ।
৪৮. মজুরিয়া, মজুর, খরমুজা, বাকী, গুলাল প্রভৃতি।
৪৯. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য পৃ.৫৬-৫৭।
৫০. বাঙলার ইতিহাসের দু'শ বছর :সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৫১. মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ ৬১।
৫২. ক. বা. সা. কালক্রম :পৃ.১১৭।
খ. History of Bengal D. U. vol. II P. 136.
৫৩. সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, বিদ্যাসুন্দরের কবি, ১৩৬৪ সন।
৫৪. Prof. Hasan Askari says Sadhan was a muslim. In colophon he finds 'main Sadhan.'
৫৫. মধু মালতী :ভূমিকা, আহমদ শরীফ।
৫৬. বাঙলার কাব্য :হুমায়ূন কবির।
৫৭. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, Bengali Literature, P. 17, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা :পৃ.১০।
৫৮. শাহ মুহম্মদ সগীরই প্রমাণ।
৫৯. দোভাষী পুথির ভাষা, দিলরুবা, আযাদী সংখ্যা ১৩৬২ সন।
৬০. ৫৭ সংখ্যক প্রমাণপঞ্জি দ্রষ্টব্য।
৬১. সাধককবি হাজী মুহম্মদ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা :১৩৬৭ সন।
৬২. নবাব আব্দুল লতিফের উক্তি : ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান কর্তৃক 'বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন-শিল্পী

আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোনো অস্তিত্ব নেই, শিল্পও তেমনি জীবন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। জীবন-চেতনাকে অবলম্বন করেই সৃজনশীলতার প্রকাশ—শিল্পের উদ্ভব।

জীবনকে যিনি ভালোবাসেন, জীবনের কোনো মুহূর্তই যাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, প্রতিক্ষণেই যিনি জীবনকে গভীর তাৎপর্য দিয়ে অনুভব করতে প্রয়াসী, জীবনের তুচ্ছতম কিংবা মহত্তম ক্ষণকে যিনি সমান গুরুত্বে গ্রহণ করতে সমর্থ, শিল্পী হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব। জীবন-চেতনা যাঁর ক্ষীণ, বিচরণক্ষেত্র যাঁর সংকীর্ণ, অভিজ্ঞতা যাঁর সীমিত, সংবেদনশীলতা যাঁতে অনুপস্থিত, জীবন-শিল্পীর গৌরব তাঁর ভাগ্যে নেই।

এ যে বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানে লভ্য নয়, তা বলে দেয়ায় অপেক্ষা রাখে না। সদাসচেতন ইন্দ্রিয়, সমীক্ষুমন, দরদভরা হৃদয় আর গুছিয়ে ও পিঁজিয়ে বলার কায়দা যাঁর আয়ত্তে, শিল্পী হওয়া তাঁরই সাজে।

এসব গুণের সমন্বিত শক্তিই সৃজনশীলতা। না বললেও চলে যে নক্‌শা আর সাহিত্য এক বস্তু নয়। নিরবয়বকে অবয়ব দানই সাহিত্য-শিল্পের লক্ষ্য। কেননা সাহিত্য জীবনালেখ্য নয়—জীবনচেতনার উদ্ভাস মাত্র। বাহ্য আচরণ, ঘটনা কিংবা দৃশ্যের বর্ণনা মাত্রই সাহিত্য হয় না, তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে নিরীক্ষণশীল মন, বিশ্লেষণী মনীষা, সংশ্লেষণী দৃষ্টি আর জীবনরসের রসিকচিত্ত। এতেই বর্ণিত বিষয় রূপে, লাবণ্যে, রসে ও তাৎপর্যে অপরূপ হয়ে ওঠে। শিল্পীরা আমাদেরই জীবন নিয়ে লেখেন। আমরা খোলা চোখে বিচ্ছিন্ন আচরণ, ঘটনা ও দৃশ্য দেখি। কিন্তু পরিবেষ্টনীর গুরুত্ববোধ, কার্যকারণ সম্পর্ক-চেতনা কিংবা সামগ্রিক চেতনার অভাবে আমরা কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারিনে। তাই আমাদের চেতনায় খণ্ড কখনো অখণ্ড অবয়বে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না, পাইনে কোনো তাৎপর্য। ফলে আমাদের অবোধ চেতনার খণ্ড সবসময়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর তুচ্ছ চিরকালই অবহেলিত। কিন্তু শিল্পীর চোখে ক্ষুদ্র-বৃহৎ তুচ্ছ-উচ্চ সব এক অখণ্ড জীবনপ্রবাহের বিচিত্র প্রকাশরূপে ধরা দেয়। জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করা, জীবনকে বিশ্লেষণ করা, জীবনের বিচিত্র বিকাশ কিংবা প্রকাশের তাৎপর্য আবিষ্কার করা তাই শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। যেমন একটা খাটের বিভিন্ন অংশ যদি বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হয়, সেসব-যে একখানা খাটেরই অংশ তা শিশুর পক্ষে ধারণা করা শক্ত হলেও বয়স্ক লোকের পক্ষে সহজ। শিল্পী ও সাধারণ লোকের পার্থক্য এখানেই। শিল্পীর রয়েছে অখণ্ড দৃষ্টি আর অশিল্পীর আছে খণ্ড চেতনা। তাই আমাদের ঘরের কথা ও কালের খবর সাহিত্য পড়েই জানতে পাই আমরা। সুন্দর, সুস্থ ও স্বস্থ জীবনের অনুধ্যানই শিল্পীর ব্রত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান এবং উপলব্ধিই শিল্পীর লক্ষ্য।

ঔপন্যাসিক হচ্ছেন জীবনশিল্পী। জীবনরূপ মহাকাব্যের মহাকবি। জীবননাট্যের নাট্যকার। তাঁর দায়িত্ব অনেক। সে-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকা চাই তাঁর। মানুষের জীবনে বিচরণক্ষেত্র সীমিত, কিন্তু মনের সঞ্চরণ-পথ ঋজু নয়। সেই বিচিত্রগামী সদাচঞ্চল তুরঙ্গ-গতি মনের দিশা পাওয়া সাধনা-সাধ্য বিষয়। একে অনুসরণ করার নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে বিচিত্র প্রতিবেশে, বিভিন্ন অবস্থায় নানা মানুষের আচরণের, নানা ঘটনার ও অনেক ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আমাদের দেশেও তেমনি শিল্পী একেবারে দুর্লভ নয়। যদিও বেদনার সঙ্গেই বলতে হয় সাধারণভাবে আমাদের উপন্যাসশাখা দুর্বল। এর দৈন্য গুহায়িত নয়। আমাদের অনেক ঔপন্যাসিকের শিল্পীসুলভ দৃষ্টি আছে কিন্তু তাঁদের প্রায় সৃষ্টিই অসম্পূর্ণ। উপন্যাসে পাঠক বিস্তৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

পরিসরে বিচিত্র পরিবেশে, সংঘাতময় জটিল জীবনালেখ্য আশা করে। সর্পিল জীবনধারায় সমাজ প্রতিবেশে জীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকাশ, বিকাশ, বিবর্তন ও রূপান্তর প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ রাখে পাঠক, আর চায় লোভ-ক্ষোভ, প্রেম-ঈর্ষা, বিরোধ-মিলন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সুখ-শান্তি, আনন্দ-আরাম, দুঃখ-শোক আর হার-জিৎ আকীর্ণ বন্ধুর জীবনে বিচিত্রগামী মন-মানসের অঋজু পরিক্রমণ-চিত্র। কেননা মানুষ একাও নয়, স্বাধীনও নয়। তার আছে দেশ, কাল, সমাজ, ধর্ম, আইন-কানুন, বিশ্বাস-সংস্কার, ভয়-শঙ্কা, আশা-নৈরাশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য। তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এসবের হাজারো বাঁধন। খোলা চোখে জীবনের খণ্ডরূপই দৃশ্যমান। তাই তা নিতান্ত সরল, তার রূপ এক। এজন্যেই সে জীবনের বর্ণালি অথচ অখণ্ড আলেখ্য দেখতে চায় শিল্পীর তুলিতে। আমাদের নামকরা ভালো উপন্যাসেও এ গুণ দুর্লক্ষ্য। এমনকি দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, আমাদের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোও আঙ্গিকে আর বহরে বড় গল্পের উর্ধ্বে ওঠেনি। মানুষের আচরণ, ঘটনা কিংবা দৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তার অর্ন্তনিহিত কার্যকারণ ধরে দেয়াই শিল্পীর কাজ।

এজন্যে প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণে দক্ষতা। ব্যক্তিক আচরণ কিংবা বাহ্যঘটনা মনুষ্য হৃদয়ে কী ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে কীভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তার স্বরূপ জানার আগ্রহ নিয়েই পাঠক বই খোলে। পাঠকের এ সাধ যে-উপন্যাস মেটাতে অসমর্থ, ব্যর্থ রচনা বলেই মানতে হবে তাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে সার্থক উপন্যাস প্রায় নেই—এমন অনুযোগ আমাদের অজানা নয়। কিন্তু লেখকের পক্ষেও বক্তব্য রয়েছে। এ যুগে প্রতীচ্য প্রভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-চেতনা বেড়েছে, কিন্তু সে অনুপাতে আর্থিক সাচ্ছল্য আসেনি। গার্হস্থ্যজীবনে নানা অভাবের টানাপড়েন-সমস্যায় মধ্যবিত্ত বা বিত্তহীনের জীবন বিপর্যস্ত। বলা বাহুল্য, লেখকরা এ শ্রেণীরই লোক। তাঁদের কেউ কেউ লেখাকেই পেশা হিসেবে বরণ করেছেন, আবার কেউ কেউ চাকুরিজীবী হলেও বেতন বেশি নয়। তাই এসব ছা-পোষা লেখক প্রাণের প্রেরণা না পেয়েও প্রকাশকের আহবানে সাড়া দিতে বাধ্য হন। ফলে সিনেমার কাগজের এবং পুস্তক প্রকাশকের ফরমায়েশি তাড়নায় রচিত উপন্যাস পড়ে পাঠক-মন তৃপ্তি পায় না। আর ফরমায়েশি হয়েও মহৎ-সাহিত্য হবে সৃষ্টির তেমন দুর্লভক্ষণ সবসময় মেলে না। এ যুগে পাঠক অসংখ্য, প্রকাশকও অনেক। সে তুলনায় লেখক কম। তাই লেখকরা আজকাল রোজগারের সুযোগ পাচ্ছেন, দরিদ্রের পক্ষে সে সুযোগ ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে প্রকাশকের কাছে লেখকদের কদর বাড়ছে, গ্রন্থের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রচ্ছদ-শিল্পের উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু লেখার মান যাচ্ছে নেমে, পাঠকের ক্ষোভও হচ্ছে তীব্র। লেখক ও পাঠকের এ দুর্ভাগ্যের কথা নাহয় না-ই বললাম, কিন্তু দেশ ও সাহিত্যের এ ক্ষতি গুরুতর।

মুদ্রাস্ফীতির কুফল কবলিত আজকের দিনে লেখকদের শিল্প-সাধনায় অনন্য-নিষ্ঠ রাখতে হলে তাঁদেরকে প্রতুল না হোক—প্রচুর সম্পদের অধিকার দিতে হবে।

২

জীবনে যখন জাগরণ আসে, তখন মানুষ উন্মুক্ত হয়ে উঠে আত্মপ্রসারে। তখন তাজা প্রাণ ঘিরে থাকে সৃষ্টিসুখের উল্লাস। তখন সে হয় সৃজনশীল, চারদিকে কেবল নিজেকে রচনা করাই তার কাজ। সুন্দর করে বয়ন, শোভন করে রচন, আর কল্যাণমুখী সৃজন তার লক্ষ্য।

তাই প্রগতি কিংবা অগ্রগতি আসলে মনেরই চিন্তা-ভাবনার ফসল। আকাঙ্ক্ষা-প্রবল সুস্থ ও স্বস্থ মনের স্বভাবধর্মই হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া। অগ্রগতির জন্যে চাই মনের গ্রাহিকা শক্তি ও উচ্চাভিলাষ। সেক্ষেত্রে জ্ঞান তার সহায় আর আত্মবিশ্বাস তার অবলম্বন। এতেই মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃজনশীলতা। নতুনের অনুভবে, সুন্দরের অনুধ্যানে এবং মনোজীবনে আর ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিচিত্র উদ্ভাবনায় মেলে তার পরিচয়। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্তর্জীবনের বিকাশ এবং ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়ন। শিল্পে-বাণিজ্যে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে-স্থাপত্যে সর্বত্রই অনুভব করছি নতুন জীবনের—বিকাশোন্মুখ প্রাণের সাড়া। দেহ-মন-আত্মার মুক্তি না ঘটলে এমনি এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ আসে না।

সাহিত্যই হচ্ছে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। কেননা, সাহিত্যেই ঘটে মন-মানসের অন্তরঙ্গ ও সুন্দরতম প্রকাশ। ব্যক্তি ও জাতিকে চেনা যায় তার সাহিত্য পড়েই। এ অর্থেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর ও প্রতিভূ।

আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অগ্রগতির পরিচয় নিলে বোঝা যাবে আমাদের কতখানি ঘটেছে মনের মুক্তি, কতখানি স্বস্থ ও সুস্থ আমাদের চিত্তলোক আর কীভাবে এবং কোনো পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা-বিশেষ করে তরুণের দৃষ্টিতে তার সামগ্রিক রূপটি কীভাবে ধরা পড়ছে মিলবে তারও আভাস।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য

আমরা প্রায় সবাই বাঙালি-মুসলমান অর্থাৎ দেশজ মুসলমান— এ-কথা অস্বীকার করবার জো নেই। আমাদের স্বভাবে, সামাজিক সংস্কারে, জীবনবোধে সর্বোপরি আমাদের নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনে আমাদের এই বাঙালিয়ানার ছাপ রয়েছে পুরোপুরি। আবার আমরা ধর্মাদর্শে আরবের অনুসারী। কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চায় এককালে আমরা ছিলাম ইরানের অনুকারী, এখন হয়েছি য়ুরোপীয় সভ্যতার সাধক!

বিগত হাজার বছর ধরে চলেছে আমাদের সমন্বয় সাধনা—তিনটে দেশ থেকে পাওয়া তিন ধারার স্বভাব, আদর্শ ও সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনা।

আদর্শ যত মহৎই হোক, জাতীয় জীবনে তা স্বভাবধর্মকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না কখনো। স্বভাবের সঙ্গে রয়েছে আবহাওয়া-প্রতিবেশের সম্পর্ক, আর আদর্শবাদ হচ্ছে একান্তভাবে বুদ্ধিপ্রসূত। বৃত্তি-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিই স্বভাব; আর মন-মননজাত কল্যাণ বুদ্ধিই হচ্ছে আদর্শবাদ। স্বভাবের স্বপ্রকাশ প্রায় অপ্রতিরোধ্য আর জীবনে আদর্শের রূপায়ণ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনাসাপেক্ষ। তাই হাজার বছরেও সার্থক বা সফল হয়ে ওঠেনি আমাদের সমন্বয়-সাধনা। গড়ার পরিমাণ হয়তো তবু বেশি, কিন্তু নগণ্য নয় ভাঙার পরিমাণও। কোরআন-হাদিস আমাদের নিত্যসঙ্গী, তবু লৌকিক সংস্কার থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম না কখনো। আজ লৌকিক সংস্কার ছেড়েছি আমরা, আমাদের কৃতিত্ব নেই এতে—নেই কোনো সিদ্ধির আত্মপ্রসাদ। কেননা তার বদলে ধর্মাদর্শকে দৃঢ় করে ধরিনি আমরা। আসলে ভোগেচ্ছা ছাড়া এ-যুগে সবকিছুই ছাড়ছি আমরা, তাই ত্যাগ করেছি কুসংস্কারও।

হয়তো আমাদের আরো বহু কল্যাণবুদ্ধি লোপ পাবে যুগ-প্রভাবে। কিন্তু স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বজাতির প্রতি মমতা ছাড়তে পারব না কখনো। স্বদেশ তথা আবাস হচ্ছে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত নিবাস। একে বলা চলে জীবনবৃন্ত। আর ভাষা হচ্ছে জীবন-রস। যে-ভাষার মাধ্যমে বোল ফোটে শিশুর, যে-ভাষায় অনুভূতি পায় অপরূপ অভিব্যক্তি, সে ভাষা—বলতে গেলে—জুড়ে থাকে জীবনের সবখানিই। এ তথ্যটি ভালোভাবেই জানতেন আগের যুগের বাঙালি মুসলমান। তাই তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করলেও আঁকড়ে ধরে ছিলেন স্বভাষা। তাঁরা জানতেন ভাষা ও সাহিত্য শুধু মহৎ প্রেরণার সহায়কই নয়, জীবনানুভূতির ভিত্তি বা জীবনরসের উৎসও। তাঁরা বুঝতেন শব্দের নিজস্ব কোনো স্বরূপ নেই। মানুষের রস-কল্পনাই শব্দকে দেয় মূর্তি ও দান করে প্রাণ। শব্দের ব্যঞ্জনা, ভাব বা চিত্র-প্রতীকতা আর সামগ্রিক অভিধা বক্তার রস-চেতনা, বুদ্ধি, বোধি ও অভিপ্রায় নির্ভর। বক্তার ভাবকল্পের দ্বারাই শব্দার্থ হয় নিয়ন্ত্রিত, শব্দার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় না ভাব। তাই যেখানেই অনুভূতির কথা, যেখানেই বোধির প্রকাশ, সেখানেই বক্তার অভিপ্রায় শব্দকে—

> 'অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যায় কিছু দূর।
> ভাবের স্বাধীন লোকে পক্ষবান অশ্বরাজ সম।'

এজন্যেই 'ঈশ্বর', 'খোদা', 'নিরঞ্জন বা ভগবান' মুসলমানের মুখে এক অপরূপ আল্লাই নির্দেশ করে। তাদের কাছে নামাজ নমস্কার নয়—'সালাত'ই। রোজাও দৈনিক উপবাস মাত্র নয়—সিয়াম! অতএব প্রতিশব্দ ভাবের প্রতিরূপ যে বদলায় না, এ বোধ ছিল সেকালের স্থিতধী বাঙালি মুসলমানের। তাই ইসলাম বরণ করে তারা ছেড়েছিল হিন্দুয়ানী, অবজ্ঞা করেছিল—ভুলতে চেষ্টা করেছিল হিন্দু-ঐতিহ্যকে, কিন্তু ছাড়েনি স্বভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। তাই আমরা আদিকাল থেকেই পাচ্ছি হিন্দুর রচনার পাশে মুসলমানের রচনার সাক্ষাৎ। শাহ মুহম্মদ সগীর চণ্ডীদাসেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমসাময়িক। মালাধর বসুর সাথে পাচ্ছি জায়নুদ্দিনকে। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, কৃত্তিবাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, দ্বিজ শ্রীধর, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতির পাশে পাচ্ছি সৈয়দ সুলতান, চাঁদকাজী, শেখ কবির, শা বারিদখাঁ, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ, মুহম্মদ কবীর, দোনাগাজী প্রভৃতিকে। শুধু কী তাই? মুসলমান কবিরাই বিষয় ও রস-বৈচিত্র্যে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বিচিত্র ধারায়। আর বিদেশাগত আমীর-ওমরাই শুধু বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, বহিরাগত অভিজাত মুসলমান-সন্ততিগণও করেছেন স্বকীয় অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিকাশে প্রচুর সহায়তা। বাহ্‌রাম খাঁ, শা বারিদ খাঁ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, সৈয়দ আইনুদ্দিন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মুহম্মদ খাঁ প্রভৃতির নাম ও আত্মপরিচয়ে রয়েছে আমাদের উক্তির সমর্থন। এঁদের কেউ কেউ আবার আমীর-ওমরাহ্‌র বংশধর বা স্বয়ং আমীর।

ধর্মান্তরে জাত্যন্তর হয়, কিন্তু দেশান্তর বা ভাষান্তর হয় না। য়ূরোপ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু হিব্রু ভাষা ঠাঁই পায়নি সেখানে। বৌদ্ধধর্ম দেশদেশান্তরে গেছে, কিন্তু কারো জাতীয় ভাষা হয়নি পালি। কাফিরের ভাষা বলে আরবি ত্যাগ করেনি মুসলমান আরব। কোরআন তো নাযেল হল সে ভাষাতেই! বাঙালি মুসলমানের চিরকালের মুখের বুলি, প্রাণের ভাষা, স্বপ্নের বোল কী করে হয় হিন্দুয়ানী ভাষা? বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের ছাপ কম হবে না হিন্দুয়ানীর চেয়ে। আমাদের মধ্যযুগীয় অবদানের সম্যক উদ্ধার ও আলোচনা হয়নি আজো। আমাদের রিক্‌থের দলিল নেই আমাদের হাতে, মুছে গেছে স্মৃতি থেকেও, তাই নিজের সম্পদের দাবী জানাতে সঙ্কোচ বোধ করি আমরা। হীনমন্যতায় আমাদের রুচি-বুদ্ধি বিকৃত। আমরা বিভ্রান্ত, বিমূঢ়! ইতিহাসও আজ আমাদের কাছে বোবা। অথবা আমরা কালা—ইতিহাসের বাণী আমাদের মর্মে দূরে থাক্—কানেও পৌঁছে না। আরবি একদিন জবর-দখল বসাতে চেয়েছিল ইরানি ভাষায়; আত্মসচেতন ফেরদৌসীর নেতৃত্বে তা হয়েছে অস্বীকৃত ও বিচ্যুত। তবু মুসলিম ধর্ম-দর্শনে ইরানের দানই সবচেয়ে বেশি। আমরাও থাকব মুসলমান; আমাদের ভাষাও থাকবে বাঙলা। এ ভাষাই আমাদের মন-মননের অভিপ্রায় অনুসারে ইসলামি ভাবের জারকরসে অভিষিক্ত হতে বাধা নেই। এটুকুই আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

স্বাজাত্যবোধ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিজীবনে বল-ভরসার আকর। আত্মকল্যাণই এর লক্ষ্য। কিন্তু কল্যাণ আপেক্ষিক শব্দ। অপরের অকল্যাণ করে নিজের হিত সাধন হয় না। ব্যক্তিস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন করতে হলে পরিবার-পরিজনেরও বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই সামাজিক স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকা চাই। সামাজিক-কল্যাণ সাধনের খাতিরেই স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক কল্যাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। আর স্বাজাতিক কল্যাণের গরজে জেগে উঠে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার কামনা।

লোভের থেকেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উৎপত্তি। তাই সবার আগে উচ্চারিত হয়েছে এ সম্বন্ধে সাবধান বাণী—'মা গৃধঃ'। বেঁচে থাকো— বাঁচতে দাও—Live and let others live—এ যুগের চরম দাবী এ-ই। এ পথেই পরম স্বস্তি তথা শান্তি। এ যুগদাবী জেগে উঠুক আমাদের হৃদয়ে। এ-ই কামনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সাধনা

দূর অতীতে মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন দুজন দার্শনিক। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে একজন বলেন—'মানুষ হাস্যময় জীব।' অপরজন সংজ্ঞা দিলেন—'মানুষ মননবৃত্তিসম্পন্ন জীব।' এতকাল পরে আজ উপলব্ধি করছি, কেন এত শব্দ থাকতে তাঁরা হাস্যকর উক্ত শব্দদ্বয় বেছে নিয়েছিলেন মানুষকে চিহ্নিত করবার জন্যে! আমাদের মনে হয়, উক্ত দু-সংজ্ঞার সমন্বয় ঘটালে সম্ভব হয় 'মানুষ' সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ধারণা করা। যেমন, মানুষ হাস্য ও মননবৃত্তিসম্পন্ন জীব। বোধ করি, এর থেকে মানুষের যথার্থ পরিচয় আর কিছু হতে পারে না। আরো একজন নৈয়ায়িক মানুষকে আখ্যাত করেছেন 'পালকবিহীন পাখি' বলে। সে-কথা এখন থাক।

আমরা জানি—মানুষ কান্না এড়িয়ে বুকে-মুখে-নয়নে হাস্য ফুটিয়ে রাখবার জন্যেই চিন্তা করে আসছে চিরকাল। মানব-প্রচেষ্টার চিরন্তন ইতিহাসের সারমর্ম বা সংক্ষিপ্ত সার এই-ই। মানুষের মনে নির্দ্বন্দ্ব নিঃশঙ্ক হাসি ফোটাবার জন্যে কালে কালে কত ধর্ম, কত ব্যবস্থা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা-নীতিকথার প্রচার হয়েছে, ইয়ত্তা নেই তার। মানুষ যতই হাসবার চেষ্টা করেছে, ততই বেড়ে চলেছে মনন-চিন্তনের ক্ষেত্র, কিন্তু ফল স্থায়ী হয়নি কোথাও। মহামানবের মহৎ সাধনা যুগে যুগে বুদ্ধিমান ও স্বার্থলোভীদের ষড়যন্ত্রে হয়েছে পণ্ড।

হজরত মুসা এলেন আল্লাহর সুসমাচার নিয়ে; কিন্তু মানুষের মুখে হাসি ফুটতে-না- ফুটতে জগৎ-সংসার আচ্ছন্ন হয়ে গেল কান্নায়। হজরত ঈসা এলেন চোখের পানি মুছিয়ে মানুষকে আশ্বস্ত করবার জন্যে! কিন্তু মানুষ আশ্বস্ত হতে-না-হতেই চারদিকে আচ্ছন্ন করে দিল নৈরাশ্যের অন্ধকার। হজরত মুহম্মদ এলেন আল্লাহর শেষ বাণী নিয়ে। সে-বাণীর লাঞ্ছনা তো প্রত্যক্ষ করছি রোজ। তত্ত্ব ও তথ্যবিকৃত বলে নিন্দিত বাইবেলের অনুসারীদের মধ্যে যত মত-পথের সৃষ্টি হয়নি, অবিকৃত কোরআনের ধারকদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছে তার শতগুণ বেশি ফেরকার।

শ্রীকৃষ্ণ চলার পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন গীতায়! চিন্তাশীলেরা পথ হারালেন বেঘোরে। বুদ্ধদেব এলেন, আশ্বস্ত হল মানুষ; কিন্তু কয়দিন? আচার্য শঙ্কর এসে আবার দিশা দিলেন শ্রেয়সের। কিন্তু কিছুতেই হবার নয় কিছু। এই হাসির জন্যে জগৎ জুড়ে কান্নার সে কি রোল! সুখের জন্যে দুঃখের দাহনে কী বীভৎস আত্মাহুতি। দুনিয়াব্যাপী সে কী নৃশংস হানাহানি, মারামারি আর গালাগালি। হাসি ফোটাবার অবকাশ এল না আর। ঃসুদূর অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে লাভ নেই। আরো আধুনিক নজিরও গ্লানিকর। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব স্বাধীনতার-সন্তান নেপোলিয়ন সেদিন রক্তের বন্যা ডেকে এনেছিলেন য়ূরোপে। মানবতার পূজারী আব্রাহাম লিঙ্কন সেদিন নিহত হয়েছিলেন মনুষ্যত্বের ধ্বজাবাহীদের হাতেই। মানবাধিকারের এজেন্ট—সভ্যতাভিমানী আমেরিকায় নিগ্রো-নিগ্রহের অবসান হয়নি আজো। চোখের সামনে যা দেখছি আজ, তার খতিয়ানও যুগযুগান্তরের মনুষ্যসাধনার সকরুণ ব্যর্থতার মর্মান্তিক চিত্র বই তো নয়? Fraternity-র উদগাতা ফরাসিরা ইন্দোচীন ও আলজিরিয়ায় দেখিয়েছে অমানুষকিতার তাণ্ডবলীলা। তীব্র মানবতাবোধের অভিমানী ব্রিটিশের জ্ঞাতিগোত্র বর্বরতার প্রদর্শনী খুলেছে রোডেশিয়ায়, দক্ষিণ-আফ্রিকায়। ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসী, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রচারক যে য়ূরোপ, সেখানে ফ্রয়েড, আইনস্টাইন আর রোমা রোঁলা হয়েছেন নির্যাতিত। বিশ্বশান্তির অছিলায় আমেরিকার কোরিয়া যুদ্ধ পরিচালনা, কোজে দ্বীপের কেলেঙ্কারি, ভিয়েতনামে বর্বর অভিযান প্রভৃতি হাজারো ব্যাপারে প্রমাণিত হচ্ছে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তাবৃত্তিসম্পন্ন জীব, কিন্তু হৃদয়বান মানুষ নয়। এই মনন-শক্তি মানুষকে যুক্তির আশ্রয়ে শুধু হিংস্র লোভাতুর জীবে পরিণত করে রাখছে, দরদ ও বিবেক-নির্ভর মানুষে উন্নীত করছে না।

আরো দেখা যাক, মানবতার উপাসক ইংরেজের নৃশংসতা কী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিনি আমরা? সর্বপ্রকার শোষণ-অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যে এতকাল সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আন্দোলন করে আসছে যে প্রবুদ্ধ বাঙালি হিন্দু, আযাদী লাভের পর সে বাঙালি শাইল্‌করাই গুলি চালায় ভুখ-মিছিলে। বহুনিন্দিত জমিদারি প্রথা কায়েম রাখার জন্যে তারাই খুঁজছে আজ নানা ছলচাতুরীর আশ্রয়। পুঁজিবাদকে গালাগাল দেয় আর নিজেরাই পুঁজিপতি হবার সাধনায় করেছে আত্মনিয়োগ। উদার জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা গান্ধী আর চিত্তরঞ্জনের স্বজাতি আজ ভিন্নধর্মাবলম্বীদের রক্তপাগল। মহাত্মা বলে পরিকীর্তিত ও পূজিত গান্ধী বেঁচে থাকবার অধিকার পেলেন না এই স্বজাতি ভক্তের দেশেই। মানবতা ও সাম্যবাদের ধ্বজাধারী রাশিয়া ও চীন অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী করে মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী! কোরআনের অনুসারীরা আজ আচরণ, বিবর্জিত ইসলামি ধ্বজার বাহক হতেই উৎসুক। সুনীতির প্রবক্তারা চিরকালই কী এমন দুর্নীতির আশ্রয়েই পুষ্ট হতে থাকবে? তবু মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি আমরা। কেননা আমরা জানি, জনসাধারণের আসলের প্রতি আসক্তি আছে বলেই চিন্তাবিদ-বুদ্ধিমান প্রতারকেরা তাদের নাজেহাল করে নকল দিয়ে। ঠকে ঠকেও কী আসলে-নকলে পরখ করতে শিখবে না মানুষ? হাসির আশায় আশায় শুধু কী কান্না নিয়েই থাকবে? চিন্তাশীল মানুষ কী সত্যিই পালকহীন পাখি? পাখির মতো বড় বড় বুলি মানুষ শুধু চিরকাল আওড়িয়েই চলবে—হৃদয়ে তাদের মর্মার্থ ধারণ করবে না? তাদের স্বরূপ কী চেনা যাবে না? মানুষ কী চিরকাল হাস্য-সক্ষম ও মনন-সম্পন্ন জীবই থাকবে—হৃদয়বান সহানুভূতিশীল মানুষ হয়ে উঠবে না? হাস্য-কাতর মানুষ কী হাসতে পারবে না? হাসির মরীচিকা দেখিয়ে দেখিয়ে সরল মানুষকে প্রতারিত করা হবে আর কতকাল? মানুষ হাসির অভিলাষী, তাই বলেই কী তাদের প্রতারণা ও মিথ্যা দিয়ে অশ্রুর লোনা দরিয়ায় ডুবিয়ে মারতে হবে? মানুষের সুখের সাধনা, শান্তির কামনা, সুন্দরের বাসনা কী সফল হবার নয়!

মানুষ! হায়রে হৃদয়হীন মননশীল মানুষ! মানুষের দুনিয়াকে বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে রাখবে কতকাল, আর কতকাল! হায়—

"এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশের পথে মানবতা

ধর্মের নামে, দেশের নামে, রাষ্ট্রের নামে বা ভাষার নিরিখে কী পরিচয় হতে পারে মানুষের? দেশ, ধর্ম, রাষ্ট্র কী মনুষ্য-যাত্রার লক্ষ্য? জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সাপ-ব্যাঙ, মশা-মাছি, গরু-গাধার মতো মানুষও একশ্রেণীর জীব। বহু জীব অধ্যুষিত পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে অন্যতম জাত। কাজেই গোটা দুনিয়ার সব মানুষ মিলে অপর জীবেতর একটি শক্তিমান জাতি মাত্র। যেহেতু স্বভাবের অর্জনশীল শক্তি রয়েছে মানুষের মধ্যে, সেহেতু মানুষ প্রাকৃত জীব না হয়ে হয়েছে সৃজনশীল জীব। তার রয়েছে স্বসৃষ্ট জীবন। যেখানে স্বসৃষ্টি সেখানেই স্বকীয়তা—সেখানেই স্বাধীনতা। তাই সেখানেই স্বাতন্ত্র্য। আর স্বাতন্ত্র্য কিছুকে বা কাউকে জাতিভ্রষ্ট করে না, বিচিত্র করে মাত্র।

দেশ ধর্ম রাষ্ট্র মানুষের কাম্যবস্তু নয় ; কাম্যকে—প্রেয় ও শ্রেয়কে পাবার উপায় মাত্র। লক্ষ্য আমাদের মনুষ্যত্ব। একে অর্জন করবার জন্যেই আর সব উপলক্ষের প্রয়োজন। 'মনুষ্যত্ব' কথাটি বড় গলাভরা, বড় বৃহৎ শোনায়, আপাতদৃষ্টিতে মহৎও। তাই আরো ছোট করে বলা যাক। আমাদের সাধনা হচ্ছে জীবন-সাধনা অর্থাৎ আমরা জীবনকে অনুভব করতে চাই, উপলব্ধি করতে চাই, চাই উপভোগ করতে। জীবনকে সুন্দর করতে হয় এই ভোগের গরজেই, কেননা ভোগ্য হয় না সুন্দর না হলে। কুৎসিতে ভোগ নেই, যন্ত্রণা আছে মাত্র। অতএব জীবনকে সুন্দর করে রচনা করতে হলে চাই উপাদান, চাই ক্ষেত্র। সর্বোপরি চাই পরিকল্পনা। জীবন রচনার জন্যে প্রথমেই দরকার পদ্ধতির—সে-পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমত নৈতিক নিয়মে, তার প্রসার ধর্মবিধিতে, তার আনুষঙ্গিক সমাজ-শাসন বা সংস্কার, আর তার পরিণতি রাষ্ট্রের কানুনে। এ সবকিছুর মিলিত প্রচেষ্টা হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন তথা জীবনকে সুন্দর করা। সুন্দর জীবন আর মনুষ্যত্ব একই কথা। জীবন রচনায় দেশ হচ্ছে ক্ষেত্র। স্বস্তিবিহীনতায় সম্ভব নয় জীবন-স্বপ্ন। স্বাধীনদেশ, অনুকূল পরিবেশ, সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, উদার ও যুক্তিনির্ভর ধর্মবিধি এবং সংস্কারমুক্ত সৌন্দর্যবুদ্ধি মনুষ্যসাধনাকে সফল ও সার্থক করে। তাই এগুলোর প্রয়োজন। মনুষ্যত্ব বা সৌন্দর্যবোধ অর্জনে চেষ্টা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস বা সাধনা বা সৌন্দর্যানুগত্যই হচ্ছে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি-সাধনা। সুরুচি বল, সংস্কৃতি বল সবকিছুরই প্রেরণা আসে সৌন্দর্য-পিপাসা থেকে এবং এ সবকিছুই সৌন্দর্য-উপাসনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দরকে নিজের মধ্যে পাওয়া। দেহে-মনে, বুকে-মুখে সুন্দর হওয়াই হচ্ছে সংস্কৃতি সাধনার চরম ফল—পরম পরিণতি। এ ফল প্রাপ্তি ঘটলেই একজন মানুষ হয় যথার্থই ভদ্রলোক তথা সুনাগরিক, হয় ধার্মিক। কেননা মর্যাদাবোধই ভদ্রলোকের প্রধান বৃত্তি বা guiding force।

সৌন্দর্য-বুদ্ধির প্রথম ফল আত্মমর্যাদাবোধের উন্মেষ বা জাগরণ। যার মর্যাদাবোধ আছে, কোনো অন্যায়-অপকর্ম করতে পারে না সে। অন্যায়-অপকর্ম হচ্ছে সৌন্দর্যবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সংহারক। এটিই সমাজে নিন্দনীয়, ধর্মে পাপ আর রাষ্ট্রে অপরাধ। এ-ই হচ্ছে একশব্দে দোষ—যা জ্ঞানের বৈরী, যা মনুষ্যত্ব তথা সৌন্দর্য-সাধনার পথে প্রবলতর বাধা। অন্যায়-অপকর্ম কি? যা একের আপাত সুখে ও স্বার্থে অপর মানুষের ধনে, জনে বা প্রাণে ক্ষতি আনে, তা-ই অন্যায়-অপকর্ম। অতএব সংস্কৃতি-সাধনা মানে সৌন্দর্য সাধনা তথা মনুষ্যত্ব অর্জন প্রয়াস। এ একাধারে ও যুগপৎ ভদ্রলোক, সুনাগরিক ও ধার্মিক হওয়ার সাধনা। কাজেই দেশ, ধর্ম ও রাষ্ট্র মানুষের জীবন-সাধনায় উপায় বা উপলক্ষ মাত্র—আদর্শ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়।

কাজেই যখন আমি বলি আমি হিন্দু, আমি খ্রীস্টান, আমি মুসলমান ; তখন লক্ষ্যভ্রষ্টতার পরিচয় দিই আমি। কেননা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান হওয়া তো লক্ষ্য নয় আমার জীবনের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুয়ানী, মুসলমানী বা খ্রীস্টানী নীতির (এগুলো প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতির এক-একটি System বা code) মাধ্যমে মানুষ হওয়া—সুন্দর হওয়াই আমার লক্ষ্য। শুধু এটুকু বলা যায় যে, জীবনযাত্রায় আমার পাথেয় ইসলামী বা হিন্দুয়ানী বা খ্রীস্টানী মতাদর্শ ও পদ্ধতি। কোনো পদ্ধতিই পরিণতির পরিচিতি হতে পারে না, বড়জোর পরিণামের ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র। তার মধ্যে গুণগত তারতম্য সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সুতরাং উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারও চলতে পারে হয়তো। অতএব মানুষে মানুষে, নীতি ও পদ্ধতিতে, পথ ও পাথেয়তে, মতে ও মননে পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য সেই এক—জীবনকে সুন্দর করে রচনা করা; জীবনে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা। পথ ভিন্ন, পদ্ধতি নানা কিন্তু কাম্য এক, তীর্থ অভিন্ন। প্রাপ্তির স্বাদও অভিন্ন।

এজন্যেই আমাদের দেশ ভিন্ন, দুনিয়া এক ; আমাদের জাত নানা কিন্তু জাতি এক। আমাদের রাষ্ট্র বহু কিন্তু শাসন-লক্ষ্য একটিই। আমাদের ভাষা বিচিত্র, ভঙ্গি একই। ভাব বহুধা কিন্তু বক্তব্য-মূল অভিন্ন। আমরা সব জাত মিলে একমর্ত্যভূমিতে একজাতি। আমরা অপর জীবেতর 'মনুষ্যজাতি'। আমাদের টিকে থাকার সংগ্রাম হবে জড় ও জীব জগতের বিরুদ্ধে ; প্রকৃতি ও গ্রহলোকের বিরুদ্ধে। এজন্যে আমাদের হতে হবে সংহত ও সংঘবদ্ধ। এরূপে আমরা হব বিশ্বমানব। আমাদের সাধ্য—বিশ্বমানবতাবোধ ও উদ্বর্তন; কাম্য বিশ্বমানবতার স্বস্তি, শান্তি ও সুখ—যা সুন্দর হওয়ার ও সৌন্দর্য-সাধনার বাচ্যার্থে ও ব্যঙ্গ্যার্থে ফল ও কারণ দুই-ই। গত হয়েছে মণ্ডুকতা ও স্বাতন্ত্র্যের যুগ। আমাদের বুকে বিশ্বমানবতার স্বপ্ন ও সাধনা না জাগলে, মুখে বিশ্বমানবতার বুলি না ফুটলে, মনুষ্যজাতির দুর্দিনে-দুর্যোগ শুধু বাড়বেই। জাতীয়তাবোধকে আন্তরিকভাবে প্রসারিত করতে হবে আন্তর্জাতীয়তায়। নইলে নিষ্কৃতি নেই দেহ-মনের,—উদ্ধার নেই সঙ্কট থেকে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে এ বোধের উন্মেষ। এই বৃহত্তর মানবরচতনায় একদিন সারা দুনিয়া সাড়া দেবে। সেদিন দূরে নয়; টিকে থাকার গরজে, স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অভিলাষে যেদিন আঞ্চলিক শাসন সংস্থার ব্যবস্থাভিত্তিক গোটা দুনিয়া পরিণত হবে এক রাষ্ট্রে। সেদিন দেশ, ধর্ম, জাত, বর্ণ নির্বিশেষে সব শুধু 'মানুষ' নামে হবে পরিচিত। প্রাত্যহিক জীবনে যেমন একই সমাজে সাধারণ পরিচয়ে বর্ণ-বয়সের প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি পরিচয়ে মা-বাপের দেওয়া নামটিই শুধু থাকবে অবলম্বন। লোপ পাবে আর সব ভেদ। সেই আভাসই পাওয়া যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অসবর্ণ বিবাহে ও নিগ্রোদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে—তবু এ অলীক স্বপ্ন নয় কি?

AMARBOI.COM

জীবনবোধ ও সংগ্রাম

মানুষের যাযাবর বৃত্তি আমাদের কৌতূহল জাগায়, আকৃষ্ট করে, এমনকি বিস্মিতও করে অনেক সময়। অথচ জীবের চলমানতা একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। তবু যে এটি আমাদের আকৃষ্ট করে, তার কারণ হয়তো এই বাহ্য-পরিচয়ের গভীরে একটি প্রবল উদ্ভিদ-স্বভাব রয়েছে আমাদের যাকে ঠিক জড়তা বলা চলে না। উদ্ভিদ যেমন সজীব হওয়া সত্ত্বেও মাটি বা জল আঁকড়ে হতে চায় দৃঢ়মূল ও নিশ্চল, প্রাণীজগতেও আমরা তেমনি দেখতে পাই স্থায়ী নিবাসের তীব্র আগ্রহ। মানুষের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও এই নিশ্চিন্ত স্থায়িত্বকামী মনের আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত। আমরা কেবল ধরে রাখতে চাই, ভরে তুলতে চাই, হারাতে চাইনে কিছুই, ফেলতে চাইনে ভালোলাগা কিছুকেই। আমাদের অমরত্ব কামনার উৎসও এখানেই। আত্মার চিরন্তনত্বের ধারণাও গড়ে উঠেছে এই আত্যন্তিক স্থায়িত্ব কামনা থেকেই। জীবের সন্তান কামনা এই স্থায়িত্ব-লোভ তথা অমরত্ব বাঞ্ছার বিকল্প রূপ।

এ কারণেই কোনো বস্তুর দীর্ঘস্থায়িত্বের সম্ভাবনা না থাকলে আমরা উৎকণ্ঠা কিংবা অশ্রদ্ধা পোষণ করি মনে মনে। ভারতীয় বৌদ্ধমত ও মায়াবাদ এই উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি ও অশ্রদ্ধারই অভিব্যক্তি। এজন্যেই জানা অতীত ও নিশ্চিত বর্তমানের প্রতি আমাদের এত আস্থা ও আকর্ষণ, আর অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি শঙ্কিত দৃষ্টি। পুরোনো-প্রীতি ও নতুন-ভীতির মূল এখানেই। তাই আমাদের জীবন-সাধনা তথা জীবনে সাধ্য হচ্ছে স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা ও নির্দ্বান্দ্বিক নির্বিঘ্নতা। এ-ই হচ্ছে মানুষের তথা জীবের সচেতন জীবন-প্রচেষ্টা। আর অবচেতন আকাঙ্ক্ষা—যার নাম দেয়া যায় ঔৎসুক্য—হচ্ছে নতুনকে চাওয়া ও পাওয়া। যাযাবর বৃত্তির মধ্যে এই নতুন-প্রীতি তথা adventure-প্রবণতাই ক্রিয়াশীল। আমাদের অবচেতন-লোলুপতা যাযাবর তথা বেপরওয়া জীবনের পরিপোষক। তাই জীবনের স্বরূপ—সুনিশ্চিত ও স্থির-লক্ষ্য জীবন-প্রচেষ্টায় রূপায়িত কিংবা অনিশ্চিত দ্বান্দ্বিক জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রকটিত, তা এককথায় বলা যায় না নিঃসংশয়ে।

তবে বাহ্যত নিশ্চিত আশ্রয় সন্ধান জৈবধর্ম হলেও মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-প্রীতি রয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমরা দেখছি, মানুষের মধ্যে যে সহজ প্রাণশক্তির অধিকারী ও যে আত্মপ্রত্যয়শীল, সে আত্মপ্রসারে উন্মুখ ও উদ্যোগী। আত্মপ্রসার করতে চাইলেই নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত জীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করতে হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে, নিতে হয় বাঁচামরার ঝুঁকি। যেমন, রাজা সুখে রাজ্য করছেন হঠাৎ তার বুকে জাগল আত্মশক্তি সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়, মাথায় চাপল সে-শক্তি প্রকাশের খেয়াল। তাঁকে ঘাড়ে ধরে চালিত করে পর নিপীড়নের ভূত। বাঁচা-মরার ঝুঁকি নিয়ে বিচিত্র উল্লাসে তিনি চালান অভিযান। আত্মশক্তিতে আস্থা এবং অপরের দুর্বলতার সন্ধানই তাঁর কাছে আত্মবিস্তারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ। সে-সুযোগ তাঁকে নামায় দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে! কাজেই সংগ্রামে সামর্থ্যই তাঁর মতে সুযোগ। সংগ্রামই তাঁর কাছে জীবন-প্রচেষ্টা, সংঘাত সৃষ্টিই জীবন-সাধনা ; জয়েই জীবনের উল্লাস, বিকাশ ও বিস্তার; সাফল্যেই স্বপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা। আর দ্বন্দ্ব-ভীরু সাধারণ মানুষের কাছে সুযোগ মানে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুপস্থিতি। সাধারণ মানুষের এ পরিচয়-যে জীবনের ও প্রাণধর্মের বিকৃতরূপ, তার প্রমাণ মেলে আমাদের খেলায় ও সাহিত্যে।

খেলা মানেই কৃত্রিম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। প্রিয়-পরিজন নিয়েই খেলি আমরা। তাদেরই প্রতিপক্ষ করে সংগ্রাম করি আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাই হার-জিতে উপভোগ করি আনন্দ-বেদনা। খেলা অবসর বিনোদনের উপায়রূপে উদ্ভাবিত। কাজেই এ একান্তভাবে আনন্দের উপকরণ। তেমন উপকরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরূপ হচ্ছে দ্বন্দ্ব তথা প্রতিপক্ষতা, সহজ কথায় বিরোধ সৃষ্টি। মানুষের অবসর বিনোদনের আর একটি অবলম্বন হচ্ছে সাহিত্য। খেলা ও সাহিত্য একই প্রয়োজনে দু-কোটির সৃষ্টি। রূপকথার দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। রাজপুত্তুর যদি অনায়াসে রাজকন্যে লাভ করে, তাহলে হতাশ হই আমরা। যেন রাজকুমারের যোগ্য হল না কাজটা। তাই তার পায়ে পায়ে বাধা, পথে পথে শত্রু। তাকে সাত সমুদ্দরে পাড়ি জমাতে হয়, তেরো নদী পার হতে হয়, আরো অতিক্রম করিতে হয় গিরি-মরু-কান্তার। সে-পথে সাপ, বাঘ, দেও, জীন, যক্ষ-রক্ষঃ হয় বৈরী, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী হয় সহায়। তাই তো কুমারের সাফল্যে আমাদের এত উল্লাস, এত তৃপ্তি। এজন্যেই তো সার্থক ট্র্যাজেডির নায়ক আমাদের এত প্রিয়। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুখর সাহিত্যের এত কদর।

অতএব, সংগ্রামই জীবন। তাই দুর্বল মানুষ কৃত্রিম সংগ্রামেই জীবনের চরিতার্থতা খোঁজে। 'ভীরুহৃদয়ের ভিখারী পিপাসা' পর-পরাক্রমে মিটিয়ে নিয়ে সে লাভ করতে চায় আত্মপ্রসাদ। কাজেই নিশ্চয়তার প্রশ্রয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয়প্রীতি মানুষের স্বভাব নয়— স্বভাবের বিকৃতি।

"তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম" অথবা 'জীবনযুদ্ধ' কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। কেননা ব্যঙ্গ্যার্থে জীবনই সংগ্রাম, অন্যকথায় সংগ্রামের মধ্যেই জীবন-রস নিহিত। এজন্যেই জীবন-রস রসিকের সংগ্রামী না হয়ে উপায় নেই। আটপৌরে ব্যবহারে কথাটি বাচ্যার্থে তুচ্ছ এবং শব্দটির ব্যঙ্গ্যার্থ প্রায় লোপ পেয়েছে বটে কিন্তু এ কথাটি যতদিন আমরা স্বরূপে ও সদর্থে উপলব্ধি না করব, ততদিন জীবনের সত্যকার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে আমাদের।

সাধারণভাবে চিন্তা করলেও দেখতে পাব, প্রতিকূল পরিবেশ ও শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েই জীবন-পথে এগিয়ে চলি আমরা। মাথায় চুল বাড়ে, হাতে-পায়ে গজায় নখ, মুখে জন্মায় দাড়ি—এসব অস্বস্তিকর প্রতিকূলতা যেমন জয় করি সুকৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে, তেমনি রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যেও করে নিতে হয় আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা। এসব আজ তুচ্ছ বটে; কিন্তু একদিন এসব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ছিল মানুষের বহু চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টার কারণ। এমনি করে প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে আজকের স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, যোগ্যতা ও প্রভুত্ব অর্জন করেছে মানুষ।

কাজেই সম্মুখগতি মানেই প্রতিকূল পরিবেশে চলার পথ করে নেয়া। আর এগিয়ে যাওয়া মানেই নতুনকে পাওয়া, বরণ করা, কিংবা জয় করা। তাই নতুন-ভীতি মাত্রই জীবনবিমুখতা। কোনো পুরোনোই পারে না নতুন দিনের পুরো চাহিদা মেটাতে। নতুন যদিবা অনিশ্চয়তার মরু হয়, তবে পুরোনো নিশ্চিতই মরীচিকার মায়া। তাহলে মরীচিকার পিছু ধাওয়া নয়, মরু-উত্তরণের সাধনাই হওয়া উচিত কাম্য। আসলে কোনো নতুন ভাব, চিন্তা বা বস্তু মানুষের অমঙ্গলের জন্যে আসেনি। নতুনই তো চিরকাল এগিয়ে দিয়েছে মানুষের মানস-সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক সভ্যতা। অতএব আমরা যে কেবল নতুন ভাব, চিন্তা ও আদর্শ গ্রহণ করব, তা নয় ; নতুন দিনে সাহস ভরে মাথা পেতে নেব অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি। নইলে জীবনের প্রসাদ থেকে, জীবনের উল্লাস-রস থেকে থাকব বঞ্চিত। এই জীবনচেতনা, এই জীবন-রস-রসিকতা, এই জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়েই নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে সাড়া দেব সর্বপ্রকার নতুনের ডাকে। সুস্থ ও স্বস্থ জীবন মাত্রই বহতা নদী।

পুরোনো দিনের অবসানে নতুন সূর্যের উদয়ে কেবল বিকৃতবুদ্ধি ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিই ম্রিয়মাণ হয় হারানোর বেদনায়, পাণ্ডুর হয়ে উঠে মৃত্যুর বিভীষিকায়। তারই পড়ে দীর্ঘশ্বাস; সে-ই কেবল বলে 'দিন গেল।' আর যে প্রাণধর্মের তাগিদে চলে, সে মনে জানে 'দিন এল।' একটার পর একটা দিন আসে, আর সে ভাবে এ বুঝি নতুন জীবনের তোরণে উত্তরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্য

সাপে-মানুষে যে পার্থক্য, তাকেও পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বলা চলে। কিন্তু তাতে কারো গৌরব নেই, কেননা তা প্রাকৃতিক কিংবা সৃষ্টির নিয়মেই পাওয়া। জন্মসূত্রে যা মেলে, তা-ই স্বভাব। স্বভাবের বিভিন্নতা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যেরই নির্দেশক। আর রূপগত ও গুণজাত অনৈক্য স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক নয়, বিধাতার বিচিত্র বিলাস-বিধানের পরিচায়ক।

মানুষের সম্পর্কে 'স্বাতন্ত্র্য'-এর রয়েছে বিশিষ্ট অভিধা। 'স্বাতন্ত্র্য' উৎকর্ষসূচক, বিশেষ ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ শব্দ। মানুষের 'স্বাতন্ত্র্য' অর্জিত গুণ। তা একান্তভাবে ব্যক্তিক চর্যায় ও চর্চায় লভ্য। এটি ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি ও মনন-সঞ্জাত। অতএব স্বাতন্ত্র্য কখনো সমাজ কিংবা জাতিগত হতে পারে না। একের উপলব্ধ সত্য অপরের অনুকৃতিজাত আচরণের তথ্যে পরিণত হলে তা প্রাণহীন মারাত্মক আধির রূপ নেয়। কেননা তখন তা অশিক্ষিত, অপরিস্রুত এবং অনুপলব্ধ যান্ত্রিক অনুশীলন ছাড়া কিছুই নয়। যন্ত্র হচ্ছে একটি অবয়ব যা সুপ্ত শক্তির আধার। যন্ত্রীর অভিপ্রায়ই যন্ত্রকে চালিত করে। ফল হয় অভিপ্রায়-অনুগ। অভিপ্রায় যেখানে অস্পষ্ট; অস্থির, ফল সেখানে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট হতে পারে না ; আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোনো রূপ নেই, তেমনি অভিপ্রায়-নিরপেক্ষ কোনো যন্ত্র নেই।

সচেতন মনের স্বতোস্ফূর্ত অভিপ্রায়ে আর বন্ধ্যামনে আরোপিত অভিপ্রায়ে তফাৎ দুস্তর। ঘরে-সংসারে লোকে সুনিশ্চিত অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে আগুন। সে আগুন অবোধ শিশুর কর্তৃত্বে গেলে ঘটায় অনর্থ।

সমাজ-ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্র প্রভৃতি যা-কিছু মনুষ্যকল্যাণে রচিত, তা হচ্ছে পরিচর্যা-পুষ্ট, পরিস্রুত-রুচি, প্রজ্ঞা-ঋদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানুষের মনন-মনীষার প্রসূন। নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত জীবন-প্রতিবেশ রচনার জন্যে যা পরিকল্পিত, বন্ধ্যা মনের অনুকৃত অভিপ্রায় সংযোগে তা-ই হয়েছে সঙ্কট-শঙ্কার আধার। সমাজ-ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্রের নামে যত পীড়ন, যত রক্তপাত ও জীবন নাশ হয়েছে, তেমনটি মহামারী-ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত কিংবা ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও হয়তো হয়নি।

প্রকৃতি আজ আর মানুষের শত্রু নয়—অনুগত। জীবজগৎ মানুষের কৃপাজীবী। মানুষ আজ অকুতোভয়। জগৎ প্রতিবেশে সে আজ যথার্থই স্বস্থ ও সুস্থ। তাহলে তাকে অমৃতের পুত্ররূপে, আনন্দের সন্তান স্বরূপ পাইনে কেন! তার কারণ, বাইরে যে স্বপ্রতিষ্ঠ বটে, কিন্তু তার মর্মমূলে জন্মেছে কীট। সে-কীটের দংশনে সে পীড়িত। বহির্জীবনের ঐশ্বর্যের মধ্যেও সে দুঃস্থ আর্ত। অপরিস্রুত মনের আত্মরতি, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা সংকীর্ণতা বদ্ধচিত্ততা ও স্বার্থবুদ্ধি জন্ম দিয়েছে এ কীটের। এ চিত্তে পরশ্রীকাতরতা ও পরপীড়নের উল্লাস ছাড়া কিছুই ঠাঁই পায় না। তাই মুসার পাপবোধ, ঈসার প্রীতিবাঞ্ছা, গৌতমের সহ-অবস্থান তত্ত্ব, মুহম্মদের যুক্তিনিষ্ঠা প্রভৃতি জনচিত্তাধারে ব্যঞ্জনাহীন বুলিরূপে বিধৃত। তার প্রয়োগও স্থূল এবং মারাত্মক।

অবশেষে মতানৈক্য আর আচার পার্থক্যই 'স্বাতন্ত্র্য' সংজ্ঞায় পরিগৃহীত হয়েছে। তাও আবার কুড়িয়ে পাওয়া তথা বহিরারোপিত মত-আচার, স্বতঃউপলব্ধ কিংবা স্বসৃষ্ট নয় এবং সে কারণেই অকৃত্রিম নয়—আপাত-অপরিহার্য সংস্কার মাত্র। সমাজে ধর্মে জাতে কিংবা রাষ্ট্রে এই বুনো বদ্ধ-নিষ্ঠা মানুষকে করেছে অমানুষ ও যান্ত্রিক। উপায়কে তারা ঠাওরিয়েছে লক্ষ্যরূপে, উদ্দেশ্যের ঘটেছে বিস্মৃতি। তাই দিশাহারা মানুষের মতাদর্শ হয়েছে মারণাস্ত্র। খ্যাপা মানুষকে মায়েতেও ভয় পায়। কেননা উন্মত্ত বা ক্রোধান্ধ লোকের সুমুখে মায়ের ধনপ্রাণও নিরাপদ নয়। বিশ্বমানবের উন্মত্তরূপ তাই পারস্পরিক শত্রুতা ও সঙ্কটের কারণ হয়ে রয়েছে। এই মত, আদর্শ ও আচারে যে নিষ্ঠা, তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

রয়েছে কেবল অন্ধ আবেগ যুক্তি-বুদ্ধি নেই। ও আমার মতে আস্থা রাখে না, অতএব আমার দলের নয় ; ও আমার আচার মানে না, কাজেই ও আমার পর। সে আমার দেশে বাস করে না, তাই সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে আমার রাষ্ট্রবাসী নয়, অতএব সে বিজাতি। ও তো আমার ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, কাজেই ও আমার শত্রু। ওর দেহাকৃতি আমার মতো নয়, অতএব ও অমানুষ। সমাজে ধর্মে জাতে রাষ্ট্রে অভিন্ন না হলেই সন্দেহ করতে হবে, শত্রু ভাবতে হবে—এই হচ্ছে মানুষের কয়েক হাজার বছরের উদ্যোগ-আয়োজন-আড়ম্বরের ফল। মনুষ্যসাধনার কী মর্মান্তিক ব্যর্থতা, মানব-মনীষার কী বিস্ময়কর অপচয়! এই হিংস্র বিদ্বেষভাব জিইয়ে রাখার নাম 'স্বাতন্ত্র্য'। গর্বোদ্ধত উচ্চারণের পৌনপুনিকতায় 'স্বাতন্ত্র্য' তার মৌল অভিধা হারিয়ে অনুদার, অসহিষ্ণু, আত্মরতি-সুখাভিলাষীর কূপমণ্ডুকতার প্রতিশব্দ রূপেই টিকে আছে।

তাই পরধর্মে ঘৃণাই ধার্মিকতা, বিজাতি বিদ্বেষই জাতীয়তা, পরমত অসহিষ্ণুতাই আদর্শনিষ্ঠা, সংস্কারাচ্ছন্নতাই সমাজানুগত্য, বিদেশী বিমুখতাই স্বদেশপ্রীতি আর পরশ্রীকাতরতাই রাষ্ট্রচেতনা নামে প্রশংসিত।

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনচেতনার নামে আদিম জৈববৃত্তির লালনে উৎসাহবোধ যেন বেড়েই চলেছে। আদিম মানুষের জৈব-বাসনা ও নির্বোধের সংস্কার জীবন-সত্য রূপে আজো নামান্তরে মানুষের জীবনের আদর্শ-উদ্দেশ্যের নিয়ামক—এ ভাবলে হতাশ হতে হয়।

যন্ত্র কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সংস্কার-যন্ত্র চালিত মানুষও যান্ত্রিকতামুক্ত হতে চায় না। তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শঙ্কা-সংশয়ই মানুষের জীবনে বিধিলিপি রূপে স্বীকৃত। প্রাকৃত ও জৈবজগতে মানুষ আজ শত্রুজিৎ। মানব-মহিমার এ যে কত বড় দলিল, তা বলে শেষ করা যায় না। কেননা যখন ভাবি যে মানুষই একমাত্র জীব, যাকে নিজের জীবন নিজে রচনা করতে হয় বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে, যার নিজের দেহও ছিল না নিজের অনুগত তখন বিস্ময়ের সীমা পাইনে। কল্পনার সামান্য আশ্রয় নিলেই বুঝতে পারি, মানুষ কী অসামান্য উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় দিয়েছে, কী জগজ্জয়ী প্রতিভা রয়েছে তার! এমন একদিন ছিল যখন মাথায় চুল বাড়ছে, জটা হচ্ছে, উকুনে উত্যক্ত করছে, দাড়ি-গোঁফ অসহ্য অস্বস্তির কারণ হয়েছে, হাত-পায়ের নখ অচল-অকর্মণ্য করে তুলেছে, অথচ অসহায় মানুষ কাটবার-ছিঁড়বার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তাছাড়া রোদ-বৃষ্টি-শীত তো রয়েইছে! জীবনারিকে মানুষ ক্রমে জীবন-মিত্রে পরিণত করছে! মানুষের এ মনীষা, এ নৈপুণ্য স্মরণে অভিভূত হতে হয়।

কিন্তু মানুষের সম্পর্কে মানুষ আজো পাশববৃত্তি মুক্ত হতে পারল না। আজ মানুষের একমাত্র শত্রু মানুষ। মানুষকেই মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়। গৃহাশ্রিত বিশেষ জীবের মতো ঈর্ষু ও লোভী মানুষই মানুষের সুখে বাদ সাধে। বাইরে সে যেমন অসাধ্য সাধন করেছে, মনের অনুশীলনেও যদি তেমনি যত্নবান হত, তাহলে জীবনবৃক্ষে ফুল ফুটত, ফল ফলত। সুন্দর হত জীবন, মধুময় হত তার দিন ক্ষণ। কিন্তু সম্ভাবনার 'এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা'—এ আফসোসই শুধু জেগে রইল। অথচ 'স্বাতন্ত্র্য'-বুদ্ধি স্বরূপে জাগলে কেউ কারো সুখের প্রতিবাদী হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। কেননা উচ্চমানের সংস্কৃতিই স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তি। আর সংস্কৃতিচর্চার পূর্ব-শর্ত হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন। যার মর্যাদাবোধ আছে, সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। সংস্কৃতির প্রথম পাঠ সহিষ্ণুতা ও উদারতা। রুচিবান মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণার শিকার হতে চায় না। তার মধ্যে থাকবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, সে-স্বাতন্ত্র্য অর্জিত ও রক্ষিত হবে আত্মোৎকর্ষের ভিত্তিতে। অপরের তুলনায় নিজের উৎকর্ষ অনুভব করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে, আস্ফালন করবে না কখনো। আবার অপরের উৎকর্ষ-উন্নতি দেখে আত্মোন্নয়নে যত্নবান হবে, পিছুটান দিয়ে সমান করবার চেষ্টা করবে না, আর অসূয়ানলেও দগ্ধ হবে না অকারণ। তার পথ প্রতিযোগিতার—প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়। অপরের ক্ষতি করে নিজের প্রতিষ্ঠা-বাঞ্ছা তার নয়। ঋণাত্মক নিবর্তনে তার উল্লাস নেই, ধনাত্মক উদ্বর্তনেই তার তৃপ্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্বাতন্ত্র্য' হবে অসামান্যতার প্রতীক। তার মনোভূমি হবে সৃজনশীল—নিত্য বাসন্তী হাওয়া বইবে তাতে। ভাঙনে থাকবে তার বেদনাবোধ, গড়নে জাগবে উল্লাস। 'To know all is to pardon all'—হবে তার উপলব্ধ সত্যসার। সেক্ষেত্রে 'স্বাতন্ত্র্য' হবে অনন্যতার নামান্তর। 'Live and let live' শ্রেণীর সহ-অবস্থানতত্ত্ব হবে তার জীবনের নিয়ামক। 'নিজে ভালো হও, আর অপরের ভালো চাও, ভালো করো'—আদর্শ হবে তার জীবনের দিশারী।

কিন্তু এ যে বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ, তাও মনে হয় না। কেননা ঘরে-সংসারে আমরা মায়ের সন্তান, স্ত্রীর স্বামী আর কন্যার পিতা ; বাইরে কারো মজুর, কারো মনিব, কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য—কিন্তু তাতে তো দ্বন্দ্ব দেখিনে। তেমনি নিজের সমাজ-ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত-অনুগত থেকেই মানুষ নির্বিশেষের প্রতি অসূয়া-অবিশ্বাস-অপ্রীতিমুক্ত মনোভাব পোষণ করতে বাধা কি! মনের তেমন অবস্থাতেই কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য দাবী করা চলে। এই 'স্বাতন্ত্র্য' উত্তমন্যতার ধারক, সমকক্ষের অসূয়া-দ্বন্দ্বের বাহক নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর

১

ঘৃণা, হিংসা ও ঈর্ষা—এই তিনটে পরিবেশ ও পাত্রভেদে মানুষের একই বৃত্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি মাত্র। আমরা ছোটকে ঘৃণা করি, সমকক্ষকে হিংসা করি, আর বড়র প্রতি হই ঈর্ষ্যু। ঘৃণার স্বাভাবিক প্রকাশ অবজ্ঞায় ও অবহেলায়, হিংসার স্ফূর্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও পরশ্রীকাতরতায় আর ঈর্ষার প্রকাশ ধনে-মানে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দোষ-সন্ধানে ও অসূয়ায়। দুর্বলের বিপর্যয়ে আমাদের অনুকম্পা জাগে, সমকক্ষের দুর্যোগে সুপ্ত জিগীষাপ্রসূত আহ্লাদ বোধ করি আর বড়র দুর্দিনে আত্মপ্রসাদ পাই। অবশ্য এদের সঙ্গে প্রীতির কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে এদের দুঃখ-বিপদে বিচলিত ও দরদে বিগলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা ছোটর সঙ্গে মিশতে চাইনে প্রাণের আরাম নেই বলে, সমকক্ষকে এড়িয়ে চলি প্রীতির অভাবে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গরজে আর বড়কে ধরা দিইনে তার সামনে বিব্রত বোধ করি বলে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্তি পায় না ভেবে। এসব অবশ্য আত্মপ্রত্যয়হীন সাধারণের আচরণ, যারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ম্লান হল ভেবে সর্বক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত। এরা বাইরে ভীরু আর অন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী। এ নিষ্ক্রিয় দ্বন্দ্বভাব তাদের মনের বিকৃতি ঘটায়, মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশ এর ফলেই রুদ্ধ হয়। এরা সঙ্কীর্ণমনা, ছিদ্রান্বেষী ও অপচিকীর্ষু। কিন্তু যারা প্রাণধর্মের তাগিদে চলে, যাদের জীবন-জিজ্ঞাসা আছে, তাদেরকে এ বৃত্তি ভিন্নপথে চালিত করে। যে উচ্চতায় থেকে তারা দুর্বলকে ঘৃণা করবার মৌরসী অধিকার পায়, সে উচ্চতা বজায় রাখবার—পতন রোধ করবার সতর্কতাও তারা এ পথে লাভ করে এবং সমকক্ষের প্রতি হিংসার উত্তেজনা তাদের মনে জিগীষা জাগায় এবং শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনে তাদের প্রবুদ্ধ করে। আর বড়র সমকক্ষ হবার প্রেরণাও খুঁজে পায় তারা। এই প্রতিক্রিয়াকে ইংরেজিতে incentive বলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—প্রতিযোগিতাই (competative spirit) হচ্ছে এদের স্বভাব। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথ ও পাথেয় এরা সহজেই খুঁজে পায়।

২

আগের যুগে মানুষের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল না। চিন্তা বলতে অন্নচিন্তা আর তত্ত্ব বলতে অধ্যাত্মতত্ত্বই তাদের পরিচিত ছিল। জীবনকে—জীবন-সমস্যাকে তলিয়ে দেখবার, মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে যাচাই করে খুঁটিয়ে বুঝবার গরজ বোধ করত না সাধারণে, সে সাধ্য তাদের ছিল না। তারা ছিল মোটা কথা আর স্থূল প্রয়োজনের মানুষ। 'ভবলীলা' বলত বটে, কিন্তু জীবনলীলা জানত না, বুঝত কেবল জীবনে নিয়তির লীলা। পাপ-পুণ্য চেতনা তীব্রতর ছিল সত্য, কিন্তু পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম সীমারেখা চিনত না।

তাই তাদের জীবনে সারল্য ছিল, স্থূলতা ছিল, আদর্শবাদও ছিল—ছিল না কেবল সূক্ষ্ম জীবনচেতনা যা দিয়ে ভালো, মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, লাভ-ক্ষতি যাচাইয়ের নতুনতর মাপকাঠি তৈরি করা যায়। তাদের জীবন ছিল অনুভূতি ও অনুসৃতি নির্ভর। তারা ছিল বাঁধা-পথের যাত্রী, নিয়মের পূজারী এবং পীর ছিল তাদের দিশারী। ডানে-বাঁয়ে পা ফস্কে গেলেই মানুষ হারিয়ে যেত, নৈতিকমানে তলিয়েও যেত। আমরা সাধারণ মানুষের কথা বলছি ; অসামান্য ব্যক্তি চিরকালই স্বতন্ত্র, কাজেই তাঁদের কথা আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

সেকালে মানুষের চলনে-মননে-কথনে 'মত' বলতে একটিই ছিল—ধর্মমত। মানুষের প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক ও আচারিক জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হত ধর্মমতের দ্বারা। কাজেই সে-যুগে মতান্তর ছিল মারাত্মক ব্যাপার। মতান্তর মাত্রই মনান্তর, ফলে তা ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত সঙ্কুল। 'মত'-প্রীতি এ-যুগেও কম নয়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার ফলে পরমতসহিষ্ণুতা এসেছে— অন্তত প্রচুর বেড়েছে। সে-যুগে এটিই ছিল প্রায় অজ্ঞাত। ফলে মতান্তর দ্বন্দ্বপ্রবণতায় ইন্ধন যোগাত। আর তাতেই স্বমতের হলে মেহেরবান আর ভিন্নমতের হলে দুশমন ঠাওরানো হত। এ যুগে এর কিছুটা উন্নতি হয়েছে, স্বমতের হলে মিত্র ভাবি বটে, কিন্তু ভিন্নমতের হলেই শত্রু মনে করিনে।

Animism-এর আমলের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর জন্যেই ঐক্যবদ্ধ সমাজসৃষ্টির প্রয়াসে অভিন্ন স্রষ্টা ও উপাস্যের নামে মতাদর্শের অভিন্নতার ভিত্তিতে মানবিক ঐক্য, সহযোগিতা ও প্রীতি স্থাপনের পন্থা হিসেবে চিন্তাশীল মানুষ উদ্ভাবন করলেন ধর্মের। কাজেই—'ধর্ম' এল মানুষের স্বস্তি-শান্তির জন্যে, সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার গরজে। সব মানুষ একমত হতে পারল না। তাই সৃষ্টি করে চলল তাদের পছন্দমতো নানা ধর্ম। বাধল সংঘাত। কারণ পরমতসহিষ্ণুতা ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মের নামে কত রক্তনদী বয়ে গেছে তার হিসেব নেই। 'বর' স্বরূপ যা কামনা করা হয়েছিল, এভাবে তা 'শাপে' পরিণত হল। এ যুগের আগে ধর্মমতই ছিল মানুষের শঙ্কা ও ত্রাসের কারণ। চোর-ডাকাতের ভয়ে ধনী যেমন সদা-শঙ্কিত, সংখ্যালঘু দুর্বলও তেমনি থাকত সতত সন্ত্রস্ত। ধর্মমতই ছিল জাতি নির্ণয়ের নিরিখ। এ কারণে শুধু-যে জাতীয় জীবনই বিপন্ন হত, তা নয় ; ব্যক্তিজীবনও নিরঙ্কুশ ছিল না। কেবল কী তা-ই, একই ধর্মাবলম্বীর বিভিন্ন শাখায়ও লেগে থাকত হানাহানি। মানুষের চরম কাম্য হচ্ছে নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন জীবন অর্থাৎ শান্তি। তারই উপায়স্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র। আশ্চর্য, এ সবই হয়ে উঠল মানুষের কাল। এদের পেষণে মানুষ হারিয়েছে দিশা—জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক স্ফূর্তির পথ।

স্থূলবুদ্ধির স্বধর্মের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি পরমত-অসহিষ্ণুতা তীব্র করে ও অর্থহীন অভিমান বাড়ায়। স্বাতন্ত্র্যবোধ তারই সন্তান। অন্ধ-অনুকৃতিকে সে স্বকীয়তা মনে করে, আর সে-স্বকীয়তার মহিমায় নিজেকে গরীয়ান ভাবতে তার ভালো লাগে। রক্ষণশীলতার জন্ম এখানেই। আর স্বাতন্ত্র্যকামী রক্ষণশীলের জাতিবৈর না থেকেই পারে না; কেননা আত্মরতি মাত্রই পরপ্রীতির পরিপন্থী। অতএব স্বাতন্ত্র্যবোধ জাতিবৈর জাগায়, আর জাতিবৈর স্বাতন্ত্র্যবোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্র করে। এর আর একটি আত্মধ্বংসী দোষ—এ মন গ্রহণ করতে পারে না ; সত্য, শিব ও সুন্দরকে বরণ করতে জানে না। এ অবস্থায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও মন মোহগ্রস্ত থাকে। তাই পরমতের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না। ভালো-মন্দ যাচাই করা চলে না, ফলে আত্মপ্রসার হয় না, আত্মক্ষয়ই তার পরিণতি। কল্যাণ-বুদ্ধিই তার জাগে না। আত্মসংকোচনে নিজেকে দুর্বল করে করে একসময়ে সে অপমৃত্যুই ডেকে আনে। ভয় আছে অথচ হিতবুদ্ধি নেই, তাই বর্জনই তার আদর্শ। নতুনকে—কল্যাণকে এভাবে বর্জন করেই সে হয় দেউলিয়া, জীবন-রসের ঘটে অভাব, ফলে সমাজ-দেহ যায় ধসে, জাতীয় জীবন হয় বানচাল।

৪

অবস্থান্তরে এর আর একটি প্রতিক্রিয়া বা রূপও দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে একে উদার ও মহিমময় বলে মনে হয়। একই গোত্রের বা গোষ্ঠীর একটা অংশ যখন ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তারা পরস্পর বিজাতি হয়। ফলে মন-মননের যোগসূত্র হয় ছিন্ন। পৈত্রিক-ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্টি ধর্মান্তরের অনিবার্য ফল।

স্বধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে মৌরসী ঐতিহ্য অস্বীকারের গরজ বোধ করে সে। সনাতনীর আভিজাত্যবোধ আর নতুনের উত্তম্মন্যতা পারস্পরিক অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্বপ্রবণতার ফলে সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠে। এর আভাস পাই আর্য ইতিকথায়। পণ্ডিতের মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনা যায়, প্রাচীন ইরানে একসময়ে আর্যরা বাস করতে থাকে। ধর্ম ব্যাপারে একদা তাদের দ্বিমত দেখা দেয়। একদলের ইষ্ট 'দেব' অপর দলের দুশমন 'দেও' হয়ে উঠে। এ দলের শত্রু 'অসুর' ও দলের দেবতা 'অহোর'রূপে পূজা পায়। তাই হয়তো শুরু হল লড়াই। পরাজিত দলই বাস উঠিয়ে দিয়ে নতুন বাস্তুর খোঁজে ভারতে আসে। এভাবে কিংবা ধর্মান্তরের ফলে যখন দেশ একধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত হয়, তখন নয়া ধর্মমতবাদীরা বিধর্মী পূর্বপুরুষের জ্ঞাতিত্ব কিংবা মৌরসী ঐতিহ্য অস্বীকার করে না, বরং সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করে নেয়। এ কারণেই মুসলিম আরব হাতেমতাই, নৌফেল, ইমরুল কায়েস প্রভৃতির ঐতিহ্যগর্বী। ইরান 'শাহনামা'য় নিজেকে খুঁজে পায়। পারস্যের বাদশাহ আজ ইরানের 'শাহ', 'আরীয় মেহের' ও 'পহলবী'। আর ভারতের সনাতনীরা যে নয়াধর্মকে (বৌদ্ধধর্মকে) একদা গ্রাস করে, সেই ধর্মের দেব-দ্বিজ ও বেদদ্বেষী অশোক ও তাঁর বৌদ্ধধর্মচক্রকে তারা জাতীয় মহিমা ও ঐতিহ্যের প্রতীক বলে সগর্বে বরণ করে নিয়েছে। অথচ আমরা জানি অশোক ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতি সদয় ছিলেন না; তিনি বলিদান রহিত করে ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। বৌদ্ধ-রাজত্বে জীবহত্যা নিষিদ্ধ ছিল বলে ভারতবাসীরা আমিষ ভোজন প্রায় ভুলে গিয়েছিল। বাঙলার বাইরে বর্ণহিন্দুর নিরামিষপ্রীতি বৌদ্ধযুগের সেই ধকলের সাক্ষ্য বহন করছে। আর সে-যুগে বৌদ্ধে-ব্রাহ্মণ্যবাদীতে মারামারিও কিছু মাত্র কম ছিল না।

প্রতিপক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই হানাহানির উৎপত্তি। আর হানাহানি থাকলে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগবেই। (পাকিস্তান-পূর্ব যুগে হিন্দুদের বিলেতী পোশাক ও সংস্কৃতি বর্জন আর মুসলমানদের ধুতি বর্জন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। এক্ষেত্রে যে-কোনো এক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বিলুপ্তিতে বিদ্বেষ ও বিক্ষোভজাত চিত্ত-বিকৃতির উপশম হয়। সহজ কথায় বলা যায়, এ হচ্ছে প্রতিবেশী সুলভ হিংসা ও হানাহানি। প্রতীচ্য দেশীয়রা আমাদের প্রতিবেশী নয়, তাই তাদের সংস্কৃতি গ্রহণে আমাদের গ্লানিবোধ নেই। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী, তাই এখানে গ্রহণ-বরণ চলে না, বর্জনাদর্শই বজায় রাখতে হয়। কল্পনা করা যাক পাক-ভারতের সবাই মুসলমান হয়ে গেছে, তখন রামায়ণ-মহাভারত মুসলমানদের জাতীয় মহিমার প্রতীক হবে, প্রতাপ-শিবাজী হবেন জাতীয় বীর।

আমি একবার ইসলামে দীক্ষিত এক ব্যক্তির মুসলিম পৌত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলোম—মুঘলেরা হলেন বিদেশী, আর প্রতাপ-শিবাজী হলেন দেশী লোক ; এঁরা যদি আজকের আমাদের ইংরেজ তাড়ানোর মতো মুঘলকে তাড়াবার সাধনা করে থাকেন, তবে আমাদের সহানুভূতি তাঁদের প্রতি থাকা উচিত নয় কি? সে এ-কথার দুটো উত্তর দিয়েছিল। প্রথমটা দিয়েছিল তর্কের খাতিরে, আর দ্বিতীয়টা ছিল তার মনের কথা। সে বলেছিল—প্রতাপ-শিবাজীও তো এককালের বিদেশীর বংশধর। আর প্রতিবেশী বা জ্ঞাতির চেয়ে বিদেশী আত্মীয় প্রিয়তর। মুঘলেরা ধর্মসূত্রে আমাদের আত্মীয়—আমাদের ভাই। এ-কথার উপর তর্ক চলতে পারে, কিন্তু এটি হচ্ছে জীবনে অনুভূত ও পরীক্ষিত সত্য। কাজেই হৃদয়ের স্পর্শহীন মগজপ্রসূত যুক্তিপ্রয়োগ নিরর্থক। সত্যেন দত্তের 'আমরা বাঙালি' কবিতায় বাঙলার কোনো মুসলিম-ঐতিহ্যের উল্লেখ নেই দেখে, এক হিন্দুবন্ধুকে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলাম—'ঈসা খান তো হিন্দুর বংশধর, চাঁদ-প্রতাপের সঙ্গে তাঁর নামটি অন্তত উল্লেখ করা যেত।' তিনি উত্তরে বলেছিলেন—'মুসলমান হয়ে গেল যখন, তখন তো আর আপন ভাবা যায় না।' আমরা জানি এর উপর আর কথা চলে না।

অতএব দেখা গেল, এই প্রীতিহীন অনাত্মীয়ভাব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রাতিবেশিকতারই ফল। তেমনি প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে তথা বিলুপ্তিতে বিধর্মী পূর্ব-পুরুষের মহিমামুগ্ধতা এবং ঐতিহ্যগর্বও অপর একধরনের সংকীর্ণচিত্ততা ও বিকৃতি প্রসূত। বাহ্যত একে শুভ ও শোভন মনে হলেও এও চিত্ত-প্রসারের অভাবজাত। কেননা এ ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার পশ্চাতে রয়েছে আদিম গোত্র-প্রীতি। মধ্যযুগে এ মনোভাব উদার-হৃদয় ও উন্নত মননের পরিচায়ক বলে অভিনন্দিত হতে পারত। কিন্তু এ-যুগে নয়। কারণ এ মনোভাবই এ-যুগের কাল—স্বস্তি-শান্তির শত্রু ও মানবতার দুশমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

এক হিসেবে বলতে গেলে আধুনিক যুগের সঙ্গে আগের কালের কোনো পারম্পর্য বা জ্ঞাতিত্ব নেই। এ যুগ শিক্ষিতের, যুক্তির ও বিজ্ঞানের। এ-যুগের জীবনের ভিত্তি বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান—যুক্তি (Rationality) এর অস্ত্র, আর বিজ্ঞান এর বাহন। এ-যুগ গণতন্ত্রের। কাজেই আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা যৌক্তিক জীবনের (Rational life) অধিকারী—এই মৌলিক স্বীকৃতির ভিত্তিতেই গণতন্ত্র চলতে পারে। এর আনুষঙ্গিক অঙ্গীকার রইল—আমাদের জীবনের ভিত্তি জ্ঞান, সম্বল যুক্তি আর বাহন বিজ্ঞান। নানা ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত এবং মতবাদ আকীর্ণ আজকের রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর গুরুতর অপরাধ। আজকের জাতীয়তা রাষ্ট্রভিত্তিক হতেই হবে। নইলে কল্যাণ নেই। নিজেদের এ বোধের অভাবেই জার্মানিতে ইহুদীরা নির্যাতিত হয়েছিল। আমরা জানি ক্ষতিস্বীকারের শক্তিতে মনুষ্যত্বের প্রকাশ এবং বরণ করার ক্ষমতাতেই সংস্কৃতির পরিমাপ। আমাদের জীবনচেতনা অনায়াসলব্ধ নয়, সাধনা-সাধ্য। পরিচর্যা করেই জীবনবৃক্ষে ফুল ফোটাতে, ফল ফলাতে আর রূপ চড়াতে হয়। জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সহিষ্ণুতার ও উদারতার, প্রীতির ও কল্যাণ বুদ্ধির।—'To know all is to pardon all.' এই বোধ না জাগলে এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে সমাজে স্বস্তিতে বাস করা যাবে না। এ-যুগ মতবাদ পেশ করবার বা placing-এর যুগ—চাপানোর বা প্রচারের (preaching) কাল নয়। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই তা বোঝা উচিত। শুধু কী তাই! এ যুগ মিলনের আর মিলানোর এবং দেওয়ার আর নেওয়ার যুগ। তাই স্বরাষ্ট্রে ও স্বাজাত্যে সন্তুষ্ট থাকা যায় না— আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছাও জাগিয়ে তুলতে হয়। কেননা রাষ্ট্রিক স্বাজাত্যবোধই হচ্ছে আজকের মানুষের ব্যক্তিজীবনে বল-ভরসার আকর। আত্মকল্যাণই এর লক্ষ্য। কিন্তু কল্যাণ আপেক্ষিক শব্দ। অপরের অকল্যাণ করে নিজের হিত সাধন হয় না। ব্যক্তিস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন করতে হলে পরিবার-পরিজনের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তেমনি পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই সামাজিক কল্যাণ সাধন করা প্রয়োজন হয়। সামাজিক কল্যাণ সাধনের খাতিরেই স্বাদেশিক মঙ্গলের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখা অপরিহার্য হয়ে উঠে। আর রাষ্ট্রিক কল্যাণের গরজেই আন্তঃরাষ্ট্রিক শুভেচ্ছার কামনা জেগে উঠে।

লোভের থেকেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উৎপত্তি। তাই সবার আগে উচ্চারিত হয়েছে এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী—'মা গৃধঃ।' বেঁচে থাকো, বাঁচতে দাও; ভালো হও, ভালো চাও—এ যুগের চরম দাবী এ-ই। কেননা এ-পথেই পরম স্বস্তি ও শান্তি। আমরা আশাবাদী। মানুষের স্বাভাবিক ও পরিশীলিত মহত্ত্বে আমরা আস্থাবান। সেদিন হয়তো দূরে নয়, যখন বিশ্বমানবিকতা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ 'এক বিশ্বে এক রাষ্ট্রের' অর্থাৎ বিশ্ব-রাষ্ট্রের ধ্বনি তুলবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

এতকাল ধরে মানুষ ঐতিহ্যবোধের মহিমা কীর্তন করে এসেছে। ঐতিহ্য-চেতনা মানুষকে এগিয়ে চলার বা আত্মোন্নয়নের প্রেরণা দেয়, এ তো সবারই জানা কথা। কেননা এ অনুভূত সত্য—সেদিক দিয়ে কম-বেশি স্বতঃসিদ্ধ। পূর্বপুরুষের গৌরব থাকলে মানুষ তা বজায় রাখার এবং গ্লানি থাকলে তা আত্মপ্রতিষ্ঠার তথা কৃতির ও কীর্তির গৌরব দিয়ে ঢেকে রাখার কিংবা মুছে ফেলার প্রেরণা বোধ করে—এ-ই সাধারণের বিশ্বাস। কাজেই জীবনে প্রেরণার উৎসরূপে মানুষ পারিবারিক ও জাতীয় ঐতিহ্য স্মরণে রাখবার ও আচরণে প্রকাশ করবার প্রয়াস পায়। তাই ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবোধ মানুষের কাছে খুব মূল্যবান। একে ব্যক্তিক ও জাতিক জীবন-সাধনায় প্রেরণার উৎস, কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবলম্বন হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি এর নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নতুন দৃষ্টির তৌলে একে যাচাই করে এর ওজন, উপযোগ ও মূল্য নির্ধারণ হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। কেননা আজকাল এটিই মানুষের মনোবেদনা ও মানসিক লাঞ্ছনার অন্যতম প্রধান কারণ। এককালের অমৃত একালে বিষে পরিণতি লাভ করছে, সেকালের বর একালে শাপে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেন এবং কেমন করে তা-ই বলছি।

আগেরকার দিনে সাধারণত ধর্মীয় গোষ্ঠী ও গোত্র-চেতনা ছিল, আর ছিল রাজা ও রাজ্য। কাজেই সে-যুগে অধিকাংশ দেশে বা রাজ্যে নির্বিশেষ ও অবাধ নাগরিকতা (সিটিজেনশিপ) ছিল না। রাজা যে-মতে বিশ্বাসী ছিলেন, সে-মতবাদীরাই ছিল দেশের বা রাজ্যের শাসকজাতি। অন্যেরা ছিল শাসিত। কাজেই বিভিন্ন ধর্ম বা মতবাদীর মিলনে এক জাতি গড়ে উঠতে পারেনি। এরূপ ক্ষেত্রে স্ব স্ব ঐতিহ্য-প্রীতি বিভিন্ন জাতিগুলোকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার প্রেরণা দিত। এ চেতনা শাসক-শাসিতে কিংবা বিভিন্ন ধর্মবাদী প্রতিবেশীতে দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কারণ হত বটে; কিন্তু স্বাজাত্যাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তাতে আরো প্রবল ও প্রখর হয়ে উঠত। ফলে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ আকাঙ্ক্ষাও হত তীব্রতর। ইত্যাকার উত্তেজনা ও উদ্দীপনা জাতিগুলোকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করত। একসময়ে দাসত্ব-মুক্তও করত। অবশ্য বৈষয়িক ক্ষতি ও পীড়ন থেকে বাঁচতে পারত না। যাহোক সে-যুগ আর নেই, কাজেই সে-যুগের সমস্যাও নেই। কিন্তু তার জের রয়ে গেছে। সে-কথাই এখানে আলোচ্য।

আগেকার যুগে জাতীয়তার ভিত্তি ছিল ধর্ম, বর্তমান যুগে হয়েছে রাষ্ট্র এবং এটি একান্তভাবে রাষ্ট্রান্তর্গত ভূ-নির্ভর। কাজেই আজকের জাতি গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, মতবাদী ও নানা গোত্রীয় লোকের সমবায়ে। ফলে সাধারণ না হলে কোনো মত, আদর্শ, ঐতিহ্য কিংবা নীতি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব ধর্ম, ঐতিহ্য ও গোত্রপ্রীতি রয়েছে, আরো রয়েছে পরশ্রীকাতরতা। সেজন্যে একের ধার্মিক, ঐতিহ্যিক ও গৌত্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি অপরের স্বাভাবিক বিরূপতাও আছে। একেরটা অপরে পসন্দ করে না, তাই সহ্যও করতে চায় না।

তাই কোনো প্রবল পক্ষ যদি নিজের ধার্মিক কিংবা সাংস্কৃতিক আদর্শ অন্যদের উপর নিছক ভোটের জোরে চাপায়, তাহলে অন্যদের মন ভাঙে। সেই মনঃপীড়া কায়িক নির্যাতনের চাইতে গুরুতর এবং তাতে যে-ক্ষতি হয় তার সঙ্গে কোনো ব্যবহারিক ক্ষতির তুলনা হয় না। কেননা মানুষ ধনে-প্রাণে মরতে রাজি হলেও হতে পারে, কিন্তু মনে মরতে কখনো প্রস্তুত থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। জার্মানির ইহুদীদের অন্য কোনো স্বদেশ ছিল না, তারা পুরুষানুক্রমে জার্মান। জনে না হলেও ধনে-মানে তারাই ছিল প্রবল ও প্রধান। কিন্তু সংখ্যাগুরু খ্রীস্টান জার্মানদের কাছে তাদের ধার্মিক ও ঐতিহ্যিক প্রতিপত্তি ছিল না। তাই তারা ছিল মনে কাঙাল। স্বদেশ ও রাষ্ট্রিক স্বজাতির প্রতি তাদের জাগে বিদেশী ও বিজাতিসুলভ বিরূপতা। ফলে জার্মানির স্বার্থ আর তাদের স্বার্থ এক রইল না। প্রথম মহাযুদ্ধে তাই তারা চরম আত্মরতি ও দেশদ্রোহিতা দেখিয়েছে। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মূলত দোষ এদের নয়; দোষ আবেষ্টনীর ও সংখ্যাগুরু খ্রীস্টান জার্মানদের। স্বতন্ত্র ধর্ম, সংস্কৃতি ও গৌত্রিক ঐতিহ্য-প্রীতিই ইহুদীদের মনে দেশের প্রতি বিরাগ জাগিয়েছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রে প্রবলপক্ষের ঐতিহ্যানুগ পতাকা ও লাঞ্ছন গ্রহণ আর বিশুদ্ধ হিন্দিবরণ অহিন্দু ভারতবাসীর মনে নিশ্চয়ই বিরূপতা সৃষ্টি করেছে। যদি রাষ্ট্রের পতাকা চরকা-চিহ্নিত হত কিম্বা লাঞ্ছনটি হিন্দুর ধর্ম ও ঐতিহ্য-নিরপেক্ষ হত অথবা গান্ধীজীর হিন্দুস্তানী রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হত, তাহলে অহিন্দুও আন্তরিকভাবে হিন্দুর স্বজাতি ও স্বদেশী হয়ে উঠতে পারত। যাদের সহজে আপন করা যেত, এভাবে সংখ্যাগুরুর আত্মরতির ছিদ্রপথে তারা হয়ে রইল পর। কোনোকিছু বিশেষ এক পক্ষের ঐতিহ্যিক কিংবা সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস হলেই বুঝতে হবে তা অপর পক্ষগুলোর বেদনার কারণ হয়েছে। এ তো নেহাত সহজবোধের কথা। কেননা একে যেখানে নিজের গোত্রীয় গৌরবময় ঐতিহ্যের ও আদর্শের সন্ধান পেয়ে সগর্বে জেগে উঠে, অপরে সেখানে নিজেদের খুঁজে না পেয়ে, নিজেদের আগ্রহ ও আবেগের অবলম্বন না পেয়ে হতাশ হয়। রাষ্ট্রিক, শাসনতান্ত্রিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো একপক্ষের গোত্রীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থাকলে সুইটজারল্যান্ড কোনোক্রমেই এমন উদার ও আদর্শ রাষ্ট্র হতে পারত না। সে অবস্থায় হয়তো গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশটি টিকতই না। অথচ সেদেশে যারা বাস করে তাদের কারুর কারুর দুই থেকে আড়াই হাজার বছরের পুরোনো বিশ্বনন্দিত ঐতিহ্য রয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল কথা অধিকারের সমতাবিধান—সে সামঞ্জস্য অবশ্যই মানসিক হওয়া চাই। সমাজ ও শাসন সংক্রান্ত আদর্শের বিভিন্নতার কোনো বিশেষ মানস প্রতিক্রিয়া নেই—কারণ, তা একান্তভাবে দলভিত্তিক। একই পরিবারের বিভিন্ন পরিজন বিভিন্ন দলভুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের Sentiment ভিন্ন প্রকৃতির এবং মানুষের মানস-সত্তায় এর প্রভাব অপরিমেয়। কাজেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় রাজনীতি ও আদর্শ চলতে পারে, কিন্তু কোনো একপক্ষের ধর্মীয় ও গোত্রীয় আদর্শ কিংবা ঐতিহ্যের আধিপত্য চলতে পারে না। এ-যুগে রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও সর্বনাশ যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে তবে তা এই ধর্ম, গোত্র ও ঐতিহ্যপ্রীতিপ্রসূত গোঁড়ামির মধ্যেই। এতে অগ্রগতি এবং উন্নতিও ব্যাহত হয়। এ-যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যা-কিছু হবে, তা সর্বজনীন আগ্রহ ও আবেগের প্রতীকই হবে। নইলে মানস-দ্বন্দ্বের আর তার থেকে বিপদকালে বিপদ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকবেই। কাজেই এ-যুগের সাধনা পুরাতনের নিছক জের টানাতে নয়, নতুনেরও প্রতিষ্ঠায়—নিছক ঐতিহ্যানুসরণে নয়, ঐতিহ্য সৃজনে। এ-যুগের শান্তি ও নিরাপত্তা কোনো বিশেষ গোত্রের গৌরববোধে নেই, রয়েছে রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি গড়ে তোলার মধ্যেই। আর এক হিসেবে সর্বজনীন মিলনক্ষেত্রে স্ব স্ব গোত্র ও ঐতিহ্যপ্রীতির উগ্র প্রকাশ সংকীর্ণতা, আত্মরতি ও আদিম গোত্রীয় মনোভাবেরই পরিচায়ক। এটি পশ্চাদ্মুখিতারও প্রমাণ। পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতাই এ-যুগের সাধ্য। ক্ষতি স্বীকারের শক্তিতেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ, আর বরণ করবার সামর্থ্যেই সংস্কৃতির পরিমাপ। আছে তো রইলই, যা নেই তা অর্জনের প্রয়াসই তো জীবন-সাধনা। প্রাণের স্ফূর্তি, মনের মুক্তি এবং মানের বৃদ্ধি এভাবেই সম্ভব, আর এ-যুগে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনও। এ-যুগ স্বাতন্ত্র্যবোধের নয়, সাকুল্য বোধের—বিযুক্তির নয়, সংযুক্তির। আভিজাত্য-গর্বের নয়, গণসংযোগের। ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির। পুরোনো দিয়ে ঘট ভরে রাখলে নতুনকে কিছুতেই ঘরে তোলা যাবে না। তাই জীর্ণ পুরোনোকে বর্জন করে সার্থক নতুনকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি চাই। ঐকিক মৌলিকের মাহাত্ম্য যা-ই থাক না কেন, এ-যুগে মানব-মহিমা যৌগিক সামগ্রিকতায় অভিব্যক্ত। ব্যষ্টির বাসনা নয়, সমষ্টির প্রয়োজন মিটানোই যুগব্রত। জনে জনে জনতা হয় বটে কিন্তু তা অকেজো; গণভোটে হয় গণনেতা, তার শক্তির সীমা নেই।

ব্যক্তিক স্বার্থ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রীতিপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক যৌথজীবন অকৃত্রিম এবং বাস্তব; তেমনি ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৃথক হলেও ভেদবুদ্ধিহীন একক রাষ্ট্রিক জাতীয় জীবন গড়ে তোলা সম্ভব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানববিদ্যা

শিক্ষার প্রতি মানুষের একটা আন্তরিক সহানুভূতি থাকলেও শিক্ষার প্রভাবের গোড়ার কথাটা মানুষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে মনে হয় না। তাই আমাদের দেশে মানববিদ্যা (Humanities) বিস্তারের ফলে যথাযোগ্য বিনিয়োগ ব্যবস্থার অভাবে বেকার সমস্যার মতো নানারকম সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেন অনেকেই। কিন্তু ঐ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধারণভাবে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক বন্ধন দৃঢ় হয়, তা সহজে চোখে পড়ে না। তাঁরা তাই কেবল কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান।

ধর্মবিধি দিয়েই লোক-শিক্ষার শুরু। এতেই সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন আর সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এককালে। তাই মনুষ্য সমাজে ধর্মের উদ্ভব তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাবে। ধর্মবিধির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারবিধি প্রয়োগ করে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা। মূলত এক প্রত্যক্ষ সমস্যার সমাধানকল্পেই ধর্ম নামক বিধিগুলোর উদ্ভব হলেও এতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত এমন একটি মৌলিক রহস্যসূত্র যুক্ত হয়েছে, যাতে বিধিগুলো শুধু প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কিত হয়েও জীবনোত্তর (অর্থাৎ এ-জীবনপূর্ব ও এ-জীবনোত্তর) কাল্পনিক জীবনের জের টেনে তাতে কল্পনাতীত সুখের মধুর চিত্র বা দুঃখের বিভীষিকার সংস্কার জন্মিয়ে দেয়া হয়েছে। এ না হলে উপায় ছিল না। কারণ কোনো নিয়ন্ত্রণশক্তি না থাকলে কোনো কানুনই কার্যকর করা সম্ভব নয়। সবলের সর্বগ্রাসী সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণ-সামর্থ্য দুনিয়াতে কারো নেই বলেই দুনিয়ার বাইরের কল্পজগতের একটা শক্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। অবস্থাও ছিল অনুকূল। এ বিশাল বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম ও বৈচিত্র্যগুলো ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজনে অসহায় কৌতূহলী মানুষের মনে এমনি একটি অদৃশ্য শক্তির (যিনি স্রষ্টা বা নিয়ন্তা) কল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে বিরাট রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির উপর শাসন ও বিচারের ভার কল্পনায় অর্পণ করে তাঁকে ভয়ঙ্কর করে তোলা হল। এভাবে প্রয়োজন- মতো নানা বিশেষণে ক্রমাগত তাঁকে বিশেষিত করা হয়েছে। বলেছি এ ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ নীতিকথায় মানুষের না ভরে পেট, না ভরে মন। আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারের জন্যে যখন যা প্রয়োজন তা বেপরোয়াভাবে আয়ত্ত করা জৈবধর্ম। কাজেই সমাজবদ্ধ মানুষকে সংযত রাখার প্রয়োজনে কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি অনুভব করলেন—শাসনশক্তি বা নিয়ন্ত্রণশক্তি চাই।

সে-শক্তির শাস্তিদানের ক্ষমতা চাই। জন্মিয়ে দেওয়া হল বিভীষিকাময় এক রুদ্র-শক্তির সংস্কার, যার ভয়ে দুর্বলচিত্ত মানুষ মরবার আগেই বারবার মৃত্যুর বিভীষিকা অনুভব করতে লাগল। মৃত্যু ভীষণ কিছু নয়, কিন্তু তার পরে আছে ভীষণ নরকাগ্নির যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ হচ্ছে ধর্ম নামের 'কোড' মেনে চলা। এতেই পুণ্য সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা। ছেলেরা ফেলের আশঙ্কা আছে বলেই পাস করবার জন্যে পড়ে, ফার্স্ট যে হয় তা আকস্মিক। ফেলের আশঙ্কা না থাকলে ফার্স্ট হওয়ার কথা দূরে থাক, পাস করার জন্যেই কেউ পড়ত না। দোজখের তিরস্কারের আশঙ্কা না থাকলে বেহেস্তের পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষায় আমরা একটা কানামাছিও তাড়াবার চেষ্টা করতাম না।

কিন্তু কোনো সংস্কার বা সম্পত্তি মৌরসী হয়ে গেলে তার সত্যিকার মূল্য সম্বন্ধে সবসময়ে সচেতন থাকা সম্ভবপর হয় না। এ কারণে মানুষের চিত্তের সবল মুহূর্তে পারলৌকিক জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ভোগের দুশ্চিন্তা বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রাণধর্মী শক্তিমান লোকের অসংযত সম্ভোগের বেপরওয়া হামলা অন্যান্যদের পীড়নের কারণ হয়ে উঠল। আর এদের শায়েস্তা ও সংযত রাখবার জন্যে বারবার নতুন করে সেই আদিম অদৃশ্য রুদ্রশক্তির দোহাই ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ও পরিবেশে সমস্যানুযায়ী নতুন নতুন বিধিব্যবস্থা জারি হয়ে চলল, আজও বিরাম হয়নি তার। কেননা শাস্তির শঙ্কাহীন সবল মনুষ্যচিত্তের অসংযত বৃত্তি-বিলাসের সীমা নেই, শেষ নেই। স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্মের বিধিনিষেধের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য নির্দেশ করা। যেমন মিথ্যা বলা পাপ, কারণ তাতে যে-কোনো একজন বা একাধিক মানুষের ক্ষতি হয় ; চুরি করা পাপ, কারণ তাতে যে-কোনো একজন বা একাধিক লোকের দুর্দশার কারণ ঘটে। এরূপে হত্যা করা, দান না করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ নেওয়া প্রভৃতি অপরের ক্ষতিকারক সর্বপ্রকার কাজ হচ্ছে অন্যায় বা পাপ। এজন্যেই পরলোকে দোজখে বসতি অনিবার্য। দেখা গেল এতে খোদার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। এক কথায় মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণের মধ্যেই পাপ। মানুষ ফরিয়াদি হয়ে আল্লাহর দরবারে নালিশ জানায় বলেই অন্যায়কারী মানুষ অপরাধের শাস্তি ভোগ করে। সুতরাং পাপপুণ্য হচ্ছে মানুষের উপকার বা অপকার করার পুরস্কার ও তিরস্কার মাত্র—একটায় নরকের শাস্তি, অপরটায় স্বর্গের শান্তি। কিন্তু এ-যুগে ধর্ম আর মানুষকে ধরে রাখতে পারছে না। এ-যুগে আর কিছু প্রয়োজন।

তবু এদিক দিয়ে ইসলাম বিশেষভাবে বাস্তব, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। সূরা ফাতেহা ছাড়া-যে নামাজ হয় না, তার কারণ ইসলামে আল্লাহর কাছে সেরাতুল মোস্তাকিম (সোজা পথ) প্রার্থনা করাই মানুষের একমাত্র ব্রত বলে নির্দেশিত হয়েছে। এ সেরাতুল মুস্তাকিম বা ঋজুপথ হচ্ছে অন্যায় বা পীড়ন-প্রেরণা বিবর্জিত পথ। এ পথে চললেই শুধু মানুষ নিজে বেঁচে থাকতে পারে ও অন্যকে বাঁচতে দিতে সমর্থ হয়। বস্তুত Live and let live-ই হচ্ছে ইসলামের মূল আদর্শ। তাই ইসলাম স্পষ্ট করেই বলে— তুমি যা নিজের জন্য পছন্দ কর না—তা তোমার ভাইয়ের জন্য কামনা করো না—অর্থাৎ যে-অন্যায় যে-পীড়ন তুমি নিজে ভোগ করতে চাও না, সে-পীড়ন সে-অন্যায় অন্যের প্রতি করো না। অন্য কথায় বলতে গেলে দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ এমনিভাবে চলবে যাতে তার বিরুদ্ধে অপর কোনো মানুষের কোনো নালিশ না থাকে। তাহলেই সে নিষ্পাপ। ইসলাম এও উপলব্ধি করেছিল যে ভালো কথায় বা আদেশে কাজ হবার নয়, যদি না তা হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি মানুষের জন্মে। তাই ইসলামে জ্ঞানার্জন বা বিদ্যাভ্যাস ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

২

সমাজবিরোধী বা অকল্যাণ-প্রসূ যে-কোনো কর্ম বা আচরণ ধর্মের চক্ষে পাপ (sin) সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় (vice), আর আইনের চক্ষে অপরাধ (crime)। আল্লাহ চোখের সামনে নেই বলে মানুষ পাপ করতে কৃচিৎ দ্বিধা করে। সে ভয় করে লোকনিন্দাকে আর ত্রস্ত হয় আইনের শাস্তির শঙ্কায়। এজন্যে মানুষ মান বাঁচিয়ে ও গা বাঁচিয়ে গোপনে অন্যায়-অপকর্ম করে। শিক্ষাজাত আত্মসম্মানবোধ কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠাপ্রসূত মর্যাদা-চেতনা মানুষকে অনেক অপকর্মের প্রলোভন এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে। তাছাড়া জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধীশক্তি, বিবেচনাসামর্থ্য ও তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ জাগে। ইসলাম এও বুঝে যে প্রবৃত্তিপরবশ মানুষকে লোকান্তরের শাস্তির ভয়ে শায়েস্তা রাখা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য এমনি তাগিদ। আমরা দেখেছি নরকাগ্নির ভয় মানুষের চরিত্র শোধনে যত না সহায়তা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি এ ব্যাপারে কার্যকর হয় আত্মমর্যাদাবোধ। কারণ আত্মমর্যাদাবোধ থেকে কর্তব্যবোধ জাগা স্বাভাবিক। আল্লাহ অন্তর্যামী ; মানুষের কোনো ভাব, ইচ্ছা বা কার্য আল্লাহর অগোচরে থাকে না—এ জেনেও প্রবৃত্তি বশে মানুষ অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু মানুষ মানুষকে ভয় ও সমীহ করে চলে নিন্দার আশঙ্কায়। এ নিন্দাভীরুতা শিক্ষাজাত আত্মমর্যাদাবোধের ফল। মানুষ মূলত সৌন্দর্যপ্রিয়, সচেতনভাবে সৌন্দর্যের সাধনা না করলেও অবচেতন মনে তা সর্বদাই করে থাকে। ফলে প্রশংসা পাবার বা ভালো সাজবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ কথায়, কাজে ও চালে-চরিত্রে সুন্দর হওয়ার একটা সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে মানুষের। পাছে লোকে নিন্দা করে এ ভয়ে মানুষ দুষ্কর্ম গোপনেই করে।

ফলে আমরা চুরি করি না নিন্দার ভয়ে, মিথ্যা বলি না অপরের শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কায়। মা-বাপের সেবাযত্ন করি অপরের নিন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। পুকুরে কচুরী জন্মাতে দিই না রুচিহীন বলে অন্যে নিন্দা করবে বলে। ঘর-দোর, পোশাক-পরিচ্ছদ, ছেলে-মেয়ে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখি সুরুচির পরিচয় দেবার জন্যে, (স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশে নয়)। এরূপ নানাপ্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলি শুধু শিক্ষাসূত্রে যে-আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে তা রক্ষা করবার প্রয়োজনে। সুতরাং দেখা গেল দান-ধর্ম, সুরুচিসম্মত আচার-ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্যবোধ, সততা-ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি যতকিছু আমরা মেনে চলবার চেষ্টা করি সবকিছুই আমাদের শিক্ষাজাত মর্যাদাবোধ থেকেই এসেছে। এতে ধর্মবিধির মূল উদ্দেশ্য সহজেই সফল হয়, যা পারলৌকিক শাস্তির ভয়েও সম্ভব হয়নি। য়ুরোপে আজকাল চুরি রাহাজানি ঘুষ অত্যাচার প্রভৃতি অনেক প্রকার অপরাধই আর বিশেষ দেখা যায় না—তার মূলে রয়েছে শিক্ষাজাত মর্যাদাবোধ। রাশিয়ায় বা চীনে দুর্গত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ জেগেছে, তাও শিক্ষাজাত বিবেচনা ও মর্যাদাবোধ জাত কর্তব্যবোধের ফলে উদ্ভূত। কেননা যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা সবাই সর্বহারা নন।

সুতরাং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনবোধের জন্যে মানববিদ্যা শিক্ষাদান ও গ্রহণ অপরিহার্য। এছাড়া মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বা সাধারণভাবে আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় পয়সা বেশি, সে কারণে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অধিক। সুখ ও আরামের লোভে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ও মনীষাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা ও তাদের অভিভাবকরা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিদ্যা কামনা করেন। মানববিদ্যা তাঁদের অবহেলা পাচ্ছে। ফলে দেশে মননশীল সমাজবিদ ও সংস্কৃতিবান মনীষীর অভাব ঘটছে। তাঁদের মনীষা থেকে বঞ্চিত হলে সমাজের ও সংস্কৃতির বিকাশ মন্থর বা রুদ্ধ হওয়ারই কথা।

বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটায়। কিন্তু যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর সমাজবদ্ধ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা জীবনবোধ প্রতিষ্ঠিত, তার সম্যক পরিচর্যা ও উন্নয়ন না হলে মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে! মনের ঐশ্বর্য না থাকলে প্রাণের পরিচর্যার কী সার্থকতা! মানুষের জীবনের সব সমস্যাই মানসিক। আজকের দুনিয়ায় দরদী মনীষীর প্রয়োজন তাই সবচেয়ে বেশি। কেননা মানববিদ্যার বিকাশ না হলে মানুষের মানস-জগৎ প্রসার লাভ করে না। মানুষের সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশের মূলে রয়েছে এই মানববিদ্যা। ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিই মানুষের মনের হীনতা, সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা ও অসূয়া-অসহিষ্ণুতা ঘুচিয়ে বৃহৎ ও মহৎবোধের জীবনে উত্তরণ ঘটিয়েছে। প্রজ্ঞা, প্রেম ও কল্যাণবুদ্ধির উৎস তো এই মানববিদ্যাই। যন্ত্রীর মন যদি কল্যাণকামী না হয়, তবে যন্ত্র কখনো কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। আজকের পৃথিবীতে মনের পরিচর্যার প্রয়োজন তাই আরো বেশি। কেননা যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা মনুষ্যজীবনের বিরুদ্ধে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়া জুড়ে মানবতার এতবড় বিপদ আগে কখনো দেখা দেয়নি। তাই আজ হাজার হাজার ইতিহাসতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও মানবতাবাদীর প্রয়োজন।

কয়েক বছর আগে আমাদের শিক্ষালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রদের 'সভ্যতার ইতিহাস' এবং কলাবিভাগের ছাত্রদের 'বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত' পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এতে বিজ্ঞানের ছাত্ররা জীবন, দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারত এবং এদের মধ্যে যারা মেধা ও মনীষার অধিকারী তাদের চিন্তার দানে ও নেতৃত্বে মানবিক সমস্যার সমাধান এবং সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব ও সহজ হত। কিন্তু এ ব্যবস্থা আবার রহিত হয়ে গেল। ফলে দেশের উৎকৃষ্ট মানস-শক্তির অপপ্রয়োগ ও অপচয় রোধ করার আর উপায় রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ, জাত ও ধর্ম

মানুষের জীবনের প্রয়োজনেই ধর্মমতের সৃষ্টি। ধর্মের যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদানের জন্যে জীবন নয়। কাজেই জীবনই মুখ্য। আর সব গৌণ। জীবন গড়ে ওঠে দেশে ও কালে। মানুষের জীবন স্বাতন্ত্র্যে উপভোগ সম্ভব নয়, তাই পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সংস্থা ও দেশকাল ভিত্তিক জাতীয়তা তার প্রয়োজন। মানুষের পক্ষে এ এমনি স্বাভাবিক যে এ নিয়ে বিচার-বিতর্কের অবকাশই নেই।

মুসলমানেরা যে-ধর্ম মানে তা আরবোদ্ভূত। সেখানকার লোক ইসলাম মানে, কিন্তু দেশের অমুসলিম ও মুসলিম কোনো ঐতিহ্যকেই অবহেলা করে না। ইরানেও ধর্মমত দৈশিক ঐতিহ্যবোধের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। তুরস্ক-ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রেও দেখি লোকের ধর্মমতে ও ঐতিহ্যবোধে কোনো বিরোধ নেই। আমাদের দেশেই কেবল শাসন-শোষণের প্রয়োজনে কৃত্রিমতত্ত্বের অবতারণা করে দেশ, জাত ও ধর্মের দ্বান্দ্বিক ধারণা দানের অপচেষ্টা হচ্ছে।

আমরা একাধারে বাঙালি ও মুসলমান। আমাদের ধর্মীয় জীবন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে ব্যবহারিক জীবন। আমরা নামাজ পড়ব, মসজিদ গড়ব, আল্লাহকে ডাকব, যথাবিধি ধর্মীয় আচরণে নিষ্ঠ থাকব। আবার আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা বিদেশী পণ্য নেব, বিজাতির জ্ঞান নেব, যা-কিছু ভালো লাগে তা-ই বরণ করব, পরের বলে বর্জন করব না। জীবনকে উপভোগের ও কল্যাণের অনুগত করব। সুন্দরের ও কল্যাণের প্রসাদকে বিদেশী ও বিজাতির বলে এড়িয়ে চলব না—বঞ্চিত করব না নিজেদের।

মানুষের জীবন রূপ পায় মুখ্যত দেশ ও কালের প্রভাবে। ধর্মের প্রভাব খানিকটা কৃত্রিম। রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ তো কৃত্রিম বটেই। কেননা ওটি সচেতন অনুশীলন ও অনুধ্যানের অপেক্ষা রাখে। এজন্যে জাতীয়তার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। জাতীয়তা অভিন্ন স্বরূপে গড়েও ওঠেনি কোথাও। কারো জাতীয়তা রাষ্ট্রসীমাভিত্তিক, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ; কারো জাতীয়তা ধর্মভিত্তিক, যেমন ইসরাইলে ; কারো জাতীয়তা গোত্রনির্ভর, যেমন আফগানিস্তানে ; কারো জাতীয়তা রাজনৈতিক আদর্শকেন্দ্রী, যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে। আজকের দুনিয়ায় সাধারণভাবে রাষ্ট্রিক-সীমাভিত্তিক জাতি-চেতনাই প্রবল। এ ধরনের জাতীয়তাবোধে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বার্থবুদ্ধিই বন্ধনসূত্র, ধর্মমতের অভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ও অভিন্ন-ঐতিহ্য-চেতনা তাতে অনুপস্থিত।

এজন্যে রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও জাতি-পরিচয় নেহাত কৃত্রিম। রাষ্ট্রসীমার সংকোচন ও প্রসারণের সাথে কিংবা রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে এমনি জাতীয়তার ও জাতির জন্ম-মৃত্যু ঘটে। রোমক জাতির অস্তিত্ব এমনি করেই লোপ পায়।

অতএব, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে যে-জাতি-চেতনা জাগে, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অভিন্ন স্বার্থবোধই তার জনক। এইস্বার্থ সূত্রে আবদ্ধ জাতির জীবন টেকসই নয়। স্বার্থগত বিরোধে সে সূত্র ছিড়ে যায়, জাতীয়তাও যায় উবে, যেমন মিশর-সিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের বাঞ্ছায় এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমানেরা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ইসলাম ও মুসলিম-সংস্কৃতি-চেতনা এর গৌণফল, মুখ্য লক্ষ্য নয়। অতএব, পাকিস্তান মুসলমানের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থচেতনা প্রসূত, ইসলাম ও মুসলিম-সংস্কৃতির প্রতি প্রীতিজাত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের সুযোগ মেলে বলেই স্বাধীনতা মানুষের কাম্য। যে নামের স্বাধীনতা প্রবলপক্ষের কাছে আত্মবিক্রয়ে দুর্বলপক্ষকে বাধ্য করে, সে-স্বাধীনতা তো বর নয়—অভিশাপ।

আমরা জাতে বাঙালি। আত্মবিকাশের সুযোগ পাব বলেই আমরা পাকিস্তান গড়েছি—আত্মবিলোপের জন্যে নয়। আমরা বাঙালি থেকেই, বাঙালিত্ব রেখেই পাকিস্তানী। কেননা, বাঙালি হিসেবে বাঙলার আবহাওয়ায় বাঙালি জীবনের প্রসার লক্ষ্যেই পাকিস্তান চেয়েছি—ইসলামের সেবার মহৎ উদ্দেশ্যেও নয়, ইসলামী সংস্কৃতির হাওয়াই সৌধ নির্মাণের স্বপ্নেও নয়। আমাদের সত্তা নিয়ে, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বিকাশের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রেখেই আমরা পাকিস্তানের নাগরিক। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হবে সমান ও অভিন্ন। আমাদের নাগরিকত্ব হবে সমঅধিকারের ভিত্তিতে সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদার। যেখানে মিল নেই, সেখানে মিলন অসম্ভব। অসমানে একত্রিত হতে পারে, কিন্তু মিলতে পারে না। এখানে অভিভাবকত্ব অচল। আমরা স্বধর্মী নিয়েই সমাজ করি, আত্মীয় নিয়ে করি ঘর, তাই বলে স্বার্থ ছাড়িনে। স্বার্থ বজায় রেখেও সৌজন্য দেখানো সম্ভব কিংবা সদ্ভাব রেখেও স্বার্থসচেতন থাকা অসম্ভব নয়। স্বার্থে ও সৌজন্যে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলাই সুনাগরিকতা ও সংস্কৃতিপরায়ণতা।

আমাদের এবাদতে থাকবে ইসলামী বিধি, আমাদের মসজিদে থাকবে ইসলামী রীতি, আমাদের বোধে থাকবে ইসলামী নীতি, আমাদের রাজনীতিতে থাকবে পাকিস্তানী আদর্শ, আমাদের নাগরিক দায়িত্ব, জ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি চালিত হবে রাষ্ট্রের স্বার্থে—এ সব হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রিক ও বাহ্যিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধিপ্রসূত চর্যা। আর আমাদের অনুভবের যে জীবন—যেখানে আমরা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও খেয়ালি তার রসদ যোগাবে আমার দৈশিক পরিবেশ, আমার দৈশিক ও জাতিক ঐতিহ্য এবং গ্রহণে-সৃজনে পাওয়া নতুন উপকরণ—ভাব, চিন্তা ও বস্তু।

কেউ তার স্বদেশের ঐতিহ্যকে অবহেলা করে না। কেননা ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই আত্মবিকাশ সহজে সম্ভব। তাই আমরাও স্বদেশের ঐতিহ্যকে পরিহার করব না। আমরা বাঙালি-চেতনা নিয়ে বিদেশী গুপ্ত-শাসনে গ্লানিবোধ করব, পাল-গৌরবে গর্বিত হব, স্বাধীন সুলতানী আমলের ঐশ্বর্য-গর্বে উল্লসিত হব, মুঘল শাসনে হতবাঞ্ছার বেদনাবোধ করব, ব্রিটিশ শাসনে অপমানের জ্বালা অনুভব করব।

আমরা বৌদ্ধযুগের মূর্তিশিল্পে পিতৃপুরুষের নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করব, সেন আমলের সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের নিন্দা করব, মসলিন শিল্পের গৌরব করব, মসজিদ শিল্পের প্রসারে উল্লাসবোধ করব, বাঙলা ঘরের আকর্ষণে আকুল হব। ধনপতি-চাঁদ সওদাগরে বাঙালির উদ্যম দেখে খুশি হব, সত্যপীর-বড়গাজীতে বাঙালির কল্যাণবুদ্ধির বিকাশ দেখে আশ্বস্ত হব। বাউল-দর্শনের গৌরব করব। আমরা রাষ্ট্রের সেবায় রত থাকব। পাকিস্তানের আপদে বিপদে জান-মাল কোরবান করব। আমরা কোরান-হাদিস জানব, ইসলামের ইতিহাস স্মরণ করব। সে-সঙ্গে চর্যাগীতির রহস্য উদঘাটন করব, বেহুলা-লখিন্দরের গল্প পড়ব, বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদন করব, বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসক বিদ্বেষী বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-গ্রহণ করব, রবীন্দ্রসাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন করব। কেননা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার চেয়ে দেশ, গোত্র ও ভাষাগত ঐক্যের বন্ধন যে অনেক দৃঢ় তার সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসের সর্বত্র। সে-সত্য অবহেলা করা জীবনকে তথা কল্যাণকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এ তত্ত্ব জানে বলেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা ময়েনজোদাড়ো-হরপ্পা ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী 'গান্ধার'-এ নিজেদের খুঁজে পায়। আমরাও আমাদের পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার ছাড়ব না। ভুলব না আমাদের রিকথ।

সাংস্কৃতিক শুচিতার কথামাত্রই অবান্তর। কেননা সংস্কৃতি বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ নয়। সংস্কৃতি বহতা নদীর স্রোত। প্রতিদিনের সূর্যের সঙ্গে তাল ঠুকে চলার নামই সংস্কৃতিপরায়ণতা। তাই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না, গ্রহণে-সৃজনেই তার স্থিতি ও বহমানতা। বিকাশমানতাই সংস্কৃতি। সুন্দর ও কল্যাণকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করা, উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা, জীবনে গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা ও ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতি। যে সৃজন করতে পারে না, গ্রহণ করেই তাকে সংস্কৃতি চালু রাখতে হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুচিবাই সংস্কৃতিবিমুখতার অন্য নাম। সৌন্দর্যচেতনা, কল্যাণবুদ্ধি, সৃজনশীলতা অন্তত গ্রহণশীলতা সংস্কৃতিপরায়ণতার লক্ষণ। 'To know all is to pardon all'- তত্ত্বে উত্তরণই সংস্কৃতিপরায়ণ লোকের চরম লক্ষ্য।

সুস্থ ও স্বস্থ জীবন ও মননের বৈশিষ্ট্যই এই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব ধারণেই ঘট-জীবনের তুচ্ছতা এড়ানোর একমাত্র উপায়। নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও 'বসুধৈব কুটুম্বকম' তত্ত্বের উপলব্ধি করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য—হীনমন্যের আত্মসংকোচনে নয়। 'এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে। ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে।' স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ এভাবেই আসে। আত্মবিলোপে বিশ্ববোধ জন্মায় না, আত্মোপলব্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। কেননা আমি আছি বলে বিশ্ব আছে, অতএব নিজের সত্তার সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক স্থাপনই জীবনের লক্ষ্য। নইলে জীববোধে আসে বিকৃতি। জীবনের প্রসাদ থাকে অজ্ঞাত। তখন এক পাশব প্রাণের ভার বয়ে জীবন হয় অনর্থক অবসিত। যদি আমরা বুঝতাম যে—এ দেহ-প্রাণ এক মহৎ শিল্পের ইজেল, তা হলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি

এক কথায় Culture-এর কোনো সংজ্ঞা দেয়া চলে না। বলতে গেলে সবার গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞাই দেওয়া সম্ভব হয়নি আজ অবধি। Culture-এর পরিভাষারূপে সংস্কৃতি কথাটা চালু হয়ে গেছে আমাদের ভাষায় এবং আমাদের আটপৌরে ব্যবহারে তা ঘরোয়া ও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। আমরা মনে করি সংস্কৃতির স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় কোনো গলদ কিংবা অস্পষ্টতা নেই। তার কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ নয় বটে, কিন্তু লোকের সংস্কৃতিবানতা অনুভব করতে পারি। এ অনেকটা শুঁড় দেখে হাতির ধারণা করার মতো। এজন্যে ব্যক্তিভেদে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিভিন্ন।

আমাদের ভাষায় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তমদ্দুন, তাহজীব, তমিজ, তরবিয়ৎ, সুরুচি, সৌজন্য, ভদ্রতা প্রভৃতি culture-এর পরিভাষা কিংবা স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশক প্রতিশব্দ প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু এদের কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ culture-এর প্রতিরূপ নয়, culture-এর খণ্ডাংশ মাত্র। অর্থাৎ এগুলোর প্রত্যেকটিই culture-এর অঙ্গীভূত, কিন্তু প্রতীক নয়। যেমন চোখ-কান-শুঁড়-লেজ-পা হাতির প্রত্যঙ্গ বটে, হাতি নয়। কেননা কোনো প্রত্যঙ্গেরই পূর্ণাবয়বের তথা হাতির স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নেই। কাজেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 'অন্ধ-হস্তী-ন্যায়'-এর মতো সত্য বটে, কিন্তু সঠিক নয়। ফলে খণ্ডকে পূর্ণের মর্যাদা দানের বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তি ঘোচে না। এতেই আমরা সবাই নিজ নিজ ধারণায় অটল-অবিচল থাকবার যুক্তি ও সুযোগ পাই।

Culture বা সংস্কৃতি একটি পরিস্রুত জীবন-চেতনা। ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। এ কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্যে দেশে কালে জাতে এর প্রসার আছে, কিন্তু বিকাশ নেই। অর্থাৎ এ জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে, কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তিমনের। কেননা সংস্কৃতিও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন culture হয় সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। যেমন হযরত মুহম্মদের জীবনে ও বাণীতে যে-সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে, তা-ই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

কাজেই একের পক্ষে যা real, অন্যদের কাছে তা ideal ; একের পক্ষে যা স্বাভাবিক, অনুকারীদের কাছে তা-ই অনুশীলন-সাপেক্ষ ও কৃত্রিম। যেমন আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ সৈন্যদের স্বোপলব্ধ নয়, তারা চাকরির শর্ত হিসেবে যান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসারী মাত্র। কিন্তু যিনি বা যাঁরা উপযোগ ও প্রয়োজন অনুভব করে নিয়ম-নিগড় উদ্ভাবন করেছেন, কৃতিত্ব তাঁদেরই। গাঁয়ের নিরন্ন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত মজুরের তেমন লক্ষণীয় কোনো রুচিবোধ নেই। কিন্তু রুচিবান ধনীগৃহে বয়-বাবুর্চির কাজ নিয়ে মনিবের প্রয়োজনে তারা যে আদব-কায়দা, রান্না ও পরিবেশন পদ্ধতি শেখে তা তাদের মনিবের সংস্কৃতিরই অনুকৃতি। তেমনি দরজি, ওস্তাগার, সুতার, তাঁতি প্রভৃতি দেশের রুচিবান ধনী-বিলাসীদের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনই রূপায়িত করে তাদের কাজে। তাজমহলের গৌরব তাই শাহজাহানের—শ্রমিক ও শিল্পীদের নয়।

তাই যার মনে চেতনার উদ্ভব, কৃতিত্ব ও মৌলিকতার গৌরব তারই—অনুকারকদের নয়। নতুনতর কিছু কোনো ব্যক্তিমনে উদ্ভূত না-হওয়া পর্যন্ত অনুকারকদের মধ্যে পুরোনোটাই অনুবর্তিত হতে থাকে এবং সে-কারণেই তা জাতীয় বা দেশীয় সংস্কৃতি- রূপে পরিচিত হয়, কাজেই যে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সৃষ্টিমূলে রয়েছে ব্যক্তিগত চেতনা। নতুন ভাব, চিন্তা কিংবা বস্তুমাত্রই ব্যক্তিমনের দান। এককথায়, যে-কোনো উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও প্রয়াসের প্রসূন।

জীবনযাপনটাকে যদি শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে জীবন রচনা ও চালিত করার জন্যে শিল্পীর মতো চেতনা, সৃজনশীলতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন। তেমন লোকের সামাজিক ভূমিকা বিদ্রোহীর ও বিপ্লবীর। কেননা পুরাতনে আকর্ষণ না হারালে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণা মেলে না। সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে, আচারে, আচরণে ও কর্মে রীতি-নীতি ও আদর্শে যাঁরা কিছু নতুন করেছেন, তাঁরা সবাই পিতৃপুরুষের সমাজ ও ধর্মদ্রোহী।

সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য-অন্বেষা। কেউ কেউ বলেন পশু-প্রায় মানুষ যেদিন ফুলের সৌন্দর্যে ও সুরের মাধুর্যে আকৃষ্ট হল—মুগ্ধ হল, সেদিনই হল মনুষ্যত্বের উন্মেষ। সে থেকেই মানুষ্যত্বের ও সংস্কৃতি-সভ্যতার শুরু, কেননা সেদিনই মানুষ অনুভব করে তার মন বলে একটা আশ্চর্য বৃত্তি রয়েছে যার শক্তির ও সম্ভাবনার সীমা নেই।

অতএব মনুষ্যত্বের পরিচয় সৌন্দর্য-চেতনায় ও পিপাসায়। সংস্কৃতিরও অন্য নাম সৌন্দর্য-চেতনা ও সৌন্দর্য-অন্বেষা। যা দেখতে শুনতে বলতে কুৎসিত, যা ঘৃণ্য, যা অকল্যাণকর তা-ই অসুন্দর—কাজেই পরিহার্য। যা-কিছু কাম্য, আকর্ষণীয়, চিত্তবিনোদক, তা-ই সুন্দর ও কল্যাণকর। সংস্কৃতিবান এই সুন্দর ও কল্যাণের সাধক। সংস্কৃতিবান জীবনের রূপদক্ষ শিল্পী। উপযোগের চেয়েও প্রয়োজনীয় এ সৌন্দর্য মানুষের জীবনে। তাই মানুষ কেবল উপযোগ সৃষ্টিতেই তুষ্ট থাকে না, সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও তৎপর হয়। যেখানে প্রয়োজনের শেষ, সৌন্দর্যের শুরু সেখান থেকেই। তার কাজে ও কথায় এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যেই ভাষায় সে উদ্ভাবন করেছে সুরের, ছন্দের, নানা ভঙ্গির ও অলঙ্কারের ; আর কাজে এনেছে শৃঙ্খলা, সুষমা ও সামঞ্জস্য।

স্থূল প্রয়োজন সহজেই মেটে। কিন্তু সৌন্দর্য-পিপাসার শেষ নেই। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সমাজে-ধর্মে-রাষ্ট্রে মানুষের এই বিচিত্র বিকাশের মূলে রয়েছে এ সৌন্দর্যবুদ্ধি। এই পিপাসাই মানুষকে এগিয়ে নিচ্ছে নব নব বিকাশের পথে—শ্রেয়সের সন্ধানে। পুরাতনে অস্বস্তি ও অবজ্ঞা না জাগলে নতুনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস জাগে না। মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই পিপাসা, অন্বেষা ও প্রয়াসের ফল।

সচেতনভাবে না হোক, অবচেতন প্রেরণায় কিংবা সহজাত বৃত্তিবশে সব মানুষই এই সৌন্দর্য-সাধনায় নিরত। কেননা সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে এতে তার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সমাজে তার Personal life আছে, কিন্তু Private life নেই। তার গায়ে যদি সুগন্ধ থাকে তা অপরের চিত্ত প্রসন্নতার কারণ হয়, তার দেহে রূপ থাকলে তা অন্যের আকর্ষণ জাগায়। তেমনি তার শরীরে ঘা কিংবা দুর্গন্ধ থাকলে তা অপরের অস্বস্তি জন্মায়। এমনি করে তার হাসি-কাশি সবকিছুরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে অপরের জীবনে। অতএব চিন্তায়, কর্মে ও ব্যবহারে লাবণ্য সৃষ্টি করে অপরের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা মানুষের জীবনের সামাজিক দায়িত্ব ও প্রয়োজন। অবচেতনভাবে তাই আমরা সবাই নিজেদের সুন্দর ও শোভন করে অপরের কাছে তুলে ধরবার প্রয়াসে নিরত। তা আমাদের দৈহিক লাবণ্য সাধন চেষ্টায়, পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতায় ও সুবিন্যাসে এবং অপকর্ম ও মিথ্যা গোপনের প্রয়াসে প্রকট। তফাৎ এই—যাঁরা সূক্ষ্ম চেতনা ও মনীষাসম্পন্ন এবং সৃজনশীল, তাঁরা নতুন নতুন উদ্ভাবনে নিজেদের ঋদ্ধ করেন। তাঁরা যুগোত্তর মনীষী ও যুগস্রষ্টা। আর সাধারণেরা থাকে গতানুগতিক, অনুকারক ও অনুস্মারক।

অতএব মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনধর্মী ও গতিশীল। এজন্যে সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হতে পারে না। অনুকারক অনুসারকের গতানুগতিক ধারার সংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতি নয়— আচার। কেননা স্থিতিশীল সংস্কৃতি প্রাণের প্রেরণাহীন ও তাৎপর্য-বর্জিত আচারে কিংবা সংস্কারে অবসিত হয়। যেমন জাকাত দানের মূলে দুঃস্থ মানবপ্রীতি, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং সংবেদনশীল ব্যাকুল হৃদয়ের যে মানবিক প্রেরণা ছিল, তা আজ অবলুপ্ত। ফলে তা আজ একটি অনভিপ্রেত ধর্মীয় কর্তব্য—একটি যান্ত্রিক আচার মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর ও শোভন অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। মৌলিক চেতনা ও চিন্তা যার আছে, সে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে রচনা করে চলে। সে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে নতুনভাবে অনুভব করে— সে-অনুভবে সে তিলে তিলে নতুন হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টি করে নিত্যনব পরিবেশ। তার কাছের মানুষকে চমক লাগানোর ও আকৃষ্ট করার মতো ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার। সংস্কৃতিবান কখনো অসুন্দরের সঙ্গে আপোস করতে জানে না। তার চিন্তা, কর্ম ও আচরণ অন্যায় ও অকল্যাণপ্রসূ নয়। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা ও কল্যাণবুদ্ধি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতিবান জীবনযাত্রী তার চলার পথ দীপ্ত করে, পথের দু-ধারে দ্যুতি ছড়িয়ে, অপরকে দিশা দিয়ে, অন্তরের মাধুরী বিলিয়ে ও জীবনের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়— ধন্য করে অন্যদের।

তাই সংস্কৃতিই জীবনযাত্রীর পাথেয়। তার কথায় কাজে চলায় স্থূল প্রয়োজনাতিরিক্ত যে-লাবণ্য থাকবে, তা-ই হবে সমাজের অন্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র। হৃদয়ের প্রীতিকামী আবেগই বিভিন্ন আত্মার মিলন-ডোর। তার বোধে ও দৃষ্টিতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। তাই সংস্কৃতিবান মানুষ সমাজে বিশিষ্ট কিন্তু স্বতন্ত্র নয়।

সাধারণ মানুষ সৃজনশীল নয়, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি নেই। তারা গ্রহণশীল হয়েই হয় সংস্কৃতিবান। তাছাড়া কোনো দেশে বা জাতে মানুষের ব্যবহারিক ও মানসজীবনের সব চাহিদা মেটাতে পারে, সর্বপ্রকার অভাব ঘুচাতে সমর্থ তেমন প্রতিভাবান বা ততগুলো প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয় না, অন্তত আজো হয়নি। কাজেই সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই, নইলে সংস্কৃতি চালু রাখা যায় না। এজন্যে কোনো দেশের বা জাতির সংস্কৃতি কখনো অমিশ্র বা মৌলিক থাকে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাঙ্গীকরণ বা আত্মস্থ করাই হচ্ছে সাধ্য। যারা সৃজনে সমর্থ নয়, অথচ গ্রহণবিমুখ—যেমন পার্বত্য ও আরণ্যক মানুষেরা—তাদের মন-মনন ও সমাজ স্থাণু।

কেননা সংস্কৃতিপরায়ণতার অন্য নাম গতিশীলতা। ক্রমোৎকর্ষ ও উন্নয়নই এর ধর্ম। আমরা—বাঙালিরা সংস্কৃতিবান হয়েছি, এগিয়ে চলেছি—সৃজন করে নয়, গ্রহণ করেই। আমাদের ধর্ম এসেছে— উত্তরভারত ও আরব থেকে, ভাষাটাও উত্তরভারতের। প্রশাসনিক ঐতিহ্যও উত্তর ভারত, উত্তর এশিয়া ও য়ূরোপ থেকে পাওয়া। আজকের ব্যবহারিক জীবনের সব উপকরণ এবং মানসজীবনের সব প্রেরণা আসছে য়ূরোপ থেকেই। অতএব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণশীল ও অনুকারক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্দিন

আযাদী লাভের পর বিশ বছর কেটে গেল। কিন্তু আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচল না ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে। আজো চলছে দলাদলি ও কোন্দল। অবশ্য মতাদর্শের বিতর্ক ও সংগ্রাম মন্দ কিছু নয়, অভিনব তো নয়ই। কিন্তু একই সমস্যা নিয়ে বিশ বছর ধরে মাথা ঘামানো, আর তার সমাধান খুঁজে না-পাওয়া এ-যুগের পক্ষে অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও অকল্যাণকর।

দল মোটামুটি দুটোই। একদল ধর্মীয় জাতীয়তায়, ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে আস্থাবান। অন্যদল দেশীয় ও ইউরোপীয় ভাব-চিন্তার অনুগত। প্রথম দল Nationalist, দ্বিতীয় দল Rationalist। আদর্শ হিসেবে কোনোটাই নিন্দার নয়। প্রথম দল ধর্মভাবে নয়—ধর্মীয় পরিচয়ে স্বাতন্ত্র্যকামী। তাঁদের আত্মপ্রীতি ও মর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তাঁরা ঋণের কিংবা অপরের অনুসৃতির লজ্জা থেকে জাতিকে বাঁচাতে চান। তাঁদের যুক্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার। কেননা ইসলাম হচ্ছে সর্বকালীন সর্বমানবিক সমস্যার সমাধান আর মানব-কাম্য কল্যাণের দিশারী। কাজেই ইসলামের অনুগত হও, কোরান-হাদিস অনুসরণ কর আর সুখে নিদ্রা যাও।

মুশকিল হল এই তাঁরা মুখে বলছেন বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁদের দ্বিধা ঘোচেনি, আর তাই হয়তো আচরণে তাঁদের কোনো সঙ্গতি দেখা যায় না। কেননা য়ুরোপীয় আদলে জীবন রচনায় তাঁরাও প্রয়াসী। য়ুরোপীয় মানস-সংস্কৃতির ফসল গ্রহণে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিকতায় য়ুরোপীয় জীবনধারার অনুকরণে তাঁদের সংকোচ দেখিনে। তা হলে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবাদ কী নিলক্ষ্য ফাঁকা বুলি মাত্র? তাও নয়। আসলে বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক স্বার্থে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রচেতনা জাগে, তাকে স্থায়ী ও জোরালো করবার জন্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তায় বিশ্বাস ও তার ভিত্তি দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজন হয়। আর এ লক্ষ্যে সিদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে আসে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের যুক্তি। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, জয়ী হয়েছিলাম আমরা। কাজেই আমাদের সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বিশ বছর আগে। ওরা এখন আমাদের পাতের ভাতের ভাগী নয়, প্রতিবেশী মাত্র। তবু আমাদের দেশ ও জাতির হিতকামী অতি-সচেতন একদল বুদ্ধিজীবী অহেতুক শঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। একটা অসুস্থ চিন্তা, একটা বিকৃত বুদ্ধি, একটা বিদ্বিষ্ট মন ও একটা অহেতুক শঙ্কা নিয়ে দেশের স্বার্থ ও জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে অতন্দ্র প্রহরীর ও গণ-অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

যা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখতে চান, খোলাখুলিভাবে তার নাম দেখা যায় 'পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু ও হিন্দুয়ানী ভীতি।' এ কারণেই তাঁরা বলছেন— হরফ বদলাও, বানান বদলাও, শব্দ বদলাও, ভাষা বদলাও, ভঙ্গি বদলাও ; বদলাও বিষয়বস্তু, বদলাও নাম, বদলাও ভাব, বদলাও চিন্তা। কেবলই বদলাও যাতে বাঙলা ও বাঙালিত্বের নাম-নিশানা ঘুচে যায়, বিলীন হয় সাদৃশ্য, প্রতিষ্ঠা পায় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। এর আগে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। কেননা শত্রুকে ছোট ভাবতে নেই।

বিশ বছর ধরে ক্রমবর্ধমান অসাফল্যের মুখ্য কারণ হচ্ছে, তাঁদের অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন করে তারা কেবলই ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের গর্ব আর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। অথচ দেহ-মনে তাঁরা বরণ করেছেন য়ুরোপকে। কথায়-কাজে এ অনৈক্য, বুকে-মুখে এ বিরোধ অন্যের অশ্রদ্ধা জাগায়। অবচেতন ভাবেই শ্রোতার মন হয়ে ওঠে বিরূপ। তাঁরা যদি সোজাসুজি বলতেন এড়িয়ে চলো হিন্দুর সাহচর্য, পরিহার কর হিন্দুয়ানী প্রীতি, বর্জন কর হিন্দুর সাদৃশ্যজ্ঞাপক সবকিছু, তা হলে হয়তো রাষ্ট্রিক অসদ্ভাবের সুযোগে সমর্থন পেতেন অনেক। কিন্তু তা তাঁরা বলেননি—বলেন না, কেননা হয়তো চান না তাঁরা

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ফলে বেড়ে যায় সাধারণের তাচ্ছিল্য আর বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা। বিরুদ্ধবাদীরা তখন যুক্তির আশ্রয় নেন। তাঁদের যুক্তি কতকটা এরূপ—যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলার অন্য নাম সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হতে পারে না, তা হবে নিত্য নতুন। প্রতিদিনকার সূর্যের মতোই নতুন। বহতা নদীর স্রোতের মতোই নতুন। কেননা সংস্কৃতি পুরোনো হলে তা আর সংস্কৃতি থাকে না, হয় আচার। তখনকার ইসলামী সংস্কৃতির তথা এখনকার ইসলামী আচারের অনেক ভালো রীতি-পদ্ধতিই যুডাইজম থেকে নেয়া, যার নাম 'সুন্নত-ই-ইব্রাহীম'। অতএব ইসলামী সংস্কৃতিও অবিমিশ্র ছিল না। সংস্কৃতি চালু থাকে সৃজনশীলতায় ও গ্রহণশীলতায়। যারা সৃষ্টি করতে পারে না, অন্যের সৃষ্টি বরণ করেই তারা হয় সংস্কৃতিবান। যারা সৃষ্টিও করতে পারে না, গ্রহণও করতে চায় না, তারা আদিম স্তর পার হতে পারেনি, যেমন আফ্রো-এশিয়ার পার্বত্য ও আরণ্যক গোত্রগুলো। অতএব সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হয় না— হতে পারে না। আমরা বাঙালিরা সৃজন করে নয়— গ্রহণ করেই হয়েছি সংস্কৃতিবান। আমাদের ধর্ম আরবের ও উত্তর-ভারতের। আমাদের ভাষা উত্তরভারতের বা আরো দূরের। আমাদের প্রশাসনিক সংস্কৃতি মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, তুর্কী, মুঘল ও ইংরেজ থেকে পাওয়া। আমাদের সমাজ সংস্থা এই ধর্ম আর প্রশাসনিক আদর্শভিত্তিক। আমরা নিজেরা হলাম অস্ট্রো-মঙ্গোল-নিগ্রো-আর্য-সামীয়ের বর্ণসঙ্কর বা রক্ত-সঙ্কর জাতি। অতএব, পাঁচ রকমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের জাতি। পাঁচমিশেললি হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাহলে কোনো অর্থে আমরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলি? আমরা গ্রহণ করি, আর নিজের মতো করে নিই, যার নাম স্বাঙ্গীকরণ। এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের রূপ আর জাতীয় স্বরূপ। আমাদের পূর্বপুরুষ বিদেশী বিজাতি আরবের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে কী আমরা লজ্জায় মরি, না স্বস্তিবোধ করি!

গ্রহণে-বরণেই যদি আমরা আজ অবধি টিকে থাকি, তাহলে আজকে হঠাৎ 'জাত গেল, ধর্ম গেল, ঐতিহ্য গেল, গেল ভাষা, গেল সাহিত্য, গেল সংস্কৃতি, বলে আর্তচিৎকারের বা আর্তনাদের কী কারণ ঘটল? বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে সংস্কৃতির কোনো স্থায়ী রূপ বা স্বাতন্ত্র্য থাকতেই পারে না। এমনকি জীবন-চেতনা, নীতিবুদ্ধি, ধর্মবোধ, ঐতিহ্যের মূল্য, ভাষার রূপ বা সাহিত্যের আঙ্গিক ও বক্তব্যই কী অবিচল অবিকৃত থাকে? এক কোরআন কেন্দ্র করেই— হাদিস অবলম্বন করেই কী আমাদের বাহাত্তর ফেরকা হয়নি? জীবনে কী প্রয়োজন-বুদ্ধি ও উপযোগ-চেতনা বদলাচ্ছে না? জীবনযাত্রী কী চলার পথে এগোয় না? মানুষের মন-বুদ্ধি-আত্মার কী বিকাশ নেই? সমাজ কী স্থাবর? তার কী কেবল অতীতই আছে, ভবিষ্যৎ নেই? তার কী কেবল অতীতের মোহ থাকাই বাঞ্ছনীয়, ভবিষ্যতের আকর্ষণ থাকা কাম্য নয়? নিজেকে নতুন করে রচনা করা কী অপরাধ না অমানবিক?

যাঁরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা, তাঁরাই আবার য়ূরোপীয় গণতন্ত্রের ভক্ত, গণতন্ত্রী সংবিধানের দাবীদার, রোমান-আইনের অনুরাগী, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যায় উৎসুক, রেডক্রসের মহিমায় মুগ্ধ, য়ূরোপীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রসাদ গ্রহণে উন্মুখ। য়ূরোপীয় মনীষার ফসল ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা, প্রাচ্য-শাস্ত্র বিশ্লেষণ বিদ্যা, বিভিন্ন বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা আর সাহিত্যশাস্ত্র শিক্ষায় এবং অনুকরণেও তাঁরা লজ্জাবোধ করেন না, কিংবা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবেন না। য়ূরোপীয় আদলে প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলতে, স্কুল-কলেজ রাখতে, সৈন্যবাহিনী বিন্যাস করতে, কিংবা কলকারখানা স্থাপনে, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে, গৃহনির্মাণে ও আসবাবপত্র ব্যবহারে তাঁদের আত্মসম্মানে বাধে না। এঁরা গরুর গাড়ি-ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে মোটরে-বিমানে-জাহাজে চড়তে, কিংবা হেকিম বাদ দিয়ে ডাক্তার ডাকতে, রেড়ির তেল ছেড়ে কেরোসিনের ব্যবহারে কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে আত্মধিক্কারে মাথা নত করেন না।

আজ আমাদের চুল কাটার ধরন থেকে জুতোর অবয়ব অবধি সবকিছুই য়ূরোপীয়। এভাবে অন্তরে-বাইরে মনে ও মেজাজে য়ূরোপীয় মানুষেরই প্রতিকৃতি আমরা। এমনকি য়ূরোপীয় জীবন-চিন্তার প্রভাবে কোরআনের কানুন—আল্লাহর নির্দেশ সংশোধনেও তাঁরা দ্বিধান্বিত নন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মনিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার বিধানের সংশোধন ও পত্নীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি স্মর্তব্য। তাহলে তাঁদের সংস্কৃতিটা কী বস্তু আর তার স্থিতি কোথায়, বোঝা ভার। তাঁরা পেন্টালুন ও পেন্টালুনের আদলে তৈরি পাজামা পরেন, আসকান-পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি রাখেন, বুফে খান এবং পাঁওরুটি ও সুপে আসক্ত ; তবু সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বড়াই করেন।

আরো মারাত্মক ব্যাপার এই যে, তাঁরা মুসলিম সংস্কৃতির কথা বলেন না—বলেন ইসলামী সংস্কৃতির কথা। এবং 'ইসলামী সংস্কৃতি' নামটা তাঁদের যথেচ্ছ প্রয়োগে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। নাচ-গান-নাটক-চিত্র-কলা প্রভৃতি ইসলামে অবিধেয় বিষয়গুলোও তাঁরা ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। যেমন বুলবুল চৌধুরীর নাচ, নজরুলের গান, মুসলিম চরিত্র নিয়ে রচিত নাটক, আবদুর রহমান চুঘতাইর চিত্র প্রভৃতি এবং যা-কিছু মুঘলাই ও ইরানি—তাঁদের কাছে ইসলামী। এভাবে যা-কিছু মুসলমান করে তা-ই ইসলামী হয়ে উঠেছে ; যেমন ইসলামিয়া হোটেল, ইসলামিয়া কলেজ, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ইসলামিয়া ব্যাঙ্ক, ইসলামিয়া ইন্স্যুর্যান্স প্রভৃতি।

আমাদের না হোক, আরব-ইরানির কিংবা মুঘলের একটা সৃষ্টিশীল ও গ্রহণশীল মুসলিম সংস্কৃতি ছিল। য়ুরেশিয়ার সর্বত্র তা যথাকালে অনুকৃতও হয়েছিল। কিন্তু সে তো দূর অতীতের ইতিহাস। আজকের দিনে তার Revival-এর চিন্তা দিবাস্বপ্ন মাত্র। এরূপ চিন্তা দুর্বলতার ও অসামর্থ্যের সাক্ষ্য। এ সংস্কৃতির গৌরব-গর্বে নিষ্ক্রিয় থাকাও বিকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক। গৌড়-সুলতানের যে-বংশধর আজ অজপাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত দিনমজুর, সে যদি তার খান্দানের গর্ব করে, যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও তা মূল্যহীন ও অশ্রদ্ধেয়। কেননা ঐ পরিচয়ের যোগ্যতা হারিয়েছে সে। আমাদেরও যখন আজ বিশ্বকে দেবার মতো কিছুই নেই, আমাদের যখন আজ কেবল গ্রহণ করা ও গড়ে তোলার পালা চলছে, তখন পূর্বপুরুষের মহান সংস্কৃতির কথা বলে নিজেদের হাস্যাস্পদ করা অসমীচীন। কথায় বলে : 'স্বনামা পুরুষ ধন্য পিতৃনামা চ মধ্যমা।' আমরা স্বনামে ধন্য নই, পিতৃনামেও নই পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি যখন জ্ঞানে, কর্মে ও চিন্তায় বিস্ময়করভাবে নিজেদের বিকাশ সাধন করছে, তখন আমরা পূর্বপুরুষেরও নয়—ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে আরব-ইরানির অতীত কৃতির আস্ফালনে নিজেদের নিঃস্বতা, নিজেদের অযোগ্যতার লজ্জা ঢাকা দেবার প্রয়াসী। আত্মধ্বংসী এ আত্মপ্রবঞ্চনা কোনো শ্রেয়সের সন্ধান দেবে আমাদের?

তাই সংস্কৃতির নামে এঁদের রক্ষণশীলতা, গ্রহণবিমুখতা, অসহিষ্ণুতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতা আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করছে মাত্র। আমাদের প্রগতি ঠেকিয়ে রাখার সামর্থ্য এঁদের ছিল না, কিন্তু ইসলামের নামে জনপ্রিয়তাকামী সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েই এঁরা প্রবল। এভাবে সরকারি প্রশ্রয়ে ও উৎসাহে সংস্কৃতির ও মননের ক্ষেত্রে জনগণের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের পথ করেছেন তাঁরা বন্ধুর এবং দেশের rational বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সুযোগ করেছেন হরণ।

যে-দল Rationalist, তাঁরা জ্ঞান, কর্ম ও চিন্তার বিস্ময়কর য়ুরোপীয় বিকাশে মুগ্ধ। এতে তাঁরা পেয়েছেন মানব-মহিমার সন্ধান। জীবন-সম্ভাবনার অনন্ত বিস্তার দর্শনে তাঁদের চিত্তলোক আন্দোলিত। জগৎ-রহস্যের নিঃসীম গগনে পাখা মেলতে চায় তাঁদের মনোবিহঙ্গ। তাঁরা দেহ-মন-আত্মার অবগাহন কামনা করেন এই নব-উপলব্ধ চেতনা-সমুদ্রে। চিত্তের এ চেতনালোকে ভূগোল নেই, ধর্ম নেই, জাত নেই ; আছে কেবল মানুষ আর আছে মানবিকতা ও মানবতার বিচিত্র-বিকাশের আভাস ও আশ্বাস। অখণ্ডের সন্ধান যে পেয়েছে, খণ্ডে তার মন ভরে না। সমুদ্র-পর্বত যে দেখেছে, নদী আর টিলা তার অবহেলা পাবেই। Rationalist-রাও তাই জীবনকে রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে না, দেখতে চায় নিখিল জগতের পটে। বিচিত্র ও বর্ণালি, বিমূর্ত ও বিমুক্ত অনুভবের সূক্ষ্ম শিকড় চালিয়ে দিয়ে জগৎ-রহস্য ও জীবন-ভাবনার স্বরূপ-চেতনার গভীরে উপলব্ধি করার প্রবণতা এ-যুগে অত্যন্ত প্রবল। সূর্য আজ প্রতীচ্য গগনে। তার আলো ও আলোর প্রসাদ পেয়ে জগদ্বাসী আজ ধন্য ও কৃতার্থ। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার।' যে আনে না—আনতে জানে না, সে হতভাগ্য। মানস-ঐশ্বর্যের দ্বার অবারিত দেখেও যে অবহেলা করে সে কৃপার পাত্র। সমুদ্র সামনে পেয়েও যে তাকিয়ে দেখে না, সে হৃদয়হীন।

প্রতীচ্যের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও জীবন-চেতনায় মুগ্ধ আমাদের Rationalist-রা তাই চরম তাচ্ছিল্যে শুচিবাইগ্রস্ত রক্ষণশীলদের বলতে চান : যে-সংস্কৃতি জীবনের প্রয়োজন মিটায় না, আত্মরক্ষার অস্ত্র যোগায় না, রোগের প্রতিষেধক জানে না, সিনেমা-রেডিয়ো-টেলিভিশন-টেলিফোন-টেলিগ্রাফ কিংবা জাহাজ-বিমান দিতে পারেনি, যে-সংস্কৃতি বিজ্ঞানে-দর্শনে-সমাজতত্ত্বে-রাষ্ট্রতত্ত্বে, অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্য বিজ্ঞানে কোনো নতুন চিন্তায় সমর্থ নয়; অন্য কথায় যে-সংস্কৃতি আধুনিক জীবন-ভাবনার সহায়ক নয়, জীবনের মানস-সমস্যার সমাধান দেয় না, মনের খোরাক যোগায় না, ব্যবহারিক জীবনের কোনো অভাব মিটানোর যোগ্যতা যাতে অনুপস্থিত ; যে-সংস্কৃতি কেবল নরকের ভয় ও স্বর্গের লোভ দেখিয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণে তৎপর; ভাব, চিন্তা, জ্ঞান ও কর্মের উদ্যোগে ও প্রসারে রক্তচক্ষু কিংবা কাতর; যে-সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় না, যে-সংস্কৃতি কল্যাণকে গ্রহণেও উৎসাহিত করে না, যে-সংস্কৃতি কেবল ধরে রাখে, কেবলই পিছুটান দেয়, অথচ যা দিয়ে মনও ভরে না, প্রয়োজনও মেটে না, এগিয়ে যাবার দিশাও দেয় না, বেঁচে থাকার উপায়ও বাতলায় না—সে-সংস্কৃতি দিয়ে আমরা কী করব?

২

Rationalist-দের কেউ কেউ পড়াশোনা ও দেখার মাধ্যমে য়ুরোপীয় চিত্তের—প্রতীচ্য মনীষার ও জীবন-ভাবনার স্বরূপটি জেনেবুঝে নিয়েছেন। তাঁদের চেতনায় জগৎ-ভাবনা উদ্দীপ্ত আর মানবিক আকাঙ্ক্ষার ও জীবন-সমস্যার আঞ্চলিক পার্থক্য অবলুপ্ত। এঁরা শান্তিকামী, স্বস্তিপ্রয়াসী ও বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। বর্ণ, ধর্ম ও রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিতে এঁরা সম অধিকার ও সম সুযোগের ভিত্তিতে সহ-অবস্থান নীতিতে আস্থাবান। এ হল দক্ষিণপন্থীদের কথা। এঁদের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী তাঁরা নিজেদের পরিকল্পনামতো বিশ্ব-সংসারকে ঢালাই করতে চান। মানুষের বর্ণ, ধর্ম, মনন ও প্রয়োজনের পার্থক্য স্বীকৃতি পায় না তাঁদের কাছে।

এ দুই পন্থের অন্যান্যরা কিছু জেনে এবং কিছু শুনে প্রাগ্রসর প্রগতিবাদী আধুনিক মানুষ বলে আত্মপরিচয় দেন। কতগুলো বুলি কপচিয়ে তাঁরা সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবসমস্যা সচেতনতার আভাস দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এঁরাই যন্ত্রযুগের যন্ত্রণার কথা, অবক্ষয়ের কথা, সমাজের বিবর্তনধারার কথা বলে শ্রোতার মনে চমক লাগিয়ে দেন।

মানুষের জীবনপ্রবাহে যে অবক্ষয় নেই, যান্ত্রিকতা যে যন্ত্রণার নয়, সমাজ বিবর্তন যে মানুষেরই অগ্রগতির ফল—এসব কথা তাঁদের বোঝানো যায় না। মানুষের অগ্রগতির তথা চলমানতার লক্ষণই এই যে, তার জীবনবোধ হবে বিচিত্রতর, সূক্ষ্মতর ও তীব্রতর। আর এর ফলে বাড়বে প্রয়োজনবোধ, দেখা দেবে অভাব, উদ্ভব হবে সমস্যার, খুঁজবে সমাধান। ফলে উপায় হবে বিচিত্র, উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন, মত হবে বিবিধ, পথ হবে বহুধা আর ঋজু থাকবে না জীবনচর্যা, সহজ হবে না বেঁচে থাকা। স্বাতন্ত্র্যে কিংবা আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলা হবে অসম্ভব। পৃথিবীর মানুষ কেবল পারস্পরিক সহযোগিতায় বাঁচবে। মানুষ ফেরেস্তা নয়, অতএব জীবনযাত্রা হবে জটিল ও দুঃসাধ্য। দেখা দেবে দ্বন্দ্ব, লাগবে লড়াই, বাধবে সংঘর্ষ, এড়ানো যাবে না সংঘাত। তা হবে ব্যক্তিক, পারিবারিক, দৈশিক ও রাষ্ট্রিক। অতএব দোষ যন্ত্রের নয়, কারণও অবক্ষয় নয়, সমাজ কাঠামোও দায়ী নয় এর জন্যে। মানুষের লোভ ও কল্যাণবুদ্ধির অভাবই এর জন্যে দায়ী। তাই জীবন-সংগ্রামের শেষ নেই। মানুষ যতই এগুবে, যতই দিন যাবে, সংগ্রামও হবে বিচিত্রতর, কঠিনতর আর জটিলতর। সে সংগ্রাম করবে প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অভাবের ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে, রোগ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে।

আর দেশ ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক মানুষের আজন্মের সংস্কার। স্বদেশ প্রেমিক ও সুনাগরিক মাত্রই স্বভাবত নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থসচেতন। রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের স্বার্থেই বিস্মৃত হতে পারে না, পারে না অবহেলা করতে। আর কোনো আস্তিক মানুষই তার ধর্মীয় চর্যায় আকর্ষণ হারায় না। কাজেই এ ব্যাপারে কারো উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠ হওয়ার কারণ দেখিনে।

আমাদের দুর্দিন বলছি এজন্যে যে আমাদের একদল এগুতে চান না, তাঁরা সংগ্রাম-বিমুখ। স্থিতির মধ্যেই তাঁরা স্বস্তি খোঁজেন, পূর্বপুরুষের রিকথ সম্বল করে নিশ্চিন্ত হতে চান। তাঁরা আকাঙ্ক্ষাহীন, অনিশ্চয়তায় পা বাড়াতে অনিচ্ছুক তাঁরা। আত্মরক্ষণই তাঁদের কাম্য, আত্মপ্রসারে আগ্রহ নেই।

আর এক দলের সাধ আকাশ-ছোঁয়া। কিন্তু সাধ্য সামান্য। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল কিন্তু যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহ ক্ষীণ, সাধনায় উৎসাহ দুর্লক্ষ্য। তাই সৃষ্টিশীল তো নয়ই, গ্রাহিকাশক্তিও তাঁদের সুষ্ঠু নয়। তাই আজো আমরা অনুকারক মাত্র। মনের দিক দিয়ে সুস্থ ও স্বস্থ কেউই নন। একদলের দৃষ্টি দূর অতীতের আরব-ইরান পানে। আর এক দল তাকিয়ে আছেন সুদূর পিকিং, মস্কো কিংবা লন্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্কের দিকে। এসব কারণে আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা

মানুষের জ্ঞান সীমিত কিন্তু অজ্ঞতা অসীম। অজ্ঞতা থেকেই ভয়, বিস্ময় ও কল্পনার উদ্ভব। যা জানিনে, যা বুঝিনে তা জানবার-বুঝবার আগ্রহ থেকেই কল্পনার প্রসার। আদিম অজ্ঞ মানুষের জীবন ছিল ভয়, বিস্ময় ও কল্পনাশ্রিত। ফল ও মৃগয়াজীবী মানুষের সংখ্যাধিক্যে খাদ্যবস্তু যখন দুর্লভ হতে থাকে, তখন বাঞ্ছাসিদ্ধির আত্যন্তিক কামনা মানব-মনে এক অদৃশ্য তৃতীয় শক্তির জন্ম দেয়। এর নাম জাদুবিশ্বাস। অভাব ও অতৃপ্তি বোধ থেকে উদ্ভূত হয় পাওয়ার বোধ। এর নাম কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। অভাব-অতৃপ্তি মিটানোর জন্যে জাগে প্রাপ্তির ইচ্ছা। এই ইচ্ছার অভিব্যক্তি প্রচেষ্টারূপে শারীরক্রিয়ায় পরিণত হয়। এর নাম কর্ম। কিন্তু কর্ম মাত্রই সফল হয় না। তাই মানুষের অভাব মিটে না—সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ অসহায় মানুষ তাই কল্পনা করেছে অরিশক্তি ও মিত্রশক্তি—ইষ্টদেবতা ও অপদেবতা। জাদুবিশ্বাসে তাই দেখতে পাই ইষ্ট ও অরি দেবতার উপস্থিতি, তাদের দ্বন্দ্ব, তাদের হার-জিৎ। জীবনধারণের পক্ষে যা-কিছু প্রতিকূল তা-ই মন্দ আর যা কিছু অনুকূল তা-ই-ভালো। ভালো-মন্দ ধারণার ভিত্তি এ-ই। তাই ভালো-মন্দের সর্বজনীন চিরন্তন কোনো রূপ নেই। 'সত্য'বোধও হচ্ছে ভালো-মন্দ প্রসূত। তাই সত্যেরও কোনো একক রূপ স্বীকৃত নয়। কেননা ভালো, মন্দ ও সত্য আপেক্ষিক ধারণা— অনপেক্ষ নয় (relative, absolute নয়)। উপযোগই ভালো, মন্দ ও সত্যের মাপকাঠি। তাই কলা পাকলে হয় খাদ্য, বেগুন পাকলে হয় অখাদ্য। রাজায় বা রাজাদেশে কাড়লে-কাটলে দোষ নেই, পাপ নেই। কিন্তু ব্যক্তিক জীবনে তাই যুগপৎ vice, crime ও sin—সমাজে অন্যায়, রাষ্ট্রে অপরাধ, ধর্মে পাপ।

জাদুবিশ্বাস-অনুগ আচার-আচরণই মানুষের আদিম ধর্ম। যেহেতু বুনো ফল-মূল ও মৃগজীবী মানুষের বাঞ্ছাসিদ্ধিই এর লক্ষ্য, সেজন্যে এ-ধর্ম মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা তখন প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে করে টিকে থাকাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। যেখানে আত্মশক্তির তথা বাহুবলের শেষ, সেখানেই জাদুবিশ্বাসের উদ্ভব, সেখান থেকেই জাদুনির্ভরতার শুরু। মিত্রশক্তির আবাহনে অরিশক্তির বিতাড়নই ব্রত। আদিম মানবের অবোধ বাসনা চরিতার্থ করবার অক্ষম প্রয়াসে সৃষ্ট হয় প্রাকৃত শক্তির কাল্পনিক অনুকৃতিজাত তুকতাক-দারু-টোনা-মন্ত্র-তন্ত্র। ভাগ্য বা অদৃষ্টতত্ত্ব এ স্তরের বোধের দান।

কল্পিত তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রবর্তনা দেয় নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষায় ও সক্রিয় পরীক্ষায়। এর থেকে অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা। একের দেখে-জানা অভিজ্ঞতাই হয় অপরের শুনে-পাওয়া জ্ঞান। ক্রমে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বাড়তে থাকে। কালে জ্ঞানে-বিশ্বাসে সংস্কার হতে থাকে জটিল ও বহুধা। কালের চাকা ঘুরছে অনবরত আর মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস-সংস্কারও হচ্ছে জটিলতর। বিশ্বাসের পরে এল জ্ঞান। তবু বিশ্বাসও রইল, জ্ঞানেরও ঠাঁই হল। জ্ঞান যুক্তির জনক। যুক্তি সংস্কার ভাঙে। বিশ্বাস সংস্কারকে প্রবল করে। যুক্তির আশ্রয় জ্ঞানজ বুদ্ধি, বিশ্বাসের প্রশ্রয় ভীরু মানুষের দুর্বলতায়, লোভী মানুষের অক্ষমতায়। যদিও বোধের থেকে বোধি, তা থেকে বুদ্ধির উন্মেষ, আর জ্ঞান বোধির যোগে আসে প্রজ্ঞা, তবু এর মধ্যে একটি প্রত্যয়স্বল্প অস্থির মানস-স্তর রয়েছে, যার ফলে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মিশ্রণে গড়ে উঠে অধ্যাত্মবুদ্ধি, যা সুবিধেমতো কখনো জ্ঞানবাদী, কখনো বিশ্বাসপন্থী। এ বুদ্ধি এক অপার্থিব রহস্যালোক সৃষ্টি করে। ইহলোকে এ আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা কখনো ঘুচবার নয়। কারণ অজ্ঞতা অসীম [illegible] তাই [illegible] বলেন— শাস্ত্র হচ্ছে সাধারণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

জন্যে, আর জ্ঞানীর জন্যে প্রয়োজন দর্শনের, তাতে কোনো ইতর-বিশেষ হয় না। কারণ ফল ও প্রভাব অভিন্ন থেকে যায়। কেননা দুটোই কল্পনাপ্রসূত এবং পরিণামে সংস্কার-রূপেই স্থায়িত্ব পায়।

জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের বৃদ্ধিতে ক্রমে বুনো-মানুষ উৎপাদনে ও পশু-লালনে জীবিকার ব্যবস্থা করল। তখন মানুষ কৃষিনির্ভর আর পশুজীবী। তখন প্রকৃতি ও পরিবেশই কেবল তার প্রতিপক্ষ নয়, উৎপাদন ক্ষেত্রের ও চারণভূমির সীমাবদ্ধতা এবং সামর্থ্যের পরিমিতি মানুষকেও করে তুলল মানুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তখন ঈর্ষা-দ্বেষ কাড়াকাড়ি-হানাহানি হয়ে উঠল পারস্পরিক। তখন মানুষের সংগ্রাম দ্বিমুখী হলেও মানুষই প্রথম নম্বরের শত্রু বলে বিবেচিত হল। ফলে জাদুবিশ্বাস তো রইলই, তার উপর জগতে ও জীবনে নতুনতর তত্ত্বও হল আরোপিত। দুর্বলের নিরাপত্তা ও সান্ত্বনার জন্যে এবং সবলকে সংযত ও শৃঙ্খলিত রাখবার প্রয়োজনে কল্পিত হল ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবন ও আত্মার অমরত্ব। রচিত হল অপৌরুষের শাস্ত্র। এই অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হল গোত্র ও সমাজ শাসনের প্রয়োজনে। উদ্ভাবন করলেন যাঁরা, তাঁরা একাধারে জ্ঞানী এবং অধ্যাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। এ এক অদ্ভুত ফাঁদ যা জানবার বুঝবার কিংবা এড়াবার সাধ্য নেই কারো। কেননা বিশ্বাসে এর দিশা মেলে না, আবার বুদ্ধি ও জ্ঞানে এর 'ওর' পাওয়া ভার।

এ শাস্ত্র জাগাল ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং তজ্জাত পাপ-পুণ্যের ধারণা। এ পাপ-পুণ্যের ফল পরলোকে তো বটেই, ইহজীবনেও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে। আবার এ ন্যায়-অন্যায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিচিত্র। সবল ও দুর্বলের ন্যায়-অন্যায় অভিন্ন নয়! তিন টাকা দিয়ে কেনা গোলাম তার ত্রিশপুরুষ অবধি দেহ-মন ও মনুষ্যত্ব দিয়ে মালিকবংশের সেবা করলেও তিন টাকার ঋণ শোধ হয় না কেন, কিংবা ত্রিশ টাকা দিয়ে কেনা জমিতে তিনশ বছর গতর খাটিয়েও কৃষকের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে না, অথচ ত্রিশ টাকায় পাওয়া স্বত্ব অক্ষয় হয়ে থাকবে কেন—এ প্রশ্ন সে-বোধের অন্তর্গত নয়। আবার রাজায় কেড়ে নেওয়াতে দোষ নেই, সামান্য লোকের কেড়ে খাওয়াতে বা চুরিতে পাপ কেন—সে-জিজ্ঞাসা হয়েছে অবান্তর বিবেচিত। সবলের পরিপূর্ণ সুবিধা-সুযোগের জন্যেই এ শাস্ত্র সবলপক্ষের তৈরি।

এই শাস্ত্র গোত্র-শাসন উদ্দেশ্যেই মূলত রচিত। সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তা সমস্যা হয়ে দেখা দিল পরে, যখন নিঃসম্পর্কীয় গোত্রগুলো জীবন-ধারণের প্রয়োজনে সহযোগিতার নামে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এল এবং একক দেবতা বা স্রষ্টার নামে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তথা গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনা লোপ করার প্রয়াসে অভিন্ন আদর্শভিত্তিক সমাজ গড়ার চেষ্টা হল। কেননা ইতিমধ্যে স্ব স্ব আচার-সংস্কার, নিয়মনীতি ও শাস্ত্রজবোধ গোত্রীয় ঐতিহ্যে ও মানস-সম্পদে পরিণত হয়েছে। পার্থিব আর আর ধন-জন-সম্পদের মতো এও প্রিয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এভাবে এটি যখন গোত্রীয় মর্যাদার ও গৌরবের প্রতীক হয়ে দেখা দিল, তখন দলে টেনে দল ভারী করার লোভে এর উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মানবপ্রবণতাও পষ্ট ও সক্রিয় হয়ে উঠল। একের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে হলে অপরের অপকর্ষ প্রমাণ করতে হয়। নিন্দা থেকে দ্বন্দ্বের শুরু; বিরোধের পরিণামে বাধল সংগ্রাম। ধর্মীয় সে-কোন্দলের আজো ইতি ঘটেনি। একে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি। বিলুপ্ত হয়েছে গোত্রবোধ। আজো সমাজে-ধর্মে-জাতে-রাষ্ট্রে ধর্মই নিয়ন্ত্রীশক্তি, বিদ্বেষ-বিরোধের উৎস, জীবন-প্রচেষ্টার নিয়ামক, প্রীতি-সম্ভাবনার অন্তরায়। এর সঙ্গে সামান্য-অর্থে তুলিত হতে পারে এ-যুগের অর্থনীতি। দ্রব্য বিনিময় রীতির অসুবিধে দূর করার জন্যে চালু হল মুদ্রা। সমস্যার সহজ-সরল-সুন্দর সমাধান! সে-ব্যবস্থার অলক্ষিত-অভাবিত জটিলতায় আজ মানুষের দেহ-মন-আত্মা জলাবদ্ধ। ধনী-নির্ধন সমভাবে পীড়িত তার অদৃশ্য পাশ-বেষ্টনে। এ এক মায়াফাঁদ—ছাড়া যেমন অসম্ভব, সহ্য করাও তেমনি আত্মপীড়নের নামান্তর।

কালে কালে মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি-বুদ্ধির প্রয়োগে ও পরিচর্যায় তত্ত্বে ও তথ্যে, চিন্তায় ও চিন্ময়তায়, উপলব্ধি ও অনুভূতির ঐশ্বর্যে, যৌক্তিক বিশ্লেষণের ঔজ্জ্বল্যে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের শাস্ত্র বিপুল ও বক্র, বিচিত্র ও বর্ণালি হয়েছে। কিন্তু মৌল আদর্শে ও লক্ষ্যে কোনো বিবর্তন আসেনি। কেবল যখন জনচিত্তে স্বধর্মের গর্ব ও অনুভূতির উষ্ণতা মন্দা হয়েছে, তখন পুরোনো বুলির চমক-লাগানো নব-উচ্চারণে কেউ কেউ সমাজে সংসারে সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অথবা কোনো বাকপটু ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচে জনমন ধাঁধিয়ে পুরোনো ধর্মের প্রশাখা কিংবা উপশাখা সৃষ্টি করে দেশকালের নেতৃত্ব পেয়েছেন। ন্যায়-নীতি সত্য-সদাচারের নামে সবাই কেবল বিভেদ-বিদ্বেষ-বিরোধের কারণ বাড়িয়েছেন, ব্যবধানের প্রাচীর তুলেছেন, ঐক্য ও অভিন্নতার বুলি আওড়িয়ে খণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। মিলন-ময়দান তৈরির নামে খাদই খনন করেছেন বেশি। অবস্থা এমন যে, সন্ধির শর্তালোচনার জন্যে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু যেন আর অবশিষ্ট নেই।

আগের দিনে জীবন-যাপনের উপকরণ ছিল স্বল্প ও বৈচিত্র্য-বিরল। ঋজু জীবনের একঘেঁয়েমির মধ্যে বিচিত্র অভিলাষ জাগিয়ে প্রাণের উত্তেজনা-উৎসাহ বাড়ানোর উপায় ছিল না। জীবনধারণের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য মান ছিল না জনগণের। ডাল-ভাত নয়, শাক-ভাত নয়—নুন-ভাতেও তৃপ্তি মিলত। তাদের মনের দিগন্ত ছিল সংকীর্ণ, তাতে মন-বলাকা অভিলাষের পাখা মেলার কল্পনাও করেনি। গৃহাশ্রিত হাঁস-মুরগির মতো কেবল কুটিরের চারধারেই দেহ-মনের খাদ্য খুঁজত। তৃপ্তি পেত খণ্ড ও ক্ষুদ্রের তুচ্ছ সাধনায়। বিপুল পৃথিবী, মনুষ্যত্বের বিরাট সম্ভাবনা তাদের থাকত অজ্ঞাত। বহু বিচিত্রভাবে প্রসারিত-পরিব্যাপ্ত জীবনের প্রসাদ লাভের স্বপ্নও জাগেনি মনে। তা তারা রেখে দিয়েছিল রাজপুত্রের অধিকারে। তাই বেকার মনের অবলম্বন হয়েছিল সমাজ, সংস্কার, শাস্ত্র ও স্বার্থ। তুচ্ছকেই উচ্চ করে ধরে তারা জীবনে স্বস্তি ও উত্তেজনা খুঁজেছে। পরশ্রীকাতরতা আর পর-পীড়নের মধ্যেই পেয়েছে প্রাণের সাড়া। ভূত-প্রেত, দেও-দানব, জীন-পরী-হুর কিংবা বিদ্যাধরী-অপ্সরা রচনা করেছিল তাদের মনের কোণে প্রীতি-ভীতির অপরূপ জগৎ। সে-জগতের প্রভাব ছিল তাদের প্রাত্যহিক জীবনে। তাদের বাহ্য আচরণে ও মানস অভিব্যক্তির মধ্যে দেখা যেত সে-জগতের ছায়া।

কৌতূহলী মানুষের অনবরত অনুশীলনের ফলে জ্ঞানের পরিধি গেছে বেড়ে। বৈজ্ঞানিক অবিষ্ক্রিয়ায় বিজ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে প্রবল। অজ্ঞতার অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে পড়েছে জ্ঞান ও যুক্তি-সূর্যের ঝলমলে আলো। অলৌকিকতার বিস্ময়জাত আকর্ষণ গেছে কমে। ভোগ্যসামগ্রী হয়েছে বহুবিচিত্র। পৃথিবী হয়েছে অনেক বড়। মনের দিগন্তের প্রসার হয়েছে অসীম। অভিলাষ হয়েছে গগনচুম্বী। বুভুক্ষু গরু যেমন চারণভূমির উন্নতশীর্ষ কচি-নধর ঘন ঘাস অনন্যচিত্তে অনবরত গিলতে থাকে, ভোগ্যবস্তুর আধিক্যে লুব্ধ এবং বৈচিত্র্যে মুগ্ধ আজকের মানুষও একান্তই ভোগকামী হয়ে উঠেছে। সেজন্যে একদিকে দেও-দানো-হুরপরী যেমন সে ছেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি পরিহার করেছে সংস্কার। অস্বীকার করেছে সমাজ ও শাস্ত্রবিধি। বৈরাগ্য ও ত্যাগের মহিমা হয়েছে ম্লান। আজকের পৃথিবীতে প্রাণ মেতে উঠবার, আবেগ উথলে উঠবার কারণ রয়েছে অনেক। এভাবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে গেছে বলে এ-যুগে ধর্ম আর প্রবর্তিত হয় না। ধর্মান্দোলন কিংবা ধর্মবিপ্লবের মাধ্যমে নেতৃত্বও মেলে না। তাই সে পথ হয়েছে পরিত্যক্ত। ভোগকামী মানুষের চিত্তহরণের নবতর পন্থাও হয়েছে আবিষ্কৃত। সে-পথেই জনচিত্ত জয় করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব। ধন-বন্টন নীতি ও শাসন রীতি সম্পর্কিত নব নব পরিকল্পনা তৈরি করে, সম্পদ উপভোগ তত্ত্বের চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়ে, কিংবা দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার তত্ত্বের মানস-অনুশীলন-লব্ধ যুক্তিবুদ্ধি-অনুগ বিশ্লেষণ-চাতুর্যে জনমন মুগ্ধ করে, দেশে কালে ও সমাজে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ অসাধ্য নয় আজও। আগে যা ধর্মের নামে পাওয়া যেত, আজ তা Ism-এর দোহাই দিলে মেলে। লক্ষ্য ও ফল অভিন্ন। কেবল পরিবর্তিত পরিবেশে নতুন পদ্ধতি ঠাঁই নিয়েছে, কলাকৌশলের রূপান্তর ঘটেছে।

আসলে গোড়া থেকেই মানুষ এ জীবনকেই চরম বলে জেনেছে, এ পৃথিবীকেই ভালোবেসেছে। পার্থিক জীবনকে নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন করবার জন্যেই জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা-বাঞ্ছায় মানুষ জাদুতে বিশ্বাস রেখেছে, দেও-দানো-ভূত-প্রেত মেনেছে, দেবতা এবং অপদেবতার পূজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, গড়েছে সমাজ ও শাস্ত্র। কল্পনা করেছে ইহ ও পরলোকে প্রসারিত জীবন। স্বীকার করেছে আত্মার অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব। সৃষ্টি করেছে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, নিয়ম-নীতি-সত্যের ধারণা। এই জীবনের প্রয়োজনই কর্মপ্রচেষ্টা ও ধর্ম-প্রেরণার ভিত্তি। এ কারণেই ভূতে ও ভগবানে মানুষের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের উৎস অভিন্ন। ক্ষতি স্বীকারে অনিচ্ছুক বাঞ্ছাসিদ্ধিকামী অসমর্থ মানুষ কাকেও অবহেলা করতে পারে না। জানে না কিছুই তাচ্ছিল্য করতে। চিরন্তন সুখ-লোভী, দুঃখ-ভীরু মানুষ তাই স্বর্গের স্থায়ী সুখের লোভে স্বল্পকালীন পার্থিব জীবনের বঞ্চনা-দুঃখকে সহজে বরণ করার নির্বোধ প্রয়াসেও তৃপ্ত। আবার অসংযত অপরিণামদর্শী মানুষ সমাজের নিন্দা, রাষ্ট্রের শাসন ও পাপের শাস্তি অবহেলা করে বিধি-বহির্ভূত কাজ করে এই সুখের লোভেই।

এজন্যেই আদিম জাদুবিশ্বাস থেকে আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধি অবধি মানুষের সব বিস্ময়, কল্পনা, চিন্তা ও জ্ঞানের সম্পদ মানুষ সযত্নে লালন করেছে, কিছুই পরিহার করেনি। সীমিত শক্তির মানুষ কোনোটাই তুচ্ছ বলে হেলা করে না। তুক-তাক-দারু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-পূজা-অর্চনা প্রভৃতি থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবধি তার কাছে সবকিছুর সমান মূল্য-মর্যাদা। সে গরজ বুঝে সবকিছু সমভাবে কাজে লাগায়, সমান আগ্রহে মেনে চলে। এজন্যেই জগৎ ও জীবন ব্যাপারে তার মননে ও সিদ্ধান্তে, ধ্যানে ও ধারণায় কোনো যৌক্তিক পারম্পর্য নেই— কার্যকারণ বোধের অবিচ্ছিন্ন সূত্র নেই। এ কারণেই তার মুখের বুলি আর বুকের বিশ্বাসে ঐক্য নেই। উক্তিতে ও আচরণে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের প্রয়োজনেই সে সৃষ্টির মূলে— জগৎ ব্যাপারে দ্বৈততত্ত্ব মানে। ভালো-মন্দ (dualism-good & evil) শক্তির টানাপাড়নে যে জগদযন্ত্র বোনা, এর দ্বারা যে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত, তা সে জরথুস্ত্রীয়দের মতোই বিশ্বাস করে। যদিও তার উচ্চমার্গের মননশক্তির মহিমা ক্ষুণ্ন হবে বলে, সূক্ষ্মচিন্তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে আশঙ্কায়, তা সে উচ্চারণ করে না। তাই মানুষ মুখে বলে আল্লাহর হুকুম ছাড়া বালিও নড়ে না, আবার অপকর্মের জন্যে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করে। সে বলে—বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। কিন্তু বিপদে ফেলেছিল কে?—সে-প্রশ্ন উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। কেউ বলে—দুঃখ দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে, রোগ-শোক দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন! কিন্তু সে-পরীক্ষা কেন, কিসের জন্যে, তাতে আল্লাহর লাভ ও উদ্দেশ্য কি, এ পরীক্ষার নিয়ম কি, মান কি? কশাইখানায় রোজ এত পশু অকালে প্রাণ হারায় কোনো অপরাধে? রোজ কোটি কোটি ডিম ভ্রূণ নিহত হয় কোনো পাপে? এ কার পরীক্ষা?— এসবের উত্তর নেই। সবটা মিলে একটা মস্তবড় গোঁজামিল, এক বিরাট ফাঁকির ফাঁদ, একটা সাজানো অপরূপ মিথ্যা, এক গোলকধাঁধা—দিশাহারা মানুষ কেবলই দিশা পাওয়ার জন্যে আলোর কামনায় অন্ধকারে ছুটাছুটি করছে! এরই নাম অন্তর্জীবন লীলা। এ এক মায়ার খেলা। এর রূপ-রস-জৌলুস মোহ জাগায়। এক আনন্দিত উন্মুখতায় জীবন কেটে যায়। এজন্যেই ধর্মবোধের মৃত্যু নেই।

বাসনা-আসক্ত মানুষের দুর্বলতায় এর জন্ম। প্রাপ্তি লোভী মানুষ এ দুর্বলতা থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। কেননা সে বাঁচতে চায়, নিরাপত্তা চায়, চায় সুখ-স্বস্তি-আনন্দ— যা তার আয়ত্তের মধ্যে নয়, সামর্থ্যের ভেতরে নয়। তাই অলৌকিক উপায়ে সে তার বাঞ্ছাসিদ্ধি কামনা করে। তার আত্মপ্রত্যয়হীন অসহায়তার মধ্যেই সৃষ্টি-পালন-সংহার কর্তার স্থিতি। অতএব পার্থিব জীবনের কল্যাণ কামনায় ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার বিকাশ আর দুর্বলের স্বস্তি-কামনায় তার চিরায়ু। বিপদে-আপদে রোগ-শোকে অপ্রাকৃত শক্তির অদৃশ্য হস্তের করুণা তার চাই-ই। তা যুক্তিগ্রাহ্য নাই বা হল, নাইবা হল বাস্তব। জ্ঞানের দ্বীপে দাঁড়িয়ে অসীম অজ্ঞতা-সমুদ্রের কী ধারণা করা যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের নাগরিক

মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যে এবং বিবর্তনবাদে বিশ্বাস না করলে আজকের দিনে মানবসমাজের কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ ছিল সর্বব্যাপারে অজ্ঞ। অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাব ছিল একান্ত। ফলে মনুষ্য- সাধারণের সর্বাত্মক জাগতিক ব্যাপারের বিধাতা ও নিয়ন্তা ছিল গোত্রাধিপতি নামের বিজ্ঞতর ব্যক্তি। সেকালে সে-অবস্থায় সর্বপ্রকার বিশ্বাসের এবং বিধান ও সমাধানের মূলে ছিল অপটু বুদ্ধি, অস্পষ্ট চিন্তা ও অন্ধ কল্পনা। সুতরাং সেকালে জনসাধারণের আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কারের উৎস ছিল বহিরারোপিত বিধি-নির্দেশ—অন্তরাহৃত আস্থা নয়, বুদ্ধিলভ্য বোধিজাত উপলব্ধিও নয়। অতএব সেকালে মানুষ চালিত হত বহির্নির্দেশ জাত সংস্কারগত বিশ্বাসে— বিবেক লব্ধ বা নিরীক্ষিত প্রত্যয়ে নয়।

কালের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের বিবেকের বিকাশ হয়েছে, অভিজ্ঞতার পরিসর হয়েছে বিস্তৃততর, প্রত্যয় ক্রমে ক্রমে মন্থরগতিতে আঘাত হেনেছে সংস্কারলব্ধ বিশ্বাসের মূলে। কল্পনার অপরিসীম রাজ্য বাস্তববোধের প্রসারের সাথে সাথে সংকীর্ণতর হয়ে এসেছে। কিন্তু যেমনি করে বলছি, ঠিক তেমনি কিছু ঘটেনি। নতুন-পুরাতনের সংঘাত লেগেছে বারবার, বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মনে, জীবনে ও আদর্শে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিস্তর, তবু লাভ হয়েছে প্রচুর, অগ্রগতি রয়েছে অব্যাহত—যদিও তা কখনো মন্থর, কখনো দ্রুত, কোথাও চরমে, আবার কোথাও বা পরমে, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ধারায় তা গতি নিয়েছে।

কিন্তু অশিক্ষার প্রতিকূলতায় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রবিশেষ প্রশস্ত হতে পারেনি আধুনিক-পূর্ব যুগে। কল্পনা-ঘুড়ির রঙিন সূতো তখনো আমাদের মনের মুঠোয়। বহিরারোপিত বিশ্বাস-সংস্কারের চশমার মাধ্যমে জগৎ ও জীবন তখনো পোশাকিরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। সত্য ও মায়া, বুদ্ধি ও কল্পনা, কায়া ও ছায়া, বাস্তবতা ও আদর্শবাদ, প্রবৃত্তি ও নীতিবোধ প্রভৃতির চিত্তবিভ্রান্তকারী সংমিশ্রণে মানুষের জীবন স্বপ্নালু ও রহস্যময় হয়েছিল। জাগর ও স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা—আচ্ছন্ন মনের পক্ষে ছিল একান্ত দুঃসাধ্য। বাস্তবেতর বাস্তব, জগতেতর জগৎ, জীবনেতর জীবন, সুখ-দুঃখেতর সুখ-দুখ ধূলিমাটির দুনিয়াকে আর ভোগ-তৃষ্ণার দেহকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিতে দেয়নি মানুষকে। তাই এতকাল, মানুষ শুধু ধর্মনির্ভর ছিল অর্থাৎ বহিরারোপিত বিধিনিষেধের পরিসরে বিচরণশীল ছিল। বিবেকের আহ্বানে, জীবনের সহজ চাহিদায় দ্বিধাহীনচিত্তে অকুণ্ঠ ও নিঃসংকোচ সাড়া দিতে সাহস পায় নি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে সে-কাহিনী। বঞ্চনা, ছল-চাতুরী, নরহত্যা, যুদ্ধ, নিপীড়ন, শাসন-শোষণ, আচার-বিচার-বিতর্ক, দান-সাহায্য, সত্য-মিথ্যা, হিংসা-দ্বন্দ্ব, ন্যায়-নীতি, লাভ-ক্ষতি সবকিছুই ব্যাখ্যাত, প্রচারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ধর্মের নামে। এখানে আল্লাহ দণ্ডধারী মহাশাসক—মানুষ ধর্মকলের প্রত্যঙ্গ (parts) বিশেষ। যা ঘটে আল্লাহই ঘটান, যা হয় এমনিতেই হয়। যুক্তি নেই, কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তবে নিয়মও আছে, নিয়তিও আছে। কিন্তু নিয়মের চেয়ে নিয়তির শক্তিই প্রবল।—এই বিশ্বাস-সংস্কারের আওতায় গড়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম, সমাজ ও রাজ্য। এই ভিত্তিতেই পেয়েছি শিক্ষা, আদর্শবোধ এবং ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য ও লাভ-ক্ষতির সংজ্ঞা। এখানে আছেন প্রভু আল্লাহ আর মানুষ বান্দা— চালক আর চালিত, যন্ত্র আর যন্ত্রী। এখানে মানুষের আর কোনো পরিচয় নেই। আর একটুর আভাস আছে, তা হচ্ছে কলুর বলদের অবাধ্যতা—মানে প্রভুর নির্দেশে বাঁধা-চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে থেমে যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার প্রসারে অনুশীলনের প্রাচুর্যে মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে নানাদিকে। বহির্জীবনে এবং মননে নব নব আবিষ্ক্রিয়া মানুষের মন ও মননকে একান্তভাবে বিজ্ঞানমুখী, যুক্তিনির্ভর ও বিবেকানুগত করে তুলেছে। বর্বর যুগে যে রঙিন চশমা মানুষ ও জগৎ জীবনের মধ্যে ব্যবধান বাঁচিয়ে রেখেছিল, তা হঠাৎ ঘুচে গেছে। জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ উপলব্ধি করছে আপন সত্তা, প্রত্যক্ষ করেছে ধূলামাটির দুনিয়াকে, চিনে নিয়েছে প্রবৃত্তি সমন্বিত জীবনের যথার্থরূপ। কল্পনা-ঘুড়ির সূতা ছিঁড়ে গেছে, ধসে গেছে সংস্কারের অন্ধকার গৃহের প্রাচীর। বহিরারোপিত বিশ্বাসকে বিতাড়িত করে তার জায়গা দখল করেছে যুক্তি ও যাচাই-নির্ভর প্রত্যয়। মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকৃতি পেল। আল্লাহ মানুষকে শক্তিও দিয়েছেন, সামর্থ্যও দিয়েছেন। ধর্ম-কলের প্রত্যঙ্গ নয়, মানুষ একটি সত্তা—আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি—আল্লাহ্‌র প্রতিভূ স্রষ্টা! 'নিয়তি' নেই, শুধু 'নিয়ম' আছে। আর কারণ, নিরপেক্ষ কার্য অসম্ভব।

আল্লাহ শুধু দুনিয়ার অন্য যাবতীয় বস্তুর মালিক নয়, মানুষেরও মালিক। গোটা দুনিয়া সৃষ্টিরই (জড়-জীব) বিহার, বিলাস ও ভোগ ক্ষেত্র—শুধু মানুষের একার নয় এবং জড়-জীব পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব, আদর্শ হোক—Live and let live (বেঁচে থাক এবং বাঁচতে দাও)। ধর্ম হোক—বিবেকের নির্দেশ ও যুক্তিবোধ।—আজকের মানুষের প্রাণের কথা এ-ই। অর্থাৎ এতদিন আমরা বহিরারোপিত ধর্মে চালিত হয়েছি। কিন্তু সমাজে সম্পদে আদর্শে বিশ্বাসে সংঘাত এড়াতে পারিনি। শান্তি দিইওনি, পাইওনি। এবার অন্তরাহৃত ধর্মের নির্দেশে চলা যাক! এবার সিদ্ধি সুনিশ্চিত, কেননা বিবেক প্রতারিত করে না। সুতরাং বহিরারোপিত ধর্মচালিত পূর্বযুগের মানুষের আচার-সংস্কার-আদর্শ-ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি মোহ শুধু মানুষের মনের তমিস্রাকে গাঢ়তরই করবে। সেই অন্ধকারে মানুষের সহজ মনুষ্যত্ব শুধু পথ হাতড়িয়ে ব্যর্থ হবে, মুক্তি পাবে না। পূর্বযুগের গোত্রীয়, ধর্মীয় ও জাতীয় কারার বন্ধন থেকে মানুষকে আজাদ করে নীল আকাশের নিচে নরম মাটির উপর মহামিলনের মহায়োজন করাই হচ্ছে আজকের মানুষের একমাত্র উদযাপনযোগ্য ব্রত। মানুষের সংস্কৃতির, সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও আদর্শের রূপ হবে একটি—তা মানবতা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আজো যারা সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, ধর্মে-আদর্শে, সমাজে-সম্পদে স্বাতন্ত্র্যের কামনা-সাধনা করে তারা মানবতার শত্রু! কারণ— ধর্ম, সমাজ আর সংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনার উপায় ও পন্থাস্বরূপ। এগুলো উপলক্ষ মাত্র—সিদ্ধি নয়, সুতরাং ব্যক্তির পরম ও চরম পরিচয় সে মানুষ। তার অবশ্য দেশ আছে, কাল আছে কিন্তু সে-সব তার পরিচয়বাহী নয়। যারা লক্ষ্য হারিয়ে উপলক্ষ নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি করে তারা শুধু হিন্দু, শুধু মুসলমান অথবা শুধু খ্রীস্টান— কিন্তু মানুষ নয়। মনুষ্যত্বের সাধনা তাদের নয়— মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেহাদের স্বরূপ

কী করে কখন থেকে যে 'জেহাদ' কথাটির অর্থ অমুসলমানের কাছে বিকৃত হয়ে গেছে, তার দিন-ক্ষণ নির্ণয় করা সহজ নয়। 'জেহাদ' বলতে তারা বিধর্মী-বিধ্বংসী মুসলিম বর্বরতাই বোঝে। এ বিরূপতা আজকের উন্নতমনা সংস্কৃতবান তরুণ-মনেও কিছুটা জেগেছে, বিজাতি প্রভাবে তারাও মুজাহিদ বলতে আসুরিক উত্তেজনা-সর্বস্ব ধর্মোন্মত্ত খুনীই বোঝে। এ নিশ্চিতই দুর্ভাগ্যের কথা।

কেননা ' জেহাদ' মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অংশ। সেজন্যে জীবনের আর আর ব্রতের মতো জেহাদও তাদের সময়োচিত ব্রত। কথাটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ইসলাম হচ্ছে প্রথমত এবং প্রধানত মানুষের পার্থিব জীবনের ব্যবহার বিধি। এর মধ্যে কোনো জটিলতা কিংবা অধ্যাত্ম-রহস্য নেই। 'দ্বৈতবাদ'ই ইসলামের শিক্ষা : স্রষ্টা ও সৃষ্টি কেবল যে আলাদা তা-ই নয়, মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্কও হচ্ছে বান্দা-মনিবের। বান্দার কাছে মনিবের নিজের জন্যে কিছুই কাম্য নেই। তিনি চান মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার এমন হবে, যাতে কেউ কারো দুঃখ-বেদনা ও ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি কোনো মর্ত্য-মানবের কোনো নালিশ না থাকে, তাহলে সে নিষ্পাপ। আল্লাহর কাছে তার জবাবদিহির আর কিছুই থাকে না। ইসলামে বিশ্বাসের (ইমানের) সঙ্গে সৎকর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যা তোমার নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা তোমার ভাইয়ের জন্যেও কামনা করো না। 'বেঁচে থাকো বাঁচতে দাও, ভালো চাও, ভাল কর'—এই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। কোরআনের সর্বত্র পার্থিব জীবনে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পারস্পরিক ঘরোয়া ও সামাজিক ব্যবহারের বিধিনিষেধই নির্দেশিত হয়েছে। অতএব ইসলাম মুখ্যত ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনবিধি (code of life) । জেহাদও এ বিধির অন্যতম অঙ্গ। পার্থিবতাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্বও এখানেই।

এবার আমরা জেহাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। যে-কোনো আদর্শবাদের জন্যে সংগ্রামই জেহাদ। এ যুগে 'ism' -গুলো যেমন এক-একটি রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ, পার্থিবতা-প্রধান ইসলামও তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজ বিধান। তফাৎ এই, ইসলামে সার্বভৌম-শক্তি মানুষ নয়—আল্লাহ। এ যুগে হলে তা' আল্লাহবিহীন একটি উৎকৃষ্ট 'ism' হতে পারত। খ্রীস্টধর্ম বা ইসলাম কার্যত সেকালীন রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রও বটে, নইলে পোপ ও খলিফা প্রতিষ্ঠা পেতেন না। আল্লাহর দোহাই কাড়া হলেও আল্লাহ পার্থিব জীবনে দেখাজানার বাইরে। কাজেই আল্লাহ নির্দেশিত বিধিনিষেধ আচরণে পালন করতে ও করাতে হলে রাজার বা রাষ্ট্রের অনুমোদন ও সহায়তা প্রয়োজন। এ কারণেই 'দারুল হরব' মুসলমানের কাছে বিভীষিকা স্বরূপ, এবং 'দারুল হরব' থেকে সম্ভব হলে হিজরত করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে এ অসুবিধের কথা বিবেচনা করেই।

ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো প্রায় অভিন্ন। ধর্মে যা নিষিদ্ধ, রাষ্ট্রে তা বেআইনি এবং সমাজে তা-ই গর্হিত। কাজেই ধর্মে যা পাপ (Sin), রাষ্ট্রে তা-ই অপরাধ (Crime) এবং সমাজেও তা-ই অবাঞ্ছিত কু-আচার (Vice)। অতএব মুসলিম জীবনে নামাজ, রোজা, জাকাত, সত্যকথন, ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবশ্যিক আচার—ব্যক্তিগত নয়; তেমনি মহাজনী, মিথ্যাচার, নামাজ-রোজা-জাকাতে অবহেলা, লাম্পট্য, বেশ্যাবৃত্তি, অপব্যয়, নাচ-গানও একাকারে সমাজ ও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্ম—ব্যক্তিক অনাচার নয়। কেননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামী বিধানে সমাজভুক্ত মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তিক (Private বা Personal) খেয়ালখুশির তথা স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ বিশেষ নেই। এ যেন People for the Society and State for the Society. যেহেতু মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার-বিধির উপরই সমাজ গড়ে উঠেছে, সেহেতু ব্যক্তিক আচরণে যদি সমাজনীতির মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং রাষ্ট্রসংস্থাও যদি সমাজ-বিধি কার্যকর রাখতে সহায়তা করে, তা হলে কোনো মানুষই মানবিক জুলুমের কবলে পড়ে না। এমনি অবস্থাটা democratic right-এর পূর্ণতার ও পূর্ণ উপভোগের অবস্থা।

কাজেই ইসলামী ধারণায় সমাজই হচ্ছে জনজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় এবং রাষ্ট্রসংস্থা সেই সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার 'অছি'। ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তার জন্যেই ব্যক্তির পক্ষে সমাজানুগত্য আবশ্যিক হয়ে উঠে, আর ব্যক্তি-জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্যেই সমাজের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা রক্ষাই রাষ্ট্র-সংস্থার একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ-যুগের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকামী গণধর্মীদের কাছে এমনি ধরনের সমাজ-গুরুত্ব অশ্রদ্ধেয় হওয়ারই কথা। তাই কথাটি বিশদভাবে বলার চেষ্টা করা যাক।

সমাজভুক্ত কোনো মানুষেরই ব্যক্তিগত (Private বা Personal affairs) বিষয় বা ব্যাপার বলে কিছুই থাকতে পারে না। আমার পার্শ্ববর্তী লোকটির যদি চোখে পিচুটি, নাকে শ্লেষা এবং ঠোঁটে ঘা থাকে, তাহলে তা আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে আমার কক্ষ-সাথীর যদি যক্ষা থাকে তা আমার সর্বক্ষণের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আমার প্রতিবেশীর ঘরে যদি কলহ্-কোঁদলের চেচামেচি চলে তাহলে তা আমার শান্তির বিঘ্ন হয়ে উঠে। আমার পাশের বাড়িতে যদি কেউ গান গায় তা আমার চিত্ত-প্রশান্তি আনে। আমার সামনের অপরিচিত লোকটি চুলে যদি সুগন্ধ তেল কিংবা গায়ে সেন্ট মাখে, তাহলে তা আমার চিত্ত-প্রসন্নতার অবলম্বন হয়, রূপবান কিংবা শ্রদ্ধেয় গুণবান ব্যক্তির সান্নিধ্য আমার আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ হয়; তেমনি কুৎসিত, ইল্লত ও নির্গুণ লোক আমার চিত্তবিকার ঘটায়। এমনিভাবে কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা, আবেগ-উদ্বেগ, স্বস্তি-বিচলন, শান্তি-শঙ্কা, প্রীতি-ভীতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে অপর মানুষের অস্তিত্ব ও নিঃসম্পর্ক আচরণ। কাজেই যে-কোনো সমাজভুক্ত মানুষের অস্তিত্ব ও আচরণের অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া রয়েছে অপর মানুষের দেহ-মন-আত্মার উপর। এ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যে পারস্পরিক তা না বলেও চলে। অতএব মনুষ্যসমাজে individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তেমন কোনো স্থানই নেই। যদিও এ-যুগে আমরা অতিপ্রগতি ও সংস্কৃতিচর্চার নামে এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক আচরণে স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রসংস্থায় এর উপরই আত্যন্তিক গুরুত্ব দেয়ার রেওয়াজই যে কেবল চালু হয়েছে তা নয়, সংস্কৃতিচর্চার প্রথম পাঠ হিসেবে এদিকে লোক-প্রবণতাও বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। এজন্যে পুরোনো চারিত্রিক ও সামাজিক নীতিবোধ বদলাতে হয়েছে। কেননা সমাজ-শাসনের অনুপস্থিতিতে স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচারের (শব্দার্থে ব্যবহৃত) অধিকারের ভিত্তিতেই ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিমাপ হয়। ফলে জীবনের ও আচরণের মূল্যবোধে হেরফের দেখা দিয়েছে; তাতে পুরোনো উচ্চ হয়েছে তুচ্ছ, আবার তুচ্ছ পেয়েছে উচ্চের মর্যাদা, মহৎ হয়েছে মামুলি, বৃহৎ পাচ্ছে তাচ্ছিল্য। আবার আগেকার দিনের কাচ এ-যুগে কাঞ্চন মূল্যে বিকোচ্ছে।

অনেক তুচ্ছ নীতি, আদর্শ ও আচরণ একালে মাহাত্ম্যে ও মহিমায় উজ্জ্বল ও আরাধ্য হয়ে উঠেছে। ভালো হল কি মন্দ হল তা অন্য তর্ক, তার হিসেব আলাদা। আমাদের বক্তব্য : যে গুরুত্ব ও মর্যাদা সমাজেরই একচেটিয়া ছিল, তা এ- যুগে ব্যক্তির উপর আরোপিত হওয়ায় আমাদের জীবনের জমা-খরচের খাতা পালটাতে হয়েছে। হিসেবের পদ্ধতিও হয়েছে বদলাতে। আগে ছিল সমাজের জন্যই ব্যক্তি ও রাষ্ট্র। এখন হয়েছে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, আর সমাজ পেয়েছে বড়জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Club-এর মর্যাদা—এর অপরিহার্যতা এ-যুগে আর স্বীকৃত নয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার-বাঞ্ছারূপ আত্মরতির ছিদ্রপথে সমস্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা গিয়ে বর্তেছে রাষ্ট্রসংস্থার উপর। যার ফলে 'Ism'-প্রবণ জনগণ রাষ্ট্রসংস্থাকে পছন্দসই 'Ism' অনুগ করতে গিয়ে জান-মাল রাষ্ট্রদানবের পদমূলে কোথাও বিকিয়ে দিয়েছে, কোথাওবা বন্ধক রেখেছে, আবার কোথাওবা স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে—ধন্যও হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যাক, রাশিয়া-চীনে যারা কম্যুনিস্ট তাদের একটি দল কোসিগিন কিংবা চৌ-এন-লাইকে তাদের ব্যক্তিক আচরণের জন্যে পছন্দ করছে না, অথচ সরাবার-তাড়াবার সাধ্যিও তাদের নেই। কাজেই তারা মনে মনে রাষ্ট্র প্রধানের উপর বিরূপ এবং ক্ষুব্ধ। এমনি অবস্থায় কোনো-অকম্যুনিস্ট যদি কোসিগিন-চৌ-কে তাড়াতে এগিয়ে আসে, তখন ঐ বিরূপ বিক্ষুব্ধ দলের ভূমিকা কী হবে? তারা কি তখন অকম্যুনিস্টের বিরুদ্ধে জান-মাল পণ করে রুখে দাঁড়াবে না? তাদের কাছে তাদের আদর্শবাদ যেমন প্রাণপ্রিয়, মুসলমানদের কাছেও তাদের সমাজাদর্শ তেমনি অপরিত্যাজ্য। এজন্যে মুসলমান কেবল খলিফাতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্যেই নয়, অত্যাচারী মুসলিম রাজার রাজ্যরক্ষার জন্যেও অমুসলমান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম করবে। কেননা মুসলিম শাসনে মুসলমানের যা আবশ্যিক সামাজিক ও নাগরিক আচরণ তা অমুসলিম শাসনে ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক আচরণের রূপ পায়। যেমন পাপের ভয় যে মুসলমানের নেই, সে ইচ্ছা করলেই সুদখোর হতে পারে, জাকাত দেয়া বন্ধ করতে পারে, জুয়াড়ি হতে পারে, সামাজিক সাম্যে আস্থা হারাতে পারে, বৈষম্যের অবাঞ্ছিত ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে। এক কথায় সে যে-কোনো বে-ইসলামী কাজ ও আচরণ করতে পারে। তা ছাড়া মুসলিম শাসনে ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমান সাম্যভিত্তিক ইসলামী সমাজের যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পেত, বৈষম্য-কণ্টকিত বিধর্মী সমাজের কোনো শাসকের অধীনে সে-যুগে তা ছিল কল্পনাতীত।

মুসলিম সমাজে ব্যক্তিক জীবনের ও জীবিকার নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়েছে রসুলের নির্দেশে—'এক মুসলমানের ধনপ্রাণ অপর মুসলমানের পক্ষে পবিত্র। এবং মুসলমানরা পরস্পর ভাই ও বন্ধু। স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো আর দাসের প্রতি সদয় হও এবং নিজের মতো করে তার খোর-পোষ দাও।' তাই মুসলমান বিধর্মী শাসনের আশঙ্কায় বিচলিত হত। কেননা সে জানত এর ফলে তার নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবনে নিশ্চিতই বিপর্যয় আসবে! কাজেই যে-ইসলাম একান্তভাবে সমাজ-কাঠামো ভিত্তিক, তা এভাবে লোপ পেতে পারে। এই সমাজ-গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্যেই মুসলমানের পক্ষে মুসলিম শাসক আবশ্যিক। তাই জেহাদ মাত্রই আত্মরক্ষা বা প্রতিরোধমূলক (Defensive & Resistive)। জেহাদ আক্রমণাত্মক (Offensive or Aggressive) হতেই পারে না। এ অর্থেই জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের হয়ে সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

জেহাদ মুসলমানের সামাজিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা মুজাহিদের ভাব জিইয়ে রাখা মুসলমানের ঈমানের অঙ্গ। এ অর্থে মুমিন মাত্রই মুজাহিদ। যে জেহাদ করে সেই মুজাহিদ, বেঁচে থাকলে হয় গাজী আর মরলে হয় শহীদ। 'Ism' আবর্তিত আজকের দুনিয়ায় আদর্শবাদী তথা মতবাদ-ধারী মানুষ মাত্রই মুজাহিদ। কেননা আদর্শের জন্যে ও ন্যায়ের পক্ষে যে-কোনো প্রকারের সংগ্রামের নামই জেহাদ। তবু জেহাদ শব্দটি ঘৃণ্য হয়ে আছে। এর মূল্য-মাহাত্ম্য এ-যুগে মনে হয় মুসলমানদের কাছেও নেই। অবশ্য এজন্যে মুসলমানেরা নিজেরাই দায়ী। কেননা মুসলিম শাসনেও ইসলামী বিধান অনুসৃত হয়েছে ক্বচিৎ আর রাজ্য-লোলুপ মুসলমান বাদশা-সুলতানেরা আত্মস্বার্থে আক্রমণাত্মক কাজে অর্থাৎ চড়াও হয়ে অপরের উপর হামলা ও জুলুম চালাবার জন্যেও অজ্ঞ-জনসাধারণকে জেহাদের ভাঁওতা দিয়ে উত্তেজিত করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অনেক অনর্থ ঘটিয়েছেন। তাই জেহাদের নামে এমন ত্রাস ও অবজ্ঞা। যা অভিনন্দিত ও মহিমান্বিত মহৎ ব্রত হতে পারত, তা-ই হল অবাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। তবু সমাজ-স্বার্থে নিত্য জেহাদ চাই। মুজাহিদ ছাড়া কে মানুষকে প্রাত্যহিক শাসন-শোসন-পীড়ন-পেষণ থেকে মুক্ত করবে, মুক্ত রাখবে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদন

মধুসূদনকে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট, আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসু, নবমানবতার উদ্গাতা আভিজাত্যগর্বী পরিশীলিত রুচির কবি এবং ধন-যশ-মান-লিপ্সু উচ্চাভিলাষী মানুষ বলেই জানি এবং মানি। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল অসামান্য, প্রয়াস ও সাধনা ছিল নিখাদ, আর আকাঙ্ক্ষা ছিল ধ্রুব। আকাঙ্ক্ষা তো নয় যেন যোগ্যতালভ্য দাবী! তাঁর অটল আত্মবিশ্বাসই তাঁর উদ্ধত উক্তি ও দাম্ভিক আচরণের উৎস। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর চাওয়া আর পাওয়া নিয়তির মতো অমোঘ। তাঁর এমনি আত্মপ্রত্যয় তাঁকে শিশুর মতো খেয়ালি, প্রাণবন্ত, বেপরওয়া ও উদ্ধত করেছিল। আমাদের চোখে যা অবিমৃষ্যকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা, তাঁর কাছে তা-ই ছিল লক্ষ্য-নির্দিষ্ট অকৃত্রিম জীবন-প্রয়াস। তাঁর সীমাহীন আত্মপ্রত্যয় তাঁকে নিশ্চিত সিদ্ধির যে প্রত্যক্ষ-মরীচিকায় নিশ্চিন্ত রেখেছিল, উত্তর-তিরিশে তা যখন নিয়তির ছলনারূপে প্রতিভাত হল, তখন হতাশায় ও হাহাকারে তাঁর মন-মরু কুঁকড়ে কেঁদে উঠল! তারই প্রতিচ্ছবি পাই আমরা তাঁর অমর কাব্যে ও রাবণ চরিত্রে।

পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট ইয়ংবেঙ্গলের ঐহিক জীবনবোধ ও পুরুষকারের বিঘোষিত মহিমার প্রতিমূর্তি ছিলেন মধুসূদন। আর তাঁরই প্রতিচ্ছবি হলেন রাবণ। কিন্তু এই পুরুষকারের মূল আত্মায় নয়, আত্মম্ভরিতায়। কেননা পাশ্চাত্য জীবনবোধে ভুঁইফোড় মধুসূদনের চেতনায় পৌরুষ, ঐশ্বর্যগর্ব ভোগলিপ্সা স্থূল ও অমার্জিতই রয়ে গেছে; তাঁর জীবনে কিংবা কাব্যে তা সূক্ষ্ম ও পরিস্রুত রুচি বা রসবোধে পরিণত হয়নি বরং দাম্ভিকতায় তার প্রকাশ এবং হতবাঞ্ছার হাহাকারে ঘটেছে তার পরিণতি।

এ কেন এবং কেমন করে ঘটল, তা-ই বুঝবার চেষ্টা করা যাক। সুরুচি ও সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষা, শীল ও চর্যার প্রসূন। কাজেই তা জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হয়, বাইরে থেকে জুড়ে দিলে চলে না। প্রতীচ্য শিক্ষার মাধ্যমে ভারত-ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও মিলন-মুহূর্তে মধুসূদনের জন্ম। ইংরেজের মহিমামুগ্ধ পিতার সন্তান, কোলকাতাবাসী ইংরেজি-পড়ুয়া মধুসূদন আবাল্য প্রতীচ্য সংস্কৃতির রূপে মুগ্ধ। দেশী জীবনবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই নতুন-দেখা সংস্কৃতির সাদৃশ্য সামান্যই। কৈশোরেই মধুসূদন এই সংস্কৃতির পূজারী হলেন বটে কিন্তু যে-পরিবেশে কোনো সংস্কৃতি রক্তের-সংস্কারে পরিণত হয়; আজন্ম লালনে অনুভূতিসিদ্ধ অপরিহার্যতায় পরিণতি পায়; দেখে-শেখা ও পড়ে-পাওয়া সংস্কৃতি সে পরিবেশ পায় না, তেমনিভাবে আত্মস্থও হয় না, তা আভরণের মতোই আলগা থেকে যায়, ত্বকের মতো অঙ্গীভূত হয় না। একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। কোনো অশিক্ষিত বা অশিক্ষিত-পরিবেশে লালিত অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি যদি ঠিকেদারী কিংবা ব্যবসা করে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়, তাহলে সেও দেশের সংস্কৃতিবান ঐশ্বর্যশালী অভিজাতের মতো করে দালান-কোঠা তৈরি করে, আসবাবপত্র সাজিয়ে, বাগান-ফোয়ারা বানিয়ে চিত্র ও ভাস্কর মূর্তি রেখে সুরুচি ও আভিজাত্যবোধের প্রতিযোগিতায় নামে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে বিস্তর, একের পক্ষে যা আজীবন চর্চার অঙ্গ, অপরের পক্ষে তা বিলাস-বাঞ্ছার ও গৌরব-গর্বের সামগ্রী। একজনের যা আত্মোত্থিত, অপরজনের তা বহিরার্জিত। একে করে অন্তরের প্রবর্তনায়, অপরজনে গড়ে ঐশ্বর্য-শালিতার আস্পর্ধায়। একজনের দৃষ্টি অন্তর্মুখী, অপরজনের নজর বহির্মুখী!

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চায় মধুসূদন এই অপরজন। কেননা, ইংরেজের সংস্কৃতিতে কেবল ইংরেজেরই অধিকার। এ তার পুরুষানুক্রমিক সাধনায় পাওয়া ধন, এ তার স্বরূপেরই বিচিত্র বিকাশ। এতে তারই আত্মার ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম প্রকাশ। এ তারই দেহ-মন-আত্মার লাবণ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধ জীবনসত্য, এ কেবল তারই অঙ্গের লাবণ্য বাড়ায়, কেবল তারই চলন-বলন ও মননে শোভা পায়। এ তার নৈষ্ঠিক জীবনচর্যার প্রসূন। কাজেই এতে মধুসূদনের উত্তরাধিকার ছিল না। তিনি হলেন usurper—জবর দখলকার। এ সংস্কৃতির মর্মে অধিকার ছিল না তাঁর। কেবল অবয়বে মালিকানা পেয়েই তিনি বাহ্যাড়ম্বর ও আত্মম্ভরিতাকে আভিজাত্য প্রকাশের বাহন করলেন। তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল বহির্মুখো। অন্তরের ঐশ্বর্যের মূল্য-মাহাত্ম্য তাঁর বোধে ধন-সম্পদের কাছে ম্লান। এজন্যে তিনি তাঁর জ্ঞান-মনীষা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের কাঞ্চন-মূল্যের প্রত্যাশী ছিলেন। পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদের যে ব্যবহারিক দাপট, তা-ই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কিংবা মনীষার জন্যে মানুষের অন্তরে ব্যক্তিবিশেষের জন্যে যে শ্রদ্ধার পুষ্পাসন রচিত হয়ে থাকে, তা যে অসামান্য ও অতুল্য, সে তত্ত্ব তাঁর মনে জাগেনি। তাই ধনীর প্রতি ছিল তাঁর ঈর্ষা আর সাধারণের জন্যে ছিল তাঁর অনুকম্পা ও অবজ্ঞা। ছাত্রজীবনে মাঝারি ছাত্রের সঙ্গেও তিনি মিশতেন না। আবার মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে মেশার দীনতা-সূচক আগ্রহ ছিল তাঁর তীব্র। কবি হবেন—এ বাসনা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে বড় কবি হব—এ আকাঙ্ক্ষা মনে রাখা নয়, কথায় ব্যক্ত করা হল সেই বহির্মুখো দৃষ্টিজাত ঔদ্ধত্য। 'আমি কবি হব' এই বাসনা প্রকাশে বাধা নেই, কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের চাইতে বড় কবি হব, এ উক্তি কেমন শোনায়,—কোনো অর্বাচীন-অবিমৃষ্য-অসংযত মনের পরিচয় দেয়!

'সাহেবের দোকানে চুল কাটিয়েছি এক মোহর দিয়ে', 'রাজনারায়ণের ছেলে গুণে পয়সা দেয় না।' দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা দেখে— 'বড়লোকের ছেলে তাই ...' রাজকবি টেনিসনের মর্যাদা দেখে রাজকবি হওয়ার স্বপ্ন ও প্রয়াস, সাহেবপাড়ায় বাস করার জেদ, সাধারণ লোককে অনুগৃহীত করার আগ্রহ, পড়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও কড়িতে বড় হওয়ার অস্থির প্রয়াস, ছোটলোকের কাছে বড়পনা ফলানোর জন্যে ধনী বন্ধুর কাছে কাঙালের মতো ধার চেয়ে বেড়ানো আর ছোটলোকের প্রাপ্য মিটিয়ে জবান রাখার আত্মপ্রসাদ লাভের মধ্যেও একই মনোভাব কাজ করেছে।

www.amarboi.com

ত্যাগ ও অনাসক্তির মধ্যেও যে সুখ ও মর্যাদা আছে, তা ভোগকামী মধুসূদন ক্ষণকালের জন্যেও উপলব্ধি করেননি। তাঁর এত বিদ্যা, এত ভাষাজ্ঞান এবং অসামান্য প্রতিভাই তাঁকে সমাজে প্রথম শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠাদানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁর চোখের সামনে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই কোলকাতার ধনীসমাজের শ্রদ্ধেয় ও মান্য হয়ে উঠেছিলেন। মধুসূদনের সেদিকে খেয়াল ছিল না। কেননা তিনি যে কোলকাতার ধনী-মানীর অন্যতম রাজনারায়ণ মুন্সীর সন্তান ও বিদগ্ধ সাহেব, তা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি। তাই তিনি ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদার মোহে মরীচিকার পিছু নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর জ্ঞান, মনীষা-কবিত্ব তাঁকে তৃপ্তি দেয়া দূরে থাক, প্রবোধও দিতে পারেনি। অবশ্যি ভেতরকার আর্তনাদ ঢেকে রাখবার জন্যে তিনি এসবেরও আস্ফালন কম করেননি। কিন্তু এহো বাহ্য। কেননা, প্রজ্ঞা কিংবা আত্মিক ঐশ্বর্য-চেতনা তাঁতে ছিল অনুপস্থিত কিংবা সুপ্ত। নইলে ভোগ ও ঐশ্বর্যিক উন্নতিকে তিনি তুচ্ছ বলে মানতেন। ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা, অপ্রমেয় আত্মপ্রত্যয় ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের কোনো অভীষ্টই সিদ্ধ হয়নি। যে-কবি হওয়ার বাসনায় তিনি খ্রীস্টান হয়ে বিলেত যেতে চেয়েছিলেন তা অপূর্ণই রয়ে গেল। সময়মতো বিলেত যাওয়া ঘটেনি, তাঁর উদ্দিষ্ট কাব্যও তাই আর রচিত হয়নি। যেভাবে যেমন লোকবন্দ্য কবি হবেন আশা করেছিলেন, তা এমনিভাবে ব্যর্থ হল।

তারপর বাঞ্ছাহত প্রায় বেকার মধুসূদন যৌবনের প্রান্তে এসে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখের ইয়ার্কিসুলভ Challenge গ্রহণ করে নিতান্ত কৌতুকবসেই বাঙলায় প্রতীচ্য আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। এ হল অনেকটা খেলতে খেলতে সাহিত্য সৃষ্টি। অতএব জীবন- প্রভাতে যে-কবি হওয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা অপূর্ণই রয়ে গেল। অথচ তন্ময় কাব্য—সার্থক মহাকাব্য রচনার জন্য যে-বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য প্রয়োজন তা তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল। আবার ইংরেজি-বাঙলায় যা লিখলেন সমকালে তা-ও ন্যায্য কদর পেল না। উচ্চপদ কিংবা রোজগারের জন্যে যে-যোগ্যতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। ব্যারিস্টারি পাস করেও তিনি কোনোটাই পেলেন না। এমনি বিড়ম্বিত জীবন তাঁর। এই হল মধু-জীবনে নিয়তির নির্যাতন—রাবণেরও ট্রাজেডি। লোক-বাঞ্ছিত পদ আর প্রতুল ঐশ্বর্য পেলেন না বলে তিনি ভাবলেন জীবন ব্যর্থ হল। উচ্চাভিলাষী, বিলাসপ্রিয়, ভোগলিপ্সু, যশকামী, মানলোভী ও সুখপিপাসু মধুসূদন—গভীর আত্মবিশ্বাস ও অপরিমেয় সাহস থাকা সত্ত্বেও—ধন-যশ-মানের সাধনায় ব্যর্থ হলেন নিদারুণভাবে। তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য ও মনীষা সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যবোধ ও চেতনার অভাবে, কস্তুরী-সৌরভ মত্ত মৃগের মতো ছুটোছুটি করেই হয়রান হলেন।

এই বহির্মুখিতা এই বহিরার্জিত শক্তি-নির্ভরতা তাঁর সাহিত্যেও পাই। তাঁর প্রধান চরিত্রের কেউ ত্যাগে সুন্দর নয়; বিভিন্ন ভাবে ভোগপ্রবণ। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীম সিংহ শিশুর মতো সরল! পৌরুষ তাঁর একফোঁটাও নেই। কন্যার মৃত্যুর বিনিময়েও তিনি রাজ্যসুখ-ভোগ করতে চান। এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বহির্শক্তির কবল থেকে ধনপ্রাণ বাঁচাবার কাপুরুষোচিত নির্বোধ উপায় খুঁজছেন ভীম সিংহ অথচ পুরুষোচিত গুণ ও আত্মমর্যাদাবোধের কণামাত্র তাঁর মধ্যে উপস্থিত থাকলে সুকৌশলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে কিংবা নিজে প্রবলপক্ষে যোগদান করে আসন্ন বিপদ এড়াতে পারতেন। তা না করে তিনি অনাথা নারীর মতো নিজ কন্যার মৃত্যুতেই বিপন্মুক্তি খুঁজেছেন। তিনি শত্রুশক্তির ভয়ে এমনি কাবু রইলেন যে নিজের শক্তি যাচাই করবার কথা তাঁর মনে একবারও জাগল না। বাইরের আঘাত প্রতিহত করবার শক্তি পান না তিনি নিজের মধ্যে। অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন শক্তির পায়ে। জয়-পরাজয় ও দৈব মর্জি নির্ভর। তিলোত্তমাসম্ভবে দেখি ব্রহ্মার হাতের ক্রীড়নক তিলোত্তমার রূপমুগ্ধ ভোগলিপ্সু সুন্দ-উপসুন্দ মারামারি করেই মরে, দেব গোষ্ঠীর জয় হয়, কারো মনে চিত্তোত্থিত দ্বন্দ্ব-সংশয় দেখা দেয় না। আত্মিক বলে—মনোবলে কেউ বলী নয়। অন্তরের খোঁজ কেউ রাখে না। আত্মিক চেতনা সেখানে দুর্লক্ষ্য।

ব্রজাঙ্গনাও তেমনি তার বিরহবোধের উপাদান খুঁজছে প্রকৃতিতে—অন্তরে নয়। বীরাঙ্গনায়ও মহৎ আদর্শচেতনা নেই, প্রকৃতি চালিত ঋজু ও অসংকোচ বাসনার প্রকাশই অভিনন্দিত হয়েছে ভোগলিপ্সু কবির কাছে।

তাঁর মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিতেও দেখি বাহুবলেরই দম্ভ। 'আমি স্বামীসোহাগিনী সতী'—এই দম্ভই প্রমীলাকে মৃত্যুবরণে অনুপ্রাণিত করেছে—এ মধুর জীবন, এ সুন্দর পৃথবী ছেড়ে যাওয়ার বেদনা তাকে যেন বিচলিত করতে পারছে না। রাবণের চিত্তক্ষেত্রও দেখতে পাই নির্বিকার। সে প্রজ্ঞাবান কিংবা বিবেকবান নয়। তবু বহির্শক্তির ভরসায় সে আত্মতৃপ্ত, কৃতার্থন্মন্য ও নিশ্চিন্ত। তার শক্তির উৎস ঐশ্বর্য ও আত্মীয়-পরিজনের বিশেষ করে মেঘনাদেরই বাহুবল। তাই এক এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে বিচলিত হচ্ছে, দুর্বলতা তাকে গ্রাস করছে। কান্নায় সে ভেঙে পড়ছে, তবু আত্মবিশ্লেষণের নাম করে না, নিজের কাছে নিজেকে ধরা দেয় না। অর্জিত ঐশ্বর্য ও জনবল-নির্ভর দাম্ভিকতা কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। রাবণও শিশুর মতো সরল, খেয়ালি ও বেপরওয়া। বাইরের থেকে আঘাত আসলে সে-আঘাত প্রতিরোধ করবার শক্তি পায় না সে অন্তরে। অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে আত্মপ্রবোধ পেতে চায় নিয়তির নির্যাতনের নামে।

বাঞ্ছাহত বিড়ম্বিত মধুসূদনের মন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর শেষ অসমাপ্ত রচনা 'মায়াকানন ও বিষ না ধনুর্গুণ' নামের মধ্যেও।

মধুসূদনও এমনি উদ্ধত সুন্দর শিশু। মধুচরিত্রের মাধুর্য এখানেই, মধু-জীবনের ট্রাজেডির বীজও এতেই উপ্ত আর মধু-সাহিত্যের তত্ত্বও এতে নিহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুসূদনের অন্তর্লোক

মধুসূদন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এক আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে তাঁর জন্ম। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব সে শতকের তৃতীয় পাদে। ভৌগোলিক হিসেবে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেরই সন্তান।

ধনী ও মানী রাজনারায়ণ মুন্সীর একমাত্র সন্তান মধুসূদন আজন্ম সর্বপ্রকার প্রশ্রয়ে লালিত। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ছোটকে তুচ্ছ করা আর বড়র বন্দনা করা ছিল তাঁর স্বভাবজ। জীবনে ও মননে ছিল তাঁর বিলাসপ্রবণতা ও আভিজাত্য। ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতাকে তিনি আবাল্য এড়িয়ে চলতেন। এটি তাঁর জীবনে আদর্শ ও লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ধন, যশ ও মানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর জীবনের শুরু। আর এ তিনটের সাধনায় ও সন্ধানে তাঁর জীবন অবসিত! ধনী, মানী ও জীবনবিলাসী বুর্জোয়া ইংরেজ ছিল তাঁর আদর্শ। ইংল্যান্ড ছিল তাঁর স্বপ্নের জগৎ—আকাঙ্ক্ষার স্বর্গলোক। তাই ধনী, মানী ও যশস্বী হবার বাসনায় কৈশোরেই বরণ করলেন খ্রীস্টধর্ম, শিখলেন ইংরেজি, হতে চাইলেন ইংরেজ কবি। ফলে যা কিছু দেশী তা পেল তাঁর তাচ্ছিল্য এবং যে-কিছু য়ুরোপীয় তা হল তাঁর বন্দ্য। বিয়ে করলেন য়ুরোপীয় মহিলা, পোশাক পরলেন য়ুরোপীয়, বাসা নিলেন সাহেব পাড়ায়, মদ খেলেন তাও সাহেবের মতো। কিন্তু কোনোটাই তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা জাত নয়, জীবন রচনার ও সাধনায় সিদ্ধির অবলম্বন মাত্র। এজন্যেই মধুসূদনের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা নেই, রয়েছে গাঢ় মমতা ও সহানুভূতি।

আজীবন মধুসূদন ছিলেন এক স্বাস্থ্যবান প্রাণধর্মী দুরন্ত শিশু। শিশুর মতোই তিনি প্রাণধর্মের প্রেরণায় চালিত হয়েছেন, হৃদয়াবেগই তাঁর সম্বল। সে-আবেগ তাঁকে সংকল্পে দৃঢ়তা এবং লক্ষ্যে অটলতা দিয়েছিল, তাই প্রয়াসবিহীন প্রাপ্তিতে তাঁর আস্থা ছিল না। ধন উপার্জনের জন্যে সে-যুগের সর্বোচ্চ যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন—ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, কবি হয়ে যশ লাভ করবার জন্যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। মধুসূদনের মতো বহুভাষাজ্ঞ সাহিত্যপাঠক এদেশে আজো দুর্লভ। আর কলকাতার সম্ভ্রান্ত উকিল ধনী রাজনারায়ণের যোগ্য ছেলে বিদ্বান ও ব্যারিস্টার এম. এম. ডাট-এর সম্মানে ছিল সহজ অধিকার।

কিন্তু জীবৎকালে ধন, যশ ও মান কোনোটাই মধুসূদনের ভাগ্যে জোটেনি। এত বড় বিড়ম্বনা মানুষের জীবনে বেশি দেখা যায় না। ধন তিনি উপার্জন করেছিলেন কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না; যশ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তা আশানুরূপ ছিল না; আর তাঁর প্রাপ্য সম্মানও তিনি পাননি। রোজগার করতে চেয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ, তার হাজারে হাজারেও হয়নি। হতে চেয়েছিলেন ভুবন-বন্দ্য ইরেজি কবি, হলেন স্বল্পপ্রশংসিত বাঙলা-কবি। আশা করেছিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপ, কিন্তু রইলেন সমাজচ্যুত হয়ে। জীবৎকালে বাঁচার মতো বাঁচতে পারেননি, মরে হলেন অমর।

মধুসূদনের এই চরিত্র, এই আকাঙ্ক্ষা ও হতবাঞ্ছাই তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত। যে-পার্থিব জীবনপ্রীতি মধুসূদন-চিত্তে চাঞ্চল্য, আবেগ ও জ্বালা সৃষ্টি করেছিল, সেই চাঞ্চল্য ও আবেগ, ভোগেচ্ছা ও হতবাঞ্ছার যন্ত্রণাই মধুসূদনের কাব্য-নাটকে অভিব্যক্তি পেয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর প্রত্যেকটিই জীবনবাদী, ভোগপ্রিয়, আবেগ-প্রবণ ও হতবাঞ্ছার বেদনায় কাতর ও দিশাহারা। সেখানে রূপানুরাগী সুন্দ-উপসুন্দ নারীর রূপবহ্নিতে আত্মাহুতি দেয়, ভীমসিংহ কন্যার জীবনের বিনিময়ে রাজ্যভোগ করতে চায় এবং পুত্রের বিক্রমগর্বী রাবণ হতমান হয়ে হাহাকার করে, পুত্র-গর্বিতা চিত্রাঙ্গদা পাগল হয়, পতি-গর্বিতা সীতা রোদন করে, স্বামী-সোহাগিনী প্রমীলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

সহমরণেও গর্ববোধ করে, বলবীর্যগর্বী ইন্দ্রজিতের জীবনও ক্ষোভে-অপমানে অবসিত হয়। সেখানে কৈকেয়ী-জনা-দ্রৌপদী হতবাঞ্ছার ক্ষোভে-জ্বালায় আগুন ছড়াতে চায়, অবশেষে কান্নায় ভেঙে পড়ে, তারা-সূর্পণখা হৃদয়ের আবেগে বিচলিত ও তার জন্যে লাঞ্ছিত। তাঁর গোপবালা অতৃপ্ত বাসনার বেদনায় ব্যাকুল। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীও প্রমূর্ত আবেগ। তাঁর Captive lady-ও বন্দী আত্মার কান্না। তাঁর সনেটগুলোতেও একটি বেদনাবোধ—একটি দীর্ঘশ্বাস যেন প্রচ্ছন্ন।

বেদনাহত নির্যাতিত মানবাত্মার যন্ত্রণা ও কান্নাই মহৎ সাহিত্যের অবলম্বন। মধুসূদনের কবি-মনে এ সত্যটি সহজেই ধরা দিয়েছিল। কোথাও তাই তাঁর কবিদৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি। নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবনে ক্ষোভ, হতবাঞ্ছার কান্না, নির্যাতিতের যন্ত্রণা, নির্দোষের লাঞ্ছনা প্রভৃতিকেই মধুসূদন তাঁর রচনার অবলম্বন করেছিলেন। অতএব, মহৎ শিল্পের কোনো উপকরণেই তাঁর অবহেলা ছিল না। বলেছি, মধুসূদনের নিজের জীবনও ছিল একটি প্রমূর্ত কান্না— একটি প্রচণ্ড হাহাকার—তাঁর 'আত্মবিলাপে' তাঁর অন্তরাত্মারই আর্তনাদ শুনতে পাই,—'আত্মবিলাপ' কবিতাটিই তাঁর আত্মজীবনী।

তাঁর জীবনবোধ ও জগৎ-চেতনায় ছিল গ্রীক নিয়তিবাদের ও পুরুষকারের দ্বান্দ্বিক প্রভাব। তাই গ্রীক-ট্র্যাজেডির ভাব-সত্য যেমন তিনি গ্রহণ করেছেন, তেমনি Paradise Lost-এর শয়তানের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও মর্যাদাবোধজাত দ্রোহকেও অভিনন্দিত করেছেন, অনুগতের শান্ত-নিশ্চিন্ত জীবনের চেয়ে দ্রোহী জীবনের মহিমময় পরাজয় এবং মহৎ মৃত্যু তাঁর কাম্য ছিল।

আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে মধুসূদনই প্রতীচ্যের প্রথম চিত্তদূত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিই ছিল তাঁর অনুধ্যানের বিষয়। তিনি ছিলেন grand and Sublime-এর অনুরাগী। grandeur ও grandoise উনিশ শতকী য়ুরোপে ছিল বিরল, তাই তাঁর মানস-পরিক্রমের ক্ষেত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগেই রইল সীমিত। আধুনিক য়ুরোপ কিংবা ভারত তাঁকে আকৃষ্ট করেনি।

তবু য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে তাঁর মধ্যেও দেখি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি, পুরুষকারে আস্থা; ঐহিক জীবনবাদ, বিদ্রোহানুরাগ, ব্যক্তিসত্তায় ও মানবপ্রীতিতে গুরুত্ব এবং হৃদয়াবেগে মর্যা দান প্রভৃতি তাঁরও রচনার বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। ফলে আঙ্গিকে তিনি ক্লাসিক হলেও প্রেরণায় পুরোপুরি রোমান্টিক। আমরা জানি, মধুসূদন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইংরেজিতে কাব্যরচনা করে অমর হবার বাসনায়। বাজি রেখে বাঙলা রচনায় হাত দিলেন, এজন্যে তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। সে বাজিতে তিনি জিতেছিলেন। বাঙালিকেও জিইয়ে ছিলেন নিস্পন্দ ধড়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। এ কারণে বাঙলার সমাজে ও সাহিত্যে, মননে ও মেজাজে মধুসূদনই প্রথম সার্থক বিদ্রোহী ও বিপ্লবী, পথিকৃৎ ও যুগস্রষ্টা। ভাবে ও ভাষায়, ভঙ্গিতে ও ছন্দে এবং রূপে ও রসে অপরূপ করে তিনি নতুন জীবন ও জগতের পরিচয় করিয়ে দিলেন বাঙালির সঙ্গে। এ দক্ষতা সেদিন আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি, যদিও ইংরেজি শিক্ষিত গুণী-জ্ঞানীর সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না সেদিনকার কলকাতায়।

মধুসূদনের জন্মের আগে থেকেই য়ুরোপে এবং তাঁর সমকালে এদেশেও শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রভাবে জীবনবোধ ও জগৎচেতনা দ্রুত রূপান্তর লাভ করছিল। এজন্যে মধুসূদনের প্রভাব বাঙলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশেষ করে তাঁর সমকালীন য়ুরেপীয় জীবনচেতনার স্বরূপ তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। এ-যুগের মর্মবাণী গীতিকবিতায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেননি—তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষ।

তবু আমাদের দেশে তিনি নতুনের বাণীবাহক, নতুনের ধ্বজাধারী যুগস্রষ্টা চিন্তানায়ক। আমরা তাঁকে ভুলিনি, ভুলতে পারবও না। জয়তু মধুসূদন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিম-মানস

১

আলোচনার সুবিধের জন্যে সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে আমার স্থূল ধারণাটি প্রথমেই জানিয়ে রাখছি। মাটি থেকেই ঘাস জন্মায়, তাই বলে মাটি আর ঘাস এক জিনিস নয়। তেমনি কাঁচামাটি আর পোড়া ইট এক বস্তু নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাদের জ্ঞাতিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব, হয়তো সহজও, কিন্তু সাহিত্য সে-রকম কোনো পদার্থ নয় যে তাকে কতগুলো উপাদানের সমষ্টি মাত্র বললেই তার স্বরূপ বোঝা যাবে। শব্দের মধ্যে পদের যে অর্থগত তফাৎ, অভিধানের শাব্দিক অর্থ আর কাব্যের চরণান্তর্গত পদের অভিধা যেমন ভিন্ন, তেমনি সাহিত্য আর সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে তফাৎ বিস্তর। এ কারণেই বিষয়বস্তুর উচ্চতা কিংবা তুচ্ছতা সাহিত্য-রসের পরিমাপক নয়। শিল্প বলতে যে-কথাটি আমরা বুঝতে ও বোঝাতে চাই তা বিশ্লেষণ-সাধ্য নয়। মাটি থেকে ঘাস হল, এ আমরা দেখলাম, কিন্তু কেমন করে হল তা বোঝানো যায় না। যে-কোনো লিখিত রচনাকেই যদি সাহিত্য বলে ধরা যায় তাহলে লেখাপড়া-জানা লোক মাত্রই লেখে এবং সব লেখাই সাহিত্য। কিন্তু সেসব রচনাকে সাহিত্য বলি না। সে কি কেবল বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার জন্যে? তাহলে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঘরোয়া চিঠিপত্র পর্যন্ত সাহিত্য হল কী করে? আদিকালের সেই তত্ত্ব এবার স্মরণীয়— 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টত্যগ্রে' আর 'নীরস তরুবরঃ পুরতো ভাতি'। অথবা একালের 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার' কিংবা 'তেলা মাথায় তেল'—এগুলির যে-কোনো একটি শব্দ পাল্টালেই সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে, যেমন কোনো মুখের ছবিতে একটি তিল এদিক-ওদিক করলেই মুখের আদলই যাবে বদলে। সাহিত্য-শিল্প তেমনি একটি অনুভব-সাধ্য ব্যপার। ওটি থাকে তো রসও রইল, শিল্পও রইল। আর যা শিল্প তা-ই রস এবং তা-ই সাহিত্য। শিল্প-রস, কিংবা সৌন্দর্য সবকিছুর মূলে রয়েছে মানবিক রস, ইংরেজিতে যাকে বলে Human interest— প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ না থাকলে তা মানুষের পছন্দসই হতেই পারে না। আর যা তৃপ্তি দেবে না, চেতনায় ঘা দেবে না, তা সাহিত্য নয় নিশ্চয়ই। আবার অনেক সময় মানবিকতা থাকলেও যেমন মানবিক রস জন্মাতে পারে, তেমনি এর অভাব ঘটলেও মানবিক রসের অভাব হয় না। চিত্তের উল্লাসই শুধু কাম্য নয়, চিত্ত বিক্ষোভও উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রস হতে পারে; যেমন করুণ, ভয়ঙ্কর, বীভৎসাদি রস।

কাব্যের সুষমা ও ব্যঞ্জনার যেমন তর্জমা হয় না, সাহিত্য-শিল্পও তেমনি ব্যাখ্যান্তর্গত নয়। সংস্কার বশে আমরা সাহিত্যের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পেতে চাই বটে, কিন্তু তা সাহিত্যসৃষ্টির বা পাঠের মূল লক্ষ্য নয়। তার প্রমাণ আমরা কাজের কথা কেজো করে না বলে প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ করে, ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে ও রসিয়ে বলি। সৌন্দর্য আমাদের প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না। সাহিত্য সৃষ্টির ও পাঠের পেছনেও কোনো প্রয়োজনের প্রেরণা থাকতে পারে না। আমাদের দেশে তাই সাহিত্যও একটি 'কলা' এবং নন্দনতত্ত্বের অন্তর্গত। কিন্তু আমরা তো কেবল সৌন্দর্যচর্চায় বাঁচিনে। আমাদের রয়েছে জীবন, সমাজ ও ধর্ম। তাই আমাদের বিষয়বুদ্ধি 'সৌন্দর্যের' সঙ্গে 'প্রয়োজন'কেও পেতে চায়। কেননা সৌন্দর্য-পিপাসা অল্পেতে এবং ক্ষণিকে মেটে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনবোধের শেষ নেই। এ কারণেই পুরোনো সাহিত্যে আমরা সৌন্দর্যের সাথে নৈতিক বা ধার্মিক আদর্শের প্রতিফলনও কামনা করেছি। ন্যায়ের জয় ও অন্যায় বা অধর্মের ক্ষয় দেখবার আগ্রহই প্রধানত পাঠক বা শ্রোতাকে সাহিত্যরসিক করে তুলত। এ-যুগের পাঠক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ খোঁজে। আমরা ভুলে যাই যে এ Utility হচ্ছে আনুষঙ্গিক তথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

by product. তাই এর উপরই সব গুরুত্ব দিলে সাহিত্য-শিল্প গৌণ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কাঞ্চন ফেলে আঁচলে গেরো দেয়ার বিড়ম্বনাই ভোগ করতে হয়। আজ পাঠক ও সমালোচক সাহিত্যে সেই বিড়ম্বনা-জালই বিস্তার করছেন। তাই কথায় কথায় পশ্চাৎমুখিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতিবাদিতা সাড়ম্বরে উচ্চারিত হয়। এই বিড়ম্বনার খপ্পরে পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এর কিছুটা তাঁর আত্মকৃত পাপ।

২

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন য়ূরোপীয় জীবন-মহিমায় মুগ্ধ। কিন্তু তিনি সম্বিৎ হারাননি। তাই তিনি জীবনের সাধনা ও আবাহন করেছেন জীবনব্যাপী নিজের জন্যে নয়—বাঙালি হিন্দুর জন্যে। (বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-গঠন যুগে বৃটিশ-ভারত গড়ে উঠেনি, তাই বঙ্কিমে ভারতীয় জাতীয়তা নেই; আছে বাঙালি হিন্দু-জাতীয়তা।বঙ্কিমের স্বদেশও ভারত নয়, বাঙলা দেশ)। কিন্তু অভিমানী, তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে য়ূরোপের এ মহিমা প্রকাশ্যে স্বীকার করায় কিংবা বরণ করায় বাধা ছিল; সে-বাধা জাতীয় মর্যাদার অভিমানপ্রসূত। তাই তিনি খিড়কিপথেই য়ূরোপের অবদান অঞ্জলিভরে গ্রহণ করলেন। বলা চলে, রৌদ্রশ্রান্ত লোকের মতো পরম তৃপ্তিতে অবগাহন করলেন। তাই শাড়ি-সিঁদুর পরা মেমসাহেবই তাঁর আদর্শ নারী। তেমনি মর্যাদায়, সাহসে ও পৌরুষে দৃপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানই তাঁর আদর্শ পুরুষ। সেজন্যে বহুপত্নী ও উপপত্নীর দেশে ভ্রমর, সূর্যমুখী, মতিবিবি চরিত্র সম্ভব হল। মাতৃঘটিত কলঙ্কের জন্যে যে-নারীকে স্বামীঘর ছাড়তে হয়, সে প্রফুল্ল পরপুরুষের সঙ্গে দেশময় ঘুরে বেড়ানোর পর স্বামীগৃহে আদর্শ বধূরূপে বরণডালা পায়। যে জাতিদ্রোহী রাজপুতেরা মুঘলের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল, সে রাজপুতের স্বাজাত্যবোধে ও স্বদেশপ্রেমে এত মহিমা আরোপিত হল। তাঁর প্রথম নায়ক জগৎসিংহ মানসিংহের সন্তান।

অনুকরণের অপবাদ সহজে কেউই গ্রহণ করতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্র অতিমাত্রায় এই দুর্বলতায় ভুগতেন। তাই তিনি অন্তরে যত য়ূরোপমুখী, বাইরে তাঁর বিরূপতাও তত অধিক। এমন অবস্থায় সাধারণত দু-কূল রক্ষা করা যায় না। বুদ্ধিমানের চোখে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুর্বলতা ঢাকা রইল না। তাঁর কৃষ্ণ উনিশ-শতকী আদর্শ রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর প্রভাবজ সৃষ্টি। তাঁর সাম্যবাদে দু-কূল রক্ষার অপচেষ্টা প্রকট এবং তাঁর ধর্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য Rationalism-এর অপপ্রয়োগে দুষ্ট।

যে উপকৃত হতে চায় অথচ কৃতজ্ঞ হতে চায় না, সে আর যাই হোক নৈতিক বলে বলী নয়; তার চরিত্র দ্বিধামুক্ত হতে পারে না, এবং তার আচরণ ও কর্ম সহজ ও ঋজু হয় না। এজন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় প্রত্যয়দৃঢ়তা ও উদারবিস্তার নেই; অসামঞ্জস্য আছে অনেক। তিনি খিড়কি দোর দিয়ে য়ূরোপের প্রসাদ লুট করতে চাইলেন, কিন্তু সদর দরজা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। ফল দাঁড়াল এই যে, শেষ বয়সে যখন তিনি আগের মতো স্থিতধী রইলেন না, তখন আন্তরিক উত্তেজনায় য়ূরোপের সাহিত্য-দর্শন ও সভ্যতার প্রতিই যে কেবল অবজ্ঞা দেখালেন, তা নয়, হিন্দুয়ানীর মহিমা প্রচার না করে উপন্যাস লিখে সময় নষ্ট করেছেন বলে আফসোসও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের এই উগ্রতা ও একগুয়েমি তাঁর স্থায়ী কলঙ্ক।

এই একই কারণে তিনি নিজে প্রগতিবাদী ও জাতিগত-প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নমূলক কোনো কাজে বা আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা মেলেনি বরং বিরূপতা দেখিয়ে নিজের ওজন হালকা করেছেন। এসব কাজ বা আন্দোলন মন্দ বলে যে তিনি দূরে সরে ছিলেন তা নয়, আসলে তাঁর অদ্ভুত অভিমান ও স্বাতন্ত্র্য-প্রীতিই তাঁকে অসামাজিক ও উৎকেন্দ্রিক করে রেখেছিল। এই উৎকেন্দ্রিকতা বজায় রাখার দায়ে পড়েই তাঁকে কৃত্রিম অনুদারতার ও রক্ষণশীলতার অভিনয় করতে হয়েছিল। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের কথায়, ভাষার ব্যাপারে কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য প্রভৃতি বিবিধ রচনায় ও প্রবন্ধে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক জেদের প্রতিকার তাঁর মতো প্রতিভা ও মনস্বীরও হাতে ছিল না। বিস্ময় এখানেই এবং এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণেই। সমকালীন কৃতী পুরুষদের সঙ্গেও তিনি তেমন সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারেননি তাঁর এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্যেই। খুব কম লোকের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যা-কিছু লিখেছেন তা কেবল হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর উন্নতির জন্যেই। এমন যে রোমান্টিক রচনা কপালকুণ্ডলা, তাতেও মতিবিবির মাধ্যমে হিন্দুয়ানীকেই (হিন্দুসতীর পতিপ্রাণতাকে) মহিমান্বিত করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্রের দিনের সাধনা ও রাত্রির স্বপ্ন ছিল ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে হিন্দুকে আদর্শ মানুষ ও জাতি হিসেবে দাঁড় করানো, তাঁর এ ধরনের প্রচেষ্টার আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সাহিত্যে একমাত্র utility-বাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যের সেই বিচারে যদি আজ তিনি ঘায়েল হন, তবে কর্মদোষে আস্থা রাখা ছাড়া উপায় কী? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। পড়াশোনা করেছিলেন সেকালের হুগলী কলেজে। তাঁর মানস গড়ে উঠেছিল বই পড়ে আর গাঁয়ের পুরোনো ধরনের পরিবেশে। কাজেই কলকাতা শহরের মুক্তবুদ্ধি শিক্ষিত তরুণের মনের স্পর্শ তিনি পাননি। তাঁর অহেতুক ও নিরর্থক অভিমান জিইয়ে রাখার অবাঞ্ছিত সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন এভাবেই।

এসব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এযাবৎ শ্রদ্ধার আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই আসীন রয়েছেন। উনিশ শতকে এ শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন অসামান্য শিল্পী ও রোমান্স-রচয়িতা হিসেবে। তিনি লেখক তথা শিল্পী হিসেবে ছিলেন উনিশ শতকের বাঙলার বিস্ময়। আর বিশ শতকের গোড়ার দিককার বিপ্লবীদের (অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির) বদৌলতে আনন্দমঠ, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতির জন্যে তিনি হলেন ঋষি। এ পর্যায়ে তাঁকে আর শিল্পী কিংবা সমাজবেত্তা হিসেবে যাচাই করবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি কারুরই রইল না। তিনি হিন্দুজাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রদ্রষ্টা ও উদ্‌গাতা ঋষিরূপেই কেবল পূজা পেতে থাকলেন। [অথচ তখনই স্বাধীনতা চাওয়া অনুচিত—এটাই ছিল উপন্যাসগুলোতে বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য। তখন য়ুরোপীয় আদলে শিক্ষিত ও উদ্যোগী মানুষ তৈরি করাই তাঁর লক্ষ্য।]

আজ স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যখন সে প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন বঙ্কিমের মন-মনন ও লেখা নিয়ে সমালোচনা—বিজ্ঞানসম্মত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ চলবে। এ ধোপে utility-বাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে বঙ্কিম জাতির শিরোমণিও হতে পারেন, আবার শিল্পী ও মনীষীকুলকলঙ্ক বলে নিন্দিতও হতে পারেন, দু-ই সম্ভব। আমার ধারণা, হবেনও তাই। কিন্তু কেবল শিল্পী হিসেবে যেসব সমালোচক তাঁর যোগ্যতা যাচাই করবেন, সেসব রসগ্রাহী পাঠক-সমালোচকের বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তলোকে তাঁর মর্যাদার আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে। এ শ্রেণীর লোকের কাছে বঙ্কিম কী বলেছেন তা বড় নয়, কেমন করে বলেছেন তা-ই দ্রষ্টব্য।

উনিশ শতকী শূন্যতায় বঙ্কিমের আবির্ভাব ও সৃষ্টি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মধুসূদনও প্রতিভা কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল সীমিত। আমরা যদি প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের ও মননের বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিই, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের জন্যে তাঁকে মোটেই দোষ দেয়া যায় না। আমাদের পছন্দসই হল না বলে তা মন্দ হতে পারে না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ক্ষোভ এই যে তাঁকে আমরা যুগন্ধর ও যুগোত্তর প্রতিভা বলে জানতাম। এতকাল পরে যখন তাঁর সম্বন্ধে আচ্ছন্নভাব কেটে গেছে, তখন দেখতে পাচ্ছি—তাঁর অপূর্ণতা এবং প্রতিভাসুলভ মৌলিকগুণের অভাব। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক, পেয়েছি তার চাইতে কম, তাই এত ক্ষোভ।

তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধের লোক হয়েও এবং তাঁর সমকালের য়ুরোপীয় নাস্তিক্য দর্শন, সংশয়বাদ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, মার্কস ও ডারুইন মতবাদের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় হিন্দু-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর ধারণায় হিন্দু রাজত্ব হলেই হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙলাদেশে উনিশ শতকের শেষার্ধেও হিন্দু রাজত্ব ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবাস্বপ্ন মাত্র। যে য়ূরোপ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেখানে যে গণতন্ত্রের বীজ সর্বত্র উপ্ত হচ্ছে— এই উচ্চাভিলাষী মনীষীর তা নজরে পড়ল না। কেবল শাসনে নয়, শিক্ষা ও ধনাগম সংস্থাতেই যে তথা অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরই যে এ-যুগের উন্নতির বীজ নিহিত— একালের রাষ্ট্রসংস্থার ভিত্তি রচিত, তা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধির বাইরে। তিনি হিন্দুর বাহুবল ও চরিত্রবলের ধ্যান করতেন। জ্ঞানবল ও ধনবল তাঁর চিন্তায় গুরুত্ব পায়নি; অথচ এ-যুগে শক্তির উৎস হচ্ছে এ দু'টোই। বাঙলাদেশে মুসলমানকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুর স্বাধীনতা-বাঞ্ছা যে পূর্ণ হবার নয়— এ বাস্তব বুদ্ধি তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। ফলে তাঁর সাধনা আপাত সফল হলেও পরিণামে ব্যর্থ হল।

হিন্দু-মুসলমান কি কোনোকালে একজাতি ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি-বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্যায়-অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা বঙ্কিম যে-মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, তারা তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী। যে বিদেশী বিজাতি ও বিধর্মী এদেশে চেপে বসল আর দেশবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল, তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপতা দেশী মুসলমানের গায়েও লাগল, কেননা ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে এবং আভিজাত্যবোধে দেশী মুসলমানেরাও নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভাবতে শিখেছে। যেমন দেশী খ্রীস্টানরা স্বজাতি ভেবেছে ইংরেজকে। শাসক-শাসিতের পূর্বসম্পর্ক স্মরণ করে উনিশ শতকের হিন্দু লেখকমাত্রই মুসলমানদের প্রতি কমবেশী বিরূপতা দেখিয়েছেন। সে-বিরূপতা বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ-রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি মধুসূদনের মতো সংস্কারমুক্ত প্রতিভাও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। তাঁর প্রহসনে মিয়াজান ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে যবন -অপহৃতা পদ্মিনী প্রসঙ্গ স্মর্তব্য। তবু অন্যদের কথা আলোচ্য নয় এজন্যে যে তাঁরা কেউ প্রভাবশালী ছিলেন না। কিন্তু বঙ্কিম যুগস্রষ্টা প্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তাঁদের পক্ষে এ অনুদার ও অবিজ্ঞজনোচিত মনোভাব দূষণীয়। শাসক-শাসিতের পূর্ব-সম্পর্ক যা-ই থাক না কেন, ইংরেজ-শাসনে যখন হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা, তখন দূরদর্শী জাতিপ্রাণ মনীষীর কর্তব্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের সংহতি সাধনা করা। বঙ্কিমের মনন-দৈন্য এখানে যে, তিনি প্রয়োজন-সচেতন ছিলেন না। একচক্ষু হরিণের মতো তিনি হিন্দু-জাগরণের চারণ কবির ব্রতকেই বড় মনে করেছেন, দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখেননি। তাই তিনি হিন্দুর ঋষি হলেন বটে, কিন্তু দেশের চিন্তানায়কের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রইলেন।

আত্যন্তিক আত্মরতি পরপ্রীতির পরিপন্থী। বঙ্কিম স্বজাতিকে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর চিন্তা, ধ্যানধারণা সবই একান্তভাবে হিন্দুর জন্যে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনো নীতি-উপদেশে মানুষকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায় না-বরং প্রতিহিংসা বৃত্তি উসকিয়ে দিলে সহজেই উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি বাস্তবে করলেনও তাই। যেহেতু ইংরেজ শাসক, সেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগিয়ে তুললে সমূহ বিপদ। তাই তিনি হিন্দুদের মনে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্যে পুরাতন দুশমন (বর্তমানে মৃত হলেও) মুসলমানদের বিরুদ্ধে (আসলে তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীই লক্ষ্য) হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুললেন—নানা সত্য ও কাল্পনিক অত্যাচারের ও অমানুষিকতার চিত্র তুলে ধরে। হিন্দু উত্তেজিত হল। বলা চলে হিন্দুমনে মুসলিম বিদ্বেষের সাথে সাথে স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রেম জাগল—হিন্দু জাতি গড়ে উঠল, কিন্তু ভাঙল মুসলমানের মন। ক্ষুব্ধ হল শিক্ষিত মুসলমান। ['মুসলমান'-এর পরিবর্তে 'তুর্কী' কিংবা 'মুঘল' শব্দ ব্যবহার করলে কোনো বিদ্বেষ-তিক্ততাই হয়তো সৃষ্টি হত না।]

মুসলমান ছিল এদেশে শাসক জাতি। তাদের উত্তমন্যতা শাসিতের প্রতি হয়তো অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু বিদ্বেষ তাদের ছিল না। তাই ইংরেজ যখন তাদের শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিল, তখন ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে তারা নিজেরা সংগ্রাম করল এবং হিন্দুদের সহযোগিতাও করল কামনা। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই তাদের প্রধান কাম্য ছিল; এবং ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ অবধি মুসলমানগণ হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যের ভিত্তিতে ইংরেজ- বিরোধী সংগ্রামী মনোভাব বজায় রেখেছিল। এরপরে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানরা ব্রিটিশের প্রতি সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরও যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ-বিরোধী হয়ে রইলেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়ে তুলবার সাধনা করেন। ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলে এ সাধনা সাফল্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাঙলাদেশে মুসলমানেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের হাতে পীড়িত হচ্ছিল বলে বঙ্কিমকেই হিন্দুমানসের প্রতীক ধরে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল ১৯৩৭ সাল থেকে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাঙলায় নয়, বঙ্কিম-সাহিত্য প্রভাবিত বাঙলাতেই অখণ্ড জাতীয়তায় ফাটল ধরল এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাঙলাদেশে মুসলিমলীগের ভিত্তি দৃঢ় মূল হল। এরপর এল দাঙ্গা, এল আজাদী। পাকিস্তান কায়েম হল। আমাদের ধারণা প্রতিভামাত্রই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্থিতধী ও বাস্তব সমস্যা-সচেতন। কিন্তু এ তৌলে বঙ্কিম টেকেন না।

৩

এবার বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শবান শিল্পী ও উদ্দেশ্যমূলক রোমান্টিক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বিচার করা যাক।— এজন্যে কিছু ভূমিকার দরকার।

শহর কলকাতা গড়ে ওঠে পালিয়ে আসা লোক নিয়ে। জব চার্নক থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলমান সবাই এল এভাবেই। কেউ এল আত্মরক্ষার জন্যে, কেউ এল আত্মগোপনের জন্যে আর বেশির ভাগ এল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের উদ্দেশ্যে। কাজেই দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্যুত জনসমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠল নতুন বন্দর কলকাতা। এসব লোকের কিছুটা অনন্যতা স্বীকার করতে হয়; তাদের উচ্চাভিলাষ, অধ্যবসায়, বিপদের ঝুঁকি নেবার সাহস, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি নিশ্চয়ই ছিল। ইংরেজ বেনের বানিয়ান হয়ে ওরা নিজেদের ভাগ্য তৈরি করতে থাকে। তারপর পলাশীর যুদ্ধের পর যখন শাসক-শাসিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মন-মনন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হল, তখন তাদের মানস-দৈন্য ও ঘরোয়া দীনতা তাদের মনে তীব্র গ্লানিবোধ জাগাল। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস প্রসূত Rationalism যে-স্বরূপে সেদেশে প্রকাশ পেল, তা সেদেশেরই ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও ব্যক্তিজীবনে বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন এনেছিল। নবলব্ধ বিজ্ঞানবুদ্ধির আলোকে তারা পুরোনো বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে পুরাতন সমাজ, ধর্ম, আর ব্যক্তি-জীবন-ধারণাকেও পাল্টাল। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই নতুন মূল্যবোধের ফলে সেদেশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, মানবতা, যুক্তিবাদ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ব পেল। যার ফলে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র, সমাজজীবনে সংস্কারমুক্তি, ধর্মে আচার-শৈথিল্য, ব্যক্তিজীবনে ন্যায়নিষ্ঠা ও বন্ধনমুক্তি, মুখে মানবপ্রীতি, মন-মননে দ্বন্দ্ব অত্যধিক বিজ্ঞানানুগত্য, যুক্তিবাদে আস্থা প্রভৃতি শিক্ষা, সুরুচি ও আভিজাত্য প্রকাশের কৃত্রিম-অকৃত্রিম অবলম্বন হল। বিজ্ঞানভিত্তিক নাস্তিক্য ও সংশয়বাদই এ-যুগের দর্শনের মূল আলোচ্য।

ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিতজনেরা য়ুরোপের এই মানস-সম্পদ লাভ করে আশায়-উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়ে উঠল। তাদের নিস্তরঙ্গ নিশ্চিন্ত জীবনে যে বিচলন এল, অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যে-আলো ঝলসিয়ে উঠল, তাতে টাল সামলানো সম্ভব ছিল না। রাজা রামমোহন রায় থেকে এজুরা পর্যন্ত সবাই তাই বেশ কিছুকাল উত্তেজনায় অস্থিরচিত্তে ছুটোছুটি করেছেন। সবারই মনের কথা, বদলাও—পাল্টাও, নতুন কিছু করো। এর তাৎপর্য ও স্বরূপটি বুঝে নিতে হবে। গরিব যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ধনী হয়, কিংবা কোনো ভূঁইফোড় ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে বড় চাকুরে হয়, তখন সে তার জীবনের মান উন্নয়নের জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রুচি পালটিয়ে রাতারাতি সংস্কৃতিবান হয়ে অভিজাতশ্রেণীর একজন হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে। গত শতকের কলকাতার শিক্ষিত-মনেও পাশ্চাত্য প্রভাবে এমনি আকুলতা জেগেছিল পাশ্চাত্য আদর্শে জীবনযাপনের জন্যে এবং পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলবার আগ্রহে। তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের পরিবার ও সমাজ। গোটা জাতির কথা কেউ ভাবেননি। বিশেষ করে তা তখনি সম্ভব বলে কল্পনা করাও ছিল দুঃসাধ্য। তাই রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ প্রমুখ সবাই যা-কিছু করেছেন তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার ভেতরেই। এ হচ্ছে কলকাতার হঠাৎ-জাগা ধনী ও ভূঁইফোড় ইংরেজিশিক্ষিতদের পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন। এ যুগে শহরকেন্দ্রিক আন্দোলন গোটা জাতির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতে পারে এবং হয়ও। তার কারণ মফস্বলের লোকেরাও শিক্ষিত এবং খবরের কাগজ ও বইপত্রের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের বাহ্য ও মানস-দূরত্ব ঘুচে গেছে। কিন্তু উনিশ শতকী আন্দোলনের এ ব্যাখ্যা চলতে পারে না। তাদের অবচেতন মনে গোটাজাতির চিন্তা যদি থাকেও তা ছিল একান্তভাবে পরোক্ষ, আকস্মিক এবং অপ্রধান। সুতরাং আমাদের উনিশ শতকী রেনেসাঁস ছিল একান্তই আত্মকেন্দ্রিক এবং সংকীর্ণ চেতনার প্রসূতি। তখনো তার 'হিন্দু চেতনার' উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়ে বাঙালি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সংখ্যাগুরু মুসলমানকে পাইনে।

এ সময়কার হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ—এই ত্রৈকোণ সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণেও মূল্যবান তত্ত্ব পাওয়া যাবে। একটা দৃষ্টান্ত নিলে এ সম্পর্কের স্বরূপটি ধরা সহজ হবে। ১৯৪২ সনে চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া পাকিস্তান-দাবীকে মেনে নেয়ার ও জাপানির সাহায্যে ইংরেজ তাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন। অথচ এ দু'টোর একটাও কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যানুগ ছিল না। ব্রিটিশের প্রতি বিরাগ ও আজাদী-বাঞ্ছার তীব্রতাই রাজা গোপালকে এমনি আদর্শবিরোধী ভাবনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল।

অনুরূপভাবে সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলমান শাসনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বেদনা ও বিদ্বেষ হিন্দুকে মুসলমানবিরোধী ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। অন্তরে আজাদী লাভের বাসনা থাকলেও বাস্তবে তা তাদেরকে সংগ্রামী করে তুলবার মতো তীব্র ছিল না। তাই লাঞ্ছিত চাকুরের মনিব বদলের স্বস্তি ও আনন্দই তারা পেতে চেয়েছিল। শাসনদণ্ড মুসলমানের থেকে ব্রিটিশের হাতে যাওয়ায় তারা এই স্বস্তি ও আনন্দই লাভ করেছিল। উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালির উল্লাস এই মনোভাবেরই ফল এবং স্বাক্ষর। পুরোনো মনিব মুসলমান যখন ব্রিটিশ-বিরূপতায় মনে, ধনে ও মানে খর্ব হচ্ছিল, তখন হিন্দুমনের পুরোনো বিদ্বেষ—বিদ্রূপ, বিরূপতা ও অবজ্ঞারূপে প্রকাশ পেতে থাকে। এর অনপনেয় সাক্ষ্য বহন করছে উনিশ শতকের হিন্দুর রচনা। শত্রুর দুর্ভোগে বিদ্বিষ্ট মনে যে উল্লাস জাগে তারই আভাস পাই উনিশ শতকের হিন্দুর বচনে ও আচরণে। এ সূত্রে সিপাহি বিপ্লবকালে তৃপ্তমন্য বাঙালি হিন্দুর ভূমিকাও স্মর্তব্য।

মুসলমানেরা ছিল শাসকের জাতি। প্রজা হিন্দুর প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকার কথা নয়, বরং থাকতে পারত তাদের উত্তমন্যতাজাত অবজ্ঞা। অবজ্ঞা অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্য জাগায়, বিদ্বেষ ও বিরূপতার রূপ নেয় না কখনো। কাজেই ইংরেজ যখন তাদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিল, তখন তারা ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামে হিন্দুর সহযোগিতা কামনা করেছিল। এইজন্যে উনিশ শতকের মুসলিম-মানসে হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল না বরং প্রয়াস ছিল হিন্দুকে কাছে টানবার। কংগ্রেস-পূর্ব যুগের এবং কংগ্রেসের সংগ্রামকালীন ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দুর ব্রিটিশ-প্রীতি ও সহযোগিতার আত্যন্তিকতা দেখে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তা করে ব্রিটিশের প্রতি মুসলমান সমাজেও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে তৎপর হন। এই প্রচেষ্টা অবশ্য সৈয়দ আহমদ, আমীর আলী, আমীর হোসেন, আবদুল লতিফ, সলিমুল্লাহ, আগাখান প্রমুখ একশ্রেণীর ইংরেজিশিক্ষিত লোকের প্রয়াস ; এবং মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান এঁদের মানস-সন্তান। অন্যান্য শিক্ষিত মুসলমানরা (বিশেষ করে মৌলবীরা) ১৯৩৭ সাল অবধি জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।

অবশ্য এর মধ্যে আরো একটি মানস-ধারা ছিল। একদিকে ছিল শিক্ষায় ও ধনে দ্রুত পতনশীল মুসলমান অভিজাতশ্রেণী, অপরদিকে ছিল দ্রুত বর্ধিষ্ণু হিন্দু শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়। উভয়ের মধ্যে ছিল পারস্পরিক অশ্রদ্ধা। ঐতিহ্যগর্বী দাম্ভিক অভিজাতরা নতুন গজিয়ে ওঠা সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো রকমেই শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠতে পারছে না। আবার বিদ্যা, পদমর্যাদা এবং ধনগর্ব নতুনদেরও উদ্ধত করে তুলছে। এই মানসদ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি মূলত তারাশঙ্করের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জলসাঘর' কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' বা তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতনের' মতো। কেবল তফাৎ এই, নতুন-পুরাতনের এই দ্বন্দ্বের আকস্মিক ভিত্তি হল হিন্দু ও মুসলমান। দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের উৎসও হল তাই এই দ্বন্দ্ব—যা বিশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যাপী জাতিবৈর বা সাম্প্রদায়িকতা ও হানাহানির কারণ হয়ে রইল।

ব্রিটিশ মুসলমানের হাত থেকেই রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, তাই তাদের মুসলমান-ভীতি তাদেরকে করেছিল মুসলমানের প্রতি বিরূপ ও আস্থাহীন। অন্যদিকে এদেশে তাদের শাসন স্থায়ী করার জন্যে তারা 'Devide and rule' নীতি গ্রহণ করল। ফলে হিন্দু তোষণ ও পোষণ এবং মুসলমান শোষণ ও দলনই হল তাদের লক্ষ্য—যা প্রায় গোটা উনিশ শতক ধরে চলেছে। পরে উনিশ শতকের শেষপাদে ও বিশ শতকে ব্রিটিশ-কৃপায় পাওয়ার তেমন কিছু ছিল না। তখন হিন্দু মনেও জাগল স্বাধীনতার স্পৃহা ও ব্রিটিশ-বিরূপতা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের নীতিও পরিবর্তিত হয়ে মুসলমান তোষণ এবং হিন্দু দলন শুরু হল।

এমনি পরিবেশে উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুর ধন, বিদ্যা ও পদমর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। আর আগেই বলেছি পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীবনরীতির সংস্পর্শে এসে বাঙালি হিন্দুর যে- জাগরণ এল, যাকে রিনেসাঁস বলে চিহ্নিত করা হয়, তা কলকাতাবাসী ধনী ও শিক্ষিতের ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের মানোন্নয়ন প্রয়াসে— আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাদের দৃষ্টি ছিল সাগরপারে, আর লক্ষ্য ছিল আত্মবিকাশ। গোটা দেশের কথা ভাববার সময় সুযোগ ও সম্ভাবনা তখনো দেখা দেয়নি। কাজেই এ রিনেসাঁস কেবল সংকীর্ণ অর্থেই সত্য। তাই একে দিয়ে গোটা দেশের কল্যাণে কোনো বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ছিল অসম্ভব।

এমনি পরিবেশের সন্তান হচ্ছেন উনিশ শতকী মনীষীরা। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই ব্যতিক্রম নন। অতএব বঙ্কিমের চিন্তায়, বচনে ও আচরণে কোনো অসঙ্গতি নেই। বরং বলতে গেলে তাঁর মধ্যেই উনিশ শতকী মানসের স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছে। সে-হিসেবে বঙ্কিম যুগসৃষ্টি, যুগধর ও যুগ প্রতিভূ। এ-কথাটি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিয়ে বুঝতে চাইনে বলেই বঙ্কিম আমাদের কারুর চোখে ঋষি আবার কারুর কাছে মুসলিম-বিদ্বেষী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা

১

রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য মানুষ। জীবন-প্রভাত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত অবধি তিনি নব নব রাগে বিচিত্র অনুভবে নিজেকে রচনা করে গেছেন। চিন্তার ও কর্মের বহুধা ও বর্ণালি অভিব্যক্তিতে তাঁর জীবন বিপুল, বিচিত্র ও জটিল হয়ে প্রকটিত হয়েছে। বয়স তাঁর যতই বেড়েছে, তাঁর মনের দিগন্তও ততই হয়েছে প্রসারিত। বেড়ে গেছে তাঁর ভাবাকাশের উচ্চতা ও পরিধি এবং সেহেতু হয়তো সরে গেছে সাধারণের নাগালের বাইরে। তাই বলাকা-পূর্ব কাব্যের, গোরা-পূর্ব উপন্যাসের, অচলায়তন-পূর্ব নাটকের এবং গল্পসপ্তক-পূর্ব ছোটগল্পের পাঠকসংখ্যা যত বেশি, তাঁর পরবর্তী রচনার সমজদার তত কম।

অতএব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের শুরু আর শেষ একভাবে হয়নি। কোনো সত্যিকার প্রতিভাই ধ্রুবতায় অবসিত হয় না— হতে পারে না। কেননা অভাবিতকে ভাববদ্ধ করা, অচিন্ত্যকে চিন্তাগোচর করা, নিরবয়বকে অবয়ব দান করা প্রতিভার কাজ। প্রতিভা যুগের দান নয়— যুগের স্রষ্টা; অর্থাৎ প্রতিভা যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, যুগকে প্রভাবিত করে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভা বলে মানি। তাই তাঁর বক্র, বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবাহ যে-কোনো ঋজু সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আবার ভক্তি ও বিদ্বেষ—দু-ই যথাযথ ধারণা লাভের অন্তরায়। তাই কবির তিরোভাবের পঁচিশোর্ধ্ব বছর পরে রবীন্দ্র-বিচারে সতর্কদৃষ্টি ও অবিচলিত মন-মননের প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

২

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সৌন্দর্যপিপাসু। এ পিপাসায় অনন্যতা আছে। কেননা এ সৌন্দর্যবোধ প্যাগান নয়, গ্রীক নয়, আধ্যাত্মিকও নয়। শৈশবে চাকর নির্দিষ্ট খড়ির গণ্ডি তাঁর শারীর- বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করত বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিবাহী মানস-বিহার রোধ করা যায়নি। 'ফাঁক-ফুকরে' প্রকৃতি-নিসর্গ তাঁর হৃদয়দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। বাধা ছিল প্রবল, তাই আগ্রহ হল তীব্র, অনুভূতি হল তীক্ষ্ণ। ফাটা দেয়ালের গুল্মফুল, পুকুরপাড়ের নারিকেল গাছ, আকাশে মেঘের লীলা আর তারার অব্যক্ত বাণী শৈশবে-বাল্যে কবির মন ও হৃদয় হরণ করেছে। তাই আকাশচারিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শুরু। আকাশ থেকে তিনি মাটিতে নেমেছেন, ভূমি থেকে ব্যোমযাত্রা করেননি। গোড়া থেকেই অবশ্য মেশামেশি হয়ে গেছে ভূম আর ভূমায়, মাখামাখি ছিল জীবনে আর জগতে। কবি একেই জেনেছেন সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধন বলে। এ বোধের অনুগত ছিল বলেই বিহারীলালের কাব্য বালক-কবির মন জয় করেছিল। আর এ উপাদানের অভাবে মধুসূদনের কাব্য পেল তাঁর অবজ্ঞা।

৩

প্রকৃতি ও নিসর্গের সৌন্দর্যে মানুষ মাত্রই অল্পাধিক মুগ্ধ। কবিরা অনুভূতিপ্রবণ বলে তাঁদের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রভাব প্রবল। কিন্তু সাধারণ কবিতে তা যতখানি অর্জিতচেতনা, ততখানি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যানুভূতি নয়। কিন্তু কোনো কোনো কবি-মনে সেরূপ চেতনা গভীর, ব্যাপক ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। যে প্রকৃতি-চেতনা Words-worth- এর মনে বেদনাবোধ জাগিয়েছে, যে রূপ-অন্বেষা ও প্রেমানুভূতি শেলীকে আকাশচারী করেছে, যে সৌন্দর্যানুভূতি Keats-কে আনন্দিত করেছে, যে রূপমুগ্ধতা বিহারীলালকে তাত্ত্বিক করেছে, সেই সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রনাথে এনেছিল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্য অনুভূতি, একপ্রকারের মুগ্ধতা বা অভিভূতি, সারা জীবনেও কবি যার সীমা-শেষ খুঁজে পাননি। সে রূপ-মাধুরীর অনুভব কবিকে 'তিলে তিলে নতুন' করে তুলেছে।

কৈশোরে কবির একদিন সত্যি সত্যি সৌন্দর্যে সচেতন দীক্ষা হয়েছিল। এক উষালগ্নে "আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়ে গেল, দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" [জীবনস্মৃতি] —এই সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর চারদিন ছিল—এমনি অনুভূতি জেগেছিল আরো একদিন পূর্ণিমা রাতে—সৈকতে, তখন তিনি আমেদাবাদে।

"আমার শিশুকালেই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য বলিয়া দেখা দিত। ... সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত, সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত।" এবং গঙ্গার "পালতোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

"কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত, মনকে কোনো মতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।"— [জীবনস্মৃতি]

"আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি।" (—ছিন্ন পত্রাবলী ১৩)। "পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।" (—ছিন্ন পত্রাবলী ৯৩)। "সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে, তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়, আমি একলা থাকি, তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশ কালে কতখানি জাগ্রত তা বুঝতে পারি।" (—ছিন্ন পত্রাবলী ১৯৭)।

"সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে।.... সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ার শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাকে, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।" (—ছিন্ন পত্রাবলী ২৫)।

শৈশবে-বাল্যে তাঁর মন-আত্মা সৌন্দর্য-সমুদ্রে অবগাহন করে করেই পুষ্ট হতে থাকে। তাঁর নিজের জবানীতে এমনি আরো উদ্ধৃতি দেয়া সহজ, কিন্তু অশেষের পথে এগুব না। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে এমনি রূপদর্শী ও রসগ্রাহী ছিলেন, ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী তার সাক্ষ্য।

৪

প্রকৃতি বা নিসর্গ অখণ্ড কোনো বস্তু নয়— খণ্ড, ক্ষুদ্র ও বিচিত্র বস্তু ও বর্ণের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তার সৌন্দর্য অখণ্ড সত্তার স্বীকৃতিতেই লভ্য। অতএব, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতিই এ সৌন্দর্যবোধের উৎস। শৈশব-বাল্যেই এ বোধে অবচেতন দীক্ষা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

খণ্ড-ক্ষুদ্রকে সামষ্টিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্যে দৃষ্টি ও মননের যে-প্রসার প্রয়োজন, অন্যের পক্ষে যা পরিশীলনেও সম্ভব হয় না—রবীন্দ্রনাথে তা প্রায় অনায়াসলব্ধ। অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "The first stage of my realization was through my feeling of intimacy with nature." (Religion of man). প্রকৃতি কিংবা নিসর্গে সবকিছুই সুন্দর নয়—হ্রস্ব-দীর্ঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুগন্ধী-দুর্গন্ধী, মরা-তাজা, ভাঙা-মচকানো, ঋজু-বাঁকা, বর্ণালি-বিবর্ণ সব রকমই আছে। কিন্তু সৃষ্টির কিছুই তুচ্ছ নয়, নিরর্থক নয়—এ বোধের বশে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ প্রকৃতি-নিসর্গের দিকে তাকায়, তাহলে সর্বত্র একটা রহস্য, একটা কল্যাণচিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সহজ হয় :

এ মাঝে কোথাও রয়েছে কোনো মিল
নহিল এত বড় প্রবঞ্চনা
পৃথিবী কিছুতেই সহিতে পারিত না।

—এই আস্তিক্যবুদ্ধিই মানুষকে জীবন-রসরসিক করে তোলে তখন বিষ আর অমৃতের আপাত বৈপরীত্য ঘুচে যায়—দু-ই জীবনের অনুকূল বলে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের মুখে তাই শুনি—"আমি স্বভাতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে, আমি সমগ্রকে মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে— আমি মনে করি আমার ধর্মও তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজ সঞ্চরণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে।" (রবীন্দ্র-জীবনী-৩ : পৃ. ২৯৪)। "জগতের সঙ্গে সরল-সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি, আমি ধন্য।" যা কল্যাণকর তা-ই সুন্দর, তা-ই শ্রদ্ধেয় এবং তা-ই প্রিয়। এ অনুভবের গভীরতাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সঙ্গে একত্ব ও একাত্মবোধ জন্মায়। তখন সহজেই বলা সম্ভব 'যদি জানিবারে পাই ধূলিরেও মানি আপনা।' যাকে বিষ বলে জানি, সুপ্রয়োগে তা-ই প্রাণ বাঁচায়, অপপ্রয়োগে অমৃত হতে পারে জীবনঘাতী। দুর্ব্যবহারে ভাইও হয় প্রাণের বৈরী, আবার প্রীতি দিয়ে অরিকেও মিত্র করা সহজ। এ তত্ত্ব একবার উপলব্ধ হলে বিশ্বজগতের প্রাণী ও প্রকৃতির আপেক্ষিকতা তথা জীবনধারণ ব্যাপারে পারস্পরিক উপকরণাত্মকতা হৃদয়-গোচর হয়। তখনই বলা চলে, "আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না" (ছিন্ন পত্রাবলী ২৩৮)।—বোধের এমনি স্তরে প্রাণী, প্রকৃতি ও মানুষকে অভিন্ন সত্তার অংশ বলে না-ভেবে পারা যায় না। এরই নাম বিশ্বানুভূতি, এ তত্ত্বের ধর্মীয় নাম অদ্বৈতবাদ। এমনি করে রবীন্দ্রনাথে বিশ্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ জাগে। প্রভাত উৎসব, বিশ্বনৃত্য, অহল্যার প্রতি, বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি, মধ্যাহ্ন, প্রবাসী, মাটির ডাক প্রভৃতি কবিতায় তা সুপ্রকট।

"এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে।"

অতএব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-চেতনাই রবীন্দ্রচিত্তে বৈচিত্র্যে ঐক্য-তত্ত্বেরও বীজ বুনেছিল। এরই বিকাশে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একত্ব ও একাত্ম অনুভব করেছেন; আর এরই বিস্তারে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে তথা সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বোধে মানবিকতা, মানবতা, সর্বমানবিকবাদ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর এই মানবধর্মের সমর্থন রয়েছে বলেই উপনিষদ তাঁর প্রিয়। আর ঐক্যতত্ত্বের বিরলতার দরুনই স্মৃতি, পুরাণ ও গীতায় তাঁর অনুরাগ সীমিত।

এই সৌন্দর্যবুদ্ধি কীভাবে তাঁর স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে, তার পরিচয় নেয়াই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

৫

স্বদেশের ও য়ুরোপের এক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এদেশে তখন বুর্জোয়া আদর্শে নগরকেন্দ্রী জীবনচর্যা শুরু হয়েছে। "আমি এসেছি যখন ... নতুন কাল সবে এসে নামল।" ওদিকে সামন্ততন্ত্রী সমাজ ও নৈতিক জীবনবোধ গাঁয়ে গাঁয়ে তখনো অটল। কেননা তখনো গাঁয়ের নিয়তি-নির্দিষ্ট জীবনে ইংরেজিশিক্ষার ছোঁয়া লাগেনি।

বৃটিশ তখন দেশের মালিক, গ্রেট বৃটেনই তখন আমাদের বিলেত। সে বিলেতে শিল্পবিপ্লবের ফলে ফিউডেল সমাজ লুপ্ত; গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া সমাজ এবং এই ধনিক সভ্যতা তখন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত। সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজে পার্থক্য সামান্য নয়—সামন্তরা ছিল সংখ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগণ্য, কিন্তু দেশের মানুষের ধন-প্রাণের মালিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক, মান ও ঐশ্বর্যের প্রতিভূ, তারাই সব; আর সব তাদের প্রজা ও মজুর—ক্ষেতমজুর ও আফিসি মজুর।

আর বুর্জোয়াদের আছে বৃত্তি, বিত্ত ও বেশাত। তাদের মুখে হাসি, বুকে বল আর সংকল্পে ভরা মন। তারা আত্মরচনায় ও আত্মপ্রসারে ব্যাকুল। তারা ধনে কেবল ধনী নয়, মানস-সম্পদেও ঋদ্ধ। তারা জিজ্ঞাসু এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রপ্রিয়; কিন্তু কলারসিক, সংস্কৃতিপ্রাণ, কল্যাণকামী, সেবাধর্মী আর মহৎ ও বৃহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সামন্ত ছিল কয়েকজন, বুর্জোয়া হল কয়েক লক্ষ। তাদের ঐশ্বর্যের সীমা নেই, তাদের সৌজন্য অতুলনীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ হচ্ছে বুর্জোয়া জীবনের ও ঐশ্বর্যের সোনার যুগ। দ্বিতীয়ার্ধ এর ক্ষয়ের যুগ— আত্মধ্বংসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানির কাল। য়ুরোপে বুর্জোয়া জীবনের অবক্ষয়কালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কিন্তু বাঙলাদেশে সে অবক্ষয়ের সংবাদ তখনো পৌঁছেনি। বুর্জোয়া সমাজের আত্মিক ও আর্থিক ঐশ্বর্যের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ লালিত। বুর্জোয়ার এই প্রাণময়তা, উদারতা, সংস্কৃতিবানতা ও বিলাস-বাঞ্ছা শহুরে বাঙালির হৃদয়-মন হরণ করেছিল।

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রধান। এঁরা উভয়েই চাকরি ও ব্যবসা করে সম্পদ অর্জন করেন এবং সবটা সদুপায়েও নয়। এঁরা দুজনেই ছিলেন সাহেব-ঘেঁষা এবং ইংরেজ-প্রীতি এঁদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল। তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। রামমোহন ছিলেন বিদ্বান ও প্রজ্ঞাবান—এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রাণের বাণীটি তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর উদারতা, গ্রহণশীলতা ও আন্তর্জাতিক চেতনা তা-ই ছিল সে-যুগে অতুলনীয়।

দ্বারকানাথ বিদ্বান না হলেও বুদ্ধিমান ছিলেন। নতুন যুগের বৈষয়িক প্রসাদে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। তাই শৌখিনতায়, বিলাসিতায়, দানশীলতায় ও সাহেব-প্রীতিতেই তাঁর নতুন জীবনচেতনা অবসিত। মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বর্জনশীল, গ্রহণশীল ছিলেন না। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও আমরা এই রক্ষণশীলতাই কেবল লক্ষ্য করি, তাঁর অধ্যাত্মবুদ্ধি তাঁকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ করেছিল, কিন্তু উদার করেনি। এই অনুদারতার জন্যেই তিনি সাহেবদের এড়িয়ে চলতেন, ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের ধারক ছিলেন, রামমোহন চরম তাচ্ছিল্যে যে-পৈতার শিকল ছিঁড়লেন, তিনি নতুন করে সেই পৈতার-বন্ধন স্বীকার করেই গর্ববোধ করলেন। অতএব, রবীন্দ্রনাথ পিতা থেকে উদারতার কিংবা প্রতীচ্য প্রাণময়তার দীক্ষা পাননি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেকটা বাপের মতোই ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ তাঁকে অনুদার রেখেছিল, অতএব পারিবারিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা বা সর্বমানবিক বোধের অনুকূল ছিল না। তাই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঁয়তাল্লিশ বছর কেটেছে অন্যের প্রভাবে। এ সময়েও অবশ্য কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্ববোধের প্রকাশ ও বিকাশ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন ছিল। যদিও কালিদাসের প্রভাবে প্রাচীন ভারত, তপোবন আর ব্রাহ্মণ্য মহিমায়ও তিনি প্রায় সমভাবেই মুগ্ধ ছিলেন, তবু তাতে বিরোধ ঘটেনি, কেননা সেখানেও তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে ত্যাগ; ভোগের মধ্যে সংযম এবং প্রেমের মধ্যে তপস্যার বীজ ও মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে স্বাদেশিক, স্বাজাতিক ও স্বধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁরও প্রশ্রয় পেয়েছে। কৈশোরেই তিনি সঞ্জীবনী সভার সদস্য, হিন্দুমেলার উৎসাহী কর্মী, স্বজাতির ঐতিহ্যগর্বী ও গানের মাধ্যমে স্বদেশপ্রীতি প্রচারে ব্রতী। পারিবারিক জীবনেও অশিক্ষিতা বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে কিংবা নিজের বালিকা কন্যার বিবাহদানে কোনো সংকোচ ছিল না তাঁর। তাঁর এই ব্যবহারিক ভুবনে তাঁর চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—তাঁর পিতা ও তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-তিলক প্রমুখ উগ্র স্বাজাত্যগর্বীদের প্রভাবে।

এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাঁর সময় লেগেছে। জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর কেটে গেছে দেশ-জাত-ধর্মের খোলসমুক্ত হতে। অবশ্য এর মধ্যেও যে তাঁর বিদ্রোহ দেখা দেয়নি তা নয়। এ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক স্মরণীয়। এ যেন বাল্যের সেই খড়ির গণ্ডি থেকে বাইরের পানে তাকানো। তাঁর নিজের উক্তিতে প্রকাশ: "নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন চারিদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে, যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।" (আত্মপরিচয়)।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্যই প্রতিভাসুলভ কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা বৈচিত্র্য নেই। সেদিক দিয়ে তাঁর নিতান্ত সাধারণ জীবন। ব্যারিস্টার হবার চেষ্টা, জমিদারি কাজে নিষ্ঠা, ব্যবসায়ে প্রবণতা, সমিতির কর্মে আগ্রহ, শিক্ষকতায় ও স্কুল পরিচালনায় উৎসাহ, গার্হস্থ্য কর্তব্যে প্রযত্ন প্রভৃতি তাঁর বৈষয়িক জীবন-নিষ্ঠার পরিচায়ক—প্রতিভার সাক্ষ্য নয়। এমনকি প্রেমের ব্যাপারে তাঁর চিত্ত-বিভ্রান্তির পরিচয়ও দুর্লভ। যদিও তিনি বলেছেন, "কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি।" (রবীন্দ্র জীবনকথা, পৃ. ২৬)। অতএব তিনি প্রতিভা-দুর্লভ অসামান্য স্থিতধী এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এমন অবলীলায় আত্মনিয়ন্ত্রণের নজির প্রতিভাবানদের চরিত্রে দুর্লক্ষ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ভাবের জীবনে ও বাস্তব জীবনে সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল। একটি অপরটিকে কখনো লঙ্ঘন করেনি, করেনি আচ্ছন্ন।

৬

স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতার নির্মোক মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধি-প্রসূত বিশ্বচেতনা দিয়ে—তাঁর কাব্যজগৎ যেমন রচনা করেছিলেন, তেমনি করে তাঁর ব্যবহারিক ভুবন নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, মানব-জগতেও পেলেন সে-তত্ত্বের সন্ধান। যে-তত্ত্বচিন্তা প্রকৃতির মধ্যে কল্যাণচিহ্ন ও সুষম সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল, সে-তত্ত্ববুদ্ধিই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মানুষের একত্বে ও একাত্মতায় বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল; এ অভিন্ন সত্তাবোধে উৎসাহিত হয়েই তিনি বিশ্বমানব ঐক্যে আস্থা রেখেছিলেন। অবশিষ্ট জীবনে তাঁর চিন্তা ও কর্ম এ-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একালে ঔপনিষদিক বিশ্বচিন্তা আর গৌতমবুদ্ধের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্ব তাঁকে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ বোধের অঞ্জন চোখে মেখেই তিনি প্রাচীন ভারতের দিকে তাকিয়েছিলেন, ফলে সেকালের সমাজে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দ্রোহ কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি; তিনি দেখেছেন বহুত্বেও একের অবয়ব, স্বাতন্ত্র্যেও সামঞ্জস্য, শ্রেণীসমন্বিত ও বর্ণেবিন্যস্ত সমাজে প্রীতিপ্রসূত কর্তব্য ও দায়িত্ব-সচেতন ব্যষ্টি। তাঁর এ দৃষ্টিতে ইতিহাস চেতনা নেই, কিন্তু সৌন্দর্যবুদ্ধিজাত আদর্শিক প্রেরণা আছে। তাঁর মতে :

"আসল কথা, মানুষের ইতিহাসে মানুষের মনটা সবচেয়ে বড় জিনিস" (মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস), ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানব-মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস" (ঐতিহাসিক চিত্র)। "ইতিহাস কেবল জ্ঞান নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়" (ইতিহাস কথা)।

আজকের ভারতের রাষ্ট্রিক Secularism-এ এ-বোধের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এ বোধই প্রবর্তিত ও প্রচারিত আচারিক ধর্মের প্রতি তাঁকে বীতরাগ করেছে; মানুষের ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন মানুষের চিত্তোত্থিত কল্যাণবুদ্ধি ও আত্মজ প্রীতি— যে-প্রীতি চরাচরের সবকিছুকে আপন বলে গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়, যে-প্রীতি কর্তব্য ও দায়িত্ববুদ্ধি জাগিয়ে রাখে।

অদ্বৈতবাদী তথা বিশ্ব-ঐক্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের এসব মৌলিক চিন্তা। এ চিন্তা থেকেই তাঁর স্বাদেশিকতা বিশ্বচিন্তায় এবং তাঁর জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত, আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীতে উন্নীত। এজন্যেই দেশের স্বাধীনতার চেয়ে সমাজ-গঠনকে তিনি জরুরি ভেবেছেন, সরকারি সাহায্যের চেয়ে আত্মশক্তির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন, আর ঐশ্বর্যের চেয়ে মর্যাদাবোধের এবং সচ্ছলতার চেয়ে সততার দাম তাঁর কাছে বেশি ছিল। এজন্যেই খেলাফত আন্দোলনকালে গোঁজামিলে হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রতিষ্ঠার নিন্দা করেছেন তিনি, গান্ধীর যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্প-বিমুখতা পছন্দ করেননি, পারেননি য়ুরোপীয় শিক্ষা বর্জনে সায় দিতে। কেননা য়ুরোপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁসের দানকে তিনি মানব-নির্বিশেষের জন্যে আশীর্বাদ বলে মনে করতেন, একে গ্রহণ করেছিলেন মানুষ অবিশেষের ঐতিহ্য বলে। একে মানুষের আত্মার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে জানতেন ও মানতেন। তাই আধুনিক য়ুরোপ ও ঔপনিষদিক ভারত তাঁর মন হরণ করেছিল।

ফাঁকির দ্বারা কোনো ফাঁক পূরণ ছিল তাঁর আদর্শ-বিরোধী। কেননা তিনি গৌতমবুদ্ধের মতো 'কারণ নিরূপণ ও উপায় নির্ধারণ' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ যে-কোনো কিছু গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। এটি তাঁর সেই সৌন্দবুদ্ধিজাত ঐক্যতত্ত্বেরই প্রভাবের ফল। তাঁর শেষজীবনে ইতিহাস-চেতনা, বিজ্ঞানবুদ্ধি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রবল হয়। এখানেও তিনি সমাধান খুঁজেছেন সৌন্দর্যবুদ্ধিপ্রসূত একত্ব ও একাত্মতত্ত্বে তথা বিশ্বজনীনবোধের স্বীকৃতিতে। অতএব এখানেও তিনি অধ্যাত্মবাদী ও অদ্বৈতবাদী। তাই কামনা করেছেন মহামানবের আবির্ভাব, যিশু-বুদ্ধের মতো প্রেম ও মৈত্রীবাদীর নেতৃত্ব। তাঁর এ অধ্যাত্মবুদ্ধি বিজ্ঞান-বর্জিত নয়। তাই ঔপনিষদিক জ্যোতিষ্মান পুরুষস্বরূপ সবিতা আর বিজ্ঞানীর জগৎ-কারণ সূর্য তাঁর চিন্তায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনের শেষ দশকের রচনা তাই 'সবিতা'-কেন্দ্রী। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ইতিহাস-চেতনা এখানে প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত; এই প্রজ্ঞার আলোকে তিনি সমাধান খুঁজেছেন বর্তমানের বিশ্বমানব সমস্যার।

রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম মুহূর্তে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড় আবার শুরু হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রসার লাভ করেছে। ধনিক সভ্যতার অবসান-প্রায় সোনার যুগে তাঁর আবির্ভাব আর সমাজতন্ত্রের বিকাশ মুহূর্তে তাঁর তিরোভাব—তাই ইতিহাস ও বিজ্ঞান-সচেতন না হয়ে পারেননি তিনি।

তাঁর ধারণায় : যেখানে symmetry, harmony ও symphony নেই, সেখানে সত্যও নেই। সত্য ও কল্যাণের পথ দুরূহ কিন্তু গন্তব্য নিশ্চিত শান্তির। 'সত্য যে কঠিন—সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

কিন্তু সাধারণ লোক যতটা আপাত-প্রয়োজন-সচেতন, ততটা দূরদর্শী নয়—আশু ফল প্রাপ্তিই তাদের লক্ষ্য। এ কারণেই কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্যে তিনি যা-কিছু করেছেন ও করতে চেয়েছেন, তা কৃষকদের মধ্যেও সমাদৃত হয়নি। তাঁর রাজনৈতিক মতও উপহাস পেয়েছে, তাঁর সমাজচিন্তা পেয়েছে অবহেলা।

AMARBOI.COM

৭

আজকের দিনে কে না স্বীকার করে যে, খণ্ড-ক্ষুদ্র হয়ে এ-যুগে কেউ বাঁচতে পারে না। বাঁচবার পক্ষে সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য—ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে এ সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থা অবধি সংহতি ও সহযোগিতা লক্ষ্যে গঠিত অসংখ্য সংস্থায় দুনিয়া ভরে গেছে। এ তো সেই বিশ্বানুভূতিরই ফল—সেই বৈচিত্র্যে ঐক্য সন্ধানের, স্বাতন্ত্র্যে সমন্বয় সাধন প্রয়াসের ও সর্বমানবিকবাদের স্বীকৃতি। অথচ অর্ধশতাব্দী আগে এ তত্ত্ব উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ উপহাসই পেয়েছেন। "একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে।... মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে-চিন্তা করতে হবে, সে-চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।" (সত্যের আহ্বান)

অতীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে মনীষা আর মনীষাকে কবিত্ব বলে জেনেছি। তাঁর বিশ্বচেতনা ও অদ্বৈতবোধ Mysticism বলে অবহেলা পেয়েছে আমাদের। তাঁর যুগচেতনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগসমস্যার সমাধান প্রয়াস কবির স্বাপ্নিক-কাঙ্ক্ষা বলে হয়েছে উপেক্ষিত। ফলে রবীন্দ্রচিন্তা তাঁর স্বদেশেও গুরুত্ব পায়নি।

আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও তাঁর ঔপনিষদিক 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-বাদ আজকের দুনিয়ায় কবি-কল্পিত তত্ত্বমাত্র নয়, অতি গুরুতর তথ্য এবং মানবজীবনের নিরেট সত্য। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সেই মানবতা, সর্বমানবিকতা বা বিশ্বজনীনতা ও সেই 'মৈত্রীধর্ম' আজ জয়ের পথে, —দেখতে পাই।

৮

পৃথিবীর কোনো একক ব্যক্তির রচনার এমন বিপুল ও বিচিত্র বিস্তার আর দেখা যায়নি। এমন সর্বতোমুখী ও সর্বত্রগামী ভাব-চিন্তা-কর্মও অদৃষ্টপূর্ব। অবশ্য গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-প্রবন্ধে তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখক য়ুরোপখণ্ডে বিরল নয়, কিন্তু কাব্যজগতে বিশেষ করে গীতিকবিতার ও গানের ভুবনে তাঁর তুলনা বিরল। অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, বৈচিত্র্যে, চিত্রায়ণে, মাধুর্যে, তাৎপর্যে, উৎকর্ষে আর অনেকতায় তাঁর গান ও গীতিকবিতা প্রায়-অনুপম। তাঁর স্বভাষী তাঁর কাছে পেয়েছে সৌন্দর্য দেখার চোখ, সুরুচির পাঠ, মানবতার বোধ ও বিশ্বজনীনতায় দীক্ষা। তাঁর কাছে পেয়েছে তারা মুখের ভাষা, কণ্ঠের সুর, প্রাণের প্রীতি, চরিত্রের দার্ঢ্য, আত্মসম্মান বোধ, আনন্দের কাঙ্ক্ষা ও জীবনে প্রত্যয়। আজকের সংস্কৃতিবান মানবতাবাদী বাঙালি মাত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ সন্ধানে

১

১৯৬১ সনে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর উক্তিতে সৌজন্যের অভাব ছিল, হয়তো ছিল রুক্ষতা। নইলে তিনি চক্রব্যূহে পড়বেন কেন! রবীন্দ্র-পাঠক-সমালোচক সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের উপর য়ূরোপের প্রভাব প্রচুর। সমালোচকরা তা কখনো গোপন রাখেননি, ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁকিয়ে বলেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তিনি কোথাও গোপন করবার চেষ্টা করেছেন বলে তো মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসুর কথাগুলো বড় কাটা কাটা ছিল, তিনি রেখে- ঢেকে বলবার চেষ্টা করেননি। ঋজু-পষ্ট কথায় শত্রু বাড়ে। বুদ্ধদেব বসু তাই নিন্দা-গালি পেয়েছেন। মানস-সংকীর্ণতা যাঁদের রয়ে গেছে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন ভারতের ও ঔপনিষদিক ঋষির আধুনিক রূপান্তর হিসেবে গ্রহণ করে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হতে চান। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যে তাঁরাই হয়েছিলেন অসহিষ্ণু।

AMARBOI.COM

২

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ছোঁয়া প্রথম যে বাঙালির অন্তরে লেগেছিল তিনি রামমোহন রায়। এই রামমোহনের ভক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ আর ভাব-শিষ্য ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহনের মনীষা ও উদারতা এঁদের ছিল না বটে, কিন্তু রামমোহন পশ্চিমের যে-জানালা খুলে দিলেন, তা বন্ধ করবার সাধ্য ছিল না কারো। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব পেয়েছিলেন পশ্চিমের এই বাতায়নিক হাওয়া। তাঁর বড়ভাইরা বাড়িটাকে পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত চর্চার কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতে প্রকাশ: "আমি এসেছি যখন ... (বাড়িতে) নতুন কাল সবে এসে নামল।"— এ নতুন কাল পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। তাছাড়া য়ূরোপীয় রেনেসাঁসের বিভায়, ফরাসি বিপ্লবের মহিমায় এবং তাঁর সমকালীন প্রতীচ্য বুর্জোয়া সমাজের কল্যাণবুদ্ধি ও আত্মার ঐশ্বর্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। এ মানস-সম্পদ আহরণে তাঁর প্রযত্নও কম ছিল না। ইংরেজকে তিনি জেনেছেন 'য়ূরোপের চিত্তদূত'রূপে, "মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়?... বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা।... প্রতি দিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।" (কালান্তর)।

কোনো বা কারো ভাব-চিন্তা-আচরণ নিজের মতো করে গ্রহণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। স্বীকরণ বা স্বাঙ্গীকরণও সামর্থ্য-সাপেক্ষ কাজ। সে সবাই পারে না—সাধারণে পারে না। তার জন্যেও প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলেই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্যতা বোঝা যাবে।

৩

নতুনকে বরণ করার ব্যাকুলতা সত্ত্বেও ঈশ্বরগুপ্ত যে নতুনকে গ্রহণ করতে পারলেন না, সে তো শক্তির অভাবে নয়— শিক্ষার অভাবে। আসলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালির চোখ ধাঁধিয়ে ছিল, মন রাঙাতে পারেনি; তাই অমন যে বিদ্বান ও প্রাণবান মধুসূদন, তিনিও পারলেন না কোলরিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীটস্-টেনিসনের ভাবাকাশের ভাগী হতে। বিএ পাস [illegible] গীতিকবিতার প্রাণের সন্ধান। [illegible] লালের সম্ভাবনাও যে

তাত্ত্বিকতার মরুবালিতে দিশা হারাল, সে তো ইংরেজি না-জানার জন্যেই। দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংবা অক্ষয়কুমার বড়ালের গীতোচ্ছ্বাসেও কৃত্রিম অনুকৃতি যতটা আছে, আত্মার সাড়া নেই ততটা। আর কত বলব!

রামমোহনের পরে পাই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তকে, যাঁরা য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা ও বিজ্ঞানকে বরণ করবার জন্যে ছিলেন উন্মুখ, কিন্তু তাঁরা সৃজনশীল নন। সৃজনশীল প্রতিভা নিয়ে যিনি য়ুরোপকে নিজের মতো করে এবং প্রয়োজন বুদ্ধি নিয়ে গ্রহণ করতে জেনেছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কথা পরে হবে। তার আগে খাস ঠাকুর পরিবারেই দেখা যাক। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে হিন্দুয়ানীর উপরে উঠতে পারলেন না, সেকি ঔপনিষদিক জ্ঞানের অভাবে! তা হলে মানতেই হবে, গ্রাহিকাশক্তি ও গ্রহণের আগ্রহ থাকা চাই। মনের দুয়ার খুলে দিয়ে চিত্তলোকে আসন পেতে দেবার মতো সংস্কার-মুক্তি ও উদারতা না থাকলে কোনো নতুনকেই বরণ করা যায় না— পাওয়া যায় না নতুনের প্রসাদ!

নতুনের তরঙ্গাভিঘাত গায়ে দাগ কাটতে পারে কিন্তু মনে রঙ লাগাতে পারে না। তার প্রমাণ দু'শ বছর ধরে ঘরে-বাইরে দেখা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিক জীবনের কিছুই গ্রহণ করতে পারেনি টোল-মাদ্রাসার লোক। এসব যে তারা এড়িয়ে চলে, সে কি মন্দ বলে, না বিচারশক্তির অভাবে? সে-জগতে এখনো মধ্যযুগ— এখনো বিদিশার নিশা কেন,—ইংরেজি ভাষাবাহী আলোর অভাবেই তো। 'য়ুরোপের চিত্তদূত' ইংরেজ বা ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে আমরা কি অন্তহীন মধ্যযুগ অতিক্রম করতে পারতাম, পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যতীত আফ্রো-এশিয়ার কোথাও মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে কি? এ সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই যে, পাঁচশ' বছর আগে সূর্য উদিত হয়েছে পশ্চিমে—সেই যেদিন ইতালিতে রেনেসাঁসের শুরু। পাঁচশ বছর ধরে ভাব-চিন্তা-জ্ঞানের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে পশ্চিম থেকেই। সে-রশ্মি থেকে যে মুখ ফেরাবে সেই বেঁচে-বর্তে থাকার অধিকার থেকে নিজেকে করবে বঞ্চিত। বিজাতীয় বলে সঞ্জীবনী-রশ্মির আলোয় অবগাহনে লজ্জাবোধ করা নির্বোধের আহাম্মকি মাত্র। কেননা কল্যাণপ্রসূ ভাব-চিন্তা-জ্ঞান চন্দ্র-সূর্যের মতোই মানুষ অবিশেষের সাধারণ সম্পদ। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের স্থিতি অনুসারে প্রভাবের তারতম্য ঘটে, কিন্তু প্রয়োজনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

www.amarboi.com

৪

প্রতীচ্য প্রভাবিত জীবনচেতনা দুইভাবে প্রকটিত হয়েছে। একটা হচ্ছে প্রতীচ্য চিন্তা ও আদর্শকে সোজাসুজি স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস—এ প্রয়াস ছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সৈয়দ আহমদ, রবীন্দ্রনাথ ও জওয়াহেরলাল নেহেরুর।

আর একটি ছিল গ্রহণ-বর্জনের মধ্যপন্থায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রয়াস—এটি মূলত নির্মাণ ক্রিয়া নয়—মেরামতি কর্ম। এ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সৈয়দ আমীর আলী, জালালউদ্দিন আফগানী, ইকবাল, গোখেল, তিলক, গান্ধী প্রমুখ।

এ দ্বিতীয় দলের জাতীয় অভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁরা প্রকাশ্যে য়ূরোপীয় কিছু গ্রহণ করতে অপমান বা লজ্জাবোধ করতেন। তাই তাঁরা খিড়কিদোর দিয়েই য়ূরোপকে জানালেন সম্ভাষণ, বরণ করলেন নেপথ্যে কিন্তু সমাদরে। এঁদের মধ্যে আবার বঙ্কিম, ইকবাল ও গান্ধীর স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক চেতনা ছিল প্রায় উগ্র-গোঁড়ামিরই নামান্তর। এঁরা আধুনিক জীবনচেতনা এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত ও পাঠ লাভ করলেন য়ূরোপ থেকে, কিন্তু ঠাটটা রাখতে চাইলেন পুরোপুরি দেশী—যাতে মনে হবে দেশের অবহেলিত পুরানো ঐতিহ্য ও আদর্শরূপ গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ার ফলেই যেন দেহের জরা ঘুচে এল যৌবনের উত্তাপ, মনের জড়তা ঘুচে জাগল প্রাণের সাড়া, কুটিরের জীর্ণতা ছাপিয়ে এল প্রাসাদের জৌলুস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

বঙ্কিম-সাহিত্যেও মিলবে আমাদের এ ধারণার সমর্থন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনী-কৃষ্ণচরিত্র-সাম্যবাদ রচনার পেছনে যে জীবনচেতনা, আদর্শ ও প্রেরণা ক্রিয়া করেছে, তা তিনি দেশ থেকে পাননি। তাঁর লোকরহস্য বা কমলাকান্তের দপ্তরে যে দৃষ্টির পরিচয় মেলে, তা ইংরেজি-না-জানা লোকে লভ্য নয়। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্র যোগ দেননি, কিন্তু য়ূরোপীয় monogamy তাঁর মন হরণ করেছিল। নইলে, এই বহুপত্নীকতা ও উপপত্নীকতার দেশে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এর মতো tragedy রচনা করতে পারতেন না। সমাজে যা সমস্যাই নয় বরং রীতি, তা-ই তাঁর উপন্যাসে জীবন-বিধ্বংসী প্রাণ-বিনাশী সমস্যা হয়ে উঠল কী করে! ইংরেজ civilian ও তাঁদের পত্নীরাই ছিল বঙ্কিমের আদর্শ নারী-পুরুষ। তাই মাতৃঘটিত কলঙ্কের দায়ে যে বধূ পরিত্যক্তা হল, পরপুরুষের সঙ্গে যে দস্যুবৃত্তি বা রাজনীতি করে বেড়াল, সেই প্রফুল্ল আবার উনিশ শতকী হিন্দুর ঘরে সমাদরে বৃতা হল, প্রতিষ্ঠিতা হল সগৌরবে। এ উদারতা কি ভারতীয়? কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুয়ানী অনেকটা ভেতরের কোট-প্যান্টালুনের উপর ধুতি-চাদর পরার মতো। ইকবালের ইসলামী জীবনও অনেকটা এরূপ। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—উনিশ বিশ শতকে প্রতীচী প্রভাবিত হিন্দুর জীবনচেতনা গীতার আদর্শ ও প্রভাবের প্রলেপে বিকাশ লাভ করেছে। রেনেসাঁসের মর্মবাণী, মানবমূল্য বা মানবমহিমা—তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেনি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-সুভাষচন্দ্র কিংবা গোখেল-তিলক-গান্ধী সবাই গীতাপন্থী। কেবল রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, জওয়াহের লালে প্রত্যক্ষ করি ব্যতিক্রম। কেননা তাঁরা য়ূরোপীয় রেনেসাঁসের আত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। সাগর যে দেখেছে, সরোবরে কি তার মন ওঠে!

৬

য়ূরোপীয় রেনেসাঁসের চরম ফল মানবতাবোধ তথা মনুষ্যত্ব ও মানবমহিমার উপলব্ধি। একালে নির্বর্ণ মানবতায় দীক্ষা খ্রীস্টান য়ূরোপ থেকেই আসে— আসলে আসে বুর্জোয়া য়ূরোপ থেকে। এই বুর্জোয়া সমাজ রেনেসাঁসের ঐতিহ্যে লালিত। য়ূরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের স্বর্ণযুগে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-যৌবন কেটেছে। তখন য়ূরোপীয় কবি, মনীষী, দার্শনিক বিজ্ঞানীদের ভাব, চিন্তা ও জ্ঞানের দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট নন কেবল, একেবারে অভিভূত। য়ূরোপীয় আত্মার ঐশ্বর্যে তিনি মুগ্ধ! রবীন্দ্র প্রকৃতির অনুগ ছিল বলে বিশ্বমানবের অদ্বয় সত্তায় তাঁর আস্থা দৃঢ়তর হয়। প্রকৃতি-প্রীতি রবীন্দ্র- স্বভাবের অঙ্গ। "সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা, আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে।" (ছিন্ন পত্রাবলী পৃ. ২৫)।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক সত্তার বোধ তাঁর কৈশোরেই জাগে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগের মাধ্যমেই তাঁর চিত্তে বিশ্বাত্মার ধারণা দানা বাঁধে। এই ঐক্যবোধের বিকাশে প্রকৃতি ও জীবজগতে একক সত্তা এবং একাত্মার বোধ জন্মে। এ কাব্যিক-চেতনাই য়ূরোপীয় মনীষার প্রভাবে মানবাত্মার অভিন্নতায় ও মানবমহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে নির্বর্ণ বিশ্বমানবপ্রেমরূপে মহিমান্বিত হয়। য়ূরোপ থেকে পাওয়া এই ঔদার্যবোধ, এই বিশ্বাত্মবোধ এবং মানব নির্বিশেষের সহযোগ ও সহঅবস্থান নীতির সাদৃশ্য ও সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন কবি উপনিষদে, বুদ্ধের বাণীতে, মধ্যযুগের সন্তদের সাধনায় ও বাউলের কণ্ঠনিঃসৃত গানে! এসব ভারতের নিজস্ব সাধনা ও মনীষার ফসল।

উপনিষদ থেকে বাউলের বাণী অবধি কোনোটাই ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। শঙ্করাচার্য উপনিষদকে জনপ্রিয় করেছিলেন, কিন্তু এগুলো আধ্যাত্মিক ছাড়া অন্য তাৎপর্যে কখনো গৃহীত হয়নি এদেশে। বৌদ্ধধর্ম যেমন তার জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে; উপনিষদ যেমন স্মৃতি, পুরাণ ও গীতার চাপে পড়ে গুরুত্ব হারিয়েছে; সন্তক-পন্থীরা তেমনি সমাজচ্যুত হয়ে মঠে-মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। অতএব এগুলোকে নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করার প্রেরণা ও দীক্ষা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুরোপ থেকেই। তাঁর কাব্য-নাটকের প্রতিপাদ্য হয়েছে ঔপনিষদিক বিশ্বাত্মবাদ, বৌদ্ধ করুণা ও মৈত্রীতত্ত্ব, সন্ত-বাউলের প্রীতি ও অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা। এই বোধের আলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, নির্দেশ করেছেন সমাজ সংগঠনের উপায়, আদর্শ খুঁজেছেন রাজনীতির, ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের ধর্ম, দিশা পেয়েছেন জীবনচর্যার।

মনুষ্যত্ব ও মানবমহিমা ঘোষণাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রত। বৌদ্ধ ও হিন্দু ভারত থেকে তিনি এই মানবমহিমা প্রকাশের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাই ত্যাগে বা ক্ষমায়, দুঃখে বা দ্রোহে, সেবা বা সহিষ্ণুতায়, চরিত্রে বা প্রত্যয়ে, প্রীতিতে বা প্রেমে, আত্মসম্মানে বা কর্তব্যনিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায় বা অনুরাগে, আদর্শ চেতনায় বা সংকল্পে, আত্মিক বিশ্বাসে বা ন্যায়সত্যের প্রতিষ্ঠায় মানুষ যেখানে মহৎ সেই কাহিনী, ঘটনা বা চিত্রই তিনি তাঁর রচনার অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনচেতনা প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীর মাধ্যমে আজকের বাঙালির উদ্দেশে পরিব্যক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতো মানুষ যেখানে ক্রোধ, ক্ষোভ, স্বার্থ ও হিংসাবশে বাহুবল সম্বল করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামে রত, তেমন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী বা ঘটনা অবলম্বনে জাতীয় শৌর্যবীর্য ও গৌরব প্রকটনে তিনি উৎসাহ বোধ করেননি।

৭

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদৃষ্টি—এই আদর্শচেতনা য়ুরোপ থেকে পাওয়া এবং রেনেসাঁসের দান। আমরা—বাঙালিরা জানি, গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য নয়—এমনকি জনপ্রিয় কাব্যও নয়। অথচ য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা গীতাঞ্জলির কবিরূপেই। কেননা গীতাঞ্জলিতে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে, যা য়ুরোপে নতুন ও প্রয়োজন। বিশেষ করে বুর্জোয়াসমাজ যখন ধনে-মনে কাঙাল হয়ে উঠছে, আত্মধ্বংসী সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্বে যখন রাজ্যগুলো পরস্পরের উপর মরণবাণ ছোড়বার জন্যে তৈরি, বুদ্ধিজীবীরা ও হৃদয়বান মানুষেরা যখন স্বস্তি-শান্তির উপায় সন্ধানে অস্থির; য়ুরোপীয় বিবেকের সেই মৃত্যু-মুহূর্তে গীতাঞ্জলি অধ্যাত্মরস সিঞ্চন করে বিক্ষুব্ধ আত্মার জ্বালা নিবারণে ক্ষণিকের জন্যে সহায়ক হয়েছিল।

তাঁর অন্যান্য কাব্য-গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটক য়ুরোপে তেমন সমাদৃত হয়নি। কেননা সেসবের মধ্যে যে বাণী আছে, তা য়ুরোপে দুর্লভ নয়—অজ্ঞাতও নয়, বরং য়ুরোপের মানস-সম্পদের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্র-রচনায় যেখানে অধ্যাত্মবুদ্ধি ও তত্ত্বরস আছে, য়ুরোপ তাকেই দুর্লভ সম্পদ জ্ঞানে বরণ করে আনন্দিত হয়েছে।

এ যুগে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে প্রাচ্যের মহত্তম প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ মনীষী, প্রতীচ্য আত্মার দূত, আধুনিকতার বাণীবাহক, মানবতা, মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার উদ্গাতা যুগন্ধর ও যুগস্রষ্টা। কিন্তু য়ুরোপের চক্ষে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি ও মনীষী মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের শিশুরা ঘনিষ্ঠজনের ছাড়া আর যে-নামটির সঙ্গে গোড়াতেই বিশেষভাবে পরিচিত হয় তা রবীন্দ্রনাথ। আমাদের শিক্ষালয়ে রোজ লক্ষ লক্ষ মুখে যে নামটি উচ্চারিত হয় সে রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তারে-বেতারে যাঁর নাম, সুর ও সংগীত প্রতিদিন পাক-ভারতের ঘাটে-মাঠে, আকাশে-বাতাসে শোনা যায়, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

তিনি আমাদের ভাষা দিয়েছেন, কথা যুগিয়েছেন। আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন-উপায় ও লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাব-চিন্তা তাঁর কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও রম্য রচনায় প্রমূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আলো-বাতাসের মধ্যেই বেঁচে আছি বটে, কিন্তু এদের দান আমাদের জীবনে কতখানি, সে সম্বন্ধে আমরা যেমন সচেতন নই। তেমনি আমরা যে-ভাষা মুখে বলি, লেখায় লিখি, যে সুরে গান গাই, যে ছন্দে লিখি, যা ভাবি, যা জানি, যা উপলব্ধি করি—তার কতখানি যে রবীন্দ্রাথের, তা মনেও জাগে না। 'ভাষা ও ছন্দ' কিংবা 'পুরস্কার' কবিতায় কাব্য ও কবি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা আমাদের জীবনে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছে। অন্যের কথা জানিনে, আমার চিত্তাকাশে রবীন্দ্রনাথের রচনার দান অনেকখানি, জীবনের বহু দুঃখ-বেদনার মুহূর্তে অনেক হতাশা-নিরাশার দুর্দিনে, নানা আপদ-বিপদের দুর্যোগে, আর সুখ-সৌভাগ্যের আনন্দিত দিনে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার জীবনপথের পাথেয় হয়ে আছে। জীবন-রস-রসিক রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় মানুষ। তিনি জানতেন, আর সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাসও করতেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'বসুদৈবকুটুম্বকম'। তিনি নিজেই বলেছেন "আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে— যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

তিনি সর্বত্র সুন্দর ও সুন্দরের প্রশান্ত দান আনন্দকে দেখেছেন, তাঁর সাধনা ছিল এই সুন্দরকে চাওয়া ও পাওয়ার সাধনা। তিনি পরমহংসের মতো সুন্দরকে পেয়েওছেন। তাই তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বলতেও পেরেছেন "আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি, আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম।"

তাই তিনি "আকাশ-জল, বাতাস-আলো' আর প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবেসেছেন, যে-ভালোবাসায় কোনো ভেদ-বিচার ছিল না। বিশ্বের অণুপরমাণুকে জ্ঞাতি বলে মেনেছেন, 'যদি জানিবারে পাই ধূলিরেও মানি আপনা'। এ প্রসঙ্গে প্রবাসী, বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। তিনি চারদিক থেকে জীবন-রস আহরণ করেছেন, দুহাত ভরে তুলে নিয়েছেন জীবনের প্রসাদ। বলেছেন : 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' তৃপ্ত হৃদয়ে তাই জীবনসায়াহ্নে তিনি বলতে পেরেছেন :

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণ-লিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে।

বলেছেন :

যাবার বেলায় এ কথাটি বলে যেন যাই
যা পেয়েছি, যা দেখেছি তুলনা তার নাই।

এবং জীবন-সায়াহ্নে যা সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেছিলেন, তা-ই তিনি অবচেতন ভাবে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে রূপায়িত করেছেন :

এ-কথা যখন জানি,
মানব চিত্তের সাধনায়,
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ-দুঃখ সবের অতীত,
তখন বুঝিতে পারি,
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির।

জীবন রসের অপূর্বতায় আর জীবন-সত্যে তাঁর প্রত্যয় ছিল দৃঢ়, তাই বলেছেন,

এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি
এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে
করিবে অস্বীকার।

আকাশে চন্দ্র-সূর্য একক। কিন্তু তাদের প্রসাদের দাবীদার বিশ্বচরাচর। তাই বলে টুকরো টুকরো করে তাদেরকে ভাগ করার দরকার হয় না। প্রত্যেকেই রুচি ও গরজ মতো চন্দ্র-সূর্যকে অখণ্ড স্বরূপেই পায়। কেউ পথচলার কাজে, কেউ উৎসব-পার্বণের প্রয়োজনে, কেউ সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে এদের প্রসাদ সচেতনভাবে কামনা করে এবং গ্রহণ করে। কবি-শিল্পীর সৃষ্টিও তেমনি। পাঠকের বিদ্যা-বুদ্ধি-রুচি-বিলাস কিংবা গরজ মতো তা কাজে লাগাতে অথবা উপভোগ করতে পারে। এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, বিশ্বমানবতার কবি। মানববোধের উচ্চতম ভাব-চিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি—এই হচ্ছে বিদ্বানদের মত। যার যতটুকু সাধ ও সাধ্য তা-ই সে রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমুদ্র থেকে গ্রহণ করতে পারে। যার ঘট যত বড়, সে তত বেশি করেই পাবে। যে সে-প্রসাদ নিতে জানল না, সে বদনসিব; যে পারল না, তার দুর্ভাগ্য।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যাস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলেছেন। তেমন মহৎ কাব্যরস রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষায় আমাদের দিয়ে গেছেন। আমাদের এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের ও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীন্দ্রিয়লোকে রবীন্দ্রনাথ

[কবি-জীবনের শেষ পর্যায়]

১

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভূমি ও ভূমার অনুভূতি সংমিশ্রণে এক অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান পেয়েছেন। আমরা জানি রবীন্দ্র-প্রতিভারশ্মি বিচিত্র ধারায় হৃদয় ও মনের এবং জগৎ ও জীবনের আনাচে-কানাচে অলিতে-গলিতে প্রবিষ্ট হয়েছে; অদেখা-অজানা ও অভাবিত বিষয়ও তাঁর প্রতিভারশ্মিপাতে উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষীকৃত হয়েছে।

কিন্তু 'পত্রপুট', ও 'সেজুঁতির' পূর্বপর্যন্ত তিনি হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, intuition দিয়েই জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, হৃদয় ও মন, মানুষ ও প্রকৃতি এবং রূপ ও সৌন্দর্যের অন্তর্নিগূঢ় রহস্যাবিষ্কারে তৎপর ছিলেন। এ সময়কার বিশ্বমানবতা ও বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একাত্মবোধ ছিল একান্তভাবে তাঁর হৃদয়াবেগপ্রসূত। তখন ছিলেন তিনি অনুভাবক, শেষজীবনে হলেন দ্রষ্টা। তখন তিনি হৃদয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে করতেন অনুভব, শেষজীবনে করলেন প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে দর্শন। যা ছিল নিছক অনুভূতি, তা-ই হল উপলব্ধি। তখন বলেছেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এ সময় বলতে পারতেন—

দিঠি না জানি কেমনে গেল খুলি
ত্রিভুবন আবরণ করিছে খোলাখুলি।

আমরা 'সিন্ধু', 'বসুন্ধরা', 'প্রবাসী'র কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' জীবনদেবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে জানি, 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্যে'র কবি অধ্যাত্মধর্মী রবীন্দ্রনাথের সাথেও আমাদের অপরিচয় নেই; রূপ, সৌন্দর্য ও প্রণয়ের কবি রবীন্দ্রনাথও অপরিচিত নন, জীবনবেত্তা ও মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে ঘনিষ্ঠতাও বহুদিনের। কিন্তু এই বিশ্বানুভূতি, এই সৃষ্টি ও স্রষ্টায় যোগসূত্র সন্ধান, এই অধ্যাত্মসাধনা, এই জীবন ও প্রণয়ধর্মের রহস্য আবিষ্কার প্রভৃতির ভিত্তি ছিল জিজ্ঞাসা, হৃদয়াবেগ, বিস্ময়, বুদ্ধি ও intuition :

তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যের আর বাক্যের অতীত—
(জন্মদিনে—১২)

তখন : 'শুধু বালকের মন নিখিল প্রাণের পেত নাড়া
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে
নাড়ীতে উঠিত নেচে।' (জন্মদিন—৯৯)

সেজন্যে আমরা তখন তাঁকে সর্বদা বিস্মিত, সম্মোহিত, আনন্দিত, ব্যাকুলিত, বিচলিত অথবা ব্যথিত দেখতে পেতুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

যিনি ছিলেন কল্পনা, আশা ও অনুভূতি-প্রদীপ্ত মহাসাধক, তিনিই শেষজীবনে হলেন জগৎ ও জীবনের রহস্যজ্ঞ ত্রিকালদ্রষ্টা মহর্ষি। তিনি এখন আর আশা-কাতর, শঙ্কা-ভীরু সাধক নন, বরং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। শান্ত ও অবিচলিতভাবে তিনি কখনো ভূমার দিকে কখনো ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, কখনো ধরার ধূলার হাসি-কান্নায় যোগ দিচ্ছেন, কখনো দ্যুলোকের অভিযাত্রী হচ্ছেন। তাঁর নিরাসক্ত ভারমুক্ত মন—জীবন, জীবন দেবতা, মৃত্যু প্রভৃতির রহস্যসূত্র আবিষ্কারের আনন্দে, সত্য-লাভের পরম তৃপ্তিতে এ লোকে ও লোকাতীতে আসা-যাওয়া করছিল।

যতই তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছিলেন ততই এই সুখ-দুঃখময় মানব-সংসারের নতুন রূপ, নতুন অর্থ এবং বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব ও তাঁর লীলা-বৈচিত্র্যের গভীরতর অর্থ এবং স্বীয় সত্তার রূপ, মৃত্যুর রহস্য তাঁর কাছে সুপ্রকাশিত হচ্ছিল—

সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে,
অকূল সিন্ধুরে নিবেদন করিতে প্রণাম
সকল সংশয় তর্ক যে-মৌনের গভীরে ফুরায়।

(জন্মদিনে—১২)

জীবনের শেষপ্রান্তে উদাসীন শিবের মতো এই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি কবির সাধনায় পরিণতি দান করেছে। তিনি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন, আর প্রত্যয় ও তৃপ্তিতে তাঁর জীবন সমাপ্তি পেয়েছে। আমরা বিশেষ করে তাঁর শেষ তিনটে কাব্য : 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে'র কথাই বলছি। কিন্তু আগে থেকেই এ আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। 'পত্রপুটে'র কাল থেকেই কবি ক্রমশ এই সুখ-দুঃখময় মানব- সংসারের গভীরতর সত্তার এবং বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব গভীরভাবে ও নতুনরূপে উপলব্ধি করছিলেন। তাই তাঁর কাছে ভূর্লোক ও দ্যুলোকের পার্থক্য-ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল : 'এ-দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' এতে তিনি 'দেশহীন, কালহীন আদিজ্যোতির ধ্যান' করবার সুযোগ পেলেন, সেই ধ্যানের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, এককথায় ভূমি ও ভূমার রহস্য অদ্ভুতভাবে উদঘাটিত হয়েছে।

AMARBOI.COM

২

কবি নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্মসাধনায় জগৎ-জীবনের সত্য আবিষ্কার করেননি, মানবচিত্তের সাধনাতেই তা সম্ভব হয়েছে।

'মানব চিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত
তখন বুঝিতে পারি,
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই।

(রোগশয্যায়—২৯)

এ চিত্ত-সাধনায় চৈতন্য-জ্যোতি শুধু অন্তরে আবদ্ধ নয়, চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে (এই চৈতন্য-জ্যোতির নাম আত্মা) এবং তা জগৎ-রহস্য উদঘাটিত করে—

'যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে,
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা কিছু আছে, তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
শৃঙ্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।
(রোগশয্যায়—২৮)

এভাবে তিনি উপলব্ধি করলেন :
আনন্দ অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।
(রোগশয্যায়—২৬)

এবং— 'যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ,
কেননা— আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ-মন হইত নিশ্চল।
(রোগশয্যায়—৩৬)

এই উপলব্ধিতেই— 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি।'
(আরোগ্য—১)

এবং পরম সুন্দর আলোকের স্নান পুণ্য প্রাতে।'
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা, ...
সব কিছুর সাথে পশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দিয়ে তারে
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির-মানবের সিংহাসন।
(আরোগ্য—২)

৩

একদিকে ভূমার এইরূপ উপলব্ধি, অন্যদিকে ভূমির মানব-সংসারের বিচিত্র জীবন-প্রবাহও কবিকে নতুন দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দান করেছে। মূলত এ তাঁর 'চিত্ত-সাধনার' দু'টো শাখা : সৃষ্টির রহস্য-চেতনা আর মানব-ঐতিহ্য মন্থন। একসাথে চলল রূপ আর অরূপের সাধনা।

মানব-ইতিহাসের বাণী আজ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। কেননা কবি দ্রষ্টা। তিনি দেখেছেন :

মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়।
ইতিহাসময়
সেই পাপে, আত্মহত্যা অভিশাপে আপনার সাধিছে বিলয়।
(জন্মদিনে—২২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে,
দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে
(জন্মদিনে—২২)

আবার—

দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার। (রোগশয্যায়—৩৮)
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত।
ভবিষতের দূত। (জন্মদিনে—১৬)

সুতরাং— এ পাপযুগের অন্ত হবে তখনই যখন
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে, (জন্মদিনে—২১)
এবং 'আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান'

যাঁরা সাধনা করেছিলেন :

অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ মাঝে
শক্তি যোগাইছে যাহা অগোচরে চির-মানবেরে
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি।
আজি এই প্রভাত আলোকে
তাঁহাদের নমস্কার করি। (জন্মদিনে—১৭)

মৃত্যু এসে একদিন তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে 'রূপ জগৎ হতে জীবন মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে '(জন্মদিনে-৪)। তাই কবি অনুভব করছেন

'জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা' (আরোগ্য—৪)

এবং

হিংস্ররাত্রি যে চুপি চুপি অন্তরে প্রবেশ করে'।
হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ (আরোগ)—৭)।

তা-ই কবিকে বিচলিত করে এবং অনাগত কালে বেঁচে থাকবেন না বলেও কবি ব্যথিত হচ্ছেন :

সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার—
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখে ছিল
অনাগত আলোকের লাগি।
(রোগশয্যায়—২২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এসব ক্ষণস্থায়ী, কেননা কবি জেনেছেন :

প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখ বিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণ দেহ দুর্গের শিখরে। (আরোগ্য—৭)

এবং
প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।
জ্যোতিস্রোতে মিলে যাক রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে
জ্যোতিষ্কের বাণী। (রোগশয্যায়—৩২)

অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ
সাবিত্রী পৃথিবী এই আত্মার মর্ত্যনিকেতন,
(জন্মদিনে—৫)

এই মর্ত্যলীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে
অমৃতের স্বাদ পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে।
সেই সুন্দরের রূপে
সে সংগীতে অনির্বচনীয়। (জন্মদিনে—১৩)

কিন্তু
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে
ভাষা পাই নাই। (রোগশয্যায়—৩)

সুতরাং
কবির এই যা দুঃখ, কেননা—
বৈদিক মন্ত্রের বাণী
কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব
স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই ভাষা নাই। (আরোগ্য—৩)

তাই কবি
কণ্ঠে জেগেছে আকুল আবেদন —:
করো করো অপাবৃত্ত হে সূর্য, আলোক আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ। (জন্মদিনে—১৩)

এবং
হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত্ত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত। (জন্মদিনে—২৩)

৪

উপরি উদ্ধৃত কবিতাদ্বয়ে এবং 'রোগশয্যায়' কাব্যের ২৬, ২০ আরোগ্য কাব্যের ৩২ এবং 'জন্মদিনে' কাব্যের ২৭ সংখ্যক কবিতায় সূর্যকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে কল্পনা করা হয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যার জ্যোতিরূপে প্রথম পুরুষ
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছি স্বরূপ।

তাই কবি সূর্যকেই সম্বোধন করেছেন উপরোক্ত ও অন্যান্য বহু কবিতায় :

হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল (রোগশয্যায়—১৫)

শুধু নিজের নয়, কবি সবকিছুর রূপ সূর্যের আলোকেই প্রত্যক্ষ করেছেন ঃ (রোগশয্যায়—৫, ১৬, ২১, ২৪, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩) এবং এইভাবে পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন :

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আত্মার ভেদ নাই,
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পূণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে, অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত।
পেতে পারি বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে। (আরোগ্য—৩২)

আদি জ্যোতির সাতে সবিতার জ্যোতি আর আত্মার চৈতন্যের জ্যোতির কোনো পার্থক্য নেই। তাই কবি কামনা করেছেন :

সমস্ত কুহেলিকা ভেদ করে
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ,
যে সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ-উর্ধ্ব লোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে নিতে পারি,
আর—এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরবার আগে। (আরোগ্য—৩৩)

কবির অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। তবু কবি বলেন :

এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি,
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান,
বিদায় নিবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।
(রোগশয্যায়—২৬)

এবং আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো
এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে। (মৃত্যুঞ্জয়)

এইভাবে কবি ভূলোকে-দ্যুলোকে এবং মহাশূন্যতায় ও মহাপূর্ণতায় বিচরণ করেছেন পরিপূর্ণ আনন্দে, তৃপ্তিতে এবং বিশ্বাসে। তাই "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি।"

এবং সেজন্যেই 'মহা অজানার পরিচয়' ও 'সম্মুখে শান্তি পারাবারের সন্ধান' পেয়েও কবি যে-মধুর মর্ত্যজীবন পেছনে ফেলে যাচ্ছেন সে জীবনের 'অধিদেবতাকে নম্র নমস্কারে" কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং যারা বন্ধুজন তাদের হাতের পরশে মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে জীবনের চরম প্রসাদ এবং মানুষের 'শেষ আশীর্বাদ' নিয়ে যেতেও কম লালায়িত ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

বক্তব্য উদ্ধৃতি-বহুল হল। তার কারণ আমরা কবির রচনায় কবিকে দেখতে চেয়েছি। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চাইনি। বার্ধক্যে যখন আবেগ হয়েছে নিঃশেষিত, প্রজ্ঞা পেয়েছে বৃদ্ধি, মনন হয়েছে সূক্ষ্ম এবং পরিবেশ-চেতনা পেয়েছে প্রাধান্য—তখনকার রচনা এগুলো। তাই এতে বিজ্ঞানবুদ্ধি, দার্শনিকতত্ত্ব, ইতিহাসের শিক্ষা ও কল্যাণ-চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেছে কবির মন ও মত। এখানে চিত্তের চাইতে চিন্তা, আবেগ ছাপিয়ে উদ্বেগ, মনের উপরে মস্তিষ্ক, ভাবের চেয়ে ভাবনা, প্রাণ থেকে প্রজ্ঞা প্রবল হয়েছে—দেখতে পাই। এজন্যে অভিভূতি অপেক্ষা আবেগের তারল্য, কবিত্বের চেয়ে কথকতার প্রাধান্য, ভাবের চাইতে ভঙ্গির জৌলুস এবং অনুভবের চেয়ে মননের ঔজ্জ্বল্যই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। এখানে কবি অনেকাংশে বক্তা ও বেত্তা। মানুষ ও মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও আদর্শই এখানে কবির মন ও মনন অধিকার করে রয়েছে। তাই এখানে সবিতা একাধারে বিজ্ঞানীর জগৎ-কারণ, অধ্যাত্মবাদীর দেবতা ও মানব-ইতিহাসের সাক্ষী। বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত মনীষী আর গৌণত কবি। তাঁর রচনাও তাই কবিতাশ্রয়ী জার্নাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকবি কায়কোবাদ

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম ধারার অন্যতম উদ্‌গাতা মহাকবি কায়কোবাদের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় নিল।

কায়কোবাদ যে- যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সে-যুগে মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীন সেন প্রমুখ ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান কবি। তাঁদের প্রবর্তিত রাজপথে ও তাঁদের আদর্শের অনুসরণে কায়কোবাদের সৃষ্টি রূপ লাভ করে। অতএব কায়কোবাদের সমসাময়িক কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে যে-নতুন কাব্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন, গীতিকবিতার যে-উচ্ছল বন্যা বাঙলা দেশ ও বাঙালির মন প্লাবিত করেছিল, তার সঙ্গে কায়কোবাদের যোগ ছিল না। তিনি এ ধারাকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি উনিশ শ তেত্রিশ সালেও কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন। অতএব তাঁকে আমরা আধুনিক যুগে পেলেও তিনি ছিলেন বিগতযুগের শেষ প্রদীপ—সে প্রদীপ বিচিত্র অলঙ্কারে ও রূপসম্ভারে ঝড়ের ন্যায় মনোহারী আর ঔজ্জ্বল্যে সমৃদ্ধ।

সুতরাং তাঁর অবদানের মূল্য যাচাই করতে হলে উপরোক্ত কবিদের রচনার পাশে রেখেই যাচাই করতে হবে। কিন্তু বিস্তৃত আলোচনার সময় আজ নয়। আমরা আজ শুধু যুগ ও পরিবেশের নিরিখে তাঁর সাধনার গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাব।

পলাশীর ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে বাঙলার মুসলিম-জীবনে নৈরাশ্যের যে সুচিভেদ্য অন্ধকার নেমে এল, তাতে নিতান্ত জীবনধারণ প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কোনোরূপ জীবন-স্পন্দনের সন্ধান মেলে না। এমনি যখন অবস্থা, তখন জীবনবোধ বা শিল্পপ্রচেষ্টা বা সৃষ্টিপ্রয়াস পঙ্গু অথবা স্তব্ধ হয়ে থাকারই কথা। ফলে মুসলমানরা নৈরাশ্যের পঙ্কেই কেবল মজল না, ঐতিহ্যবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল।

এদিকে ইংরেজ শাসকমণ্ডলী স্বার্থপ্ররোচণায় সদ্যরাজ্যহারা স্বাধীনচেতা অসহযোগী মুসলমান -শোষণ ও হিন্দু-তোষণনীতি গ্রহণ করে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ফন্দি আঁটল। ফল এই দাঁড়াল যে, নতুন ভূমিব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমান ভূঁইয়ারা রাতারাতি ফতুর হয়ে গেল।

এরপরে অভাবে, অশিক্ষায় জড় মুসলমান আভিজাত্যের গর্ব ও অসহযোগের দৃঢ়তা ভুলে ইংরেজি শেখা আরম্ভ করল নতুন সমাজব্যবস্থায় মর্যাদা ও সম্পদ লাভের প্রত্যাশায়। প্রথম যুগের এমনি ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে কায়কোবাদ একজন, যদিও তিনি প্রবেশিকা মানের স্তরেও উঠতে পারেননি। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে তাঁদের বিরাট ও বিচিত্র অবদানের ঐতিহ্যবোধের ক্ষীণ রশ্মিটুকুও মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তাই মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ যখন বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সক্ষম পদক্ষেপ করলেন, তখন সেদিনকার সাহিত্যের আসরে তাঁরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে সবিস্ময় অভিনন্দন পেলেন এবং সমালোচককে সবিস্ময়ে বলতে শোনা গেল—"মুসলমান হইয়া এমন বিশুদ্ধ বাঙলা লিখিতে পারেন, তাহা আমাদের জানা ছিল না।"

মুসলমানদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যবিস্মৃতি ও হিন্দুদের অবজ্ঞার সাক্ষ্য হয়ে চিরকাল ইত্যাকার কথাগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের বেদনাদায়ক দুঃসময় স্মরণ করিয়ে দেবে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন ব্যতীত কেউ তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। সুতরাং বলা চলে কায়কোবাদের মাধ্যমেই মুসলমানদের আধুনিক বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে হাতে খড়ি হয়। আশ্চর্য, প্রথম প্রচেষ্টাতেই অক্ষমতার তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই। কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' 'মহাশ্মশান' ও 'অমিয়ধারা' সেদিনকার বাঙলা সাহিত্য-ইমারতে তিনটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে শোভা পেয়েছিল। বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে, মধুসূদন ও বিহারীলাল ব্যতীত সে-যুগের প্রথিতযশা কবি হেমচন্দ্র, কামিনীরায় ও নবীন সেন প্রভৃতির চেয়ে কায়কোবাদ কি মহাকাব্য রচনায়, কি খণ্ড-কবিতা সৃষ্টিতে তেমন ন্যূন ছিলেন না, বরং অসূয়াহীন ঔদার্যে তিনি পূর্বসূরীদের হার মানিয়েছেন।

কাব্যকলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ছিল অনন্য। মহৎ আদর্শ ব্যতীত উদ্দেশ্যবিহীন নিছক রসসৃষ্টির আদর্শকে তিনি ঘৃণা করতেন। এ কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের এবং তৎপরবর্তী সাহিত্য-প্রয়াসকে সুনজরে দেখতেন না।

কায়কোবাদের নিজস্ব মহৎ আদর্শ ছিল। সে-আদর্শ রূপায়ণ লক্ষ্যে তিনি মহাকাব্য রচনায় হাত দেন। তাঁর কাব্যসাধনার গুরু ছিলেন নবীন সেন। তাঁরও সাধনা ছিল মহান আদর্শ ও নীতির কাব্যে রূপায়ণ। ফলে মহাভারতের নতুন ভাষ্য—রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নামক কাব্যত্রয়ীর সৃষ্টি ও অমিতাভ, অমৃতাভ, খ্রীস্ট প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনী ও শিক্ষাকে কাব্যে কথন-প্রচেষ্টাতেই সীমিত ছিল তাঁর সাধনা।

কায়কোবাদের জীবনাদর্শের তিনটে সুস্পষ্ট ধারা ছিল। সে-তিন ধারা—স্বাজাত্য ও ঐতিহ্যবোধ, জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা এবং জীবন ও প্রেম।

স্বাজাত্য ও ঐতিহ্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মহাশ্মশান, মহররম শরীফ ও অমিয়ধারায়। 'জাতিবৈর'-এর কবি হেমচন্দ্র বা পলাশীর যুদ্ধের কবি নবীন সেন অথবা 'পদ্মিনী' কাব্যের কবি রঙ্গলালকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে, কায়কোবাদের শক্তি, আবেগ ও তেজস্বিতার প্রমাণ মিলবে। স্বদেশপ্রেমে ও স্বাজাত্যবোধে এবং প্রকাশ-প্রতিভায় কায়কোবাদ এঁদের চেয়ে কম ছিলেন না।

কবির আদর্শের আর একটি দিক হচ্ছে—মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের আপোসহীন সংগ্রাম। সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার এড়িয়ে জীবনযাপন করার মধ্যেই আত্মার মুক্তি। জীবনের পথ বড় বন্ধুর; নানা মায়া-মোহের জালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তদুপরি আছে অতৃপ্তির বেদনা ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের ক্ষোভ। একটানা মায়া-বন্ধন, অতৃপ্তি, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যৎ-নৈরাশ্যের কান্নায় অশ্রুমালা গ্রথিত।

জীবন ক্ষণস্থায়ী সত্য, কিন্তু এ জীবনও সুন্দর এবং আরামদায়ক করে গড়া যায়, যদি প্রেমের সাধনা একান্তভাবে করা সম্ভব হয়। প্রেমের বীজ উপ্ত হয় ব্যক্তিকে অবলম্বন করে, কিন্তু পরিণতি বিশ্বপ্রেমে। তাই কবি তাঁর কাব্যে সর্বত্র 'প্রেমের' মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। বলা চলে—তিনি 'প্রেম'কেই মানবজীবনের দিশারী বলে আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন। প্রেমিক অন্যায়-অসত্য-অসুন্দরকে বাইরে না হলেও অন্তরে জয় করতে সক্ষম হয়। 'শিবমন্দির' বা শ্মশানভস্ম প্রভৃতি কাব্য এ আদর্শেরই রূপায়ণ। তাঁর কাব্যগুলোর ভূমিকা পাঠে আমাদের উক্তি আরো স্পষ্ট উপলব্ধ হবে। কবির নিজের কথায়—"অধোপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎসাহিত্যের আলোচনা। নিপুণ কবি তাঁহার কাব্যে যেসব পুণ্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাদের মধ্যে ধর্মালোকে উদ্ভাসিত পুণ্যের জীবন্ত ছবি থাকিলে সমাজ তাহারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উন্নতির দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া থাকে।" (ভূমিকা—শিবমন্দির)। কবি এ আদর্শেই সাহিত্য-সাধনা করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যের তিন ক্ষেত্রে যে- তিনজন শক্তিমান পুরুষ আত্মবিস্মৃত দিশেহারা জাতিকে পথের দিশা দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—মীর মশাররফ হোসেন, মহাকবি কায়কোবাদ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। অবশ্য এঁদের সহযোগী ছিলেন আরো কয়েকজন। কিন্তু এঁরাই ছিলেন পুরোভাগে। মীর মশাররফ হোসেন গদ্য-সাহিত্যে, কায়কোবাদ কাব্যে এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম অবদান ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এভাবে নতুন করে মুসলমানেরা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারক, বাহক ও সাধক হয়ে ওঠেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য জাতির প্রাণ। এইজন্যে বাঙালি মুসলমান তাঁদের মরা দেহে প্রাণসঞ্চারকারী বলে এই তিন মহাসাধকের কাছে চিরদিন ঋণী থাকবেন।

সুতরাং কবি কায়কোবাদ আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের মুসলিম ধারার অন্যতম প্রবর্তক, বাঙালি মুসলমানদের জাতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক এবং আধুনিক মহাকাব্য রচনায় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান।

এককথায়, আমরা তাঁর কাছে আধুনিক সাহিত্যে হাতে-খড়ি, জাতীয়তাবোধের 'এস্‌ম' ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রেরণা লাভ করি—এ-ই তাঁর গৌরব, এখানেই তাঁর সাধনার সার্থকতা, এ-কারণেই তিনি আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়।

আজকের দৃষ্টিতে সাধারণভাবে বলতে গেলে উনিশ শতকী মুসলিম সাহিত্যিকদের সৃষ্টি প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস শ্রদ্ধেয়। তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছেননি বটে, কিন্তু পথের দিশা পেয়েছিলেন। তাঁদের অসাফল্যের জন্যে তাঁরা নন—তাঁদের অসম্পূর্ণ প্রতীচ্য-শিক্ষাই দায়ী। তাঁরা পথিকৃৎ, তাঁরা দিশারী—এজন্যে তাঁরা আমাদের আদর্শ নন—অবলম্বন। তাঁরাই বটতলার মজলিশের মোহ কাটিয়ে লালদীঘির প্রভাব স্বীকার করে মুসলিম সমাজে বাসন্তী হাওয়া ছড়ালেন। তাঁদের কৃতিত্ব এখানেই। আমাদের কৃতজ্ঞতাও এজন্যেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ এমদাদ আলীর সাধনা

উনিশ শতকের শেষদিককার আবহাওয়ায় ও ধ্যান-ধারণায় যাঁদের মন-মনন প্রভাবিত, বিশ শতকের গোড়ার দিকের সেসব সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্রমশ ছিন্ন ও অবলুপ্ত হয়ে আসছে। সৈয়দ এমদাদ আলীর প্রয়াণে আর একটি সূত্র ছিন্ন হল।

নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সম্পর্ক এভাবেই ছিন্ন ও লুপ্ত হয়। নতুনকে ঠাঁই করে দিয়ে পুরাতন চিরকাল এভাবেই অতর্কিতে সরে পড়ে। পুরোনো বিবর্ণ পাতা কিশলয়কে অভিনন্দন জানিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়। বস্তুত জগৎ নিত্যনতুনের মেলা। একে ধরে রাখবার—ভরে থাকবার অধিকার কোনো পুরাতনেরই নেই। নতুন সূর্যের উদয়ে, নবতররূপে পৃথিবী উদ্ভাসিত ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—এ-ই নিয়ম।

সৈয়দ এমদাদ আলী পরিণত বয়সেই ইন্তিকাল করেছেন! তবু আত্মীয়-বন্ধুর প্রাণে হারানোর বেদনা বাজবেই। কিন্তু আমরা যারা দূরের মানুষ, আমাদের দুঃখ অন্য কারণে।

পলাশীর পরাজয়ের পর সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের প্রথম আবির্ভাব উনিশ শতকের অষ্টম দশকে মীর মশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে। নবম দশকে পেলাম মোজাম্মেল হককে এবং শেষদশকে এগিয়ে এলেন কবি কায়কোবাদ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এ সময়টাতে এঁদের যাঁরা সহযোগী ছিলেন, আজ তাঁদের অবদানের বাহ্য-নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই সত্যি; কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সমাজ-জীবনে ও অন্তর্লোকে তাঁদের প্রচেষ্টার প্রভাব প্রায় অপরিমেয়। এসব বিষয় যে আমরা শুধু ভুলে গেছি তা নয়, আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবার প্রয়াস পাচ্ছিনে, দুঃখ এজন্যেই। আর একজন যিনি জাতিকে গ্লানিমুক্ত ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন এবং বিজাতিকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবান করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, তিনি সৈয়দ আমীর আলী। কিন্তু সমাজ তখনো অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলে, তাঁর রচনার প্রভাবসুদূর প্রসারী হতে পারেনি। তাই তিনি শক্তিমান হয়েও মেঘলাদিনের 'মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড'-রূপেই আমাদের মনের আকাশে অস্পষ্ট হয়ে রইলেন। তাঁর সাধনা ছিল ইংরেজি ভাষা নির্ভর।

অপরদিকে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, স্যার সৈয়দ আহমদ, জামালউদ্দীন আফগানী, মওলানা কেরামত আলী প্রমুখ বহির্বঙ্গীয় মনীষীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় তিতুমির থেকে দুদুমিয়া অবধি অনেক স্বজাতিপ্রাণ ও কল্যাণকামী মনীষী মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শোধন ও বোধনের জন্যে প্রাণপণ সাধনা করে গেছেন। আমাদের ভাগ্যদোষে এসব আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে।

মোটের উপর, এইসব মহাপ্রাণ মনীষীর প্রচেষ্টাতেই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দন ফিরে আসে। বিদেশী শাসকের প্রতিকূলতা-লাঞ্ছিত ও প্রতিবেশীর শোষণ ও অবজ্ঞাপীড়িত সেদিনকার মুসলিমে নতুন করে জীবন-জিজ্ঞাসা জাগানো কিরূপ কষ্টসাধ্য সাধনার ব্যাপার ছিল; আজ তা, আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না।

মুসলমানদের পদক্ষেপ যখন প্রাথমিক পর্যায়ের ভীরুতাও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তখন বাঙালি হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ঐতিহ্য-সম্বল রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকে অবলম্বন করে সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্র-চেতনায় হিন্দুত্ব ও হিন্দুয়ানির পতাকা অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। মুসলমান সাহিত্যিকগণ অনুরূপ আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে জাতীয়সত্তা দৃঢ়মূল করবার প্রয়াসী হলেন। ফলে হযরত মোহাম্মদ কাব্য, হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত, শাহনামা, সৌভাগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শমণি, বিষাদসিন্ধু, মহাশ্মশান, জাতীয় ফোয়ারা শ্রেণীর রচনা আমরা পেলাম। তাঁদের ধারণায় জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক সাধনাই প্রগতির পথ! এজন্যে বাঙালি হিন্দুর অবলম্বন হয়েছে আর্যাবর্ত-রাজস্থান তথা উত্তরভারত আর বাঙালি মুসলমান প্রেরণা খুঁজেছেন আরবে-পারস্যে।

আমরা আত্মবিস্মৃত ও আত্মসম্বিৎহীন জাতি বলেই সৈয়দ এমদাদ আলী সম্বন্ধে দুটো কথা বলবার জন্যে এত দীর্ঘ ভূমিকার দরকার হল। নতুবা কবিতার বই 'ডালি', পত্রোপন্যাস 'হাফেজা' ও জীবন-কাহিনী 'রাবেয়ার' লেখক এমদাদ আলী সম্বন্ধে সোজাসুজি দুটো কথা বললে, যে-কেউ ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার বাঁকা হাসি টেনে কথাগুলো এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারেন। কেননা এসব রচনার যথার্থ সাহিত্যমূল্য বেশি নয়।

আমাদের নজরুল-পূর্ব যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলা চলে, সেখানে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি বিরল। কিন্তু তাঁরা উত্তরপুরুষ ও উত্তরসাধকের জন্যে যে-ক্ষেত্র কর্ষণ ও তৈরি করে রাখলেন, তার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হলে একদিন আমরা শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হব—এ নিশ্চিত জানি।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ এমদাদ আলীর জন্ম। তিনি উনিশ শতকের শেষ পাদে মুসলিম জাগরণের উন্মেষকালের আবহাওয়ায় বর্ধিত। তাঁর মন-মননের উপর জাতীয় হিতৈষণা ও কল্যাণকামিতার যে-প্রভাব পড়ে, তার তাগিদে—অন্তরজাত প্রতিভার আবেগে নয়—তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মনের পরিচয় মিলবে তাঁর বাঙলা ও ইংরেজি প্রবন্ধগুলোতে আর তাঁর 'নবযুগ' নামক অসমাপ্ত উপন্যাসে। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর আদর্শ ও অবদানের আভাস পাওয়া যাবে তাঁর মাসিক 'নবনূর' পত্রিকার প্রকাশ ও পরিচালনায়। এ পত্রিকাখানি তার স্বল্পকাল-স্থায়ী জীবনে জাতির আলোকবর্তিকা ও দিশারী স্বরূপ ছিল। এজন্যে কেউ কেউ একে 'বঙ্গদর্শনের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর সাধনার স্বরূপ সাহিত্যসৃষ্টিতে নয়—জাতিকে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তোলার কাজের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

এ ব্যাপারে আর একটি কথা আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে সে-যুগে যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, তাঁদের কেউ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তেমন শক্তিমান লেখকও ছিলেন বিরল। প্রায় সকলেই হিন্দুলেখকদের বাঙলা রচনা পড়েই সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। আরবি-ফারসি ভাষায়ও বিশেষে ব্যুৎপত্তির পরিচয় তাঁদের রচনা বহন করে না।

এমনি অবস্থায় তাঁরা যা বলতে বা করতে চেয়েছেন, তাতে তাঁদের প্রাণগত সাধনা ও স্বজাতিবাৎসল্যের অপরিমেয় আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের সাধ যত ছিল, সাধ্য ততটুকু ছিল না। তাই তাঁদের হাতে তাঁদের অবদানের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু পাইনি। কিন্তু যে মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য, যে আন্তরিকতা, উদ্যম ও অক্লান্ত সাধনা তাঁদের প্রচেষ্টাকে মহিমান্বিত করে রেখেছে, তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত না হলে, তাঁদের ঋণ স্বীকার না করলে, আজকের দিনে শুধু জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি নয়, নিজেদের প্রতিও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে লিখিত এক পত্রে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছিলেন, "যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, আমরা সে-যুগে জাতির ভাগ্যাকাশে জ্যোতিষ্কস্বরূপ উদিত হয়ে জাতিকে দিশা দিতে চেষ্টা করেছি।" অবিকল কথাগুলো আমার মনে নেই তবে ভাবটা এ-ই। একে কেউ তাঁর অহমিকার অভিব্যক্তি বলে ভাবলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। এতে তাঁর বা তাঁর সতীর্থদের সাধনার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই প্রকাশ পেয়েছে। পুরাতন ও প্রবীণদের আমরা ধরে রাখতে পারব না। কিন্তু পুরোনো ও প্রবীণের অবদানকে আমরা মহামূল্য পাথেয় করে রাখব। তা আমাদের জীবনে ও জাগরণে, সাধে ও সাধনায় কাজে লাগবে।

সৈয়দ এমদাদ আলী গেলেন কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের মধ্যে চিরন্তন হয়ে থাক—এ-ই কামনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহাদাৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সবদেশেই পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করেই বিদ্যার্জন শুরু হয়। কিন্তু কোনো কোনো দেশে এর বাইরের বিদ্যাও আয়ত্ত করবার সহজ সুযোগ ঘটে। বাঙলাদেশে আমরা যে-পরিবেশে লেখাপড়া করেছি বা এখনও পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, তা পাঠ্যবইএর বাইরের বিদ্যার্জনের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। কাজেই পাঠ্যবই-এ যাঁদের রচনা থাকে না, তাঁরা যতবড় প্রতিভাই হোন না কেন, নেহাত সাহিত্যানুরাগী ব্যতীত আর কারো কাছে তাঁদের লেখা দূরে থাক, নামও পৌঁছে না। এজন্যেই শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও মোহিতলাল মজুমদার ও শাহাদাৎ হোসেন শিক্ষিত-সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না।

স্কুলপাঠ্যবইএর উপযোগী কবিতার অভাবহেতু শাহাদাৎ হোসেন বা মোহিতলাল 'জনপ্রিয়' বা 'প্রখ্যাত' কবি হয়ে উঠতে পারেননি। অথচ রবীন্দ্র-যুগে যে-কয়জন বিশিষ্ট কবি বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, এঁরা তাঁদেরই সমস্থানীয়।

যখন স্কুলে পড়ি, তখন পাঠ্যপুস্তকে যাঁদের রচনা থাকত, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তাঁদের এক-একজন মনশ্চক্ষে বিস্ময়কর ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হতেন। এখন বয়োধর্মে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তের সে-উচ্ছ্বাস হ্রাস পেয়েছে অবশ্য, কিন্তু শ্রদ্ধা জাগরূকই রয়েছে। বাল্যে ও কৈশোরে যে-কয়জন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের নাম ও লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কবি শাহাদাৎ হোসেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মৃদঙ্গ' এবং উপন্যাস 'রিক্তা'র মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। মৃদঙ্গের ভাষা বা বক্তব্য বুঝবার বিদ্যা বা বয়স আমার ছিল না। তবু কবির কাব্য!—শ্রদ্ধা জাগাবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট ছিল। 'রিক্তা' গদ্য-বই, উপন্যাস, সুতরাং ভালো তো বটেই!

নানা ব্যাপারে শাহাদাৎ হোসেন ও মোহিতলালের মধ্যে মিল আছে, সেজন্যেই শাহাদাৎ হোসেন প্রসঙ্গে মোহিতলালের কথাও মনে জাগে। শাহাদাৎ হোসেন ও মোহিতলাল ক্লাসিকধর্মী কবি। তবু তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাব কম নয়। এতৎসত্ত্বেও তাঁদের কাব্যে যে-বস্তুটা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে কাব্যের আঙ্গিক বা কবিতার diction। শব্দ চয়নে আশ্চর্য নৈপুণ্য, ছন্দে গাম্ভীর্য ও লালিত্য, ভাবাদর্শের আভিজাত্য, প্রকাশভঙ্গির সৌষ্ঠব ও সংযম তাঁদের কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। তাঁরা উভয়েই আদর্শবাদী ও শিল্পী। ব্যবহারিক জীবনের রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-ব্যথা, অথবা নিজের বা মনুষ্য-সাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দ-বেদনা, অভাব-অনটন, অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী মোহিতলালের কাব্যে স্থান পায়নি। শাহাদাৎ হোসেনেও খুবই কম। তার কারণ, তাঁরা ছিলেন রোমান্টিক কবি— বাস্তব বিমুখ, কল্পলোকবিহারী! তাঁদের কাব্য প্রেরণার উৎস এ জগৎ ও জীবন নয়! প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের হাজারো দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনা-হতাশা-গ্লানি ভুলে থাকবার তাগিদে তাঁরা মনোময় কল্পলোক রচনা করে তাতে নির্দ্বন্দ্বে ও নির্বিঘ্নে সানন্দে জীবন উপভোগ করেন—জীবনে; যে কল্পসাধ মিটানো যায়নি, সে-সাধ মিটেছে গানে, জীবনে যা অসম্ভব, কল্পনায় ও স্বপ্নে তা-ই সম্ভব ও সার্থক হয়ে উঠেছে। সুতরাং কবি হিসেবে শাহাদাৎ হোসেন মুখ্যত বাস্তবমুখী নন—কল্পাশ্রয়ী। তাঁর সমধর্মী কবি মোহিতলাল বলেন :

"জীবন যাহার অতি দুর্বহ, দীন দুর্বল সবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ—সেইজন বটে কবি।"

কারণ—এতে ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদ ভয়,
কায়া আর ছায়া— বৃথা সংশয়
স্বর্গ হইবে ধরা।"

শাহাদাৎ হোসেনের হৃদয়েও অমৃতের তৃষ্ণা, তিনিও মর্ত্যের সৌন্দর্যে, ধরিত্রীর যৌবন-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে নেমে আসেন দেবতাদের মতো মর্ত্যবিহারে। ধরণীর আবিলতা ও গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করবার পূর্বেই তিনি চলে যান কল্পলোকবাসে। ধুলার ধরায় তিনি অতিথি। 'ধরণীর বনকুঞ্জে' তাঁর আনন্দ প্রবাস চলেছিল মাত্র। কারণ, 'শ্যামায়িত সৌন্দর্যের ফুল্ল শতদল' কবির রূপ-সৌন্দর্য-পিপাসু হৃদয়কে যে আকুল করে তুলেছিল!

"মানসের কল্পদলে চিত্রিত মায়ায়
অনন্ত বসন্ত জাগে সান্দ্র নিরালায়।"

তাই প্রকৃতির 'শ্যামল মায়ার' বশে কবি 'কল্পতুলিকায় রূপচ্ছবি' আঁকছিলেন। এছাড়া বিমুগ্ধ কবির উপায় ছিল না। কারণ—

"যত দেখি, বাড়ে সাধ— কী অপূর্ব প্রাণরসে
হয়ে থাকি ভোর,
অনুভূতি জেগে উঠে, শুষ্ক আঁখি ভিজে যায়,
গলে যায় হিয়া খানি মোর।"

এজন্যেই বোধহয় প্রকৃতি (ঋতুপর্যায়) বিষয়ক কবিতায় শাহাদাৎ হোসেনের কবিপ্রাণ উচ্ছল হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে পাঠকের স্ব-স্ব মত-পথ-আদর্শ ও রুচি অনুসারে এ-কাব্যাদর্শের বিচার হবে। আজ সে বিতর্কের সময় নয়। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে, জীবনবোধ মানুষ অবিশেষে কোনোকালেই একরূপ ছিল না এবং হয়তো মানুষ কোনোকালেই একমত হবে না।

মধুসূদন-প্রবর্তিত উনিশ শতকের ক্লাসিক-ধারার অনুসারী ছিলেন শাহাদাৎ হোসেন ও মোহিতলাল। অর্থাৎ এঁরা মূলত রোমান্টিক কবি হয়েও বাহ্যত ক্লাসিকরীতির ধারক ছিলেন। তাঁদের উচ্ছ্বসিত কল্পনা, অনুভূতির তীব্র-গভীর আবেগ সংযমের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাস্করের মূর্তির ন্যায় তাঁদের কবিতার বহিঃরূপই অধিকতর ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এজন্যে তাঁদের কাব্যকলাকে ভাস্কর্য ও তাঁদের ভাস্কর বলা চলে। এক কথায়, তাঁদের কবিতা Romantic in spirit এবং Classical in form. Romantic ভাবকল্পনাকে সুসংযত কথার ছাঁদে ও সুনির্বাচিত শব্দের নিগড়ে বেঁধে ভাবগর্ভ ও বর্ণাঢ্য করে তোলার মধ্যে আশ্চর্য শক্তির পরিচয় রয়েছে।

বিশ শতকে মোহিতলাল ও শাহাদাৎ হোসেন এবং আরো দুচারজন কবি কাব্যক্ষেত্রে এ দুস্তর সাধনা ও কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার ওজস্বিতায় ও লালিত্যে, উপমার ঘটায়, অলঙ্কারের ছটায়, ছন্দের ঝঙ্কারে, শব্দের সুনিপুণ চয়নে এঁদের কবিতাগুলো রসজ্ঞ রসবেত্তার আদরণীয় হয়ে থাকবে।

কবি শাহাদাৎ হোসেনের সঙ্গে আমার যখন চাক্ষুষ পরিচয় হয়, তখন লক্ষ্য করেছি তাঁর চলনে-বলনে-পোশাকে একটা আভিজাত্যবোধের ছাপ ছিল। আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল ; স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল সজাগ। তাঁর মন-মননেও এ আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল স্পষ্ট। এক কথায় তাঁর জীবনে ও মননে Love for grandeur ছিল। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের মূলেও ছিল এই grandeur প্রবণতা।

আশ্চর্য, কৈশোরে কবিতার ডালি নিয়েই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ, যৌবনে যাত্রা-থিয়েটারের আকর্ষণই ছিল বেশি, তবু তিনি কবিতা ও নাটক লিখেছেন কম, অথচ উপন্যাস লিখেছেন বহু— এবং উপন্যাসে তিনি আদর্শে ও রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছেন; যেমন নাটকে করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে আর কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে করেছেন ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দকামী শাহাদাৎ হোসেন ও দেহাত্মবাদী মোহিত মজুমদার রস-সর্বস্ব (Art for art's sake) আদর্শের কবি। এরূপ কল্পনাশ্রয়ীদের জীবন সংঘাতমুখী নয়—একেবারে নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন। কিন্তু তবু তাঁদের অনুভূতির সে-জগৎ প্রশস্ত নয়। তাই তাঁদের কাব্যজগতে জীবনলীলার বৈচিত্র্য বিরল। নানাভাবে, বহুবিচিত্র ধারায় জীবনকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস সেখানে নেই। তাঁদের প্রাণও তেমন উচ্ছল নয়—এ জন্যে তাঁদের ভাবাবেগেও উদ্দামতা নেই। স্বল্প পরিসরে অবশ্য অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও গভীর। এ-কারণেই তাঁদের কবিতার ভাব গুপ্ত ও মন্দ-প্রবাহিণী।

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায় কল্পনার প্রসার ও ভাবের আশানুরূপ গভীরতা না থাক, কিন্তু তিনি ভাষার জাদুকর, ছন্দযোজনায়ও নৈপুণ্য আছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বহিঃরূপ ও গঠনসৌন্দর্যই তাজমহলকে মনোহারী ও বিশ্ববিখ্যাত করেছে—এর প্রসার বা বিস্তার নয়। তাই এসবের আলোচনা অবান্তর। শাহাদাৎ হোসেনের কবিতাও ছন্দ এবং শব্দের মহিমায় মনোহারী, পড়বার সময় ভাব-সৌন্দর্য বিচার করবার অবকাশ হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা যে-কারণে সুন্দর ও সুখপাঠ্য; শাহাদাৎ হোসেনের কবিতাও সে-কারণে প্রশংসনীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যদি ছান্দসিক কবি বলে কীর্তিত হন, তবে শাহাদাৎ হোসেনও রূপকার বা ভাস্কর কবি বলে মর্যাদা পাবেন। কবিও হয়তো এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'রূপচ্ছন্দা'।

কবি শাহাদাৎ হোসেন মুখ্যত 'রসলোক'-বিহারী হলেও বাস্তব জীবনকে একেবারে উপেক্ষা করেননি। দেশ, জাতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগও বহু কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। ইতিহাস-সচেতনতাও তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল। আজাদী-প্রীতি এবং স্বদেশ-বাৎসল্যও তাঁর কম তীব্র ছিল না। তিনি যে বিশ্ব-মুসলিম জাতীয়তাবাদী (Pan-Islamist) ছিলেন, তা-ও তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

মোহিতলাল ও শাহাদাৎ হোসেন উভয়েরই আত্মবিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম ও দৃঢ় এবং এঁদের কেউ আত্মপ্রচারে বা আত্মপ্রসারে আগ্রহশীল ছিলেন না। তাই তাঁরা 'জনপ্রিয়' হননি সত্যি, কিন্তু তাঁরা যাঁদের কাছে যতটুকু সমাদর বা কদর পেয়েছেন, তাতে খাদ নেই, তা একান্তই খাঁটি। তাঁদের শক্তি ও প্রতিভার যে-স্বীকৃতি পাওয়া গেছে—তাপ্রচারে আদায় করা নয়; তা রসগ্রাহী চিত্তের স্বেচ্ছানিবেদিত অভিব্যক্তিমাত্র। তাই Tennyson-এর কথায় উভয়েই বলতে পারেন—"We shall dine late, but the dining room will be well-lighted, the guests few and select."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-মানস

নজরুলের মন ছিল সরল, বুদ্ধি ছিল ঋজু, আত্মা ছিল অনাবিল। তিনি যা চেয়েছেন সহজভাবেই তা বলেছেন, যা ভেবেছেন তাতে কোনো কূট-সমস্যা নেই— জটিল যুক্তিজাল নেই। সরল মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে চাওয়া ও পাওয়ার দাবীই তিনি পেশ করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে দর্শন নেই, তত্ত্ব নেই। তাঁর কাম্য ছিল : পারস্পরিক প্রীতি, সাম্য ও স্বস্তিপূর্ণ সমাজ। সুস্থ, স্বস্থ ও সুখী মানুষের সমাজ এবং এই মানুষকে ভালোবেসে, এই মানুষেরই ভালোবাসা পেয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ ভালো করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম'। কাজেই তিনি সাম্য— কামী ও অভাবমুক্ত মানুষ তথা কাঙাল-বিরল সমাজকামী হলেও মার্কসবাদী ছিলেন না, তা তিনি বুঝবার চেষ্টাও করেননি কোনোদিন।

বলেছি, তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন সে-ভালোবাসা যেমন ছিল অকপট, তেমনি ছিল গভীর। তাই ভালোবাসার পথে যারা বাধা হয়ে রইল, তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে রইলেন তিনি। এ হচ্ছে সরল হৃদয়ের অনভূতিজাত উত্তেজনা, চিন্তাপ্রসূত বিক্ষেভ নয়। তাই তাঁর রচনায় ভাঙার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই। এজন্যেই তিনি সোজা কথাটা ভাবতে পারেননি যে, যাদেরকে তিনি গরিব ও দুর্বলের দুশমন মনে করেছেন, দোষ তাদের নয়— তাদের রক্ত ঝরলেই শত্রুনিপাত হয় না। এক জমিদার পথে বসলে আর এক জমিদার গজায়, এক পুঁজিপতি দেউলিয়া হলে আর এক ধনী মাথা উঁচু করে। গলদ রয়েছে গোড়ায়—অর্থাৎ সমাজকাঠামো, নৈতিক আদর্শ এবং ব্যষ্টির দায়িত্ব ও দাবী, কর্তব্য ও অধিকারবোধ না পাল্টালে এ ব্যাধির কবল থেকে নিষ্কৃতি মেলে না। সহজ প্রাণের চাহিদা আর প্রয়োজন-উপলব্ধি এক জিনিস নয়। নজরুল যা চেয়েছেন তা তাঁর প্রেমিকহৃদয়ের চাহিদা। এজন্যেই তাঁর কাব্যে দর্শন নেই, সমাজতত্ত্ব নেই, নতুন সমাজ গড়ার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। কেবল যা চেয়েছেন তা পাননি বলে, প্রবল উত্তেজনায় সুমুখে যাকে পেয়েছেন তাকেই আক্রমণ করেছেন; কার্যকে ভেবেছেন কারণ, আর 'কারণ'-এর খোঁজ পাননি বড় একটা।

ফলে প্রেমিক হলেন সংগ্রামী। প্রেম বিলোতে এসে বিরুদ্ধ-পরিবেশে পড়ে রক্ত ঝরানোর সংকল্প নিলেন। (তাঁর কথায়; দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি)। প্রত্যক্ষভাবে পারছেন না বলে পরোক্ষ উপায় গ্রহণ করলেন। অসির বদলে মসিই করলেন সম্বল এবং প্রকাশ্যে বললেন, 'রক্ত ঝরাতে পারি না যে একা, তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা'। এও হৃদয়বান কবির প্রায়-কায়িক উত্তেজনারই বহিঃপ্রকাশ। এভাবে জাতপ্রেমিক—বিশ্বমানব প্রেমিক হলেন বিদ্রোহী, বিপ্লবী, সংগ্রামী ও জাতীয় কবি। ভাগ্যের পরিহাস!

এতে আমরা কিন্তু ভাগ্যবান হলাম। কেননা এতে আমরা জানলাম, জাগলাম আর অংশত জয়ীও হলাম। আবার এক ক্ষেত্রে নজরুল বাস্তববোধের ও সমস্যা-সচেতনতার বিস্ময়কর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভারতে ধর্মীয় পরিচয় গৌণ করে না তুললে কেয়ামত তক মারামারি চলতেই থাকবে। তাই এক্ষেত্রে অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে দেশগত জাতীয়তাবাদ প্রচারকে তিনি বিশেষ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই মুখ্যব্রতে বাঙলাদেশে তিনি অতুলনীয় এবং এর উদ্‌যাপনেও তিনি অসীম ধৈর্য, অপরিমেয় সহনশীলতা ও প্রচুর অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর রেখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের হৃদয় ছিল কুসুমকোমল। তাঁর বাইরের ধর্মও ছিল আবার বজ্রকঠোর—তাই তাঁকে কুলিশ-কঠোর সংগ্রামী বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও তা তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়। কোনো প্রেমিকই কঠোর হতে জানে না, যদিও উত্তেজনাবশে নিষ্ঠুর আচরণও তার পক্ষে সম্ভব। সে কেবল আকস্মিক এবং ক্ষণিকের রূপ—স্থায়ীভাবে নয়। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় তাঁকে পৌরুষের অভিমান-বর্জিত কেঁদে-লুটানো অসহায় প্রেমপ্রার্থী রূপে দেখি, যদিও তিনি বলেছেন এবং কাজে দেখিয়েওছেন ;

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশী আর হাতে রণ তূর্য।'

তবু এহো বাহ্য। অন্তরে তিনি প্রেমিক, দয়ালু ও হৃদয়বান। মানুষকে ভালোবাসাই তাঁর স্বভাব, দরদই তাঁর পুঁজি। কোন্দল করা নয়—গান গাওয়াই তাঁর ব্রত। কিন্তু তাঁর 'বীণা' প্রতিকূল প্রতিবেশে 'তরবারি' হল। সে-তরবারিই আমরা দেখলাম, সংগ্রামী বলেই তাঁকে জানলাম, মানবপ্রেমিক আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল। বিরাট সম্ভাবনা বিপ্লবে, সংগ্রামে ও জাতীয়তাবোধ-প্রচারেই নিঃশেষ হল। নজরুলের ভাগ্যের বিড়ম্বনা!

নজরুল হলেন প্রমূর্ত প্রাণময়তা। প্রাণচঞ্চল এ মানুষটি যখন ক্রুদ্ধ হন তখন চিৎকার করেন; যখন আনন্দিত হন, তখন অট্টহাস্য করেন। গাইবার সময় উঁচুকণ্ঠেই গান; উল্লসিত হলে হৈ হৈ করেন; আর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে দীলে চোট পেলে শিশুর মতো অসহায়ভাবে কান্নাকাটি করেন। অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অপরিমেয় মমতার আধারস্বরূপ এই পুরুষটি সংগ্রামে আলীর মতো নির্ভীক, অন্তরে বুদ্ধের মতো ক্ষমাসুন্দর, প্রীতিতে ঈসার মতো উৎকণ্ঠ আর প্রণয়-ব্যাপারে কৃষ্ণের মতোই নিঃসংকোচ। এমন মানুষকে ভালো না—বেসে পারা যায় না। তাই নজরুল আমাদের প্রিয়।

যে করেই হোক, নজরুল পূর্ববাঙালিদের প্রিয় ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যাপারে প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছেন। সেজন্যেই নজরুল-কাব্যের চর্চা যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল। তাঁকে বারোয়ারিভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের রেওয়াজ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের আজকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনজিজ্ঞাসায় নজরুলের কাব্যের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। যেজন্যে নজরুলের সংগ্রাম, তা আজো আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। নজরুলেরই সংকল্প—'আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম'—গণমানসে সংক্রামিত হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগন্ধর কবি নজরুল

সৃজনীশক্তি আর সৃষ্টিশীলতা মানুষের ব্যক্তিগত গুণ। কিন্তু সে-সৃষ্টির অবলম্বন দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়, পরিবেশকে আধার আর প্রতিভার অভিব্যক্তিকে আধেয় হিসাবে কল্পনা করলে, যে-কোনো প্রতিভার কিংবা সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হয়।

স্থান-কালের প্রভাবেই মানুষের দেহ-মন নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মানুষের যে-কোনো আচরণে বা অভিব্যক্তিতে স্থানিক ও কালিক ছাপ না-থেকেই পারে না।

প্রতিভা মাত্রেই একাধারে যুগন্ধর ও যুগোত্তর, এতে সমকালীন মন-মেজাজের চাপ যেমন থাকে, তেমনি থাকে ভাবীকালের মন-মানসের আভাস— যা প্রাকৃতজনকে দেয় ভবিষ্যতের দিশা।

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করার আগে এ ভূমিকাটুকু করতে হল এ জন্যে যে, আজকাল কথা উঠেছে নজরুল-কাব্য সাময়িকতা দোষে দুষ্ট, কাজেই তা কালোত্তীর্ণ হতে পারবে না। ফলে তাঁর কবিতা হবে না অমৃত আর তিনি রইবেন না অমর। এ অভিযোগ তাঁর বন্ধু ও হিতৈষীরা গোড়া থেকেই করে আসছিলেন, নজরুল জবাবও দিয়েছিলেন :

বর্তমানের কবি আমি ভাই
ভবিষ্যতের নই নবী
কবি অকবি যা বল ভাই
নীরবে আমি সহি সবি, ...
বন্ধুগো আর বলিতে পারি না
বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি
তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি নাতো একা
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা
বড় কথা বড় ভাব আসেনাকো মাথায়, বন্ধু বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।

তবু হিতৈষীদের ক্ষোভ কমেনি, তাই আজো ভক্ত পাঠক-মনে বেদনা জাগে।

বালক-কিশোর কবি কবিতা লেখে, সে-লেখা যত না নিরুদ্দিষ্ট পাঠকের জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি অবচেতন মনের অনুভূতি প্রকাশের প্রেরণায়— বেদনা-মুক্তির কারণে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়, সে হয় প্রতিবেশ সচেতন। তখন প্রকাশের প্রেরণাই প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। তখন স্রষ্টার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে— কী লিখব, কেন লিখব, কার জন্যে লিখব এবং কেমন করে লিখব? এতেই মিলে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিশা। তখন বক্তব্য প্রাণ, পায়, অর্থপূর্ণ হয় এবং পাঠকহৃদয়ে জাগায় সমানুভূতি। মানুষের স্বভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে বৈচিত্র্য, মতে আছে বিভিন্নতা এবং মননে আছে লঘু-গুরু ভেদ। এতেই ঘটে একই বস্তু সম্বন্ধে জনে জনে দৃষ্টির পার্থক্য ও মতের বিভিন্নতা।

প্রকাশের প্রেরণাবোধ করতেন, তাই নজরুল ছেলেবেলায় লিখতেন। তখন চেষ্টা ছিল কেবল সুন্দর করে বলার দিকেই, যাতে করে শ্রোতারা বলে 'বেশ হয়েছে, চমৎকার লাগল।' তখন বক্তব্য নয়, বলার ভঙ্গি-সুষমাই লক্ষ্য।

কৈশোরুত্তীর্ণ কবির অভিজ্ঞতা অনেক দূর থেকে হলেও জগৎ-জীবনের নগ্নরূপ বড় বীভৎস আকারে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে মানবতার লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথিত-ব্যাকুল করে তুলেছে। একদিকে পুঁজিপতি বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের নর-রক্তমুণ্ড নিয়ে দানবীয় উল্লাস, অপরদিকে চির-নির্যাতিত আর্তমানবতার মরিয়া ভাবের বিপ্লব। মধ্য-য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্র আর রাশিয়ার বিপ্লব ময়দান—এ দুটোর সার্বিক বৈপরীত্য কবির বক্তব্যের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করল অপরিমেয়! প্রত্যয়দৃঢ় কবি লেখনীর মাধ্যমে সংগ্রাম শুরু করলেন—

'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা'

এভাবেই নজরুল যুগ-জাত এবং যুগন্ধর কবি হয়ে উঠলেন। তিনি সমকালের মানুষের বুকের বেদনার অভিব্যক্তি দিলেন, তাদের রুদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল তাঁর তীব্র লেখনী মাধ্যমে।

যদিও 'মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি' তবু সে-রবির প্রভায় এ যুগ-আর্তি তেমন ধরা পড়ছিল না প্রাকৃতজনের চোখে। তাঁর প্রশান্ত তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, তাঁর তিতিক্ষা-মধুর তিরস্কার উপলব্ধি করবার যোগ্যতা ছিল না জনগণের। তাই তাঁর মানবতার বাণী তাদের স্বস্তি দিতে পারে নি।

রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে দেশ হতে আজ দেশান্তরে
সে কিরণ শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে।

নজরুল ইসলাম সাধারণের বুকের কথা তাদেরই মুখের আটপৌরে ভাষায় যখন বলা শুরু করলেন, তখন বিস্মিত বাঙালি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করল। প্রদীপ্ত সূর্য-শাসিত আকাশে তারার আবির্ভাব যেমন অদ্ভুত, রবীন্দ্র-সৃষ্ট সাহিত্যাকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের দীপ্তি ও স্থিরতা নিয়ে নজরুলের উদয়ও তেমনি অভাবিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁকে বরণ করে নিলেন। তিনিও তাঁকে অভিনন্দিত করলেন 'ভবিষ্যতের নবী' হিসেবে নয়, 'বর্তমানের কবি'-- রূপে এবং সম্বোধন করেছেন 'ধূমকেুত' বলে!

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন!

অতএব নজরুল যেমন 'ভবিষ্যতের নবী' না হয়ে 'বর্তমানের কবি' হবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁকে যুগের 'ধূমকেতু' বলে, সমকালীন সমস্যার সংগ্রামী বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিশ্বমানবতার ধারক, বাহক ও প্রচারক এবং মানুষ ও প্রকৃতি রাজ্যের সার্বিক অনুভূতির প্রমূর্তরূপ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও যাঁর স্বাতন্ত্র্য ম্লান করতে পারেনি, তাঁকে সাময়িকতার অপবাদে তাচ্ছিল্য দেখানো সহজও নয়, সম্ভবও নয়।

নজরুলের কাব্যে দীপ্তি আছে, সামগ্রিক সৃষ্টি-সুষমা নেই এবং অনুশীলন-পরিশীলন-পরিচর্যার একান্ত অভাব। তাই তাঁর হাতে আকস্মিকভাবে গুটিকয় আশ্চর্য সুন্দর কবিতা সৃষ্টি সম্ভব হলেও তাঁর প্রতিভার ক্রমবিকাশের ও পরিণতির সাক্ষ্য নেই কোথাও। ক্ষোভের কারণ এখানেই। যেভাবে বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল তা সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক হলেও খণ্ডদৃষ্টির ফল, তা বোঝা যায় যখন দেখি অনেক চিরন্তনত্বকামী সুকবি—যাঁদের রচনায় কাব্য—কুশলতার অভাব নেই কিংবা অযত্নের এতটুকু ছাপ নেই কোথাও—পাঠকের সমাদর পাননি। নজরুলের জনপ্রিয়তাই নজরুলের যোগ্যতার ও তাঁর কাব্যের সার্থকতার প্রমাণ। যদি তাঁর কাব্যে কিছু অসাময়িক না-ই থাকবে, তা হলে নজরুল আজো এত জনপ্রিয় কেন? সে কী কেবল তাঁর তুলে-ধরা সমস্যার সমাধান হয়নি বলে, কিংবা তাঁর শুরু-করা সংগ্রামের ইতি ঘটেনি বলে? তা-ই যদি হত, তাহলে এতসব গণসাহিত্য আবর্জনার মতো অপসৃত হচ্ছে কেন?

নজরুল যুগের চারণ-কবি, যুগের মুযাহিদ এবং চিরকালের আতমানবতার প্রমূর্ত কান্না এবং বিদ্রোহ দু-ই। তাই তাঁর কাব্যে মহাভাবের মহৎ কথা নেই, ব্যবহারিক জীবনের অনুভূত সত্যের বেদনাময়-আগুনে অভিব্যক্তি আছে, এই জ্বালাময়ী বেদনার অগ্নিক্ষরা বাণীর পেছনে একটি সুস্থ সমাজ-দর্শন কিংবা রাষ্ট্রাদর্শ আশা করেছিল পাঠক মন। তা তারা পায়নি, ক্ষোভের মূল এখানেই। এই অবচেতন অভিযোগই তারা অক্ষম-ভাষায় প্রকাশ করছে সাময়িকতার অপবাদ দিয়ে এবং আঙ্গিক সৌন্দর্যের অভাব দেখিয়ে।

যে-নজরুলের দৃষ্টিতে এমন মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা আছে, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসায় যদি তেমনি গভীরতাও থাকত!—পাঠক- মনে এ সক্ষোভ প্রশ্ন জাগে। অর্থাৎ তারা একটা 'দর্শন' চায়। কিন্তু কবির কাছে 'দর্শন' পাই তো ভালো, না পেলেও দুঃখ কী? আমার মনের কথা, ভাবনার ভাষা পেয়েছি, এই কী যথেষ্ট নয়! আর কার্য-কারণ বিশ্লেষণ না-ই বা থাকল, সিদ্ধান্ত সমাধান না-ই বা পেলাম! আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নজরুল ইসলামে বোলশেভিকবাদ কিংবা অন্য কোনো ইজমের আনুগত্য ছিল না। তাঁর ব্যক্ত মানবতাবোধ মানুষের সুপ্ত মানবিকতারই বিমূর্ত প্রকাশ—তাই এর গতি দুর্বার, এর আবেদন ঋজু এবং আকস্মিক। আঘাত ও অনুভূতিজাত বলেই এ উচ্ছ্বাস ঝড়ের মতো ফুঁসিয়ে চলে এবং এ উত্তেজনা বন্যার মতো ভাসিয়ে দেয় আর সাগরের মতো কল্লোল তোলে।

নজরুল ইসলাম আসলে রবীন্দ্রনাথেরই পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথে যে রেনেসাঁস প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে নতুনকে—সুন্দরকে গড়ার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথেরই। ঘুণে-ধরা পুরোনোকে ভাঙার দায়িত্ব পড়ল নজরুলের উপর। রবীন্দ্রনাথের মনীষা (brain), আর নজরুলের হাত (action)। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন প্রেমানুভূতি ও প্রজ্ঞা তাঁকে কঠোর-নির্মম হতে দেয়নি, শিক্ষা-বিজ্ঞানীর মতো তাঁর চেষ্টা ছিল পরোক্ষ। নজরুল পাঠশালার পণ্ডিত। তিনি লাঠ্যৌষধির প্রত্যক্ষ ফল লাভে উৎসুক। দুজনের লক্ষ্য ছিল এক এবং অভিন্ন—প্রেম পাওয়া ও দেওয়া, সমাজে-ধর্মে-রাষ্ট্রে অসুন্দরকে অপসারিত করে কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। অপ্রেম-অসুন্দরই নজরুলকে করেছে সংগ্রামী। বোধিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের ছিল সইবার ও অপেক্ষা করবার ধৈর্য। কিন্তু তারুণ্য নজরুলকে করেছিল অসহিষ্ণু ও বিদ্রোহী। আর জীর্ণ আবর্জনা সরিয়ে না ফেললে নতুন ইমারত গড়ে তোলা যে দুঃসাধ্য এ বাস্তববোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। যা তিনি পারছিলেন না বলে অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তা-ই করবার ব্রত নিয়ে একজনের সদম্ভ আবির্ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ উল্লাস ও অভিনন্দন না জানিয়ে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আর নজরুলের কর্মে বাঙালির রেনেসাঁস পূর্ণতা পেল।

সংগ্রামব্রতী নজরুলের হাতে ছিল 'রণতূর্য' আর মুখে ছিল ভাঙার গান—যে-ভাঙা ধ্বংসাত্মক নয়— সৃষ্টিমূলক :

'প্রলয় রাগে নয়' রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।'

এবং ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন-সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন জীবন-হারা-অসুন্দরে করতে ছেদন!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!

কাজেই— তোরা সব জয়ধ্বনি, কর!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের ও যুগের সে-অবস্থায় নজরুলের মতো সংগ্রামী কবির প্রয়োজন ছিল, তিনি সে-প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তাই তিনি জনপ্রিয় ও গণহৃদয়ের রাজা। তাঁর কাব্যও তাই উপাদেয়। তাঁর কাব্যেই প্রথম এদেশের 'বঞ্চিত বুকের সঞ্চিত ব্যথার অভিযান' প্রত্যক্ষ করি আমরা।

নজরুল ইসলাম যুগন্ধর কবি। তাঁর কাব্য আমাদের এক দুর্দিনের সমাজ-সংস্কৃতি ও মন-মননের ইতিহাস হয়ে রইল, আর রইল অনাগত অনেক কালের জন্যে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে। নজরুল-কাব্য আমাদের চেতনার স্বাক্ষর, আমাদের বোধের সাক্ষ্য, আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস এবং আমাদের মন-মননের প্রতীক, প্রেরণার উৎস আর মানবতাবোধের প্রতিভূ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের কাব্যপ্রেরণার উৎস

কবি হতে হলে হৃদয়বৃত্তির বিশিষ্ট বিকাশ প্রয়োজন। এতে মন তীব্রভাবে অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শচঞ্চল হয়ে উঠে। কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে এ বিকাশ পূর্ণমাত্রায় হয়েছিল। যে-বয়েসে মন শুধু গ্রহণ করতে থাকে এবং বিবেচনাহীন উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হয়, সেই কিশোর বয়েসে কবি লড়াই-এর ময়দানে গিয়েছিলেন, দূর থেকে দেখেছিলেন বর্বরতার নির্লজ্জ অভিনয়, নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব লীলা, পাশব-বৃত্তির নগ্ন আত্মপ্রকাশ, মানবতার অপমৃত্যু। জীবনের গ্লানি আর মৃত্যুর বীভৎসরূপ তাঁর কাছে প্রকট হয়ে ওঠে একান্তভাবে। এতে কবির অনুভূতিপ্রবণ স্পর্শচঞ্চল মন ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়। তাঁর আত্মায় জ্বলে উঠল বিদ্রোহ, বিপ্লব আর মানবতাবোধের অপূর্ব দ্যুতিময় শিখা।

কবি ফিরে তাকালেন তাঁর দেশবাসীর দিকে। দেখলেন—সেখানেও দাসত্ব, দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় মানোষের মুমূর্ষু আত্মা ধুঁকছে। কবির বিক্ষুব্ধ আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মারমুখী হয়ে তিনি সংগ্রাম শুরু করলেন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বাহুবল তাঁর ছিল না; তাই শোষণ-অনাচারের বিরুদ্ধে চলল বাণীর অভিযান :

"রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা।"

তার সে কী তীব্রতা! সে কী আশ্চর্য আবেগমুখরতা! ক্ষোভে, জ্বালায়, যুক্তির সারবত্তায়, বাচনভঙ্গির তীক্ষ্ণতায়, উচ্ছ্বাসের দুর্বার গতিবেগে সহস্র বজ্রনিনাদে তাঁর বাণীবর্শা নিপতিত হতে লাগল এটমবোমার মতো সমাজদেহে ও রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর। কবি উদাত্তকণ্ঠে সবিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন তাঁর ব্রত :

"আমি সেই দিন হব শান্ত—
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীমরণভূমে
রণিবে না।"

AMARBOI.COM

শুরু হল সংগ্রাম—আপোষহীন, বিরামহীন। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির খতিয়ান গেল তলিয়ে। একান্তভাবে ভালোবেসেছিলেন তিনি স্বদেশকে ও স্বজাতিকে। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ ছিল না কারো প্রতি। কারো ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায়ের প্রতি তাঁর ছিল না নালিশ। তাঁর সংগ্রাম আদর্শগত; ব্যক্তি, রুচি বা স্বার্থগত নয়। তাই দেশের মানুষ নির্বিশেষকে তিনি ভালোবাসতে পেরেছিলেন হৃদয়-মন দিয়ে, দ্বিধাহীনচিত্তে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন ব্যক্তিজীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটি। এইজন্যেই নারীপুরুষ, কৃষকমজুর, এমনকি বারাঙ্গনাকেও তিনি সমান উদারতায় মর্যাদা দিতে পেরেছেন। শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছেন মানুষ নির্বিশেষকে অকুণ্ঠচিত্তে।

পতিত স্বদেশ ও নির্যাতিত স্বজাতিকে ভালোবাসতে গিয়ে কবি বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানবতাকে ভালোবেসেছেন। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যে ফরিয়াদের হাত উঠিয়ে তিনি দাসত্ব, শোষণ ও অত্যাচার-জর্জরিত বিশ্বমানবের জন্যে আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ জানিয়েছেন। এ কারণেই দুর্গত

এশিয়ার সমস্ত অনুন্নত, পেষণক্লিষ্ট জাতির সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশত হতভাগ্য এশীয় জাতিগুলোর সবকটাই মুসলমান। তাই কোনো কোনো পাঠক-সমালোচক তাঁকে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাবাদী বা pan Islamism-এ বিশ্বাসী ঠাউরেছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁদের এ বিশ্বাসে গলদ আছে, কেননা তাঁর মুসলিম দেশ ও বীর-প্রশস্তি বিষয়ক কবিতাগুলো মুসলিম প্রীতির চেয়ে দুঃখীর প্রতি সমপ্রাণতার পরিচয়ই যেন বেশি বহন করছে। যেমন—

ইরাকবাহিনী! এ যে গো কাহিনী—
কে জানিত কবে বঙ্গবাহিনী—
তোমারও দুখে 'জননী আমার'
বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর?
পরাধীনা! এই একই ব্যথায় ব্যথিত
ঢালিল দু-ফোঁটা অশ্রু ভক্ত বীর।'

অথবা—

তাই মিশরের নহে এই শোক
এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া-আফ্রিকা দুই মহাভূমি
বেদনা উঠিছে বাজি।
অধীন ভারত তোমারে স্মরণ
করিয়াছে শতবার।

এরূপ আরো কবিতায় কবি এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের নব-জাগরণে উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে স্বদেশীয়দের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ;

এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে হে ঋষি
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল
চলিতেছে দিবানিশি।

অথবা—

খররোদ পোড়া খর্জুর তরু তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর।
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতের বুকে নাই রুধির!'

অপর কয়েকটা কবিতায় তিনি অন্যদেশের ন্যায় স্বদেশেও জাগরণ কামনা করেছেন :

জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেছের
এয় খোদা! এই জাগরণ রোলে
এই মেষের দেশও জাগাও ফের।

অথবা—

মলয় শীতল সুজলা এদেশে
আশিস করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের
মরুর দু মুঠো বালি!

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূলত আত্যন্তিক স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমের যে-অভিব্যক্তি বাণীরূপ লাভ করল, তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে আচার, সংস্কার, শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নক্লিষ্ট মানবসাধারণের মুক্তি-জেহাদের রূপ গ্রহণ করেছে। এ জেহাদ একাধারে ত্রিমুখী : বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক কুৎসিত মনোভঙ্গির উৎসাদন প্রয়াস এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি প্রচেষ্টা। এ-জেহাদে নজরুল অকপট মুযাহিদ ছিলেন। সংকল্পের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ছিল নিবিড়। যে-ব্রত তিনি হৃদয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করলেন, তার উদযাপন প্রচেষ্টায়ও তিনি উক্ত বৃত্তিনিচয়ের উদার ও অবাধ সহযোগিতা পেলেন। ফলে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী জ্বালায়, দরদে, ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, সুরে তীক্ষ্ণ-তীব্র মধুর হয়ে উঠেছে।

কবি নিজে ছিলেন প্রাণধর্মী। এজন্যে প্রাণধর্মের প্রতীক তরুণ ও তারুণ্যকে কবি সর্বত্র অভিনন্দন জানিয়েছেন :

'কূপমণ্ডুক অসংযমীর
আখ্যা দিয়াছে যারে—
তারি তরে ভাই গান রচে যাই
বন্দনা করি তারে।'

কবি জীবনধর্মী অভিযাত্রীও বটে, তাই তিনি বলেছেন :

'গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে
যারা আজি আগুয়ান।'

এসবও হয়তো বাহ্য লক্ষণ। তার সর্বসংগ্রামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার সম্যক উপলব্ধি। তিনি এজন্যেই বলেছেন :

'নাই দানব নাই অসুর? চাইনে সুর, চাই মানব।'

কারণ— 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নাই কিছু মহীয়ান।'

এহেন মানুষের তিনি প্রেমিক। এই মানুষকে ভালোবেসেই তিনি ধন্য হতে চান— জীবনকে চান সার্থক করে তুলতে। এমন মানুষের দুঃখ-বেদনা লাঞ্ছনায় কী তিনি স্থির থাকতে পারেন? তাই তাঁর ভাষা এত তীব্র, বাণী এমন তীক্ষ্ণ এবং জোরালো? এই ভালোবাসাই তাঁকে সাম্যবাদী করেছে— করেছে বিদ্রোহী, করেছে বিপ্লবী। কিন্তু তাঁর সাম্যবাদকে মার্কসবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে ভুল হবে। কারণ তাঁর সাম্যবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে— মানুষ এক আদমের সন্তান, সুতরাং মানুষ মাত্রেই ভাই ভাই। মানুষ হচ্ছে 'আনতুমা খয়ায়ে উম্মাতীন'। অতএব এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো মর্ত্যশক্তির নিকট তার মাথা নত করতে নেই। মানুষের এ মর্যাদায় তিনি পূর্ণ-বিশ্বাসী। সর্বপ্রকার কর্ম ও বৃত্তি যখন জীবন ও সমাজ রক্ষার জন্যে অপরিহার্য তখন কোনো কাজ বা পেশাই ছোট নয় এবং বৃত্তির জন্যে কেউ হেয় হতে পারে না। সেইজন্যেই কবি সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন। তবু শ্রেণীবিলুপ্তির কথা তাঁর বাণীতে নেই। তিনি চেয়েছেন স্ব-স্ব অধিকার, বিত্ত ও বৃত্তি বজায় রেখে স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদার পূর্ণ স্ফূরণ; চেয়েছেন এমন ব্যবস্থা যাতে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও বৃত্তি বজায় রেখেও মানুষ 'যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই।' আইন করে চাপানো ধনসাম্য নয়—প্রীতি-বন্ধুত্বের সাম্য তথা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাম্যই কবির কাম্য।

এই আদর্শই ছিল তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণই ছিল তাঁর ব্রত। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর সাধনা। এই-ই হচ্ছে তাঁর কাব্যের মূলবাণী—গানের মূল সুর। এইজন্যেই এ আদর্শের রূপায়ণে প্রতিবন্ধকস্বরূপ যতকিছু ছিল, সবকিছুর বিরুদ্ধে সর্বত্র তাঁর বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। তিনি মানবতার পূজারী মহাসাধক, প্রাণ-ও-জীবনধর্মের মূর্ত প্রতীক।

সুতরাং মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি অর্জন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যুগে যুগে সমাজ, সংস্কার, রাষ্ট্র প্রভৃতির অবাঞ্ছিত জঞ্জাল এসে মানুষের এই মৌলিক অধিকারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবির সংগ্রাম হচ্ছে তাকে সব বাধা ও মালিন্য মুক্ত করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। সে-সংগ্রাম করতে গিয়েই কবি বাঙালির সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ভাষায়, ছন্দে, সুরে একযোগে বিপ্লব আনয়ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিরাট ও মহান। তাঁর স্বপ্ন ছিল গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি জাতিকে (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে দাঁড় করানো। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আদর্শে, আচারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে, সাহিত্যে কোথাও যেন গ্লানি না থাকে— মনুষ্যত্বের সুউচ্চ সাধনায় যেন তাঁর দেশবাসী আত্মনিয়োগ করে—এই ছিল তাঁর অভিলাষ।

প্রতিভাবানেরা সমসাময়িক যুগের দিশারী ও নিয়ন্তা এবং ভবিষ্যৎকালের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। কাজী নজরুলও এমনি একজন প্রতিভা। তিনি সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ভাষায়, ছন্দে ও সুরে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন। যা অভিলাষ করেছিলেন, তা অনেকাংশে পূর্ণও হয়েছে। ভবিষ্যতে একদিন তাঁর স্বপ্ন হয়তো পুরোপুরিভাবেই সফল হবে। সেদিন তিনি থাকবেন না, কিন্তু তাঁর আদর্শানুসারী লক্ষ লক্ষ প্রবুদ্ধ জন-কণ্ঠে সেদিন নিবেদিত হবে তাঁর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের কাব্যসাধনার লক্ষ্য

নজরুল ইসলামই মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র কবি—যাঁর অনন্য প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা ছিল। প্রতিভাবানেরা সমসাময়িক যুগের দিশারী ও নিয়ন্তা এবং ভবিষ্যৎকালের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। নজরুল ইসলামের মধ্যেও আমরা এসব লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ভাষায়, ছন্দে ও সুরে একযোগে বিপ্লব আনয়ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিরাট ও মহান। তাঁর স্বপ্ন ছিল গোটাজাতিকে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দাঁড় করানো। শিক্ষায়, সভ্যতায়, আচারে, আদর্শে যেন কোথাও গ্লানি না থাকে, মনুষ্যত্বের সুউচ্চ সাধনায় যেন তাঁর দেশবাসী আত্মনিয়োগ করে— এ-ই ছিল তাঁর অভিলাষ। এইজন্যেই তিনি বিপ্লবী কবি।

এইরকম আর একজন মাত্র প্রতিভা বাঙলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁরও সাধনা ছিল বাঙালি হিন্দুকে উন্নত সমাজাদর্শ, ধর্মাদর্শ, রাষ্ট্রাদর্শ ও জাতীয়তাবোধ দান করা। সমাজাদর্শে দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রাষ্ট্র ও জাতীয়তার প্রতীক তাঁর সীতারাম, আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস এবং অনুশীলন, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতির দ্বারা তিনি ধর্ম-সংস্কারের প্রয়াসী হন। নজরুল ইসলামও অগ্নিবীণা, সন্ধ্যা, সর্বাহারা, সাম্যবাদী, বিষের বাঁশী, জিঞ্জির, ভাঙ্গার গান প্রভৃতি কাব্য; আমপারা, মরুভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কোরবানী, মোহররম, ফাতেহা দোয়াজদহম আর আমানুল্লাহ, জগলুলপাশা, খালেদ, কামালপাশা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের প্রশস্তি দ্বারা একাধারে মুসলমান ও বাঙালি জাতির উন্নতি কামনা করে গেছেন। একদিক দিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বড়। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু হিন্দুর কথা ভেবেছেন, প্রতিবেশী মুসলমানকে তিনি আপনজন ভাবতে পারেননি। স্বামী বিবেকানন্দও মুচি, মেথর, চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলেছেন, কিন্তু মুসলমানকে ভাই বলে বরণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রও এ ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখেননি কখনো— দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়েও নয়। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বাঙলার যমজ সন্তান বলেই জানতেন। বস্তুত সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামই একমাত্র লেখক—যিনি ভুলেও কখনো বিধর্মীকে বিদ্বেষ বা বিদ্রূপ করেননি। পক্ষান্তরে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব হিন্দু-লেখকের লেখায় অল্প-বিস্তর মুসলমান-বিদ্বেষ বা বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

নজরুল-প্রতিভার পরম বিস্ময়কর দিক হচ্ছে সমকালীন জীবনবোধ। রাশিয়ার সাম্যবাদের বুলি যখন এদেশে পৌঁছেনি, তখন তারা ভারতবর্ষে—হয়তো গোটা এশিয়ায় তিনিই প্রথম জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ফরিয়াদ নিয়ে সমাজের ও রাষ্ট্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রতিকারের দাবী জানালেন। এমন অকৃত্রিম দরদী বাঙলাদেশে কমই জন্মেছেন। এইজন্যেই তাঁকে এককথায় জীবনধর্মী মানবতার কবি বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

কেউ কেউ অভিযোগ করেন, তিনি প্রচার-সাহিত্যের কবি, তাঁর সাহিত্যে সাহিত্যের চিরন্তন উপাদান নেই। এসব মতবাদ একটু সেকেলে। কেননা যে-সাহিত্য মানুষের রসপিপাসা মিটাতে সমর্থ, তা পুরোনো হবার নয়। ধরতে গেলে সাহিত্যের বিষয়বস্তু কোনোকালেই চিরন্তন নয়, কবি-সাহিত্যিকের প্রতিভার স্পর্শেই নগণ্য বিষয়বস্তুও শিল্পায়ত্ত হয়ে চিরন্তন রসের উৎস হয়ে থাকে। যেমন একটি দুর্ভিক্ষ বা একটি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষের কাহিনী শিল্পীর সক্ষম তুলিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরন্তন বাণীমূর্তি লাভ করে সর্বকালের পাঠকের কাছে কারুণ্যের নির্ঝর হয়ে থাকতে পারে। অথচ দুর্ভিক্ষ বা বন্যা এমন কিছু চিরন্তন সাহিত্যের উপাদান নয়। সুতরাং ভাব বা বিষয়বস্তু সাহিত্যের তেমন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়, রূপায়ণশক্তিই সাহিত্যের চাবিকাঠি অন্য কথায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে কঙ্কালস্বরূপ, ভাব হচ্ছে রক্তমাংস স্বরূপ এবং প্রাণ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গি। এই প্রকাশ-প্রতিভা (style) না থাকলে রচনা সাহিত্য হয় না। সুতরাং নজরুল ইসলাম তাঁর যে-কাব্য দিয়ে সমাজে-সাহিত্যে-ভাষায় ছন্দে-সুরে যুগপ্রবর্তক কবি বলে অভিনন্দিত হলেন, সে-কাব্যের আবেদন অনাগতকালে থাকবে না এমন ধারণায় সত্য নেই বিশেষ। কেননা যা সাহিত্য তা রসোত্তীর্ণ কাজেই নজরুলের কাব্যের যে অংশ সাহিত্যরসময় সে-অংশ কখনো বিলুপ্ত হবে না। তা পুরোনো সাহিত্যরূপে উত্তরকালেও কদর পাবে। যদি সমালোচকদের যুক্তি মেনে নিয়ে বলি যেহেতু ইহা প্রচার সাহিত্য—এ-যুগের প্রয়োজনেই রচিত, সেহেতু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পরবর্তী যুগে এর কদর হবার কথা নয়, তাহলেও আমরা ভুল ধারণাই পোষণ করব, কেননা সেদিন এই সাহিত্য ইতিহাসের বাণীর ন্যায় সে-অনাগত দিনের জনগণকে আদর্শচ্যুতি বা পথবিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। কারণ নির্বিশেষ মানুষ কোনোদিন দুষ্প্রবৃত্তির ও সংকীর্ণতার উপরে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আজকের মতো সেদিনও পাঠকচিত্তে নজরুলের কাব্য রস ও প্রেরণা যোগাবে।

নজরুল ইসলাম স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক কবি। তার চেয়েও বড় পরিচয় তিনি নির্যাতিত মানবতার কবি। স্বদেশের দুঃখী জনসাধারণের দুঃখ-বেদনা-নিপীড়নের ফরিয়াদ ও প্রতিকার প্রচেষ্টায় তিনি কলম ধরেছিলেন। সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অত্যাচারমুক্ত করে মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর ব্রত : 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস। যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।' কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশ-জাতি ও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে মানুষের যেখানে নির্বিশেষ পরিচয়, সেই পরিচয়ের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন করে তোলাতেই তাঁর সাধনা নিবদ্ধ ছিল। বিত্ত-বৃত্তি নিরপেক্ষ মানুষের যে—ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির আত্মিক মর্যাদা আছে— সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই ছিল তাঁর কাব্যসাধনার লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের অবাধ স্ফূরণ ও বিকাশের অধিকার। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন মানুষ নির্বিশেষের অবাধ ও সহজ মিলনের ; যে-মিলনে বিত্ত-বৃত্তি-বেশাত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, যে-মিলন সম্ভব হয় পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার স্বীকৃতির উপর। তিনি চেয়েছেন এমন 'মিলন ময়দান' যেখানে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যাত্মা লাঞ্ছিত হয় না এবং 'যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে

আমার এক বন্ধু আড্ডার আসরে সেদিন নজরুল-কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যে-বক্তব্য পেশ করেছেন, এখানে আমি তার সার সংকলন, করে দিচ্ছি। দিচ্ছি এজন্যে যে এতে ভাববার ও ভাবনার বিষয় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে তর্কের অবকাশ।

তিনি বললেন, "নজরুলকে কোনো মতেই 'বিদ্রোহী' বলা চলে না। কেননা, সুব্যবস্থা ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ যে করে সে-ই বিদ্রোহী। নজরুলের সমকালীন সমাজ ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কার যাদের পছন্দসই ছিল তাদের চোখেই নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী, আর যারা নিশ্চিত ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছে, ভালো-মন্দের অনুভূতি নেই—তাদের কাছে তিনি বিপ্লবী। আর আমরা-যারা তাঁর মতাদর্শের সমর্থক আমাদের কাছে তিনি সংগ্রামী বা যিহাদী কবি—তিনি মুযাহিদ।"

"তাঁকে মানবতার কবিও বলাও ভুল। 'মানবতা' বিশ্বমানবপ্রীতির দ্যোতক। মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতি তাঁর ছিল না। মা'র কোনো সন্তান দুর্বৃত্ত হলে মা বেদনা বোধ করেন, কিন্তু তার মৃত্যু কামনা করেন না বা নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন না। গৌতমবুদ্ধকে বলা যায় মানবতার পূজারী। নজরুল বঞ্চিত উৎপীড়িতের পক্ষ নিয়ে উৎপীড়কের বিরুদ্ধ সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন, চেয়েছেন তাদের বুকের রক্ত পান করে প্রতিশোধ নিতে। কাজেই তাঁকে বড়জোর নির্যাতিত মানবতার কবি বলে আখ্যাত করা যায়।

"আবার তাও বলা যায় কি-না তলিয়ে দেখবার মতো। কেননা, নজরুলের ঠিক ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ব্রত ছিল না। তিনি নিজেও বঞ্চিতদের একজন, দুঃখ- লাঞ্ছনায় তাঁর জীবনও হয়েছিল দুঃসহ। কাজেই তাঁর সংগ্রামের মূলে নির্জলা লাঞ্ছিত-বাৎসল্য ছিল না—আত্মরতিও ছিল। এজন্যেই তাঁর কাব্যে উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা বেশি, আদর্শবাদের আবেগের চাইতে চিত্ত-বিক্ষোভের পরিমাণ অধিক। রবীন্দ্রনাথ ধনীর দুলাল। তাই তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে,' 'দুরন্ত আশা' 'দেশের উন্নতি' 'অপমান' প্রভৃতি কবিতায় তিরস্কার আছে, ভৎর্সনা আছে, সদিচ্ছাও রয়েছে, কিন্তু ক্ষুব্ধচিত্তের উত্তেজনা নেই! ফলে রবীন্দ্রনাথের আবেদন হয়তো হৃদয়বানদের ভাবিয়ে তুলেছে, কিন্তু নজরুলের কথার আগুনে-গোলা পাঠককে করেছে বিক্ষুব্ধ এবং সংগ্রামী।

"আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা নজরুলকে জাতীয় কবি বলে প্রচার করি। অন্যত্র যেমনই হোক, সুধী-সভায় তাঁকে জাতীয় কবি বলে পরিচিত করাবার চেষ্টা অনুচিত কর্ম। কেননা 'জাতীয় কবি'র যে-সংজ্ঞা আমাদের জানা আছে, তাতে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় কবি হতে পারেন না। সংগ্রামী আদর্শেও না, বোধেও না।

"নজরুলই বাঙলাদেশে একমাত্র লেখক, যাঁর অবচেতন মনেও হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। তাঁর কথায়, কাজে ও আচরণে তিনি যে উদার মন ও মতের পরিচয় দিয়েছেন তা একান্তই বিস্ময়কর। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি প্রত্যেক মানুষেরই অনুকরণীয়। এদিক দিয়ে নজরুলের জুড়ি নেই। মানুষ নজরুল ও কবি নজরুলের চরিত্র ও কাব্যের কেবল এদিকটি স্মরণে রাখলেও যে-কোনো মানুষেরই আত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে। এ দুর্লভ উদারতার একটি কারণ হয়তো এই যে, সেদিনকার ভারতের স্বাধীনতা এবং শোষিত জনের মুক্তিই তাঁর কাম্য ও সাধ্য ছিল, তাই তিনি কোনো তুচ্ছ আবেগকে প্রশ্রয় দেননি—আদর্শ ও লক্ষ্যে বিপর্য ঘটবে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই মনোভাব ছিল বলেই নজরুল ও তাঁর কাব্যকে সহসা কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক ছাপে চিহ্নিত করা যায় না। নিতান্ত এ যুগের লোক না হলে ফকির লালনের ন্যায় নজরুলের জাতিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কের কারণ ঘটত। তাঁর কাব্যে না'ত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে শ্যামাসঙ্গীত; মুসলিম ঐতিহ্যের পাশে রয়েছে হিন্দু পুরাণ; আল্লাহ্-রাসুলে বিশ্বাসের সাথে পাই তাঁর দেবদ্বিজে ভক্তি। তাঁর পারিবারিক জীবনেও ঘটেছে হিন্দু-মুসলিম মিলন। সে-মিলন সমন্বয়ভিত্তিক নয়—সংযোগমূলক। এতে দুটো জাতির ধার্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পারস্পরিক শ্রদ্ধার সূত্রেই গড়ে উঠেছে। এও কারুর চোখে ভালো, আবার কারুর কাছে মন্দ।

"জীবনচর্যায় নজরুলে মুসলমানী যতটুকু আছে, হিন্দুয়ানী আছে তার চেয়েও বেশি। তিনি মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাস রাখেননি। তাঁর আস্থা ছিল হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ তবু মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করেছেন, নজরুল তাও করেননি। রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করতে হলে নজরুলকেও রাখা চলে না।

"অবশ্য নজরুল ছিলেন বাঙালি ও মুসলমান। বাঙালি হিসেবে দেশী প্রাচীন ঐতিহ্যে ছিল তাঁর জন্মগত অধিকার। আর ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে আরব-ইরানের ঐতিহ্যে জন্মেছে তাঁর আকর্ষণ। তাই তাঁর মধ্যে আমরা হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি সমান আগ্রহ লক্ষ্য করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি আর ভারতের বাইরে হিন্দু নেই। কাজেই তাঁর দেশী ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল অভিন্ন এবং দুটোই আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুয়ানী। একের প্রশংসা ও অপরের নিন্দার কারণ ঘটেছে এভাবেই। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশও মিলেছে এখানেই।

"আঙ্গিক হচ্ছে কাব্যের দেহ, অনুভূত ভাব হল কাব্যের প্রাণ। দুটোই আপেক্ষিক বস্তু। কারণ দেহহীন প্রাণের কল্পনা অলীক আর প্রাণহীন দেহ নিরর্থক। কাজেই কাব্যের আঙ্গিক কাব্যের আত্মার মতোই মূল্যবান এবং অপরিহার্য নজরুল-কাব্যে আঙ্গিক সৌন্দর্যের অভাব রয়েছে। অথচ সাধারণ্যে রূপ যে গুণের চেয়ে চড়া দামে বিকায়—তা কে না জানে! কবিতায় বক্তব্য প্রকাশে তিনি যত ব্যস্ত, অঙ্গ সৃষ্টিতে তত মনোযোগী নন। ফলে যে-পরিমাণে দ্যুতি রয়েছে, সে-অনুপাতে অঙ্গ-সুষমা নেই। এজন্যেই নজরুল-কাব্যে ভাবে, ভাষায় ও আঙ্গিকে ক্রম-উৎকর্ষ বা ক্রমবিকাশ কিংবা ক্রমপরিণতি দুর্লক্ষ্য। প্রতিভাও যে পরিশীলন ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, নজরুল কাব্যই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বক্তব্য প্রকাশে অর্থাৎ মত প্রচারেও তিনি মন দিয়েছিলেন যতটুকু, ততটুকু মনন দেননি। ফলে তাঁর বক্তব্যের পেছনে কোনো তত্ত্ব, বিজ্ঞান বা দর্শনের পষ্ট ভিত্তি নেই। এ যুগে কবিমাত্রই কবি-দার্শনিক বা কবি-বিজ্ঞানী কিংবা কবি-তাত্ত্বিক। শাদা কথায় ; নীতি, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কীয় একটা বিজ্ঞানভিত্তিক বা দর্শনানুগ মতবাদ থাকে আজকালকার কবি-সাহিত্যিকের রচনার পটভূমিকায়। নজরুলেরও মত আছে, বক্তব্য আছে, কিন্তু তা পষ্ট করে কোনো সমাজবিজ্ঞানের বা রাষ্ট্রাদর্শের বা নীতি-দর্শনের ধারণা দেয় না। তিনি চেয়েছেন পীড়নমুক্ত সুস্থ ও স্বস্থ মনুষ্যসমাজ। সে-ই যে বলেছি, তাঁর বক্তব্যের পেছনে মনন ছিল না, কেবল ক্ষুব্ধ চিত্তের আবেগই ছিল ; তাই তিনি সুমুখে যাকেই পেয়েছেন তাকেই শত্রু বলে জেনেছেন এবং আক্রমণ করেছেন। তলিয়ে দেখেননি যে, পীড়ক-পীড়িত দুই-ই পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভর সমাজ ও রাষ্ট্রকলেরই by product। যন্ত্র আর যন্ত্রী বদল না হলে ধনীর ধনী না হয়ে উপায় নেই, নির্ধনেরও ধনাগমের পথ নেই। ঘুষ শুধু আমরা দিতে বাধ্য হইনে, নিতেও বাধ্য থাকি। আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। যন্ত্রের পরিবর্তন না হলে যন্ত্রজ পদার্থের রূপ-রস বদল হতেই পারে না। কাজেই যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে, তারা আসলে সংগ্রামের লক্ষ্য হবার যোগ্য নয়, এর নাম শ্রেণী-সংগ্রাম—ভাঙার গান। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধনা এ নয়—গড়ার কারিগরিও নয়। এ কারণেই লোকে বলে তাঁর কাব্যে ভাঙার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই। উদার সমাজ দর্শন বা সমাজবিজ্ঞান এতে নেই।

"বলেছি, নজরুল কাব্যে আঙ্গিকের প্রতি অবহেলা আছে, তবু উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা তথা আবেগ আন্তরিক হলে বাণীর আপনিতেই একটা ছন্দ গড়ে ওঠে—বক্তব্য হয় মর্মস্পর্শ, তাতে কাব্য-সুষমাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটে ওঠে, নজরুল কাব্যেও তাই রয়েছে। তাঁর কাব্যে সামগ্রিক সুষমা না থাক—দ্যুতি আছে, স্থানে স্থানে দীপ্তি আছে এবং তা হীরেমুক্তোর মতো উজ্জ্বল। বিদ্রোহী, সিন্ধু, দারিদ্র্য প্রভৃতি কবিতাই তার প্রমাণ। আবার এ উচ্ছ্বাস-প্রবণতার জন্যেই নজরুল সনেটও রচনা করতে পারেননি এবং তাঁর গদ্যও উচ্ছ্বাসের পঙ্কে মজেছে।

"একে তো নজরুল সম্বন্ধে অধিকাংশ পাঠকের আজো বিস্ময় ও উত্তেজনার ঘোর কাটেনি, তার উপর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নজরুল সম্বন্ধে আমাদের উচ্ছ্বাস দেখানোর গরজও অনুভূত হয়, ফলে তাঁর কাব্যের নিরপেক্ষ যাচাই-বাছাই আজো সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে কবি আজো বেঁচে আছেন এবং কালের হিসেবেও পুরোনো নন।

"কবির 'জিঞ্জির' কাব্যখানা ইসলামি কবিতার সংকলন বলে সাধারণ্যে প্রচারিত। আসলে এর Spirit তা নয়। কবি পরাধীন দেশের লোক ছিলেন, বিদেশী-বিজাতির শাসন-শোষণের প্রতি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। বলা যায়, তাঁর সংগ্রামের অন্যতম মুখ্য প্রতিপক্ষ বিদেশী শোষক। তাঁর ব্রতই ছিল এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাই আফ্রিকা-এশিয়ার পরাধীন ও উৎপীড়িত জাতি এবং দেশগুলো ছিল তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনার পাত্র। এদের জাগরণে কবি উল্লসিত হয়েছেন, অভিনন্দনে সে-উল্লাসের অকুণ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। এ হচ্ছে সমদুঃখী ও সমব্যথী আত্মীয়ের সাফল্যে উল্লাস— মুসলমান বলে নয়, পরাধীন ও উৎপীড়িত বলে। এরা যে মুসলমান তা আকস্মিক।

"নজরুল আসলে প্রেমিক, প্রতিকূল পরিবেশই তাঁকে সংগ্রামী ও মারমুখো করেছে। সে খবর তাঁর মুখেই শোনা যাক্ : 'যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি, তিনি যদি আমার সর্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে এই বিদ্বেষ জর্জরিত.... ভেদজ্ঞানে কলুষিত, অসুন্দর অসুরনিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব। এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দরসধারা থেকে বঞ্চিত; সেই আনন্দ, সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ্যমাত্র। সেই সাম্য, অভেদ শান্তি, আনন্দ, প্রেম আবার আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম প্রেমময়ের কাছ থেকে। .... বিশ্বাস করো, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসেনি— আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না ....।'

"এ কারণেই কবির বেদনা-করুণ কণ্ঠে শোনা গেল—'বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।' মানুষের বিরুদ্ধে—সমাজাদির বিরুদ্ধে কবির যে অভিযোগ, তা আজকের মানুষ আমাদেরও। তাই নজরুল, আমাদের হৃদয়রাজ্যের রাজা, নজরুল আমাদের প্রিয় সেনাপতি। নজরুল যেসব সমস্যা তুলে ধরেছিলেন, সেসবের সমাধান-পন্থা আজো আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তাই নজরুলের কাব্যে আমাদের মনের কথা—প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এসব কারণেই নজরুল-কাব্য আমাদের প্রিয় ও পাঠ্য এবং আমাদের প্রেরণার উৎস। চিত্ত-বিক্ষোভের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশান্তের যে দাহ-শান্ত ভাব—তাও হয়তো তাঁর কাব্য থেকে পাই।"

বিবৃত কথাগুলো আমার বন্ধুরই উক্তি। এগুলোর সঙ্গে আমার মনের বা মতের মিল আছে মনে না-করাই বাঞ্ছনীয়। এও বলে রাখছি, তাঁর কোনো কথাই আমি বানিয়ে-বাড়িয়ে বা কমিয়ে-লুকিয়ে বলিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-কাব্যে প্রেম

নজরুল ইসলাম ব্যবহারিক জীবন-সমস্যার কবি। সেজন্যেই তাঁর কাব্যে সমস্যানিরপেক্ষ রসসর্বস্বতা বিরল। মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে রাষ্ট্রিক পেষণ ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে সহজ মনুষ্যত্বের আলোকে সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ করে তোলাই ছিল নজরুলের সাধনা। এজন্যেই তাঁর কাব্যে আমরা উচ্চ দার্শনিকতার সাক্ষাৎ পাইনে। তিনি আদর্শ ও নীতি প্রচার করেছেন, কোথাও তত্ত্ব প্রচার করেননি। তাই তিনি বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবী কবি, জনস্বার্থের কবি, মানুষের কবি, মানবতার কবি। কিন্তু দার্শনিক বা মরমী কবি নন। মানুষের আন্তর্জীবনের রহস্যঘন মূর্তি তিনি অঙ্কিত করেননি, বহির্জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অভাব-অভিযোগের কাহিনী তাঁর কাব্যের উপজীব্য "যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।"—এ-ই ছিল কবির ব্রত বা সাধনার আদর্শ। তিনি বহির্জীবনকে নির্বিঘ্ন করতে চেয়েছেন, অন্তর্জীবনকে নির্দ্বন্দ্ব করার সাধনা তাঁর নয়। তবে আশা ছিল—গ্লানিমুক্ত ব্যবহারিক-জীবন অন্তর্বৃত্তিগুলোকে বিকশিত ও সুষমামণ্ডিত করে তুলবে, বহির্জীবনের আনন্দ অন্তর্বৃক্ষের মূলে রস যোগাবে—কাণ্ডে ফোটাবে ফুল; দেহকে করবে পুষ্ট, আত্মাকে করবে মহিমান্বিত।

তবু এই বিপ্লব, বেদনা এবং শক্তির কবির হৃদয় নারীপ্রেম বর্জিত ছিল না। যে স্পর্শ-চঞ্চলতা ও ভাবালুতা তাঁকে বিপ্লবী করেছিল, সে-প্রাণময়তাই তাঁকে প্রণয় ব্যাপারেও উচ্ছ্বাসী এবং হৃদয়ধর্মী করে রেখেছিল। নজরুলের প্রেমের কবিতার সংখ্যা কম নয়, প্রণয়-গীতিও বহু। বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ অত গান লেখেন নি। নজরুলের গানের অধিকাংশই প্রেম-সংগীত।

নজরুল বিপ্লবের কবি, প্রাণপ্রাচুর্যের কবি, জীবনবাদের কবি! এদিক দিয়ে তাঁর পৌরুষ-ব্যঞ্জনা ও দৃঢ়তার সীমা নেই। কিন্তু প্রণয়-ব্যাপারে কবি শিশুর মতো অসহায়, শিশুর ন্যায় অশ্রুর আবেদন ছাড়া তাঁর আর গতি নেই। যে-কবি শক্তির পূজারী, মনোবলের উদ্‌গাতা, আপনার সীমাহীন শক্তির উত্তেজনায় যিনি সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়াসী: সে-কবির প্রণয়-রাজ্যে অসহায়তা ও রিক্ততার সকরুণ হাহাকার পরমাশ্চর্যের বিষয় বই কি! এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের কারণ খুঁজলে বোঝা যাবে—কবির হৃদয় উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও কোমল। ব্যবহারিক জীবন-ব্যাপারে যে-উত্তেজনা রক্ত ঝরাতে প্রবুদ্ধ করে, সেই উত্তেজনাই প্রণয় ব্যাপারে ব্যর্থতার কান্না ও হাহাকার এনে দেয়। একই হৃদয় বৃত্তির দুটো দিক : উচ্ছ্বাস-উত্তেজনায় ঝাঁপিয়ে পড়া আর কেঁদে লুটানো—আগুন জ্বালানো আর অশ্রু-ঝরানো। এজন্যেই আমরা তাঁকে একান্তভাবেই হৃদয়ধর্মী বলেছি। বুদ্ধিজীবী তিনি নন। তাই তাঁর সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রবিষয়ক বিপ্লবাত্মক রচনায় হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাসময় বিকাশ ও প্রকাশ দেখতে পাই, বুদ্ধিমত্তা ও মনীষার দীপ্তির সাক্ষাৎ পাইনে। হৃদয়-উদ্ভুত সত্যনিষ্ঠাই এসব রচনার প্রাণ। তাই বিপ্লবী কবির রচনায় 'ভাঙ্গার গান' আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই।

নজরুল ইসলামের প্রণয়-কাব্যেও উঁচু দার্শনিকতা নেই। শেলী, ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি অতীন্দ্রিয় প্রেমরাজ্যে বিহার প্রয়াসী নন। একান্তভাবে শরীর-নিষ্ঠ ভালোবাসার সাধক তিনি। এ কায়ার সাধনায় 'ছায়া' যদি কোথাও 'মায়া' পেতে থাকে, তবে তা আকস্মিক—সচেতন প্রয়াস নয়। যেমন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তব হরষ...

অনুভব করেছেন, এবং— কথা কও কথা কও প্রিয়া
হে আমার যুগে যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া
[অনামিকা]

এ শরীরনিষ্ঠ প্রণয়-কথা বলবার সাহসও কম প্রশংসনীয় নয়। কবি মোহিতলালও শারীর প্রেমের কবি। সে-প্রেম অবশ্য আত্মাকে বাদ দিয়ে নয়। দেহভিত্তিক প্রেমের মানসোপভোগই মোহিতলালের কাব্যাদর্শ। যদিও মোহিতলাল শরীরনিষ্ঠ প্রণয়-পূজারী, তবু নজরুলের মতো এমন উচ্ছ্বাস ও প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ তাঁর পক্ষে সর্বত্র সম্ভব হয়নি। ইতোপূর্বে কবি গোবিন্দ দাসের একটি কবিতায় দেহনিষ্ঠার নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ দেখেছি—

আয় বালিকা খেলবি যদি এ এক নতুন খেলা,
চুপ চুপ চুপ ক'সনে কারো এ এক নতুন খেলা।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে 'বিবসনা', 'স্তন', 'দেহের মিলন', প্রভৃতি কবিতা রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এসব কবিতা অতীন্দ্রিয় প্রণয়-রাজ্যের সোপানস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেননা তিনি এতে তৃপ্তি খুঁজে পাননি। সুতরাং নজরুল ইসলামই দেহনিষ্ঠ মানবীয় ভালোবাসার প্রধান সপ্রতিভ স্তুতিকার। মানুষের দেহ, মন, প্রাণ, কর্ম সবকিছু যে-দেশে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত; অধ্যাত্মপ্রেম ছাড়া যে-দেশে অন্য প্রেমের কোনো স্বীকৃতি নেই, সে-দেশে সে-সমাজে এমনি প্রণয়সাধনা কম দুঃসাহসের কথা নয়। তাঁর সমসময়ে আমরা মোহিতলালকে এবং তারপরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পাচ্ছি। কামাক্ষীপ্রসাদ ও আরো অনেকের কবিতায় এসব বস্তুনিষ্ঠা অনুকৃত হয়েছে।

কিন্তু তাঁর শরীরনিষ্ঠ সাধনায় অসংযম বা অশ্লীলতা নেই, ক্লেদ-পঙ্কিল বীভৎসতা কোথাও প্রকট হয়ে উঠেনি। এ দেহসর্বস্ব প্রণয়েও পবিত্রতা এবং সুষমা কোথাও অস্বীকৃত হয়নি। তাঁর 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট' 'পূবের হাওয়া' ও 'বুলবুলের' কবিতা ও গানগুলোতে এবং আরো অনেক গানে আমাদের উক্তির সমর্থন মিলবে। নজরুল শারীর- প্রেমের সাধক হলেও আত্মার অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করেননি। এজন্যেই উদ্বেল ভাবাবেগে কবি এখানে-সেখানে শরীরের সঙ্গে আত্মাকে এবং আত্মার সঙ্গে দেহকে টেনে এনেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট হয়েছে ; অসামঞ্জস্য এবং অসংগতিও দুর্লভ নয়।

নজরুলের প্রণয়-সাধনা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রণয়তৃষ্ণারও গভীরতা এবং বিপুলতা নেই। তবু সর্বত্র ব্যর্থতার মর্মভেদী হাহাকার ও গাঢ় বেদনার মূর্ছনা প্রকট হয়ে উঠেছে। যে-কবির হৃদয় অগ্নিগর্ভ, বাণী অগ্নিক্ষরা এবং যাঁকে বলদৃপ্ত, দৃঢ়চিত্ত, দাম্ভিক ও সীমাহীন ব্যক্তিত্বশীল বলে মনে হত, তিনিই নারীর করুণার ভিখিরি হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মতো কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। অশ্রুর আবেদন ছাড়া দ্বিতীয় সম্বল নেই, দ্বিতীয় অস্ত্র নেই তাঁর নারীর হৃদয় জয়ার্থ প্রয়োগ করবার জন্যে। এতে বোঝা যায়, কবি যা ই বলুন না কেন, আসলে তাঁর হৃদয় বড় দুর্বল, বড় কোমল :

আমার দুচোখ 'পরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়,
বুকে বাজে হাহাকার করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় 'খালি সব খালি'
ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখিলের করুণার যা, কিছু তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখে।

(বেলা শেষে)

অথবা— কান্নাহাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা,
আজকে বড় শ্রান্ত আমি আশার আশায় মিথ্যা ঘুরে।

(উপেক্ষিত)

'বিদ্রোহী'-র কবির ভেতরকার স্বরূপ :

খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা—
আর সহেনা মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলা ফেলা।

অথবা— চাই যারে মা তায় দেখিনে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা
বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়
ছিন্ন আশা নেতিয়ে পড়ে ওমা এসে দাও বরাভয়।

হৃদয়-জগতে অহঙ্কার থাকলে আর যাই হোক প্রণয়ে সিদ্ধি নেই। তাই কবির অহঙ্কারের এমন ধূল্যবলুণ্ঠিত অবস্থা—এমন লাঞ্ছনা। আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনের দ্বারাই প্রণয়ে সাফল্য সম্ভব। পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারাই প্রণয়ের মূল্য দিতে হয়।

নজরুলের প্রণয়-সাধনা একটানা ব্যর্থতার ইতিহাস, তবু এখানে-সেখানে এক আধটু আশার আলো যে নেই, তা নয়। তবে যে-সুর তাঁর কাব্যে প্রবল তা' হতাশার—ব্যর্থতার—নৈরাশ্যের ও বেদনার সুর, সে সুরে ক্ষোভও কম নয়।

বায়ু শুধু ফোটায় কালিকা
অলি এসে হরে নেয় ফুল

এই ব্যর্থতাও—স্মৃতি সুখময় হয়ে হৃদয় ভরে রইল। কারণ—

না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে
তুমি শুধু তুমি
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে
তব প্রিয় নাম চুমি।

শুধু তাই নয়, কবির উপলব্ধির জগৎও প্রশস্ততর হয়েছে। প্রেয়সীকে পাওয়া নাই-বা গেল, কিন্তু প্রণয়ানুভূতি তো চিরন্তন হয়ে রইল, তাই-বা কী কম লাভ?

মরিয়াছে অশান্ত অতৃপ্ত চির স্বার্থপর লোভী
অমর হইয়া আছে, রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি।—(পূজারিণী)

এবং— যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলোার মাঝে উঠব বেঁচে সেইতো আমার প্রাণ
নাইবা পেলাম চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান।

(গোপন প্রিয়া)

কারণ,—'প্রেম সত্য-চিরন্তন। প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়। জন্ম যার কামনার বীজে।' (অনামিকা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের 'পূজারিণী' কবিতাটিকে তাঁর প্রণয়-দর্শনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছি। কেননা এ কবিতায় তাঁর প্রণয়াদর্শের স্বরূপ পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এখানে প্রেমের আদি, মধ্য ও পরিণতির একটা স্পষ্টরূপ ধরা দিয়েছে। দেহ-কামনা এবং কাম-বিরহিত প্রণয়ানুভূতির সুন্দর সুষ্ঠু প্রকাশ এমনি করে আর কোনো কবিতায় বা গানে দেখা যায়নি। 'পূজারিণী' কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু এ কবিতাটিও কবিকে অমরতা দান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'সমর্পণ' 'পুবের চাতক' 'চপল সাথী' 'কবি-বাণী', 'অভিশাপ', 'অবেলার ডাক' প্রভৃতি কবিতাও স্মরণীয়। 'অনামিকায়' কবি পরমের সঙ্গে অনন্ত প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটি এর সঙ্গে স্মরণীয় :

প্রেম সত্য প্রেম-পাত্র বহু অগণন;
তাই চাই বুকে পাই, তবু কেঁদে উঠে মন,
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়,
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও, সেই নেশা হয়।
চির-সহচরি
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।...
প্রতিরূপে অপরূপা ডাক তুমি
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো সে-ই তুমি
ধরা দেবে তায়,
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম
সে সরাব লোহু।'

—(অনামিকা)

এরূপ অনুভূতি আরো কয়েকটা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'চিরজনমের প্রিয়া' 'জন্মে জন্মে' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হেঁয়ালির মতো ঠেকে। কারণ শারীর-প্রেমের কবির, বিশেষত মুসলিম কবির পক্ষে এসব শব্দের প্রয়োগ অবান্তর ও নিরর্থক। এসব শব্দের ব্যঞ্জনা অর্থবিভ্রান্তি ঘটায় মাত্র।

মোহিতলালের 'মানস-লক্ষ্মী,' শাহাদত হোসেনের 'উপেক্ষিত', গোলাম মোস্তফার 'পাষাণী', আবদুল কাদিরের 'লাবণ্যলতা', খান মঈনুদ্দিনের 'রহস্যময়ী' আর নজরুল ইসলামের 'পূজারিণী' ও 'অনামিকা' প্রায় একই জাতীয় কবিতা। উপরোক্ত কবিতাগুলোতে কবিগণের স্ব স্ব প্রণয়াদর্শ অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

নজরুলের 'হবের হাওয়া' গ্রন্থের গানে-কবিতায় কবিমনের 'প্রেমবৈচিত্র্য' প্রকাশ পায়নি, পেয়েছে হালকা ও অনির্দেশ্য বিরহ-বিলাস। এজন্যে কবিচিত্তে যেমন, পাঠক-চিত্তেও তেমনি এসব গান ও কবিতা বিশেষ দোলা জাগায় না। নজরুলের ব্যক্তিজীবনে যেমন একধরনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অস্বস্তি ও অতৃপ্তি ছিল ; তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও ছিল তেমনি একপ্রকারের ক্ষোভ, তৃষ্ণা, অতৃপ্তি ও বেদনাবোধ। প্রথম জীবনের বাউণ্ডেলের আত্মকথা, রিক্তের বেদন থেকে তাঁর শেষ রচনায় অবধি তা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত। কোনো পাওয়াতেই যেন তাঁর মন ওঠে না। না-পাওয়ার ক্ষোভ আর পেয়ে হারানোর বেদনাই যেন তাঁর জীবনব্যাপী একটা আর্তনাদ—একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাহাকার রূপে অবয়ব নিয়েছে। তাই নজরুল বেদনা-বিক্ষুব্ধ ঔপন্যাসিক, বিপ্লবী সংগ্রামী কবি এবং প্রত্যাখ্যান-বিক্ষুব্ধ ও বিরহী প্রেমিক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, নজরুল সংগ্রামে যেমন 'বজ্রাদপি কঠোরানি' প্রণয়ে তেমনি 'কোমলানি কুসুমাদপি'। তাঁর জীবনের স্বরূপ, তাঁর অন্তর ও কবি-জীবনের পরিচয়, তাঁর সাধনা ও জীবনোপভোগের পদ্ধতি, তাঁর অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের দিগদর্শন একটিমাত্র কথায় যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

মম এত হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণতূর্য।

এর চেয়ে যথার্থ আত্মপরিচয়, এর চেয়ে বেশি আত্মোপলব্ধি কবির আর কোথাও দেখা যায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলামের ধর্ম

নজরুল ইসলাম দার্শনিক ছিলেন না। বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞানির্ভরও তিনি নন। একান্তভাবে হৃদয়ধর্মী কবি নজরুলের মধ্যে আমরা যে-শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ দেখতে পাই তা নিতান্ত স্পর্শ-চঞ্চলতা ও অনুভূতিপ্রবণতার দুর্বার গতিজাত। এজন্যেই তাঁর কাব্যে সমাজ ও রাষ্ট্রসচেনতার স্পষ্ট ও ঋজু মূর্তি প্রকাশ পায়নি, ভাঙার গানই তিনি গেয়ে গেলেন, জোড়ার কাজে হাত দিতে পারেননি। তাঁর মধ্যে সুন্দর সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিকল্পনা ছিল না। শুধু সমস্যাই তিনি দেখেছেন, সমস্যার সমাধানও তিনি চেয়েছেন আন্তরিকভাবে, কিন্তু পথের সন্ধান তিনি বাতলিয়ে দেননি। রক্তঝরানোই কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছেন : 'রক্তঝরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্তরলখা।' কারণ 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস' তাদের উৎসাদনই হচ্ছে আশু কর্তব্য। সেইজন্যেই কবির অভিলাষ 'যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ'। তিনি চেয়েছেন মানুষ নির্বিশেষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও কুসংস্কার মুক্তি। এই মুক্তিকামনার উৎস সমাজবোধ নয়, হৃদয়বৃত্তিজাত সহানুভূতি। তাই তাঁর আবেদনে অকৃত্রিম আবেগ আছে, ঐকান্তিক সাধনার নিদর্শন নেই—যে সাধনা গড়ে তুলতে পারত সুন্দর নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন সমাজ, দিয়ে যেতে পারত মহৎ ও বৃহৎ কোনো অবদান। তাঁর মধ্যে প্রচুর আবেগ, সীমাহীন উত্তেজনা রয়েছে। উত্তেজনা সবসময় ক্ষণস্থায়ী এবং মহৎ ও বৃহৎ কর্মের পরিপন্থী। ফলে বিদ্রোহ সার্থকতার পথ খুঁজে পেল না, বিপ্লব পেল না সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন। উত্তেজনায় সংযমের স্বাস্থ্য থাকে না, থাকে না সুপরিকল্পিত কর্মের প্রেরণা। তাই তিনি উত্তেজনা ও প্রাণপ্রাচুর্য বশে তারুণ্যের, যৌবনের, জীবনের, সুন্দরের বন্দনা করে গেলেও তাদের স্বরূপ চিহ্নিত করে দিতে পারেন নি।

যা পারেন নি, যা দেন নি তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন, তার মূল্যও অপরিসীম। তিনি সত্তা-অচেতন জড় জাতির জীবনে নতুন করে প্রাণ-স্পন্দন দিয়েছিলেন। দারিদ্র-দাসত্ব-অশিক্ষা-শোষণ জর্জরিত স্বদেশবাসীর জন্যে তাঁর আকুলতার সীমা ছিল না, ক্ষোভের ছিল না অন্ত। এই ক্ষোভ ও আকুলতাই তাঁকে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী করেছিল। সমাজে-রাষ্ট্রে-ধর্মে—যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন সেখানেই রুখে দাঁড়িয়েছেন, নির্মমভাবে করেছেন আঘাত, নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন তাঁর উপলব্ধ সত্যকে, নির্ভীকচিত্তে করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি নিজেই বলেছেন— "যা অন্যায় বলে বুঝেছি অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কারও তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কারো পিছনে পোঁ ধরি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।" (জবানবন্দী)।

নির্যাতিত স্বদেশী লোকের দুঃখবেদনায় সমবেদনা জানাতে গিয়ে কবি বিশ্বের দুর্গত জনসাধারণের হয়ে অন্যায়-অত্যাচরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তি-চেতনা জাগানো এবং ব্যক্তি-সত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর সাধনা। স্ব স্ব মর্যাদায় অধিকারে ও বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানুষ তৈরি করবে মিলন-ময়দান-'যে ময়দানে সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই।' নির্যাতিত মুমূর্ষু মানুষকে আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস দানই ছিল তাঁর ব্রত। 'এ ক্রন্দন কী আমার একার? না এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণার চিৎকার। (জবানবন্দী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা—“বীর কারুর অধীন নয়, ভিতরে বাইরে সে কারুর দাস নয়—সম্পূর্ণ উদার মুক্ত। পরকে ভক্তি করে, বিশ্বাস করে শিক্ষা হয় পরাবলম্বন—আর পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব।... বল 'কারুর অধীনতা মানিনা—স্বদেশীরও না বিদেশীরও না'।” (দুর্দিনের যাত্রী)।

নজরুলের কাব্য-সাধনা ছিল একান্তভাবে মানবনিষ্ঠ। নজরুলের ধর্মও ছিল তাই মানবনিষ্ঠা। তিনি বিশ্বাস করতেন 'মানুষকে প্রেম করাই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ এবাদত। এ প্রেমে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা দেখতে পাই বিবেক, সত্য ও মানবতাকে তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিবেকের নির্দেশ মেনে চলেন। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে ঘোষণা করেছেন জেহাদ। মানুষ নির্বিশেষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রেমই তাঁকে ধর্মের গোঁড়ামি, আভিজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করেছে :

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাহি কিছু মহীয়ান,
নাই দেশকাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি;
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

অথবা—

দোকানে কেন এ দর কষাকষি? পথে ফুটে তাজা ফুল
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

নজরুল ইসলাম কোনো বিশেষ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন বলা চলে না। তিনি দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান উদারতায় ভালোবাসতে পেরেছেন। বিবেক-বিধৃত সত্যের উপরে সত্য নেই, এ-ই তাঁর বিশ্বাস—

“শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য-সিন্ধুজলে”
“ওরে বেকুব, ওরে জড়, শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়।”
“এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।”

বলেছি, নজরুল ইসলামকে কোনো বিশেষ ধর্মের অনুরাগী বলা চলে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। তার কারণ, কবির জীবনের যা ব্রত তা ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে এমন স্পষ্ট করে বলেনি। কবি বলেন :

'চির উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নতশির
ওই শিখর হিমাদ্রির।

কোরআন বলে—'আনতুমা খয়ারে উম্মাতীন।' 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো শক্তির কাছে মানুষের শির অবনমিত হবে না।' মানুষ 'আশরাফুল মখলুকাত'।

কবি বলেন— 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো কাবা-মন্দির নাই।'
ইসলাম বলে : মানুষের হৃদয় কাবা স্বরূপ।
কবি বলেন— মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নাই কিছু মহীয়ান
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।
ইসলাম বলে— মানুষ সব এক আদমের সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই
কবি বলেন— 'তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।'
অথবা, 'ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হল।'

ইসলাম বলে— 'যে-দুঃখ, যে-বেদনা, যে-লাঞ্ছনা তুমি নিজের জন্যে কামনা করতে পারো না, তা তোমার ভাইয়ের জন্যে কামনা করো না! প্রতিবেশীকে উপবাসী রেখে নিজে ক্ষুধার অন্ন গ্রহণ করো না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি বলেন—'সবদেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

ইসলাম বলে—'মানুষকে ভালোবাসাই আল্লার শ্রেষ্ঠ এবাদত।'

কবি চেয়েছেন—মানুষের ব্যক্তি-মর্যাদার সাম্য, বিত্ত-বৃত্তি নিরপেক্ষ ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি; শোষণ, অত্যাচার ও আভিজাত্যবোধের উৎসাদন।

ইসলামের শিক্ষাও হচ্ছে :
নাই ছোট বড়—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জলে কারো ঘরে কী রে জ্বলিবে দীপ
দুজনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসীব?
এ-নহে বিধান ইসলামের॥

ইসলামের এ শিক্ষাই কবিকে মুগ্ধ করেছে। এজন্যেই কবি ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছেন। ইসলামের মানবতা ও সমাজ সংজ্ঞা তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ অনুকূল বলেই মানুষ নির্বিশেষের মিলন-পীঠ কাবার ছবি তাঁর বক্ষে অঙ্কিত ; মানবতা ও সাম্যের বাণী-বাহক হজরত মুহাম্মদের নাম তাঁর 'জপমালা'; এইজন্যেই মর্যাদার পূজারী উন্নতশির কবির হৃদয় কলেমা 'লাইলাহা ইলল্লাহু মুহম্মদ রসুলাল্লাহ' আন্দোলন জাগায়। তাঁর এই ইসলামপ্রীতি ধার্মিকতাপ্রসূত নয়—মানবতা ও ব্যক্তি নিষ্ঠাজাত। ধর্মপ্রাণতা নয়— আদর্শানুগত্য। তাঁর আদর্শের সাধনার অনুকূল উপাদান তিনি যেখানেই পেয়েছেন, গ্রহণ করেছেন। তাই হিন্দুর দেবদেবী, পুরাণ প্রভৃতিও তাঁর কাব্যসাধনায় ও আদর্শানুসরণে প্রেরণা দিয়েছে, আশা জাগিয়েছে, ভাষা যুগিয়েছে। খলিফা ওমর, তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন শুধু ধার্মিক বলে নয়, ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যবিধাতা বলেও নন, মানুষকে ভালোবেসেছেন বলে :

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু
বলিয়াছ ভাই—তাই
তোমারে এখন চোখের পানিতে
স্মরি গো সর্বদাই।

এইরূপে 'আমপারা', 'মোহররম', 'ফাতেহা-দোয়াজদহম' 'মরুভাস্কর' প্রভৃতি রচনায় কবি ইসলামের ও হজরতের জীবনের মানবতার দিকটি উদঘাটিত করেছেন। ইসলাম ও রসুলের জীবনের এই সৌন্দর্য ও শিক্ষায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন। নিজের জীবনে ও সমাজে এই শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণেই তাঁর সাধনা নিয়োজিত ছিল।

অতএব নজরুলের ধর্মবোধ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি জাগায় না। এ ধর্ম কল্যাণ ও মিলনকামী। এ ধর্ম মোক্ষের সহায় নয়—জীবনের অবলম্বন—ঋজুপথের দিশারী ও স্বস্থ জীবনের পাথেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন শাহ্

সাধক কবি লালন শাহ্র কথা বলতে হলে একটু ভূমিকা দরকার। মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন প্রশ্ন রয়েছে, তারই মনোরম জবাব খোঁজার প্রয়াস আছে আমাদের তত্ত্ব -সাহিত্যে। বাউল গান আমাদের তত্ত্ব-সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলিম প্রভাবে তথা সুফীমতের প্রত্যক্ষ সংযোগে বাউলমতের উদ্ভব হলেও, এর মূল রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আদিকাল থেকেই যে-কোনো ধর্মে দৈহিক শুচিতাকে মানস-শুচিতার সহায়ক বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্যে উপাসনাকালে দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যক হয়। মনে হয়, এ বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। যোগে, সাংখ্যে, বৌদ্ধদর্শনে ও সুফীসাধনতত্ত্বে দেহকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে। দেহের আধারে যে-চৈতন্য, সেই তো আত্মা। এ নিরূপ নিরাকার আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা শরীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে : দেহযন্ত্র নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহযন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবেই সাধন-তত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অসামান্য। তাই এদেশে অধ্যাত্মসাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। যোগ-সাধন পাক-ভারতের আদিম অনার্যশাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা দেখা যায়। বাঙলায় পাল আমলের তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখাই মধ্যযুগে সুফীপ্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতরূপে প্রসার লাভ করে। এভাবে চর্য্যাপদের পরিণতি ঘটে বাউল গানে ও সহজিয়া পদে।

মুসলিম বিজয়ের পরে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথম দক্ষিণ ভারতে, পরে উত্তর ভারতে এবং সর্বশেষে বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নের বাহ্যরূপ—ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রয়াস। হিন্দু মায়াবাদ তজ্জাত ভক্তিবাদ ও ইসলামের সুফীতত্ত্বই এসব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। উত্তর ভারতের 'সন্তধর্ম, দক্ষিণভারতের 'ভক্তিধর্ম' আর বাঙলার বৈষ্ণব ও বাউলমতবাদ সুফীমতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। সেদিন নির্যাতিত নিম্নশ্রেণীর মনে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী যে আবেগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল, তারই ফলে মন্দির ছেড়ে মসজিদের পথে না গিয়ে উদার আকাশের তলে স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতাবার এ নতুনতর প্রয়াস মাত্র। জীবনের যে-চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা; উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাত, ধর্ম ও সমাজচেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। তখন মনে হয়, যদিও 'হিন্দু ধাবই দেহরা মুসলমান মসীত।' কিন্তু সেখানে আল্লাহ নেই। তাঁদের মতে এই বিপথগামীদের আল্লাহ বলছেন—

'মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মৈঁ তো তেরে পাসমে।
না মৈঁ দেবল, না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ।

জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপন আত্মার পরিশুদ্ধিই খোদা-প্রাপ্তির উপায়। তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই এঁদের প্রাথমিক ব্রত। এঁদের আদর্শ হচ্ছে 'Knoweth thyself', আত্মাং বিদ্ধি—নিজেকে চেনো। হাদিসের কথায় 'মান্আরাফা নাফ্সাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।'—যে নিজেকে চিনেছে, সে—আল্লাহ্কে চিনেছে।' জীবনের পরম ও চরম সাধনা সে-খোদাকে চেনা। বাউলের রূপক অভিব্যক্তিতে সে-পরমাত্মা হচ্ছেন—মনের মানুষ, অচিন পাখি, মানুষরতন, মন্মনুরা ও অলখ সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী) প্রভৃতি। বাউল রচনা সাধারণত রূপকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবরণে আচ্ছাদিত। সে-রূপক দেহাধার, বাহ্যবস্তু ও ব্যবহারিক জীবনের নানা কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে গৃহীত।

মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয়পাদ থেকেই বাউল-মতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিধি ও আউলচাঁদই এ মতের প্রবর্তক বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। মাধববিধির শিষ্য নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রই বাউল-মত জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।

লালনের সঠিক জীবনকথা আজো জানা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে রূপকথার মতো নানা কাহিনী চালু আছে। লালন সম্বন্ধে সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য যে তথ্য পাওয়া যায়, তা এই : লালন হিন্দুসন্ততি। অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন। ফেরার পথে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে পথে ফেলে বাড়ি চলে যায় এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দেয়। সিরাজ ফকির নামের এক নিঃসন্তান গরিব লকিবাহক তাঁকে পথ থেকে তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। স্বামী-স্ত্রীর সেবাযত্নে লালন প্রাণে বাঁচলেন। কিন্তু একটি চোখ হারালেন। লালন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু মুসলমানের অন্ন খেয়েছেন বলে ঘরে উঠতে পারলেন না, তাঁর স্ত্রীও জাতিচ্যুত স্বামীর অনুগামী হতে অস্বীকার করলেন। এতে লালনের বিক্ষুব্ধচিত্তে বৈরাগ্য দেখা দেয়। তিনি আশ্রয়দাতা সাধক সিরাজের কাছে ফিরে আসেন ও তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন। ১৮২৩ সালের দিকে লালন নানা তীর্থ পর্যটনের পর কুষ্টিয়ার গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া গাঁয়ের জোলাজাতীয়া মুসলিম-স্ত্রী গ্রহণ করে এখানেই বাস করতে থাকেন।

কুমারখালির কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে লালনের পৈত্রিক নিবাস ছিল। আর সিরাজ সাঁইয়ের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে(?) দীর্ঘজীবী লালনের জন্ম এবং ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবারে(?) তাঁর মৃত্যু হয় বলেই অধিকাংশ পণ্ডিতের মত। লালন কায়স্থ সন্তান ছিলেন। কেউ বলেন তাঁর কুল-বাচি ছিল 'কর', আবার কারুর মতে 'দাস'। সেঁউড়িয়ায়ই লালন দেহত্যাগ করেন। এখানে তাঁর মাজার আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত দুদ্দুশা রচিত 'লালন চরিত'-এর অকৃত্রিমতা নানা কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি সাম্য ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি রুমী, জামী ও হাফেজের সগোত্র এবং কবীর, দাদু ও রজবের উত্তরসাধক। লালন কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। তাঁর গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়—বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর। আমাদের উনিশ শতকী পাশ্চাত্যমুখিতার জন্যেই তাঁর যথাযোগ্য আদর-কদর হয়নি। তবু আড়াই লক্ষ বাউলের তিনি গুরু—জীবনপথের দিশারী।

লালন বলেন— এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন।
ডুবে দেখ দেখি মন তারে; কিরূপ লীলাময়
যাঁরে আকাশ পাতাল খোঁজ এই দেহে তিনি রয়।

অথবা, দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ।
ডাকলে কথা কয়
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।

রবীন্দ্রনাথও বলেন—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা, আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা
কিংবা, আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
রুমীও বলেন—I gazed into my own heart
There I saw Him, He was nowhere else.
'আনল হক' ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায় লালনের মুখে—
আপন সুরতে আদম গড়লেন দয়াময়
নইলে কী আর ফেরেস্তারে সেজ্দা দিতে কয়।...
লালন বলে আদ্য ধরম আদম চিন্‌লে হয়।
এবং— আত্মা আর পরমাত্মা ভিন্ন ভেদ জেনো না।
আসল কথা—
আপনার আপনি যদি চেনা যায়
তবে তার চিন্‌তে পারি সেই পরিচয়।
কেননা, যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমন বাজায় বাজে তেমন
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।
জাত-বিচার সম্বন্ধে লালন প্রশ্ন করেন—
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী-লোকের কী হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কী ধরে?
দেহাত্মবাদী লালন বলেন :
উপাসনা নাইগো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এ-দেহে তার সব মিলে।
কাজেই— ক্ষ্যাপা, তুই না-জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়।
আপন ঘর না-বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।
আমি যেরূপ, দেখ না সেরূপ দীন দয়াময়।

পরমাত্মা এ আত্মারই দোসর। কাছে থাকে, দেখা দেয় না, ধরা যায় না, এ জ্বালা কী হৃদয়ে সয়! তাই ক্ষোভ, তাই বেদনা :

আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জনম ভর একবার দেখলাম নারে।
কথা কয়রে দেখা দেয় না
নড়ে-চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলে না
তাই— আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক পড়শী বসত করে।
তার কারণ— জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায় আলেকে বসে।

লালণের কণ্ঠে মানব মনের চিরন্তন কামনা ধ্বনিত হয়েছে :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

কিংবা— কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।

লালনের ও বাউল গানের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় বাউল প্রভাবও কম নয়। তাঁর ভাষাতেই আলোচনা শেষ করছি : (বাউল গান) থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়।... এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে।—এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।

লালনের গান আমাদের মূল্যবান সাহিত্য ও মানস-সম্পদ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল সাহিত্য

ইদানীং বাউল মত ও গান আমাদের চেতনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, নানা কারণে এসব আমাদের ভাবিয়েও তুলেছে। সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় বিপুল সংখ্যক গান সংগৃহীত হয়েছে। সাড়ে তিনশ বছর ধরে দেশের জনসমাজের এক অংশ এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে যে জীবনচর্যার এ বিপুল আয়োজনে এতদূর এগিয়ে গেছে, সে-সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম না। লোকচক্ষুর অন্তরালে লোকান্তরে প্রসারিত জীবনবোধের পরিচয়বাহী এই কাকলিকুঞ্জে প্রবেশ করে, এই সুরসমুদ্রে অবগাহন করে বিস্ময় মানি। বাউলের অনুচ্চ কণ্ঠের লীলায়িত ভঙ্গিমার সুরপ্রবাহে মন ভাসিয়ে দিলে দূরলোকের উদাস-করা যে ধ্বনি চিত্তবীণায় ঝঙ্কার তোলে তা' মন ও আত্মার গ্লানি মুছে দিয়ে অভিভূতির এক শান্ত-আবহ আনে। এক আনন্দ-সুন্দর জীবন-কল্পনায় চিত্তের ক্লিন্নতা ঘুচে যায়। মাটির মমতাকে তুচ্ছ জেনে উৎকণ্ঠ মন-বলাকা পাখা মেলে নতুন-পাওয়া দিগন্তহীন গগন পানে। বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে ভাবছি,—এ নিয়ে আমরা কী করব! ভোগের পঙ্কে মজেও যখন মনে করছি অমৃতস্নান হচ্ছে, তখন আবেকওসরের উপযোগ-বুদ্ধি নিশ্চিতই হারিয়েছি।

দেশের প্রাকৃতজন যখন ফলপ্রসূ চাষে নিরত, তখন শিক্ষিতগণ নিষ্ফল উদ্যান রচনায় ব্যস্ত। মহৎ জীবনের যে-বীজ প্রাকৃত মনে উপ্ত ও পল্লবিত, এমনকি ফলন্তও, তখনো বিরূপ শিক্ষিত মন বিজ্ঞানবুদ্ধির জপবারি সিঞ্চনে চিত্তমরু শীতল করবার ব্যর্থ সাধনায় রত।

বাউলমত যদি আদিকালের ইতিকথা হত তাহলে পরিহারযোগ্য ঐতিহ্য বলে মনে করতাম। কিন্তু আজকের মানুষের এক অংশের জীবন- দর্শনের প্রতি এমনি উদাসীন থাকা দায়িত্ববোধের অভাবই জ্ঞাপন করবে। Materialism ও Spiritualism-এর দ্বন্দ্বে যখন দুনিয়ার মানুষের মন অস্থির ও অসুস্থ, যখন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, যখন পৃথিবীর কল্যাণকামী চিত্ত অবক্ষয়ের নিরূপ যন্ত্রণায় কাতর—মানস-দ্বন্দ্বে বিক্ষত, মানুষ যখন স্বস্তির নিদান লাভের আগ্রহে উন্মুখ ও উৎকণ্ঠ, বিমূঢ় শিল্পী ও মনীষীরা যখন দিশাহারা ; তখন এই অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর নিশ্চিন্ত মনের অবিচল প্রসন্ন-প্রশান্তি আমাদের ভাবিয়ে তুলবেই। বস্তুবাদ (তথা ভোগবাদ কিংবা ঐহিক জীবনবাদ) ও অধ্যাত্মবাদের দ্বৈত বোধে সৃষ্ট দ্বান্দ্বিকবোধের টানাপড়েনে উত্যক্ত ও বিকৃতিবুদ্ধি মানুষ আমরা। আমাদের কাছে বাউলের জীবনচর্যা অত্যন্ত অর্থবহ—জীবনের সুষ্ঠু মূল্যায়নের ইঙ্গিতবাহী এবং আজকের প্রতিবেশে জীবনাদর্শ নির্ণয়ের সহায়ক। বাউলগান আমাদের ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের মূল রয়েছে গভীরে, গতি হচ্ছে অনন্তে আর সম্ভাবনা আছে বিপুল।

প্রখ্যাত বাউল কবি ও সাধক লালন শাহ্, পাগলা কানাই, শেখ মদন বাউল প্রমুখের নাম ও তাঁদের পদ শিক্ষিতসমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। সুফী মতবাদের লৌকিক আচারিক রূপ এঁদের পদরচনার ধারাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। অধ্যাত্ম ও মরমী চিন্তার ঐশ্বর্যের সঙ্গে সহজ কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত মানবিক বোধই বাউল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

আজ এখানে দুজন স্বল্প-পরিচিত বাউল কবি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

বাউল ফুলবাসউদ্দীন ও তাঁর সাগরেদ নসরুদ্দীন বা নসরুল্লাহ্‌র বিপুল সংখ্যক পদ পাওয়া গেছে। এজন্যে তাঁরা বিশেষ আলোচনার দাবীদার। এখনো হয়তো তাঁদের অনেক গান সংগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে তাঁদের জনপ্রিয় পদগুলো সংগৃহীত হয়ে গেছে এমন ধারণা পোষণ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো অযৌক্তিক নয়। কারণ, ভালো গানই জনপ্রিয় হয়, জনপ্রিয় গানই বেশি চালু থাকে আর সেগুলোই প্রথমে সংগ্রাহকের হাতে পড়ে।

ফুলবাসউদ্দীনের গুরু বিনোদ, শিষ্য নসরুদ্দীন। তিনজনই কবি ও সাধক। নসরুদ্দীন ওরফে নসরুল্লাহ্‌র পদে উল্লেখিত মরিয়ম (আত্মবোধন) ও নিসারুন (সাঁইতত্ত্ব) হয়তো তাঁর দুই সাধন-সঙ্গিনীরই নাম। বাউলের সাধন-সঙ্গিনী প্রয়োজন। পরকীয়া হলেই ভালো। কিন্তু মুসলমান বাউল স্বকীয়া তথা স্ত্রীকেই সাধারণত সাধন-সঙ্গিনী করে। কাজেই মরিয়ম ও নিসারুন হয়তো নসরুদ্দীনের স্ত্রীই। মরিয়মও কবি। তাঁর আত্মবোধনমূলক একটি গান পাওয়া গেছে :

—"মাঝিকে আগে রাজি কর, সাঁতার দিলে প্রাণে বাঁচতে পার।"

বাউল কবিদের মধ্যে বহুল পরিচয়ের ফলে আমরা লালনকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানি এবং মানি। কিন্তু অন্য অনেক কবিই যথার্থ তাত্ত্বিক ও সুকবির খ্যাতি ও মর্যাদা পাবার যোগ্য। ফুলবাস ও নসরকে এ-শ্রেণীর কবি বলেই মনে করি। জগৎ, জীবন ও স্রষ্টার যে-রহস্য উদঘাটনে আত্মার আকুলতা, আত্মনিমগ্ন ভাবে-বিভোর বাউলকবি সে-রহস্য-দ্বার উন্মোচনে অবিচল নিষ্ঠায় সদানিরত। পিঁপড়ের সমুদ্র-সাঁতারের আকাঙ্ক্ষার মতো ক্ষুদ্র মানুষের অসীমের সীমা খোঁজার এ প্রয়াসও চির-অসাফল্যে বিড়ম্বিত। অকূলে কূল পাবার আকুলতা প্রকাশেই এর সার্থকতা। কেননা, এতেই আত্মার আকুতি আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। ইরানি কবির জবানীতে 'জগৎ হচ্ছে একটি ছেঁড়া পুঁথি—এর আদি গেছে খোওয়া, অন্ত রয়েছে অলিখিত।' কাজেই এর আদি-অন্তের রহস্য কোনোদিনই জানা যাবে না। তবু অবোধ মন বুঝ মানে না, তাই ঘরও নয়, গন্তব্যও নয় ; পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে, পথ বাড়ানোর খ্যাপামি একে পেয়ে বসে। এই মোহময়ী মরীচিকাই দিগন্তহীন আকাশচারিতার আনন্দে অভিভূত রাখে। জীবনে আকাঙ্ক্ষার এই প্রদীপ্ত আবেগ, এই আনন্দিত অভিভূতিই যথালাভ।

বাউল এই খ্যাপামির শিকার। তাই তার অশান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসার শেষ নেই, বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগে সে নানাভাবে স্রষ্টার, সৃষ্টির ও জীবনের দিশা খোঁজে। সেই আকুল জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর হচ্ছে এক-একটি পদ। বাউল গানের প্রথম চরণেই এক-এক মুহূর্তের এক-একটি ভাব-বুদবুদের সাক্ষ্য রয়েছে ; কখন কোনো তত্ত্ব মনকে নাড়া দিচ্ছে, প্রাণে সাড়া জাগাচ্ছে তা ঐ প্রথম চরণ থেকেই আঁচ করা যায়।

ফুলবাসের মুখেও সে অনাদিকালের প্রশ্ন—'তুমি আমার কে হও, শুনি?' কিন্তু তিনি তো এ প্রশ্নের জবাব পান না। অন্যেরা কী পেয়েছে? তাই আবার তাদের কাছে জিজ্ঞাসা—'সাঁই-এর কী রূপ দেখে স্থির তোরা?' দয়াল সাঁইও আবার ভক্তকে দেখার জন্যে উৎকণ্ঠ, তাই তিনি বলেন—

একবার আয় দেখিরে, তোমায় নয়ন ভরে দেখি
তোমার মতন ভক্ত পেলে, আমি হৃদমন্দিরে রাখি।
আমি নিজ শক্তি তোমায় দিয়ে
থাকব তোমার অধীন হয়ে
আত্মা আত্মায় মিশায়ে হব আমি সুখী।"

কবির এমন উপলব্ধি বেশিক্ষণ টেকে না। আকাশচারী দুরন্ত মন আবার মাটিতে নেমে আসে, জৈব-সমস্যার কথা ভাবে, তখন গোহারী জানায় :

দেখে তোমার কাজগুলা
যায় না কো সাঁই দয়াল বলা
তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান্তা ভাতে মেলে না নুন;
কেউ খায় ঘৃত মাখন কার কান্ধে দেও ঝোলা,
কার নাহি জোটে খেটেখুটে,
পড়ে থাকে ছেঁড়া চটে,
দিবারাতি নানান কষ্টে, শোক-অনলে হয় কয়লা।
কেউ সুখ-সাগরে ডুব দিয়া রয়,
কারো কেঁদে কেঁদে জনম যায়,
ফুলবাস উদ্দীন ভাবে সদাই—কার নামে 'জপি মালা!'

কোনো যুক্তি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়েই আল্লাহ্‌কে লাভ করতে হবে। নিজের চিত্তের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করাই মানুষের ব্রত; কেননা আল্লাহ 'যখন গড়েছিল আদম, এক চিজ রেখেছে কম—এই ভালোবাসার কাম।

আর, 'জপতপ, ভজন সাধন, সে ধন বিনে (ভালোবাসা) সব অকারণ
আবার যদিও শুনি আলিফে লাম লুকায় যেমন, এই মানুষে সাঁই
আছে তেমন,
জাতে আর সিফাতে খোদা, মিশে সদায়

এবং 'কুলুবেন মোমিন আরশ আল্লাতালা'
কোরানেতে আছে খোলা,
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেইদিকে তোমারে দেখি
যেখানে ফুল সেখানে বাস, থাকে মিশামিশি,
তবে কেন দেও না দেখা বল, করি কী উপায়।
.... সাঁই-এর আজব লীলা আমার বুঝার সাধ্য নাই।
আহাদে আহমদ হল মোহাম্মদে লুকাইল
আদমরূপে প্রকাশ হল, তিনে হল এক বরণ।

কবি তাঁর মনের মধ্যে এর উত্তর খুঁজে পান :
সাঁই আমার আসমান জমিন, পবন-পানি কভু ছাড়া নয়।...
..... মোকামে আছে রব সাঁই আমি দেখিতে শুনিতে পাই,
সে যে 'বাক্'-রূপেতে খেলছে সদায়
যে দেখেছে তাঁর প্রাণ জুড়ায়,
ছয় মোকামে ছয় লতিফাতে,
চার ঘণ্টা করিয়া তাতে
বিরাজ করেন সেই যে রব সাঁই
বেখুদী হবে যে জন সেই তো পাবে দরশন।

বাউল সাধনায় পরম গুরু হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্। যেমন :
আমি ডাকি তোমায় বারংবার
এসে আমায় দেও গো দিদার
তুমি বিনে কেউ নাই আমার
ওগো মুরশীদ খোদা।

সাধনতত্ত্ব বিষয়ে ফুলবাস বলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদেকী প্রেমিক হলে, কামরতি তাহার থাকে না
সহস্র দলে উজান চলে, কামত্যাগী প্রেমিক যেজন।
সুজন হলে উজান চলে, নাহি টলে রতিমাসা।

আত্মাতত্ত্ব :

জনমভর যত্ন করে একদিনও দেখলাম নারে
আমি এই দেখবার আশায় ফাঁদ পাতিলাম
তবু পাখি পড়ে না ফাঁদে, 'পুড়ুত' করে উড়ে যায়।

জীবনের এ-ই হচ্ছে বিড়ম্বনা।

অভেদ তত্ত্ব :

জাত বিজাতি যে বাছে
তার চেয়ে আর বোকা কে আছে?
আর ব্রহ্মাণ্ডময় একই খোদা—
এই মানুষ ছাড়া নয়কো জুদা
এক চিজেতে সবাই পয়দা,
ধাঁধায় পড়ে ঘুরতেছে।
বামুন কায়েত হাড়ি মুড়ি
একই জলে হলেন শুচি
সেখানে নাই বাছাবাছি
সকলে শুচি হচ্ছে।
আর চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রগণ
এই মাটির উপরে সবারি আসন
এক মনিবের সব প্রজাগণ
ফুলবাস উদ্দীন ভাবতেছে।

এই অভেদ-দৃষ্টি লাভ করা কেবল লোকান্তরে প্রসারিত জীবন অধ্যাত্মবাদীর পক্ষেই সম্ভব। বাউলেরা বৈষ্ণবদের মতো সমাজ প্রতিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। বাউল গানে ব্যবহারিক জীবনের নানা বস্তু থেকে রূপকাদি গৃহীত হয়েছে। সাধারণত দেহতত্ত্ব ও আত্মবোধন বিষয়ক গানেই রূপপ্রতীকের আধিক্য দেখা যায়। বাউলেরা জীবনকে নৌকা এবং দুনিয়াকে দরিয়া ভাবতে বিশেষ অভ্যস্ত।

ফুলবাসের শিষ্য নসরুদ্দীনের ধারণায়, আল্লাহ্ ভক্তবৎসল। আল্লাহ্ বলেন :

'আমি ভক্তের অধীন আছি চিরদিন
ধনী মানী দুঃখী তাপীরে—কাহাকেও ভাবি না ভিন।
যেভাবেতে রাখে যেবা জন,
তার কাছে রই তেমনি মতন,
যোগাই তাহার মন।

নসরুদ্দীনের সৃষ্টিতত্ত্ব :

নীর হইতে নূরের আকার ধরে,
আলিফ রূপে সেই পরওয়ার
আহাদ নামটি হল তাহার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর-নিরঞ্জন যারে কয়
আলিফের 'কালেব' হইতে
আহাদ এল মিম রূপেতে
আহমদ রয় মিমের মধ্যে
মিমরূপে সেই জগৎ সাঁই
মিম ফেটে হয় মোতির মতন
সেই নূরে আদম হয় চেতন
জাতে জাতে এল তখন
পেল বিবি আমেনায়।

নসরের মতে :

'দেহের বিচে দেখ আছে আজব কারখানা
তিনশত ষাট দিয়ে জোড়া করেছে দেহ খাড়া
দুই খুঁটি একটি আড়া—বেড়া চারখানা
দশ দরজা আট কুঠুরি—চার কুতুব ষোলো প্রহরী
বায়ান্ন গলি, তিপান্ন বাজার, তের নদী সাত সমুদ্দর
তাহার মধ্যে চোদ্দটা ঘর, 'কেউ করে না তাহার খবর—
তিন উজির তিন বাদশা তারে, এক মনিব দুই খরিদ্দার
দালাল তাহার দুইজনা।
দেহের খবর বড় খবর
তিন তারেতে হচ্ছে সব খবর।
বারো বুরুজ সাত সিতারা,
দেহের ভিতর আছে পোরা।

আর দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে বিভিন্ন শক্তির অধীন। নসরের ভাষায় :

ওয়াজেবল অজুদের মাঝি—রহমানি নফস আছে
ওয়াহেদল অজুদের বিচে—মাতাইন্না নফস রয়
আর মমকেনল অজুদের ধারা—বাস করে নফস আম্মারা
মমতেনাল অজুদে পোরা, লওমা সেই নফস কয়
মলহেমা বলে যারে, আরফেল অজুদে ফিরে
পাঁচ অজুদকে চিনতে পারলে নসর কয়, অধর ধরা যায়।
স্বরূপ-রূপে নিয়ে নয়ন চেতন হয়ে দেখ এবার
মিমমোকামে ভজন সাধন, 'হাহুতে' সেই সাঁই-এর আসন।

নসরের কাছে জীবন ও স্রষ্টার অভেদতত্ত্ব এরূপ :

আমি দুগ্ধ তুমি মাখন, আমি পাথর তুমি আগুন
আমি ফুল তুমি ঘ্রাণ—রাখছি জাত সিফাতে
চাঁদের চাঁদনী যেমন, সূর্যের মধ্যে ধূপের কিরণ।
আবের মধ্যে বিজলি গোপন, এইরূপে রয় জাত সিফাতে
জাতে সিফাত সিফাতে জাত, আমি তুমি নয়কো তফাত
তুমি আছ নসরের সাথ, খেতে শুতে পথে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সুমধুর কবিত্বে তত্ত্বকথা কাব্যকথার রূপ নিয়েছে।

রসিক কবির প্রতিবেশ-চেতনা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় মেলে বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্র অঙ্কনের প্রয়াসে :

বাঙলা দেশের জঙলা মুসলমান
কই মানে হাদিস-কোরান।
সুদ-ঘুষ-জেনায় মত্ত, বেপর্দা নারী যত
তাদের হাতে সবাই খান।
দারি ছাঁটে এ্যালবার্ট-কাটে
শার্ট কোর্ট ঘড়ি পকেটে
কেউ দেয় লেংটি এঁটে
চশ্‌মা চোখে হাতে ঘড়ি
তামাক খান না—পান বিড়ি
তহ্‌বন-টুপির নাইকো মান।

পানিই জগৎ-কারণ—এ-কথা বলতে গিয়ে পানি-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে ফলমূলের একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন কবি :

পানিতে হল এ সংসার
এই যে পানি দেহ খানি, সৃষ্টি করলেন সাঁই আমার
নীরাকারে ডিম্বরূপে ভেসেছিলেন সাঁই
পানি হতে আসমান-জমিন চৌদ্দ ভুবন হয়।
পানির আড়া পানির বেড়া পানি ছাড়া কে এবার।
রাই সরিষা, মটর, মশুরী, তিল গোঁজা ছোলা
ক্ষীরা-কুমড়া-তরমুজ-খরমুজ-শশা আর কলা
পেয়ারা-পেঁপে-পোস্তদানা, পানির 'পরে জন্ম তার
মহুরী-গুপারী, এলাজ-কস্তুরী, বরবটি ধোঁধল
লিচু পিচু গোলাপ জাম, হচ্ছে রাম পটল,
হেট্‌ কাবাজারী রাই-খেশারী ডুমুর ডালিম হয় এবার।
আম জাম হয় কাঁঠাল এই বাঙলাদেশে
করমচা কামরাঙ্গা ভালো, খেলে জ্বর আসে
আইফল-নাশপতি ভালো বাংলা দেশে পাওয়া ভার
আছে আঙুর কিনে খেজুর পয়সা জোটে না
লঙ্কা খেলে পেট জ্বলে খাও বরফদানা
নসের বলে পানি নইলে চল্‌বে না আর এ সংসার।

প্রার্থনাসূচক গানগুলোতে নসরের ভক্তহৃদয়ের আবদার, অভিমান, গোহারী ও মিনতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন :

১. (তুমি) ভক্ত হতে প্রকাশিত, ভক্ত না থাকিলে কে ডাকিত
   তুমি মনিব আমি যে দাস, আমা হতে তোমার নাম প্রকাশ
২. রহমান নাম কেন তোমার
   পাপীকে যদি না কর উদ্ধার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশেষে আমারও কবির সাথে প্রার্থনায় যোগ দিয়ে প্রাণের কথা নিবেদন করি :

তুমি দয়া কর দয়াময়
দীনহীনে ডাকে যে তোমায়
তোমার আশায় চিরদিন এ যৌবন বয়ে যায়
দিনে দিনে ফুরাল দিন, আমার ভাবতে ভাবতে
তনু যে ক্ষীণ
আমায় কী ভাবেতে ভেবেছ ভিন আমি কী তোর কেহ নয়
কত সহে জীবনে, আমি পুড়ে মলাম আশকআগুনে
দেবা পাব কত দিনে—দীনহীন নসরে কয়।

পরিণামে সব মানবাত্মারই এক আবেদন, একই মিনতি! অপরিমেয় রূপপ্রতীকের প্রয়োগ বাউল গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা

AMARBOI.COM

আহমদ শরীফ রচনাবলী-১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, তোমার নাম সিরাজ,
তোমার মতো তোমার আশিসও যেন
আমার জীবন-পথে দীপ হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ন ও আনন্দ

ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যে যা মানুষকে ধরে রাখে অথবা মানুষ যা ধরে বেঁচে থাকে তা-ই ধর্ম। দরাজ অর্থে সৃষ্টিমাত্রেরই ধর্ম রয়েছে। এই কারণে ধর্মের অপর অর্থ স্ব-ভাব। স্ব-ভাবও একপ্রকার বন্ধন, যা ছিন্ন করা অসম্ভব। আবার ধর্ম, দীন কিংবা Religion (< Religare) শব্দের মধ্যেও রয়েছে বন্ধনের ভাব। আধুনিক অর্থেও ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতি, ব্যবহাররীতি ও চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রণ-বিধির সমষ্টি। কাজেই যে-কোনো তাৎপর্যে ধর্ম মানুষকে ধরে রাখে—কিন্তু ভয়েও যে তুলতে পারে—তা নিশ্চিত করে বলা চলে না।

অন্য জীব ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ধর্ম প্রাকৃতিক। কিন্তু মানুষের ধর্ম অনেকখানিই স্বসৃষ্ট। সে স্বেচ্ছায় নিয়মের শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধেছে যৌথজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার তাগিদে। এ তার অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের প্রয়োজনে নির্মিত। প্রাণ-মন-প্রজ্ঞা দিয়ে সে অন্ন ও আনন্দের সুব্যবস্থা করতে চেয়েছে, আবার এই অন্ন আর আনন্দই হয়েছে তার প্রাণ-মন ও প্রজ্ঞার পোষক। তাই উপনিষদ বলে—ব্রহ্ম হচ্ছেন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ঔপনিষদিক তাৎপর্যে জীবই ব্রহ্ম। কাজেই জীবনে প্রাণ, মন ও আনন্দের জন্যে চাই অন্ন। অন্ন উৎপাদনের জন্যে চাই জ্ঞান। 'পাঁচরুহ' বা 'পঞ্চপ্রাণ' তত্ত্বের উৎসবিন্দুতেও হয়তো রয়েছে এ বোধ। এ পঞ্চকোষের সমন্বয়ে মেলে পূর্ণাঙ্গ জীবন। এগুলোর ভারসাম্যে অভিব্যক্তি পায় সত্য ও সমগ্র সত্তা। এ লক্ষ্যেই চিরকাল পরিচালিত হয়েছে মানুষের চেতন ও অবচেতন প্রয়াস।

AMARBOI.COM

প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অন্ন আর মন রক্ষার জন্যে আনন্দ—এ দুটোর সাধনাই মানুষের কর্ম ও চিন্তার ইতিহাস। মানুষ বাইরে লড়েছে অন্নের জন্যে আর ভেতরে সংগ্রাম করেছে তত্ত্ব নিয়ে। জনসংখ্যা বর্ধিষ্ণু, জীবিকা ক্ষয়িষ্ণু— তাই তার সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, উদ্ভাবন করতে হয়েছে উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়, কাড়তে হয়েছে অন্য মানুষের খাদ্য—বেড়েছে তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা, ব্যাপক হয়েছে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম। এভাবে একদিকে প্রকৃতির প্রায় সবকিছুর উপযোগ সৃষ্টি করে সে বৃদ্ধি করে চলেছে জীবন-জীবিকার উপকরণ; অন্যদিকে জীবিকার সু-উপভোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-লক্ষ্যে সে তৎপর রয়েছে সমাজ-বিন্যাস চিন্তায়। একদিকে ক্রম-সাফল্যে মৃগয়া ও ফলজীবী মানুষ আজ নভোচর, অন্যদিকে Totem-Taboo-Magic ছেড়ে Animist, Pagan ও Religious মানুষ আজ নাস্তিক— Anarchist.

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমবর্ধিষ্ণু জীবন-চেতনা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়ে চলেছে নতুন ভাবনায়, মননে, কর্মে ও আবিষ্কারে। অন্ন ও আনন্দের অভাব মিটাতেই হয়। অতএব, মানুষের চলমানতার মূলে রয়েছে অন্বেষা। সে-অন্বেষা : অন্নের ও আনন্দের। আর এ দুটোর জন্যেই চলছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রাম, সৃষ্টি হচ্ছে ন্যায়-নীতি-নিয়ম, উচ্চারিত হচ্ছে সাম্য, করুণা ও মৈত্রীর বাণী, ধ্বনি উঠছে সহযোগিতা-সহ-অবস্থান ও সমদর্শিতার, গড়ে উঠছে জীবিকার রকমারি উপকরণ। এভাবে চলছে সমাধানের মানস ও ব্যবহারিক নানা প্রয়াস। আজ অবধি মানুষের যা কিছু সৃষ্টি ও নাশকতা; যা কিছু লজ্জা ও গৌরবের, যা কিছু চিন্তা ও কর্মে অভিব্যক্ত, তা এই অন্ন ও আনন্দ সংস্থানের জন্যেই।

এ প্রয়োজনের তাগিদেই দেশে দেশে নতুন ধর্মের উদ্ভব। চেতনা যার গভীর, সে-মানুষ সচেতনভাবে উপলব্ধি করে দেশ-কালের প্রয়োজন। তাই সে হয় পিতৃধর্মও সমাজ-দ্রোহী। পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের অন্ন ও আনন্দের চাহিদা মিটিয়ে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সংবেদনশীল মনীষীর। এমনি করে দেশ-কালের প্রয়োজনেই সেকালে হ'ত নতুন নতুন ধর্মের উদ্ভব,—একালে যেমন হয় নতুন নতুন মত ও রীতি-পদ্ধতির প্রচলন।

কিন্তু দেশ-কালের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ কোনো ধর্মের যে উদ্ভব হয়নি এবং কোনো ধর্মই যে সর্বকালিক, সর্বদেশিক কিংবা সর্বমানবিক হতে পারে না, ধর্মকে অপরিবর্তিতরূপে আঁকড়ে ধরে রাখলে, তা যে জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তার যুগোপযোগী সংস্কার কিংবা পরিবর্তন যে দরকার, তা সাধারণ লোক বোঝে না। তাই তারা মনে করে ধর্মনিষ্ঠা ও অধার্মিকতাই মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে উত্থান-পতনের একমাত্র কারণ। তাদের মতে মানুষের সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে দুর্দিন ও সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন মানুষ অবহেলা করে ধর্মের বিধি-নিষেধ। সেন্ট অগাস্টাইন, ইবনে খলদুন থেকে শুরু করে আজকের দিনের অনেক ঐতিহাসিক, মনীষী এবং দেশনায়কও পোষণ করেন এ ধারণা।

অথচ এ ধারণা যে কত ভিত্তিহীন তা বলে শেষ করা যায় না। যেহেতু ধর্মমতের উদ্ভবের মূলে রয়েছে দেশ-কালের চাহিদা, সেজন্যে নতুন ধর্মমত মাত্রেই বিদ্রোহজাত এবং আঞ্চলিক মানুষের জীবন-জীবিকার তথা সমাজ-সমস্যার সমাধান। তাই অঞ্চল বহির্ভূত জগতে এ প্রচারিত হয়ে প্রসার লাভ করেছে বটে, কিন্তু মানুষের কোনো প্রয়োজন মিটিয়ে তার ব্যবহারিক কিংবা মানস-জীবনে কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। যদিও ধর্মমাত্রেই তার উদ্ভবক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে জন্ম দেয় নতুন যুগের; চিত্তলোকে নতুন বোধ ও প্রেরণা জাগিয়ে মানুষকে করে কর্মপ্রবণ, দায়িত্ব-সচেতন ও কর্তব্যনিষ্ঠ, আর করে বাহুবলে বলীয়ান, নৈতিক চেতনায় মহীয়ান, ব্যবহারিক সম্পদে ঐশ্বর্যবান এবং মানসজীবনে ঋদ্ধ।

হযরত মুসার পাপবোধ সেদিন হয়তো কেনানে-মিশরে মানুষকে পীড়নমুক্ত করেছিল, কিন্তু অন্যত্র তা প্রভাব ছড়ায়নি হয়তো সে-পরিবেশের অনুপস্থিতির দরুনই। ধনলিপ্সুর ক্রূর লোভ ও নিষ্ঠুর পীড়নপ্রবণতার বিরুদ্ধে লড়েছেন হযরত ঈসা। সেকালের প্যালেস্টাইনের সামাজিক পরিবেশে এ দ্রোহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেশান্তরে রোমকরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেও রোধ করতে পারেনি তাদের পতন কিংবা যুরোপে কোনো অঞ্চলের মানুষেরই মানসোৎকর্ষের কারণ হয়নি যিশুর ধর্ম। এমনকি তা ব্যবহারিক জীবন-প্রয়াসের অথবা নৈতিকজীবন ও মানবিকবোধ বিকাশের সহায়ক হয়েছিল বলেও তেমন দাবী করা চলে না।

বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-শোষণ থেকে নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করে মানুষের ব্যক্তিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ছিলেন দেব-দ্বিজ-বেদ-দ্রোহী মহাত্মা বুদ্ধ ও বর্ধমান। তাঁদের বাণী বিপ্লব ঘটিয়েছিল উত্তরপূর্ব ভারতে। তাঁদের সাম্য, মৈত্রী ও করুণার বাণী সেদিন এ অঞ্চলের মানবিক সমস্যার সমাধান দিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বাণী দেশান্তরে ভিন্ন পরিবেশে মানুষের মনের ও সমাজের রূপান্তর ঘটিয়ে কোনো নতুন যুগের সূচনা করেনি, মধ্য এশিয়ার রক্তপিপাসু শক-হূন-ইউচিদের চরিত্রে দেয়নি করুণা ও কোমলতার প্রলেপ কিংবা জীবন-রসিক চীনাদের করেনি বৈরাগ্যপ্রবণ।

একক স্রষ্টার নামে হযরত মুহম্মদের সাম্য ও ঐক্যের বাণী যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল মক্কা-মদিনায়। এই নবলব্ধ ঐক্য তাদের করেছিল অদম্য অপরাজেয় শক্তির অধিকারী। বন্যার বেগে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তারের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু সিরিয়া-ইরাক-ইরানে কিংবা মিশরে-মরোক্কে অথবা মধ্য এশিয়ায় ও ভারতে দীক্ষিত মুসলিম-জীবনে সে-প্রাণপ্রাচুর্য, সে-বৈষয়িক উন্নতি, সেই মনোবল কখনো দেখা যায় নি। উল্লেখ্য যে, তুর্কী-মুঘলের আত্মপ্রসার ইসলামের দান নয়। শক-হূন-ইউচি-মোঙ্গলের এই বংশধরেরা বেঁচে থাকার দায়েই বাহুবল ও মনোবল-সম্বল জীবনযাপন করত। এদের পূর্বপুরুষেরাই কোরআনের ইয়াজুজ-মা'জুজ, এদের ভয়েই গড়তে হয়েছে চীন-ককেসাসের প্রাচীর। তবু এদের কবল থেকে রক্ষা পায়নি চারদিককার জগৎ। সিরিয়া-ইরাক-ইরান-আর্মেনিয়া-রাশিয়া-ভারত-চীন চিরকালই যুগিয়েছে এদের পিপাসার রক্ত আর উদরের অন্ন। অনুর্বর মধ্য এশিয়ায় যখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা অনাবৃষ্টির জন্যে চারণভূমির ও খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটেছে তখনই তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে মরীয়া হয়ে। অনিবার্য আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচবার গরজপ্রসূত বলেই এই অভিযানে তারা ছিল অপ্রতিরোধ্য ও অপরাজেয়। কেননা, তারা জানত সামনে তাদের জীবন—পশ্চাতে মৃত্যু।

জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে যখনই গ্লানি ও বিপর্যয় আসে, তখনই সাধারণ নায়কেরা মানুষকে স্বধর্মে তথা পিতৃপুরুষের ধর্মে নিষ্ঠ হতে উপদেশ দেন, তাঁদের মতে একমাত্র এ পথেই বিপন্মুক্তি সম্ভব। সবদেশে সবযুগেই সাধারণ মানুষের ধারণায় সঙ্কট উদ্ধারের এ-ই একমাত্র উপায়। তাঁরা যদি নতুন ধর্মের প্রবর্তন চাইতেন, অন্তত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তা হলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। মোহগ্রস্ত চিত্তে পুরোনোই শ্রদ্ধেয়, নতুনমাত্রই অবেজ্ঞয় ও অনভিপ্রেত। অথচ তাঁরা ভেবে দেখেন না যে হযরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে-তুঙ অবধি কোনো যুগের কোনো দেশের কোনো চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মীই পিতৃপুরুষের ধর্মে সন্তুষ্ট ও সুস্থির ছিলেন না। তাঁরা সবাই পুরোনো ধর্মদ্রোহী ও নতুন ধর্মের প্রবর্তক। যাঁরা তেমন অসামান্য মননশীল কিংবা সৃজনশীল নন, তাঁরাও reform করেছেন পুরোনো ধর্ম যুগের চাহিদা পূরণের জন্যেই।

কাজেই কোনো জ্ঞানী-মনীষীর কাছেই ধর্ম সর্বকালিক বলে বিবেচিত হয় নি কখনো। আল্লাও দেশ-কালের প্রেক্ষিতে নতুন নতুন বাণী পাঠিয়েছেন তাঁর নবীদের মুখে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র কিংবা বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যা কিছু নতুন হয়েছে, সবকিছুই এই পিতৃপুরুষের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি-দর্শন প্রভৃতির অস্বীকৃতির তথা অগ্রাহ্যের ফল। এই দৃষ্টিতে যুগে যুগে দ্রোহী-নাস্তিকেরাই বিশ্বমানব ভাগ্যের দিশারী—দেশ-কালের মানবিক সমস্যার সমাধানদাতা। মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে এমনি দ্রোহীদের দানে।

পরিবেশবিরহী ধর্মের সৃষ্টি ও স্থিতি তথা স্থায়িত্ব যে নেই, তার প্রমাণ পরিবর্তিত পরিবেশে ওগুলো উপযোগ হারিয়ে স্বদেশেই লোপ পায়, যেমন জন্মভূমিতেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে জরথুস্ত্রীয়, ইহুদী, খ্রীস্টীয়, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম।

কাজেই ধর্মনিষ্ঠাই মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে শক্তি, সম্পদ ও উন্নতির উৎস এবং ধর্মাচারহীনতাই বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের কারণ—এ তত্ত্বে তথ্য নেই।

সত্য হচ্ছে এই, যে ক্রমপরিবর্তমান, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমঅসমঞ্জস প্রয়োজন-সচেতনতা ও আয়োজন-বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় সামর্থ্য না থাকলে রূঢ়িক কিংবা যৌগিক জীবন সমস্যাসঙ্কুল হয়ই—আর তাতে অভাব-অন্যায়-উৎপীড়ন দেখা দেয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-দ্রোহও এড়ানো যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তির অন্বেষায়

প্রায় দশলাখ বছর আগে প্রাণিজগতে যখন মনুষ্য শ্রেণীর উদ্ভব, তখন থেকেই হয়তো শুরু হয় মানুষের মুক্তির অন্বেষা। জন্মমুহূর্ত থেকেই শিশু যেমন বুঝবার চেষ্টা করে তার পরিবেশকে, এও ছিল হয়তো তেমনি অবচেতন প্রয়াস। দিন যায়, বর্ষ যায়, এমনি করে বয়ে যায় লক্ষ লক্ষ অব্দ। এক সময়ে তার অবোধ মনে সৃষ্টি হয় বোধের, যেমন শিশু অর্জন করে তার বোধশক্তি।

তার বোধ-বুদ্ধির বিকাশ ছিল মন্থর, কিন্তু বিরামহীন ও প্রবহমান। তার আত্ম-শক্তি-চেতনাও ছিল তার বোধ-বুদ্ধির আনুপাতিক। এবং অজ্ঞতার দরুন সে-শক্তির প্রয়োগ-সামর্থ্য ছিল তার আরো কম। প্রয়োগ-বাঞ্ছাই যোগায় প্রয়াসের প্রেরণা। আবার প্রত্যয়হীন বাঞ্ছাও বন্ধ্যা। কাজেই প্রয়োগ-বাঞ্ছার সঙ্গে প্রত্যয় ও প্রয়াসের মেল-বন্ধন না হলে সাফল্য থাকে অনায়ত্ত। আর তেমনি অবস্থায় আসে নিষ্ক্রিয়তা। তখন বুদ্ধি ও শক্তি দুটোই আচ্ছন্ন হয় জড়তায়। শীতকালীন ঔষধির মতো দুটোই আত্মগোপন করে সুপ্তির গহ্বরে।

এমন মানুষ হয় প্রয়াস-বিহীন প্রাপ্তিকামী। তারা পরোপজীবী ও পরনির্ভর। এ রকম মানুষের সংখ্যাই অধিক। তাই মানুষের সংখ্যার অনুপাতে মানুষের কৃতি ও সাফল্য নিতান্ত নগণ্য। চেতনার ও চিন্তার, বুদ্ধির ও কর্মের, প্রয়োগ-বাঞ্ছা ও প্রয়াসের যোগ হয়েছে তেমন মানুষের সংখ্যা যে-গোত্রে বেশি, সে-গোত্রের অগ্রগতিও হয়েছে সে অনুপাতে। আর অন্য গোত্রগুলো প্রকৃতির কৃপা-জীবী হয়েই রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে।

এ কারণেই মানুষের যা কিছু সাফল্য ও কৃতিত্ব তা গুটিকয় মানুষেরই দান। এই গুটিকয় মানুষের উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের, চিন্তার ও চেতনার ফসলই সাধারণ মানুষের সম্বল ও সম্পদ। এই স্বাচ্ছন্দ্য-সুখেই, এই গৌরব-গর্বেই মানুষ প্রাণিশ্রেষ্ঠ।

সেকালে মানুষের জগৎ ছিল অঞ্চলের দিগন্তে সীমিত। সেজন্যে মানুষের কোনো কৃতিই হতে পারে নি সর্বমানবিক সম্পদ। তাই আজো কেউ রয়েছে আদি অরণ্যচারী, আর কেউ হয়েছে নভোচর।

পরমুখাপেক্ষী মানুষের এই নিষ্ক্রিয়তা কেবল বেদনাদায়কই নয়, সমস্যাপ্রসূও। কেননা এদের চেতনার বিকাশ নেই, নেই সৃষ্টির প্রয়াস। এদের এগুবার আগ্রহ নেই, আছে সুস্থির থাকার বাসনা। তাই নিশ্চিত পুরোনো-প্রীতি আর অনিশ্চিত নতুন-ভীতিতে তাদের মন-মানসের পরিক্রমা অবসিত। আচার-সংস্কারের পরিসরে স্বস্তি খোঁজে তাদের জীবন। স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির কাঙ্ক্ষা নিয়ে নতুন সৃষ্টির আগ্রহে অজানার ঝুঁকি নিতে তাঁরা নারাজ। তাই জীবন-সচেতন কর্মী-মনীষীর নব-চেতনালব্ধ চিন্তা কিংবা প্রয়াসার্জিত কৃতি গ্রহণেও তারা বিমুখ। তারা কেবলই রুখে দাঁড়ায়, কেবলই পিছু টানে। চেতনায়, চিন্তায় ও কর্মে অগ্রসর মানুষের জীবন তাই দ্বন্দ্ববহুল ও বিঘ্নসঙ্কুল। আজ অবধি মানুষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের মর্মকথা এ-ই।

এভাবে আশীর্বাদকে অভিশাপ ভেবে তারা যে কেবল নিজেরা ঠকেছে তা নয়, ভাবী মানুষের অগ্রগতিও করেছে ব্যাহত। অতএব, আদিম স্তরে আবদ্ধ আরণ্য-মানুষের কথা তো উঠেই না, এমনকি দুনিয়ার অগ্রসর মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতাও সময় আর সংখ্যার পরিমাপে শোচনীয় ভাবে সামান্য।

যতই মন্থর ও বাধাগ্রস্ত হোক, তবু প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দাস মানুষের মুক্তি অন্বেষার ও প্রয়াসের একটি প্রবহমান ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস অবশ্যই গুটিকয় চিন্তাশীল ও কর্মীমানুষের চিন্তা ও কর্মের ইতিকথা। একজনের চিন্তা অন্য সবার সম্পদ এবং একজনের কর্ম অন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

আচারে হয় রূপায়িত ও পরিণত। অতএব, একের চিন্তা ও কর্মের ফসল সমাজবদ্ধ অঞ্চলবাসী গোত্রের মানস ও ব্যবহারিক সংস্কার এবং আচার তথা চেতনা ও জীবিকা-পদ্ধতিরূপে পরিচিত।

প্রমাণে ও অনুমানে জানা যায়, Animism, Magic belief, Totem, Taboo প্রভৃতি Pagan ও প্রতীকতার স্তর পার হয়েই ধর্ম-দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়েছে মানুষ। এখনো অবশ্য সর্বস্তরের মানুষই মেলে অল্পবিস্তর। এ সব মতবাদ বিশ্বাস-ভিত্তিক। এ বিশ্বাসপ্রসূত ভয়-ভরসা নির্ভর জীবনধারা চলেছে আজো। প্রকৃতির পোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্তি-কামনায় মানুষ স্বাধীন ও স্বস্থ জীবনোপায় সন্ধানে বেরিয়ে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের অবস্থায়।

অঞ্চল ও গোত্রে সীমিত জীবনে আচার-সংস্কারের এরূপ ঐক্যমত ছিল সমাজ-বন্ধনের ও সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক। অভিন্ন মত ও স্বার্থভিত্তিক ঐক্য অন্য অঞ্চলের ভিন্ন গোত্রীয় লোকের আক্রমণ প্রতিরোধের হয়েছিল সহায়ক আর সহজ করেছিল যৌথ প্রচেষ্টায় জীবিকার্জন।

কাজেই একস্তরে গোত্র-চেতনা ও পরবর্তী স্তরে ধর্মীয়-ঐক্য চেতনা ছিল মানুষের আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নয়নের সহায়ক। Pagan মত ও ধর্মমতের পার্থক্য এখানে, যে Pagan মতের ভিত্তি হচ্ছে ভয়-বিস্ময়-ভরসা ও কল্পনা। আর ধর্মমত হচ্ছে বিশ্বাসের অঙ্গীকারে যুক্তি ও তাৎপর্যের সমন্বিত রূপ। যে-যুক্তির ভিত্তি জ্ঞানও নয়, প্রজ্ঞাও নয়, কেবলই বিশ্বাস, তা ফুটো পাত্রে জল ধরে রাখার মতো অলীক। সে-যুক্তি প্রমাণ নয়,—অনুমান। বিশ্বাস ও যুক্তি এমনিতেই পরস্পর বিপরীত ভাব। বিশ্বাস অন্ধ ও বন্ধ্যা, আর যুক্তি জ্ঞানজ ও জ্ঞানপ্রসূ। বিশ্বাসের উৎস মানসপ্রবণতাজাত ভাব, আর যুক্তির ভিত্তি বাস্তব প্রমাণ। তাই বিশ্বাসে যুক্তি আরোপ করা পুতুলে চক্ষু বসানোরই নামান্তর।

দুধ শিশুর খাদ্য। শৈশবোত্তর কালে মানুষ সে-খাদ্যে বাঁচে না। তখন অন্য খাদ্য প্রয়োজন। তেমনি Animism থেকে Religion অবধি বিশ্বাস ও ব্যবস্থা সমাজবদ্ধ মানুষের শৈশব-বাল্যের সংস্কৃতি, সভ্যতা কিংবা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মিটিয়েছে। এক বয়সের অবলম্বন অন্য বয়সের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। তাই পুরোনো সবকিছু জীর্ণপত্র ও ছিন্ন বস্ত্রের মতো পরিহার করে নতুনের প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ। কাজেই পুরোনো জীবনবোধ ও রীতিনীতি নতুন মানুষের জীবন-যাত্রার অনুকূল নয়। কিন্তু বিশ্বাস-সংস্কারের ব্যাপারে সে পুরোনোকেই শ্রেয় ও সত্য মনে করে। এজন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে পরিবর্তনকে স্বীকার করে,—পরিবর্তন যে পরিবর্ধনও তা সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু তার বিশ্বাস ও আচার সংস্কারের ক্ষেত্রে সে সত্য ও শ্রেয়সের চিরন্তনত্বে আস্থাবান। ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ চিরকালই বিনাদ্বিধায় নতুনকে গ্রহণ করেছে, পরম আগ্রহে বরণ করেছে শ্রেয়ঃ-কে। কিন্তু মনোজীবনে তার রয়েছে অচলায়তনের বাধা। সেখানে সে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের অনুবর্তনে আশ্বস্ত থাকে—আয়ত্তগত সংকীর্ণ চেতনার পরিসরে সে যেন খুঁজে পায় নিজেকে—এতেই তার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। তাই নিষ্ক্রমণের সিংহদ্বার খুলে দিয়ে বাইরের উদার আকাশের আলো-হাওয়ায় কেউ আহ্বান জানালেও বের হতে সাহস পায় না সে। পাছে অনিশ্চিত অজানায় বেঘোরে মরতে হয়—এই তার ভয়। চিন্তনে ও সৃজনে সে নিষ্ক্রিয় বলেই সে বিবেচনা শক্তিহীন, সে গোঁড়া; সে রক্ষণশীল। তার নতুন-ভীতি ও পুরোনো-প্রীতির এই কারণ।

বলেছি গুটিকয় লোক ছাড়া আর সব পরচিন্তা ও পরসৃষ্টিজীবী। বিরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠের বিমুখতার ফলে মনুষ্য-সমাজের অগ্রগতি ছিল নিতান্ত মন্থর এবং সময় সময় হয়েছে ব্যাহত।

যেহেতু পুরোনোর অপর নাম জরা ও জীর্ণতা, আর নতুন-মাত্রই জীবন ও শক্তির প্রতীক; সেহেতু নতুনকে শেষ অবধি ঠেকিয়ে রাখা যায় না— যায়ওনি। কেননা বন্যা বাঁধ মানে না। তাই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই এগিয়েছে সংস্কৃতি ও সভ্যতা,—ভাব-চিন্তার হয়েছে বিকাশ ও বিস্তার। কিন্তু তবু তার উত্তরণ ঘটেনি যুগের তোরণে। কেননা, কোনো বিকাশই হতে পায়নি সর্বাত্মক ও সর্বমানবিক। আজকের মানুষের বারো আনা দুঃখই এ পিছিয়ে-পড়া মানুষের মানস মুক্তির অভাব প্রসূত। সব মানুষের মনে যতদিন জ্ঞান-প্রজ্ঞাজ যুক্তির জন্ম না হবে, ততদিন সমাধান নেই মানবিক সমস্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিম মানুষের জীবনবোধ ছিল অবিকশিত। তার জৈবিক চাহিদা ছিল সীমিত। জীবন ছিল আঞ্চলিক। জীবিকা ছিল পরিবেষ্টনীগত। তাই গোত্রীয় ঐক্যই ছিল নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন জীবন ও জীবিকার দৃষ্টিগ্রাহ্য উপায়। প্রকৃতি ও পরিবেষ্টনীর অনুগত জীবনে তাই বিবেচিত হয়েছিল শ্রেয় বলে। কথায় বলে, Necessity is the mother of invention, এই প্রয়োজন-বুদ্ধিই উপযোগ সৃষ্টির যুগিয়েছে প্রেরণা। পূজ্যের অভিন্নতা পূজারীকে করেছে ঐক্যবদ্ধ। Fatherhood of deity, brotherhood of men-তত্ত্বে দিয়েছে প্রেরণা ও প্রবর্তনা। সেদিন সে-অবস্থায় এর থেকে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারত না হয়তো। উপযোগবুদ্ধিজাত এই ঐক্য জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দিয়েছে যৌথ প্রয়াসের সুযোগ, দিয়েছে নিরাপত্তার আশ্বাস ও আত্মপ্রসারের প্রেরণা।

তারপর ক্রমে জীবনবোধ হয়েছে প্রসারিত। প্রয়োজনবোধ হয়েছে বিচিত্র। জনসংখ্যা গেছে বেড়ে। জীবিকা হয়েছে দুর্লভ। তখন সীমিত অঞ্চল ও গোত্রগত জীবন আর অনুকূল থাকেনি জীবিকার। সে-সময় প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক গোত্রের সংহতি ও সহযোগিতা, কিন্তু সে-কল্যাণবুদ্ধি জাগেনি জনমনে। তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হল গোত্রে গোত্রে ও অঞ্চলে অঞ্চলে। তখন আত্মসংকোচন ও স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিই আত্মরক্ষার উপায় রূপে হল বিবেচিত। বাহুবলই হল টিকে থাকার সম্বল। তখন 'জোর যার মুলুক তার'। তখন বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। তখন শক্তিমানের উদ্বর্তনই প্রমাণিত তত্ত্ব ও তথ্য। তখন আত্মরতি আর পরপীড়নই মনুষ্যধর্ম। তখন অসূয়া ও বিদ্বেষেই নিহিত ছিল বাঁচার প্রেরণা। স্বমতের ও স্বগোত্রের না হলেই শত্রু। এবং শত্রুর বিনাশ সাধনই ছিল নিজের বাঁচার উপায়। সহ-অবস্থান তত্ত্ব ছিল অজ্ঞাত।

জ্ঞানী-মনীষীরা নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন নানাভাবে। কিন্তু জনগণের অবোধ্য উপায় কাজে লাগেনি বিশেষ। তাই আজো জটিলতর হয়েই চলেছে সমস্যা। কেননা জীবনবোধ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের চাহিদা বেড়েই চলেছে, অথচ প্রয়োজন মিটানোর সদুপায়-চিন্তা আজো ঠাঁই পাচ্ছে না জনমনে। আজকের সংহত পৃথিবীতে সংহতি, সহ-অবস্থান ও সহযোগিতা যে দরকার, তা তারা যেন কোনো রকমেই চিন্তাগ্রাহ্য করে উঠতে পারছে না। কেননা, তারা চিন্তা করে না। তাই তাদের পিতৃ-পুরুষদের মতোই প্রতাপকেই তারা সত্য বলে জানে। প্রভাবের গুরুত্ব আজো অস্বীকৃত। অথচ প্রতাপে নয়, মানুষ বেঁচে থাকে প্রভাবের মধ্যেই। প্রতাপ দূরে সরায়, আর প্রভাব টানে কাছে। নিজের প্রভাব যে যতটুকু অন্যমনে সঞ্চারিত ও বিস্তৃত করতে পারে—তার অস্তিত্ব ততটুকুই। প্রতাপ নেতিবাচক, প্রভাব ইতিসূচক। কেননা, প্রতাপের প্রকাশ পীড়নে, আর প্রভাবের ফল প্রীতি।

আজকের দিনেও মানুষ আঁকড়ে ধরে রয়েছে তার পূর্বপুরুষ—শিশুমানবের বিশ্বাস সংস্কার-ভিত্তিক আচারিক ধর্ম ও ধর্মবোধকে। এবং গোত্রীয় চেতনারই আর এক রূপ—স্বাধার্মিক ও স্বাদেশিক জাতীয়তা মানুষের 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। আদিকালের এই জীর্ণ ও জড় আচারিক ধর্মের নিগড় ও স্বাগোত্রিক মোহ থেকে অন্তত অধিকাংশ মানুষ মুক্ত না হলে, কল্যাণ নেই আজকের মানুষের। স্বাধর্ম্য ও স্বাজাত্য-চেতনা স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল তুলে রোজই যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে বিরোধের ব্যবধান। দেশ-জাত-ধর্ম অস্বীকারের ভিত্তিতে, নির্বর্ণ মনুষ্য—সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকারে সংহতি, সহযোগিতা ও সহ-অবস্থান নীতির প্রয়োগে একালের মানবিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি, পরিবার ও সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ, জাতি ও জাতিসঙ্ঘ, স্বাতন্ত্র্য ও সদ্ভাব, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি, প্রতাপ ও প্রভাব, বিদ্বেষ ও প্রীতি, অসূয়া ও অনুরাগ, স্বার্থ ও সৌজন্য প্রভৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণকামী মানুষের প্রয়াস হবে "To convert hostility into negotiation, bloody violence into politics and hate into reconciliation."[১]

আশ্চর্য এই যে মানুষ প্রকৃতি-বশ্যতা থেকে মুক্তি-বাঞ্ছায় সংগ্রাম শুরু করে মনের জোরে। মনই ছিল তার শক্তির উৎস,—তার ভরসার আশ্রয়,—প্রাণিজগতে তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। যে-মনের সৈনাপত্যে তার এই মুক্তি-অন্বেষা, সেই মনই কোন্ সময়ে বিশ্বাস-সংস্কারের দাসত্ব স্বীকার করে তাকে করেছে প্রতারিত! এভাবে মন নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস-সংস্কারের কাছে, আর মানুষ নিজেকে বন্ধক রেখেছে মনের কাছে। এজন্যে মানুষের মুক্তি-অন্বেষা সফল হয়নি—সার্থক হয়নি তার প্রয়াস।

তাই মুক্তি আজো দৃষ্টিসীমার বাইরে। যদিও মানুষ তার প্রাথমিক ব্রতে সফল হয়েছে—কেননা প্রকৃতি আজ তার প্রভু নয়, দাস— কিন্তু অভাবিত রূপে সে যার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছে, তাকে সে শত্রু বলেও জানে না। এবং শত্রু না চিনলে সংগ্রাম চলে না,—সতর্কতাও হয় ব্যর্থ। তেমন অবস্থায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। আজ মানুষ তেমন এক মিত্রকল্প শত্রুর কবলে আত্মসমর্পণ করে আশ্বস্ত। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিকে সে এই মিত্রকল্প শত্রু—বিশ্বাস-সংস্কারের অনুগত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। খাঁচায় পোষা পাখির মতো সে মিথ্যা সুখে প্রবঞ্চিত। তার আত্মা যে অবরুদ্ধ, তার আত্মবিকাশের অসীম সম্ভাবনা যে বিনষ্ট, তা সে অনুভবও করে না। তার রক্ষক বিশ্বাস-সংস্কার যে তাকে গ্রাস করছে, তা সে মানে না। অজগরের দৃষ্টিমুগ্ধ শিকারের মতো তার অভিভূত চেতনা তাকে প্রতারিত করছে। তার বিমুগ্ধ আত্মা ফাঁদের চুম্বক আকর্ষণে ব্যাকুল। তাই তার মনে চেতনা-সঞ্চার করা কঠিন।

মানুষ মাত্রেই শান্তি ও কল্যাণকামী। কিন্তু শান্তি ও কল্যাণের পথ চেনা নেই বলেই তারা শান্তির নামে ঘটায় অশান্তি, কল্যাণ কামনায় ডেকে আনে অকল্যাণ; প্রীতির নামে জাগায় গোষ্ঠী-চেতনা। তাই আচারিক ধর্মানুগত্য ও উগ্রজাতীয়তাবোধই মানবপ্রীতি ও মানবতাবোধ বিকাশের বড়ো বাধা,—আজকের মানব-সমস্যার মূল কারণ। প্রীতি বিনিময়ে কারো অনীহা নেই—এ বিশ্বাসে আমরা মানুষ অবিশেষকে আহ্বান জানাই,—সংস্কার-মুক্ত চেতনা, চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে। কামনা করি, বিবেক ও যুক্তি তাদের দিশারী হোক। কৃত্রিম আচারিক ধর্ম ও উগ্রজাতীয়তা পরিহার করে তারা বিবেকের ধর্মে ও মানুষের অভিন্ন জাতীয়তায় আস্থা রাখুক। তাদের চিত্তলোকে প্রীতি ও সহিষ্ণুতার চাষ হোক, সেই ফসলে তাদের চিত্তলোক ভরে উঠুক। 'মানবতাই মানব ধর্ম'—এ বোধের অনুগত হোক তাদের চিন্তা ও কর্ম। মুক্তি অন্বেষ্টা মানুষের মুক্তির অন্বেষা সফল ও সার্থক হোক।

১ L. B. Johnson : Time, May 10, 1968.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ব-সমস্যা

উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি, ভিমরুল প্রভৃতিও সমাজবদ্ধ জীব। কর্মে ও জীবিকায় এদেরও রয়েছে যৌথ জীবন। জলে-ডাঙায় এমনি আরো অনেক প্রাণী রয়েছে যারা সামাজিক ও যৌথ জীবনযাপন করে। এগুলো প্রাকৃত প্রাণী—স্বভাব বা সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। এদের জীবনে রীতি-নীতি কিংবা পদ্ধতির পরিবর্তন নেই— ডারুইনকে মেনেও বলা চলে কয়েক হাজার বছরের মধ্যে অন্তত দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু মানুষের জীবনেতিহাস অন্যরূপ। তার দৈহিক গঠন ও মানস সম্পদ তাকে প্রেরণা দিয়েছে প্রকৃতির আনুগত্য অস্বীকার করতে ও প্রকৃতির উপর স্বাধিকার বিস্তার করতে। তাই মানুষের প্রয়াস কৃত্রিম জীবন রচনার সাধনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিকে জয় করার, প্রাকৃত সম্পদের উপযোগ সৃষ্টি করার সংগ্রামই মানুষের জীবন প্রচেষ্টার ইতিহাস। কাজেই মানুষের ইতিহাস—ক্রম পরিবর্তন, ক্রম আত্মবিস্তার ও ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার ইতিকথা। অতএব মানুষের জীবনযাত্রায় ও চিন্তায় চিরস্থায়ী কিছু অসম্ভব, অনভিপ্রেত, এমনকি দুর্লক্ষণ। মানুষের এই অগ্রগতির আঞ্চলিক ও গোত্রীয় ধারায় দৈশিক-কালিক প্রতিবেশের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি যৌথ জীবনে আবশ্যক রীতি-নীতি-পদ্ধতি কিংবা আইন ও আদর্শ। পুরোনো যখন উপযোগ হারিয়েছে, জীর্ণপত্রের মতোই তা হয়েছে জীবন ধারণের পক্ষে অকেজো। তখন প্রয়োজনবুদ্ধি আবার সৃষ্টি করেছে নতুনতর রীতি-নীতি ও আদর্শ। এমনি করে লোকপ্রবাহ এগিয়ে এসেছে আজকের দিনে। এ তত্ত্ব বোঝে না কিংবা বুঝতে চায় না বলেই পাঁচ-সাত হাজার বছর আগের জীবন-চেতনা ও জীবন-রীতি যেমন সুলভ, আবার এই তত্ত্ব-সচেতন বলেই আজকের দিনে গ্রহলোক জয়কামী মানুষও দুর্লভ নয়। তাই মানুষের ইতিহাস পুরোনো চেতনা আর নতুন চিন্তার দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ইতিবৃত্তেরই নামান্তর। যেখানে পুরোনো চেতনা প্রবল, সেখানে অগ্রগতি ব্যাহত ; যেখানে নতুন চিন্তা তীব্র ও আগ্রহ অমোঘ, সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতিক্রম করেই এগিয়েছে মানুষ। ঋতুবদল যেমন কালের পরিচায়ক ও পরিমাপক, তেমনি পাথেয় পরিবর্তনও চলমানতার লক্ষণ। শীত-বৃষ্টি-রৌদ্রে যেমন পরিচ্ছদ ও আশ্রয় অভিন্ন নয়, তেমনি দেশ-কালভিত্তিক জীবনে দেশান্তর ও কালান্তর নতুন প্রয়োজন বোধের জন্ম দেয়। এ প্রয়োজনে সাড়া না দিলে জীবনে নেমে আসে বদ্ধতার বিকৃতি, অচলতার গ্লানি। প্রয়োজন-চেতনার অভাব কিংবা প্রয়োজন-অস্বীকৃতি জীবনের গতিশীলতা অস্বীকারের অপর নাম। মানুষের জীবন যে স্বরচিত এবং মানুষকে যে স্বশিক্ষিত হতেই হবে— এ বোধের অভাবেই অধিকাংশ মানুষ অচলতায় স্বস্তি খোঁজে—চিরন্তনতায় চায় আশ্বস্ত হতে। কিন্তু মানুষ যে সচল প্রাণী—জড়তা যে তার ধর্ম নয়—চলমানতাতেই যে তার জীবন-সত্য নিহিত,— তা সে বুঝতে না চাইলেও প্রকৃতি আঘাত হেনে তাকে জানিয়ে দেয়। প্রকৃতির আঘাত আসে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দারিদ্র্য, অসততা, পীড়ন ও অপ্রেমরূপে। তখনই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিদ্রোহ, পীড়ন, বিপ্লব ও সংগ্রাম—আনে নতুন মতবাদ, নীতিবোধ, আদর্শ কিংবা ধর্মমত। এ জন্যেই যে-স্থানিক প্রয়োজনে জরথুস্ত্রর কিংবা হযরত মুসা-ঈসা-বুদ্ধ-বর্ধমানের ধর্মমতের উদ্ভব, ও পরিবর্তিত পরিবেশে সে-প্রয়োজনের অবসানে স্বস্থানেই সেসব ধর্মমত হয়েছে বিলুপ্ত। আবার সে-সব ধর্ম দেশান্তরে গৃহীত হয়েছে বটে কিন্তু নতুন শক্তি হিসেবে সমাজে কিংবা মনে স্বদেশের মতো বিপ্লব ঘটায় নি। হযরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে-তুঙ অবধি সবাই পুরোনো-দ্রোহী ও নতুনের প্রতিষ্ঠাতা।

মনের দিক দিয়ে মানুষ তিন শ্রেণীর— এক শ্রেণীর লোক পথ চলে পথের দিশা খোঁজে, আর এক শ্রেণীর মানুষ গড়া পথে স্বচ্ছন্দে চলতে উৎসুক, আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক চলতেই চায় না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা দোলনায় দুলে চলার আনন্দ পায়। প্রথম শ্রেণীর লোক দুর্লভ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকও স্বল্প। তৃতীয় শ্রেণী দলে ভারী। তাই দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করে তাদের তাড়িয়ে নিতে হয় নতুন মঞ্জিলে। এ কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর সমাজও অতিক্রান্তকালের তুলনায় বেশি এগুতে পারেনি।

আত্মরক্ষা ও জীবিকা আহরণের প্রয়োজনে আদি যুগের মানুষ অনুভব করে সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের গরজ। তারই ফলে যে-সংহতিবোধ জাগে তার বহি:রূপ গোত্রীয় ঐক্য। এই গোত্রীয় সংহতি-চেতনা কালে ধর্মীয় ঐক্যবোধে রূপান্তর লাভ করে অভিন্ন মতবাদীর সাম্প্রদায়িক সংহতি গড়ে তোলে,—তারপরে তা রূপ নিয়েছে দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তায়। ইদানীং এ চেতনা রাজনৈতিক আদর্শ বা মত ভিত্তিক সম্প্রদায়ও গড়ে তুলছে। এ চেতনা কোনো কোন যুগে দেশ-কালের প্রয়োজন মিটিয়েছে, মানুষের সাময়িক কল্যাণ এনেছে। কিন্তু এ চেতনা মানুষকে চিরকাল অনুদার, অসহিষ্ণু, স্বার্থপর, হিংসুটে, অমানবিক ও দ্বন্দ্বপরায়ণ রেখেছে। এ হয়তো প্রাণীকে প্রাণ-ধর্মে নিষ্ঠ রাখে—জীবন-সংগ্রামে হয়তো হিংস্র বলিষ্ঠতাও দান করে, কিন্তু মানবিক গুণের বিকাশ সাধনে—উদার মানবতাবোধে দীক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে না।

আঠারো শতক থেকে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবুদ্ধি ও জীবনচেতনা পৃথিবীকে দ্রুত এগিয়ে দিয়েছে— এ জন্যে আগে যে-মতাদর্শের উপযোগ থাকত হাজার বছর ব্যাপী—এ যুগে তা পঞ্চাশ বছরেই হয়ে পড়ে অকেজো। তাই যে-ধর্মমত মধ্যযুগ অবধি আঞ্চলিক মানুষের কল্যাণ এনেছে, তা আজ হয়ে উঠেছে মানব ও মানবতার দুশমন। যে-জাতীয়তাবোধ উনিশ-বিশ শতকে য়ুরোপীয় জীবনে আবে হায়াত রূপে প্রতিভাত—তা আজকের মানুষ ও মানবতার বড়ো শত্রু। যে-গণতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির আদর্শ সংস্থা বলে অভিনন্দিত, সেখানেও মানুষ ধনবল ও বাহুবলের দাস ; যে-সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র চরম মানবতাবোধের পরম দান বলে পরিকীর্তিত, তাতেও মানুষের জীবন যতটা যান্ত্রিক ততটা মানবিক নয়। ব্যক্তি মাত্রই রাষ্ট্রকলের যন্ত্রাংশ কিংবা মজুর—সে যন্ত্র যারা ধনবলে বা বুদ্ধিবলে চালানোর অধিকার পায়, তারাই উপভোগ করে সাময়িক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য—আগের যুগে এ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যেমনটি ছিল সম্রাট, শাসক ও সামন্তের। কাজেই পরিবর্তিত ব্যবস্থায়ও ব্যক্তি মানুষের মুক্তি আসেনি। কেউ পড়েছে ধনগত পীড়নের চাপে, কেউ রয়েছে দলগত নির্যাতনের তাপে। তাই বঞ্চিতজনের বিক্ষুব্ধ আত্মার চিৎকার ও দ্রোহ সর্বত্র বিরাজমান—আর্তনাদ আর সংগ্রামও কোথাও কোথাও দৃশ্যমান। বলতে গেলে সারা পৃথিবীর শাসিত মানুষ আজ Time Bomb-এর মতো—সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো, অনুকূল পরিবেশে যোগ্য নেতৃত্বে সামান্য উত্তেজনায় জ্বলে উঠবে—নিজেরা পুড়বে আর পোড়াবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ, ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। ধর্মীয় ঐক্য-চেতনার, মতবাদের অভিন্নতার কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে গড়া সরকারি ব্যবস্থা এখন আর মানুষের অভাব মোচন করতে কিংবা চাহিদা মেটাতে পারছে না। গোটা পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের সামগ্রিক প্রয়াস-প্রসূত কোনো উপায় বের না হলে এর ইতি হবে না। সাধারণ মানুষ সমস্যাই কেবল অনুভব করে, সমাধানের উপায় জানে না। তাই এ দায়িত্ব চিন্তানায়ক, কর্মীপুরুষ ও শাসকগোষ্ঠীর। পৃথিবীর বহুদেশ আজ শিল্পায়িত ও শিল্পদ্রব্যে সমৃদ্ধ, অন্যগুলোও একই লক্ষ্যে অগ্রসরমান। তাই বাজার মন্দা। কাজেই অর্থনৈতিক সমস্যা আজ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সমস্যা নয়— বিশ্ব-সমস্যা। ফলে এ সমস্যার সমাধান কোনো এক রাষ্ট্রের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাই ধর্ম, জাতীয়তা ও রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের বন্ধন-মুক্ত হয়ে একই মিলন-ময়দানে সব মানুষকে এসে দাঁড়াতে হবে। অসমানে একত্রিত হতে পারে বটে—কিন্তু মিলতে পারে না। কাজেই সাম্য ও সমদর্শিতার নীতিতে আস্থা রেখে লিপ্সামুক্ত চিত্তে সদিচ্ছা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে মানবিক সমস্যার সমাধানে।

নইলে বাড়বে মানুষের অন্তর্দাহ—সংঘাত হবে তীব্র ও গভীর, সংগ্রাম হবে ব্যাপক ও আত্মধ্বংসী—ভাঙ্গার গানই শুনতে হবে সর্বত্র। তার লক্ষণও পষ্ট হয়ে উঠেছে নানা দেশে। বীট-হিপ্পী আন্দোলন থেকে বর্ণদাঙ্গা অবধি সব কিছুতে সেই বিষেরই বিস্ফোট দৃশ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক পরিভাষায় এই বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে বলে শ্রেণী-সংগ্রাম কিংবা দলগত সংগ্রাম। যারা স্বার্থবাজ ধূর্ত আর যারা নির্বোধ তারা ক্রান্তিকালের যে কোনো বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপর্যয়কে 'অবক্ষয়' বলে আখ্যাত করে বিজ্ঞোচিত বিশ্লেষণ-সামর্থ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সমাজে যেখানে একশ্রেণীর বিপর্যয়ে অন্যশ্রেণীর সুদিনের সূচনা করে, যেখানে দুই প্রতিপক্ষের সংগ্রামে এক পক্ষ কাহিল হয়, সেখানে দেশ বা জাতির জীবনে সামগ্রিক 'অবক্ষয়' কোথায়? অতএব অবক্ষয় বলে কিছু যদি থাকেও তা শ্রেণীগত—জাতিগত নয়।

জনসংখ্যা ও যন্ত্রশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে মানুষের অভাব, প্রসারিত হবে প্রয়োজনবোধ, বিস্তৃত ও বিচিত্র হবে জীবনচেতনা, দেখা দেবে নতুন নতুন সমস্যা, জটিল হবে জীবনপদ্ধতি। সময়মতো সমাধান খুঁজে না পেলে জাগবে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, আসবে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা, দেখা দেবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, শুরু হবে সংগ্রাম— একে 'অবক্ষয়' বলা চলে না—এ তো চলমানতার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। জীবন থাকবে সচল আর প্রয়োজন থাকবে স্থির—একি কখনো হয়!

উপায় বের করতেই হবে—পুরোনো কখনো নতুন মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। অতীত কখনো বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ নয়, তা-ই যদি হতো তা'হলে তো নিত্য বর্তমানই থাকত কাল—তার না থাকতো অতীত, না থাকতো ভবিষ্যৎ—এমনকি এ কালভাগ থাকতো অকল্পনীয়।

তাই পরিহার করতে হবে অতীতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রবোধ, পুরোনো ন্যায়-নীতি ও আদর্শ-চেতনা। বাঁচার উপায় বের করতেই হবে—এমনকি তা যদি Flamingo-দের মতো আত্মহত্যার মাধ্যমেও করতে হয়, তাহলেও। বাঁচার তাগিদে আগেও কোনো প্রাণী মারতে বা মরতে দ্বিধা করেনি। আজো করবে না, বাঁচার জন্যেই আজো মানুষ মরতে ও মারতে প্রস্তুত। অন্ন ও আনন্দের ভারসাম্য চাই আজ। বাস্তব পন্থা অবলম্বন না করে হৃদয়বেদ্য মহৎ ও বৃহৎ বুলির চাতুরী দিয়ে ভোলানো যাবে না আজকের মানুষকে। এমনি বুলি 'শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। আমাদের ভুললে চলবে না, যে বিজ্ঞান দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির স্রষ্টা হলেও মানুষ প্রাণী—আর সব কিছুর স্থান জীবের জৈব চাহিদার পরে। Old order must change yeilding place to new.

AMARBOI.COM

মানবিক সমস্যার সমাধানে সংবাদপত্র

বিজ্ঞানীরা বলেন, চল্লিশ লাখ বছর আগে সচল প্রাণীরূপে প্রথম দেখা দেয় মাছ। আর ক্রমবিবর্তনে বা ক্রমোন্নয়নে মানুষ অবয়ব পায় দশ লাখ বছর পূর্বে। বিজ্ঞানীর বিবর্তনবাদে ও উদ্বর্তন তত্ত্বে আস্থা রেখে বলা চলে, মানুষের আরো কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেছে দেহে-মনে উৎকর্ষ লাভের অবচেতন প্রচেষ্টায়। কিছুটা আভাসে, কিছুটা অনুমানে এবং কিছুটা নিদর্শনে আমরা মানুষের ইতিকথা পাচ্ছি মাত্র আট-দশ হাজার বছরের।

মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করেছে তার দৈহিক উৎকর্ষ ও আঙ্গিক সামর্থ্য। তার দুটো হাতের উপযোগই তাকে দিয়েছে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব,—দিয়েছে জৈব-সম্পদে ও মানস-ঐশ্বর্যে অধিকার।

আত্মসচেতন প্রাণী হিসাবে মানুষের মননের প্রথম লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটে সর্বপ্রাণবাদ (Animism) তত্ত্বচিন্তায়। তারপরে তার আরো এগিয়ে আসার স্বাক্ষর মেলে তার যাদুতত্ত্বের (Magic Power)উদ্ভাবনায়। তার আরো অগ্রগতির সাক্ষ্য রয়েছে টোটেম-টেবু ভিত্তিক জীবন-চেতনায় ও সমাজ বিন্যাসে।

Pagan জীবন-চেতনায় ও ধর্মীয় জীবনে মৌলিক কোনো পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। বাহ্য পার্থক্য হচ্ছে একটি অবচেতন অভিব্যক্তি, অপরটি সচেতন জীবন ধারণা। একটিতে রয়েছে অবিন্যস্ত অস্পষ্টতা, অপরটিতে আছে যুক্তির শৃঙ্খলা ও তাত্ত্বিক তাৎপর্য। মূলত ভয়-ভরসা, বিস্ময়-বিশ্বাস ও কল্পনা-সংস্কারই উভয়বিধ জীবন-তত্ত্বের ভিত্তি। আর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও প্রসারই লক্ষ্য। এ জন্যে যুক্তি, বিশ্বাস ও তত্ত্ব সমন্বিত হলেও ধর্ম Animism, Magic, Totem, Taboo তত্ত্বেরই বিকশিত শোভন রূপ। আচারে-অনুষ্ঠানে আজো তার শাঁস সর্বত্র দৃশ্যমান। কেবল লক্ষ্যে মহৎভাব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে মাত্র। কেননা, মানুষের কোনো বিশ্বাস-সংস্কারেরই মৃত্যু নেই। পরিবর্তিত পরিবেশে তার রূপান্তরই হয় শুধু।

জীবনের বিকাশ কিংবা বিলয় জীবন-জীবিকার পরিবেশ নির্ভর। তাই মানুষে মানুষে পরিবেষ্টনী-গত পার্থক্যও দেখা দিয়েছে গোড়া থেকেই। সে পার্থক্য বর্ণে, জীবিকায় ও জীবনদৃষ্টিতে সুপ্রকট। পরিবেষ্টনীগত প্রয়োজন স্বীকার না করে উপায় ছিল না বলেই বিচিত্র ধারায় গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন ও মনন। এভাবে প্রতিবেশের আনুকূল্যে মানুষের অগ্রগতি কোথাও হয়েছে অবাধ, আবার এর প্রতিকূলতায় কোথাও হয়েছে ব্যাহত।

পরিবেশ ও প্রয়োজনের অনুগত মনুষ্য জীবনে এজন্যেই বিকাশ সর্বত্র সমান হতে পারেনি। তাই আজো স্থিতিশীল আরণ্য গোত্র যেমন রয়েছে, তেমনি দেখা যায় পাঁচ-সাত হাজার বছরের পুরোনো সভ্য জাতিও।

সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ-মানসে তথা জীবন-জীবিকায় নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধান লক্ষ্যে উন্নততর সমাজে ধর্মের উদ্ভব। ধর্মও তাই স্বীকার করেছে পরিবেষ্টনীগত জীবন-জীবিকার প্রভাব ও প্রয়োজন। এ জন্যেই কোনো ধর্মই দেশকাল নিরপেক্ষ সর্বমানবিক হতে পারেনি। প্রতিবেশের কারণেই কোনো ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছে পাপ, কোনো ধর্মে ক্ষমা, কোনো ধর্মে কর্ম, কোনো ধর্মে আচার, কোনো ধর্মে বৈরাগ্য, কোনো ধর্মে জরামৃত্যুভীতি, কোনো ধর্মে নৈতিক জীবন, কোনো ধর্মে জ্ঞান, কোনো ধর্মে ভক্তি এবং কোনো ধর্মে মুখ্য হয়েছে সংগ্রাম।

দেশকালের চাহিদা পূরণের জন্যে এভাবে কত ধর্মের জন্ম-মৃত্যু হয়েছে, আবার একই ধর্মের হয়েছে কত কত শাখা-উপশাখা। তবু নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশে চলমান মানুষের নব-উদ্ভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন মেটেনি। নিত্য নতুন সমস্যায় বিব্রত মানুষ উপায় খুঁজে খুঁজে এগিয়েছে— একটার সমাধান পেল তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অন্য সমস্যা। কোনো চলমান জীবনেই প্রয়োজন ও উপকরণ অপরিবর্তিত ও স্থিতিশীল থাকে না। তাই মানুষ কোনদিন নিশ্চিত জীবনের আশ্বাস পায়নি।

ফলে, ধর্ম অভাব মিটিয়ে ভরে তুলতে পারেনি বলে, ধরেও রাখতে পারেনি। দিশেহারা মানুষ ধর্মের নামে কেবল খুনো-খুনিই করেছে—কিন্তু শ্রেয়সের সন্ধান পায়নি। এ অভিজ্ঞতা থেকে উন্নততর সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনচেতনা তথা সমাজ-চেতনা দেখা দেয়। তারই ফলে জীবন, সমাজ ও জীবিকা-তত্ত্বে হয়েছে নানা মতের ও পথের উদ্ভব। এ সব মতবাদই এখন সভ্যজগতে জীবন নিয়ন্ত্রণের ও চালনার ভার নিয়েছে।

ধর্মে ছিল অপৌরুষের অঙ্গীকার। তার ভিত্তি ছিল ভয়-ভরসা ও বিশ্বাস-সংস্কার। এজন্যে ধর্মে আনুগত্য ছিল প্রায় অবিচল।

মতবাদ হচ্ছে যুক্তি ও ফল নির্ভর। মতবাদ গ্রহণে-বর্জনে মানুষ অকুতোভয় এবং স্বাধীন। এ জন্যে সমাজে ও রাষ্ট্রে আরো জটিল হয়েছে সমস্যা।

ধর্মে আনুগত্য ভয়-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে বলে সে-আনুগত্য হয় অন্ধ ও অবিচল। তাই ধার্মিক মাত্রেই গোঁড়া ও কর্তব্যনিষ্ঠ। আনুগত্য, সংযম ও নিষ্ঠাই ধার্মিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভয়-ভরসা ও বিশ্বাসের অঙ্গীকারে সংযত ও বিধাননিষ্ঠ ধার্মিক তাই পোষমানা প্রাণী। তার মধ্যে প্রশ্ন নেই, দ্রোহ নেই, নেই কোনো উদ্বেগ। নিয়ম ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত তার জীবনের সুখে-দুঃখে, সাফল্যে-ব্যর্থতায়, রোগে-শোকে কিংবা আনন্দে-বেদনায় সে সহজেই প্রবোধ ও স্বস্তি পায়। অপৌরুষের বিধি-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত থাকে তার ইহলোকে-পরলোকে প্রসারিত জীবনের ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট। এজন্যেই ধার্মিক মানুষে খাঁটি মানবতা সুদুর্লভ। মনুষ্যত্বের সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ তা'তে অসম্ভব। তার হচ্ছে যান্ত্রিক জীবন। যেমন দুটোই সৎকর্ম হওয়া সত্ত্বেও ধার্মিক মুসলমান মন্দির নির্মাণে এবং ধার্মিক অমুসলমান মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে না। এবং বিধর্মী ভিক্ষুক দিয়ে কাঙ্গাল ভোজনের কিংবা ফিৎরা দানের পুণ্য মেলে না। তার ধর্মপ্রেরণা-প্রসূত দয়া যেমন অশেষ তার ঘৃণাও তেমনি তীব্র ও মারাত্মক। এজন্যে তার মনুষ্যত্ব, তার মানবতা ও তার উদারতা তার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারে না কখনো। তাই ধার্মিক মানুষের সংযম ও নীতিনিষ্ঠা সমাজ-শৃঙ্খলার সহায়ক হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের অগ্রগতির অবলম্বন হয় নি। আর মতবাদ যেহেতু যুক্তি ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সেজন্যেই মতবাদই মতধারীর মনুষ্যত্ব ও মানবতার পরিমাপক। এটি তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অর্জিত বলেই এখানে সে স্বয়ম্ভু।

সেকালের ধর্মমত আর একালের মতবাদ দুটোই মূলত সামান্য অর্থে ধর্ম,—জীবনযাত্রীর নিয়ামক। একটা ঐশ্বরিক, অপরটা নিরীশ্বর তথা মানবিক—পার্থক্য এটুকুই। কিন্তু কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানবিক সমস্যার সমাধানে কোনোটাই নয় পুরো সমর্থ। তবু গণহিতৈষণা-কামীর 'গণবাদ' শ্রেয় এবং গণতন্ত্র উন্নততর ব্যবস্থা।

সেকালে ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন, প্রচারক ছিলেন, ছিল ধর্মগ্রন্থ। একালেও মতবাদের প্রবর্তক আছেন, সংবাদপত্রই এর গ্রন্থ এবং সাংবাদিকরাই এর প্রচারক। এজন্যে আজ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাই মানব ভাগ্যের নিয়ামক।

সেকালে পৃথিবী ছিল খণ্ডে বিভক্ত, আর সে-কারণে সমাজগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। একালে পৃথিবী হয়েছে অখণ্ড ও সংহত। মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা হয়েছে একই সূত্রে গ্রথিত। যৌথ প্রয়াস ছাড়া কোনো প্রয়োজনই মেটে না; সহযোগিতা ছাড়া মেলে না কোনো সমস্যার সমাধানও। এমনি অবস্থায় ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা কেবল অকল্যাণই আনবে। স্বাতন্ত্র্য ও সৌজন্য; স্বার্থ ও সহযোগিতা; ধর্মবোধ ও মানবতা এবং জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মেলবন্ধনেই কেবল আজকের মানবিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের যুগের মানবতাবোধ ছিল ব্যক্তি-মানসের উৎকর্ষের ফল। এ যুগে মানবতাবোধ সমাজ-মানসে সংক্রমিত না হলে মানুষের নিস্তার নেই। সংবাদপত্র হচ্ছে গণসংযোগের মাধ্যম। কাজেই মানবতা-প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সাংবাদিককেই। স্বার্থ বজায় রেখেও সৌজন্য দেখানো সম্ভব অথবা সৌজন্য বজায় রেখেও স্বার্থসচেতন থাকা যায়—লিপ্সা মুক্ত স্বার্থে ও সৌজন্যে যে বিরোধ নেই—এ কথা আজ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য যেমন প্রয়োজন, সামষ্টিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যবুদ্ধিও তেমনি আবশ্যিক। আগের মতো ক্ষণিকের উত্তেজনায় কিংবা লিপ্সায় আপাত স্বার্থে ধর্ম, জাতি ও রাষ্ট্রের নামে বিরোধের ব্যবধান সৃষ্টি না করে মিলনের মহাময়দান তৈরির ব্রত গ্রহণ করতে হবে সাংবাদিককে। দেশ-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ নির্ভেজাল মানবতার বিকাশের সাধনার আজ বড়ো প্রয়োজন। ধর্মীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনাকে করতে হবে বিশ্বমৈত্রী ও করুণার অনুগত এবং এগুলো রক্ষার ও বৃদ্ধির অনুকূল। আজ সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার নীতিই মানবিক সমস্যা সমাধানের দৃষ্টি-গ্রাহ্য একমাত্র উপায়।

এ নীতি প্রচারের গুরুদায়িত্ব, এ কঠিন কর্তব্য ও নেতৃত্বের এ অধিকার আজ সংবাদপত্রের। সংবাদপত্রের কাছে বিশ্বের কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই তাই আজ অনেক প্রত্যাশা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস পাঠকের দু-একটি জিজ্ঞাসা

এ যুগের মতবাদের মতোই ধর্মমাত্রেই কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষের বিদ্রোহ-বিপ্লবের দান। কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, আর্থিক নৈতিক কিংবা প্রশাসনিক বিপর্যয়ের প্রতিকারকল্পে জ্ঞানী-মনীষীর চিন্তা ও প্রয়াস প্রথমে মনন-বিপ্লবরূপে এবং পরে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে দ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্লব-বিদ্রোহের অবসানে দ্রোহীদের জয়ে তাদের পরিকল্পিত ও অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতি ও নীতি-আদর্শ পরিণামে নবধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুষ সোনার মতোই জীবনে পায় লাবণ্য, মননে পায় ঔজ্জ্বল্য। সে তাপ অবসিত হলে আবার নেমে আসে গ্লানি। ম্লান হয়ে উঠে সমাজ-সংস্কার। নবতর অভাব ও প্রয়োজনবোধ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় মাথা উঁচু করে। নতুন ভাব-চিন্তা ও আয়োজন-বুদ্ধি নিয়ে পূরণ করতে হয় প্রয়োজন। উদ্ভব হয় নতুনতর ধর্মের। যারা প্রয়োজন-সচেতন ও আয়োজনে তৎপর তারা তরে, আর যারা প্রয়োজন মতো আয়োজনে অসমর্থ তারা মরে।—এ-ই প্রকৃতির নিয়ম। তাই ধর্মের অকারণ উদ্ভব যেমন নেই, তেমনি নেই কালান্তরে তার উপযোগ। হৃত-উপযোগ ধর্ম কালান্তরে প্রাণের প্রেরণা নয়, জীবনের অবলম্বন নয়—সমাজের উপসর্গ—প্রগতির অন্তরায়।

স্বদেশে ধর্মমাত্রেই জীবন-চেতনারই প্রতিরূপ। তাই স্বদেশে যে-নতুন ধর্ম Practice, দেশান্তরে তা theory মাত্র। স্বদেশে যা real, দেশান্তরে তা-ই ideal এবং কালান্তরে তা একটা idea, একটা কল্পনাসাধ্য Philosophy-র বেশি নয়। মানুষের সামান্য ধর্মের সাদৃশ্যবশে অঞ্চলোদ্ভূত ধর্ম দেশান্তরে প্রসার লাভ করে বটে, কিন্তু জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তা সম্পদ ও সম্বল হয়ে ওঠে না। যেহেতু তা theory হিসেবেই মন ভোলায়, তাই দেশান্তরে ব্যাপ্ত ও কালান্তরে স্থিতি পায়। কিন্তু ধর্ম যেখানে বাস্তব জীবনে সমস্যার সমাধান রূপে উদ্ভূত, সেখানে তা কালান্তরে হয় বিলুপ্ত। পশ্চিম এশিয়ার হযরত ইব্রাহিম থেকে হযরত ঈসা অবধি সকল চিন্তানায়ক প্রবর্তিত ধর্ম-সমাজ এভাবে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। স্বদেশে জরথুস্ত্রীর-জৈন-বৌদ্ধধর্মের পরিণামও স্মর্তব্য।

দেশ-কালের প্রতিবেশে উদ্ভূত বলেই তথা সামাজিক-নৈতিক-আর্থিক কিংবা প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানের তাগিদজাত বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রসূত বলেই ধর্ম তার উদ্ভব ক্ষেত্রের মানুষকে দেয় আত্মপ্রকাশের প্রেরণা ও আত্মবিস্তারের শক্তি। ইসলামের উদ্ভবে মরুভূ মক্কা-মদিনার জনগণ একদিন এমনি জীবন-স্বপ্নের বাস্তবায়নে বন্যার বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল অমোঘ শক্তিরূপে। চারদিককার ভুবন এলো তাদের দখলে। সিরিয়া-ইরাক-ইরান-মিশর-মরোক্কো-স্পেন-সিন্ধু-তুরান প্রভৃতি কত কত দেশ এল তাদের হাতে। পাঁচশ বছর ধরে চলল তাদের শাসন। পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের ইসলামী প্রেরণা গেল উবে। মক্কা-মদিনার ঐতিহাসিক ভূমিকার হ'ল অবসান। স্বদেশী ধর্ম মক্কা-মদিনার লোককে দিল ঐশ্বর্য ও সম্মান, করল শাসক, আর দেশান্তরে দীক্ষিত মুসলমানদের রাখল পরপদানত। স্বদেশে ইসলামের মুখ্যদান জিগীষা। কিন্তু দেশান্তরে দীক্ষিত মুসলমানদের মক্কা-মদিনাবাসীর মতো জিগীষু করেনি ইসলাম। অতএব দেশান্তরে ও কালান্তরে ধর্ম যে মানুষের জীবন-প্রয়াসে প্রেরণার উৎস হতে পারে না— কেবল আচার ও আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে,—এ তথ্য ও তত্ত্ব নতুন প্রত্যয়ে গ্রহণ করা আবশ্যিক। নইলে বিভ্রমমুক্ত পথ মিলবে না এগুবার।

প্রায় আড়াইশ বছর ধরে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, আবদুল আজিজ, আবদুল কাদির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, বেলায়েত আলী, তিতুমীর, মক্কার মুহম্মদ ইবন্ আবদুল ওহাব, জামালউদ্দিন আফগানী, শরীতুল্লাহ, দুদুমিয়া, কবি হালী, কবি ইকবাল প্রমুখ বহু জ্ঞানী, মনীষী, চিন্তানায়ক ও দেশনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন,— ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মাচারহীনতাই জাতীয় উত্থান ও পতনের কারণ। ইতিহাসের সমর্থন বিহীন এই ধারণায় গলদ ছিল বলেই তাঁদের প্রয়াস কোথাও সফল হয় নি। গত আড়াইশ বছর ধরে ধর্মীয় প্রেরণার মাধ্যমে তথা ধর্ম-সংস্কারের পন্থায় মুসলমানদের উন্নতি বা আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বার বার। ধর্মের নামে তথা ধর্মভাবের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি লাভ করতে হলে দেশজ নতুন ধর্মের প্রয়োজন। কেননা দেশজ নতুন ধর্মই কেবল প্রাণে দিতে পারে প্রেরণা, বাহুতে দিতে পারে বল।

এ কারণেই সুলতান মাহমুদ থেকে আরম্ভ করে নওয়াব সিরাজদ্দৌলা অবধি সাতশ বছরের মধ্যে আমরা জ্ঞানী-গুণী কিংবা রাজা-বাদশা বা পদস্থ দেশী মুসলমান পাইনে। বহিরাগত নবধর্ম তাদের জীবনে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল বলে প্রমাণ নেই। অথচ ভারতে অমুসলমানেরা রাজসরকারে যথাযোগ্য পদও পেয়েছেন, আবার স্বাধীন রাষ্ট্রও গড়ে তুলেছেন একাধিক। আর জ্ঞানী-মনীষীর তো কথাই নেই।

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান নিম্নবর্ণের ও বিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত হলেও উচ্চবর্ণের লোকও নগণ্য ছিল না। তাদেরও তো কোনো দান ও উন্নতি জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সুলভ নয়। অতএব এর কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

আমরা দেখেছি মধ্য এশিয়ার নানা গোত্রীয় লোকই ভারতে আধিপত্য করেছে। তুর্কী-মুঘল-ইরানীরাই দখল করেছিল রাজ-সরকারের সব উচ্চপদ। এজন্যে শাসকদের এ-দেশী স্বজাতির সহযোগিতা দরকার হয় নি। ফলে অমুসলমানের অংশ দেশী অমুসলমানেরা পেয়েছে এবং মুসলমানের অংশ সাতশ বছর ধরে ভোগ করেছে তুর্কী-মুঘল-ইরানীরাই। এভাবে বঞ্চিত রইল দেশী মুসলমানেরা। পদলাভের পথ রুদ্ধ ছিল বলেই হয়তো তাদের শিক্ষার প্রেরণাও ছিল না— ছিল না ধনাগমেরও সহজ উপায়। তাই অর্থে-বিত্তে কিংবা বিদ্যায় তাঁরা সমাজের উঁচুস্তরে উঠতে পারে নি কখনো। এখনকার দিনে যেমন পূর্ব পাকিস্তানে কল-কারখানা গড়ে উঠেছে অনেক, কিন্তু মালিকানা রয়েছে অবাঙালির হাতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পূর্ব পাকিস্তান সমৃদ্ধ হচ্ছে, কার্যত বাঙালির দুঃখ ঘোচে নি। ঠিক এমনি অবস্থা ছিল ব্রিটিশ-পূর্ব যুগেও। দেশে ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু সে ঐশ্বর্য ছিল বিদেশাগত মুসলিমদের হাতে। আমাদের এ ধারণার পরোক্ষ সমর্থন পাই আরাকানের ইতিহাসে। সাময়িক বিচ্যুতি থাকলেও ১৬৬৫ সন অবধি চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের অংশ। সেখানে তুর্কী-মুঘল-ইরানীর স্থায়ী প্রভাব ছিল না বলেই চট্টগ্রামবাসী বাঙলাভাষী বাঙালি মুসলমান রোসাঙ্গের শাসনকার্যে তাদের যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে। তাই আমরা সতেরো শতকে আশরাফ খান, শ্রীবড় ঠাকুর, সৈয়দ মুসা, সোলায়মান, মাগন ঠাকুর, নবরাজ মজলিস প্রভৃতি দেশী মন্ত্রী পাই।

ইংরেজ আমলে দেশী খ্রীস্টানের ক্ষেত্রেও আমরা এমনি এক বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করি। ব্রিটেন থেকে স্বজাতি আনয়ন সম্ভব না হলে ইংরেজরা দেশী খ্রীস্টানকেই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে আশ্বস্ত হত, কিন্তু তেমন কোনো প্রয়োজন না হওয়ায় যদিও প্রচারকদের উৎসাহে ও তৎপরতায় খ্রীস্টান হয়েছে অনেক, কিন্তু শাসকের স্বজাতি বলে অনুগ্রহ পেয়েছে সামান্য। স্বজাতির পোষণে তাদের আত্মবিকাশ ছিল দুর্লক্ষ্য।

কাজেই সময় এসেছে নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস পাঠের। তুর্কী-মুঘল মুসলিম শাসনে আর্থিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশী মুসলমানের সুযোগ ও সুবিধা, অবস্থা ও ভূমিকা, কৃতি ও সংস্কৃতি কী ছিল তা যাচাই করা প্রয়োজন। আমরা সাদা চোখে দেখছি দিল্লী-আগ্রায় কিংবা দাক্ষিণাত্যে অথবা গৌড়-সোনার গাঁ-ঢাকা-মুর্শিদাবাদে পদস্থ দেশী মুসলমান অনুপস্থিত।

বাঙলা দেশের ইতিহাসের যে-অংশের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের হাতে এসেছে সে-অংশেও অর্থাৎ নওয়াবী আমলেও আমরা খাঁটি দেশজ বাঙালি পাইনে। বিদেশী মামলুকের মর্যাদা আর সুযোগও পায় নি দেশী গেরস্থ। উত্তর ভারত থেকে আগত ব্যক্তির পুত্র হুগলীবাসী জাস্টীস সৈয়দ আমীর আলী নওয়াবী আমলের বাঙলার উচ্চবর্ণের মুসলমানদের বংশধর সম্পর্কে বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'These are called Hidustanis and few of them ever understand Bengali. In most of the districts of upper Bengal, such as Beerbhoom, Midnapur, Dinajpur, Maldah, Purneah and to some extent the English district of twenty four pergunnahs, the Mohammedans speak urdoo, though not with the same purity as a native of Lucknow or Delhi, and know only enough of Bengali for the purposes of social intercourse with their Hindoo neighbours.

নওয়াবী আমলে এই বহিরাগত মুসলমান বড় চাকুরেরা ও তাদের পরিজনেরা (This class of Muslims) treated the language of the subject races with contempt..... they were as ignorant of native vernaculars as any English administrator of the day.

এও সত্য যে সিরাজদ্দৌলা-মীর কাসেমের পতনের পর বিদেশাগত অনেক অভিজাতই উত্তর ভারতে চলে যায়, যারা নানা অসামর্থ্যে যেতে পারে নি, সেই স্বল্প সংখ্যক পরিবারের কথাই বলেছেন সৈয়দ আমীর আলী ও ডক্টর মল্লিক।

অতএব, এই তুর্কী-মুঘল-ইরানী অবতংসরা ইংরেজ প্রশাসকদের মতোই সযত্নে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই প্রজা-সাধারণের সুখ-দুঃখ করেছিলেন প্রত্যক্ষ, আর পীড়ন-শোষণ চালিয়ে ছিলেন সর্বপ্রকার ছোঁয়া বাঁচিয়ে। দেশী খ্রীস্টান ও গোরা খ্রীস্টানের যেমন রয়েছে সমাজে ও ধর্মশালায় স্বাতন্ত্র্য, তেমনি শাসক ও শাসিত মুসলমানে ছিল দুস্তর ব্যবধান। সে-স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর অতিক্রম করে সাতশ বছরেও মিলতে পারে নি তারা। তাই রাজদরবারের বিদেশী মামলুক আর হাবসী দাসেও বর্তেছে তখতের অধিকার, হিন্দুরও ছিল বিদ্রোহের সুযোগ, কেবল দেশী মুসলমানেরই ছিল না পাত্তা। এখানে হাসান গঙ্গা বাহমন, ঈশা খান, কালা পাহাড়, মালিক কাফুর, মালিক খসরু, জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ (যদু) প্রভৃতি দেশী হিন্দুর বংশধরদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে অসঙ্গত। কেননা, তাঁরা হিন্দু হিসাবেই বড়ো হয়েছিলেন অথবা ছিলেন বড়ো হিন্দু পরিবারের সন্তান।

'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' লেখক ডাব্লিউ. এ. হান্টারের ভূমিকা ছিল অনেকটা পশ্চিম এশিয়ার টি, ই, Lawrence-এর মতোই। মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ ও ব্রিটিশ-প্রীতি জাগানোর অভিনব কৌশল হিসেবে চমকপ্রদ নানা বানানো কথা তিনি তথ্যের আকারে সাজিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। একশ বছর ধরে মুসলমানরা তাই কপচিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। এ-গ্রন্থে যদি কোনো সত্য থেকেও থাকে তবে তা বিদেশাগত শাসকশ্রেণী সম্পর্কেই প্রযোজ্য—দেশী মুসলমান সম্পর্কে নিশ্চিতই নয়।

তাছাড়া নওয়াবী আমলের বাঙলা কখনো ১৯০৫ সনের পরবর্তীকালের ভৌগোলিক বাঙলা ছিল না। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা মিলেই বাঙলা, অন্তত সিরাজুদ্দৌলার বাঙলা ছিল বাঙলা-বিহার। আর তা ১৯০৫ সন অবধি ছিল স্থায়ী। কাজেই একালের বাঙলার ইতিহাস চর্চায় বিহারকে বাদ দেয়া যায় না। পলাশী-উত্তর বাঙলায় হিন্দু ও ইংরেজের ভূমিকা ও তাদের শাসন-পীড়ন কিংবা পোষণ-শোষণ নীতি বাঙলা-বিহারে সমভাবে ছিল কার্যকর। বিহারকে বাদ দিয়ে কোম্পানী আমলের বাঙালি মুসলমানের বিত্ত-বৃত্তি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে-সব কথা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যরূপে চালু রয়েছে, তা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার ফল নয়, হান্টার শ্রেণীর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রশাসনিক প্রয়োজনপ্রসূত দান, সাম্রাজ্যিক নীতি প্রেরণাপ্রসূত বিশ্লেষণ। এজন্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বাঙালি মুসলমানের তথাকথিত অনীহা, লাখরাজ, আইমা, তঘমা, মদদ-ই-মাশ ইত্যাদি হারানোর প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম প্রভৃতি বিহারী মুসলিম-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।

তখন হয়তো দেখা যাবে ইংরেজের প্রতি বিরূপতা কিংবা ইংরেজির প্রতি অনীহাই বাঙালি মুসলমানকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বিরত রাখে নি, শিক্ষার Tradition ছিল না বলেই তারা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় নি। অবশ্য উচ্চবিত্তের মুসলমানরাও যথাসময়ে সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল এবং তাদের অনেকের শিক্ষা পূর্ণতা পায় নি পরিবেশের অভাবেই। কেননা ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছিল কোলকাতায়। সেখানে উচ্চবিত্তের মুসলমান ছিল অনেককাল অনুপস্থিত। কোলকাতা ও তার চার পাশের হিন্দুরাই পেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা প্রথমদিকে এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ব্যতীত বৈদ্য, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের কাছে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার পারিবেশিক কারণেই রুদ্ধ ছিল বহুকাল। বিহারে বিদেশাগত মুসলিম অভিজাতের সংখ্যা ছিল বেশি, তাই ইংরেজি শিক্ষায় তারা পিছিয়ে পড়েনি।

কেউ কেউ মনে করেন, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিরূপতা ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবপ্রসূত। কিন্তু ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র বিহার ও উত্তর প্রদেশে তৎসত্ত্বেও ইংরেজিশিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। আমরা জানি কোনো আন্দোলনের প্রভাবই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী হয় না। মুসলিম সমাজে ওহাবী প্রভাবও সর্বাত্মক ছিল না। তাছাড়া, ১৮৬০ সনের পরে ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত এবং সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজে ইংরেজ ও ইংরেজি প্রীতি প্রবল হতে থাকে। তবু বিশ শতকের দ্বিতীয়পাদের আগে বাঙলার মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা লক্ষণীয়ভাবে প্রসারলাভ করে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কালাপানি পার হলে জাত-যাওয়া ও সমাজ-চ্যুতি নিশ্চিত জেনেও উনিশ শতকে কোনো হিন্দু বিলেত যাওয়ার সুযোগ ছাড়ে নি। ওহাবী প্রভাব নিশ্চয়ই হিন্দুর ঐ ধর্মীয় সংস্কার ও লাঞ্ছনাভীতির চেয়ে প্রবল ছিল না কখনো। আসলে নিম্নবর্ণের হিন্দুর যেমন, নিম্নবিত্তের মুসলমানেরও তেমনি লেখাপড়ার ঐতিহ্যই ছিল না।

ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুর নতুন বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে অর্থাগম হ'ল অপরিমেয়। বিত্তশালী শ্রেণী গড়ে উঠল তাদের নিয়ে। অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা রইল অভিন্ন। তাদের দারিদ্র্যদুঃখ বাড়ল ভিন্ন কারণে। গ্রামীণ কৃষি-শিল্পজাত পণ্য বিনিময় (Bartar) নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের প্রভাবে মুদ্রা বিনিময় (Money currency) রীতিতে পরিবর্তিত হওয়াতে আর্থনীতিক কাঠামোতে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া দেশের কৃষি-শিল্প নিয়ন্ত্রণের সাম্রাজ্যিক নীতির ফলে নিত্য-প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হয় তারা। এভাবে আয়ের পথ হল রুদ্ধ—ব্যয়ের পথ হল বিস্তৃত। তাই দারিদ্র্য হল ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে বুর্জোয়া রাজত্বে ইংরেজি জানা হিন্দু দালাল-মুৎসুদ্দী-বেনিয়ান-চাকুরে বেতন, ঘুষ ও সুদের আকারে কাঁচামুদ্রা অর্জন করে ঐশ্বর্যবান হতে থাকে যখন, তখন বিদেশাগত মুসলমানের স্বল্পসংখ্যক বংশধর ছোট লোকদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৈত্রিক-সম্পত্তি-নির্ভর নিশ্চিন্ত জীবনযাপনে মশগুল। কাজেই উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মতো বহিরাগত উচ্চবিত্তের মুসলমানও যে কোম্পানী রাজত্বের প্রসাদ পেয়ে ধনী-মানী শ্রেণীরূপে গড়ে উঠতে পারত, সে-সম্ভাবনা হল তিরোহিত। তাদের ঔদাসীন্যে হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীই কেবল গড়ে উঠল—হিন্দু-মুসলিম মিশ্র বুর্জোয়া শ্রেণী আর গড়ে উঠতে পারল না। এবং এই শ্রেণীতে মুসলিম নামধারীর অনুপস্থিতিই ছিল ধর্মীয় স্বাজাত্যগর্বী বাঙালি মুসলমানের ক্ষোভের কারণ। কিন্তু বহিরাগত মুসলিম অবতাংসরা বুর্জোয়া বিত্তের অংশ পেলে দেশী মুসলমানের বাস্তব ও বৈষয়িক কী উপকার হত—কেবল জাতীয় গৌরব-গর্ব করবার মতো নির্বোধ আত্মপ্রসাদ পাওয়া ছাড়া। যে-কয়টি পরিবার ইংরেজ আমলের দু'শ বছর ধরে জমিদার হিসেবে টিকে ছিল, তারা দেশী মুসলমানের শিক্ষা বিস্তারে কী সহায়তা করেছে, স্কুল-কলেজ গড়েছে কয়খানা, ছাত্রবৃত্তি দিয়েছে কয়টি! অবশ্য পার্থিব নেতৃত্ব এবং অপার্থিব পুণ্য অর্জনের জন্য দান করেছে প্রচুর-লিল্লাহ দিয়েছে বটে। এরাই আরব-ইরানের খোয়াব দেখিয়ে, সমরকন্দ-বোখারার স্মৃতি জাগিয়ে, উর্দুর মহিমা কীর্তন করে স্বস্থ হতে দেয় নি বাঙালি মুসলমানকে। বারবার বহির্মুখো ও ছিন্নমূল করবার সচেতন প্রয়াসে তারা দেশী লোকের অগ্রগতির পথ করেছিল রুদ্ধ; দৈশিক জীবন-চেতনা প্রসারে দিয়েছিল বাধা। সে-প্রয়াসে আজো তাদের বিরতি-বিরাম নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব মুসলিম শাসনকালে বিদেশাগত মুসলিম চাকুরে ও অভিজাতদের দ্বারা দেশী মুসলমানের কী উপকার হয়েছিল, আর ইংরেজ আমলে এদের তমঘা, আইমা মদদ-ই মাশ ও জমিদারী বাজেয়াপ্তির বা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলমানের কী ক্ষতি হল, তা আজ খুঁটিয়ে দেখবার-বুঝবার প্রয়োজন আছে। নতুবা স্বধর্মীকে স্বজাতি মনে করে অভিন্ন স্বার্থের সুবাদে আস্থা রাখার বিড়ম্বনা কখনো ঘুচবে না।

1. Syed Ameer Ali; 'A' Cry from the Indian Mohammedans' Nineteenth Century, London. August 1882, PP 199-200 as quoted by Dr. Muin-ud-Din Ahmed Khan, Islamic Studies P.P. 284 Journal of the Islamic Research Institute of Pakistan Vol. VI no 3 for September, 1967.
2. Dr. A. R. Mullick—British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856. Asiatic Society of Pakistan Publication 1961, Dacca P. 48.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তা

১

দার্শনিক পরিভাষায় প্রতিটি মানুষ হচ্ছে বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা। সামান্য তাৎপর্যে, দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, নীতি ও আদর্শের অভিন্নতা যেমন বিশেষ দেশ, ধর্ম ও রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষকে অদ্বৈত বর্ণে ও গুণে প্রতীয়মান করে ; তেমনি আবার ঘরের, দেশের, সমাজের, ধর্মের কিংবা আদর্শের প্রভাব প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র রাখে। বর্ণে ও অবয়বে, চলনে ও বলনে কিংবা স্বভাবে ও আচরণে যেমন প্রতিটি মানুষ অনন্য, তেমনি আবার আপাত অভিন্ন জীবন-রীতি মানুষকে করেছে সমষ্টির নিরূপ অংশ। প্রথমটির নাম ব্যক্তিত্ব (Personality) এবং দ্বিতীয়টি জাতিত্ব (Nationality)। এভাবে ব্যষ্টি (individual) নিয়ে গড়ে উঠে সমষ্টি (Nation)। অতএব, প্রতি মানুষের রয়েছে এই দ্বৈতসত্তা। একটি ব্যক্তিসত্তা, অপরটি জাতি-পরিচয়। একটির জন্যে অপরটি অস্বীকার বা অবলুপ্ত করবার প্রয়োজন হয় না। একাধারে এই দ্বৈতসত্তার নির্দ্বন্দ্ব সহাবস্থান বা সংস্থিতি সম্ভব। এ জাতীয়তা অবশ্যই অভিন্ন দেশ, ধর্ম, ভাষা ও সমাজ ভিত্তিক।

আধুনিককালে অভিন্ন গোত্র, ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও ভৌগোলিক সংস্থান নিয়ে যেসব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেখানকার সমস্যা ভিন্নতর। সেখানে দ্বন্দ্ব জনকল্যাণ সম্পর্কিত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত। আর বিভিন্ন গোত্র, ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও ভৌগোলিক-চেতনা ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা মূলত রাষ্ট্রিক-চেতনাজাত অভিন্ন জাতির পরিচয়, বিশ্বাস ও সংস্কার দৃঢ়মূল করার উপায় ও প্রয়াস-পদ্ধতির। আজকের পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র ও এ অসমাধ্য সমস্যায় পীড়িত। বস্তুত এ সমস্যা এ যুগেরই। আগের কালে রাজা-প্রজার সম্পর্ক ছিল শাসক ও শাসিতের, প্রবলের ও দুর্বলের, শোষক ও শোষিতের, সেজন্যে সে-যুগে এ সমস্যা ছিল না। শাসকের শক্তির তারতম্যে রাজ্য-সাম্রাজ্যের স্থিতি ও ভাঙা-গড়া চলত। এ যুগ গণতন্ত্রের ও জাতীয়তার এবং রাজ্যের নয়—রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রে প্রতি মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের স্বীকৃতিতে জাতি-চেতনা ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও স্থিতি। অনেকাংশে এ এক সমবায় সংস্থা। এজন্যেই একক অভিন্ন জাতি-চেতনায় জাতীয়তাবোধ না জন্মালে, এ যুগে কোনো রাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় বাস করা ও স্বাভাবিক আনুগত্য রাখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই রাষ্ট্রমাত্রেই হবে mono-national state—এক জাতি এক রাষ্ট্র।

উনিশ শতকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কৃত্রিম জাতীয়তা সৃষ্টির প্রয়াসে য়ুরোপ-আমেরিকায় বহু রক্তারক্তি হয়ে গেছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ প্রয়াস নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ শতকে আবার তার পুনরাবৃত্তি চলছে আফ্রো-এশিয়ায়। হয়তো কেবল পরিণামে ব্যর্থ হবার জন্যেই।

আবার এর উল্টো সাধনাও লক্ষ্য করি— দেশ ভাগ করে জাতি-চেতনাকে খণ্ডিত করার অভিনব অপপ্রয়াস—সিরিয়া, কোরিয়া, জার্মানী, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্মর্তব্য।

এই উভয়বিধ অপপ্রয়াস চলছে রক্তের অভিন্নতার প্রমাণে, ভৌগোলিক অবিচ্ছেদ্যতার যুক্তিতে অথবা আদর্শের ধ্বনি তুলে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কিংবা আর্থনীতিক প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখিয়ে। আসল কারণ শাসন-শোষণের লোভ। নইলে বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজনে এক প্রকারের যুক্তি, আর সংহতির-বাঞ্ছায় বিপরীত যুক্তি একই কালে একই মুখ দিয়ে বের হতে পারত না। তাই কোথাও রক্ত, কোথাও ভাষা, কোথাও ধর্ম, আবার কোথাও আদর্শ কিংবা অর্থনীতি গুরুত্ব পাচ্ছে। দুষ্টবুদ্ধি প্রসূত না হলে নীতির ও যুক্তির এ অসঙ্গতি থাকত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

আমাদের পাকিস্তানও এ সমস্যার স্বীকার। বৃটিশ আমলে হিন্দুর পীড়নজাত প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতে মুসলমানেরা ধর্মীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। এর ফলে গড়ে উঠে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র। কিন্তু এখন পরিবর্তিত পরিবেশে আগের আবেগ ও স্বপ্ন অবলুপ্ত। তাই নতুন করে দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবোধ সুষ্ঠু করার প্রয়োজন।

ধর্মীয় অভিন্নতাই পাকিস্তানী জাতীয়তার একমাত্র ভিত্তি। শাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিষম-নীতি অনুসৃতির ফলে কেবল ধর্মীয় বন্ধন জাতীয়তার ভিত দৃঢ় রাখতে পারছে না। প্রবল পক্ষের প্রতি দুর্বল পক্ষের বর্ধিষ্ণু বিরূপতা রোধ করবার প্রয়াসে তাই সমাজ-সংস্কৃতির অভিন্নতা প্রমাণের অপচেষ্টা শুরু করেছেন সবল পক্ষ।

রাজনীতিক স্বার্থে গড়ে উঠেছে স্ব-ধর্মভিত্তিক এ জাতীয়তা। প্রীতিপ্রসৃত নয় বলেই আত্মরতি হয়েছে প্রবল। শাসক-শাসিত তথা পীড়ক-পীড়িত সম্পর্কের উচ্ছেদ সাধন করে সাম্য ও সমদর্শিতার ভিত্তি রচনায় তাই আগ্রহ নেই তাঁদের। শোষণ কায়েম রাখবার কুমতলবে তাঁরা শোষণ ও সম্প্রীতির ভারসাম্য স্থাপনে প্রয়াসী। এজন্যে তাঁরা এককালে একক ভাষার ফজলিয়ত বয়ান করেছেন, তারপর চালু করতে চেয়েছেন অভিন্ন হরফ, তারও পরে শুরু করেছেন আরবি-ফারসি শব্দের মহিমা প্রচার। এ সঙ্গে রয়েছে বর্ণ ও বানান সংস্কারের জিকির। নায়ক রয়েছেন নেপথ্যে। ছদ্মনায়ক সেজেছেন যাঁরা, তাঁরা সব আমাদের ঘরের লোক। তাই যন্ত্রী ও যন্ত্র-চালিতের পার্থক্য বোঝা কঠিন। বিড়ম্বনাও বাড়ছে এজন্যেই। শিক্ষিত সরলজনেরা তাই বিভ্রান্ত কিংবা বিমূঢ়।

তবু কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব যে বর্ণে-অবয়বে, মনে-মেজাজে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আহার্যে-পোশাকে, আচার-আচরণে, ভাষায়-সংস্কৃতিতে—এককথায় জীবন-চর্যার সর্বক্ষেত্রে যে পার্থক্য ঘটায় তা ঢাকা দেবার জন্যে তাই এবার সেই পুরোনো জিকির আবার শুরু হয়েছে—পাকিস্তান হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানের জন্যেই, ইসলাম দেশ-কাল-জাত-জন্মের পার্থক্য স্বীকার করে না। অতএব, সারা পাকিস্তানে মুসলমানের জীবন-চর্যা হবে অভিন্ন। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে যা নেই, পূর্ব পাকিস্তানে তা চলবে না—চলা উচিত হবে না। কেননা, পশ্চিম পাকিস্তানীরা হচ্ছে আদমের আমল থেকেই মুসলমান আর পূর্ব পাকিস্তানীরা হচ্ছে ইসলামোত্তর যুগের দীক্ষিত মুসলমান! কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানীর অভিভাবকত্বে চলবে পূর্ব পাকিস্তানীর মুসলমানী জীবন। পশ্চিম পাকিস্তানের পাকা মুসলমানেরা যা কিছু করে, তা-ই হবে পূর্ব পাকিস্তানের অনুকরণীয়—কেননা এই কাঁচা মুসলমানের জন্যে তা-ই শ্রেয়। অতএব, রবীন্দ্রতিথি, বসন্তোৎসব কিংবা নববর্ষ বেদাৎ বলেই মুমীনের পরিহার্য। বাঙলাদেশ, বাঙলা ভাষা, বাঙালি প্রভৃতি আমল-ই-জাহিলিয়তের নামগুলো ভুলে যেতে হবে। সত্যের আলোক প্রাপ্ত মুমীন বলবে—পাকিস্তান, পাকজবান, পাকিস্তানী। মুসলমান হওয়া কি যেমন-তেমন কথা! মুসলমান করার ও মুমীন রাখার মহান ব্রত ও দায়িত্ব নিয়েই পাক সরজমিনে গড়ে উঠেছে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামের অছি-সরকার। এ-ই যদি না হল তাহলে যে সবই বৃথা!

কথাগুলো শুনতে বিদ্রূপাত্মক বটে, কিন্তু এসব হাস্যকর যুক্তিই অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর ভাষায় উচ্চারিত হয়। অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও সরল লোকেরা শুনে মুগ্ধ হয়, চরিত্রবান অক্ষম দেশহিতৈষীরা বেদনাবোধ করে, আর বিষয়ীরা এর থেকে ফায়দা উঠায়।

কিন্তু এ যুগে এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ানোর কোনো কারণ ছিল না। কেননা, সমস্বার্থে মিলিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সহ-অবস্থান করা এ যুগেই সম্ভব ও সহজ। বলতে গেলে এ যুগ কেবল জাতীয়তার নয়—আন্তর্জাতীয়তারও। ভৌগোলিক দূরত্ব, গোত্রীয় বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষার পার্থক্য ও ধর্মীয় প্রভেদ এ যুগে মিলনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। সৌজন্য, সমদর্শিতা ও সমস্বার্থের ভিত্তিতে আজকাল পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তের লোকও একরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় একক জাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে তুলতে পারে। আবার দুষ্টবুদ্ধি যে একক দেশ ও জাতিকে সহজেই বিভক্ত করতে সমর্থ তা আগেই বলেছি।

৪

আবার এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ছিদ্রপথে আরো ক্ষতিকর বিভ্রান্তির প্রসার ঘটছে। আমাদের রাষ্ট্রবাসীরা সুযোগ-সুবিধে মতো কখনো ইসলামী জাতীয়তার, কখনো বা রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার অঙ্গীকারে চলে। এমনকি গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাও চেতনার গভীরে ক্রিয়াশীল। তাই প্রায় প্রতি নাগরিকই এই দ্বৈতসত্তার পীড়ায় অসুস্থ। ফলে পাঠান-বালুচ-সিন্ধি-পাঞ্জাবি বাঙালি সত্তার সঙ্গে কখনো মুসলিম-চেতনার কখনো বা পাকিস্তানী-চেতনার যোগে-বিয়োগে রাষ্ট্রিক জাতীয়তা দৃঢ়মূল হবার অবকাশ পাচ্ছে না। প্রত্যয় ও অঙ্গীকারের মেল-বন্ধন না হলে সমস্যার সমাধান নেই।

মনকে চোখ ঠাওরিয়ে যদি গোঁজামিলে মিলনসেতু তৈরি করি, কিংবা ফাঁকি দিয়ে ফাঁক পূরণ করি, তাহলে 'না-ঘরকা না-ঘাটকা'-চেতনা প্রশ্রয় পাবেই এবং তাতে রাষ্ট্রিক স্বার্থ ব্যাহত হবেই।

অজ্ঞতা, অন্ধতা ও ভাবাবেগ মানব-চৈতন্যের স্থায়ী অবস্থা নয়, কাজেই অবাস্তব-অযৌক্তিক কিছু বেশিদিন টেকে না। সে-যুগ আর নেই, যখন ইসলাম-বিদ্বেষী কামাল আতাতুর্ক ছিলেন পাক-ভারতীয় মুসলমানের চোখে জাতীয় বীর ও ইসলামের ত্রাণকর্তা। তিনি কোরান, মসজিদ ও আরবি-অসহিষ্ণু হলেও তাঁকে নিয়ে স্বধর্মীর গৌরব-গর্বে ও এদেশের মুসলমানের মাতামাতির অন্ত ছিল না। প্যান-ইসলামী সে-আবেগ আজ বিলুপ্ত। তাই খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলো তো বটেই। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও—মিশর, মরোক্কো, সুদান, আলজিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতিও ধর্মীয় আবেগ থেকে মুক্ত। আজ দুনিয়ার সব রাষ্ট্রই ধর্মভিত্তিক নয়—রাষ্ট্রসীমা ভিত্তিক জাতীয়তায় আস্থাবান এবং এ অঙ্গীকারেই সমৃদ্ধিকামী।

আমাদের ছাত্ররা দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য-গ্রন্থে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার এই বিভ্রান্তিকর দ্বৈতবোধই লাভ করে। ফলে তাদের জাতীয়তাবোধ প্রয়োজনানুরূপ ঋজু, পষ্ট ও দৃঢ় হয় না। এ জাতীয়তাবোধের ভিত্তি চোরাবালি, ফলত রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক।

ধর্মীয় জাতীয়তায় আস্থা রাখলে, ইরানী, আফগানী প্রভৃতি যে-কোন বিদেশী স্বধর্মীর শাসনে এ দেশের লোক নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করবে, যেমন তুর্কী-মুঘল আমলে দেশী মুসলমানরা শাসকের স্বাধর্ম্য গর্বে খুশি থাকত। আজকের জগতে এহেন নির্বোধ আত্মপ্রসাদ কাম্য কি! অতএব, তুর্কী-মুঘল আমলে দেশী মুসলমান স্বাধীন ছিল কি-না, গৌড়ের স্বাধীন সুলতানী আমল বাঙালিরও স্বাধীনতার যুগ কি-না, মুঘল সুবাদার আলীবর্দী-সিরাজদ্দৌলার শাসন বাঙলাদেশে বাঙালির স্বরাজের প্রতীক কি-না বিচার-বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় এসেছে।

আরো একটি ভাববার কথা আছে। বিধর্মীর সঙ্গে রাষ্ট্রিক যুদ্ধে যেহাদী-প্রেরণা-পন্থা গ্রহণ করলে স্বধর্মীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে কোন্ প্রেরণা কাজ করবে? মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ দৃঢ়মূল হলেই মানুষ স্বদেশের স্বার্থে সর্বাবস্থায় সংগ্রামী প্রেরণা পায়। কাজেই আশুপ্রয়োজন মিটানোর জন্যে জাতীয়তাবোধের মতো অতি গুরুতর ধারণার সংকোচন-প্রসারণে যথেচ্ছ অপব্যবহার পরিণামে অহিতকর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা

প্রত্যেক মানুষেরই চলনে-বলনে-করনে নিজের মনের মতো নীতি-পদ্ধতি রয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, প্রত্যেকেরই জীবনে স্ব স্ব পছন্দসই মত ও পথ আছে। এর সাধারণ নাম 'আদর্শবাদ'। Men are born-Philosophers বলে যে-কথাটি চালু আছে, তার সোজা অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যেক মানুষই স্ব স্ব জগতে ও জীবনে দার্শনিক। এ দৃষ্টিতে দেখলে, কোনো আদর্শই মিথ্যা বা নিরর্থক বলে মনে হবে না। কাজেই প্রত্যেক আদর্শেরই ব্যক্তিক, স্থানিক ও কালিক উপযোগ থাকে। এ সূত্রেই স্বীকার করতে হয়, যে-কোনো আদর্শেরই সর্বজনীন ও শাশ্বত হবার যোগ্যতা নেই। এ কারণেই যুগে যুগে দেশে দেশে আদর্শবাদের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে।

আগেই বলতে চেয়েছি, আদর্শবাদ একান্তই উপযোগ-ভিত্তিক। এবং সে-উপযোগ কোনো অবস্থাতেই মানুষের বিচিত্র প্রয়োজনানুগ হতে পারে না। কেননা, এমন কোনো একক আদর্শ থাকা সম্ভব নয়, যা জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রসূ। প্রয়োগ, প্রয়োজন এবং স্থান-কাল-ব্যক্তি ভেদে এর ফলাফলও বিভিন্ন ও বিচিত্র। কাজেই কোনো আদর্শই নিরঙ্কুশ কিংবা নির্ভেজাল ভালও নয়, মন্দও নয়। অতএব, আদর্শবাদের ক্ষেত্রে কোনো কিছু চরম কিংবা পরম বলে মনে করা কেবল অবাঞ্ছিত নয়, অকল্যাণকরও। এমনকি আল্লাহর দান—রোদ-বৃষ্টিও সব সময় সবার কাছে অভিপ্রেত নয়।

একটি দৃষ্টান্ত নিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। শারদীয় কিংবা বাসন্তী জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। তবু যে-ছেলেকে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে,—জ্যোৎস্না যতই পর্যাপ্ত ও আকর্ষণীয় হোক না কেন—তাকে ঘরের কোণে দীপের আশ্রয় নিতেই হবে। বাহ্যত চাঁদে আর দীপে তুলনাই হয় না। তবু এ ক্ষেত্রে কেউ যদি ছেলেটিকে রুচিহীন নির্বোধ মনে করে, তা হলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হবে।

প্রতিবেশ ও প্রয়োজনমত আদর্শবাদের পরিবর্তন যে হয় বা হতে যে পারে তার আভাস একটি হাদিসেও আছে: "তোমরা এখন এমন এক কালে আছ, যখন যেসব বিধি-নিষেধ তোমাদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, তার দশভাগের একভাগ অমান্য করলেও তোমরা ধ্বংস হবে, কিন্তু এমন যুগও আসবে, যখন এসব আদেশ-নির্দেশের দশভাগের নয়ভাগ অবহেলা করলেও তোমরা মুক্তি পাবে।"

মূলত একটি অপরটির পরিপূরক হলেও আগেকার দিনে ধর্মাদর্শ, সমাজাদর্শ নৈতিকজীবনাদর্শ ও শাসনাদর্শের মধ্যে বাহ্যত সমন্বয়-সামঞ্জস্যের রূপ প্রায়শই প্রকট হয়ে উঠত না। তার কারণ, হয়তো তখনো বিজ্ঞতর মানুষেরও জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে পূর্ণদৃষ্টি ও সামগ্রিক ধারণার অভাব ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজান্দোলন ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে, মানুষের মধ্যে ক্রমে জীবনযাত্রার নানাক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড জীবনচর্যার বোধ জন্মেছে। ফলে সামগ্রিক জীবনবোধ যেমন জেগেছে, তেমনি আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন প্রচেষ্টার ঐক্যসূত্র।

আগেকার অবস্থায় তাই গড়ে উঠেছিল ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিততন্ত্র, এবং সমাজের সঙ্গে মাতব্বরতন্ত্র; আর দেশ হয়েছিল রাজার রাজ্য। তাই এগুলো মূলত মানুষের জীবন-নিয়ন্ত্রী সংস্থা ও শক্তি হলেও ঐক্য ও সহযোগিতার অভাবে কোনো কোন ক্ষেত্রে প্রায়ই দ্বান্দ্বিকশক্তিরূপে দেখা দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই রুশোর 'সামাজিক চুক্তি'—যতই অপ্রাকৃত বোধ হোক,— মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার পথে যুগান্তকর উপলব্ধি। এতে মানুষের বোধের ক্ষেত্র হয়েছে প্রসারিত, জীবনের পরিপূর্ণ রূপ জানবার ও বুঝবার উদ্যম হয়ে উঠেছে দুর্নিবার।

এ বোধের সুসন্তান গণতন্ত্র। ব্যষ্টি দিয়ে সমষ্টি এবং ব্যষ্টির প্রয়োজনে সমাজ, ব্যষ্টির প্রয়োজনেই ধর্ম আর ব্যষ্টিস্বার্থে শাসন-সংস্থার প্রয়োজন—এ বোধ মানুষের অগ্রগতির মূল ভিত্তি। তা হলে ব্যষ্টির তথা ব্যক্তিক স্বার্থ সংরক্ষণই অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন বিকাশের সুযোগদানের মৌল স্বীকৃতিই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ।

অতএব কথা দাঁড়ায় : ব্যক্তিক জীবনে নিরাপত্তা ও সুযোগ লাভের জন্যেই মানুষ সমাজ গড়ে তুলেছে এবং ব্যক্তিক জীবন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রণের জন্যেই ধর্ম-বিধির গরজ বোধ করেছে। আর ব্যক্তিক জীবন উপভোগের ও বিকাশের সহায়রূপে গঠন করেছে শাসনসংস্থা তথা রাষ্ট্র। এ যদি সত্য হয়, তা হলে এসব প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ব্যষ্টির জীবন-যাপনে সুযোগ ও সহযোগিতা প্রাপ্তি। অতএব স্বীকার করতে হয়, সমাজ-সংস্থা, ধর্ম-বিধান কিংবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হচ্ছে মূলত ও লক্ষ্যত সমবায় সমিতি। ব্যক্তিক সুযোগ লাভ ও পারস্পরিক সহযোগিতা দানই এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এ দৃষ্টিতে দেখলে পারস্পরিকতাই (Reciprocity) সব কিছুর ভিত্তি বলে সহজেই উপলব্ধ হবে। এই পারস্পরিকতা হবে— ব্যক্তিক সুযোগ লাভের বিনিময়ে সামষ্টিক সহযোগিতা দান। অতএব, প্রতিজ্ঞাগুলো এরূপ দাঁড়ায় : ব্যষ্টির জন্যে সমাজ এবং সমাজের জন্যে ব্যষ্টি, ব্যষ্টির স্বার্থে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের জন্যেই ব্যষ্টি (People for the state and state for the people)। অন্যকথায়, ব্যষ্টির সমষ্টিতে সমাজ এবং সমাজের একতম সদস্য ব্যষ্টি। জনস্বার্থেই জনগণের জন্যে জনগণের সমবায়েই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র।

অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসক-শাসিত বলে কোনো শ্রেণী নেই। জনগণের হাতেই রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। এ অর্থেই রাষ্ট্র হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠান আর রাষ্ট্র-সংস্থা তথা সরকার হচ্ছে জনচর্যার প্রতিরূপ। অন্যকথায়, জনমানস লালন ও নিয়ন্ত্রণ এবং জন-আচরণ নিয়ন্ত্রণ আর জনস্বার্থের রক্ষণ ও পোষণই এর দায়িত্ব। তা হলে রাষ্ট্রই জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রতীক। জীবন বলতে ব্যষ্টির ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা বুঝায়, —যা বিকাশোন্মুখ এবং স্বচ্ছন্দ বিহার প্রয়াসী। কাজেই যা ব্যক্তিজীবনের বিকাশে, প্রসারে ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রয়াসী, তা-ই গণ-সরকার। বেঁচে থাক এবং বাঁচতে দাও, আর ভাল হও এবং ভাল চাও— এই হচ্ছে এর মৌল নীতি। এ ভাবে এ উদ্দেশ্যে আর এই নীতিতে গণ-জীবন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনই গণ-সরকারের ব্রত। যেহেতু গণ-গরজে, গণ-স্বার্থে ও গণ-নির্দেশেই সরকার পরিচালিত হয়, সেজন্যে জনগণের সাধারণ (Common) ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্র সংস্থার নীতি ও কৃতির মাধ্যমেই রূপায়িত হয়। কাজেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আলাদা ধর্মীয়, সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ-চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রই যখন জীবন-জীবিকার প্রতিভূ এবং প্রতীক, তখন সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে সেই আদর্শ একান্তই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শানুগ তথা গণতান্ত্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কেননা ব্যক্তিস্বার্থে ও আদর্শে কোনো বিরোধ নেই। মৌল ও বৃহত্তর অর্থে যা ব্যষ্টির তাই রাষ্ট্রের আর যা রাষ্ট্রের তাই ব্যষ্টির। এ উপলব্ধি থেকেই আজকাল কেবল সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্রের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে গণ্য হয় না, নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও সমগুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্যেই সার্বভৌমত্বের অভিযান ত্যাগ করে কোনো কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জনকল্যাণের খ্যাতিরে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বা যৌথ সংস্থাও গঠন করেছে। বিশেষ দৃষ্টিতে UNO-ও রাষ্ট্র কল্যাণের বনামে জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান।

এখন একটি কঠিন প্রশ্ন জাগছে : রাষ্ট্রের আদর্শ নির্ণয় ও নির্ধারণ করবে কে? যাঁরা ভোট পেয়ে রাষ্ট্র পরিচালক হন তাঁরা, না যারা ভোট দেয় সেই জনসমাজ? এর সহজ জবাব হয়তো এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যেহেতু জনসাধারণ তাদের পছন্দসই লোককে রাষ্ট্র পরিচালনের ভার দেয়, অর্থাৎ তাদের পক্ষ হয়ে চিন্তা ও কর্ম করবার দায়িত্ব অর্পণ করে, অন্যকথায় তাঁদের রাষ্ট্রিক চিন্তায় ও কর্মে প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার দেয়, সেজন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রাদর্শ নির্ধারণ ও শাসন পরিচালন ব্যাপারে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী। আপাতদৃষ্টিতে এ জবাব যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও এ একান্তই স্থূলবোধ প্রসূত। কেননা, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি নির্বাচকরা শিক্ষিত হলেও প্রয়োজনানুরূপ দায়িত্ব সচেতন ও চৌকশ নয় এবং নির্বাচিত ব্যক্তি মাত্রেই যোগ্য নয়। কাজেই এ ব্যাপারে ভোটাধিক্যে গুরুত্ব দেয়া যাবে না, মেধা-মাহাত্ম্যে তথা মনীষাকেই মূল্য দিতে হবে। তাহলে সমাজের চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, মনীষী প্রভৃতি গুণী-জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মতামতকে জনমত বলে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হয়। এঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এই যে এঁরা বাক-চাতুর্যে, চিন্তার প্রাখর্যে, বুদ্ধির দীপ্তিতে দূর ও অখণ্ড দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বর্তমানের স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের দিশা সহজেই খুঁজে পান, আর সহজেই মন ও মত গঠন করতে পারেন। জনমত সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনে বা বিনষ্ট করণে, কিংবা সভা, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে বা ভাঙনে এঁদের জুড়ি নেই। এঁরা যথার্থ অর্থে 'জনগণ মন অধিনায়ক'। পৃথিবীর ইতিহাস-ধৃত চিন্তানায়কগণের কথা স্মরণ করলেই এর যাথার্থ্য বোঝা যাবে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই দেশের ঐতিহাসিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি গুণী-জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীদের অবাধ চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

পাকিস্তানে একজন রাষ্ট্রপতি একবার এর ন্যায্য গুরুত্ব উচ্ছ্বাসবেশে উচ্চারণ করেছিলেন :

> "Feel free in your mind , act freely in your expression and react freely to the environments around you. Let not the edge of your sensitivity be blunted by any sense of fear or expediency. On my behalf I cannot do better than assure you in the spirit of Voltair, that I may differ, even protest, against what you say but I will defend your right to say it unless it is directed against the very existence of our homeland."

এ উদাত্তবাণী কেবল শ্লাঘ্য নয়, যুগান্তকরও। এ নীতি সরকার কর্তৃক অনুসৃত হলে জীবনে ও সমাজে শান্তি ও মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য আসত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ আমলে মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্র

পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয় মুখ্যত সূফী সাধকের দ্বারা। ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর কোরআনের ইসলামের উপর ইরানী অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রভাব পড়ে সুপ্রচুর। কোরআনের ইসলামের মূলকথা : স্রষ্টা ও সৃষ্টি আলাদা, পরস্পরের সম্বন্ধ হচ্ছে বান্দা ও মনিবের। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মেনে চলাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তি অনিবার্য। আল্লাহ্‌র দেয়া বিধি-নিষেধও কোনো অধ্যাত্ম-জীবনের ইঙ্গিত বহন করে না, তা একান্তভাবেই মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কিত। কাজেই কোরআনের শিক্ষায় কোথাও কোনো অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালি নেই। সূফী মতবাদে কিন্তু বান্দা-মনিব সম্পর্কটি প্রায়ই অস্বীকৃত হয়েছে এবং ঘোষিত হয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে— পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রণয় সম্পর্ক। এর পরিণাম দ্বৈতাদ্বৈতবোধে। অথচ ইসলামের মৌল কথা 'দ্বৈতবাদ'। ফলত 'ইসলাম' আর 'মুসলমানধর্ম' এক থাকে নি। পাক-ভারতে এই মুসলমান ধর্মই প্রচলিত হয়েছিল, তার উপর শিয়ামতবাদও এখানে অপ্রচলিত ছিল না।

জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত, আর প্রচারক ছিলেন পীর-দরবেশ, কাজেই যুক্তি প্রয়োগে নয়—কেরামতি, সামাজিক-সাম্য ও ভাবালুতা সম্বল করেই প্রচারিত হয়েছিল ইসলাম। তাই অধ্যাত্ম মহিমামুগ্ধ তত্ত্বপ্রবণ মনে ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা বিশেষ সক্রিয় হতে পারে নি : যেমন শিয়া, ইসমাইলী সম্প্রদায় কিংবা চিশতিয়া-আদি সূফী খান্দানীদের ধর্মবোধ আজো পীরকেন্দ্রী। 'মারফত'-পন্থ নামে চিহ্নিত করে ইত্যাকার মতবাদকে শরীয়তী-ইসলামেরও উপরে স্থান দেয়া হয়েছে।

ফলে পাক-ভারতের দীক্ষিত মুসলমান কোনোদিন দৃঢ়-প্রত্যয়ী মুসলিম হতে পারে নি। তাই নানক-কবীর-চৈতন্যের মাহাত্ম্য-মুগ্ধ মুসলমান ইসলাম ছেড়ে তাঁদের শিষ্য হয়েছিল। যারা রইল, তারাও পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার পুরো ত্যাগ করতে পারে নি।[১]

তাই বাঙলা দেশে আমরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত সত্যপীর, বনবিবি কালুগাজী, ওলাবিবি প্রভৃতি মুসলিম-পূজ্য উপদেবতা পাচ্ছি। এভাবে পাক-ভারতে একপ্রকার লৌকিক ইসলাম দাঁড়িয়ে যায়। মাদার-পন্থী ফকিরেরা ও শাহ্ বু-আলি কলন্দরের 'যোগমার্গ' আরো বাড়িয়ে দিল এ-বিকৃতি। যোগপন্থী দেহাত্মবাদী বাউল-বিকৃতিও মুসলিম সমাজকে পেয়ে বসেছিল। একে তো মুসলমান শাসকজাতি—শাসিত সম্প্রদায়ের তুলনায় ঐশ্বর্যবান—সবক্ষেত্রে ধনে না হোক, মানে ও মনে তো বটেই! তাই আবার ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার একান্ত অভাব। কাজেই বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল প্রকট ও প্রবল। আকবরের আমলে রাজশক্তির প্রশ্রয়ে তা আরো বেড়ে গেল। আকবরের রাষ্টচেতনা ছিল সে যুগের পক্ষে অভিনব। তিনি রাজ্যের স্থায়িত্বের খাতিরে এক-জাতিতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে স্বধর্ম ও সংস্কৃতি ত্যাগ করলেন। সম্রাটদের মধ্যে তিনিই প্রথম দাড়ি চাঁছলেন, রাজপুতদের মতো পোশাক পরলেন, দরবারে নানা হিন্দুয়ানী তথা রাজপুত আচার চালু করলেন আর সামাজিকভাবে হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক পাতলেন।

---

১ ক. জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য—ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ. ২৫-২৬।

খ. বাঙলার সূফী সাহিত্য—বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত

গ. পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইলাহি' মত আসলে 'একজাতি এক রাষ্ট্র'-তত্ত্বের বাস্তবায়নের উপায়রূপেই পরিকল্পিত। না-ব্রাহ্মণ্য, না-ইসলামী আবহাওয়ায় মানুষ হলেন জাহাঁগীর। ফলে মুসলিম প্রজা-সাধারণের মধ্যে ধর্মানুরাগের অভাব লক্ষ্য করে কিছু সংখ্যক আলেম বাদশাহ্র ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করলেন মোজাদ্দেদ-ই-আল্‌ফিসানি শেখ আহমদ সিরহিন্দ। এ আন্দোলন পুরুষ পরম্পরায় চলেছিল এবং সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তাঁরই ভাবশিষ্য ছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ। এঁর সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানবুদ্ধি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রবোধের একটি আশ্চর্য সুন্দর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিল। কিন্তু পতন-যুগের শিথিল-চরিত্র মুসলমান সমাজে তা বিশেষ কার্যকর হয়নি। তারপর কিছুকালের মধ্যেই ঘুণে-ধরা রাষ্ট্রশক্তির পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। একদিন বাঙলা-বিহারে দণ্ডধর হল বিদেশী বেনে-শক্তি। ভারতের সর্বত্র ক্রমে খসে পড়তে লাগল দেশী শাসন-দণ্ড। তা পড়ল বটে; কিন্তু মুসলমান চরিত্র হারালেও মর্যাদা ও অভিমান হারায় নি তখনো। বৃটিশ মুসলমানের এই মনোভাব টের পেয়েছিল গোড়াতেই। তাই কার্যত দণ্ডধর হয়েও তারা নামত 'দেওয়ান'ই রইল বহুকাল। তারা জানত মুসলমান তাদের রাজশক্তি হিসেবে স্বীকার করতে চাইবে না। এরূপ ঘটনা আমরা ইতিহাসে আগেও দেখেছি; মুসলমানেরা তখ্‌ত নিয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেছে, কিন্তু কোনো হিন্দু প্রশ্রয় পায়নি। তাই মালিক কাফুর, গণেশ টিকতে পারেন নি আর জগৎশেঠ-রাজবল্লভ মসনদ দখল করতে সাহস করেন নি।

মুসলমান নিজেদের জীর্ণতার কথা বহুকাল টের পায় নি, যদিও মারাঠা, শিখ ও ইংরেজ কার্যত ভারতের মালিক হয়ে উঠেছিল। যখন টের পেল তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তবু তারা নিঃশেষে ভেঙে পড়ে নি। হৃত রাজ্য ও গৌরব ফিরে পাবার সংগ্রামে তারা মেতে উঠল নতুন উদ্যমে। এবার নেতৃত্ব দিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। ইনি ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র ভাবশিষ্য এবং আরবের সংস্কার-নেতা মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মতবাদে মুগ্ধ। মুসলমান আমলে যা ছিল একান্ত ধর্ম-সংস্কারান্দোলন, তা-ই এখন ধর্মসংস্কারের আবরণে রূপ নিল আযাদী সংগ্রামের। তাঁরও যতটা ইসলামী জোস্ ছিল, রাষ্ট্রনীতিক দৃষ্টি ততটা ছিল না। তাই তিনি ঘরের পাশের বৃটিশকে শত্রু ভাবলেন না, যুদ্ধ করতে গেলেন বালাকোটে ক্ষয়িষ্ণু শিখ-শক্তির বিরুদ্ধে। ভাবী শত্রু শিখ এভাবে হতবল হচ্ছে দেখে সৈয়দ আহমদের প্রতি হয়তো বৃটিশ সহানুভূতিশীল ছিল। পরে নানা সঙ্গত কারণেই ওহাবীরা বৃটিশ বিরোধী হয়। আযাদী সংগ্রামে মুসলমানদের আত্যন্তিক উত্তেজনা দানের জন্যেই তিনি ভারতকে 'দারুলহরব' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সদিচ্ছা ছিল; কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল না। তাই তলিয়ে দেখবার বা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর মোকাবেলা করবার এতটুকু যোগ্যতাও আর মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। যোগ্যতা বা কৌশল ছাড়া কেবল মনের বলে কিংবা গায়ের জোরে কিছু হবার নয়। এই সামগ্রিক দূরদৃষ্টির অভাবে তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম ব্যর্থ হল। যদিও আযাদী-লুব্ধ গাঁয়ের তরুণও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই যেহাদে। স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার আযাদীমত্ত তরুণ। একই কারণে ব্যর্থ হল বাঙলা দেশে তাঁর শিষ্য তীতুমীরেরও সংগ্রাম।

সৈয়দ আহমদ ও তীতুমীরের শাহাদতের পরেও চেষ্টা চলেছিল সংগ্রাম চালিয়ে যাবার। কিন্তু বৃটিশের ভয়ে বিত্তবানেরা ওহাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাদের বিরত হতে হল। কিন্তু ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন তারা ত্যাগ করে নি; ফলে অন্তত বাঙলা, বিহার ও সেকালীন উত্তর ভারতে শরীয়তী ইসলাম দৃঢ়মূল হল। এও একটা বড় লাভ। বাঙলা দেশে এ আন্দোলন বিশ শতকের প্রথম দুদশক পর্যন্ত বেশ প্রবলভাবেই চলেছিল, তার রেশ কোনো কোনো অঞ্চলে—যেমন চাটগাঁয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও উত্তরবঙ্গে এখনো বর্তমান। এ ক্ষেত্রে কেরামত আলী, হাজী শরীয়ৎ উল্লাহ, দুদুমিয়া, ইমামুদ্দিন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখের কৃতিত্ব এবং আহলে হাদীস, শর্ষিনা ও ফুরফুরার প্রভাব স্মরণীয়।[২]

বাঙলা দেশে যাকে 'ফকির বিদ্রোহ' বলে, উত্তরবঙ্গে মজনু শাহর নেতৃত্বে সেই অবাধ লুটতরাজও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশের বা বৃটিশশাসন অস্বীকারের প্রচেষ্টামাত্র। এক শ্রেণীর আলেমের মতে বিজাতি ও বিদেশী রাজের শাসন অমান্য করা ও দেশের বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রাখা মোমেনের কর্তব্যেরই অঙ্গ। মজনু শাহ ও তাঁর অনুচরদের মনে এ শিক্ষাই ক্রিয়া করেছিল। তাই তাদের আচরণ ও কাজের পশ্চাতে এই আদর্শই সক্রিয় ছিল। ঢাকার সরফরাজ খান, বীরভূমের আসাদুজ্জামান খান, মুর্শিদাবাদের উজীর আলী প্রমুখের বিদ্রোহও মুসলমানের আযাদী-উদ্যমের সাক্ষ্য বহন করছে।[৩] আজিমুদ্দিনের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও অর্থপূর্ণ ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, নদীর পাড়-ভাঙার মতই অতর্কিতে যখন আযাদী গেল, তখন মুসলিম মনে জাগল এক অসহ্য গ্লানিবোধ এবং তা-ই লাভ-ক্ষতির পরওয়াহীন বিক্ষোভে, বিরোধিতায় ও সংগ্রামে রূপ পেল।

এদিকে বাঙলাদেশে ইংরেজ সুকৌশলে সরকারি দপ্তর থেকে মুসলিম তাড়ন শুরু করে দিল। এতে শাসন পরিচালনে কোনো অসুবিধেও হল না তাদের। গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলিম নিয়োগ ছিল নিষিদ্ধ। পুরোনো আমলা অবসর নিলে তার পদে হিন্দুই নিযুক্ত হত। নতুন প্রভুর অযাচিত অনুগ্রহে আপ্লুত হিন্দুসমাজ সোৎসাহে ইংরেজিও শিখতে লাগল। ফলে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের দিকে মুসলিম-শূন্য হল সরকারি দপ্তর। কাজেই ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংরেজিকে দরবারি-ভাষা রূপে চালু করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। মুসলিম কাযীর পদও বাতিল হল ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে।

আমরা মুখে যাই বলি না কেন, আসলে লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য চাকরি— এক কথায় লেখাপড়াও বৃত্তিমূলক। চাকরির আশা নেই দেখে অভিভাবকদের কাছে সন্তানদের লেখাপড়ার কোনো গুরুত্ব রইল না, এভাবে লক্ষ্যহীন-ভরসাহীন শিক্ষা চলতে পারে না।

তার উপর ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে জনহিতকর দাতব্য লাখেরাজ 'আয়েমা' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় মুসলমানের শিক্ষার পথও হয়ে গেল রুদ্ধ। এরূপে মুসলমানদের শেষ আশা এবং আশ্রয়ও নষ্ট হল। কাজেই ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে অশিক্ষিত কুলি-কাঙালে পরিণত হল মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা। এভাবে যে দুর্ভাগ্যের দুর্দিন নেমে এল তা সুদীর্ঘ ষাট-সত্তর বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে সুদিনের সূর্যরশ্মি দেখা দিতে থাকে।

পলাশীর প্রান্তরে জয়লাভ করে ইংরেজরা দেশের ভাগ্যবিধাতা হল বটে, কিন্তু তারা এদেশ শাসন করবে কি শোষণ করবে, তা তখনই স্থির করতে পারে নি। মনস্থির করতে পুরো পঁচিশটি বছর লেগেছিল তাদের। অবশেষে সাব্যস্ত হল তারা শাসন ও শোষণ দু-ই সমানে চালিয়ে নেবে।

---

২ এ প্রসঙ্গে
- ক. বিনয় গোপাল রায়ের Religious Movements in Modern Bengal (Islam in Modern Bengal)
- খ. W. Cantwell Smith; Modern Islam in India.
- গ. N. T. Titus; Indian Islam.
- ঘ. Farquhar : Modern Religious Movements in India.
- ঙ. বাঙলার নব জাগৃতি—বিনয় ঘোষ (পৃ. ৯৮–১০৪)
- চ. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালার নব জাগরণ (পৃ. ২৪৭–৫৪) —সুশীল কুমার গুপ্ত
- ছ. বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ২য় খণ্ড— (প্রথম অধ্যায়)গোপাল হালদার।

৩ শশিভূষণ চৌধুরীর Civil disturbances during British Rule in India গ্রন্থে অনেক বিদ্রোহের ইতিহাস পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবের চমকপ্রদ দলিল ও বিবরণ পাওয়া যাবে ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Early Administrative System of East India Company নামক মূল্যবান গ্রন্থে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেই শাসন-শোষণের সুবিধার জন্যে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে সরকার যে নতুন ভূমিস্বত্ব ও রাজস্বব্যবস্থা চালু করে, তাতে কাঁচা মুদ্রার অভাবে অভিজাত মুসলমানেরাও জমিদারি ক্রয় করে সম্পদশালী থাকতে পারল না।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবে ওহাবী আন্দোলনের মনোভাবও যে সহায়তা করেছিল, তা অবশ্যস্বীকার্য। সিপাহী বিপ্লবকালে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজ-পক্ষে ছিলেন। এই দূরদর্শী মনীষীই প্রথম উপলব্ধি করলেন, হিন্দুরা যখন বৃটিশের সহযোগিতা করছে, তখন মুসলমানদের এই বৃটিশ-বিদ্বেষ, অসহযোগ ও সংগ্রাম আত্মধ্বংসী বই কিছুই নয়। এই সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের উপায় হিসেবে বৃটিশ-প্রীতি ও সহযোগের মনোভাব সৃষ্টির জন্যে তিনি মুসলিম সমাজে প্রচারণা চালাতে লাগলেন।[৪] তাঁর মতবাদ মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে অভিনন্দিত হল। তখন থেকেই মুসলমানেরা আচরণে বৃটিশ-বিদ্বেষ ত্যাগ করে এবং অভিমান ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু তখন কাঙাল মুঠে-মজুরের সমাজে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব বুঝবার ও ব্যয়ভার বহন করবার মতো যোগ্যতা আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না, তাই অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যেও বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না।

এ সময় থেকেই শিক্ষিত হিন্দুসমাজে স্বাজাত্য ও অধিকারবোধ জাগতে থাকে। ফলে বৃটিশ সরকার এখন থেকে মুসলমানের প্রতি প্রসন্ন ও হিন্দুর সম্পর্কে সতর্ক হতে থাকে।

আমরা মুসলিম মনের বিক্ষোভ, বৃটিশ-বিদ্বেষ ও ইংরেজি বর্জনকে মুসলমান-জাতির বোকামি বলব না; মর্যাদাবান মানুষের মতো তারা নির্ভীকচিত্তে ও সমুন্নত শিরেই দুর্ভাগ্যকে জয় করতে চেয়েছিল। বাইরের দাসত্ব তখনো তাদের মনের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। কারণ আত্মসচেতন ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই কাছে জানের চেয়ে মান বড় এবং তার চাইতেও বড় স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা হারিয়ে যদি তারা লাভ-ক্ষতির বেনেসুলভ খতিয়ান তলিয়ে না দেখে, তবে তাদের ব্যবহারিক জীবনের লোকসান যত বেশিই হোক না কেন, অন্তর্জীবনের ঐশ্বর্যের প্রভাব আমাদের আনন্দিত করে। অবশ্য ক্ষতি যা হল, তা অপরিমেয় এবং এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এ যুগেও আমাদের পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় লাগবে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭ সন অবধি সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা বৃটিশবিরোধী ছিল না। কিন্তু আরবি-ফারসি শিক্ষিত মুসলমানদের আযাদী স্পৃহা এতই তীব্র ছিল যে, আযাদী লাভের আশায় মৌলবী-মোল্লারাই সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন কাফের বলে নিন্দিত হিন্দুদের সঙ্গে। এঁরা শেষ অবধি কংগ্রেস-পন্থী তথা হিন্দু-মুসলিমের একজাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেস, খেলাফত সমিতি বা মুসলিম লীগের আহ্বানে অশিক্ষিত নিঃস্ব মুসলমান যেভাবে অকপট সাড়া দিয়েছিল, অশিক্ষিত অমুসলমান কোনোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে সাড়া দেয়নি।

বিশ্বাসের অঙ্গীকারে জন্মায় ধর্মবোধ। আস্তিক মানুষের জীবন চালিত হয় ধর্মবিশ্বাসের আনুগত্যে। এবং ধর্মমাত্রই পুরোনো। কাজেই আস্তিক মানুষ জীবনযাত্রার নীতি-আদর্শ খোঁজে অতীতে। এমন মানুষ পরিবেষ্টনীকে অবহেলা করে এবং দেশ-কালের চাহিদা ও প্রভাব এড়িয়ে আদর্শ জীবনের অদ্ভুতস্বপ্ন রচনা করে স্বস্তি পায়। সম্মুখদৃষ্টিকে পশ্চাতে নিবদ্ধ করার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় নিহিত থাকে তাদের ব্যর্থতার বীজ। ইসলামের উদ্ভবযুগের ঋজু অবিকৃত ধর্মবিশ্বাসই আরবদের দিগ্বিজয়ী করেছিল—মুসলমানেরা এ-কথা ভুলতে চায় নি। এবং একেই আত্মোন্নয়নের একমাত্র ও ধ্রুব উপায় বলে মেনেছে। তাই ধর্মবোধের মাধ্যমে মুসলমানদের

৪ এ ব্যাপারে নওয়াব আবদুল লতিফ (ফরিদপুর), সৈয়দ আমীর হোসেন (পাটনা) এবং বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলীর (হুগলী) প্রচেষ্টাও স্মরণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেরণাদানের ও পতনরোধের চেষ্টা হয়েছে সর্বত্র। পাক-ভারতের ইতিহাসের ধারায় আমরা তাই বারবার একই আহ্বান শুনেছি, শেখ আহমদ সিরহিন্দী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, তিতুমীর, কেরামত আলী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া, হালী-ইকবাল-জলন্ধরী-ফররুখ প্রভৃতি ধর্মবেত্তা, সমাজনেতা ও কবি-দার্শনিকের মুখে। ওহাবী-ফরায়েজীর পিউরিটানিক গোঁড়ামির তথা গ্রহণবিমুখতা ও বর্জন-প্রবণতার কারণও ছিল এ-ই। কল্যাণচিন্তায় এঁদের আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু কালিক জীবনচেতনা ছিল না, ছিল না স্থানিকবোধও। তাই তেরোশ বছর আগের মরুভূ আরব তাঁরা কখনো অতিক্রম করতে পারেন নি।

আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ আত্মসংকোচনকেই আত্মরক্ষার উপায় বলে জানে। স্বশক্তিতে আস্থাবান মানুষ চারদিককার সবকিছু আত্মসাৎ করে হয় বড়ো। অতএব যদিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল মহান কিন্তু সামর্থ্য ছিল সামান্য, মনন ছিল সীমিত এবং পথ ছিল ভ্রান্ত। গ্রহণ, বরণ, বর্জন ও সমন্বয় সাধনের মধ্যেই যে ব্যক্তিজীবনের বৃদ্ধি এবং জাতীয় জীবনের প্রগতি পন্থা নিহিত, তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো আরো অনেক ব্যক্তিত্ব ও চিন্তানায়কের স্থানিক ও কালিক প্রয়োজন ছিল।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন প্রবল হলেও সর্বশ্রেণীর লোকের যে এতে সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না, তা না বললেও চলে। বিশেষ করে উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানের ভূমিকা এতে দুর্লক্ষ্য। ফলে ধর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য-মুক্তি ও আযাদী স্বপ্ন সফল হয়নি। এমনকি তাঁদের প্রচেষ্টায় এদেশী মুসলমানের পতন পথ রুদ্ধ হয়েছিল বলেও প্রমাণ নেই। বরং ইংরেজ-বিদ্বেষহেতু ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁদের বিরূপতা মুসলিম মধ্যবিত্ত ঘরে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ফলে অর্থাগমের পথ রুদ্ধ রইল দীর্ঘদিন। এমনকি এই বিরূপতা বশে মাদ্রাসায়ও নাম-ঠিকানা লেখা ও পড়ার জন্যে ইংরেজি হরফও শেখানো হয় নি। অথচ প্রশাসনিক ভাষার সঙ্গে এই লৈপিক পরিচয় বৈষয়িক কারণেই জরুরী ছিল।

অবশ্য মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এতেই রোধ করা যেত না, যেমন জাত নষ্ট ও সমাজ বিচ্যুতিভয় হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও বিলেত গমন রোধ করতে পারে নি। কিন্তু এর বিস্তার মন্থর হল অন্য কারণে। হিন্দুসমাজে নিম্নবর্ণের মধ্যে যেমন, পুরুষানুক্রমে নিম্নবিত্তের দেশজ মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না। তারা বাঙলা বা আরবি শিক্ষাও গ্রহণ করে নি কোনোদিন। অতএব মসজিদ-কেন্দ্রী আরবি ফারসি শিক্ষায়ও তাদের কোনো কালে আগ্রহ ছিল না। নিরক্ষরতা ছিল সর্বব্যাপী। কেবল গাঁয়ে গাঁয়ে দু-চারটি লোক লেখাপড়া জানত। এরাই হত নায়েব গোমস্তা পীর-মুনশী-মূয়াজ্জিন। বিহারে-উত্তরপ্রদেশে উচ্চবিত্তের অভিজাত বেশি ছিল, তাই ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়েও সেখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল এবং বাঙলার উচ্চবিত্তের অভিজাত মুসলমানরা ও রাজসরকারের পদস্থ কর্মচারীরা ছিল অবাঙালি। তাঁদের অধিকাংশই সিরাজদ্দৌলা-মীরকাশেমের পতনের পর উত্তর বিহারে ও উত্তর ভারতে চলে যায়। আর যারা নানা কারণে রয়ে গেল, তারা গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছিল। তাদের এবং দেশী মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আবার পড়তে গেলেও পড়া হয় নি অধিকাংশের। তাই ব্রিটিশ আমলে বাঙলার মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়েনি। আবার মৌলানা কেরামত আলী, ইমামুদ্দিন প্রভৃতি ধর্ম-সংস্কারকদের প্রবর্তনায় চট্টগ্রাম বিভাগে আরবি শিক্ষা বিস্তার পায়।

আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই য়ুরোপে দৈশিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। উনিশ-বিশ শতকে ঘটে তার উগ্রবিকাশ এবং পৃথিবীব্যাপী বিস্তার। এর আগে ধর্মীয় ঐক্যবোধ ভিত্তিক একপ্রকার জাতীয়তাবোধ মানুষের ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবমুক্ত এদেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ ছিল প্রবল। এমনকি প্রতীচ্য শিক্ষার আলো প্রাপ্ত অনেক চিন্তাবিদ মনীষী-কবি-সাহিত্যিকও এ সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-স্যার সৈয়দ আহমদ-আমীর আলী প্রভৃতি অনেকের জাতি-চেতনা এ সূত্রে স্মর্তব্য। তাই সে-যুগে দৈশিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন-চেতনা ছিল দুর্লভ। ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীগত জীবনের ও প্রয়োজনের অস্বীকৃতিতে হিন্দু আত্মত্রাণের প্রেরণা খুঁজেছে স্বধর্মে ও উত্তরভারতের বৈদিক, রাজপুত ও মারাঠা ঐতিহ্যে এবং মুসলমানও ত্রাণ সন্ধান করেছে তার স্বধর্মে ও আরব-ইরানে। এটির নাম স্বাধর্ম্য— প্যান হিন্দুইজম ও প্যান ইসলামইজম। ফলে মধ্য ও উচ্চবিত্তের হিন্দু-মুসলমান নানা কাজে একত্রিত হয়েছে কিন্তু তাদের মিলন হয় নি। যদিও তারা একই হাটে বেচা-কেনা করেছে একই বাটে হেঁটেছে, একই মাঠে ফসল তুলেছে, একই বন্যায় পীড়িত হয়েছে এবং মরেছে একই মহামারীতে। তারা প্যাশাপাশি বসেছে, ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েছে,— বাইরে সর্বত্র মিলেছে, সহযোগিতা করেছে, অন্য সব কিছুই দেয়া-নেয়া করেছে; মনটাই কেবল দেয়া-নেয়া করে নি, তারা মনটা ফিরিয়ে রেখেছিল দেশবহির্ভূত ধর্মের ও ঐতিহ্যের আনুগত্যবশে। ওটার নাম স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধর্ম্য যার অপর নাম দেশকালহীন আদর্শিক জাতীয়তা। কিন্তু এই আদর্শিক জাতীয়তা কোন্ শ্রেয়সের সন্ধান দিয়েছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন, সমাজ ও সাহিত্য

কলাবিদেরা বলেন, যেখানে Photography-র শেষ; সেখান থেকেই চিত্রকলার শুরু। যেখানে কথার শেষ, সেখান থেকেই সুরের আরম্ভ। প্রয়োজন ছাড়িয়েই সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা, নকশা অতিক্রম করেই সাহিত্যের সৃষ্টি। স্বাভাবিক ভঙ্গির অস্বীকৃতিতেই নৃত্যের উদ্ভব। কাজেই কলা মাত্রেই কৃত্রিম। তুচ্ছকে উচ্চ করে তোলা, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করা, কৌৎসিত্যে লাবণ্য দেয়া, সরলকে জটিল করা, ঋজুকে বক্র করে তোলা, সামান্যকে অসামান্যতা দেয়া, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা কলা-শিল্পীর দান। যা নেই তা সৃজন করা, যা কাম্য তা পাইয়ে দেয়াই শিল্পীর দায়িত্ব। অতএব, স্বাভাবিকতায় শিল্প নেই। অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্পকলা। তাই শিল্পীমাত্রেই স্রষ্টা। এবং স্রষ্টা কখনো অনুকারক হতে পারেন না। অথবা কোনো অনুকারকই স্রষ্টার সম্মান পান না। অতএব সৃষ্টি মাত্রেই মৌলিক।

যা আছে তা নয়, যা থাকা উচিত, যা শ্রেয় কিংবা প্রেয়, এমনকি যা প্রয়োজন তার স্বপ্ন দেখা, অন্যের মনে সে-স্বপ্ন জাগিয়ে তোলাই শিল্পীর ব্রত। এই অর্থে সাহিত্যাদি কলা একাধারে জীবন-স্বপ্নের উৎস, আধার ও প্রতিচ্ছবি। অতএব, শিল্পকলা চিরকালই জীবন-স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটিয়েছে, জীবনের প্রয়োজনই মিটিয়েছে। 'কাজেই Art for art's sake' বলে যে-বাজে কথাটা রটেছিল, তাতে না ছিল ইতিহাসের সমর্থন, না ছিল শিল্পবোধের পরিচয়।

কেননা মানুষের কোনো কর্ম বা আচরণ প্রয়োজন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এ প্রয়োজন অবশ্যই মানস অথবা ব্যবহারিক হবে। এ প্রয়োজন নিয়ম-নীতি-নিয়ন্ত্রণ মানে না এবং মানুষে মানুষে তা অভিন্নও নয়। এ প্রয়োজন স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, বাহ্য কিংবা আন্তর, বৈষয়িক কিংবা মানসিক, পার্থিব কিংবা আধ্যাত্মিক হতে পারে। তাই এ প্রয়োজন বিচিত্র ও বহু। মানুষের জীবনবোধ ও প্রয়োজনবুদ্ধি বিশ্বাস, সংস্কার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অজ্ঞতা; বিস্ময়, কল্পনা, বোধ, বুদ্ধি, ভীতি, সাহস, ভাব-চিন্তা, উপলব্ধি, উপযোগবুদ্ধি, রূপচেতনা প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। সেজন্যেই তা আপেক্ষিক। এগুলোর আনুপাতিক উপস্থিতি ও অভাবই মানুষের জীবনবোধে ও শ্রেয়োচেতনায় বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন দান করে। তাই কারো ভাল কারো কাছে মন্দ, একের কাছে যা অপরিহার্য, তা-ই অন্যের কাছে বিলাস মাত্র। ফলে সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দর্শনে জীবনবোধের ও জীবনদৃষ্টির প্রকাশ বিচিত্র ও বহুধা। এজন্যেই শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনকে জাতীয়, ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা সামাজিক রূপ দেয়ার নির্দেশ দান নির্বুদ্ধিতায় পরিচায়ক। কেননা জীবনবোধ ও উপযোগবুদ্ধি ফরমায়েশে তৈরি হয় না। চেতনানুসারেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম অভিব্যক্তি পায়। ফলে কেউ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কেউ ধর্মীয় বোধে অনুপ্রাণিত, কেউ সমাজচিন্তায় বিব্রত, কেউবা জীবনের নৈতিক গুরুত্বে আস্থাবান। তাই সবাইকে নির্দেশে নিবর্ণ করার অভিপ্রায় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মননের দৈন্যপ্রসূত। মানুষ মেশিন নয়, কাজেই তার কাছে অভিন্ন ভাব-চিন্তা-কর্মের পৌনপুনিকতা কিংবা অভীষ্ট রূপ বা ফল, আশা করা বাতুলের দিবাস্বপ্ন মাত্র।

অতএব শিল্পমাত্রেই প্রয়োজন প্রসূত। কলার উদ্ভবতত্ত্বেও পাই এ তথ্য। গান থেকেই সাহিত্যের বিকাশ। শ্রমসাধ্য যৌথ কর্মের অনুষঙ্গ হিসেবেই গানের উৎপত্তি। তেমনি যাদু ও সর্বপ্রাণতত্ত্বে আস্থাবান মানুষের বাঞ্ছা-সিদ্ধির অবলম্বন হিসেবে উদ্ভূত নৃত্য ও চিত্রকলা। এভাবে প্রয়োজনের কর্মের সঙ্গে সৌন্দর্যের ও আনন্দের যোগসাধন করে মানুষ কর্মে পেয়েছে উৎসাহ এবং শ্রম করেছে সুবহ। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও চিত্র বা মূর্তি আজো তাই অনেকেরই উপসানা বা ধর্মাচারের অঙ্গ। যাদের উপাসনা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে, অথচ তারা নাচ, গান, বাজনা কিংবা চিত্র ও প্রতিমার আকর্ষণ হারায় নি, তাদের কাছেই এগুলো কেবল সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রূপচেতনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসূত আনন্দের অবলম্বন। তারাই Art for art's sake তত্ত্বের প্রবক্তা। আসলে আদি মানব সমাজে যা ছিল জীবন ও জীবিকার স্থূল অবলম্বন, তা-ই মানবীয় শক্তি ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় মানস প্রয়োজনে উন্নীত। সম্পর্ক হয়েছে দূরান্বিত, সম্বন্ধ সূত্র হয়েছে অদৃশ্য। ফলে জীবনপ্রয়াসের অনুষঙ্গ হিসেবে যা সৃষ্ট, তা-ই উত্তরকালে ব্যবহারিক জীবন-নিরপেক্ষ খেয়ালী মনের রূপ ও রসচর্চা বলে বিবেচিত। কিন্তু এ ধারণাও সত্য নয়, কেননা রূপকথায়ও দেখি ভাল-মন্দর দ্বন্দ্ব। সেখানেও মন্দশক্তির প্রতীক দুর্বৃত্ত-দুয়োরানী, দৈত্য-রাক্ষস ও সাপ-বাঘের পরাজয় নিয়তি-নির্দিষ্ট। সেখানেও নৈতিক আদর্শ সর্বত্র বন্দিত। আদ্যিকালের গানে-গাথায়-ছড়ায়, রূপকথা-উপকতা-পুরাণকথায় ন্যায়-নীতিবোধ জাগানোর—মহৎ আদর্শ দানের প্রয়াস সর্বত্র লক্ষণীয়।

সেকালে সাধারণ্যে জীবন-চেতনার প্রসার ছিল না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যবস্তুর অভাব তখনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। কেনা অসহায় মানুষের জীবন তখনো সর্ব ব্যাপারে দৈবানুগ্রহ-নির্ভর ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। সুখ-শোক, ভোগ-রোগ, ধন-দৈন্য, বিপদ-সম্পদ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি তখনো দেবতার 'কৃপা' ও দেবতার 'মার' বলে বিবেচিত। কাজেই সমাজে মানুষের নৈতিক জীবন-সমস্যা ছাড়া অন্য সমস্যা সমাধানে হাত ছিল না মানুষের। এজন্যেই মানুষের মনন-চিন্তন ব্যক্তির নৈতিক জীবন উন্নয়নে ছিল নিয়োজিত। মধ্যযুগের ধর্ম ও সাহিত্যাদি কলা তাই ভাল-মন্দ, ভোগ-ত্যাগ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের ফল; ঘৃণা-হিংসা-দ্বেষ, ছলনা-ক্রূরতা-প্রতিহিংসা প্রভৃতির পরিণাম এবং প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, ক্ষমা-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য-অধ্যবসায়, উদারতা-মহত্ত্ব, শক্তি-সাহস প্রভৃতির মহিমা-মাহাত্ম্যের বর্ণনায় ও চিত্রণে ছিল পরিপূর্ণ।

তারপর ক্রমে মানুষের জীবনধারা পাল্‌টে গেছে। এর কারণ অনেক। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, যন্ত্রায়ত্ত শিল্প, মুদ্রা বিনিময় রীতির বিস্তার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিক শোষণ, যন্ত্রবিজ্ঞানে অসম অধিকার, ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিজাত ও খনিজদ্রব্যের প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতা প্রভৃতি নানা কারণে দেশে দেশে ও সমাজে সমাজে ধন-বৈষম্য ও তজ্জাত শক্তি বৈষম্য, দারিদ্র্য, শোষণ, কর্মকুশলতার অভাব প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দেয়। অতএব এ যুগের মানবিক সমস্যা রাষ্ট্রিক কিংবা প্রশাসনিক নয়—মূলত অর্থনীতিক এবং ফলত সামাজিক।

আগের যুগে নিয়তি-নির্ভর মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা কিংবা বিপর্যয়ের কারণ ছিল ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বা অবনতি। এ যুগে আর্থিক বৈষম্যই সামাজিক মানুষের দুঃখ-বেদনার মুখ্য কারণ। তাই এ যুগের নাচ-গান-চিত্র-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি সমাজ ভিত্তিক। অন্যকথায় সমাজবদ্ধ মানুষের দুঃখ নিবারণ ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন লক্ষ্যেই এযুগে মানুষের শিল্প ও মনন প্রয়াস নিয়োজিত। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-ভাবনা পুরাতনকে স্বরূপে ও স্বস্থানে ধরে রাখার জন্যে নয়, পুরাতনের প্রয়োজন মতো বর্জন, শোধন ও নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্যেই।

অতএব শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও প্রসারণ। পুরোনো সমাজকে ভেঙে—অতিক্রম করে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন জাগানো, পরিকল্পনা প্রদান; চালু সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ও নতুন সংস্কৃতি সৃজন; যে-ঐতিহ্য প্রগতির অন্তরায়, অনুপ্রেরণা দানে অক্ষম, তা পরিহার করে নতুন ঐতিহ্যের সন্ধান ও সৃজন প্রভৃতিই হবে শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আদর্শ, লক্ষ্য ও ব্রত।

চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় activism, abstractism, surrealism প্রভৃতি চালু হয়েছে। সংগীতের মধ্যেও বিদেশী সুর-তাল-যন্ত্র গৃহীত হয়েছে সাদরে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় ভাল-মন্দ সবকিছুই নির্বিচারে আত্মসাৎ করছে সবাই—যদিও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার মৌখিক আস্ফালনও বাড়ছে সেই অনুপাতে। ভাবে ও আঙ্গিকে (In form and spirit) গত একশ বছরের বাঙলা সাহিত্য তো দেশী ভাষার আবরণে বিলেতি বস্তুই। ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা য়ুরোপীয় শব্দের পরিভাষা নিয়েছি ও নিচ্ছি সংস্কৃত থেকেই। তবু আরবি-ফারসির জিগির ছাড়িনে। য়ুরোপীয় শব্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিভাষা হিসেবে গৃহীত বলেই পুরোনো সংস্কৃত শব্দ নতুন তাৎপর্যে নতুন। কিন্তু আরবি-ফারসি শব্দের পুনর্ব্যবহারে নতুন ব্যঞ্জনা দুর্লভ। আমরা ভুলে যাই যে পুরোনো উপকরণে নতুন জিনিস তৈরি করলে তার রঙ বিশেষ খোলে না,—জৌলুস তো অভাবিত।

সাহিত্যে সমাজচিত্র দেয়া মানে যা আছে, কেবল তাই চিত্রিত করা নয়— যা হওয়া উচিত তারই সংকেত দেয়া—প্রেরণা দেয়া, নইলে রচনা নকশাই থেকে যায়। তেমনি ভাষা ও বাক-ভঙ্গি যেমনটি আছে তেমনটিই রক্ষার প্রয়াসেই লেখকের কর্তব্য সীমিত রাখলে চলে না, তার উন্নয়ন ও বিকাশের চেষ্টাও করতে হয়। সংস্কৃতিও যা আছে তা নয়, যা কাম্য তারই দিশা দান সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অতএব, দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনের যোগসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ-সংস্কৃতির রূপ এঁকে দেয়া। এজন্যে বাক্‌জাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যাণপ্রসূ দিক উদঘাটিত হলেই এ উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। প্রীতি ও প্রত্যয়ই এ কর্মে সাফল্যের সম্বল। কেননা প্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দু-ই অসার্থক।

যাঁরা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অতীতরূপের ধ্যানে আসক্ত, কিংবা বর্তমান রূপের অনুরাগী ও অনুগত, তাঁরা জীবন-বিমুখ, প্রগতি-ভীরু। তাঁদের বুদ্ধি স্বল্প, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বোধ অগভীর। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন লোকের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসি সংগ্রামীর সমস্যা

এ যুগে লেখকেরা বঞ্চিত শোষিত মানুষের ত্রাণের জন্যে লেখনী ধারণ করেছেন। মসি যুদ্ধে মানুষের মতি ফেরানোর এই অভিনব ও সুপরিকল্পিত প্রয়াসে চরিত্রবান সাহিত্যিকদের আন্তরিকতার অভাব নেই। এঁদের লক্ষ্য দ্বিবিধ : প্রত্যক্ষভাবে শোষিতদের ও সহানুভূতিশীলদের সচেতন ও সংগ্রামী করে তোলা আর পরোক্ষে শোষকদের অন্যায়বিমুখ ও সুবিবেচক করা।

কিন্তু মুখ্য কিংবা গৌণ লক্ষ্য—কোনোটাই আশু ফলপ্রসূ নয়। কেননা যাঁরা লেখেন তাঁরা—এমনকি বিত্তহীন হলেও—মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। যাদের জন্য তাঁদের সংগ্রাম তারা অশিক্ষিত, অজ্ঞ, মূক এবং মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তাদের মানস-সূত্র অসংযুক্ত। আর যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারাও এ সাহিত্যে অবহেলাপরায়ণ। কাজেই এ সাহিত্যের দ্বারা অশিক্ষিত শোষিতজন বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী হয় না। আর শোষক বুর্জোয়ারাও ন্যায়নিষ্ঠ ও দায়িত্বসচেতন হওয়ার গরজ বোধ করে না।

সুতরাং আপাতত, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লক্ষ্য যারা, তাদের কাছে এ সাহিত্য পৌঁছেই না।

তাহলে, এ সাহিত্য কাদের জন্যে, কাদের কাছে এ সব লেখার আবেদন?

না বললেও চলে যারা বঞ্চিত কিংবা শোষিত, তাদের চেতনা সূক্ষ্ম নয়; তারা কেবলই মার খায়, আর তাকে নিয়তি কিংবা বিধিলিপি বলে মেনে নেয়। আন্দোলন করবার, বিদ্রোহী হবার, কিংবা নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন অথবা সামর্থ্য তাদের কোনো কালেই ছিল না। তাদের জাগাবার, সংগ্রামী প্রেরণা দেবার কিংবা নেতৃত্ব দানের গরজ বোধ করেছেন চিরকালই মধ্য অথবা উচ্চবিত্তের সংবেদনশীল মানবতাবাদী শিক্ষিত মানুষ। মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ থেকে মাও-সে-তুঙ্‌ অবধি সব নেতাই মধ্য ও উচ্চবিত্তের লোক। অতএব মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রী লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠক মধ্য ও উচ্চ বিত্তের শিক্ষিত জনগণই। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে লেখার মাধ্যমে সংবেদনশীল ও সংগ্রামী করে গড়ে তুলতে পারলেই তাদের মাধ্যমেই গণসংযোগ ও গণ-আন্দোলন সম্ভবপর হয়। দুনিয়া জুড়ে সৈন্যরা ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল সেনাপতিরই অভাব। দুর্যোগ-দুর্দিনে শিক্ষিত সংবেদনশীল দৃঢ়চিত্ত সাহসী ও ত্যাগপ্রবণ কর্মীর নেতৃত্বই সংগ্রামে সাফল্য দান করে।

সংবেদনশীলতা ও মনুষ্যত্ব সব হৃদয়ে সুলভ নয়। পরিশীলন ও পরিচর্যায় এর বিকাশও হয়তো সামান্যই হয়। সহানুভূতি ও মনুষ্যত্ব মন-মেজাজের বিশেষ গড়ন-প্রসূত। নীতিকথায় এক্ষেত্রে মন ফেরানো অসম্ভব। এ অবস্থাকে স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য বলেই মেনে নিতে হবে। তাছাড়া উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে বিত্তশালী হবার নানা সুযোগ ঘটে। শিক্ষিত, কুশলী ও নীতিভ্রষ্ট নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে প্রলোভন সংবরণ করা সহজ নয়। কাজেই যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উপর জনকল্যাণ ও গণমুক্তি নির্ভরশীল, তাদেরও রয়েছে চোরাবালির মতো প্রতারক মন।

একেবারে নিঃস্ব না হলে সাধারণত মানুষ নিশ্চিত বর্তমান ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পা বাড়ায় না। ব্যতিক্রম কেবল অসামান্যতারই পরিচায়ক। তাই দেখা যায় Boss ও বিবেকের দ্বন্দ্বে প্রায়ই Boss-এর জয় হয়। কেননা 'ঢাকুরে-কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়।'

এজন্যে মধ্যবিত্তে দীর্ঘস্থায়ী চারিত্রিক দার্ঢ্য সুদুর্লভ। আবার "টাকার এমন কুহক যে লোকে লাথিও খাচ্ছে এবং নিকটে গিয়া যে-আজ্ঞাও করছে।" এমনো দেখা যায় মধ্য বয়সে মানুষ ন্যায়-নীতি-আদর্শের বন্ধন মুখোশের মতোই হঠাৎ পরিহার করে। বাইরের লোক তার খোলস পালটানো দেখে নিন্দে করে। কিন্তু কোন্ বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মানস ও বৈষয়িক সংগ্রামে সে পর্যুদস্ত ও পরাজিত, তা তারা ভেবেও বুঝতে চায় না। তেমন অবস্থায় একজন সংগ্রামপ্রবণ,

www.amarboi.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আদর্শবাদী মানুষও একান্তভাবে বিষয়ী স্বার্থপর হয়ে উঠে। তখন আল্লাহর দয়া, মনিবের দাক্ষিণ্য ও বিবির দিদার ছাড়া কিছুই তার কাম্য থাকে না। তখন আদর্শের রূপায়ণ-ব্রতী কোনো বুদ্ধিজীবী একাকী দায়িত্ব পালনে কিংবা কর্তব্য সাধনে ভয় পায়। তার রাত্রি-নিশীথের সংকল্প দিন-দুপুরে আত্মপ্রকাশের সাহস হারায়। তেমন লোক বক্তব্য প্রকাশের জন্যে কেবলি আকুলিবিকুলি করে ,সহায়-সমর্থনের জন্যে নিজের চারদিকে তাকায়, কাকেও না পেয়ে গুমরে মরে, ব্যথায় জর্জরিত হয়, ক্ষোভের যন্ত্রণায় ছটফট করে,—কিন্তু একা মৃত্যুর কিংবা পীড়ন বরণের ঝুঁকি নিতে জৈব কারণেই অসমর্থ।

শিক্ষিত লোকের সংখ্যাল্পতার জন্যে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে এ সমস্যা আরো প্রকট ও তীব্র। কেননা, সেখানে সহানুভূতিশীল পাঠকও কম। এজন্যেই প্রাচ্যদেশে যদিও ধনবৈষম্য তীব্র, জীবিকা অর্জনের সুযোগ সীমিত, পীড়ন ভয়াবহ ও প্রবলের স্বৈরাচার নির্বিঘ্ন, তবু এখানে গণদরদী লেখক স্বল্প, পাঠক নগণ্য, সরকারও অসহিষ্ণু। তাই তারুণ্যের অবসানে অধিকাংশকেই দেখি ব্রতভ্রষ্ট ও খণ্ডব্রত।

তাছাড়া 'মধ্যবিত্ত' সংজ্ঞাটিও আপেক্ষিক। প্রাচ্যদেশে যারা মধ্যবিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা য়ূরোপের কোনো কোন দেশের নিম্নবিত্তের লোকের চেয়েও তারা হীনাবস্থ। জীবনযাত্রার মান নিম্ন এবং রুচি অবিকশিত বলে এ দেশে যারা প্রাচুর্যের মধ্যে আছে বলে মনে করি, তারাও জীবনের নানা ভোগ্য-সামগ্রী থেকে বঞ্চিত। ফলে তারাও অভাব মুক্ত নয়—তারাও মনে কাঙাল। কাজেই প্রলুব্ধ হওয়া তাদের পক্ষেও সম্ভব ও সহজ। এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের নানা প্ররোচনায় ও প্রলোভনে বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত করবার প্রয়াসী। সাহিত্য পুরস্কারের শিকার হয়ে প্রাণের কথা বিকৃত করে প্রকাশ করা বা বক্তব্য চেপে যাওয়া গরিব লেখকের পক্ষে সম্ভব। আবার প্রত্যয় দৃঢ়মূল নয়, অথচ বয়োধর্মের বশে ফ্যাশানের আনুগত্যে কেউ কেউ আদর্শবাদের বুলি কপচায়, একটু বয়স হলেই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে—দালালও হয়ে উঠে। যেমন গতশতকে ইয়াংবেঙ্গলদের প্রায় সবাই চল্লিশোত্তর জীবনে নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। এসব নানা কারণে তারুণ্যের অবসানে আদর্শবাদী গণদরদী ন্যায়নিষ্ঠ সংগ্রামপ্রবণ বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা বদলে যায়, ভোল পাল্টায়।

নির্যাতিত মানবতার কথা ছেড়ে দিলেও দুনিয়াব্যাপী গণমানবের দুঃখের অন্ত নেই। যেখানে একনায়কত্ব, সেখানে পেটের ক্ষুধা যদি বা মেটে, মনের কথা প্রকাশের পথ নেই। তাতে মনের ঝাল মিটিয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োবার উপায় খুঁজে পায় না মানুষ। জীবনে সে আর এক যন্ত্রণা। যেখানে ডেমোক্রেসির মার্কা আঁটা সরকার পরমত অসহিষ্ণু সেখানেও সেই জ্বালা। ক্ষোভে-দুঃখে, জ্বালায়-যন্ত্রণায় বাকস্বাধীনতা মানুষের বেদনা উপশমের অন্যতম উপায়। কেননা, মানুষ প্রাণ নিয়ে বাঁচে না, বাঁচে মন নিয়ে। সে মনের উপর পীড়ন একসময় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। তাই দৈহিক পীড়ন ঘটায় মৃত্যু, আর মানস নির্যাতন দেয় বিকৃতি। তখন গুপ্ত পথে বিষাক্তক্ষতের মতো তা পরিণামে প্রাণঘাতী বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও জিঘাংসা জাগায়। সমাজে-রাষ্ট্রে নেমে আসে বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার। ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থলোলুপ শাসকের দৌরাত্ম্যও বেড়ে যায়। তখন রাষ্ট্র যেন লুটের মাল, শেষ মুহূর্ত অবধি যা পাওয়া যায় তাই লাভ— এই মনোভাবের বশে শাসক গোষ্ঠীও হয়ে ওঠে বেপরওয়া। ধন-জন সব ছারখার হয়ে যায় রক্তে আর আগুনে।

এসব পরিণাম যে শাসক গোষ্ঠীর অজানা, তা নয়, কিন্তু আপাত সুখের মোহে তাদের শ্রেয়োবোধ হয় অবলুপ্ত। অন্যদিকে সংগ্রাম ও জীবনধ্বংসী দুর্ভোগ ছাড়া যে মুক্তি আসতে পারে না, তা যদিও সংগ্রামীদের বোধ বহির্ভূত নয়, কিন্তু যন্ত্রণা-বঞ্চনা সইবার ধৈর্যের অভাবে তারা সংকল্পচ্যুত ও পলাতক।

কাজেই আজকের দুনিয়ায় নিপীড়িত মানুষের জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে চাই বাক-স্বাধীনতার আন্দোলন, আর এজন্যে চাই শিক্ষিত বয়স্ক মধ্যবিত্তের সহানুভূতি এবং তরুণ মধ্যবিত্তের সমর্থন, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সহায়তা এবং লিখিয়েদের উচ্চ ও নির্ভীক কণ্ঠ এবং অবিচলিত কলম। এ ব্যাপারে সমর্থন ও সহযোগিতাই শক্তির উৎস। এককভাবে মানুষ কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বল নয়—ভীরুও। জনবলই বল। আর মনোবলই সামর্থ্য। সঙ্ঘশক্তির মতো শক্তি নেই, যৌথ কর্মে নেই অসাফল্য।

এদেশের প্রাচীন কবির এক আপ্তবাক্য 'বদংশত মা লিখ'—আজ মিথ্যে বলে প্রমাণিত। কেননা সরকারের চোখে বক্তৃতা মারাত্মক, গদ্য লেখা দূষণীয় ও কবিতা নিষ্ফল। তাই দেখছি কবিতায় যে-কিছু বলা যায়, কিন্তু গদ্যে লিখলে হয় আপত্তিকর, আর বক্তৃতায় বললে হয় অপরাধ।

কবিতার আবেদন যদিও গভীর ও স্থায়ী, তবু তা স্বল্পসংখ্যক পাঠকে সীমিত। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প এবং নাটকের আবেদনও সর্বজনীন নয়। বক্তৃতা গণমুখী,—তাই সরকার বক্তৃতাভীরু। দুনিয়ার প্রায় সব সরকারেরই এক চেহারা এক রূপ। তাই বলে কি কাফেলা স্থির হয়ে থাকবে, চিন্তার স্রোত কি শুকিয়ে যাবে! বাধা প্রবল ও বেপরওয়া হলে কালমাত্রা বেড়ে যায় এবং ক্ষয়-ক্ষতিও বেশি হয় বটে কিন্তু পরিণামে গণসংগ্রামে সাফল্য সুনিশ্চিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিবৈর ও বাঙলা সাহিত্য

আদিম মানুষের মন-বুদ্ধির বিকাশের ফলে তাদের মধ্যে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রয়োজন-বুদ্ধিই তাদের সংহতি দান করে। সেদিনকার হাতিয়ার-বিরল অজ্ঞ মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সংহতি ও সহযোগিতার মধ্যেই সন্ধান পায় নতুন শক্তির ও সম্ভাবনার। স্বনির্ভর অসহায় জীবনে এভাবে নতুন ভরসা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে প্রসারিত জীবন সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হল মানুষ।

তখন জনসংখ্যা ছিল কম। পৃথিবী ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। মানষের জীবন ছিল অঞ্চলের সীমায় আবদ্ধ। এভাবে তাদের এক একটি দল নিজেদের খণ্ড ক্ষুদ্র জগতে যাপন করত স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর জীবন। কুলপতিই ছিল তাদের নেতা—শাসন-পোষণ ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক—ভয়-ভরসার আকর।

এই গোত্রীয় সংহতি এককালে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের ছিল শ্রেষ্ঠ উপায়। তারপর ক্রমে বেড়ে গেছে জনসংখ্যা। জীবনবোধ হয়েছে প্রসারিত। প্রয়োজন গেছে বেড়ে। জীবিকা হয়েছে দুর্লভ। প্রয়োজনের তাগিদে তখন অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করতে শিখেছে মানুষ। তখন গোত্রে গোত্রে জীবিকার অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হল শুরু। কেননা তখনও জাগেনি গোত্রীয় সহঅবস্থান এবং সহযোগিতার সুবিধা ও সুফলের চেতনা। কাজেই অন্য গোত্রের প্রতি বিরূপতা ও বিমুখতা এবং বিগ্রহই আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের একমাত্র উপায় বলে হত বিবেচিত। অনেক কাল হল সেই গোত্রীয় গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তার ঠাঁই নিয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়। স্বাধর্ম্য গোত্রীয় চেতনারই আর এক রূপ। তাই গৌত্রিক বিরোধ-বিদ্বেষের ঠাঁই নিয়েছে ধর্মমতবাদীর বিরোধ, বিদ্বেষ ও স্বাতন্ত্র্য চেতনায়। এজন্যে আজো মানুষের সেই আদিম মনোভাবের ও জীবন-চেতনার পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য। ধর্মীয় ঐক্য সংহতি দেয় আর অনৈক্য বিরোধ ও হানাহানি ঘটায়—এ-ই হচ্ছে মানুষের কয়েক হাজার বছরের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের সারকথা। কাজেই পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলানের সম্পর্কের ইতিহাসও স্বতন্ত্র হতে পারেনি। তার উপর সম্পর্কটি বিজিত-বিজেতার বলেই বিদ্বেষ-বিরূপতাও ছিল তীব্রতর।

বাঙলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানে যে আন্তরিক সম্প্রীতি ছিল না, তার প্রমাণ রয়েছে বাঙলা সাহিত্যে। এতে কিন্তু অস্বাভাবিক বা নিন্দনীয় কিছু দেখতে পাইনে আমরা। কেননা সাধারণ মানুষের জীবন চিরকালই ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। ধর্ম হচ্ছে সাধারণের জন্যে বিধি-নিষেধের সমষ্টি; ইহলোকে পরলোকে প্রসারিত জীবনের দিশারী। স্থূলবুদ্ধি ও অজ্ঞ সাধারণ মানুষ যুক্তি ও চেতনা দিয়ে জীবনোপভোগ করে না—লব্ধ নিয়ম-নীতির অনুসরণেই সে যাপন করে জীবন। বিধি-নিষেধের বেড়ার সীমিত পরিসরে বিবেক-বুদ্ধিকে সে-সব নীতির অনুগত রেখে সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত। সে হয়ে উঠে পোষমানা প্রাণী—তার জীবনও তাই যান্ত্রিক। সে-জন্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধার্মিক তথা আস্তিক মানুষের একটিমাত্র মতই আছে—তা হচ্ছে ধর্মমত। ধর্ম তার ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে কল্যাণ ও শ্রেয়সের উৎস। এর বাইরে কোনো ভাল থাকতে পারে কিংবা তার ধর্মবিধানে কোনো ত্রুটি থাকা সম্ভব, তা সে ভাবতেও পারে না। এমনকি তা ভাবা পাপও। যেহেতু মানুষের ধর্মবুদ্ধি গোত্রীয় সংহতি ও কল্যাণ চেতনায় আচ্ছন্ন, সেহেতু ভিন্ন ধর্মের লোককে সে পর ও শত্রু না ভেবেই পারে না। এবং শত্রুর প্রতি প্রীতি কেবল আত্মধ্বংসী অকল্যাণই যে আনে তা নয়, সে-কারণে স্বধর্মে নিষ্ঠাহীনতার পাপও স্পর্শ করে। তাই পরধর্ম ও বিধর্মী বিদ্বেষ বা ঘৃণাই ধার্মিক মানুষের স্বধর্মনিষ্ঠার এবং আদর্শজীবনের লক্ষণ। এজন্যেই সাধারণত ধার্মিকেরা গোঁড়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুদার ও বিবেক-বুদ্ধিহীন। স্বাধীন চিন্তা, উদার দৃষ্টি ও নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি কিংবা বিশুদ্ধ মানবতাবোধ জন্মাতেই পারে না তাদের রুদ্ধদ্বার মনে।

বাঙলা সাহিত্যেও তাই দেখতে পাই, ধার্মিক মানুষেরাই বিধর্ম ও বিধর্মী বিদ্বেষী। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের সমভাবেই উৎসাহী দেখি। মধ্যযুগে নিরঞ্জনের রুস্মাতেই প্রথম বৌদ্ধ-হিন্দুর বিদ্বিষ্ট সম্পর্কের সংবাদ পাই। বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গলে, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস প্রভৃতির চৈতন্যচরিত গ্রন্থে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কৃষ্ণরামের অন্নদামঙ্গলে, সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। আবার জায়নুদ্দীনের রসুলবিজয়ে, শাবারিদ খানের রসুলবিজয়ে ও হানিফার দিগ্বিজয়ে, সৈয়দ সুলতানের 'জয়কুম রাজার লড়াই'-এ, গরীবুল্লাহ্‌র সোনাভানে, সৈয়দ হামজার জৈগুনের কিস্‌সাতে এবং কোনো কোনো পীরপাঁচালীতে হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর, কাফের ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা-অসৌজন্য সুপ্রকট।

আধুনিক কালে প্যারীচাঁদ মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকের রচনায় যেমন মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ ('অমিয় ধারা'র তিনটে কবিতায় অশ্লীল ভাষায় হিন্দুর নিন্দা করা হয়েছে), ইসমাইল হোসেন শিরাজী, ডাক্তার আবুল হোসেন, শেখ ইদরিস আলী প্রভৃতির রচনায় হিন্দু বিদ্বেষ সুপ্রকট। এছাড়া প্রায় সব হিন্দু ও মুসলমান লেখকের রচনায় প্রতিবেশী বিধর্মীর প্রতি কটাক্ষ, অশ্রদ্ধা কিংবা অবহেলা দৃশ্যমান।

এসব লেখকদের কেউ নাস্তিক নন, তাঁরা ধর্মীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী। তাঁদের জীবন গোত্রীয় সংহতি চেতনার আধুনিক রূপান্তর ধর্মীয় ঐক্যবোধে নিয়ন্ত্রিত। তাই বাঙালি হিন্দু প্রেরণা খুঁজেছে উত্তর ভারতের আর্য ও রাজপুত ঐতিহ্যে এবং বাঙালি মুসলমানের প্রেরণার উৎস হয়েছে আরব-ইরানীর ঐতিহ্য। দেশগত জীবন ও ঐতিহ্য বিশেষ শ্রদ্ধা পায়নি কারো। এই মনে বিধর্মী-বিদ্বেষ না থেকেই পারে না, কেননা তাদের স্বাজাত্য দেশগত নয়, ধর্মগত। কাজেই তাদের স্বাজাত্য স্বাধর্ম্যেরই নামান্তর। মনের দিক দিয়ে কোনো আস্তিক মানুষই স্বাধীন ও স্বস্থ নয়। তাই বিবেক, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির স্বাধীন ও যৌক্তিক তথা নিরপেক্ষ মানবিক প্রয়োগ তাদের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই এঁদের এই মানস অভিব্যক্তির মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই—মোহপাশবদ্ধ মানুষের আত্মিক অপমৃত্যুর জন্যে আমরা কেবল বেদনাবোধ করতে পারি, তাঁদের জড় বিবেকে চেতনা সঞ্চারের চেষ্টাও হয়তো করা সম্ভব, কিন্তু সাফল্যের আশা সামান্য। গোত্রীয় উত্তম্মন্যতা, ধর্মীয় জাতীয়তা, রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা কিংবা আধুনিক মতবাদ প্রসূত ঐক্যবোধ তথা গোষ্ঠী-চেতনা আজ বিশ্বমানবের স্বস্তি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে এক মারাত্মক হুমকি। আজ পৃথিবীব্যাপী এ সমস্যা দুষ্ট ক্ষতের মতো বিরাজমান। বর্ণ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-চেতনা এই তিনটেই মানবিকতা ও মানবতার দুশমন। আজকের দুনিয়াব্যাপী খুনোখুনি ও কাড়াকাড়ির মূল কারণ। অধিকাংশ মানুষ এই বর্ণ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের উর্ধ্বে না উঠলে অর্থাৎ এসব ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিহার না করলে অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে আজকের পৃথিবীর মুক্তি নেই।

মানুষের এই শোচনীয় অবস্থায় সব দেশেই কিছু সংখ্যক মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিক, মানবতাবাদী ও মানবদরদী জ্ঞানী-মনীষী ও কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক কল্যাণের পথে, শ্রেয়সের দিকে, উদারতার খোলা প্রাঙ্গণে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন শান্তি, প্রীতি ও মানবতার নামে। কিন্তু তাঁদের প্রভাব দুর্লক্ষ্য।

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে কেউ কেউ অনুযোগ করছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবেশী মুসলমান সমাজকে অবহেলা করেছেন (এমনকি মুসলিম বিদ্বেষের অভিযোগও আছে)। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা শোনা যায়। যাঁরা এই নিন্দা উচ্চারণ করেন, তাঁরা কবি-সাহিত্যিক। তাঁরাই আবার দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারক। তাহলে হিন্দুর কাছে তাঁরা এই দাবী করছেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এঁরা মুসলমানকে গালি দেননি, এটাই কি যথেষ্ট সৌজন্য ও উদারতা নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে তাঁরা নিজেরা গত বিশ-ত্রিশ বছর ধরে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। তাঁদের কোনো লেখায় হিন্দু-প্রীতি কিংবা সহিষ্ণুতার আভাস মাত্র নেই। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানীর শতকরা দশজন হিন্দুর নাগরিকত্ব তাঁরা মুখে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু ওদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারও কার্যত অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই তাঁদের। নইলে "ভাষা বদলাও, হরফ বদলাও, আরবি-ফারসি শব্দ বসাও কিংবা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বর্জন করো" প্রভৃতি যখন তাঁরা বলেন তখন তাঁরা দেশী হিন্দুর কথা ভাবেন না। সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে মুসলমানদের যা বর্জনীয়; হিন্দুর তাই বরণীয়। কাজেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজের স্বার্থে অন্যের অধিকার হরণ কিংবা অন্যকে সমসুযোগ থেকে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই অগণতান্ত্রিক অবিচার। আশ্চর্য, সর্বক্ষণ হিন্দু-বিদ্বেষ ও হিন্দুভীতি মনে পোষণ করেন যাঁরা, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করেছেন উদারতা ও প্রতিবেশীসুলভ প্রীতি, অথচ নিজেরা সে-উদারতা, সৌজন্য ও প্রীতির অনুশীলনে অনিচ্ছুক। মানুষের অবিবেচনারও একটা সীমা আছে। এ অনুযোগ যেন তাও অতিক্রম করছে। 'আমার বাড়ি যেতে কী নিয়ে যাবে আর তোমার বাড়ি গেলে কী খাওয়াবে'—ন্যায়ের মতো এটিও একপেশে ন্যায়। রবীন্দ্রনাথেরা যে-ভুল ও অন্যায় করেছেন বলে তাঁরা মনে করেন, নিজেদের সে-ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু সে-ঔচিত্যবোধের আভাস নেই তাঁদের চিন্তনে কিংবা বচনে।

আরো একটি অপযুক্তি তাঁরা প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁরা বলেন নজরুল এ ব্যাপারে আদর্শ। তিনি অসূয়ামুক্ত থেকে হিন্দু-মুসলমান ও তাদের ঐতিহ্যকে সমভাবে ভালবেসেছেন। তাঁরা ভুলে যান যে মুসলমানেরা দেশগত পরিবেষ্টনীর প্রভাব এড়াতে পারেননি, তাই মুসলমানমাত্রেরই রচনায় দেশীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি মুসলমানদের রচনায় এ মিশ্রণ দৃশ্যমান। হিন্দুর দেশ ও ধর্ম অভিন্ন অঞ্চলের, তাই যা দেশী তা ধর্মীয়ও বটে। এইজন্যেই হিন্দুর রচনা পুরোপুরি হিন্দুয়ানী বলে চিহ্নিত করা যেমন সহজ; তেমনি কঠিন নয় মুসলিম মনের উদারতা ও গ্রহণশীলতা প্রমাণ করাও। উভয়েই ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও নজরুল ইসলামের অবচেতন উদারতার কারণ এই তত্ত্বেই নিহিত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির হিন্দুয়ানীর রহস্যও এ-ই। অতএব একের সৌজন্য ও উদারতা এবং অপরের সংকীর্ণচিত্ততা ও অনুদারতার সাক্ষ্য নয় এসব।

কাজেই আস্তিক মানুষের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠ কেউ যদি প্রকাশে বিজাতি-বিদ্বেষ ব্যক্ত না করে থাকে—হোন না তিনি প্রতিবেশীর প্রতি অবহেলাপরায়ণ, তাহলেও তাঁকে উদার-হৃদয় সহিষ্ণু-সুজন বলে তারিফ করা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশে বৈশাখে

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। কলম হাতে নিয়েছি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব বলেই। কিন্তু তার আগে দু-একটা কথা সেরে নিই।

সাহিত্য শাস্ত্র নয়, জ্ঞানভাণ্ডার নয়, বিষয়-বিদ্যা তথা অর্থকর বিদ্যাও নয়। সব মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর রসপিপাসা থাকলেও তারা পরচর্চা করেই তা মিটিয়ে নেয়,—বড়োজোর গান-গল্প-কাহিনী মুখে মুখে শুনেই তারা তৃপ্ত থাকে। কাজেই সাহিত্য সবার জন্যে নয়। সাহিত্যানুরাগ আবাল্য অনুশীলন সাপেক্ষ। যারা সচেতনভাবে সাহিত্যরস গ্রহণে উৎসুক নয়, সাহিত্য তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয়। এজন্যে লেখাপড়া-জানা লোক মাত্রেই সাহিত্যপাঠক বা সাহিত্যানুরাগী নয়। এমন শিক্ষিত লোকও আছে, যারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে একটি গ্রন্থও পড়ে নি জীবনে।

সাধারণ মানুষ চলে প্রাণধর্মের তাকিদে। প্রাণীর প্রাণধারণের পক্ষে যা প্রয়োজন, তা পেলেই প্রাণী সন্তুষ্ট। সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষও জীবন ও জীবিকার অবলম্বন পেলেই আর কিছুরই তোয়াক্কা করে না। পশুর জীবন যেমন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিচালিত, সাধারণ মানুষের জীবনও তেমনি নীতি ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণে বিচলন ঘটায় কেবল লিপ্সা। বৈষয়িক জীবনে প্রয়োজন কিংবা সামর্থ্যাতিরিক্ত লিপ্সাই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় আনে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে। এই লিপ্সা নিয়ন্ত্রণের জন্যেই মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এই নিয়ন্ত্রিত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য বিধানের জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি।

AMARBOI.COM

এগুলোর মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন মনুষ্যত্ব ও মানবতা বিকাশের সহায়ক। মনুষ্যত্বের ও মানবতার অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের জন্যে এগুলোর চর্চা ছিল প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে-প্রয়োজন ও দায়িত্ব স্বীকার করে নি কখনো। তাই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কিংবা দর্শন চিরকালই গুটিকয় মানুষের সাধ্য-সাধনায় রয়েছে সীমিত।

সাহিত্য, শিল্প,সঙ্গীত ও দর্শন মানুষের আত্মার উপজীব্য। সাধারণ মানুষ অবশ্য আত্মা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা জানেও না ওটা কী বস্তু। সমাজ-ধর্মের সংস্কারবশেই তারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করে এবং সে-কারণেই পারত্রিক জীবনে আস্থা রাখে। তাই সমাজ-ধর্ম নির্দেশিত পাপ-পুণ্যবোধেই তাদের আত্মাতত্ত্ব সীমিত। যারা জীবনের গভীরতর তাৎপর্য-সচেতন, তারা জানে, চেতনাই আত্মা। এবং এ চেতনা পরিশীলন ও পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা, পরিস্রুত ও পরিমার্জিত চেতনাতেই মনুষ্যত্ব ও মানবতার উদ্ভব। বলতে গেলে—সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন একই সঙ্গে বীজ, বৃক্ষ ও ফল। কেননা সাহিত্যদর্শনাদি যেমন পরিস্রুতি ও পরিমার্জনার উপকরণ, তেমনি আবার পরিশীলিত চেতনার ফলও বটে। তাই সাহিত্যদর্শনাদি একাধারে আত্মার খাদ্য ও প্রসূন।

মানুষের মধ্যে যে-সব জীবনযাত্রী—বিষয়ে নয়—চেতনার মধ্যেই জীবনকে অনুভব ও উপভোগ করতে প্রয়াসী; সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন তাদেরই আত্মার খাদ্য। এসব তাদের জীবনের অপরিহার্য অবলম্বন। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কিংবা দর্শন চর্চা করে এ ধরনের লোকই শান দেয় তাদের চেতনায়। মনুষ্যত্বের দিগন্তহীন উদার বিস্তারে মানস-পরিভ্রমণ তাদের আনন্দিত করে, আর মানবতাবোধের অসীম অতল সমুদ্রে অবগাহন করে ধন্য হয় তারা।

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যত্ব ও মানবতার সাধনা ফলপ্রসূ নয় ব্যবহারিক জীবনে, বরং ক্ষতিকর। এজন্যে লোকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলে এ সাধনা। তাই এ পথ যাত্রীবিরল। তারা পরিহার করে চলে বটে, কিন্তু তাচ্ছিল্য করে না—কেবল বিষয়-লিপ্সাবশে এ পথ গ্রহণে উৎসাহ পায় না—এ-ই যা।

যে-স্বল্পসংখ্যক লোক মানুষের আত্মার খাদ্যরূপে এ ফসল ফলায়, আর যারা এর গ্রাহক, তারা বিষয়ে রিক্ত হলেও যে অন্তরে ঋদ্ধ, তা সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করে তাদের অনুভবের সুন্দরতম মুহূর্তে। এজন্যেই তারা হেলা করে বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাও রাখে।

এগুলোর মূল্য সম্বন্ধে তাদের অবচেতন মনের স্বীকৃতি রয়েছে বলেই লিপ্সুর বিষয়বুদ্ধি নিয়ে তারা এগিয়ে আসে এগুলোর মূল্যায়নের জন্যে এবং স্বার্থবুদ্ধিবশে বিধিনিষেধও আরোপ করতে চায় এগুলোর উপর। এমনকি ফরমায়েশ করবার ঔদ্ধত্যও প্রকাশ হয়ে পড়ে কখনো কখনো। স্বার্থপরের বিষয়বুদ্ধিপ্রসূত এই নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা সময়ে সময়ে জুলুমের পর্যায়ে নামে। এবং তখনই শুরু হয় মনুষ্যাত্মা, মনুষ্যত্ব ও মানবতার দুর্দিন।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন আত্মার উপজীব্য বলেই যারা চেতনা-গভীর জীবন কামনা করে, এগুলোর স্রষ্টা তাদের আত্মীয়। আত্মার জগতে দেশ-কাল-জাত-ধর্ম নেই। তাই দেশ, কাল, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয়তায় চিহ্নিত নয় এ চেতনালোক। এখানে যে কেউ আত্মার খাদ্য যোগায় সে-ই আত্মীয়। যা কিছু এ চেতনার বিকাশ-বিস্তারের সহায়ক, তা-ই বরণীয়।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষের যা কিছু সার্থক সৃষ্টি তা চেতনা-প্রবণ বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ, রিক্‌থ ও ঐতিহ্য। একক চন্দ্র-সূর্য যেমন সবার এজমালি হয়েও প্রত্যেকের অখণ্ড সম্পদ, এবং দ্বন্দ্ব না করেই প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো পেতে পারে এগুলোর প্রসাদ ; তেমনি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত আর দর্শনও দেশ-কাল-জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ সর্বমানবিক সম্পদ। কল্যাণ ও সুন্দরের ক্ষেত্রে কোনো মানবতাবাদীই মানে না জাত ও ভূগোল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতকার ও দার্শনিক। তাই রবীন্দ্রনাথ চেতনা-প্রবণ মানুষমাত্রেরই আত্মীয়। পাক-ভারতে ইতিপূর্বে মানবাত্মার এত বিচিত্র খাদ্য আর কেউ রচনা করেননি। পৃথিবীর ইতিহাসেও এমন রকমারি ফসলের স্রষ্টা সুদুর্লভ! এত বড়ো মানবতাবাদীও ঘরে-ঘরে জন্মায় না। পৃথিবীর আত্মীয়-সমাজে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরমাত্মীয়। কেননা, যে-ভাষা আমাদের জীবনানুভূতির ও জীবনোপভোগের বাহন, যে-ভাষা আমাদের জীবনস্বরূপ, সেই আত্মার ভাষাতেই আমাদের আত্মার উপজীব্য দিয়ে গেছেন তিনি। এত বড়ো সুযোগ ও সৌভাগ্যকে হেলা করার মতো নির্বোধ হই কী করে! জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সাধনের যে-দিশা ও দীক্ষা আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি, আজকে গরজের সময়ে যদি তা আমাদের পাথেয় করতে পারি, তবেই ঘটবে আমাদের মনের মুক্তি। আর আমাদের চেতনায় পাব মানবতার স্বাদ।

সম্প্রতি জাতির হিতকামী কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে শঙ্কিত, আতঙ্কিত কিংবা দুর্ভাবনাগ্রস্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য নাকি আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংসী। অন্য কোনো বিদেশী সাহিত্যের কু-প্রভাব কিংবা কুফল সম্বন্ধে কিন্তু চিন্তিত নন তারা। অন্তত তাঁদের কর্মে ও আচরণে এখনো প্রকাশ পায়নি সে-ত্রাস। নইলে ইসলামী রাষ্ট্রের মুমীন নাগরিকের উপর চীন-রাশিয়ার ধনসাম্যবাদী নাস্তিক্য সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই অমঙ্গল দেখতেন তাঁরা এবং শঙ্কিত হতেন মার্কিনী যৌন ও গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা দেখে। এ বিষয়ে হিতবুদ্ধিপ্রসূত কোনো অসন্তোষও তাঁদের মুখে প্রকাশ পায় নি কিংবা প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের এই নিশ্চিন্ত উদারতা দেখে মনে হয়, তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একাকিত্বে কিংবা স্বাতন্ত্র্যে মন-বুদ্ধি-আত্মার বিকাশ নেই, এবং বহির্বিশ্বের আলো-বাতাসের লালন না পেলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বোধের উন্মেষ হয় না কিংবা গণসংযোগ ব্যতীত ভাব-চিন্তা-কর্মের প্রসার অসম্ভব। কেননা, মানুষের জীবন পরিবেশ ও পরিবেষ্টনী নির্ভর। সে-পরিবেষ্টনী যার জগৎ-জোড়া, তার জীবনের বিস্তার ও চেতনার গভীরতা নিশ্চয়ই বেশি। তা হলে তাঁদের রবীন্দ্র-সাহিত্য বিরোধিতার কারণ অন্য কিছু। আমরা অন্তর্যামী নই। কাজেই সে-কথা থাক।

কিন্তু আমাদের অন্য প্রশ্নও আছে। স্বধর্মী বলেই যদি ভারতের জাতীয় কবি গালেব-হালি-নজরুল পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রিয় ও প্রেরণার উৎস হতে পারেন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের অমুসলমান নাগরিকরাই বা কেন তাদের স্বধর্মী বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রভৃতির সাহিত্য পড়ার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে! হিন্দু-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়ে যদি মুসলমানের সংস্কৃতি নষ্ট হয়, তা হলে হিন্দুর সংস্কৃতি নিশ্চয়ই প্রাণ পায়। পাকিস্তানের অমুসলমানেরও যদি সমনাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়, তা হলে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচর্চার অধিকারও মেনে নিতে হবে। সংখ্যাগুরুর স্বার্থে সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ নিশ্চয়ই অগণতান্ত্রিক। অতএব শিশু, ছাত্র, মহিলা, সৈনিক, বুনিয়াদী গণতন্ত্রী প্রভৃতির জন্যে যেমন রেডিয়ো-টেলিভিশনে স্বতন্ত্র আসরের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি শক্তি-বৈষ্ণব ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরও থাকা উচিত। কেননা, সমদর্শিতাই সুবিচারের পরিমাপক।

মহৎচিত্তের ভাব-চিন্তা জ্যোৎস্নার মতোই সুন্দর, স্নিগ্ধ ও প্রীতিপদ। জ্যোৎস্না কখনো ক্ষতিকর হয় না। ও কেবল আলো ও আনন্দ দেয়, স্বস্তি ও শান্তি আনে আর দূর করে ভয় ও বিষাদ। মহৎসৃষ্টিও মানুষের মনের গ্লানি মুছে দিয়ে চিত্তলোকে আশা ও আনন্দ জাগায়, প্রজ্ঞা ও বোধি জন্মায়, আর জগতে ও জীবনে লাবণ্যের প্রলেপ দিয়ে বৃদ্ধি করে জীবন-প্রীতি,—দীক্ষা দেয় মনুষ্যত্বে ও মানবতার মহিমায় চেতনায়। এই কারণেই তো সাহিত্যরস তথা কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। জীবনে মানুষ ও প্রকৃতির দেয়া দুঃখ-যন্ত্রণার অন্ত নেই। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন—এসব জীবন-যন্ত্রণা ভুলবার অবলম্বন। তা থেকে বঞ্চিত হলে কী করে বাঁচবে হৃদয়বান চেতনা-প্রবণ মানুষ!

AMARBOI.COM

এজন্যেই দেশী লেখক-প্রকাশকের নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন তরক্কী বাঞ্ছায় বিদেশী গ্রন্থের আমদানি বন্ধের আমরা বিরোধী। জীবনের আর আর ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি ও ব্যবহারিক অসুবিধা স্বীকার করেও দেশী শিল্প ও সম্পদের আনুকূল্য করব। কিন্তু মনের চাহিদার ক্ষেত্রে দইয়ের সাধ ঘোলে মিটানো অসম্ভব। এখানে রস-পিপাসা মিটাতে অকৃত্রিম রসেরই প্রয়োজন। জৈব চাহিদা আর মানস-প্রয়োজন অভিন্ন নয়। লা মিজারেবল, ওয়ার এ্যান্ড পিস, মাদার, জাঁ ক্রিস্তফ কিংবা ঘরে-বাইরে পড়ার সাধ আনোয়ারা, মনোয়ারা, সোনাভান পড়ে মিটবে না। তাছাড়া এ যখন আমার শখের ও সাধের পড়া, এখানে বাধ্য করা পীড়নেরই নামান্তর। আমি পড়ি—আমার বৈষয়িক, আর্থিক, জৈবিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্যে, আর আমার চিত্তের সৌন্দর্য-অন্বেষা ও রসপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে। আমি পড়ি—আমার আত্মার বিকাশ কামনায়—আমার চেতনার প্রসার বাঞ্ছায়,—আমার মানবিকবোধের উন্নয়ন লক্ষ্যে ও আমার মানবতাবোধের বিস্তার কল্পে।

যাতে আমি আনন্দ পাইনে, তা দিয়ে আমি কী করে সৃষ্টি করব আমার পলাতক মনের আনন্দ-লোক! কাজেই বইয়ের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা কল্যাণকর নয়। দেশের ভালো বই পড়ব তো নিশ্চয়ই, গর্বও বোধ করব তার জন্যে। সে-বইয়ের যে প্রতিযোগিতার ভয় নেই, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করব বলেই কলম হাতে নিয়েছিলাম। নানা কথার চাপে মূল বিষয় হারিয়ে গেছে বটে, তবে মূল উদ্দেশ্য হয়তো ব্যর্থ হয় নি। কেননা, রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রীতিই এসব বাজে কথা জাগিয়েছে আমার মনে। সবভাষা আমাদের জানা নেই। বিশ্বের সেরা বইগুলো কখনো পড়া হবে না জীবনে। এইসব বই যে-সব মহৎমনের সৃষ্টি, সে-সব মনের ছোঁয়াও মিলবে না কখনো। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সে-সব মহৎ মনের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করে বঞ্চিত আত্মাকে প্রবোধ দিতে চাই আমরা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের চিত্তদূত—মানবতার দিশারী, আমাদের সামনে এক আলোকবর্তিকা, এক অভয়শরণ, এক পরম সান্ত্বনা। আমার ভাষাতেই তাঁর বাণী শুনতে পাই, তাঁর ভাষাতেই আমার প্রাণ কথা কয়—আমার এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে অকালে, অতর্কিতে ও অভাবিতভাবে ঘটল আমাদের মধ্যযুগের অবসান। এ যেন অমাবস্যার নিশীথে হঠাৎ সূর্যোদয়, এ যেন কাঁচা ঘুমে জেগে উঠা। আধুনিক যুগের এই উষালগ্নে চকিত-চমকিত জনের মানস স্বাস্থ্যানুসারে কেউ বিমূঢ়, কেউ বিরক্ত আবার কেউ বা কৌতূহলী। নবযুগের সূচনায় যাঁকে সপ্রতিভ কৌতূহলী হিসেবে পাই তিনি রামমোহন। পশ্চিমী চেতনার বাতায়নিক বায়ু সেবনে তাঁর চিত্তলোক প্রসারিত—প্রতীচ্য জ্ঞানরশ্মিতে তাঁর প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত, তাঁর উদ্যম উদ্দীপ্ত—তাই তিনি চঞ্চল, মুখর ও অক্লান্ত। তাঁর মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি বুদ্ধির মুক্তি—পশ্চিমী জীবন-চেতনার প্রথম ফল।

পাশ্চাত্য হাওয়া অনেককাল কোলকাতার চৌহদ্দি অতিক্রম করতে পারেনি, কেননা, ইংরেজি শিক্ষা তখনো পরিব্যাপ্ত হয়নি মফস্বল অঞ্চলে। এখানেই আমরা বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত থেকে ইয়ং বেঙ্গল অবধি সবাইকে চেতনা-চঞ্চল দেখি। তখন পাশ্চাত্য নাস্তিক্য দর্শন, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং ফরাসী বিপ্লবের মহিমাই ছিল মুক্তবুদ্ধি তরুণদের অনুধ্যেয়। অন্যেরা গ্রহণ-বর্জনের টানাপড়েনে দ্বিধান্বিত, কেউ কেউ বিপর্যস্ত। বস্তুত রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রামকমল, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া তারুণ্যের অবসানে আর সবাই অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গলেরা হিন্দুয়ানীতেই স্বস্তি খুঁজেছেন ১৮৬০-এর আগে ও পরে। অবশ্য লালবিহারী, কৃষ্ণমোহন, মধুসূদন প্রমুখ খ্রীস্টানই রয়ে গেলেন। তখন ব্রাহ্ম হওয়া আর ব্রাহ্ম থাকাই ছিল চরম আধুনিকতা তথা প্রগতিশীলতা।

এভাবে নাস্তিক্য দর্শন তাঁদের জীবনে হল ব্যর্থ, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসাদ ছিল অনায়ত্ত আর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব রইল অনাগত।

আগে ছিল ভূমি-নির্ভর কড়ির জীবন। এখন নগরে দেখা দিল বেনে সমাজের কাঁচা টাকার লেনদেন। নগুরে বাঙালি ব্রিটিশ বেনের বেনিয়া-ফরিয়া-কেরানী হয়েই সে-কাঁচা টাকার প্রসাদে ধনী ও মানী। বুর্জোয়া-জীবনের পরোক্ষ স্বাদ পেয়েই তারা ধন্য ও কৃতার্থ।

তারপর ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হল। প্রতীচ্য চেতনারশ্মি গ্রামেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সে-চেতনা ছিল গোড়া থেকেই বিকৃত, বিসদৃশ, অস্পষ্ট ও অজাতমূল। বৈশ্য বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যযুগীয় ভূমি-নির্ভর সামন্তিক সমাজে হঠাৎ করে চালু হল পশ্চিমের শিল্পায়ত সমাজের বুর্জোয়া অর্থনীতি। অকালে ও অস্থানে এই অতর্কিত ব্যবস্থা নিয়ে এল এদেশের নিস্তরঙ্গ আর্থিক জীবনে চরম বিপর্যয়। সাম্রাজিক শোষণ, ঔপনিবেশিকতা, যন্ত্রজাত পণ্যপ্রাধান্য, অটল সামন্তব্যবস্থা, জনগণের অশিক্ষা, বুর্জোয়া জীবনানুরাগ আর মনোজগতে শিক্ষালব্ধ মানবিক ও আত্মিক জীবন-চেতনার প্রসার প্রভৃতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম দিল, যার সমাধানবুদ্ধি ছিল না বিমুগ্ধ, বিমূঢ়, বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত জনগণের।

সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, শিল্পবিপ্লব, বেনেবুদ্ধি, সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতি ছিল ইংরেজের জীবন-চেতনাজাত ও সমাজ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতি প্রসূত স্বাভাবিক জীবনচর্যার প্রসূন। সে-পরগাছা লালনের প্রস্তুতি ছিল না আমাদের দেশে। যে আবহাওয়ায় ও-সবের উন্মেষ ও বৃদ্ধি, সে-আবহাওয়া ছিল অনুপস্থিত ও অজ্ঞাত। তাই এদেশের মাটি ও-সবের কোনোটাই গ্রহণ করেনি বটে, কিন্তু সবগুলোর পীড়ন সইতে হয়েছে তাকে। অতএব, ইংরেজি শিক্ষার সূচনায় যে অকাল বসন্তের আভাস দেখা দিয়েছিল, রঙধনুর মতোই মিলিয়ে গেল সে-ক্ষণবসন্ত। বাসন্তী হাওয়া গায়ে লাগার আগেই যেন দেখা দিল হিমেল হাওয়ার দৌরাত্ম্য। কৃত্রিম আশ্বাস এভাবে বিদায় নিল অকৃত্রিম যন্ত্রণার জন্ম দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজ্ঞ, মূক ও দৈব নির্ভর মানুষের দারিদ্র্য দুঃখ বেড়ে চলল বটে, কিন্তু এটি নিয়তির লীলা ও আল্লাহর 'মার' বলেই জেনে আত্মপ্রবোধ পাওয়া কঠিন হল না। কাজেই কিসে কী হয়, সে তত্ত্ব রইল অজ্ঞাত।

যারা নগুরে তারা ইংরেজ বেনের উচ্ছিষ্ট পেয়েই ধনী ও ধন্য। ব্যবহারিক জীবনের ঐশ্বর্যে, চাকচিক্যে ও ভোগের নতুনতর রীতির আস্বাদনে তারা বিমুগ্ধ। যাদের বদৌলতে এ প্রাপ্তি, সেই ইংরেজ এখন তাদের প্রমূর্ত ভগবান। ছায়াকে কায়া বলে অনুভব করার বিড়ম্বনা তখনই টের পাওয়ার কথাও নয়।

এঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত ও মননশীল, তাঁরা জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির ঈষৎ অনুভূত পীড়া ও বেদনা থেকে মুক্তি কামনায় য়ূরোপীয় জীবন প্রতিবেশের আর এক দান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প চর্চায় আত্মনিমগ্ন থেকে চিত্তলোক প্রসারে আনন্দিত হতে চেয়েছেন।

য়ূরোপে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার, মানসোৎকর্ষ ও বৈশ্য সভ্যতার বিকাশ তথা বুর্জোয়া সমাজের প্রাধান্য ছিল ঐতিহাসিক বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি এবং সে কারণেই স্বতঃস্ফূর্ত। এর কোনোটাই অনুকূল ছিল না আমাদের দেশে। এজন্যে আমাদের জ্ঞানী-মনীষীরা য়ূরোপীয় জীবনের ও যুগের মর্মবাণী স্বরূপে উপলব্ধি করতে হয়েছেন অসমর্থ। তবু অবচেতন প্রেরণায় নতুন যুগ ও পরিবেশকে তাঁরা গ্রহণে ছিলেন উন্মুখ, যদিও সামর্থ্য ও সুযোগ ছিল সামান্যই। ব্যবহারিক জীবনে বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য অর্জনের উপায় ছিল না বলে তাঁদের সাধনা হয় অন্তর্মুখী। এভাবে আর্থিক জীবনে প্রতিহত হয়ে তাঁরা মানবিক ও আত্মিক চেতনা প্রসারে হন প্রয়াসী। ব্যবসায় দ্বারকানাথের অসাফল্য দেশের স্বাদেশিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক চেতনা বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়েছে, দেখতে পাই।

য়ূরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের ব্যবহারিক ও মানস ঐশ্বর্যে মুগ্ধ লুব্ধচিত্ত বাঙালির ঘরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এই ঘরে সামন্ত জীবনের দাপট ও বুর্জোয়া জীবনের ঐশ্বর্যের আশ্চর্য মিলন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই য়ূরোপে বুর্জোয়া জীবন বিকাশের পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর জন্মোত্তরকালে বুর্জোয়া সমাজের গ্লানি, ত্রুটি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। কিন্তু সে খবর উনিশ শতকেও এদেশে পৌঁছেনি। কাজেই বুর্জোয়া সমাজ; বেনে বুদ্ধি ও বৈশ্য সভ্যতাই ছিল শিক্ষিত বাঙালির অনুধ্যেয় জীবন স্বপ্ন। তাতে আবার ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা তখনো বুর্জোয়া জীবনের কোনো প্রসাদ থেকেই ছিলেন না বঞ্চিত। ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তি যা-কিছু মানব কাম্য, যা-কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন তা ছিল জন্মসূত্রেই আয়ত্ত। এ জীবন দেশগত তথা প্রতিবেশ প্রসূত নয়—এ হচ্ছে দেখে শেখা ও পড়ে পাওয়া কৃত্রিম ও অনুকৃত জীবন— এ দেশে অজাতমূল। কাজেই গোটা দেশের প্রয়োজন ও সমস্যার সঙ্গে এ জীবনের যোগ ছিল না—তাই দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনাও ছিল অনুস্থিত। কিন্তু নেতৃত্বের সহজ অধিকার বশে তাঁরা সভাপতিত্ব করতেন বটে, কিন্তু তাতে সেবার প্রেরণা ছিল না, ছিল সৌজন্যের আড়ম্বর।

এ হেন পরিবেশের সন্তান রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতা এখানে যে তিনি মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতির অনুশীলনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের মানবিক গুণে ও আত্মিক উৎকর্ষে আস্থা রাখতেন, অনুকূল আবহাওয়ায় মানুষের সদ্বুদ্ধি ও সৌজন্যেই পীড়ন ও পাপমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—এ ধারণা বশেই তিনি জাগতিক সব অন্যায়-অনাচারের ব্যাপারে মানুষের বিবেক ও বোধের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। কোনো বাস্তব পন্থায় সমাধান প্রয়াস তাঁর কাছে হয়তো মনে হয়েছে কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক—যা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলেই টেকসই নয়।

দৈশিক পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক অমোঘতায় যে চেতনার জন্ম, সে-চেতনা সমস্যার প্রকৃতি ও সমাধানের উপায় নির্ধারণে সহজেই সমর্থ। কিন্তু যে-চেতনা পড়ে পাওয়া এবং পরিস্রুতি ও অনুশীলন প্রসূত তা তত্ত্বপ্রবণই করে—সক্রিয়তা দেয় না। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধও তাই সংবেদনশীলের মহাপ্রাণতাজাত—সমস্যা-বিব্রত দেশকর্মীর নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্যেই তিনি চাষী-মজুরের হিতকামনা করেছেন, তাদের স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দিতেও চেয়েছেন। সমবায় সমিতি গড়েছেন কিন্তু প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন নি। জমিদার যে পরোপজীবী ও পরস্বাপহারী তা উপলব্ধি করেও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদে সক্রিয় হন নি।

পীড়নমুক্ত মনুষ্য সমাজ দেখবার জন্যে তাঁর আবেগ ও আকুলতার অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগও ছিল অশেষ। কিন্তু কৃত্রিম বুর্জোয়া পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে সমাধানের বাস্তবপন্থা গ্রহণে ছিলেন অসমর্থ। এজন্যে রবীন্দ্রনাথ হিতকামী দার্শনিক—কর্মী পুরুষ নন।

কৌতূহল থাকলে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কার্লমার্কসকে (১৮১৮-৮৩) চাক্ষুষও করতে পারতেন। তাঁর প্রৌঢ় বয়সে রাশিয়ায় মার্কসের আদর্শ সমাজ মূর্তিলাভ করতেও দেখলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সে-প্রভাব অনুপস্থিত। এমনকি রাশিয়া স্বচক্ষে দেখেও তিনি দ্বিধামুক্ত হননি। মার্কসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষ। কেননা বর্ণে বিন্যস্ত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতেই ছিল সাম্যবাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যেহেতু জনমনে ছিল মধ্যযুগের ঘোর, সামন্ত ও পেটি বুর্জোয়া জীবন ছিল প্রসারমুখী, এর জ্ঞানী-মনীষীরা ছিলেন বুর্জোয়া-জীবনের মানস-ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ এবং তার উপর ছিল পরাধীনের অসামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাসের অভাব ; সেহেতু সাম্যবাদ এখানে শিকড় গাড়তে পারেনি। এ আবহাওয়ার সন্তান মানবতাবাদী মানবদরদী রবীন্দ্রনাথও তাই চিন্তানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। মার্কস পেলেন তাঁর অবহেলা।

প্রসঙ্গত নজরুল ইসলামের নামও এ সূত্রে মনে পড়ে। স্বাধীনতা ও সাম্যকামী হয়েও তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। উভয়ের ক্ষেত্রেই কারণ সম্ভবত অভিন্ন। বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব বা তথ্য কিংবা উপায় বা আদর্শ আবেগগত না হলে তা জীবনে আচরণীয় হয়ে উঠে না। বিশেষ করে আস্তিক ও আত্মাবাদীরা নাস্তিক্য ভিত্তিক ধনসাম্যবাদ মানতে চায় না। কেননা তাঁদের চেতনায় 'Man does not live by bread alone' তত্ত্বের গুরুত্ব অশেষ। এ শ্রেণীর লোকই 'Animal Farm' জাতীয় গ্রন্থে নিজেদের বোধ ও বিজ্ঞতার সমর্থন পেয়ে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়। কিন্তু ধনসাম্য যে মানুষের দেহ-মন-আত্মার পার্থক্য মুছে দেয় না কিংবা সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিকাশ যে ব্যাহত করে না, ধনসাম্য যে শক্তিসাম্য ঘটায় না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, প্রজ্ঞা, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠা বুর্জোয়া কিংবা পুঁজিবাদী সমাজের মতোই যে সম্ভব, কেবল তা নয় ; ব্যবহারিক, সামাজিক জীবনেও সামর্থ্যানুসারে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি তা মান-যশ-প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকে অক্ষুণ্ন—বরং বাড়ে। কেননা ধনে লভ্য কৃত্রিম শক্তির প্রয়োগ এখানে অচল বলেই যোগ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ যে সহজ—তা তারা বুঝতে চায় না।

ধন্যসাম্যবাদীরা খাদ্যবস্তুর অভাব, তার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিই মানুষের যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, পীড়ন-শোষণ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস বলে বিশ্বাস করে। জীবিকা তথা খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন-আহরণ যারা করে তারা শ্রমজীবী শ্রেণী আর যারা কৃত্রিম উপায়ে পরোপজীবী তারা শোষক শ্রেণী। এদের সম্পর্ক হয়েছে উৎপাদক ও নিষ্ক্রিয় উপভোগীর, শোষক ও শোষিতের, পীড়ক ও পীড়িতের, বুর্জোয়া ও প্রলিতারিয়েতের, পুঁজিবাদী ও দরিদ্রের, সামন্ত ও ভূমিদাসের, মালিকের ও মজুরের, ধনী ও নির্ধনের, বেনের ও ক্রেতার, মহাজন ও খাতকের, মেহনতি জনতা ও পরশ্রমজীবী সবলের। কাজেই এদের মধ্যে সচেতন কিংবা অচেতন একটা দ্বন্দ্ব; বৈর কিংবা প্রতিপক্ষতা রয়েছে। এর নাম শ্রেণীসংগ্রাম। জীবন-চেতনার বিশেষ বিকাশের সঙ্গেই এর শুরু। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি; জীবিকার দুর্লভতা, জীবনবোধের প্রসার ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ সংগ্রাম স্পষ্ট ও তীব্রতর হচ্ছে। অতএব মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে উৎপাদনে ও বণ্টনে সমতা বিধান করে প্রত্যেক মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থা করার মধ্যেই। তাই মানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম এই শ্রেণী- সংগ্রামের অবসান কল্পে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এজন্যেই বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিরও এ সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। এসবের আলাদা কোন উদ্দেশ্য বা সার্থকতা থাকতে পারে না— অন্তত থাকা উচিত নয়। এগুলো আগে পরশ্রমজীবী শোষকদের চিত্তবিনোদনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োজিত হয়েছে,এখন হবে শোষিতের মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক। কাজেই রাষ্ট্রসংস্থার নিয়ন্ত্রণে জনগণের কর্ম ও চিন্তাগত যৌথ প্রয়াসে মানবিক সমস্যার সমাধান ও জীবিকার সুব্যবস্থাই হচ্ছে দৃষ্টিগ্রাহ্য একমাত্র উপায়।

রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, তাঁর রচনা এই সংগ্রামী প্রেরণা প্রসৃত নয়। তাঁর মানবতাবোধ ও মানবপ্রীতি বুর্জোয়া উদারতার প্রসূন মাত্র। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্য কালপ্রবাহে দেশের মৃত ঐতিহ্য মাত্র। এর মূল্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে—জীবনের উপকরণ রূপে নয়। অতএব বামপন্থীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো উপযোগ মূল্য নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম তমদ্দুনবাদীদের মতও স্মরণীয়। তাদের কাছেও রবীন্দ্রসাহিত্য তাদের সংস্কৃতিবিধ্বংসী। একদলের পক্ষে পরিত্যাজ্য বুর্জোয়া সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে। তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ যুগের সৃষ্টি ও যুগধর—যুগোত্তর কিংবা যুগ প্রবর্তক নন।

২

অতএব রবীন্দ্রসাহিত্যের অপমৃত্যু আসন্ন! অবশ্য কাল সবকিছুকেই গ্রাস করে। রবীন্দ্রনাথও একসময় প্রাচীন কবি হবেন, তাঁর অধিকাংশ রচনা মূল্য হারাবে—রবীন্দ্র-মহিমাও হবে ম্লান। ইতিমধ্যেই আধুনিক কবিতা ও গান রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু এত শিগগির যে রবীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবেন, তা ছিল অভাবিত।

অবশ্য এর মধ্যে ভরসার কথা এই যে এ বিরূপতা বিচারের ফল নয়— আদর্শিক প্রতিপক্ষতার স্বাক্ষর মাত্র। আদর্শে অনুগত মানুষের বিচারশক্তি থাকে না—থাকে আচ্ছন্ন মনে advocacy-র প্রবণতা। আদর্শিক প্রয়াসের সিদ্ধিবাঞ্ছায় তারা চালিত হয় আবেগে—বিবেক-বুদ্ধি হয় অবহেলিত।

উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্যেই-যে সমাজে ধনবৈষম্য ও তজ্জাত অন্যান্য সর্বপ্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সচেতন বা অচেতন শ্রেণীসংগ্রাম আধুনিক কালের চেতনাপ্রসৃত—পুরাকালে এর উপস্থিতির সাক্ষ্য মেলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের চেতনায় এর কোনো নজির পাইনে। মুসাতে দেখি পাপ-ভীতি, ঈসার মধ্যে পাই ধনভীতি ও প্রীতির কথা, হযরত মুহম্মদের বাণীতে দেখি দাস ও দরিদ্রের প্রতি দাক্ষিণ্যের কথা এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব কিন্তু ধন সাম্যের নয়। বুদ্ধে রয়েছে জন্ম-জরার ত্রাস আর করুণা ও মৈত্রীর কাঙ্ক্ষা ও ধন-বিরাগ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পাই লোভের পরিণামভীতি ও ভোগে অনাসক্তির গুরুত্ব। চৈতন্য প্রচার করেছেন বৈরাগ্য ও ও প্রীতির মহিমা, কনফুসিয়াস কিংবা লাও-সে (Lao tse) ধনসাম্যের কথা বলেননি। এঁদের সবারই আবেদন ছিল মানুষের আত্মার কাছে, সদ্বুদ্ধির প্রতি। এঁরা সবাই যুগানুগত ও মানবতাবাদী।

সুশৃঙ্খল সমাজ লক্ষ্যে সবাই চেয়েছেন নীতিনিষ্ঠা ও ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠা, উৎসাহ দিয়েছেন দয়া-দাক্ষিণ্যে—কিন্তু ধন বৈষম্যের অভিশাপের কথা কারো মুখে শোনা যায়নি। বস্তুত মার্কস-পূর্ব যুগে উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্যই যে মানবিক যন্ত্রণার গোড়ার কথা এবং সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাস যে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিকথা, তা কখনো উচ্চারিত হয়নি। অবশ্য এসব মনীষীর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যদি কেউ শ্রেণীসংগ্রাম এড়ানোরই অবচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করেন, তা হলে আমরা নাচার।

কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের চিন্তানায়ক রুশো-মন্টেগ-ভল্‌ট্যায়ার কিংবা মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌-লেনিন থেকে আজকের দিনের যে কোনো দেশের অধিকাংশ কম্যুনিস্ট নেতা, কর্মী কিংবা চিন্তাবিদ বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া এমনকি পুঁজিপতির সন্তান। Zeno থেকে Nicolite খ্রীস্টান বা জোসেফ প্রোচোন, বাকুনীন বা Hippie অবধি কোনো anarchist-ই গরিব ঘরের নন। কাজেই Suffering থেকেই সংগ্রামের শুরু অর্থাৎ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম চিরন্তন—এই তত্ত্বে সত্য নেই। অতএব চিরকাল মানবিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা বা সংগ্রাম করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতাবাদীরাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত দরিদ্ররা এত প্রচারণার পরেও আত্মস্বার্থে ধনসাম্যতন্ত্রে তথা সমাজতন্ত্রে আজো উৎসাহবোধ করছে—না এটিই কি শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের অনুপস্থিতির বড় প্রমাণ নয়! এতে বোঝা যায় মানবতাবোধ, মানবপ্রীতি, সংবেদনশীল মন, সংগ্রামী প্রেরণা প্রভৃতি আবেগযুক্ত হলেই ব্যক্তিবিশেষ শোষণ-পীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত মনুষ্য-সমাজ বাঞ্ছা করে কিংবা গঠনে উদ্যোগী হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন কালের মানবতাবাদী মানবদরদীরা সহানুভূতির আবেগেই সুশৃঙ্খল ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রত্যেকেই দেশকালের প্রেক্ষিতে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষের সামাজিক তথা আত্মিক কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। ক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে, জীবিকা হয়েছে অপ্রতুল, পৃথিবী হয়েছে সংহত, কাজেই সমস্যাও হয়েছে জটিল—সমাধানের উপায়ও হয়েছে বহু ও বিচিত্র। মার্কসোত্তর যুগে মার্কসপন্থীর সমাজতন্ত্র তাই মানব-সমস্যা সমাধানের নতুনতম পন্থা। গরিবদেশের সমস্যা সমাধানে সমাজতন্ত্র তথা ধনসাম্যবাদ প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী—তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিও স্থায়ী সমাধান নয়, ঐতিহাসিক ধারার আধুনিক রূপ মাত্র।

অতএব হযরত ইব্রাহিম থেকে মাও সে-তুঙ অবধি সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করে এসেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও পদ্ধতির। সবাই মানবদরদী ও মানবতাবাদী। সবার জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা অভিন্ন ছিল না, কাজেই উপায়ও এক থাকেনি। মানুষের সমস্যাও পরিবেশগত। তাই সমাধান পদ্ধতিও হয়েছে স্থানিক ও কালিক। তাই কারো কল্যাণ প্রচেষ্টাই স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালিক ও সর্বমানবিক হয়নি।

রবীন্দ্রনাথও মানবতাবাদী। তিনি মুখ্যত কবি-মনীষী—কর্মী নন। তাঁর কর্তব্য ছিল মানুষকে আত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করা—বাস্তবে রূপায়ণ নয়। আবহমান কালের ধারায় তিনি যুগ-প্রতিনিধি। তাঁর আবেদন মানুষের সদ্বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে। কম্যুনিস্টদের আবেদনের লক্ষ্যও তাই। কম্যুনিস্ট বল প্রয়োগে বিশ্বাসী। মানবতাবাদী কবি স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-বুদ্ধির বিকাশে আস্থাবান। সামন্তবাদী, ঔপনিবেশিকতাবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, অধ্যাত্মবাদী প্রভৃতি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে কোনো মানবতাবাদীকে বিচার করা অবিচারের নামান্তর। নিজের মত-পথকেই কেবল একমাত্র ও অভ্রান্ত ভাবা অসহিষ্ণুতা ও মানব-মনীষার প্রতি অশ্রদ্ধা তথা ব্যক্তিক সত্তার অবমাননার নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সমান্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তিনটেই স্বচক্ষে দেখেছেন—বুঝবার শক্তিও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন আত্মিকবোধ না জন্মালে বাহুবলে আর্থিকসাম্য স্থাপন স্থায়ী হতে পারে না। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের যোগ না ঘটলে তা স্বভাবে পরিণতি পায় না। স্বেচ্ছা সম্মতি আর জবরদস্তির 'সায়' এক বস্তু নয়।

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার সাধনাই করেছেন, কল্যাণ ও সদ্বুদ্ধি প্রসূত স্বেচ্ছাসম্মতি দানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানবকল্যাণকামী স্বেচ্ছা-সৈনিক। তাঁর এই জীবন-দৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য।

গল্পে-প্রবন্ধে-নাটকে-কাব্যে কত ভাবে তিনি দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিভেদ-বিরোধ, শোষণ-পীড়ন ও অপ্রেম-অশ্রদ্ধামুক্ত সমাজ-চিন্তা জাগানোর চেষ্টা করেছেন! ন্যায়যুদ্ধে কত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি!

তবু, তা কারো 'ism'-সম্মত হল না বলে তাদের কাছে তা অকেজো ও অশ্রদ্ধেয়। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্য আজ তাদের কাছে না ঘরকা না ঘাটকা! মানুষকে ভালবাসার এ এক অভিনব বিড়ম্বনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী বলে যে কথা উঠেছে, যে আশঙ্কা আমাদের জাতি-প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের মনে জেগেছে, তা নিরসনের জন্যে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী আর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সদিচ্ছা নিশ্চয় শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কল্যাণকামী হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা সহানুভূতিও জাগায়। কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছা সৎসাহসপুষ্ট নয়—এবং সদিচ্ছার সঙ্গে সৎসাহসের যোগ না হলে সাফল্য থাকে অসম্পূর্ণ; এমনকি স্থান-কাল বিশেষে সাফল্য অর্জন হয় অসম্ভব।

রবীন্দ্রসাহিত্য যে আমাদের অকল্যাণের নয় বরং আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ বিকাশের সহায়ক—এই কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যে তাঁরা যে-সব যুক্তির অবতারণা করেন আর যে-সব তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করেন, তাতে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতেই রবীন্দ্রনাথকে করেন অপমানিত আর নিজেরা বরণ করেন কৃপাজীবীর লজ্জা।

তাঁরা প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিরোধ করতে চান না, তাঁরা অনুগ্রহকামীর মন-বুদ্ধি নিয়ে হুজুরের দরবারে তদবিরে নিরত। বিরোধীদের ক্ষমা ও প্রশ্রয়বাঞ্ছায় তাঁরা পেশ করেন আবেদন-নিবেদন, যাচ্ঞা করেন কৃপাদৃষ্টি। তাই তাঁরা সভায় ও লেখায় বলে চলেছেন ; রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন হাফিজের কাব্যের অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথে বর্তেছে সে-প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সূফীকবি, মুসলিম বিদ্বেষ তাঁর ছিল না, নিন্দাও করেননি কোথাও। তিনি টুপি ইজার আলখাল্লা পরতেন, আর সযত্নে লালন করতেন দাড়ি। মোঘলাই পরিবেশ ছিল ঠাকুর পরিবারে। অতএব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় তৌহিদবাদী ও আধা মুসলমান। কাজেই হুজরান দয়া করে আমাদের শুনতে দিন রবীন্দ্রসঙ্গীত, পড়তে দিন রবীন্দ্রসাহিত্য। এখন মহামহিমদের সুমর্জি, ক্ষমাসুন্দর হুকুম ও সদয়প্রশ্রয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা আসামীর দুরু দুরু বুকের কাঁপুনি ও আশা নিয়ে। নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ভীরুহৃদয়ের এই সদিচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করতে বাকি রাখল কি? বরং রবীন্দ্র-বিরোধীরাই তাঁকে যথার্থ সম্মান দেন। কেননা, তাঁর অমিত শক্তি ও সর্বগ্রাসী প্রভাব স্বীকার করেন বলেই তাঁরা ভীত। তাঁরা সূর্যের প্রচণ্ড তাপ স্বীকার করেন বলেই অন্ধকারের প্রাণীর মতো তাঁরা আত্মরক্ষার ভাবনায় বিচলিত।

মহৎমনের স্পর্শকামী এইসব মানবতাবাদী যদি রবীন্দ্রসাহিত্য বিরোধিতা প্রতিরোধ প্রয়াসে সৎসাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন, তাহলে তাঁদের মুখে শোনা যেত অন্য যুক্তি। তাঁরা বলতে পারতেন—আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান থেকে ইসলামী শাস্ত্র অবধি সব বিদ্যাই দান করা হয় বিদেশী, বিজাতি ও বিধর্মী য়ুরোপীয় বিদ্বানদের গ্রন্থ পড়িয়ে। চীন-রাশিয়ার নাস্তিক্য সাহিত্যই আজ পাকিস্তানে জনপ্রিয় পাঠ্য। আমেরিকার যৌন-গোয়েন্দা সাহিত্যে আজ বাজার ভর্তি। বিদেশীর, বিজাতির ও বিধর্মীর সাহিত্য অনুবাদের জন্যে দেশে গড়ে উঠেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান। খ্রীস্টান য়ুরোপের আদর্শে জীবন রচনার সাধনায় আজ সারাদেশ উন্মুখ। য়ুরোপীয় আদলে জীবনযাপন করে অসংখ্য লোক কৃতার্থমন্য। য়ুরোপ আজ কামনার স্বর্গলোক। তাছাড়া ইমরুল কএস থেকে হাতেমতাই, এবং দারান-ওশেরোয়াঁ থেকে রুস্তম অবধি সব আরব-ইরানী কাফেরই আমাদের শ্রদ্ধেয়। এতসব উপসর্গ বেষ্টিত হয়েও আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কা করিনে। কেবল দেশী কাফের রাম থেকে রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের ভয়। অথচ এই রাম-রবীন্দ্রনাথের দেশেই [illegible] বরণ করেছে ইসলাম। এঁদের দেখে-শুনে-জেনেও বিচলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি মুমিনের ইমান। পাশে থেকেও প্রভাবে যে পড়েনি তার প্রমাণ আজকের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তাহলে হাজার বছরের পুরোনো মুসলমান সন্তানদের ধর্ম-সংস্কৃতি হারানোর এই ভয় কেন?

অতএব, রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলে সংস্কৃতিধ্বংসের আশঙ্কা নয়, রয়েছে অন্য কিছু। তা যদি রাজনৈতিক স্বার্থ কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক হয়, তা হলে আমাদের বুঝিয়ে বলেন না কেন তাঁরা? আমাদের স্বাজাত্যবোধ দেশপ্রেম কিংবা রাষ্ট্রানুগত্য কি কারো চেয়ে কম যে তাঁরা আমাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে আমাদের অপমানিত করবার অধিকার নেবেন! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি কিংবা তাঁরা যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই বর্জন করব রবীন্দ্রসাহিত্য। দেশের স্বার্থে এমনকি প্রয়োজন হলে নিজের সন্তানকেও বর্জন করতে রাজি। কিন্তু এ তো হুকুমে হবার কাজ নয়—জানা-বুঝার ব্যাপার। তাঁরা এগিয়ে আসুন, আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিন। আমরা কি এতই পাপাত্মা যে দেশের স্বার্থ বুঝব না! —এমনি সব তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তির অবতারণা করতে পারতেন তাঁরা। আর যদি শ্রেণীস্বার্থের কারণেই ঘটে রবীন্দ্রবিরোধিতার উদ্ভব, তাহলে আমাদের স্বার্থেই প্রতিকার প্রয়োজন। সে-প্রতিকারের পথে যদি আঘাত নেমেই আসে, তবে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে সইতে হবে সে আঘাত। কেননা, ছলনা দিয়ে ছলনার প্রতিকার হয় না। পরস্বাপহারীর হৃদয় গলে না অনুনয়ে। কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখলেই শুকায় না দুষ্টক্ষত কিংবা বন্ধ হয় না। মিথ্যার প্রলেপে ঢাকা যায় না মিথ্যাকে। বেদনা সয়েই ব্যবস্থা করতে হয় বেদনা উপশমের। সমস্যা এড়িয়ে চললে সমস্যা বাড়েই—সমাধান হয় না। অস্ত্রোপচারে যন্ত্রণা বাড়িয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হয় কোনো কোনো রোগে। এরূপ ক্ষেত্রে কল্যাণবুদ্ধি ও মমতাই যোগায় নির্মম হবার প্রেরণা। আপাত নিষ্ঠুরতা অনেকক্ষেত্রেই গভীর করুণার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ মানবতার প্রমূর্ত প্রতিনিধি। মানবকল্যাণের দিশারী। আমাদের গরজেই আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক। সে-গরজ যদি হয় গুরুতর, তা হলে আমাদের প্রতিকার-প্রয়াসও হবে তীব্র। এভাবে সখের প্রেরণায় সৌখিন ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করবার অধিকার নেই আমাদের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিতলালের কাব্যের মূল সুর

বাঙলা দেশে রবীন্দ্রযুগে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপর রবীন্দ্রনাথের কিছু-না-কিছু প্রভাব রয়েছে, তবে তাঁদের স্বকীয় বিশেষত্বও কিছু যে না আছে তেমন নয়। বস্তুত অল্পবিস্তর প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাব-চিন্তা ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট, তাঁরা হচ্ছেন—অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন।

এঁদের মধ্যে আবার মোহিত মজুমদার ক্লাসিকধর্মী বলে, যতীন্দ্রনাথ নতুন জীবন-দৃষ্টির জন্যে, কাজী নজরুল নতুন ভাব-চিন্তা-আদর্শ ও আঙ্গিকের প্রবর্তক হিসেবে এবং জসীমউদ্‌দীন প্রাচীন পল্লী-সাহিত্য ধারার অনুসারীরূপে বিশেষভাবে খ্যাতিমান।

মোহিত মজুমদার ক্লাসিকধর্মী হলেও তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাব কম নয়, তবু তাঁর একটা নিজস্ব ভাবলোক, মতপথ এবং গতি ও ভঙ্গি রয়েছে, যা অন্যত্র সুদুর্লভ। তাই তিনি অনন্য ও তাঁর কবিতা বিশিষ্ট। তাঁর কাব্যে সবচেয়ে যে বস্তুটা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে কাব্যের আঙ্গিক বা কবিতার Diction. শব্দ চয়নে আভিজাত্য, ছন্দে গাম্ভীর্য ও লালিত্য, ভাবাদর্শের অনন্যতা, প্রকাশ-ভঙ্গির-বৈশিষ্ট্য ও সংযম তাঁর কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এককথায় মোহিতলালের কাব্য Classical in form আর Romantic in Spirit.

কবি আদর্শবাদী ও শিল্পী। তাঁর কাব্যে ব্যবহারিক জীবনের রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু-ব্যথা, অথবা নিজের বা মনুষ্য-সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনা, অভাব-অনটন, অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী স্থান পায়নি—কারণ তাঁর মতে:

জীবন যাহার অতি দুর্বহ, দীন দুর্বল সবি,
রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ সেই জন বটে কবি।

অতএব তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস—ব্যবহারিক জীবন কিংবা মনুষ্য-সাধারণ নয়। তাঁর কাব্যে কোথাও বৈষয়িক জীবন-চেতনার অভিব্যক্তি নেই। কবি রসাদর্শের (art for art's sake) অনুসারী। তাঁর ভাব-চিন্তার ধারা তন্ময় নয়—মন্ময়। ব্যবহারিক জীবনে সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা ও কলকোলাহলের উর্ধ্বে মনোময় কল্পজগৎ সৃষ্টি করে তাতে তিনি বিহার করেন। বাস্তব জীবনকে আড়াল করে স্বপ্নের স্বর্গলোকে কামনার কামিনী-সাধনায় তাঁর শিল্পীমন পরিতৃপ্তি খোঁজে। তাঁর নিজের কথায়:

১. এ হৃদয়ে আজো তাই রহিয়াছে অমৃতের তৃষ্ণা!...
... সকল কল্লোল মাঝে নীরব নিকুঞ্জ গড়ি করিতেছে নিভৃত কূজন।

(উৎসর্গ—স্বপন পসারী)

২. যে স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে—
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রাতে,
তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
জল-রেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা।
আনন্দ ধন-রস-সরসিত,
দিবসের আলোকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদ-ভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা। (স্বপন পসারী)

৩. ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপ্ন বালিকা।
যে বীণা বাজাতে আলো-নীহারিকা
ছায়া পথে যায় থামি—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে
স্বপন-পসারী আমি। (স্বপন পসারী)

৪. যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা!
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা!
আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপসা, এ দেহ দহিতে চাই!
সুখ-দুঃখ ভুলে যাই। (ব্যথার আরতি)

৫. দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ ভিখারী,
.... পরশ-রসিক আমি, অন্ধ আঁখি তারা
আমার আকাশ তাই শশী সূর্য হারা।
পদতলে পৃত্থি আছে আলিঙ্গনে চৌদিকে বিথারি—
আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের আরাম। (স্পর্শ রসিক)

৬. ঘোমটা-পরা মিথ্যাময়ী সেই যে আমার সর্বজয়ী!
জনমকালে কখন সে যে জড়িয়েছিল কণ্ঠহারে—
একটি চুমায় বন্ধ করে রাখল প্রাণের নিশানটারে! (অ-মানুষ)

৭ সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটাব ঝরাব ফুল-পল্লব বারোমাস। (মৃত্যু)

৮. রূপ-মধু সৌরভের স্বপন সাধনা
করিনু মাধবী মাসে; ইন্দ্রিয় গীতায়
রচিনু তনুর স্মৃতি। (ফুল ও পাখী)

তাঁর এই কল্পলোকে তিনি যে রস পান করেন—তা এ জগতে দুর্লভ। এই ভাব-সর্বস্ব কল্পলোকাশ্রয়ীদের সুবিধে এই যে, এখানে জীবন সংঘাতমুখী নয়—একেবারে নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন।

মোহিতলালের অনুভূতির সে-জগৎ প্রশস্ত নয়। তাই সেখানে তাঁর জীবন-লীলায় বৈচিত্র্য বিরল। নানা ভাবে, নানা ধারায় জীবনকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস তাতে অনুপস্থিত। তাঁর প্রাণও উচ্ছল নয়—এ জন্যে তাঁর ভাবাবেগে উদ্দামতা নেই, তবে তাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও গভীর। এ কারণে কবি সর্বত্র সংযতবাক ও গম্ভীর। আঙ্গিকের আভিজাত্য, বাক্‌ভঙ্গির গাম্ভীর্য, অনুভূতির অনুচ্ছলতা, মননশীলতা প্রভৃতি তাঁর কাব্যমাধুর্যকে ফল্গুধারার মতো গুপ্ত ও মন্দ-প্রবাহিণী করে রেখেছে। উর্মিমুখর স্রোতস্বিনী করে তোলেনি। ফলে তাঁর কাব্যে শুধু বিশেষের অধিকার আছে, তাঁর দুর্গম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যবীথি সাধারণের জন্যে দুরতিক্রমণীয়। এসব কারণে উঁচুদরের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবিখ্যাতি সাধারণ্যে বিস্তৃত হয়নি। কবিও এ ব্যাপারে সচেতন : তিনিও বলেছেন,—I shall dine late but the dining room will be well lighted, the guests few and select.

কবি কল্পলোকে যে পিপাসা নিয়ে বিচরণ করেন, সে পিপাসা হচ্ছে—রূপ ও প্রণয় পিয়াস। কবি উপলব্ধি করেছেন—দেহে রূপ, রূপে প্রণয় এবং প্রণয়ে সম্ভোগ লিপ্সা জাগে। অতএব, রূপ ও প্রণয় ক্ষুধা চরিতার্থতা লাভ করতে পারে একমাত্র দেহকে অবলম্বন করেই। এই দেহ-কেন্দ্রী রূপ ও প্রণয় সাধনাই হচ্ছে তার প্রথম দিককার কাব্যের মূল সুর।

"যে রূপের পিপাসায় প্রেম হল জীবন অধিক" (প্রেম ও জীবন)

এ ব্যাপারে মোহিতলাল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভাবশিষ্য। দেবেন্দ্রনাথের সাধনাও ছিল রূপ সাধনা। তবে তিনি প্রধানত নিসর্গ রূপপিয়াসী।

চিরদিন চিরদিন
রূপের পূজারী আমি—রূপের পূজারী।

মোহিতলালও বলেছেন—আমি কবি অন্তহীন রূপের পূজারী।

কবি-চিত্তে রূপের পিপাসা—রূপ আগে পরে ভালবাসা (রতি ও আরতি)। Taso বলেছেন, That thou art beautiful and I am not blind; মানে, তোমার রূপ আছে আমারও আছে পিপাসা। রবীন্দ্রনাথের কথায় : ও রূপের কাছে এ ক্ষুধা তাই চিরদিন জাগিয়া রবে। Keats-ও জেনেছেন—A thing of beauty is a joy forever.

মোহিতলাল মননশীল, তাই তিনি মানস রূপের পূজারী :

'যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রত ভুবনে।
আমারি ঐশ্বর্য তাই হেরি আমি তার দেহ মাঝে,
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্লফুল সাজে। (রতি ও আরতি)

মোহিতলালের সাধনায় তিনটি স্পষ্ট স্তর রয়েছে। স্বপন পসারী-বিস্মরণী স্তর, স্মরগরলের স্তর এবং হেমন্ত গোধূলির স্তর। স্বপন পসারীতে উন্মেষ, স্মরগরলে পূর্ণ বিকাশ এবং হেমন্ত গোধূলিতে অবসান। প্রথম স্তরকে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলের' যুগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরকে 'মানসী'র সঙ্গে মিলানো যায় না। কারণ মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' ও 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কবির দেহ-সম্ভোগ লিপ্সার ইতি ঘটেছে এবং 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় প্রেমের বিকাশ, বিস্তার ও চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপরূপ উপলব্ধি রয়েছে।

কবি বুঝে নিয়েছেন—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
কেহ নহে তোমার আমার।
এবং 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' (নিষ্ফল কামনা)

আরো উপলব্ধি করেছেন :

বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল রবে সে কি
ক্রমে ধীরে ধরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে নাকি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
হৃদয় আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা হেরিব আমার হরি
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী। (সুরদাসের প্রার্থনা)

এ উপলব্ধির চরম বিকাশ 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমারেই আমি বাসিয়াছি ভাল শতযুগে শতবার
যুগে যুগে জনমে জনমে অনিবার।
আমরা দুজন করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
আজ সেই চির দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ এক অশরীরী রূপ-সৌন্দর্যকে ভালবেসে প্রণয়-ক্ষুধায় চরিতার্থতা লাভ করেছেন। মোহিতলাল কিন্তু এই মার্গে পৌঁছতে পারেননি। তিনি স্বপনপসারী ও বিস্মরণীতে দেহ সম্ভোগে রূপ-সৌন্দর্য-প্রণয় পিপাসা মেটাতে চেয়েছেন। অবশ্য ভাবের ঘোরে ধ্যানের চোখে কায়া কখনো কখনো 'ছায়া'তে এবং 'মায়া'তে মিলিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম'-এ যে 'প্রবৃত্তি-বেগ' প্রকাশ পেয়েছে, এ স্তরে মোহিতলালও প্রায় সেই আবেগে চঞ্চল এবং লিপ্সায় মুখর। তাঁর কয়েকটি অভিব্যক্তি :

১. কনক-কমল রূপে প্রেম যদি ফুটি উঠে—
তবেই আমার মানস-মরাল অলস পক্ষপুটে
চকিতে জাগিয়া উঠে। (রূপতান্ত্রিক)

২. আমার দেবতা—সুন্দর সে যে!
পূজা নয়, ভালোবাসি!
সুন্দর লাগি ভালোবাসা মোর,
অন্তর আঁখি ফুটে!—(রূপতান্ত্রিক)

৩. থাক্ তোলা আল্‌বোলা পেয়ালায় মুখ ধর!
চেয়ে দেখ্ মন-ভোলা দুনিয়া কি সুন্দর! (দিলদার)

৪. দিকে দিকে প্রিয়ারি পিরীতি
উথলিছে লাবণ্যের মত! সে মিলন
অহরহ কোথা নাই বিরহ কল্পনা!...
আলোক আঁধারে দ্বন্দ্ব
ঘুচে গেল মানবেরি পিপাসার সাথে। (পুরূরবা)

৫. রানীর মুকুটখানির কথা প্রেমির মনে জাগে—
নারীর পূজার তরেই সে যে রাজার বিভব মাগে। (নারী)

৬. রস—সে যে রূপে পড়িয়াছে ধরা, কোথা নহে নিরাকার,
অরূপ রূপের উপাসনা—সে যে অন্ধের অনাচার!
(একখানি চিত্র দেখিয়া)

৭. পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনী ফুল (প্রেম)?
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল!
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত পরাগ ভরা—
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা। (পাপ)

৮. নীল ফুলে ভরা কুঞ্জ বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে
হয়ে গেছি ভোর রূপ সুধা পানে,
চেয়ে আছি অনিমেষ...
রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন
সীমা নাই, সীমা নাই।...
সেতো নহে শুধু দেহ বিভঙ্গ
কালো আঁখি আর কেশ তরঙ্গ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিম্ব অধরে মুকুতা সঙ্গ,
সে যে সবই রূপ! সে যে অনঙ্গ
দিব্য আলোক বিভা। (পূর্ণিমা স্বপ্ন)

৯. সৃষ্টি হতে এতকাল এই যে পীড়ন—
এত কালি, এত ধূলা এত পাপ তাপে,
তবু কি মরেছি আমি? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে। (ভ্রান্তি বিলাস)

১০. মধু সৌরভ—সৌরভ মধু। মধু আর শুধু মধু,
আপনারি প্রাণ দুইখানি হয়ে হল বর হল বধূ!
পাপড়ি কি পাখা চেনা নাহি যায়, কার মধু
নাহি গুঞ্জন, শুধু সুধা পান শুধু সুখ! (আঁধারের লেখা)

১১. আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে জ্বলুক
অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না
অমৃত ভাতি।
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে
আঁধারে আলোকে শিশিরে কিরণে আমি
হব তার সাথী। (কামনা)

এখানে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনিও 'ভালবাসি নারী নরে, ভালবাসি চরাচরে' সুখ পেতে চেয়েছেন এই হাসি-অশ্রুময় ধরণীতে। তিনিও স্বর্গের অনন্ত সুখ ভীরু!—'স্বরগে অন্ অনন্ত সুখ! ওহো, এ কি যাতনা!'

১২. আমার মনের গহন বনে
পা টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী অপ্সরী সঙ্গোপনে!
সেথা সুখ নাই, দুঃখ নাই সেথা
—দিবা কি নিশা।
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু সে অমরা
বাহির ভুবনে এই বাহু পাশে দিবে না ধরা। (বিস্মরণী)

১৩. আমারে করেছে অন্ধ গন্ধ ধূমে দেহ-ধূপাধার,
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায়!
বিষরস পান করি স্বাদ পাই স্বরগ সুধার,
চির বন্দী আছি তাই স্বপ্ন কারায়। (স্পর্শ রসিক)

১৪. দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা
ধূলা মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাচমণি হীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত
ধরণীর স্তন যুগ করে দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতের করিব
জর্জর—আমরা বর্বর।
ওরে মূঢ়! জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ
ভালোবাসা নব জন্ম আশা (মোহমুদ্গার)

১৫. দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা। .... নিষ্ফল কামনা
মোরে করিয়াছে কল্প সহচর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি
মিথ্যা সনাতনী।
সত্যেরে চাহি না তব, সুন্দরের করি আরাধনা।
জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে।
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি কামানল!
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ।
চিনি বটে যৌবনের প্রেম দেবতারে,
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্ন সখী চির অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী। (পান্থ)

১৬. সেই রূপ ধ্যান করি অঙ্গে মোর জাগিল
যে স্ফুরৎ কদম্ব শিহরণ।
দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে প্রীতি
প্রেম সেতুর বন্ধন।
পাপ-মোহ-লালসার লাল নীল রশ্মিমালা বরতনু
ঘেরিয়া তোমারি
লাবণ্যের ইন্দ্র ধনু শোভা ধরে—নাই জ্বালা,
মুগ্ধ হনু আনন্দে নেহারি। [অকাল সন্ধ্যা]

১৭. ভালো যারা বাসে তারাই চিনেছে,
তুমি আঁকিয়াছ তারে—
সে দিনের সেই তরুণীরে নয়—নিখিলের
বনিতারে।
যার তনু ঘেরি, আরতি করিল শরতের
আলোছায়া—
মানস বনের মাধবী সে হল; ফাগুনের ফুল
কায়া! (মাধবী)

১৮. বধূও জননী পিপাসা মিটায় দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
একি অপরূপ রূপের লাবণী।
সুন্দর! তব একি ভোগবতী
মরম পরশী রসধারা। (বাঁধন)

১৯. (হে দেহ) হাসি ক্রন্দন তব উৎসব!
পিরীতির পারাবার
অধরে, উরসে, চরণ সরোজে
আরতি যে অনিবার। (মৃত্যুশোক)

২০. রূপের আরতি করিনু আঁধারে
আবেশে নয়ন মুছি—
হেরি দেহে মনে বাধা নাই আর,
—উদ্বেল অম্বুধি! (বিস্মরণী)

স্মরগরলে কবি বুঝেছেন : শুধু দেহে ও রূপে এ ক্ষুধা মিটবার নয়, যেন দেহাতীত এমন কিছু আছে যা সত্যিকার তৃপ্তি—নিবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু তা কি তিনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝি না, দোঁহার মাঝে কেবা নিদ্রা যায়,
কেবা জাগে কার চেতনা হরিয়া। (রূপ মোহ)

দেহ ও দেহস্থিত আত্মাকেও তিনি এক বলে উপলব্ধি করেছেন :

দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ,
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ
নয় যে কভু এক সমান। (পরমক্ষণ)

তিনি এই জীবনকে এবং যৌবন-ধর্মের স্বাভাবিক চাহিদা রূপ-দেহ-প্রণয়-সম্ভোগকে অস্বীকার করেননি। তিনি একান্তভাবে, জীবনধর্মী বলেই মৃত্যুর পরপারে আর জীবনের—চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। মৃত্যু তাঁর নিকট অন্ধকার ও ধ্বংসের প্রতীক। তাই ব'লে তাঁর এই রূপ-প্রণয়ের সাধনাকে কামজ মনে করবার হেতু নেই। একে তো তিনি দেহাতীত ও রূপাতীত সৌন্দর্য এবং সম্ভোগ বাসনাকে স্বীকার করেছেন, অধিকন্তু তাঁর রূপ ও প্রণয় পিপাসার মধ্যে এমন এক তীব্র ও গভীর অনুভূতি, এমন এক অনন্য সৌন্দর্য দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, যা ভূমির হয়েও ভূম্যেতর। এই প্রকার রূপ-সৌন্দর্য পিপাসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম, তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে সে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে, তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।"—(ছিন্নপত্র)

এই উক্তি মোহিতলাল সম্বন্ধে সর্বৈব প্রযোজ্য। এমনিতর ব্যাকুলতাই তার কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ স্তরে তিনি জেনেছেন দেহে রূপ, রূপে রতি ও কামে প্রেম জন্মায়। সে প্রেম সম্ভোগলিপ্সু নয়, একপ্রকার মানসোপভোগই কাম্য। তখন দৈহিক রূপ সৌন্দর্যানুধ্যানের সোপান কিংবা অবলম্বন মাত্র।

এ বোধে উত্তরণের পর মোহিতলাল যথার্থই শিল্পী—নিষ্কাম সৌন্দর্যের সাধক। কিন্তু তাতেও যেন কোথায় অতৃপ্তির বেদনা জেগে থাকে। যেন কামে-প্রেমে একটা দ্বন্দ্ব, রূপে-অপরূপে যেন টানাটানি—একটা আলো-আঁধারি কিংবা কায়া-ছায়ার মায়াপ্রপঞ্চ তাঁকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন রাখছে। তবু স্বীকার করতে হয় Byron-এর মতো উচ্ছলতা, Shelley-র মতো উদ্দামতা এবং Keats-এর মতো আকুলতা তাঁর নেই। তবে Keats যেমন বুঝেছেন—

'Heard melodies are sweet
But those unheard are sweeter'

তেমনি মোহিতলালও উপলব্ধি করেছেন—এই যৌবন এই রূপ এই দেহ সত্য হলেও স্বপ্ন এবং রূপের আরতি সুন্দরতর।—

'বল দেখি, কমলের বঁধূ অলি, না সে ওই আকাশের রবি?
রূপ যে স্বপ্ন তার—কামনার ধন নয় বাসনার ছবি।
রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালবাসে কবি।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয় সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি।
সে তো নহে ভোগ প্রয়োজন,
সে নয়, প্রাণের ক্ষুধা প্রেম নয়, সে তো দেহ পদ্মে মধু আস্বাদন
দুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, দুই আমি এক আমি হয়,
আত্মরস রসাতলে স্বর্গ-মর্ত্য নিখিলের লয়! (রতি ও আরতি)

এইরূপে মোহিতলালের সকাম রূপপিপাসা ও প্রণয়ক্ষুধা নিষ্কাম বিদেহ রূপ সাধনার আভাস দিয়ে থেকে গেছে; তা "রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে জগতের গিরি নদী সকলের শেষে কামনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোক্ষধাম অলকার তীরে" পৌঁছতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপরতন আশা করি,' তেমনি আশ্বাস মোহিতলাল কোথাও পাননি। তাই তাঁর ক্রন্দন—

'মোর কামকলা কেলি উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন বিলাস—
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত
হেরি তার মুখ'...
আমার পিরীতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত
ভস্ম-ভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিত!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না।
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন সঙ্গীত (স্মরগরল)

[কবি শেখরের 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়' পদ স্মরণীয়]

২. একে দুই কাজ নাই, দুয়ে এক ভালো
তুমি আমি বাঁধা রব নিত্য আলিঙ্গনে।
নিভে যাক রাধিকার নয়নের আলো
রাধার মরণ হোক তোমার জীবনে।
আমি প্রেম, তুমি প্রাণ-বারি ও পিয়াস
এক পাত্রে রহে যেন দ্বন্দ্ব যাক থামি। (ভ্রান্তি বিলাস)

৩. একদিন আছিল যা সফেন তরল
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! (উৎসর্গ)

৪. আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের 'দেহেলী' পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচফুল সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আধারে স্বস্তিক তার আঁকিনু যতন ভরে। (স্মরগরল)

৫. আমার অন্তর লক্ষ্মী দেহ-আত্মা-মানসের
শেষ তীর্থে শুচি স্নান করি দাঁড়াইল।
মুক্ত লজ্জা,
সর্বরাগহারা এবে, তাই তার রূপরেখা
অনিন্দ্য সুন্দর।
প্রাণের সঙ্গীত রসে একপাতে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপাচার
বুঝি না দোঁহার মাঝে কেবা নিদ্রা যায়,
কেবা জাগে কার চেতনা হরিয়া

৬. দেবী সে প্রেয়সী নয়। এ যে তাই
আরো রূপ।
একি মোহ স্নেহ অবসানে— (রূপ মোহ)

৭ সৃষ্টির ভরা ভারি হয়ে এল, ভেঙ্গে যায় রূপের চাপে
তবু রূপ চাই স্নায়ু চিরে চিরে, আয়ু যে ফুরায় তাহারি দাপে!
রূপ নয় আর প্রিয়েরি লাগিয়া প্রেমের ছলা
সে যে নিজ তরে কামনা নটীর নৃত্যকলা। (রুদ্রবোধন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. সুখের স্বপনে সুমধুর ব্যথা কেন জেগে রয়! (বসন্তবিদায়)
৯. কোথা সেই রূপ চোখ দিয়ে যারে যায় না ধরা,
যে রূপ রাতের স্বপন-সভায় স্বয়ম্বরা।
কোথা সেই তুমি দেখেছিনু যারে দেখারও আগে। (নিশিভোর)
১০. শত যুগ ধরি রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা?
তারি পরে যমযূপ।
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ এত রূপ।
অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান! (দিনশেষ)

এবার কবি জেনেছেন :

১১. জেনেছি কোন্ সাগর-কূলে
আলোক লতা উঠছে দুলে—
পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস
আর কিছু না চাই। (নতুন আলো)
১২. নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া,
যে জীবন যৌবনের ক্ষয় নাই, খেদ নাহি যায়,
হাসি অশ্রু দুই-ই এক, একই শোভা গোলাপে শিশির!
জীবন বসন্ত শেষ—শেষ নাই পূর্ণিমা নিশির।... ...
জীবনের মতো প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্রে বলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন একান্ত উদাস।
১৩. সেই প্রেম! জন্ম জন্ম তারি লাগি ফিরিছে সবাই!
এই দেহ পাত্র ভরি যেই দিন উঠিবে উছলি—
ঘুচিবে দুরূহ দুখ মৃত্যুভয় রবে না যে আর। (বুদ্ধ)
১৪. মৌনবতী সে রাজকন্যারে আর কেহ চিনিল না—
শুধু মোর লাগি সে মূক অধরে মনোহর মন্ত্রণা!
তনুর প্রভায় অতনুরে নাশি'
মোরে চিরতরে করিল উদাসী।...
অয়ি সুন্দরী ভুবনেশ্বরী!
আমার জগতে তবু হায় বাণীরাগ রঙ্গিণী,
হেরিনু তোমারে মনোমন্দিরে রূপ রেখা বন্দিনী।
আমারে লইয়া একি লীলা তব? (শেষ আরতি)

কবি ভুবনেশ্বরীর লীলা বুঝেও শান্তি পেলেন না—

১৫. এ যে মৌন অট্টহাস মরণের জ্যোৎস্না জাগরণ।
যৌবন দেহের ব্যাধি, রূপে যেন তাহারি বিকার!
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলা শেষে নিশাকালে একি হাহাকার। (নিষুপ্তি)

সুতরাং এই স্তরে কবির তৃপ্তি-অতৃপ্তির, জানা-অজানার দ্বন্দ্বের নিরসন আর হ'ল না, তাই আমরা বলেছি, কবি সাধন-মার্গের শেষপ্রান্তে 'অলকার তীরে' পৌঁছতে পারেননি। কবি বুঝেছেন দেহাতীত রূপ—কামাতীত সৌন্দর্যই যথার্থ চাওয়ার ও পাওয়ার বস্তু। উপভোগ, তৃপ্তি কিংবা প্রশান্তি মেলে তখনই যখন রূপ নিরূপে পায় সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্যানুভূতি নিরবয়বে পায় স্থিতি। কিন্তু তা তাঁর বোধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থায়ীভাবে ধরা দেয়নি। কায়ার প্রতিভাস ছায়ারূপে মাঝে মাঝে জেগেছে বটে, কিন্তু সে ছায়াও মায়া বিস্তার করে পালিয়েছে—জ্যোতিষ্মান হয়ে তাঁর অন্তর্লোকে স্থিতি লাভ করেনি। আকৃতি ও বেদনাতেই তাই কবির সাধনা অবসিত—প্রশান্তিতে পরিসমাপ্ত নয়। মোহিতলাল ভোগের কবি—ত্যাগের নন—বেদনারও নন, তিনি জীবনধর্মী। প্রাণ-ধর্মের প্রাচুর্যে তাঁর বেদনাও মাধুরী হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর কাছে জীবনের বড়ো প্রেম:

হায় প্রেম ক্ষণপ্রভা! এ জীবন আঁধার বিধুর!
জীবনের চেয়ে ভালো সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক। (প্রেম ও জীবন)

তিনি একান্তভাবে জীবনধর্মী বলেই মৃত্যুর পরপারে আর জীবনের চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। মৃত্যু তাঁর নিকট অন্ধকার ও ধ্বংসের প্রতীক। এমনকি স্বর্গের নিত্য অনন্ত সুখও তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তিনি বিহারীলালের ভাবশিষ্য। এ হাসি-অশ্রুময় জগতের আকাশ জল বাতাস আলোতে যে আরাম, যে সুখ, যে মাধুরী তা স্বর্গে নেই। তাই স্বর্গসুখ অনভিপ্রেত। এ সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'ও স্মরণীয়। কবি বলেন—

১. অজর অমর হয়ে নিত্যের নন্দনে
থেকো না অরূপ রূপে।...
নব নব জন্ম বিবর্তনে আঁখি যুগ
চিনি লবে আঁখি যুগে, চির পিপপাসায়!
বার বার হারায়ে হারায়ে ফিরে পাব
দ্বিগুণ সুন্দর। ...
নিত্যেরে কে বাসে ভালো? চিরস্থির ধ্রুব
অন্তর রজনী কিম্বা অনন্ত দিবস?
নহি তাই অনুরাগী। আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে; চাই ছন্দ, চাই গতি
রূপ চাই ক্ষুব্ধ সিন্ধু তরঙ্গ শিয়রে—
ধরিতে না ধরা যায়, পুলকে লুটায়। (পুরূরবা)

২. আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে বুকে করি লব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের হাসি জীবনের দুখ
জীবনের আশা, জীবনের সুখ
পরাণ আমার চির উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি
অধরে তুলিব ধরি
ধরণীর রস জীবনের রস যত। ...
তারপর—আমার 'আমিটা' একেবারে শেষ হোক
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক। (মৃত্যু)

৩. জীবন মধুর! মরণ নিঠুর তাহারে দলিব পায়,
যত দিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মতো কর সুধা পান
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান। ...
অপরূপ নেশা অপরূপ নিশা
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা। (অঘোর পন্থী)

৪. ত্যাগ নহে, ভোগ—ভোগ তারি লাগি যেই জন বলীয়ান,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ। (পাপ)

৫. জানি শুধু—যাব বহুদূর, আসিয়াছি বহুদূর হতে।
জানি না কোথায় কবে
পথ চলা শেষ হবে—
লুকাইবে লোক-লোকান্তর অন্তহীন অন্ধকার স্রোতে। (পথিক)

৬. (দেহ) তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ!—
দেহলীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে !...
আর তুমি প্রেম!—দেহের কাঙ্গাল!
হারাইলে আর পাবে না নাগাল।
.... পড়িবে না চোখে সেই রূপ-রেখা—
স্বপনের সঙ্গিনী। (মৃত্যুশোক)

শুধু এখানেই শেষ নয়, কবি মনে করেন, হৃদয়ের রূপ প্রণয় স্নেহ ভালবাসার ক্ষুধা 'ভবতৃষ্ণা' জাগিয়ে রাখে। তাতেই জন্মান্তর হয় এবং স্বর্গের নিত্য আনন্দ-ভোগের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি মেলে। গৌতম বুদ্ধের 'ভব তনহার' শাস্তিস্বরূপ জীবজন্ম বা হিন্দুমতের পাপজনিত জন্মান্তর এ নয়, এ হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে জীবনের আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে ধূলার ধরায় ফিরে ফিরে আসা।

১. শিয়রে মৃত্যুর ছায়া, চক্ষে ভাসে তবু
নন্দনের চিরন্তন আনন্দ স্বপন!
প্রেম যে আত্মার আয়ু! ক্ষয় নাহি তার
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ বর। (জন্মান্তরে)

২. এ ধরার মর্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ ব্যথা, সন্তান পিপাসা,
তাই রবে ফিরিবার আশা।
তারি তরে, ওরে মূঢ়। জ্বেলে নেরে দেহ-দীপে
স্নেহ ভালবাসার নবজন্ম আশা। মোহমুদ্গর)

স্বর্গও মিথ্যা—

৩. সত্য শুধু কামনাই মিথ্যা চিরমরণ পিপাসা।
দেহহীন, স্নেহহীন, অর্থহীন বৈকুণ্ঠ স্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ (পান্থ)

৪. নবীন জীবন জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে।
(ভ্রান্তি বিলাস)

শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ হেমন্ত গোধূলির আমলে কবি তাঁর আত্মভাব সাধনার মূল সুরটি হারিয়ে ফেলেছেন ; লীলা চঞ্চল, দৃপ্ত-দুরন্ত সে যৌবন আর নেই। যৌবনের পুরোহিত প্রেমদেবতার আধিপত্য লুপ্ত হয়ে গেছে। যৌবন মদমত্তায় যে রূপ-প্রণয়কে জীবনে চরম ও পরম কাম্য বলে মনে করেছিলেন, যৌবনাবসানে কবির মোহ যখন গেল ছুটে, স্বপ্ন গেল ভেঙে, কঠোর বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পলোকবিহারী কবি তখন উপলব্ধি করলেন, রূপ প্রণয় সম্ভোগ প্রেম প্রভৃতি সব অনিত্য এবং নিঃসার। ফলে তার হৃদয়-মনে এল হাহাকার, ক্লান্তি, অবসাদ। যৌবনের সেই মিথ্যা ভোগেচ্ছাকে 'জীবনধর্ম' বা 'দেহের নিয়তি' বলে স্বীকার করে নিলেন। বিগত জীবনে ফেলে আসা দিনগুলোর জন্যে কোথায় যেন একটু ব্যথা বাজে, কেন যেন অনুশোচনা হয়। স্বপ্ন ভঙ্গে, আহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির চিত্ত বিক্ষুব্ধ অশান্ত ও ব্যথিত। তাই তিনি আকুলভাবে 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি' আশায় 'গঙ্গাতীরে' আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছেন।

৩. যৌবন নিশার সেই স্বপন সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল ত্বরা,
অন্তরীক্ষে, পুরূরবা মায়া বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস যামিনী।
হায় নর! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন!
উর্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন!
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত পিক
পলায়েছে; মরু পথে, হে মৃত্যু
কে রচিবে পুনঃ সেই প্রফুল্ল নন্দন? (স্বপন সঙ্গিনী)

৪. অসময়ে ডাক দিল হায় বন্ধু একি পরিহাস
ফাগুন হয়েছে গত, জানো নাকি এ যে চৈত্র মাস?
বাতাসে শিশির কোথা ফুলেদের মুখে হাসি নাই,
কোকিল পলায়ে গেছে, গোলাপ যে বলে—যাই।
একদিন এ জীবনে পূর্ণিমার ছিল না পঞ্জিকা!
নিত্য জ্যোৎস্না ছিল নিশা হেমন্ত ও শারদ চন্দ্রিকা!
শ্রাবণে ফাগুন রাতি উদিয়াছে বহু বহু বার
শীতে রৌদ্রে গাঁথিয়াছি চম্পা আর চামেলীর হার।
জীবনের সে যৌবন মরু পথে সেই মরুদ্যান—
পার হয়ে আসিয়াছি আজ শুধু করি তার ধ্যান।
দুদিনের এই সুখ, দুদিনের এই সুন্দর ভুল
এরি লাগি সৃষ্টিপথ অহরহ মেলিছে মুকুল। (অকাল বসন্ত)

৫. রূপ মধু সৌরভের স্বপন সাধনা
করিনু মাধবী মাসে, ইন্দ্রিয় গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি। প্রাণ সবিতায়
অঞ্জলিয়া দিনু অর্ঘ্য—প্রীতি নির্ভাবনা,
নিষ্ফল ফুলের মতো অচির শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি কবিতায়। (ফুল ও পাখি)

৬. তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।
সংসার শর্বরী
তব রূপ স্বপ্নে আমি করেছিনু ভোর।
গৃহ পরিহরি চলেছিনু কল্পবাসে। (নির্বেদ)

৭. ঘুচিল সংশয় মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা। সৎ শুধু প্রকাশ মহিমা
প্রাণস্পর্শী বিরাটের; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল। (প্রকাশ)

৮. পরশ হরষে মজি নাই তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে রব বলে করি নাই তার অধরের মধু পান।
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব যখন মিথ্যে হল, তখন :

অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি আজিকে
মাগিছে প্রাণ।

৯. এমন প্রহর ভ্রমিবে না আর, ঠাঁই তার লবে চিনি
আর রবে না রূপের পিপাসা
আজি অ-ধরার অধর লাগি সারা প্রাণ উৎসুক—
সে রসে বিবশ ঘুমাইবে মোর বাণী হারা
সুখ দুখ। (বাণী হারা)

প্রতিভাবান কবিদের রচনাবলীতে ভাবধারার একটা ঐক্য থাকে, একটি ভাব-সূত্রে গ্রথিত হয়ে রূপ-রস ও ভাবের একটি অপূর্ব রসময় মানসমূর্তি অঙ্কিত হয়। অন্যকথায় সব রচনায় কবির আত্মভাব সাধনার বা কাব্যের মূল সুরের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। মোহিতলালের কবিতায়ও এরূপ একটি যোগসূত্রের সন্ধান মিলে। এইজন্যই আমরা কবির কাব্য-প্রেরণার উৎস—রূপ ও প্রণয় পিপাসা আদিম বর্বর প্রবৃত্তির প্রতীক নাদির শাহ এবং বেদুইনের মধ্যেও দেখতে পাই। 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' এবং 'মৃত্যুশয্যায় নূরজাহান' কবিতাদ্বয়েও রূপ ও প্রণয় পিপাসাই শেষ কথা :

১. তাহমিনা। তাহমিনা!—
চাও, কথা কও! কোথা সুখ নাই
নাদিরের তোমা বিনা।
আজ নওরোজ রাতে
অশোক এসেছে, যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে।
লুটাইনু পায়, বলিনু বাঁচাও! তুমি জানো সেই পাতা
যার রসে এই যাতনা জুড়ায়, আর কেহ জানে না তা। (নাদির শাহের শেষ)

২ এ বিশ বছর ধ্যান করি, কালি তার দেখা পেয়েছি ভাই
মাফ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে,
হুকুম মিলেছে খোদাতালার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে,
অবসান আজ সব জ্বালার। ...
আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে
সে কথা আর একজন।
দুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায় করিবে
অশ্রু বিসর্জন।
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায়
গুমারি গভীর রাতে,
অমনি আলো যে জ্বেলেছে দ্বিগুণ আগুনের ঝঞ্ঝাবাতে।
(শেষ শয্যায় নূরজাহান)

৩ সেই মুখ, আর সেই চোখ, আর ছাউনি যে—
বাচ্চার পানে হরিণীর মত ফিরে চাওয়া পথের মাঝে। ...
তারি মুখখানি মনে করে আমি গান বেঁধেছিনু
দিওয়ানা হয়ে—
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও —ছুরি—ছোরা?
সে তো গেছেই সয়ে।
'দারাত জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটি পরাণ ছাইয়া আছে।
(বেদুঈন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. ভালো করে কাঁদো! ঢাকিওনা মুখ—
এত শোভা, মরি মরি
হাহাকার প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি!
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দরবারে,
'রোজ কেয়ামত' ভেরীর আওয়াজ থেমে যাবে একেবারে।
(নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর)

মোহিতলাল ফারসি সাহিত্যের সূফীধারার অনুরাগী। জীবনকে সূফীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করতে তিনিও প্রয়াসী :

১. থাক তোলা আলবোলা পেয়ালায় মুখ ধর
চেয়ে দেখ মন ভোলা, দুনিয়া কি সুন্দর! (দিলদার)

২. যত নেশা হৌক রাতটি ফুরালে রয় তা' কি?
তোমার সুরত্-সুরায় যে জন মস্তানা,
হুঁশ হবে তার 'আখেরি জামানা' শেষ-দিনে।
বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালা ভর সাকী।
হরদম্ দাও! আজ বাদে কাল ভরসা কি? (গজল গান)

৩. য়ূসুফের রূপ দিনদিন যে গো ফুটে ওঠে,
কুমারী ধরম-শরম যে তার পায়ে লোটে।—
জুলায়খার ঐ আবরু এবার গেল টুটে,
ইজ্জত রাখা ভার হল সেই লজ্জিতার। (হাফিজের অনুসরণে)

শব্দ, ভাষা ও ছন্দযোগে বিষয়ানুরূপ পরিবেশ সৃষ্টিতে মোহিতলালের কৃতিত্ব অসাধারণ। ফারসি সাহিত্যানুগ কবিতা রচনায় বা মুসলিম জীবনালেখ্য চিত্রণে তাঁর কৃতিত্ব লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসারী এবং এঁদের এ ধরনের কবিতাই নজরুল ইসলামকে উৎসাহিত করেছিল আরবি ফারসি শব্দ প্রয়োগে।

AMARBOI.COM

মোহিতলালের আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর মধ্যে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি-প্রীতি যেমন প্রবল, তেমনি নতুন ভাব-চিন্তার অগ্রনায়ক বাঙালির মননও প্রচুর। এইজন্যে একদিকে অগ্নিবৈশ্বানর, পুরূরবা, মৃত্যু ও নচিকেতা, আবির্ভাব, রুদ্রবোধন, কন্যা প্রশান্তি প্রভৃতি কবিতায় যেমন তিনি হিন্দু তত্ত্ব-চিন্তার অনুসারী ; তেমনি নারী স্তোত্র, বুদ্ধ, প্রেম ও সতীধর্ম অঘোর পন্থী, দেবদাসী, প্রেম ও জীবন প্রভৃতি কবিতায় বাঙালি সুলভ নতুন মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে কবির নিজস্ব মনন ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি মোহিতলাল মনেপ্রাণে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মনিষ্ঠ। দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতি প্রীতি তাঁর অস্থিমজ্জায়। তাঁর গদ্য রচনাবলীর মূল ব্যঞ্জনাই এসব। ফলে তাঁর মননশীল মন গ্রহণ-বর্জনের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা মেনে চলেছে। অন্য কথায় তিনি তাঁর মনীষা ও রুচি অনুসারে হিন্দু তত্ত্ব-চিন্তা ও দর্শনের কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে নিজস্ব একটা আদর্শ বা মতপথ খাড়া করেছেন। এজন্যে তাঁর কবিতার দু-এক জায়গায় সনাতন আদর্শ বিরোধিতা ও মতদ্রোহিতা প্রকাশ পেয়েছে :

১. মাটির প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর—
দেহই অমৃত ঘট, আত্মা তার ফেন অভিমান।
সেই দেহ তুচ্ছ করে, আত্মা ভয়-বন্ধন জর্জর
এসেছে প্রলয় পথে, অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণ তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান। (নারীস্তোত্র)

২. করাইলে আত্মবলিদান
শূন্য সুখ তবে শুধু ঘুচাইয়া প্রাণের পিরীতি—
সেকি নহে দুর্বলেরে লয়ে সেই সবলের খেলা! ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্ধ করি আঁখি জল ম্লান করি অধরের হাসি।
প্রাণ হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার?
তার চেয়ে ক্রূর সেকি তৈমুরের লক্ষ জীব নাশ? ...
দেহ মিথ্যা, প্রাণ মিথ্যা, একমাত্র দুঃখ সত্য হবে?
... সেই প্রেম। জন্ম জন্ম তারি লাগি, ফিরিছে সবাই।
এই দেহ পাত্র-ভরি' সেই দিন উঠিবে উছলি—
ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যু ভয় রবে না যে আর।' (বুদ্ধ)

মোহিতলালের কবিতায় নিসর্গ বা প্রকৃতির অনাবিল শোভা সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রয়াস চিহ্ন নেই। কারণ কবি মননশীল, তিনি প্রকৃতির রূপ শোভার অন্তরালের রহস্য উদঘাটন প্রয়াসী এবং তৎসঙ্গে মানবজীবনের সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র আবিষ্কারে আগ্রহশীল। ফলে তাঁর শ্রাবণ রজনী; বসন্ত আগমনী, ভাদরের বেলা, পূর্ণিমা স্বপ্ন, বিভাবরী, বসন্ত বিদায় প্রভৃতি কবিতায় নাম-মাহাত্ম্য রয়েছে শুধু, নিসর্গ শোভা তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে নিসর্গের স্থান নগণ্য। পূর্বেই বলেছি তিনি বস্তুতান্ত্রিক নন, মর্মরস রসিক বা গ্রাহী। তাই প্রকৃতি-প্রেরণার অভাব তাঁর কবিমনের মাধুর্য নষ্ট করতে পারেনি এবং কবিমন বিকাশেও বাধা জন্মায়নি। দেহ ও রূপ কবির কাব্যশিল্পের উপকরণ, তাঁর কাব্যসৌধের উপাদান।

কবি ও মনীষী-প্রশস্তিমূলক কবিতাবলীতে কবির গুণগ্রাহিতা, ঐতিহ্যানুরাগ, স্বদেশ, স্বজাতি ও সংস্কৃতি প্রীতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী, মধু উদ্বোধন, বঙ্কিম চন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আঙ্গিক (Form) ও বক্তব্য বিষয়ের প্রাঞ্জলতায় মোহিতলালের সনেট পরম্পরায় রচিত দীর্ঘ কবিতাও তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। যথা—শরৎচন্দ্র, কবিধাত্রী ও এক আশা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে মোহিতলাল কবিতার Form (আঙ্গিক) ও diction (ভঙ্গি) সম্বন্ধে বিশেষভাবে যত্নশীল। স্মরগরলের ভূমিকায় তিনি এ-কথা সগর্বে বলেওছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, তাঁর কবিতায় বিষয় ও ভাব-গাম্ভীর্যানুযায়ী শব্দ ও ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাবের দীনতা, ছন্দে শৈথিল্য, শব্দে ব্যঞ্জনার অভাব কোথাও তেমন দেখা যায় না। মননশীলতায় তাঁর দীনতাও বিরল। এইজন্যে ভাবের উচ্চতায়, শব্দের ব্যঞ্জনায়, ভাষার আভিজাত্যে, ছন্দের ললিত মন্থরতায় ও গাম্ভীর্যে, মননশীলতার চমৎকারিত্বে তাঁর এক-একটি কবিতা অনবদ্য শিল্পকর্মে রসমূর্তি লাভ করেছে।

আমরা কবি মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যের মূলসুর বা আবেদন কী তাই শুধু জানতে চেয়েছি। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর; তৎসত্ত্বেও আমরা দিয়েছি—এই আশঙ্কায় পাছে আমাদের বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায়। সুতরাং তাঁর বিশিষ্ট কবিতাগুলোর ভাব ও রূপ প্রতীকের সৌন্দর্যের আলাদা আলোচনা সম্ভব হল না। তাঁর কবিতার ভাষা ও ছন্দ-সৌন্দর্য বিশ্লেষণও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হত।

জানি, এই গণ-সংগ্রামের যুগে মোহিতলালের কবিতার কদর হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন দিনও হয়তো আসবে, যখন মানববাদীর গণ-সাহিত্য কেবল ঐতিহাসিক মর্যাদায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর মোহিতলালের কাব্য-সুধা মানস-রস—রসিকদের দেবে তৃপ্তি।

যদিও মোহিতলালের জীবন-দৃষ্টি কোনো শ্রেয়সের সন্ধান দেয় না, তবু তাঁর নির্মিত এই বাসনা-জগৎও যে মানব-কাম্য তা অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর সৃষ্ট রস-সরোবরের সার্থকতা এখানেই। তাঁর কাব্যের স্থায়ী আবেদন-তত্ত্বও এতেই নিহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব

॥ 'ভাষা' বিদ্বেষ ॥

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্যসাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃতই ছিল পাক-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়।

এরপরে মুসলমান আমলে ফারসি হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতিক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব-কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুইস্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন-সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্য-প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দু সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করেনি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

হয়তো দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশীভাষার অনুশীলনের প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ। যেমনটি ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান-সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেক কাল অভিজাতরা বাঙলাভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনোদিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায়নি, তাই অন্তত দশশতক থেকে বাঙলাভাষায় সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারেনি। শেক্সপিয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাব হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় দুষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়—'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'—এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য-শিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হননি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেননি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি; মুসলমানরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব ধর্মপ্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধসাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানবরসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সংপৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাসবাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

পাক-ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালিরা ইরানী ও হিন্দুস্তানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই (বৈষ্ণবসাহিত্যও) মূলত অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনপুনিকতা দুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেননি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসিতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেননি। বাঙলা তখনো তাঁদের চোখে 'বুলি' মাত্র। এ যুগে শিক্ষিত জনেরা যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষা ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল।

এছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল : ক. সেন রাজারা বাঙলায় উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশী সংস্কৃতি সৃজ্যমান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বিকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার পথ রুদ্ধ রেখেছিলেন তাঁরা। আর তখন বস্তুত অবহট্‌ঠ-এর যুগ। তাই অবহট্‌ঠ-এর যুগে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খ. অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃতি ও স্বর্গীয় ভাষা আরবি থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত; ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানদের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজার সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাঙলা চর্চা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন:

অষ্টাদশ পুরাণানি চ রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে :

কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুণ-ঘেঁষে
—এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সুরে। এঁদের কেউ কেউ তীব্র প্রতিবাদীও :

শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯—১৩১০ খ্রীস্টাব্দে) বলেন :

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আমি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

সৈয়দ সুলতান (১৫৮৪ খ্রী.) বলেছেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবি বচন।
ফলে, আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।
তবু, যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছত দূষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি।
অবশ্য, মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও (ষোল শতক) নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি :

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন :

হিন্দুয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর' পরে 'আল্লি' মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে-আল্লি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ।

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রী.) ভয় :

আরবিতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রী.) রচয়িতা আবদুন নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানী কথা দেখি মনেত ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি :

যেইদেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেইবাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন
মারফত ভেদে যার নাহিক গমে
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মন না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম কবির দেখা যায় না।

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মেলে।

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা' [দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান ১৬ শতক], কারুর মতে 'লোক ভাষা' (মাধবাচার্য ১৬ শতক), কেউ বলেন 'লৌকিক ভাষা' (কবিশেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছুসংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম গৌড়িয়া!

২

মধ্যযুগে হিন্দুয়ানী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

তুর্কী ও মুঘলেরা এদেশে মুসলিম শাসন দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজনে বিদেশী ও দেশী মুসলিম মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। ধর্মের উৎসভূম আরব এবং শাসক ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্র ইরান-সমরখন্দ-বুখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-আকর্ষণ সৃষ্টির ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, তাঁর পুত্র নূরকুতবে আলম, জাহাঁগীর সিমনানী, আলফ্সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতির পত্রে এ মনোভাবের আভাস আছে। আর মুসলিম রচিত ইতিহাসের ভাষায় আর ভঙ্গিতেও হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। অনুকূল পরিবেশে এই বহির্মুখী মানসিকতা মুসলিম মনে ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে। ইরানে সাফাবী বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছুসংখ্যক বাস্তুত্যাগী ইরানী নাকি বাঙলায়ও বসবাস করতে এসেছিল। সম্ভবত তাদের সাহচর্য আভিজাত্যলোভী দেশী মুসলমানদের বহির্মুখী মানসিকতাকে আরো প্রবল করেছিল। ফারসি ভাষার বাস্তব গুরুত্বে ও সংস্কৃতির মর্যাদায় প্রলুব্ধ বাঙালি তা গ্রহণে-বরণে (উনিশ শতকের বাঙালির ইংরেজি ও বিলেতি সংস্কৃতি গ্রহণের মতোই) আগ্রহ দেখাবে—এ-ই ছিল স্বাভাবিক।

এমনিতেই আভিজাত্যলোভে শিক্ষিত দেশী মুসলমানরা চিরকাল নিজেদের বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। ফজলে রব্বী খান বাহাদুর তাঁর 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' (অনুবাদ : The Origin of the Musalmans of Bengal, 1895 A. D.) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সবাই বহিরাগত। আঠারো শতকে কোম্পানী শাসন প্রবর্তিত হলেও নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অনেককাল বিলীন হয়নি। ফারসি ছিল ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি দরবারী ভাষা। কাজেই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সমাজ তখনো মধ্যযুগীয় আমীরী স্বপ্নে বিভোর, যদিও তাদের অজ্ঞাতেই তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। তখন দুর্ভাগ্যের দুর্দিন সত্যই তাদের সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, তখনো হৃতসর্বস্ব মুসলমান উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল জ্ঞাতির ঐশ্বর্যগর্বে নিজের দীনতা ভুলবার নিষ্ফল আশায়। তখন আরবি নয়, এমনকি ফারসিও তত নয়, উর্দু প্রীতিই তাদের মানসিক সান্ত্বনার অবলম্বন হল। "উর্দূ ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাংলা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাংলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া দিয়াছে।" [১৯২৭ সন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত : ভূমিকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ। ইনি নিজে ছিলেন বাংলা লেখক ও সাংবাদিক।] তাই নওয়াব আবদুল লতিফের (১৯২৬-৯৪) মুখে শুনতে পাই: 'বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাংলা। আর অভিজাতদের ভাষা উর্দু।'

বাঙলার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কত বিচিত্র ছিল তার দু-একটি নমুনা দিচ্ছি: "A Muhammadan Gentelman about 1215 B. S. (1808 A. D.) enjoined in his deathbed that his only son should not learn Bengali, as it would make him effiminate. ... Muhammadan gentry of Bengal too wrote in Persian and spoke in Hindustani.

(JASB, 1925 PP 192-93; A Bengali Book written in Persian Script : Khan Saheb Abdul Wali). মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের পূর্ব উদ্ধৃত উক্তিও স্মর্তব্য।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' (১৩১৫ সন) গ্রন্থে লিখেছেন : মুন্সী সাহেব (তাঁর শিক্ষক) বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। ....বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। .... আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না।"

মীর মুশাররফ হোসেনের 'গৌরাই ব্রীজ বা গৌরীসেতু" গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র? যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেও মুসলিম সমাজমনের পরিচয় পাই: "যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থকিবে যে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করিবেন, ততদিন সে (হিন্দু-মুসলমান) ঐক্য জন্মিবে না।"

[হিন্দু মুসলমান ঐক্য তখনো ছিল না— শাসক-শাসিত সুলভ অবজ্ঞা বিদ্বেষের জেরই বিদ্যমান ছিল!]

'বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা।' (নবনূর ; ভাদ্র ১৩১০ সন : মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার— লেখক কেন চিৎ মর্মাহতের হিতকামিনা। ইনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।)

"আমি জাতিতে মোসলমান,—বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে।" ['হিন্দু মুসলমান' (ঢাকা ১৮৮৮ সন) গ্রন্থে লেখক শেখ আবদুস সোবহান। ইনি 'ইসলাম সুহৃদ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল কাদির ও ওয়াহাবী (মুহম্মদী) আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের বাহন ছিল উর্দু। সে সূত্রেও ইসলামি সাহিত্যের আধাররূপে উর্দূ ধর্ম ও জাতি-প্রাণ মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে শেখ আবদুর রহিম, নওশের আলি খান ইউসুফজাই, মৌলানা আকরম খান প্রমুখ অনেক বাঙলা লেখকও উর্দুর প্রয়োজনীয়তা (পাকিস্তান পূর্বযুগেও) অনুভব করতেন। শেখ আবদুর রহিম বলেছেন:"....বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না—ধর্ম ভাষা আরবি, তৎসহ ফারসি এবং উর্দু এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা। (৮ই পৌষ ১৩০৬ সন— মিহির ও সুধাকর)।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান বলেছিলেন—'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার। (তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন : অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।)

সাধারণভাবে বলতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বাবধি (১৯২০ খ্রী;) এক শ্রেণীর বাঙালি মুসলমান উর্দু-বাঙলার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এঁদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং জমিদার অভিজাতরাই ছিলেন বেশি। বাঙালি মুসলমানের অশিক্ষার সুযোগ উনিশ শতকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি স্ব-আরোপিত (Self assumed) অবাধ নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, আমীর হোসেন (বিহারী), সৈয়দ আমির আলি, নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলি প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমের উর্দুভাষী বংশধরগণ। তাঁরাই বাঙালি মুসলমানের মুখপাত্র হিসেবে উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে বিদ্যালয়ে চালাবার স্বপ্ন দেখতেন। পাকিস্তান-উত্তর যুগে তাঁদেরই বংশধর কিংবা জ্ঞাতিত্ব লোভীরাই উর্দুকে বাঙালির উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াসী ছিলেন। আজো একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও সাহিত্যিক বাঙলায় আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা উর্দুর স্বাদ পাবার প্রয়াসী!

অতএব, গোড়া থেকেই বাঙলা ভাষার অনুশীলনে মুসলমানরা বিবিধ কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আজো সে-দ্বিধা থেকে তাদের অনেকেই মুক্ত নয়। এভাবে বাঙলা মুসলিম গুণী-জ্ঞানীর আন্তরিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত ছিল। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান যতখানি থাকা বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক ছিল, তা মেলেনি। সৈয়দ সুলতানও এই দ্বিধাগ্রস্তদেরই অন্যতম। বহু যুক্তি দিয়ে তিনি একদিকে নিজেকে বাঙলা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে বিরূপ সমালোচনা প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা-সাহিত্যের আঁধার-যুগের ইতিকথা

চর্যাগীতিকে দশ থেকে বারো শতকের বাঙলা রচনা বলে ধরা হয়। এর পরে তেরো শতক থেকে চৌদ্দশ পঞ্চাশের মধ্যেকার কোনো বাঙলা রচনার নিশ্চিত নিদর্শন মেলে না। তাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময় বাঙলায় কিছুই রচিত হয়নি এবং তাঁরা তুর্কী বিজয়কেই এ-জন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, তুর্কী বিজয়ের ফলে বাঙলা দেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলে। দেড়শ, দু'শ কিংবা আড়াইশ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো হয় কাফেরদের উপর। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির উপর চলে বেপরোয়া ও নির্মম হামলা। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর পরেও মাটি কামড়ে টিকে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিন-রজনী গুনে গুনে রইল। কাজেই ধন, জন ও প্রাণের নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিলাস অসম্ভব। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশের কথাই উঠে না। এই হল তাঁদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন থেকে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি সব ইতিহাসকারেরই একই সিদ্ধান্ত। বাঙলা দেশে তুর্কী বিজয় সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মনে একটা বিজাতীয় বিরূপতা সব সময় সক্রিয় থাকে, ফলে তাঁদের সহজ বিচারবুদ্ধি এখানটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নইলে তাঁদের রচনায় উক্তির অসঙ্গতি, তথ্যের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার ফিরিস্তি এমন উৎকট হয়ে ফুটে উঠত না।

AMARBOI.COM

যে তুর্কী বর্বরতার বরাত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের বন্ধ্যাযুগের ইতিকথা তৈরী হয়েছে, সে তুর্কী-বিজয় ও তুর্কী শাসনের খসড়াচিত্র এখানে তুলে ধরছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত History of Bengal-কে সাধারণত নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলে স্বীকার করা হয়। তারই দ্বিতীয় খণ্ডের আলোকে এ সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাসের আভাস ও ফলশ্রুতি দেবার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগের ইতিহাস সে-যুগের আবহেই যাচাই করতে হবে। সে-যুগে পরমতসহিষ্ণুতার কিংবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্যমূলক শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ছিল। পরাক্রান্ত শক্তি মাত্রেই পরপীড়ক ছিল। তার উপর ছিল ফৌজী বর্বরতা—যা এ-যুগেও বিরল নয়। এটিলা, চেঙ্গিজ, হালাকু থেকে তৈমুর-নাদির অবধি এশিয়ার যে-কোন দিগ্বিজয়ীর কথা স্মরণ করলেই এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শাসক কিংবা বিজেতার কোনো জাতধর্ম নেই। তাঁদের লোভের কিংবা ক্ষোভের কবলে যে পড়ে সেই উৎপীড়িত হয়। তাই দুনিয়ার রাজবংশাবলীর ইতিহাসে আত্মীয় হত্যার নজিরই বেশি। দুনিয়াতে চিরকাল রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিত—এই দুই শ্রেণীই আছে। সেই রাজা শাসক বা শোষক স্বদেশী-স্বজাতি হোক কিংবা বিদেশী-বিজাতি হোক তাতে কোনো ইতর-বিশেষ হয় না। বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মীয় ও জ্ঞাতি হত্যার নজির হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান প্রভৃতি পৃথিবীর রাজবংশের ইতিহাস মাত্রেই বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে মুসলমানরাই প্রধানত পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী। কাজেই তাদের অন্যায়, উৎপীড়ন ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। আসলে সে-যুগের সভ্যজগতের ইতিহাস সর্বত্রই একরূপ। পনেরো শতকের ইটালিতে পোপ পঞ্চম নিকোলো (১৪৪৭-৫৫) পেগান, মন্দির, মূর্তি, ইমারত ও শিল্পকৃতি ভেঙে প্রাসাদ ও গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন।[১] ফরাসী বিপ্লবকালে লুই ও

১ The Story of Civilization—Will Durant Vol V. P 376

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজবংশীয়দের হত্যা, গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে গ্রীকদের আনাতোলীয়া অঞ্চলে তুর্কী নিধন, হিরোসিমা-নাগাসাকির হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি পুরোনো প্রবৃত্তিরই নতুন প্রকাশ। উত্তেজনাবশে ভাল মানুষও যে হিংস্র শ্বাপদ হয়ে উঠতে পারে তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬-৫০এর বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজে। সেকালের যুদ্ধনীতি ও শাসনরীতি ছিল ভিন্ন। রাজা-প্রজা তথা শাসক-শাসিতের কর্তব্য, দায়িত্ব এবং অধিকারবুদ্ধিও ছিল অন্যরকম। জাতি ও বর্ণ-দ্বেষণা আজো সুসভ্য আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে তীব্র সমস্যা হয়েই রয়েছে। সে যুগে যে ছিল—তা এমন আর ক্ষোভের কি! তবু যারা ক্রীতদাসকেও নিজের সমান মর্যাদা দিয়েছে, উচ্চপদে বসিয়েছে, জামাতা করেছে, সিংহাসন দিয়েছে, তারা কি একেবারে অমানুষ হতে পারে? উদারতা ও মানুষের প্রতি নিঃসঙ্কোচ শ্রদ্ধার এমনি দৃষ্টান্ত আর কোনো জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, মুসলমানেরা অমুসলিম দেশ জয় করতে গিয়ে ধনের লোভে ও ফেরারী শত্রুর খোঁজে গির্জা-মন্দির-বিহার আক্রমণ করেছে, মন্দির ও মূর্তি ভেঙেছে, ধন-রত্ন লুট করেছে। যেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে সেখানে মন্দিরকে মসজিদ করেও নিয়েছে। আত্যন্তিক স্বধর্মপ্রীতি ও বিধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এমনি অপকর্মে সেনাদলকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করে। পৌত্তলিক সমাজ থেকে গড়ে ওঠা নিরাকার একেশ্বরবাদী মুসলিম মানসে পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞাটাও ছিল তীব্রতর। কাজেই যুদ্ধকালে বর্বর ফৌজী-উত্তেজনার সময় মন্দির-মূর্তি ভাঙা ও ধনরত্ন লুট করা সে-যুগের কোনো বিজেতা-বাহিনীর পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। বিজাতি বিধর্মী বিজেতারা চিরকালই তা করেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বত্র এর নজির রয়েছে। মুসলমানেরা এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ে খেয়ালের বশে কিংবা বিজাতি-বিদ্বেষের প্রাবল্যে কোনো মুসলমান শাসক মন্দির-মূর্তি ভাঙেননি। বরং কেউ কেউ পাপের ভয় উপেক্ষা করেও মন্দির তৈরিতে অর্থসাহায্য করেছেন, দেবোত্তর জমি দিয়েছেন। "এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে-সব ঐতিহাসিক নজির দিন-দিন নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতিমোহন সেন)। তারপর যখন হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত দেশে রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ হয়েছে, তখন ধর্মস্থানের উপর হামলা (বিশেষ কারণ না ঘটলে—যেমন মন্দিরে শত্রুর আশ্রয় নেয়া, আত্মগোপন করা ইত্যাদি) হয়নি। ভারতের কোনো মুসলমান বিজেতাই স্বধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে দেশ জয় করেননি— রাজত্বলোভেই অস্ত্রধারণ ও প্রয়োগ করেছেন। মুসলমান বিজেতারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেই হিন্দু পাইক (পদাতিক সৈন্য) ও কর্মচারী নিয়োগ করতে থাকেন। "রাজ্য শাসনে ও রাজস্বব্যবস্থায় এমনকি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" এবং "গৌড়ের সুলতানেরা মুসলমান হইলেও রাজকার্য প্রধানত হিন্দুর হাতেই ছিল।" (সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।—এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্ত ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস)। "পাঠান রাজত্বকালে জায়গীরদারেরা দেশের ভিতরে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। দেশে শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হত। সেইজন্য পাঠান আমলে হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।" (বাঙলার নব জাগৃতি, বিনয় ঘোষ পৃ. ২৮।)

কাজেই তখনকার নতুন অভিযানে মন্দির ভাঙায় বাস্তব বাধা ছিল। আর ফৌজী বর্বরতার কথা বাদ দিলেও শাসকদের কেউ হয় নরদেবতা আবার কেউ বা নরদানব—এ একান্তভাবে ব্যক্তিক-চরিত্রের কথা। সুশাসন-কুশাসন ব্যক্তিক যোগ্যতা ও স্বভাবের উপরই নির্ভরশীল। এজন্যে জাত তুলে খোঁটা দিলে বুদ্ধির তারল্যই প্রকাশ পায়। এবার আমরা বাঙলার শাসকদের পরিচয় নেব।

(ক) খালজী আমীরদের শাসনে : (১২০২-২৭ খ্রী.)

১। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খালজী (১২০২-৭) ১২০২ কিংবা ১২০৬ সনে 'নুদিয়া' জয় করেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এদেশ জয় করেন। তাই শাসনক্ষমতা হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েই ইনি সামন্ততান্ত্রিক শাসন-সংস্থা গড়ে তুলেন। আর একদিকে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গঠনমূলক কাজে যেমন যত্নবান হন, তেমনি শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। "Malik Ikhtyar-uddin Muhammad devoted the next two years (1203–05) to the peaceful administration of his newly founded kingdom. He followed the usual practice of Muslim conquerors by pulling down idol temples and building mosques on their ruins, endowing Madrasa or Colleges of Muslim learning and evincing his zeal for religion by converting the infidels. But he was not blood-thirsty and took no delight in massacre or inflinching misery on his subjects (PP 8–9)... (He) was indeed the maker of the medieval history of Bengal—He was a born leader of men, brave to recklessness and Generous to a fabulous extent." (P. 12)

২। মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহম্মদ শিরান খালজী (১২০৭-৮)— এক বছরের মতো রাজত্ব। Shiran was a man of extra-ordinary courage, sagacity and benevolence (P. 15)

৩। মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (১২০৮-১০ খ্রী.)— ইনি বিদ্রোহী আমীর আলি মর্দানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দক্ষ শাসক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। (He) was the most level headed politician, steadfast in ambition, unfettered by any scruple or sentiment, possessed of the rare gift of making himself acceptable even to his prospective rivals and too clever to place all his cards on the table a minute too soon. (P. 18)

৪। মালিক আলি মর্দান (১২১০-১৩ খ্রী.)—এঁর ঘটনাবহুল জীবন। বিদ্রোহ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃসাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, উন্মত্ততা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতির সমবায়ে ইনি বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মানুষ।

হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর হাতে সমভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। (He) was a man of undoubted ability as a soldier, but impolitical, blood-thirsty and of a murderous disposition .... Partly out of policy but mainly actuated by a feeling of Vengeance against his Khilji Kinsmen who had cast him out, he made the Khilji nobles suffer terribly at his hands. (P. 19)

৫। মালিক হুসামুদ্দিন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (পুন. ১২১৩-২৭)— অত্যন্ত জনপ্রিয় সুশাসক। ইনি নৌবহর সৃষ্টি করেন। সম্ভবত তাঁর নৌসৈন্যেরা হিন্দু ছিল।

(Iwaz) Proved one of the most popular Sultans that ever sat on the throne of Gour (P. 21) ... Iwaz built more than one Juma Mosque, other Mosques and Madrasas also arose on all sides (P. 25) ..... the kingdom of Lakhnawati and Bihar enjoyed uninterrupted peace for about twelve years under the vigorous and beneficient rule of Sultan Ghyasuddin Khilji till the first expedition of Sultan Shamsuddin-Iltutmish against Bengal 1225 A. D. (P. 25)—Sultan Ghyasuddin's reign of about fourteen years was a prosperity for his kingdom (P.17)—Sultan Ghyasuddin in his exterior and interior graces was every inch a Padishah, just, benevolent and wise (P. 28), 'বৃহৎবঙ্গে'ও (পৃ. ৬১২) এঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছ্বসিত তারিফ আছে। এখানেই খালজী আমীরদের শাসনের অবসান ঘটে। তারপরে শুরু হয় দিল্লী সুলতানের মামলুক (ক্রীতদাস) শাসন।

(খ) মামলুক (গোলাম) শাসনে (১২২৭-৮২)

৬। শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ (১২২৭-২৯)— সম্রাট ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড়ের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বছর মাত্র "অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিয়াছেন।" (বৃহবঙ্গ পৃ. ৬১৩)।

৭। মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বল্‌খ খালজী (১২২৯-৩০) ওরফে দৌলতশাহ্‌ বিন মওদুদ— নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট ইলতুতমিসের সেনানীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

৮। মালিক আলাউদ্দীন জানি (১২৩১-৩২)—সম্রাট ইলতুতমিস এঁকেই গৌড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সম্রাট স্বয়ং গৌড়ে আসেন এবং অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে মালিক সাইফুদ্দীন আইবককে সুবাদারী দেন।

৯। মালিক সাইফুদ্দীন আইবক (১২৩২-৩৫)—"He possessed all the noble qualities of his race and rose to the front rank of the maliks of his age." (P. 45)

১০। মালিক ইজ্জুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৩৬-৪০)— ইনি রাঢ় অঞ্চলও দখলে এনেছিলেন। ফলে বিহার, বরেন্দ্র ও রাঢ়ের অধীশ্বর হয়ে ইনি যোগ্যতার সঙ্গে শাসনদণ্ড চালনা করেন। "He was adorned with all sorts of humanity and sagacity and graced with virtues and noble qualities and in liberality, generosity and power of winning men's heart he had no equal. (P. 46)

১১। মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান (১২৪৫-৪৭)— ইনি তুঘরল তুঘান খান থেকে গৌড় জবরদখল করেন। এঁর আমলে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রের অনেকখানি দখল করে নেন। কিন্তু তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

১২। মালিক জালালউদ্দীন মাসুদ জানি (১২৪৭-৫১)—ইনি আলাউদ্দীন জানির পুত্র। এঁর উপাধি ছিল মালিক-উস্‌-শরক্‌। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

১৩। মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন উজবেক (১২৫২-৫৭)— ইনি তিনবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এই দিগ্বিজয়ী, সাহসী ও নিপুণযোদ্ধা গৌড়, বিহার ও অযোধ্যা জয় করেন এবং কামরূপ অভিযানে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করেন।

'Rushness and imperiousness were implanted in his nature and constitution; but he was a man of undoubted ability as soldier and proved a successful ruler too (P. 51)

১৪। মালিক ইজ্জুদিন বলবন-উজবেকী (১২৫৭-৫৯)—জবরদখলকার। তাঁর উল্লেখ্য কোনো কৃতি নেই।

১৫। মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫)—যুদ্ধবাজ ও রক্তপিপাসু। ইজ্জুদিন যখন 'বঙ্গ' অভিযানে ব্যস্ত তখন লখনৌতে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

'He was an impetuous and warlike men and had attained the acsue of capacity and intrepidity (P. 55)

১৬। তাতার খান (১২৬৫-৬৮)—আরসালানের পুত্র।

'Tatarkhan was a very capable ruler, renowned for his bravery, liberality, heroism and honesty. (P. 57)

১৭। শেরখান (১২৬৮-৭২)— উল্লেখ্য কৃতিহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮। আমীন খান—উল্লেখ্য কৃতিহীন।

সহকারী সুবাদার তুঘরল খান (১২৭২-৮১)

১৯। মুঘিসুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান (১২৭২-৮১)— অল্পদিন সুবাদার আমীন খানের সহকারী রূপে থেকে গৌড়ের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন। তুঘরলের হিন্দু পাইক (পদাতিক) সৈন্যবাহিনী ছিল, (P. 61)। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন অসংখ্য পরিকর সহ তুঘরলকে হত্যা করেন। গৌড়ে সে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

"Tughral possessed all the characteristic virtues of Turk, indomitable will, reckless bravery, resourcefulness and boundless ambition." (P. 58)—His court at Lakhnawati rivalled that of Delhi in power and magnificence and he was more popular with his people and much better served by them than Sultan Balban who was more feared than loved by his subjects—He was profuse in liberality so the people of the city (of Delhi) who had been there, and also the inhabitants of that place (Lakhnawati) became very friendly to him. The troops and citizens having shaken off all of the Balbani chastisement, joined Tughral heart and soul. (P. 60–61)

এবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামলুক শাসনকালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক : "The History of this period is sickening record of internal dissensions usurpations and murders—Here in Bengal the political maxim gained ground that who-soever could kill or oust the reigning ruler should be acknowledged without demur as its legitimate master and Bengalees, whether Turks or Hindus remained generally indifferent to the fate of their rulers and enunciated a constitutional principle of their own that the loyality of a subject was due to the masnad (throne) and not to the person who happened to occupy it (P. 42)—Another notable feature of the history of this period was the beginning of a sort of rapprochment between the conquerors and their Hindu subjects. The exodus of upper class Hindus on a wide scale from the Muslim Territory gradually stopped and now for the first time we come across references to Hindus as a class of inhabitants in the Muslim Capital. The Muslim rulers had no internal trouble with regard to their Hindu subjects or Varendra even when the Hindus of Orissa threatened the capital with a siege. (P. 43).

(গ) বলবন বংশের শাসনে (১২৮২-১৩০১)

২০। নাসিরুদ্দীন বঘরা খান (১২৮২-৯১)— কর্মকুণ্ঠ, বিলাসপ্রিয়, কিন্তু হৃদয়বান সজ্জন। "He was wise in counsel, weak in action and unaggressive by temperament. Though there was nothing to admire in him, he was a lovable and genial personality strong in human virtues. He reigned rather than ruled the kingdom of Bengal, but he enjoyed throughout the esteem of his nobles and popularity with his subjects in the land of his adoption (P. 47)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১। রুকুনউদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১-১৩০১)—নাসিরুদ্দীনের পুত্র। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব।

এবার বলবনী শাসনের ফলশ্রুতি যাচাই করা যাক : "The Balbani regime in Bengal was not only a period of expansion but one of consolidation as well. It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active peity, energy and foresight began prosetlylising on a wide scale not so much by force as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the low class of Hindus then as ever in the grip of superistition and social repression.[১] —About of a century after the military and political conquest of Bengal, there began the process of the moral and spiritual conquest of the land through the efforts of the muslim religious fraternities that now arose in every corner. By destroying temples and monasteries the muslim warriors of earlier times had only appropriated their gold and silver–the saints of Islam completed the process of conqueset—moral and spiritual by establishing Dargahs and Khankhas deliberately on the sites of these ruined places of Hindu and Buddhist worship (P. 69)

(গ) অজ্ঞাত মামলুক শাসনে (১৩০১-২৮)

২২। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-২২)—"Shamsuddin Firoz was a ruler of exceptional ability. (P. 81) He died full of years of glory and a fame (P. 82)

২৩। (ক) গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ Rebellious son of Firoz Shah.
(খ) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্
(গ) বহরম খান ওর্ফে তাতার খান (১৩২২-২৮)।

এখন থেকে কয়েক বছরের জন্য গৌড় রাজ্যকে তিন-অঞ্চলে ভাগ করে তিনজন শাসকের অধীনে দেয়া হয় এবং শাসকদের নিজেদের মধ্যে দখল-বেদখলের কোন্দলও চলতে থাকে।

২৪। (ক) কদর খান—লখনৌতি—১৩২৮
(গ) মালিক ইজুদ্দিন এহিয়া—সাতগাঁও—১৩২৮
(গ) বহরম খান—সোনারগাঁও—১৩২৮—(মৃত্যু : ১৩৩৮)

২৫। (ক) ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৫০)—সোনারগাঁও। "The lot of Hindu population in Fakhruddin's time was not very enviable for "They are muleted" says Ibn Batuta "of half of their crops and have to pay taxes over and above that" (P. 102)
(খ) আলী শাহ (১৩২৮-৪২) লখনৌতি
(গ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ—লখনৌতি-সাতগাঁও (১৩৪২-৫৭)—সোনারগাঁও (১৩৫৩-৫৭)

---

১ "হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম/আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"—বৃন্দাবন দাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ঘ) ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ (১৩৫০-৫৩)—সোনারগাঁও। ইনি ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর পুত্র।

(ঘ) ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২-১৪১৩)

২৬। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-ই শেষ অবধি গোটা গৌড়রাজ্যের অধিপতি হয়ে উঠেন এবং তিনি ১৩৫৩ সন থেকেই গৌড়রাজ্যের স্বাধীন সুলতান।

২৭। সিকান্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯)—ইলিয়াস শাহর পুত্র। "During the long period of peace that followed Sultan Sikandar adorned his capital with many noble monuments of architecture" (P. 112)

২৮। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯)—এঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক হয়ে আছে। ইনি সিকান্দর শাহর পুত্র। বিদ্যাপতি এঁরই গুণকীর্তন করেছেন।

২৯। সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪০৯-১০)—উল্লেখ্য কৃতিহীন।

৩০। শামসুদ্দীন (১৪১০-১৩)— ইনি হামজা শাহের পুত্র। এঁর আমল রাজা গণেশের প্রভাবের যুগ। এ সময় সম্ভবত রাজপরিবারে গৃহযুদ্ধ ঘটে।

(ঙ) গণেশ ও তার বংশধরদের আমল (১৪১৪-৪২)

৩১। রাজা গণেশ (১৪১৪-১৮)—জবরদখলকার। এঁর নিন্দা-প্রশংসা দু-ই আছে। তবে সুদক্ষ শাসক।

৩২। মহেন্দ্র দেব (১৪১৮)—রাজত্বকাল কয়েক মাস মাত্র। ইনি হিন্দু দলের দ্বারা মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন।

৩৩। যদু বা জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)—যেসব ব্রাহ্মণ তাঁর প্রায়শ্চিত্তে অংশগ্রহণ করেও তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে নারাজ ছিল, তাদের তিনি লাঞ্ছিত করেন। মোটামুটিভাবে সুশাসক। "We can well believe that the province grew in wealth and population during his peaceful reign. (P. 129)

৩৪। শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২-৩৩)— ইনি জালালউদ্দীনের পুত্র। "His reign was darkened by his crimes and follies, till the nobles finding it intolerable1 got him murdered through his slaves Shadi khan and Nasir khan in 1333 A. D." (P. 129)

(চ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহ আমলে (১৪৩৩-৮৬)

৩৫। নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯)

"Chosen by the people the new sovereign, who styled himself Nasiruddin Abul Muzaffar Mahmud, was able to enjoy an undisturbed and prosperous reign. He is described as a just and liberal king by whose good administration" the people, both young and old, were contended and the wounds of oppressions inflicted by Ahmad Shah were healed .... his main interests probably lay in the arts of palace. A large number of inscriptions found all over his kingdom recording the erection of Mosques, khankas, gates, bridges and tombs, testify not only to the prevailing prosperity but also to the enthusiasm for pulic works and interest in the building art, which he inspired. (P. 130)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬। রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৬)—"Histories praise him as "a sagacious and law-abiding sovereign in whose kingdom the soldiers and citizens alike had contentment and security." (P. 132) কৃত্তিবাস এঁর প্রতিপোষকতা পেয়েছিলেন।

৩৭। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১)— মালাধর বসু এঁরই প্রতিপোষকতায় "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" রচনা করেন। "Both Firishta and Nizamuddin described him as vastly learned, virtuous and an able administrator. He evidenced a special interest in the administration of justice and interested on the strict and impartial application of the law—like Alauddin, he totally prohibited the drinking of wine and frequently assisted the judges in difficult cases." (P. 136)

৩৮। জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ (১৩৮১—৮৭)—"Fath is stated to have been an intelligent and liberal ruler 'who maintained the usages of the past and in whose time the people enjoyed happiness and comfort.' (P. 137)

এবার এখানে ইলিয়াস শাহী রাজত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন উদ্ধৃত করছি :

"The dynesty deserved well of Bengal, for with remarkable consistency it produced a succession of able rulers. They were tolerant, enlightened administrator and great builders. In shaping the economic and intellectual life of the Bengali people for nearly a century and a half; the Ilyas Shahi kings played the leading part. Tolerance was their greatest asset. To have ruled over a people of an alien faith for eight generations was in itself a great achievement; to be instated on the throne after twenty five years' exclusion by a local dynesty was an even greater one. It was a singular proof of their popularity—a popularity which rested on their past services. (P. 137)

AMARBOI.COM

(ছ) হাবসী গোলাম আমলে (১৪৮৭-৯৩)

৩৯। সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-৯২)—প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে প্রভুপত্নীর অনুরোধে বিশ্বস্ত হাবসী-গোলাম—আমীর আন্দিল 'সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ' নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন।

"He is credited with having ruled justly and efficiently. His reputation as a soldier inspired respect and awe and his attachment to the Ilyas Shahi house made the people forget his race. His kindness and benevolence evoked warm praise from the historians. (P. 139)

৪০। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়)—(১৪৯০-৯১)— এক বছর কাল রাজত্ব করার পর সিদিবদরের হাতে নিহত হন।

৪১। শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা (১৪৯১-৯৩)—রক্তপিপাসু নরদানব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"He was perfect reign of Terror .... Commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword fell equally heavily on the Hindu nobility and princes suspected on opposition to his sovereignty." (P. 140)

(জ) হোসেন শাহী আমল (১৪৯৩-১৫৩৮)

হোসেন শাহী শাসন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ নেই, বরং তারিফ আছে প্রচুর। কাজেই আমরা ইতিহাস আর ঘাঁটতে চাইনে।

৪২। সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)।

আমরা বাঙলার ৩১৫ বছরের ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম। এ ধরনের শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্যার 'তাণ্ডবলীলা' প্রত্যক্ষ করেছেন, গোপাল হালদার দেখেছেন কেবল 'রক্ত' আর 'আগুন', আর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্রমোহন বসু, ডা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাসরচয়িতাই পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা কিংবা বলপ্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী।

ইখতিয়ার উদ্দীন খালজী (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৫১৯) অবধি মোট বিয়াল্লিশ জন শাসক গড়ে সাত বছর করে গৌড়রাজ্য শাসন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ স্বাধীন, কেউ বা দিল্লীর সম্রাটের সুবাদার। সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসনতান্ত্রিক কানুনের অনুপস্থিতি, সিংহাসনের উত্তরাধিকারে 'দাবী' ও যোগ্যতা বিষয়ে ধর্মীয় কিংবা শাসনতান্ত্রিক বিধানের অভাব এবং অঞ্চল হিসাবে গৌড়ের প্রান্তিকতা গৌড় শাসকদের উচ্চাভিলাষী ও উচ্ছৃঙ্খল হতে সহায়তা করেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিপুলতার কারণও এ-ই। তাই সুবাদার বদল হয়েছে ঘন ঘন। এতেই শাসকসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-যুগে সুলতানেরা সাধারণত আমৃত্যু রাজত্ব করেছেন।

এঁদের মধ্যে হিন্দু-পীড়ক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন : ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০৪-৭), আলী মর্দান (১২১০-১৩), মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫), সোনার গাঁয়ের ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৫৩-৫৭), শামসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩)। এঁদের মোট রাজত্বকাল বিশ বছর। ৩১৫ বছর কালের পরিসরে কুশাসন বা হিন্দু-নিপীড়নের বিভিন্ন কালের যোগে পাচ্ছি মাত্র বিশ বছর। এই বিশ বছরই 'দুধে চনা' কিংবা দুধে গরলের মতো গোটা মুসলিম আমলকে 'রক্ত ঝরানো ও আগুন জ্বালানো' শাসনরূপে পরিচিত করেছে। সে-যুগে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়ার কারণ নাকি এ-ই।

আমরা জানি, মুসলমান শাসকেরা কেবল নিজেদের মধ্যে মারামারিই জিইয়ে রাখেননি, রাজ্যবিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুকে শত্রু করে রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্য-ও নিয়ে (যেমন তুঘান খান, ১২৭২-৮১) যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিল না।[১] আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজারা প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে নয় মাসেই

---

১ এ প্রসঙ্গে 'Early Muslim Rulers in Bengal and their non-Muslim subjects (Down to A. D. 1538) by Dr. Abdul Karim, Journal of Asiatic Society of Pakistan, Dacca. 1957 দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছত। প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। এ সম্পর্কে মামলুক শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়। যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত করেছিল? শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এ দেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, '৪৬ ও '৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য। আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্তও নেয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খ্রী:) বাঙলা বিজিত হল বটে; কিন্তু আকবর-জাঁহাগীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। শাহ্জাহানের আমলে বাঙলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য; কিন্তু হার্মাদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না; আবার আওরঙ্গজীবের আমলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য নতুন উপসর্গরূপে দেখা দিল। তা সত্ত্বেও বাঙলায় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোনো কোনো রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক।[১] এ ব্যাপারে বলবনী শাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়।

এবার বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো পেশ করছি:

ক. তুর্কী আক্রমণ ও বিজয় কি কেবল বাঙলা দেশেই ঘটেছিল, ভারতের অন্যত্র ঘটেনি? সেখানকার অবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছিল?

খ. যুদ্ধকালে জীবন ও সম্পদ নষ্ট অনিবার্য। কিন্তু তাই বলে যারা রাজত্ব করতে আসে, তারা বিজিতদের ওপর নির্বোধের মতো চিরকাল বেপরওয়া অত্যাচার চালায় না এবং চালালে সে-রাজ্য ও রাজত্ব টেকে না। রাজনীতি ও শাসননীতিতে এমন নির্বোধ policy থাকতে পারে না। যারা কথায় কথায় বাঙলা দেশে দেড়শ, দু'শ বা আড়াই শ বছরব্যাপী হিন্দু-পীড়নের কথা বলেন, তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি, যে এটা ছয় থেকে দশ পুরুষের (generations) ব্যাপার? ইতিমধ্যে শাসক বদল হয়েছে কয়বার; generation ঘুরেছে কয়বার? দেড়শ-আড়াইশ বছর ধরে পুরুষানুক্রমে একই মতাদর্শে আস্থা রাখা, একই পীড়ননীতি চালু রাখা কিংবা একই কর্মে সক্রিয় থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি?

গ. জনাব গোপাল হালদার (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড) বলেছেন, বৌদ্ধদেরও উপর অত্যাচার হয়েছিল। দুর্গভ্রমে মগধের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ ও সৈন্যভ্রমে ভিক্ষু হত্যার ব্যাপারটি যে একান্তই অজ্ঞানকৃত তা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধদের সংখ্যা তখন বাঙলায় নেহাত নগণ্য এবং দণ্ডশক্তি তাদের কারো হাতে ছিল না। তারা তখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিগ্রহপিষ্ট ও অনুকম্পাজীবী। কাজেই তাদেরকে নিপীড়িত করবার কারণ ও সুযোগে দু-ই ছিল অনুপস্থিত। মুসলমান বিজয়ে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন-মুক্তির উল্লাসই কি 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' ব্যক্ত হয়নি?

ঘ. ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, উচ্চ বর্ণ ও বিত্তের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। তারপরেও বাঙলা দেশে—বিশেষ করে গৌড়ে-নদীয়ায় উচ্চবর্ণের এত হিন্দু রইল কী করে? বাঙলা দেশে উচ্চবর্ণের লোকের আনুপাতিক সংখ্যা যত, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে তত আছে কি? বাঙলার যে অংশ সুলতানদের পদতলে ও পদপ্রান্তে ছিল সেখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশি কেন? 'রক্তে' ও 'আগুনে' এতকিছু ধ্বংস করার পরেও সব রইল কী করে? মন্দির ধ্বংস কিংবা হিন্দু নাগরিক হত্যা না করেই পূর্ববঙ্গ একশত বছর পরে (১৩০১ খ্রী.) জয় করা হয়। [পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে আসলে ১৫০ বছরের বেশি সময় লেগেছিল।] রাঢ় অঞ্চলও তেরো শতকের তৃতীয়পাদ অবধি গঙ্গারাজদের দখলে ছিল। সেখানকার বাঙলা ও সংস্কৃত অবদানের নিদর্শন কী এবং কোথায়?

১ "হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ/আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন। হিন্দুরা কি করে তারে যার যেই কর্ম/আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।" – বৃন্দাবন দাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ. সে যুগে কি নির্দিষ্ট প্রান্তরে নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ হত না? এবং সেনাপতির নিধনে, দুর্গ দখলে কিংবা তখ্ত অধিকারে গোটা দেশ জিত হত না? গরিলা যুদ্ধ তথা গণসংগ্রাম ছিল কি? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়'—কথাটা কি আক্ষরিক অর্থে সত্য ছিল না? আমাদের মধ্যযুগীয় শেষ লড়াই 'পলাশীর যুদ্ধ'ও এরূপ যুদ্ধ নয় কি? জয়ের পরে দুই একদিন নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে, রাজধানী প্রবেশের পথে ও রাজধানীতে লুটতরাজ চলত (এ-ই নিয়ম)। তাই বলে তা বছরের পর বছর ধরে চলেছে বলে ভাববার কারণ কি? বর্গীর হামলার মতো রাজশক্তির ও রাজার সুপরিকল্পিত cold-blooded বর্বরতা, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর আছে কি? তবু বর্গী উপদ্রুত অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, পালা-পার্বণ ও বিবাহ-উৎসবাদি কি বন্ধ ছিল? দেড়শ-আড়াইশ বছর ধরে নিপীড়ন চললে তা কি গা-সহা বা অভ্যস্ত হয়ে উঠে না? সে অবস্থায় জীবনযাত্রা কি বিকৃতভাবেও স্বাভাবিকতা লাভ করে না? তখন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় খুব বাধা থাকে কি? ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষকালে যখন বাঙলা দেশের প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাল তখনো কি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিত এবং বাঙলার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কি ছাপা হয় নি? পলাশীর যুদ্ধের পরে, সিপাহী বিপ্লবকালে, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময়ে কিংবা ১৮৪৬-৫০-এর পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরওয়া হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজের সময়ে (সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও এবং অনেকের আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ ও সম্পদহানি হওয়ার পরেও) বাঙলা দেশের অধিকাংশ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে ও মননে বিপর্যয় ঘটার প্রমাণ আছে কি? তখন কি স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, পার্বণ ও বিবাহাদি উৎসব বন্ধ ছিল?

চ. মুসলমান আক্রমণকারীরা নাহয় গৌড়-লখনৌতিতে চলার পথে, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা রাজধানী দখলের সময়ে মন্দির ভেঙেছে, প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করেছে, গ্রাম লুট করেছে ; কিন্তু তাদের সংখ্যা কয়টি ও কয়জন? দেশব্যাপী হিন্দু যারা বেঁচে রইল তাদের বাড়ির এবং দেশের অন্যান্য মন্দিরের পুথিপত্র নষ্ট হবার কারণ কি? এ তো গৌড়ের কথা। রাঢ়ে-বঙ্গে তো মুসলমানের পা বহুকাল পড়েনি, যখন পড়েছে তখন যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়-পরাজয় নিশ্চিতভাবে নির্ণিত হয়েছে, মন্দির ভাঙার কিংবা নির্বিচারে লোকহত্যার প্রয়োজন হয়নি। সেখানকার হিন্দুর বাঙলা-সংস্কৃতে কী অবদান আছে? গৌড়-লখনৌতিতে কাফেররা কি কেবল নিগৃহীতই হচ্ছিল; রাজনীতি ও কূটনীতির নিয়মানুসারে কেউ কেউ কি অনুগৃহীত হয়নি? তাদের দান কী?

ছ. ভারতে সর্বত্র ইংরেজের শাসনকাল সমান নয়। বাঙলাতেই তো ১৮২ বছর মাত্র। তবু আমরা কী দেখলাম? এর মধ্যেই আমাদের সর্বাত্মক বিবর্তন ও রূপান্তর জন্মান্তরেরই নামান্তর নয় কি? তা হলে মুসলমান রাজত্বের প্রথম আড়াইশ বছরেও (বিজ্ঞানযুগ নয় বলে হয়তো খুব মন্থরগতিতে) দেশের সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রূপান্তর ও বিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটেছে, যার ক্রমিক ও পূর্ণ বিকশিত রূপ পাচ্ছি ভাস্কর রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ-কলন্দর-রামানন্দ-কবীর-নানক-একলব্য-রামদাস-দাদু-রজ্জব-চৈতন্যের মতবাদে। ক্ষিতি মোহনসেনের 'ভারতের মধ্যযুগে সাধনার ধারা', 'হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা', তারাচাঁদের, Influence of Islam on Indian culture' 'সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'The Hindu view of life', বিনয় ঘোষের 'বাঙলার নবজাগৃতি,' উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারত দর্শন সার' প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের উক্তির সমর্থন রয়েছে।

এ ব্যাপারে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, নবদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালুগাজী, ওলাদেবী-ওলাবিবি প্রভৃতি উপ ও অপদেবতার উদ্ভব ও পূজা-শিরনীর কথাও স্মরণীয়।

'বৃহৎ বঙ্গে' দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'বাঙলা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীনতার যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল।' অরবিন্দ পোদ্দারের 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও মানবধর্ম' গ্রন্থেও তুর্কী বিজয়ের সুফলের কথা আছে এবং বৈষ্ণব মত যে সুফী মতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবপ্রসূত তা সুকুমার সেনও কিছুটা স্বীকার করেন। (বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস—পূর্বার্ধ পৃ. ২৪৫)।

জ. বাঙলা দেশ উজাড় হল বলে বাঙলা সাহিত্য দেড়শ-আড়াইশ বছর ধরে সৃষ্টি হয় নি, এ-ই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্ধাদের চর্যাপদ ছাড়া বাঙলায় আর কিছুই সৃষ্টি হয়েছিল কি? উচ্চবর্ণের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুসলিম বিজয়ের পূর্বেকার কোনো বাঙলা রচনার সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া যায় কি? লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলায় লিখিয়ে কবি ছিলেন কি? শৌরসেনী ছাড়া অন্য কোনো অবহট্টেই কি লিখিত বিশেষ কোনো রচনা আছে [ODBL–P. 113]? গৌড়ী অবহট্টে রচনার রেওয়াজ না থাকলে প্রাচীন বাঙলাতেই বা থাকবে কেন? ধ্বংসের মধ্যেও 'মূর্ছাহত' বাঙালি 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলন করবার প্রেরণা ও সংকলনের জন্য কবিতা পেলেন কোথায়? আর প্রাকৃত-অবহট্টের মতো বাঙলা কবিতা থাকলেও কি এরূপ সংকলন হত না? এ সময়ে রচনার অনুকূল পরিবেশ না থাকলে এ সময়কার কিছু কিছু সংস্কৃত রচনার (পুরাণাদির) সন্ধান মিলল কিরূপে? বাঙলা কি তখন শিক্ষিত লোকের সাহিত্য রচনার বাহন হবার যোগ্য হয়েছিল? সে-যুগের ধর্মসম্পৃক্ত সাহিত্য 'ভাষায়' সৃষ্টির বা অনুবাদের পক্ষে বাধা ছিল না কি? চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ছাড়া কোনো বামুন আদিস্তরে বাঙলায় কিছু লিখতে সাহস বা আগ্রহ দেখিয়েছেন কি?

অষ্টাদশ পুরাণানি চ রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

কিংবা 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে এ তিন সর্বনেশে' বুলিটা আঠারো শতক অবধি কথায় ও কাজে অন্তত কিছুটা কি চালু ছিল না?

ঝ. হিন্দুর বেদ-পুরাণাদি রইল, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের গ্রন্থও রইল, মুসলমানেরা কি শুধু বেছে বেছে বাঙলা বই নষ্ট করেছিল যে চর্যাপদ নেপাল দরবারের আশ্রয়ে টিকে রইল আর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) বাঁকুড়ার গোয়ালঘরে আশ্রয় পেল? শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের আর কোনো কপি পাওয়া গেল না কেন? 'শেখ শুভোদয়া'[১] কী বলে? বাঙলা দেশে কি আগুন-পানি-উই-কীট সে যুগে ছিল না? জনপ্রিয় না হলে এ-যুগের ছাপা বইও কি দুর্লভ ও ক্রমে লুপ্ত হয় না? ভাষার পরিবর্তনে ও জনপ্রিয়তার অভাবে (যদি বাঙলায় কিছু রচিত হয়েও থাকে) আলোচ্য যুগের বাঙলা বই কি লুপ্ত হতে পারে না? 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' কী লুপ্ত বা লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ নয়?

নেপালেই বা চর্যাপদের একাধিক পুথি পাওয়া গেল না কেন? ষোলো-সতেরো শতকে রচিত বহু পুথি কি লুপ্ত হয়নি? শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তারিখটি এবং কৃত্তিবাসের 'আত্মকথা' প্রচুর পাওয়া যায় না কেন?

আমাদের ধারণায় তুর্কীবিজয় ও তার পরেরকার গৌড়রাজ্যের চিত্র এরূপ ঃ

তুর্কীরা যুদ্ধ করে যখন দেশ জয় করেছে [আসলে বখতিয়ার খালজী অনায়াসেই দেশ দখল করেন, হত্যাকাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, কারণ রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন]; তখন সাময়িকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলেছিল (যেমনটি চলে থাকে)। তারপর দেশ শাসনে তারা মনোযোগী হয়। গোড়ার দিকে উদ্ধত অসহযোগীদের শায়েস্তা করতে হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ লোকের উপর অত্যাচার চলে। কিছু কিছু লোকের ধন-জন-প্রাণ হরণ করা হয় (যেমনটি নিয়ম ও প্রয়োজন)। তারপর রাজত্ব স্থায়ী করার গরজেই শাসিতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানে শাসকবর্গ বাধ্য হয় এবং যেহেতু দেড়শ বছর ধরে গৌড় সিংহাসনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল না, মসনদ নিয়ে

১ 'শেখ শুভোদয়া' অকৃত্রিমতায় অনেকে সন্দিহান। কিন্তু ষোলো শতকের সেই ইতিহাস-বিহীন যুগে হলায়ুধ মিশ্রের নাম জানা এবং তাঁর নামে ভণিতা দিয়ে জাল বই রচনা করা কেবল মুসলমানের পক্ষে নয়, অতি বুদ্ধিমান হিন্দু পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। অবশ্য প্রাপ্ত পুথিতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ ও বিকৃতি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্য কাড়াকাড়ির আশঙ্কা থাকত, সেহেতু সিংহাসনাভিলাষীরা সামন্ত, সর্দার ও ভূঁইয়াদের স্বপক্ষে টানবার জন্যে সুশাসন চালাবার চেষ্টা করতেন এবং সে সূত্রে সুশাসনের নামে বেশকিছুটা অতিরিক্ত উদারতা ও সদাশয়তা দেখাতেন এবং জনপ্রিয়তার জন্যে জনগণকে প্রশ্রয় দিতেন। এও অনুমান করা যায় যে, তাঁরা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবার গরজে প্রজাদের গোড়ার দিকে করভারে পীড়া দিয়েছেন। ইংরেজদের যেমন দেখেছি, তেমনি মুসলমানেরাও উত্তমন্যতা (Superiority complex) নিয়ে চলত, আর শাসিতদের অবজ্ঞা ও অনুকম্পা দেখাত; নির্বোধ ও সাধারণ মুসলমানেরা সে-অবজ্ঞা কথায় ও আচরণে প্রকাশ করত। [কীর্তিলতা[২] ও চৈতন্যমঙ্গলে যেমন দেখা যায়] এজন্যে হিন্দুর মনেও ক্ষোভ ছিল (যেমন মধ্যযুগের হিন্দুরচিত নানা গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতা দেখা যায়; বৃটিশ আমলের দেশীয় সাহিত্যে যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকট)। এজন্যে সময় ও সুযোগমতো তারা তিলকে তাল করে রটিয়ে দিত। (কিছুকাল আগে যেমন পাকিস্তানে হিন্দু-নারী হরণের ও হিন্দুর উপর নানা লঘুগুরু অত্যাচারের অলীক সংবাদ কলকাতায় শোনা যেত)। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক বিজাতির ও বিদেশীর হলে এমনটিই হয়, না হয়ে পারে না। শাসকের দোষ খোঁজার ও দেখার জন্যে এবং ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগের জন্যে এমনি অবস্থায় মনটি তৈরি হয়েই থাকে। (গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদলের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।) ঐতিহাসিকের কর্তব্য সব কথা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস না করে সত্য ও সারটুকু ছেঁকে নেয়া। আর অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা এ যুগেও রটে—সুতরাং সে-যুগে নানা কারণে এর বাহুল্য যে ছিল এবং অজ্ঞতার সুযোগ এবং যাচাই করবার উপায়ের অভাবে সেগুলো যে সহজে বিশ্বাস হত তা না বললেও চলে। আজকের মতোই ভালয়-মন্দয় শাসনকার্য চলত, মাঝে মাঝে অমানুষ শাসকের হাতে পড়লে তার ব্যতিক্রম ঘটত—আজও যেমন ঘটে। এজন্যে মানুষের ভাব-চিন্তা কিংবা আনন্দ-উৎসব বন্ধ থাকেনি—থাকে না। তবে অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশে তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘটে। তাও এসব বাধার যা-কিছু গুরুত্ব সাধারণের কাছেই—প্রতিভাধরের কাছে কখনোই নয়। তার প্রমাণ বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য।

এবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি যে বাঙলা এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামস-যুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়। হিন্দি, মৈথিল, উড়িয়া, অসমীয়াও এর দাবীদার। ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালি বিদ্বানেরাও ওদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩] সব সিদ্ধার

---

২ বিক্ষুব্ধচিত্ত হিন্দুর কাছে নির্যাতন মনে হয়েছে বটে, আসলে কীর্তিলতায় বর্ণিত 'তুর্কীর হিন্দু নির্যাতনের' চিত্রটি অশিক্ষিত নির্বোধ মুসলমানের রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সেকালীন স্থূল রসিকতা ও বিদ্রূপের ধরনই ছিল ঐরূপ। 'ফোট চাই জনউ তোড়। উপর চড়াব এ চাহ ঘোড়॥—এ নির্যাতন নয়—রসিকতার বিকৃত ধরন। এতে কবিজনোচিত অত্যুক্তিও আছে। যেমন ঃ

গোরি গোমঠ পূরলি মহী।
পদরুহ দেবাক ধাম নহী—

মিথিলার হিন্দুরাজার প্রসাদপুষ্ট বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এ নয়—কল্পচিত্র মাত্র।

৩ ক. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪; বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আর্যভাষা দশম শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপলাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ ছিল না বলে তা সাহিত্যে সদ্য সদ্য গৃহীত হয় নাই। তবু কথ্যভাষার পদ ও বাক্রীতি সমসাময়িক অবহট্ট রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং কালানুক্রম ও বিষয় ধরিয়া নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্ট সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাস উপেক্ষিত হয়। বা. সা. ইং ১/৩ পূর্বার্ধ সুকুমার সেন পৃ. ৪৬। "চর্যাগীতগুলি" প্রাচীন বাংলায় লেখা হলেও এতে অবহট্টের ছাপ ও ছাঁদ থাকায় ... কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বললেও অন্যায় হয় না, পৃ. ৬০। খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/২, পৃ. ৬৭-৭৭; গ. চর্যাগীতি পদাবলী; পৃ. ৩৯; ঘ. ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৯৫ (৪র্থ সং); ঙ. উড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন, পৃ. ৮; চ. বিজয়চন্দ্র মজুমদার—The History of the Bengali Language.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি বাঙলায় নয়, বাঙলা তখনো শালীন ও লেখ্য সাহিত্যের ভাষা নয়, আঞ্চলিক বুলি মাত্র। কাজেই উড়িষ্যা, মিথিলা কিংবা আসামের লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, চর্যাপদ অর্বাচীন প্রাচ্য (গৌড়ী?) অবহট্টে রচিত। সে সময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা ও আসামী অবহট্ট মোটামুটি অভিন্ন ছিল। নাথ সহজিয়া পন্থের অন্যতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ। কাজেই মানিকচাঁদ-ময়নামতী-গোপীচাঁদের দেশে (আধুনিক কুমিল্লাদি জেলায়) বহুল চর্চার ফলে [নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশাদি পূর্ববাঙলার লোকেরাই নিয়ে যান] চর্যাগীতিতে বঙ্গ-গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে।[৪] এতেই বাঙলার দাবী জোরালো হয়েছে। মুনিদত্তের টীকাযুক্ত চর্যাগীতি নেপালে নেওয়ারী হরফে লিখিত পুথিতেই পাওয়া গেছে। বিদেশে বিভাষীর পক্ষে ভিন্ন ভাষার অলিখিত শাস্ত্রচর্চা সম্ভব নয়। কাজেই চর্যাগীতি নেপালে স্বাভাবিকভাবেই লিখিত ও টীকা সম্বলিত হয়েছে। কিন্তু আসাম-বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও তার লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। নাথ সহজিয়া-শম্ভু যোগ-তান্ত্রিক বজ্রযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা। কাজেই উপসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি ছিল না এবং তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপন করেনি। অতএব সেকালের বাঙালি-বিহারী-আসামী-উড়িয়া সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবী বা যোগ্যতা এদের ছিল না। সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। কারণ শাস্ত্রচর্চার ও শাসন পরিচালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহট্টেরও লেখ্যরূপ মিলে না। গৌড়ী-মাগধী অবহট্টেই যদি লেখার রেওয়াজ না থাকে, তা হলে তখনো নিতান্ত অবজ্ঞেয় আঞ্চলিক মুখের বুলি আসামী-বাঙলা-উড়িয়া-বিহারীতেই বা লেখ্য রচনার সম্ভাব্যতা কোথায়? কাজেই এদেশে চর্যাগীতির কোনো লেখ্যরূপ ছিল না এবং এগুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকসাহিত্য বা লৌকায়ত শাস্ত্ররূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা। অতএব, আমাদের অনুমান এই যে চর্যাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়— অর্বাচীন গৌড়ী-মাগধী অবহট্ট এবং মৌখিক রচনা। ডক্টর সুকুমার সেনও বলেছেন—"অসমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি (বাঙলা ও অসমীয়া) দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না[৪] " এবং "উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে মূল ধারা হইতে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[৪-৫] কাজেই ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা, উড়িয়া, মৈথিল অসমীয়ার উদ্ভব। ডক্টর সুকুমার সেন এর নাম দিয়েছেন, প্রত্ন-বাঙ্গালা-অসমীয়া-উড়িয়া।[৬] এই সাধারণ স্তর আমাদের ধারণায় অর্বাচীন অবহট্ট বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ স্ফুটনকালীন অবহট্ট। অতএব চর্যাগীতি কেবল বাঙলার নয়, উক্ত অপর ভাষাগুলোও সাধারণ ঐতিহ্য এবং এর ভাষা আলোচ্য সবকয়টি ভাষার জননী।

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃতই ছিল পাক-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাব-বিনিময়ের বাহন। তাই কোনো আর্য-ভারতিক আঞ্চলিক বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায়নি। বৌদ্ধ ও জৈন মত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্র শাসনের কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে পরে কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী,

৪ চর্যাগীতি পদাবলীর–পৃ. ৩৯।

৪-৫. ডঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও এ মত পোষণ করেন।

৫ ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ ৪র্থ সং ঃ পৃ.–৯৫।

৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পূর্বার্ধ : পৃ .১ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাঠি ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্ট সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়।

এরপরে মুসলমান আমলে ফারসি হল দরকারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাববিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতিক আর্য ভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজ্জব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্ট বৌদ্ধ ব্রজযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র ও শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়— যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্ট থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুইস্তরের অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শনস্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল বৈষ্ণবমত ও দেব পাঁচালী। পরবর্তীকালে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের, হিন্দুসমাজে সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগসুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেনি; কারণ পরপর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোনো দিন জাতীয় ভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

শিক্ষার, সাহিত্যের ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোকের ভাষা। সেকালে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বুলিতেই। এভাবে তারা গান, গাথা, ছড়া, বচন ও রূপকথা-রসবার্তা তৈরি করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। বহু মুখের স্পর্শে ওগুলো রূপ ও রস বদলায়, ফলে ও-গুলোকে ব্যক্তিক রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাই আজকাল এ সাহিত্যকে গণরচনা বলে নির্দেশ করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় এগুলোই লোক-সাহিত্য বা পল্লী-সাহিত্য। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লী-সাহিত্য সাহিত্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস-প্রসূত নয়। তবু মানবমনের কোমল অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ বলেই এগুলো সুন্দর এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পুষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃত রচনা লোক-সাহিত্যের মাধ্যমেই। বাঙলা লোক-সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে—ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, যোগীপাল-ভোগীপাল, মহীপাল গীত (অপ্রাপ্য), ময়নামতী-গোপীচাঁদ-মানিকচাঁদ গীত, মীননাথ-গোর্খনাথ-হাড়িপা কাহিনী; শিবের-ছড়া, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালী, ভারত কথা প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাহিনীগুলো রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গল কাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধ কাহিনী ময়নামতী-গোপীচাঁদকথা গাথা রূপেই রয়ে গেছে এবং পাল গীতি লোপ পেয়েছে।

অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন বা রাজ্য শাসনের মাধ্যম কিংবা প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে বলে রাখা ভাল, মুসলমান সুলতান-সুবেদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পোষকতা করেন। লেখ্য ভাষা বইপত্র ছাড়া লেখা যায় না, কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেমনটি হয়ে ছিল। আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রুত গড়ে উঠে এবং ভাষা পুষ্টি লাভ করে অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব আলোচ্য দু'শ বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না মেলার আমাদের অনুমিত কারণ এই :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্য শাসনের বাহন হয়নি বলে বাঙলা তুর্কী বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায়নি।

খ. ফলে, তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা ভাষা উচ্চবিত্তের লোকের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে উঠেনি। এ সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গান, গাথা ও ছড়া-পাঁচালীই চলত।[৭]

গ. সংস্কৃতেতর কোনো ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয়নি। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই প্রাকৃতজনেরা গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত প্রাকৃত বা শৌরসনী অবহট্টই ছিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ভাষায় রচন, পঠন ও শ্রবণ নিষিদ্ধ ছিল। সংস্কৃতের মাধ্যমে বৌদ্ধ শাস্ত্রেরও চর্চা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা ও সম্ভাব্যতা কোনো উচ্চশিক্ষিত লোকের মনে জাগে নি। পাল ও সেন আমলে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে এবং মুসলমান বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেককাল গড়ে উঠেনি। কিন্তু এতে ভাষা বিকশিত হয়েছে; তার প্রমাণ মেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (তথা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে)। এ গ্রন্থেই দেখা যায়, ইতিমধ্যে এক ডজন ফারসি-তুর্কী শব্দ বাঙলা সাহিত্যের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে।

ঘ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু শাসিত মিথিলায়। তাই এ সময় বাঙলা দেশে সংস্কৃতচর্চা বিশেষ হয়নি, কেবল কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল। মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চার তথা শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে।

ঙ. তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে আলোচ্য যুগে বাঙলায় কিছু কিছু পুথিপত্র রচিত হয়েছিল, তা হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপি করণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। যত্ন করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পায়। আগুন পানি-উই-কীট তো রয়েইছে। কিন্তু এ যুগে যে ভাষায় কিছু লিখবার রীতি ছিল না, তার বড় প্রমাণ পনেরো শতকের শেষাবধি নানা মঙ্গল গীতি, রামায়ণ গান, ভারত পাঁচালী এবং বিশ শতকেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়নামতী গানের লিখিতরূপ পাওয়া যায়নি। অথচ এগুলো সুপ্রাচীন।

চ. আবার লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), শেখ শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

---

৭ ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, দু-চারিটি ছড়া এবং এক আধটি গান ছাড়া এমন কিছু কালের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বড়গোছের কোন রচনা এ সময়ে লেখা হইয়া থাকিলে তাহার স্মৃতিরেশও বোধ করি থাকিয়া যাইত। তবে পরবর্তী কালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি বিচার করিয়া বলিতে পারি যে, এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটবড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেবমন্দিরে। অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকায়তিক (Secular) ; এমন ছড়া ও গানও এই সময়ে চলিত ছিল,—এই অনুমান করিবার কারণ আছে।" [—বা. সাই. ইং পৃ. ১/৩ পূর্বার্ধ। পৃ. ৭৭-৭৮।]

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও সাহিত্যের একটি মাত্র আদর্শ ছিল। সে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যের আদর্শ [ঐ পৃ. ৮০।] খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ অবধি যাঁহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রসংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী হোন, তখন যাঁহারা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি—রাজসভাসদ অথবা সমাজপতি। [ঐ পৃ. ৭৬।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তা হলে তেরো-চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোনো লিখিত রচনা না-থাকারই কথা। চর্যাগীতি ছাড়াও বারো শতকের বাঙলা-ঘেঁষা রচনার নমুনা মেলে 'শেখ শুভোদয়া'র আর্যায় ও প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোনো কোনো পদে। বাঙলা তখন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, লক্ষ্মণ সেনের সভায় আমরা বাঙলা-কবিও দেখতে পেতাম এবং পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়ের মতো হিন্দুশাসিত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদর্শন পাওয়া যেত।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না এবং মুসলিম বিজয়ে তাদের রচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটেনি। কেবল তাই নয়, বাঙলা লেখ্য ভাষা হলে গৌড়-সুলতানের দরবারে রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে গোড়া থেকেই অন্তত বাঙলা ফরমান লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায়নি, লৌকিক দেবতার পূজাপ্রচার প্রয়াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দুর রচনায়।

পরাধীনতার গ্লানি হিন্দু-মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে চারশ বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয়নি বাঙলা দরবারী কিংবা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি বলেই।

অতএব, আমাদের অনুমান এই যে বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এটি হচ্ছে বাঙলার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস

মুসলমানেরাই যে এদেশে মানবিক-রসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন, এ তথ্য এখন আর কারুর কাছেই নতুন নয়। এটি হচ্ছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশের হিন্দু-মুসলমানের পরিচয় একই সূত্রে ও একই সময়ে ঘটলেও প্রভাবের তারতম্য ঘটেছে বিস্তর। অপেক্ষাকৃত সংস্কারভারমুক্ত একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি স্বীকরণে সহায়তা করেছে প্রচুর, কিন্তু সংস্কার-পঙ্গু হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই মুসলমানেরা যখন আধুনিক সংজ্ঞার 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' সৃষ্টি করছিল, তখনও হিন্দুরা দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। চর্যাকার থেকে কবিওয়ালা অবধি হিন্দুর হাতে দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মীয় প্রচার সাহিত্যই পেয়েছি। ধর্মভাগ জাগানো এর লক্ষ্য—সাহিত্য-শিল্প এর আনুষঙ্গিক রূপ এবং সাহিত্য রস এর আকস্মিক ফল। অপরদিকে মুসলমানদের হাতে বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হতে থাকে।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক রস বা মানবতা। একালে 'মানবতা' বলতে যা বোঝায়, এ কিন্তু তা নয়। এ মানবতা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা'ই নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিস্ময়-চঞ্চল কল্পচারী মানুষের প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানস-সৃষ্ট দেব-দানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতূহল চোখে-দেখা মানবমুখী হয়ে উঠে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল মানুষকেও জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ন ও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোনো সীমারেখা স্বীকৃত নয় এ লোকে। নদী-নগরী, গিরি-মরু-কান্তার, আকাশ-মাটি-সাগর ও স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের পরিসরে দেব-দানব রক্ষা-যক্ষের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে প্রকটিত।

সংস্কৃতেতর পাক-ভারতিক ভাষায় প্রথম বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শালীন রচনা হচ্ছে আবদুর রহমানের 'সংনেহয়-রাসয়' বা 'সন্দেশ রাসক'। এটি হচ্ছে একটি দূতকাব্য এবং বারো শতকে অপভ্রংশে বা অবহট্টে রচিত। মূলতানবাসী কবি আবদুর রহমান তাঁতি মীর হোসেনের সন্তান।[১] অতএব দেশজ মুসলমান।

অপভ্রষ্টে বা অবহট্টে রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'পহুরিরায় রাসউ' বা 'পৃথ্বীরাজ রাসক'। এর রচয়িতা চন্দ বলিদ্দ বা চন্দ বরদাই। জনপ্রিয়তার ফলে ভাষ্য ক্রমে আধা-হিন্দিতে রূপান্তরিত হওয়ায়, এটি কালে আদি হিন্দি কাব্যরূপে প্রখ্যাত হয়।[২] এ দুটোই 'দিওয়ান' জাতের কাব্য। আনন্দ ধর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মিশ্রিত কাব্য 'মাধবানল-কামকন্দলা'ও এখানে উল্লেখ্য।

---

১ (ক) বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : পৃ.১

(খ) ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃ. ২।

২ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃ. ২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে দাক্ষিণাত্যে তেলেগু ভাষাতে দণ্ডলির সংস্কৃত 'দশা কুমার চরিত'-এর তেরো শতকে কৃত একটি পদ্যানুবাদ পাওয়া গেছে।[৩] পাঞ্জাবি লৌকিক ভাষায় রচিত গানের আদি নিদর্শন মিলেছে শিখ গুরু অর্জুনের আদিগ্রন্থে। এ অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করেছেন নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মুর্শিদ, সাধক কবি শেখ ফরীদুদ্দীন শক্করগঞ্জ (মৃ. ১২৬৭ খ্রী.)।[৪] হিন্দি ভাষায় প্রথম কবি লোদী-দরবারের আমীর খসরু (১২৫৪-১৩২৫ খ্রী.)। ইনি হিন্দিতে কবিতা, গান ও প্রহেলিকা রচনা করছেন।

কবি দামোর 'লক্ষ্মণ সেন পদ্মাবতী কথা' রচনার কাল নিয়ে মতভেদ আছে। রচনা শুরুর কাল কারুর মতে ১৫২৬ সংবৎ তথা ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ, আবার কেউ কেউ মনে করেছেন ১৫৭০ সংবৎ বা ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দ।[৫] এটি উপাখ্যান। শাহ্ ফিরোজ তুগলকের আমলে মালিক নাসিরের আদেশে লোকগাথা ভিত্তি করে হিন্দি-মস্নবী 'চান্দাইন' রচনা করেন কবি মোল্লা দাউদ। রচনা সন ৭৮১ হিজরি বা ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ।

এটি সুফী কবির তত্ত্বরসাত্মক মরমী গাথা।[৬] কিন্তু মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' ও হয়তো দাউদের মসনবীর পরেরকার রচনা নয়। এ অনুমানের সমর্থন মিলেছে ৯১১ হিজরি বা ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের লেখা মানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তিতে।[৭]

অনুলিপিই যখন ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের, তখন মূল রচনার তারিখ নি:সংশয় অনুমানে বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়। পনেরো শতকের প্রথমার্ধের সিন্ধি মরমী কবি সাধন 'মৈনাসৎ'-এর কবি মিয়া সাধন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করবার কারণ নেই। সাধন পূর্ব-উত্তর ভারতের কবি, এবং ভাষা ঠেঠ-হিন্দি (ভোজপুরী-অবধী?)। সাধন ভগৎ যদি এ কাব্যের রচিয়তা হতেন, তাহলে সিন্ধি কবির হিন্দি বিশুদ্ধতর হত। অবশ্য 'মৈনাসৎ' ও অধ্যাত্মরূপক কাব্য। লোর চান্দাইনের অপর কবি সয়ফুলমূলক বদিওজ্জামান (১৬২৬ খ্রী.) ও তুতিনামা (১৬৪০) রচয়িতা গাওয়াসি, ইনি গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুব শাহর দরবারে ছিলেন।

লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যানের পরে রচিত হয় অধ্যাত্মরূপকাশ্রিত আখ্যায়িকা 'মৃগাবতী'। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আশ্রিত জৌনপুরের শর্কী সুলতান হোসেন শাহর সভা-কবি কুতবন ৯০৯ হিজরি বা ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এটি রচনা করেন :

নউ সউ নব জব সংবত অহী।
[জব] মোহর্‌রম চান্দ উজিয়ারী
য়হ কবি কহী পূরী সংয়ারী
গাহা দোহা অবেল অরজ
সোরঠা চৌপছ কই সরজ
সান্তর অখির বহুতই আয়ে
অউ দেসী চুনি চুনি কহ্‌লায়ে।

[সুকুমার সেনের পাঠ : ইসলামি বাঙলা সাহিত্য]

অতএব, এটিও লোককাহিনী ভিত্তিক। আঠারো-বিশ শতকের কোনো কোনো বাঙলা উপাখ্যানে মৃগাবতীর অনুসরণ আছে। আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ মুকিম মৃগাবতী বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু এ কাব্য আজও পাওয়া যায়নি।

---

৩ (ক) বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান :গুলে বকাওলী পৃ. ১।
(খ) History and Culture of the Indian people : Vol V. P. 377.

৫ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : পৃ: ৪।

৬ বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দি অবধি পটভূমি : মমতাজুর রহমান তরফদার : বাংলা একাডেমী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা : পৃ: ৭-১৫

৭ বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দু অবধি পটভূমি : পৃ. ১৪-১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পরে লোকসাহিত্যের জনপ্রিয় পুরোনো উপাখ্যান নিয়ে রূপকাশ্রিত 'মাধবানল-কামকন্দলা' কাব্য রচনা করেন গণপতি (১৫২৭ খ্রী.)। কুতবন প্রভাবিত জায়সীর 'পদ্মাবৎ' রচিত হয় ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে। 'পদ্মাবৎ' রূপকাশ্রিত হলেও অতি উৎকৃষ্ট কাব্য।

অতএব, সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশেতর পাক-ভারতিক আর্য ভাষায় পনেরো শতকের আগে রচিত ধর্মনিরপেক্ষ উপাখ্যান একটিও নেই। পনেরো শতকের শেষার্ধের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় মাত্র একটি। সেটি মোল্লা দাউদের মরমী গাথা চান্দাইন (১৪৮০ খ্রী.); এবং এ-সময়কার বলে অনুমান করা যায় আরও দুটো : দামোর 'লক্ষণ সেন পদ্মাবতী কথা' (১৫৪৯ খ্রী.?) এবং মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' (১৫৭০-৮০ খ্রী.?) আর সাধারণভাবে তেরো শতকের আগেকার রচনার কোনো নিদর্শনই বাঙলা ছাড়া অপর কোনো আধুনিক পাক-ভারতিক আর্য ভাষায় মেলেনি। সে দিক দিয়ে দেখলে চর্যাগীতি যেমন আধুনিক পাক-ভারতিক আর্য ভাষার আদি নমুনা, তেমনি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী.) ইউসুফ জোলায়খাই আদি প্রণয়োপাখ্যান। কেননা, কবি দাউদের 'চান্দাইন' অধ্যাত্মতত্ত্বরসাশ্রিত মসনবী কাব্য আর দামো ও সাধনের কাব্যের রচনাকাল অনিশ্চিত। নতুন কোনো তথ্য-প্রমাণ না-মেলা অবধি আমাদের এ মতই পোষণ করতে হবে। চর্যাগীত যেমন পাক-ভারতিক ভাষা-জগতে নবযুগের স্মারক স্তম্ভ, তেমনি 'ইউসুফ জোলায়খা'ও রোমান্টিক সাহিত্যের গৌরব-মিনার।

ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালিরা ইরানী ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এবং ঐ দু'টোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যও মূলত অনুবাদ সাহিত্য। ফারসি-হিন্দি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে রোমান্টিক সাহিত্য এবং আরবি-ফারসি থেকে অনূদিত হয়েছে ধর্ম ও যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ। অনুবাদ বলতে আধুনিক সংজ্ঞায় যা বোঝায়, সবক্ষেত্রে ঠিক তা ছিল না। অনুবাদ ছিল তিন প্রকারের : কায়িক, ছায়িক ও ভাবিক অর্থাৎ আক্ষরিক, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবাবলম্বন।

ফারসি প্রণয়োপাখ্যানগুলো (কোনো কোনো হিন্দ আখ্যায়িকাও) প্রধানত সূফীতত্ত্বের রূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জমা হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানরূপেই। তত্ত্বকথাকে এভাবে রস-কথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে জীবনবাদী বাঙালি মানসের স্বরূপ ধরা পড়েছে। চর্যা-বাউল-বৈষ্ণব-মুর্শিদী প্রভৃতি অধ্যাত্মগীতির উদ্ভবক্ষেত্র বাঙলায় এ মানবিক-রসপ্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ অর্থপূর্ণ।

সে-যুগের হিসেবে বাঙলা রোমান্টিক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র নয়। চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ অবধি তার ইতি ঘটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ, আর ভাবে ও ভঙ্গিতেও বৈশিষ্ট্যহীন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ওসব রচনার আর কোনো সাহিত্যিক মূল্যই নেই এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো শতক অবধি রচিত ও জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি।

চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে কিংবা পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলায়খা'। ষোল শতকে পাচ্ছি দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহ বারিদ খানের 'বিদ্যা সুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যান হচ্ছে : দোনা গাজীর 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামান', কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী', আলাউলের 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান', 'সপ্তপয়কর', 'রতন-কলিকা-আনন্দ-বর্মা', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুল মুলুক', 'ইউসুফ-জোলেখা', নওয়াজিশ খানের 'গুলে বকাউলী', পরাওলের 'শাহপরীর কেচ্ছা', মঙ্গল চাঁদের 'শাহ্ জালাল-মধুমালা। (এতে মঙ্গল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যের মর্মগত অনুকৃতি আছে), সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবল মুলুক-সামারোখ', শরীফ শাহ্‌র 'লালমতী সয়ফুল মুলুক' আর আঠারো শতকে রচিত হয়েছে খলিলের চন্দ্রমুখী, মুহম্মদ মুকিমের গুলে-বকাউলী, কালাকাম, মৃগাবতী, মুহম্মদ আবদুল করিম খোন্দকারের 'তামিম আনসারী', রফিউদ্দিনের 'জেবলমূলুক সামারোখ', শাকের মাহমুদের 'মধুমালা-মনোহর', নুর মুহম্মদের 'মধুমালা', রামজয়ের 'শশিচন্দ্রের পুঁথি', দ্বিজপশুপতির 'চন্দ্রাবলী', গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ-জোলেখা', 'সোনাভান', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রাজার 'তমিমগোলাল চৈতুন্ন সিলাল', 'মিশরী জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ্ পরী মল্লিকা জাদা', 'হাসান বানু', আবদুর রজ্জাকের 'সয়ফুল মুলুক লালবানু', শমশের আলীর 'রেজওয়ান শাহ', মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহ্‌রাম গোর' 'কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষ্ণব মতবাদ ও বাঙলা সাহিত্য

আর্যপূর্ব যুগে ভারতে দ্রাবিড়গণই বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিল। তারা সংখ্যায় যেমন অধিক ছিল, দণ্ডশক্তি এবং সংস্কৃতিতেও তেমনি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই মনে করা যেতে পারে আর্যপূর্ব যুগে ভারতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরাজ করত তা বাহ্যত এবং প্রধানত দ্রাবিড় সভ্যতা।

দ্রাবিড়গণ সেমিটিক গোত্রীয় হলেও, ভারতের আবহাওয়ায় তাদের মন ও মননের পরিবর্তন হয়েছিল। কায়ার চেয়ে ছায়ার মায়ায় ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল তারা। জীবনবাদের চেয়ে জীবন্মুক্তিই সাধ্য-সাধনার মুখ্য লক্ষ্য হয়ে উঠল। ভোগবাদ যেখানে বৈরাগ্যের নিকট পরাজিত হয়, সেখানে অলস-নিষ্ক্রিয়তা তথা ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কী আশা করা যায়! বাহ্যজগতের প্রতি বিরাগ ও মনোজগতের প্রতি অনুরাগই তাই তাদের বড় দার্শনিক করে তুলল বটে, কিন্তু নির্বোধ বিষয়ী করে রাখল। দৃশ্যজগৎকে তুচ্ছ করে, অদৃশ্যজগৎকে উচ্চ করে তার সাধনায় যখন দ্রাবিড়গণ বিভোর, তখন ভারতে এল আত্মপ্রত্যয়শীল, সংগ্রামী, জীবনবাদী যাযাবর আর্য। বাধা দেবার মতো দণ্ডশক্তি দ্রাবিড়দের ছিল না। উৎপীড়ন যখন অসহ্য হয়, তখন নিতান্ত নিরীহ এবং দুর্বলও মরণ-কামড় দিতে চেষ্টা করে। দ্রাবিড়গণ সেরূপ বাধা দিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা দাক্ষিণাত্যে ও পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে বাঁচল। অভিজাত অনার্যেরা আর্যসমাজে মিশে গেল। তবু বহু অনার্য আর্য-খপ্পরে পড়ে গেল এবং আর্যসমাজে তারা নিগ্রহ ভোগ করতে থাকল।

আর্যগণ দ্রাবিড়দের মাথার অধিকার পেল বটে, কিন্তু মনের কাছে হার মানল। দ্রাবিড়দের যুগান্তরের ভাবচিন্তা কি ব্যর্থ হবে? তাই এদের মানস-সংস্কৃতির কাছে বাহুবলে বলীয়ান আর্যগণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। যেমন পরবর্তীকালে রোমকগণ করেছিল গ্রীকদের কাছে, আরবগণ করেছিল ইরানীদের নিকট। বাহুবল বাক্যবলের কাছে হার মানল। মাংসপিণ্ড থেকে মন যে অনেক বড়, তা স্বীকৃতি পেল। ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞপ্রধান আর্যধর্মের উপর পড়ল দ্রাবিড় প্রভাব। আচারসর্বস্ব আর্যধর্মে প্রবিষ্ট হল ভাববাদ। জীবনবাদী,—জীবনধর্মী আর্যদের তৃতীয়নেত্র উন্মীলিত হল, মায়াবাদ প্রাণধর্মী আর্যমানসের সরস সতেজ ক্ষেত্রে বইয়ে দিল উদাস হাওয়া।

দিন যায়। দ্রাবিড় প্রভাবে আর্য ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি রূপান্তরিত ও পুষ্ট হতে থাকে। আর্য-দ্রাবিড়ে নতুন শক্তি গড়ে উঠে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধি-নিপুণ দণ্ডশক্তি মায়াবাদকে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। বর্ণাশ্রম নিপীড়নের যূপকাষ্ঠরূপে দেখা দিল। সদুদ্দেশ্য নিয়ে যা প্রতিষ্ঠিত, অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির তাই বাহন হয়ে দাঁড়াল।

অত্যাচার, উৎপীড়ন যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন ধীরে ধীরে সমাজমনে দেখা দিল অসন্তোষ। এই অসন্তোষই পুষ্ট হয়ে একসময় প্রবল বিদ্রোহ ও সর্বাত্মক বিপ্লবে পরিণত হল। এর সার্থকনাম নেতা হচ্ছেন বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ। এঁদের আগে তেইশজন তীর্থঙ্কর ও বহু বৌধিসত্ত্ব এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই মায়াবাদ এঁদেরও মূলধন। এই বিপ্লবের বন্যায় যুগসঞ্চিত কলুষ-জীর্ণ প্রাচীন যত সব-কিছুই ভেসে গেল—বেদ গেল, ব্রাহ্মণ গেল, দেবভাষাও মর্যাদাচ্যুত হল, বর্ণাশ্রম গেল। স্বর্গ-নরক-দেবতা কারুর অস্তিত্ব স্বীকৃতি পেল না। সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা, জীবে-দয়া, জাতিভেদের অসারতা প্রভৃতি প্রচারিত হল। সর্ব বন্ধনকে দলিত করে বিঘোষিত হল মনুষ্যত্বের জয়। আর্য-অনার্যের বিভেদ ঘুচে গেল। গণতন্ত্র হল না সত্য, কিন্তু গণমানস স্বীকৃতি পেল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম জনসাধারণের আচরণসাধ্য ছিল না, শাস্ত্রে ছিল না অধিকার, নিজের মনের কথা [illegible] দেবতার কাছে নিবেদন করবার উপায় ছিল না। পুরোহিতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে দেবতার সঙ্গে যে কৃত্রিম সম্পর্ক ছিল, তাতে সংস্কারের দৃঢ় বন্ধন ছিল না। তাই বুদ্ধ ও মহাবীরের ডাকে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সহজেই।

ধর্মদর্শন হিসেবে 'মায়াবাদ'ই ছিল বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের পুঁজি। মায়াবাদ যতই শ্রোত্ররসায়ন হোক না কেন, (একে অবসর সময়ে ভাবপ্রবণ দুর্বলচিত্তে প্রশ্রয় দিতে বেশ লাগে সত্য) কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কারণ, জৈবসাধনা হচ্ছে ধন-জন-মানের সাধনা। এটা প্রাকৃতিক বা প্রাবৃত্তিক। সুতরাং প্রারম্ভিক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা যখন চলে গেল, তখন বোঝা গেল জৈবধর্মের প্রতিকূল এ বৈরাগ্যবাদ— এ জীবন-মুক্তির সাধনা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণ-সাধ্য নয়। তাই বৌদ্ধ-জৈন ধর্মে বিকৃতি ও সমাজ-জীবনে বিকার অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিল। শঙ্কর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এ বিকৃতি ও শৈথিল্যের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরও এ ব্যাপারে প্রধান পুঁজি 'মায়াবাদ'। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল বলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই প্রথম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদকে স্বীকৃতি দিল অর্থাৎ 'মায়াবাদকে' ভাঁওতা হিসেবে নয়, জীবনে সাধ্য ধর্ম-দর্শনরূপেই গ্রহণ করল তারা। এর ফলে জীবনে চতুরাশ্রম গ্রহণ একরূপ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। এইরূপে হয়তো এই প্রথম দ্রাবিড়-আর্যের ধর্মসমন্বয় পূর্ণতা পেল। এমনি করে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের সমান আদর ও কদর প্রতিষ্ঠিত হল। আর্যের ব্রহ্মবাদ, দ্রাবিড়ের মায়াবাদ এবং উভয়ের সমন্বয় ও সংমিশ্রণজাত ভক্তিবাদ 'সচ্চিদানন্দ' শক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রসার লাভ করল। এতেও মূলত দ্রাবিড় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেল। ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিবর্তন ও রূপান্তরের ধারা ছিল এরূপই।

মুসলমানদের কোরআনের মধ্যেই সূফীতত্ত্ব নিহিত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। ভাবপ্রবণ হৃদয়বান ইরাকীদেরকে প্রথমে তা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মূলত কোরআন থেকেই সূফীমতের সমর্থন পাওয়া গেলেও এর পুষ্টি ও প্রসার ঘটে ভারতীয় বেদান্তের পরোক্ষ এবং নিউপ্ল্যাটনিক দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। দেখতে দেখতে ইরাকে-ইরানে মরমীয়াদের সংখ্যা আশাতীতরূপে বেড়ে গেল। হাফেজ, রুমী, জামী, নিযামী, ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবির সৃষ্টির মাধ্যমে তা ইরানের সীমা অতিক্রম করে গোটা মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, সূফীদের আল্লাহ আর 'সচ্চিদানন্দে' দৃশ্যত পার্থক্য কিছুই নেই।

মুসলমান অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন তাঁরা সবাই সূফী দরবেশ ছিলেন। এই মরমীদের অনেকেরই সঙ্গে শরীয়তের বাহ্যানুষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ ধর্ম আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্মাচরণ দু:সাধ্য। সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক সাধনা বাহ্যানুষ্ঠান ও আচরণের মাধ্যমেই চলে। ফলত, পীর-দরবেশ-আউলিয়া প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারতের প্রথম যুগের মুসলমানগণ মুসলিম সংস্কৃতি পুরোপরি গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীর-পূজা প্রচলিত হয় এইভাবে। এতে কোনো হিন্দুপ্রভাব নেই। তবে এই পীরবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুর গুরুবাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

সূফীদের মূলবক্তব্য হচ্ছে : সৃষ্টিটা স্রষ্টার আনন্দজাত। আনন্দিত স্রষ্টা বললেন: 'কুন্‌ফায়াকুন্‌' (Be it so, and it is so) অর্থাৎ সৃষ্টিটা কারো অনুরোধে বা গরজে হয়নি। স্রষ্টা তাঁর খেয়াল-খুশির খাতিরে আনন্দ-সহচর হিসাবেই তা করেছেন। এ তাঁর লীলা। অসমানে প্রণয় হয় না। নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন ও অকৃত্রিম আনন্দ পেতে হলে বন্ধুর সাহচর্যই কাম্য। কারণ, হৃদয়ের অসংকোচ প্রকাশ একমাত্র প্রণয়ের সম্পর্কেই সম্ভব। সুতরাং স্রষ্টা যেখানে আত্মোপভোগের জন্যেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সৃষ্টি-সেরা মানুষের সঙ্গে তাঁর বান্দা-মনিব-সম্পর্ক হতে পারে না। তাহলে যে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না—স্রষ্টার উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়! যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক,—কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলের বাধা সেখানে অবাঞ্ছিত নয় শুধু, অসম্ভবও। কাজেই আল্লাহর সঙ্গে যেখানে মানুষের প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে বান্দা-মনিবের, পিতা-পুত্রের বা ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কল্পনা করাও বাতুলতা। কাজেই নামাজ, রোজা বা ইত্যাকার আনুগত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নই অবান্তর। ফলে শরীয়ৎ সেখানে নিরর্থক। অনুরাগে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহ বোধে উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে—প্রেমিক প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে, পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র। কিন্তু বিন্দুর একক শক্তি কতটুকু! তাই তার অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই সমুদ্রের জন্যে তার আকুলতা। নইলে যে তার অপমৃত্যু সুনিশ্চিত! বিন্দুস্বরূপ জীবাত্মার তাই পরমাত্মার জন্যে এত আকুলতা। গরজ জীবাত্মার, তাই সে প্রেমিক—তাই সে রাধা। পরমাত্মারও গরজ আছে—যেমন সমুদ্রও বারিবিন্দুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনো বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার বিশেষ আকুলতা নেই। এজন্যেই জীবাত্মা সদা উদ্বিগ্ন—পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে—'এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে ; না-জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, যখন বলা চলে আনলহক বা সোহম। এই অবস্থাটা সূফীর ভাষায় ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহ, বৈষ্ণবের কথায় যুগল রূপ বা অভেদ রূপ। (তু. চৈতন্যদেব 'মুই সেই, মুই সেই')—এ দুটো কথায় সূক্ষ্ম-দার্শনিক অর্থে মারপ্যাঁচ আছে। তবে অবস্থা ও অভিপ্রায়টা মূলত একই।

'কুন্‌ফায়াকুন্‌' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, 'একোহম বহুস্যাম' অদ্বৈতবাদনির্দেশক। সূফীরা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় গড়া, তাদের সাধনা চলে দ্বৈতবোধে, পরিণামে অদ্বৈত সত্তার প্রয়াসে। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের প্রেমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। কেননা, রুমীর কথায়—

দানা চুঁ অন্দর জমিন পেনহাঁ শওয়াদ।
বাদ আঁজা সারে সবজি বস্তা শওয়াদ।।

জীবাত্মা তখন বংশীর ন্যায়—'বশোনা আজনায়ে চুঁ হেকায়েত মি কুনদ.....এজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

তাই সূফী গজলে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলন-পিপাসু বিরহী-আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাই। সূফী-গজল ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য মানবাত্মার চিরন্তন Tragedy-র সুর ও বাণী বহন করছে। না-পাওয়ার বেদনা আর পেয়ে হারানোর শঙ্কা—কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টা কম! তাই চিরকাল 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া' যেমন কাঁদে এবং 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলেও হিয়া, জুড়ায় না, তেমনি 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' এর শেষ নেই—সমাধান নেই। এ সাধনাও বড় কঠিন সাধনা। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়—এ তিন থাকতে কিছু হয় না। ধন-জন-মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে, তবে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঘুচে যায়। এজন্যেই এতে সবার অধিকার নেই। সূফী বৈষ্ণবেরা তাই পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের উপহাস করেন। হাফেজ বলেন :

ঢালো সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা শরম আছে কি তায়।
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো ধরম যাহারা চায়

চণ্ডীদাস বলেন,

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছএ যারা,
কাজ নাই সখি, তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।

মুসলমানদের ভারত অধিকার ভারতবর্ষের সামাজিক ও কৃষ্টির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে শক-হুনদল এসেছিল; ভারতবাসীরা অনায়াসে তাদের গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু বহিরাগত তুর্কী মুসলিমকে এদেশীয় সমাজ আত্মস্থ করতে পারে নি। তার কারণ, মুসলমানেরা শুধু বিশেষ আকৃতি, প্রকৃতি ও বাহুবল সম্বল করে আসে নি, এনেছিল যুক্তি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ভর এবং প্রত্যয়-দৃঢ় ধর্ম, সমাজ, আচার আর রাষ্ট্রাদর্শ যার সামাজিক ও পারমার্থিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। এত অসাধারণ যে, তা আজকের দিনের বলশেভিকবাদের চেয়েও সর্বগ্রাসী এবং আণবিক বোমার চেয়েও বিস্ময়কর। ফলে, মুসলমানদের একদেহে লীন করা কোনো মতেই সম্ভব হয় নি। কিন্তু আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মও পর্যুদস্ত হবার নয়। এর অন্তর্নিহিত শক্তিও এই নবশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্য ছিল। ফলত, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম না হল ইসলামে বিলীন, না পারল মুসলমানদের বিলীন করতে। বিজেতা ও বিজিতের তথা শাসক ও শাসিতদের মধ্যেকার এ স্নায়বিক দ্বন্দ্ব বড় তীব্র হয়ে দেখা দিল। কেউ কাকেও না পারে গ্রহণ করতে, না পারে গ্রহণ করাতে। অবস্থাটা যেন 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান।' উভয় পক্ষই বুঝল এ অবস্থা অসহ্য, এর আশু সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু এসব অভিজাত হিন্দুর কথা।

এদিকে বর্ণাশ্রম কণ্টকিত অনুদার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে নিপীড়িত শূদ্রগণ ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের চুম্বকার্ষণে এতই বিচলিত হয়েছিল যে, স্বধর্মে সুস্থির থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগ্রহ প্রবল হলেও মন যা চায় তা পাওয়া অধিকাংশের পক্ষেই সহজ ছিল না। নবধর্ম গ্রহণে বাধা ছিল ত্রিবিধ : প্রথমত, প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও ভয় : দ্বিতীয়, হিন্দু-সমাজপতির কোপ-দৃষ্টি, তৃতীয়, ইসলাম সম্বন্ধে অনিশ্চিত জ্ঞান। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার-বঞ্চিত নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইসলামের উদার সমাজ-ব্যবস্থা ও সাম্য দর্শনেই প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং আজন্ম পোষিত মায়াবাদের সঙ্গে বহুশ্রুত সূফীতত্ত্বের অপূর্ব সামঞ্জস্য দর্শনে কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিল। এভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের ঘরের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, পথে নামল, কিন্তু ইসলামের আশ্রয় নিতে পূর্বোক্ত কারণে ছিল প্রচুর শঙ্কা। দাদুর ভাষায়—হিন্দু তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাজ। অতএব নির্ভে নির্পথ হোই। তাই ঘরেও নয়, গন্তব্যেও নয়, পথ চলে পথের দিশা পাওয়ার প্রয়াস দেখা দিল। হিন্দুর মায়াবাদ ও মুসলমানদের সূফীতত্ত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল। সক্রেটিসের 'Knoweth thyself', উপনিষদের আত্মানাং বিদ্ধি, ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।' বা উপনিষদের তং বেদ্যং পুরুষৎ বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথা। এই হল নবধর্মের মূল দর্শন বা মন্ত্র। ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য যখন 'মনের মানুষ'কে পাওয়া, তাহলে হিন্দুয়ানী বা মুসলমানীর বেড়াজালে আটকে পড়ার দরকার কী? শঙ্করাচার্যের দর্শন তখনও আলোচিত তত্ত্ব এবং ফারসি-সাহিত্যের মারফত হাফেজ, জামী, রুমী, আত্তার, খৈয়ামের বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত সত্য। কাজেই এ আন্দোলনের ইন্ধন ছিল হাতের কাছেই।

এরূপে ভারতের দিকে দিকে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ভাস্কর, মাধব, রামানন্দ, নানক, কবীর, একলব্য, দাদু, চৈতন্য, রামদাস, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রমুখ বহু সাধক-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটল। শাস্ত্রাধিকার, সামাজিক সত্তা ও জীবনে নিরাপত্তাবোধের অবচেতন প্রেরণা থেকেই হয়তো এসব ধর্মান্দোলন শুরু হয়, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দণ্ডধর মুসলিম শক্তিকে বাধা দেবার বা বিতাড়িত করবার সচেতন প্রয়াস হিসেবে প্রকট হয়ে উঠে। শিখ ও বৈষ্ণবান্দোলনে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— তার বহু প্রমাণ রয়েছে। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে বাদশাহ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্তও সমন্বয়-সাধনা অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া চলে। এসব সংগীত সূফী কবির দিওয়ান, গজল ও রুবাইর অনুকরণে রচিত হয়েছে। চর্যাগীতিও দোঁহার আমল থেকেই গণভাষায় রচিত পদ ও দোঁহা ধর্মমত ও তত্ত্ব প্রচারের বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এদের উদ্দেশ্য ও সাধনা সার্থক হয়েছিল। ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল। এর গতি চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর প্রচার বা প্রসার লাভ করল না। এর আগে মদিনা থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি ইসলামে দীক্ষা অপ্রতিহত ছিল। শুধু তাই নয়, বহু মুসলমান তাঁদের মতে দীক্ষিতও হল— বিশেষত শিখ ও বৈষ্ণব ধর্মে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের আওতায়ও এরা রইল না। এগুলো হিন্দু-মুসলিম ধর্মদর্শনের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। কিন্তু প্রচারকগণ নামত হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধায় এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাধা, কৃষ্ণ, রাম, সীতা, দেবতা প্রভৃতি নামসার হিন্দুয়ানীর রেশ থাকাতে, এরা জাতি অর্থে হিন্দুই রয়ে গেল। তাতে উত্তরকালে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা হয়। সুতরাং এরা নামগত জাতিতে হিন্দু এবং ধর্মগত জাতিতে আলাহিদা। যেমন রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মে হিন্দুয়ানীর চেয়ে খ্রীস্টানী ও মুসলমানী কম নয়, তবু ব্রাহ্মবাদের ঐতিহ্যবোধে এবং 'রামমোহন' নামের মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত এরা জাতি হিসেবে হিন্দুই রয়ে গেল। বস্তুত, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম সচেতনভাবে খ্রীস্টধর্মের প্রসার রোধকল্পে প্রবর্তিত হয়েছিল ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

উক্ত সব সাধকের মধ্যে জোলা শ্রেণীর কবীর ও ধুনকর সম্প্রদায়ের দাদু ও রজ্জব মুসলমান ছিলেন। মুসলমান হয়েও তাঁরা ধর্মান্দোলন শুরু করেছিলেন— তার কারণ, এঁরা নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দু-সমাজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূফীদের হাতে। শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব, পূর্ব-সংস্কারগত মায়াবাদের প্রভাব এবং সূফীতত্ত্বের উদার আবহাওয়া এঁদেরকে ভাবরসে বা প্রেমসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও যে আত্মার স্বরূপ এক ও অবিকৃত, এই সমন্বয়পন্থিগণ তা-ই প্রচার করেছেন। এসব ধর্মান্দোলনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ প্রথা ও শাস্ত্রে অনধিকার রহিতকরণ এবং মনুষ্যসত্তার মর্যাদা দান। তা পুরোপুরি সফল হল। তাই ইসলাম আর প্রসার লাভ করেনি। ইসলামের প্রভাবই সমাজ সংস্কারে প্রয়োজনীয় ফল দান করল। যেমন, য়ুরোপে ইসলামের অনুকরণে Protestant মত প্রচারই নবযুগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসও এরূপ একজন সাধক ছিলেন। সূফীপ্রভাবে তিনিও প্রেমধর্ম প্রচার করেন এবং বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তিনিও বলে উঠেন: 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এর পরে মাধবেন্দ্রপুরী এবং তার পরে শ্রীচৈতন্য।

ভাগবতে ভক্তিবাদের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তা মুসলিম বিজয়ের পূর্বে প্রসার লাভ করে নি। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা নেই, বিদ্যাপতিতেও না। গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণধামালী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ), শিবশিবানীর ছড়া বা গাথা প্রভৃতি আদিরসাত্মক রচনা সমাজ-জীবনের বিকৃতির এবং রাজনৈতিক নির্বীর্যতার যুগে নৈতিকতা শিথিল গণমনের রস-পিপাসা মিটাবার জন্যে রচিত হয়েছিল। ইত্যাকার আদিরসাত্মক রচনা সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীর যথার্থই বলেছেন: "সমাজ জীবনে যখন মন্দা পড়েছে, বিলাসের আড়ম্বরে জাতির চরিত্রতেজ ও শৌর্য যখন ম্লান, তখনই বিদ্যাসুন্দরের এবং এ ধরনের কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। পাঠান রাজত্বের অবসানের যুগে শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর, মোগলশক্তির আসন্ন ভাঙনের দিনে কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর এবং নবাবী আমলের অবসানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আবির্ভাবে এ-কথার সাক্ষ্য মেলে। রাজশক্তির পতনের দিনে ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বর সমস্ত দেশেই দেখা দেয়, বাঙলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ; তাই অবনতিপ্রবণ সমাজের বিকৃত রুচির প্রতিচ্ছায়া হিসাবে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ও বারে বারে অশুচিরূপে ফুটে উঠেছে।... রাজসভার কৃত্রিমতায় সে কাহিনী যত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে ধর্মপ্রেরণার অবান্তর আগ্রহে তাকে সজীব করবার চেষ্টাও হয়েছে তত বেশি। ভারতচন্দ্র তাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক—জীবনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মন্দার দিকে তাঁর আবির্ভাব স্বাভাবিক ও সঙ্গত।"

বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজ-মনে, —তার ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগল, তারই ফলে বাঙলায় বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি। অবশ্য দক্ষিণ ভারতেই এর প্রথম বিকাশ। এখানে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ তাতে দ্রাবিড়সুলভ ভাবাবেগের প্রাচুর্য ছিল, আর ছিল তীব্র প্রাণময়তা। দ্রাবিড়রক্তের উত্তরাধিকারী বাঙলায়ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ একইরূপ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এমনিতে বাঙালি চিরকাল ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। সামান্য কারণেই উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত, উন্মত্ত বা অভিভূত হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্যেই এরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করে তখন তা গীতিকবিতা হয়ে উঠে, সামাজিক আন্দোলনে সাময়িক ঝড় উঠে। রাজনীতিতে ভয়ংকর বিপ্লব ঘটায়, এজন্যেই এরা তর্ক করে যুক্তি মানে, কিন্তু হৃদয়ানুভূতিগোচর না হলে আচরণ করে না।

বৈষ্ণব মত ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। এদের প্রভাবও বিশেষভাবে পড়েছিল পশ্চিম বাঙলায়। তার কারণ, হুমায়ুন কবীরের ভাষায় : "পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকরের পথ—দিগন্ত-প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্তরৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরালে মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রোলোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালির কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস, অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণে।" কিন্তু পূর্ব বাঙলায় এতবড় ধর্ম ও সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব যে পড়েনি তা নয়, তবে তা যেন কতকটা প্রথা রক্ষার তাগিদে কৃত্রিম চর্চা। পূর্ববঙ্গে মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল বেশি, তাই লক্ষ্য তার প্রায়ই ভূমির দিখে। কৃচিৎ ভূমার দিকে তা ধাবিত হয়েছে। ফলে এখানে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুখ-দ্বন্দ্ব ও প্রেম-স্নেহ-বিরহ-মিলনের গান-গাথা এবং দেবদ্রোহী, বীর্যমান, মর্যাদাবান, মানবতার প্রতীক চাঁদ সদাগর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। কারণ "পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করে নি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চললীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই।... সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই ভয়ঙ্কর শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মুহূর্ত হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার সমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?... পূর্ববাঙলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও মহিমা সত্ত্বেও নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামশীল মানুষ মুহূর্তের জন্যও নিজের সত্তা ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধ বিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব বাঙলার মজ্জাগত, মুসলিম বিজয়ে তা আরো প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠল নতুন আত্মপ্রত্যয়, নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। এভাবে পূর্ব বাঙলার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিদ্রোহ-ধর্মী মন সহজেই ইসলামের সংসারমুখী সন্ন্যাস-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নিল।" (বাঙলার কাব্য)

স্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে বৈষ্ণব বিপ্লবের যে প্লাবন এল তাতে পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু সবাই চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হয়নি বা রাধাকৃষ্ণের রূপকে ভক্তি বা বৈরাগ্য সাধনা করে নি। হয়তো চৈতন্যদেবের উপর অভিমান, অথবা রাধা-কৃষ্ণ রূপক থেকে প্রেরণার অভাব। তাই একদল লোক ভিন্ন পথে একই সাধনা করে চলল, এরা বাঙলার বাউল। বাউল আর বৈষ্ণবে সাধনাগত মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পরিণামে তারা একই গন্তব্যে পৌঁছে। একদল মুসলমান হিন্দুয়ানীর প্রতি অবজ্ঞাবশত পীর-মুর্শিদের রূপকে সাধনা করেছে। আর একদল হিন্দুর যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির সমন্বয়ে এক তত্ত্ব-দর্শন খাড়া করেছে। ফলত, বাঙলায় চতুর্বিধ শাখার সাহিত্য আমরা পাচ্ছি: ১. বৈষ্ণবপদ সাহিত্য ২. বাউল সাহিত্য, ৩. মুরশিদা ও ৪. মারফৎ সাহিত্য। এ সবক'টির মূল উৎস মায়াবাদ আর মুসলমানের সূফীতত্ত্ব। মায়াবাদও সূফীমতের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে উদ্ভূত। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে নানাদিকে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা সেদিন নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল প্রচুর। সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, সংগীতে সর্বত্র এর সাক্ষ্য মিলে। এ ধারায় চললে আজ বাঙলার সংস্কৃতি কিরূপ নিত তা হয়তো কল্পনা করা সম্ভব—কিন্তু নিরর্থক। কারণ, মধ্যপথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেষ্টায় রামায়ণ-মহাভারতের বহুল চর্চা হিন্দু-মানসকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমুখী করে দিল। অপরপক্ষে ফরাজেয়ী-ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে শরীয়তের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ মুসলমানগণকেও রক্ষণশীল এবং আরব-ইরানী তমদ্দুনের পূজারী করে তুলল। ফলে, বাঙলার সংস্কৃতি সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পারল না।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অনেক কবি বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কেউ করেছেন নেশার ঝোঁকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে। নেশার ঝোঁকে করার দারণ দুটো : ১. সূফী মতবাদের সাথে বৈষ্ণবাদর্শের আত্যন্তিক সাদৃশ্য ও আচারিক মিল, ২. জগৎ ও জীবনের চিরাবৃত রহস্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতূহল প্রভৃতি মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগায়, তার সদুত্তর সন্ধান-প্রয়াসজাত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশী বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ রূপকের ব্যবহার। বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবে দয়া, বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ সাধন, বিনয়, নামে রুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্য প্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি, তালাক প্রথা, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি সূফীদের যিকর, খিদমত, সামা, হাল, সদাসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, হকিকত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র। ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহও রাধাকৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব বা যুগল রূপ পরিকল্পনার উৎস স্বরূপ। এমনকি অদ্বৈতবাদী হিন্দুর দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সূফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত। অবশ্য বেদান্ত প্রভাবে পরে সূফীদের কেউ কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন। সুতরাং সূফী মতাসক্ত বাঙালি মুসলমানদেরকে বৈষ্ণব সাধনা অনুপ্রাণিত করবে তাতে আশ্চর্য কী ? এজন্যেই সাধক নূর কুতবে আলম এবং সৈয়দ মর্তুজা ফারসি গজল যেমন লিখেছেন, বাঙলা রাধাকৃষ্ণপদও তেমনি রচনা করেছেন। তাঁরা দুই তত্ত্ব অভিন্নরূপে দেখেছেন। 'রাধাকৃষ্ণ' যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ ও প্রাণ এবং ভক্ত ও ভগবানের পরিভাষারূপে পাক-ভারতের সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, এঁদের এবং পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মুসলিম রচিত পদ ও দোঁহাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা ছাড়া মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু—সেই অনাদিকাল থেকে মানুষ নানাভাবে এ প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধান করেছে। আজও তার অবসান হয়নি। কারণ, আজো সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সমাধান মেলেনি। এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার রূপ মানুষ অবিশেষে একই, কাজেই চিন্তাধারাও কমবেশি একই রূপ। কেননা, সবারই যে 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশী লাগিছে অন্তরে।' ইরানী ভাষা ও সাহিত্যে অপটু বাঙালি মুসলমান তাই রাধাকৃষ্ণের দেশী রূপকে জগৎ, জীবন আত্মাপরমাত্মায় রহস্য উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। শুধু বাঙালি মুসলমানই বা বলি কেন ; দাদু, কবীর, রজব, তাজ প্রভৃতি অবাঙালি মুসলমানও রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেননি। রাধাকৃষ্ণ রূপক তাঁদের মনন-প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে। সতেরো শতকের দরিয়া সাহেব বলেন:

আদি অংত মেরা হৈ রাম।
উন বিন ঔর সকল বেকাম ॥
কহা কঁরূ যে মান বড়াঈ।
রাম বিনা সবহী দুখ দাঈ ॥

কবি শেখ বলেন :

চরণ কমল হী কী
লোচনমেঁ লোচ ধরী
রোচন হ্বৈ রাচ্যো
সোচধাম ধনকৌ।
সোক নেস নেক হু
কলেস কৌ ন লেস রহ্যো।
সুমরি শ্রীগোকলেস
গো কলেস মনকৌ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইজুদ্দিন বলেন :

বৃংদাবনকী কুংজ গলিন মেঁ
ঢুংঢত ঢুংঢত হারী
দৈহৌ দরস মোহি আপনি।
মৌজ সে এহো কৃষ্ণ মুরারী
পিয়া মোহি আস তিহারী।

আফসোস বলেন :

নিশিদিন কৃষ্ণ মিলন কো সখিয়া
আস লগায়ে ঠাড়ি রহত হৈঁ।
আফসোস পিয়াকী নেহ-সুরতিয়া।
নিরখত নর ঔনারী রহত হৈঁ।

কবি কাইম বলেন :

হরি হেরত মৈঁ' কিরতা বাবরী
নৈননি মেঁ কব আবৈ
হরি কো লখি কাইম সখিয়া সোঁ
কাহে ন ধূম মচাবৈ।

সাধক এয়ারী বলেন :

হৌ তো খেলৌ পিয়া সংগ হোরী,
জবতে দৃষ্টি পরৌ অবিনাসী
লাগী রূপ ঠগৌরী।
কহ য়ারী যদি করুঁ হরিকী
কোই কহে সো কহৌরি

দরিয়াও বলেন :

মুরলী কৌন বজ রৈ হো
গগন মংডল কে বীচ ?
যা মুরলীকে ধুন সে
সহজ রচা বৈরাট।
যা মুরলী কী টেরহিঁ সুন সুন
রহী গোপিকা মোহী।
সব্দ ধুন মিরদংগ বজত হৈ
বারহ মাস বসংত।
অমহদ ধ্যান অখংড আতুর রে
ধ্যায়ত সব হী সংত।
কান্হ গোপী করত নৃত্যহিঁ
চরণ বপু হি বিনা।
নৈন বিন দরিয়ার দেখে
আনংদ রূপ ঘনা।

একেতো সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর; তাদের রক্ত-সংস্কারে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা—সুফী মতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে, সুতরাং মুসলমানদের মন, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও ধর্মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভারতীয় ভক্তিবাদ তাদেরকে সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তাই বাঙালি কবি শাহনূরের কথায় মুসলমানদের রাধাকৃষ্ণ রূপক গ্রহণের সংগত কারণ খুঁজে পাই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ শাহনূরে কয় রাধা কানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনেরে।

আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি : তন রাধা মন কানু শাহনূরে বলে।

অথবা : সৈয়দ শাহনূরে কয়, ভব কূলে আসি
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী ?

অথবা, ওসমানের কথায় :

রাধাকানু একঘরে কেহ নহে ভিন
রাধার নামে বাদাম দিয়ে চালায় রাত্রিদিন,
কানুরাধা একঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

সৈয়দ মর্তুজাও বলেন :

আনন্দমোহন মওলা খেলএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারী।
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি, মওলা গোপতের চিন।
পুরান পিরীত খানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে তুলনীয় :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি। (—চৈতন্য-চরিতামৃত)

বিকৃত বৈষ্ণব সাধক—বাঙলার বাউল ও অন্যান্য উপ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলোই রাধাকৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ত্ব তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদপ্রয়াসী। শুধু তাই নয়, আধুনিক উর্দু কবি হাফিজ জলন্ধরী থেকে বাঙলা কবি নজরুল, জসীমউদ্‌দীন প্রভৃতি অনেককেই এ রাধাকৃষ্ণ কাব্য-প্রেরণা দান করেছেন।

ফলত, বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মননের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-মতের প্রভাব ও প্রেরণা ছিল গভীর ও ব্যাপক। এজন্যে ষোলো শতককে বাঙলার রেনেসাঁর যুগ বলা হয়। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ও বাঙালির মানবতাবোধ বৈষ্ণবান্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। বাঙলা গীতিকবিতায় প্রেমের অনন্য অনুভূতির অনুপম বিকাশ, চরিত সাহিত্য সৃষ্টি, তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত, কীর্তনের বিভিন্ন সুরের আবিষ্কার, সর্বোপরি মানুষের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি—'জীবে ব্রহ্ম ও নরে নারায়ণ দর্শন' এবং প্রীতিতত্ত্বে দীক্ষা বাঙলাভাষা ও বাঙালির প্রতি চৈতন্য মতবাদের অমূল্য অবদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যাপতির কাল নিরূপণ

বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল তথা জীবৎকাল নি:সংশয়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি আজো। মুখ্যত লক্ষ্মণ সংবৎই এরজন্যে দায়ী। মিথিলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংবৎ গণনার চারটি ভিন্ন রীতি ছিল ষোলো-সতেরো শতক অবধি। মোটামুটিভাবে কোনোটির সঙ্গে ১০৮০, কোনোটির সঙ্গে ১১০৮, কোনোটির সঙ্গে ১১১৯-২০ এবং কোনোটির সঙ্গে ১১২৯ বছর যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ মেলে।[১]

আমরা বিদ্যাপতি-রচিত গ্রন্থে ও পদাবলীতে মিথিলার ও প্রতিবেশী রাজ্যের রাজপুরুষ, রানী ও রাজাদের নাম পাই। ভোগীশ্বর, গণেশ্বর, কীর্তিসিংহ, বীরসিংহ, ভবসিংহ, দেবসিংহ, হরসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, রাঘবসিংহ, ভূপতি সিংহ, রাজবল্লভ, রুদ্র সিংহ, ধীরসিংহ, মিথিলারাজ ভোগীশ্বর-পত্নী পদ্মাদেবী, দেবসিংহ-পত্নী হাসিনী দেবী, শিবসিংহ-পত্নী লক্ষ্মীদেবী, পদ্মসিংহ-পত্নী বিশ্বাসদেবী, নারায়ণ-পত্নী মেনকা দেবী, রেণুকা দেবী, রাজা অর্জুন, চন্দ্রসিংহ, রূপিণী দেবী, ভূপতিনাথ, কংসনারায়ণ ও তৎপত্নী সুরমা দেবী, রাঘব সিংহ-পত্নী স্বর্ণমতী দেবী, পুরাদিত্য লক্ষ্মীনারায়ণ-পত্নী চন্দল দেবী প্রভৃতি এবং আরসালান, মালিক বাহারুদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন, আলম শাহ, নসরত শাহ, ইব্রাহিম শাহ, হোসেন শাহ, ফিরোজ শাহ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের সুলতান ও রাজপুরুষদের নাম রয়েছে কবির গ্রন্থে ও পদাবলীতে।

ঐনবার বংশের কামেশ্বর-পুত্র রাজা ভোগীশ্বরই বিদ্যাপতির রচনায় প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি।[২] ভোগীশ্বর দিল্লীর তুঘলক সুলতান ফিরোজ শাহর (১৩৫১-৮৮) সমসাময়িক ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাপতি :

"ভোগী সরাঅ বর ভোগ পুরন্দর। ...
পিঅ সখা ভণি পিঅরোজ সাহ সুরতান-সমানল"।[৩]

এই ভোগীশ্বরের রাজত্বকালেই যে বিদ্যাপতি গান রচনা শুরু করেন, তার প্রমাণ—এর পূর্বেকার মিথিলার কোনো রাজা বা রাজপুরুষের নাম মেলে না বিদ্যাপতির পদে। ভোগীশ্বরের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাদেবী। বিদ্যাপতি বলেন:

বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে
তোঁকে অছ গুণক নিধান
রাউ ভোগিসর গুণ নাগরা রে
পদমা দেবী রমাণ।[৪]

ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বরের সঙ্গে ২৫২ লক্ষ্মণ সংবতে আরসালান (আসলান) নামের এক রাজ্যলোভী তুর্কীর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আরসালান পরাজিত হয়। কিন্তু পরে একসময় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এবং সে-সুযোগে আরসালান গণেশ্বরকে হত্যা করে মিথিলার শাসক হয়।[৫] কীর্তিলতা সূত্রেই আমরা এ সত্য জানতে পাই :

লখখন সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখখ পঞ্চদ্দে
তন্নুহমাসহি পঢ়ম পখ্খ পঞ্চমী কহি অজে।
রজ্জলুব্ধ আসলান বুদ্ধি বিক্কম বলে হারল
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল।[৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর থেকে আমরা দুটো বিষয়ে ইঙ্গিত পাই, ক. ২৫২ সংবতের তথা ১৩৮১ (২৫২ — ১১২৯) খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয় আর ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পরে কোনো সময়ে গণেশ্বর আরসালানের হাতে প্রাণ হারান। এবং খ. ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই গান লেখার মতো বয়স হয়েছিল বিদ্যাপতির। অতএব বিদ্যাপতির জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

কীর্তিলতা থেকেই জানা যায়, গণেশ-পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শাহ শর্কীর (১৪০১-৪০ খ্রীস্টাব্দে) আশ্রয় ও সহায়তা পেয়েছিলেন।[৭] অতএব অন্তত ১৪০১ খ্রীস্টাব্দ অবধি মিথিলা আরসালানের অধিকারে ছিল।

ইব্রাহিম শর্কী গণেশ-পুত্র কীর্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৮] কীর্তিসিংহের আগ্রহে তাঁর বীরত্ব-কথা বর্ণিত বলেই গ্রন্থের নাম 'কীর্তিলতা'। কীর্তিসিংহের পরে মিথিলার রাজা হন কামেশ্বরের অপর পুত্র ভবসিংহ। তাঁর পরে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র দেবসিংহ। পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতা দেবসিংহকে তাড়িয়ে নিজেই রাজা হলেন। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ আবার সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ রাজা হন। অবশ্য এঁদের কেউ বেশিদিন রাজত্ব করেননি। তবে শিবসিংহ প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গৌড়ের রাজা গণেশের মিত্রতা ছিল এবং তিনি সম্ভবত মিথিলাকে জৌনপুরের প্রভাবমুক্ত করেন।[৯] শিবসিংহের আমলেই বিদ্যাপতি তাঁর অধিকাংশ পদ এবং গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাজেই শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির যশ ও খ্যাতি পারস্পরিক প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার ফল। গণেশের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম শর্কীর গৌড় অভিযানকালে (১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে) শিবসিংহ ইব্রাহিম শর্কীর হাতে নিহত অথবা বন্দী হন। এবং শর্কী দেবসিংহকে আবার রাজা করেন।[১০] কাজেই ১৪১৫ খ্রীস্টাব্দে শিবসিংহের রাজস্ব শেষ হয়। শ্রীধরের 'কাব্য প্রকাশ' গ্রন্থের পুষ্পিকা সূত্রে বলা যায় (২৯১ ল. সং + ১১১৯) শিবসিংহ ১৪১০ সনের দিকে পিতৃসিংহাসন দখল করেছিলেন।[১১] দেবসিংহের পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্মসিংহ রাজা হন। পদ্মসিংহের পরে হয়তো দেবসিংহের ভাই ত্রিপুর সিংহের (নৃপনারায়ণ) পুত্র অর্জুন ও অমর সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। এই সুযোগে নেপালের সপ্‌তরী জনপদের পুরাদিত্য অর্জুন ও অমরকে পরাজিত ও হত্যা করে দ্রোণবারে স্বাধীন রাজা হন। তাঁর সভাতেই বিদ্যাপতি এই বিপর্যয়ের সময় আশ্রয় পান। হয়তো শিবসিংহের পরিবারও রাজবনৌলি গ্রামে বিদ্যাপতির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।[১২] পদ্মসিংহের পর দেবসিংহের ভাই হর বা হরিসিংহের পুত্র নরসিংহ বা নৃসিংহ রাজত্ব পেয়েছিলেন। এই নৃসিংহ বা নরসিংহের একটি শিলালিপি মিলেছে মাধিপুরা মহকুমার কানাদাহা গাঁয়ে। এতে 'শক শরাশ্ব মদন:' তথা ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।[১৩] অতএব নরসিংহ অন্তত ১৪৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। নরসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি 'বিভাগসার', তাঁর স্ত্রী ধীরমতির আগ্রহে 'দানবাক্যাবলী', পুত্র ভৈরব সিংহের আজ্ঞায় 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে কবি নরসিংহ ও তাঁর পুত্র ধীর সিংহকে রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব পিতার জীবিত কালেই পুত্র রাজা বা যুবরাজ হয়েছিলেন। নরসিংহেরই বিরুদ ছিল দর্পনারায়ণ। এই দর্পনারায়ণের আদেশেই কবি 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করেন। শিবসিংহের দুই জ্ঞাতি ভ্রাতার নাম ছিল রাঘবসিংহ ও রুদ্রসিংহ এবং ধীরসিংহের পুত্র ও পৌত্রেরও যথাক্রমে এ দুটো নাম ছিল। বিদ্যাপতির তিনটে পদে রাঘব সিংহের ও দুটো পদে রুদ্র সিংহের নাম আছে। ধীর সিংহের সময়েই তাঁর পুত্র-পৌত্রকে পাওয়া যায়, কাজেই রাঘব ও রুদ্র শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা না হয়ে যদি ধীরসিংহের পুত্র এবং পৌত্রও হয়, তাতে বিদ্যাপতির জীবৎকালের পরিসরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অতএব, বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছেন। আমরা উপরে যা আলোচনা করেছি, ছকে তা এরূপ দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

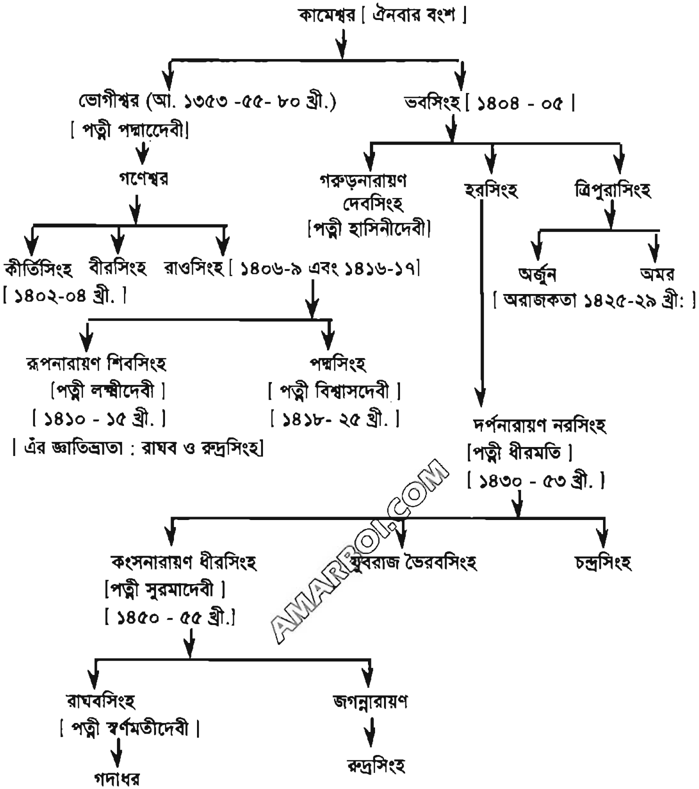

ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কামেশ্বর বংশীয় সব রাজা, রাজকুমার ও রানীর প্রশংসাসূচক ভণিতা দিয়েছেন বিদ্যাপতি তাঁর রচিত পদে। গ্রন্থগুলোও রচিত হয়েছে তাঁদের কারো-না-কারো নির্দেশে। বংশ তালিকাটি দীর্ঘ হলেও কাল-পরিসর দীর্ঘ নয়। খুব দীর্ঘায়ু না হয়েও এমনি স্বল্পজীবী অনেক সুলতানের [গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক অবধি] প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবি আমীর খুসরুও [১২৫৩-১৩২৫ খ্রী.]। ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কালের বিস্তৃতি হবে মোটামুটি ৭৫ বৎসর [আনু ১৩৮০-১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ]। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে লোকশ্রুতি আছে। অতএব, বিদ্যাপতির আয়ু [১৩৬৪ - ১৪৫৪ খ্রী.] নব্বই বছর হলেই ভোগীশ্বর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি সবাই তাঁর জ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক কিংবা কনিষ্ঠ সমসাময়িক হতে পারেন।

আমাদের ধারণা দর্পনারায়ণ নরসিংহের রাজত্বকালেই যুবরাজ ছিলেন। ধীরসিংহ এবং ভৈরবসিংহ রাজত্ব করেছেন পনেরো শতকের শেষদশকে (মুদ্রার প্রমাণে)। ধীরসিংহের পুত্র রাঘব কিংবা পৌত্র রুদ্রসিংহ দর্পনারায়ণ নরসিংহের আমলেই যথাক্রমে প্রৌঢ় ও যুবক ছিলেন। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌজন্যের ভাষায় রাজপরিবারের লোকমাত্রই 'রায় বা রাজা'। এইজন্যে তাঁরা যথার্থ রাজা ছিলেন বলে মনে করা অসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে দীর্ঘজীবী আওরঙজীবের বংশধারা—বাহাদুর শাহ—আজিমুশশান—ফররুখশিয়র প্রভৃতি স্মর্তব্য। আওরঙজীবের মৃত্যুকালে প্রপৌত্র ফররুখশিয়রই প্রায়-প্রৌঢ়।

বিদ্যাপতি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর আদেষ্টানুক্রমিক তালিকা এরূপ :

	গ্রন্থ	আদেষ্টা	
১.	কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ [১৪০২-০৪]	
২.	কীর্তিপতাকা	রূপনারায়ণ	
৩.	পুরুষ পরীক্ষা	শিবসিংহ	
৪.	গোরক্ষ বিজয় [নাটক]	[১৪১০-১৫ খ্রী.]	
৫.	ভূপরিক্রমা	গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ [১৪১৬-১৭ খ্রী.]	
৬.	শৈবসর্বস্বসার	পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী	
৭	গঙ্গাবাক্যাবলী	[১৪১৮-২৫ খ্রী.]	
৮.	লিখনাবলী	দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্য [ল. সং ২৯৯+১১২৯=১৪২৮ খ্রী.] [দ্রষ্টব্য : JASB, 1915, p. 422]	
৯.	বিভাগসার	দর্পনারায়ণ নরসিংহ	
১০.	দানবাক্যাবলী	নরসিংহ পত্নী ধীরমতি	
১১.	দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী	কংসনারায়ণ ধীরসিংহ আ: ভৈরবসিংহ [রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণ]	১৪৩০-৫৫ খ্রী.
১২.	ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী	দর্পনারায়ণ নরসিংহ	
১৩.	বর্ষকৃত্য বা ক্রিয়া–অপ্রাপ্ত		
১৪.	গয়াবাক্যাবলী বা গয়াপত্তন—অপ্রাপ্ত।		

বিদ্যাপতি 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী'তে প্রসঙ্গক্রমে 'দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিনী'র উল্লেখ করেছেন—অনুক্তং যদন্যম দুর্গাভক্তিতরঙ্গিন্যাম অনুসন্ধেয়ং গ্রন্থ কলেবর শঙ্কয়াএ পুণর্লিখিতমিতি"—গণেশচরণ বসুর মতে স্মৃতিকারেরা নিজের রচনা উল্লেখ প্রসঙ্গেই সাধারণত 'অনুসন্ধেয়ং' শব্দটি প্রয়োগ করতেন।[১৪]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর পরে রচিত। বিদ্বানদের মতে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী ভৈরব সিংহের আদেশে প্রণীত। ভৈরব সিংহের পিতা নরসিংহ দর্পনারায়ণ যে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর তাম্রশাসন। কাজেই এ সময়ে বা কিছু আগে কিংবা পরে যে 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত এটিই বিদ্যাপতির শেষ গ্রন্থ।

সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন তুঘলকই (১৩২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে) মিথিলার কর্ণাট-বংশের উচ্ছেদ সাধন করে রাজপণ্ডিত কামেশ্বরকে মিথিলার সিংহাসন দান করেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে হাজী ইলিয়াস ওর্ফে গৌড় সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দে বিহার জয় করে হাজীপুর শহরের পত্তন করেন। পরে ফিরোজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে বিতাড়িত করে মিথিলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা করলেন কামেশ্বর-পুত্র ভোগীশ্বরকে। হয়তো তাঁর ভাই ভবসিংহও বিহারের এক অংশ শাসনের অধিকার পান, এবং কীর্তিসিংহের পর ভবসিংহের পুত্র শিবসিংহ বাহুবলে বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হন।[১৫]

এক বিদ্বানের অনুমান, আরসালান কর্তৃক গণেশ্বর নিহত হওয়ার পরে হয়তো গণেশ্বরের পুত্র বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দিল্লী ও গৌড় সুলতানের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পরেও নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিথিলারাজকে হয়তো বিভিন্ন দরবারে ধর্না দিতে হয়েছে। এ সূত্রেই মিথিলার দরবারী কবি বিদ্যাপতি—গৌড়-সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, গৌড়ের সুফী-পীর আলম শাহ (হযরত নূর কুতুব-ই-আলম) অথবা দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলম শাহ (১৪৪৪-৪৮ খ্রী.) দিল্লীর তুঘলক সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৩৯৪-৯৯ খ্রী.), গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯ খ্রীস্টাব্দ) শর্কী হোসেন শাহ বা মখদুম সুলতান হোসেন শাহ, মালিক বাহারুদ্দীন প্রভৃতির প্রশস্তি যোগ করেছেন তাঁর রচিত পদাবলীতে।[১৯] যথা:

১. নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ (তুঘলক)
কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি
রাত্র নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি।
(গুপ্ত ৩৪৯, মিত্র-মজুমদার ৯৩২)

অথবা বিদ্যাপতি ভানি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নাসির মধুপ ভুলে কমলবাণী
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সং ২৩৫৩)

২. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (গৌড়)
নাসির শাহ ভাণে
মুঝে হানল নয়ন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতির ভাণে। (গুপ্ত : ৪৪, মিত্র-মজুমদার ৯৩১)

পাঠান্তর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি সং ২৬৪৮
সাহা হুসেন ভাণে
জাকে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

৩. গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (গৌড়)
বিদ্যাপতি কবি ভাণ
মহলম যুগপতি চিরেজীব জীবথু
গ্যাসদেব সুরতান। (গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ৭৪, পদ সং ২৯)

৪. হুসেন শাহ শর্কী বা দ্বারবঙ্গের মখদুম শাহ সুলতান হোসেন:
ভণই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর
পৃথিবী [পুহবী] দোহর কঁহা
সাহ হুসেন ভৃঙ্গসম নাগর
মালতী সেনিক জহাঁ।
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ১৩১, পদ নং ১৫১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. মালিক বাহারুদ্দীন :
বিদ্যাপতি কবি রভবে গাব
মালিক বহারদিন বুবই ভাব।
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ১২০, পদ সং ১১০)

৬. আলম শাহ:
দশ অবধান ভন পুরুষ প্রেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা
আলম শাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা।

(রাগতরঙ্গিণী, পৃ. ৮৬, গুপ্ত সাহিত্য পরিষদ, সং পদ সং ৬, পৃ. ৫২৯, মিত্র মজুমদার ভূমিকা পৃ.)

অবশ্য উক্ত সুলতানগণকে গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আর তাঁর পুত্র নুসরতশাহ ও গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ বলে অনুমান করে এগুলোকে সহজেই শ্রীখণ্ডবাসী বাঙালি কবি বিদ্যাপতির (কবিশেখর, কবিরঞ্জন) পদ বলেও প্রমাণ করা যায়, এবং অনেকেই তা করেওছেন।[১৭] কিন্তু তা করবার প্রয়োজন নাই। কেননা, এগুলোকে মৈলিথিল কবির রচনা বলে গ্রহণ করতে বাধা দেখিনে।

আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি, ১৩৬০-৬৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এং ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি অভিনব জয়দেব, নব কবিশেখর (কবিশেখর), কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠক্কুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত প্রভৃতি উপাধি ছিল।

আর আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি শৈবই ছিলেন। আমাদের বৈষ্ণব বিদ্বানেরাই বিশেষ করে এঁকে বৈষ্ণব বলে ভাবতে চান। তার কারণও রয়েছে।

চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন, সেই থেকে বিদ্যাপতি হয়েছেন মহাজন গোস্বামী। পাঁচশ বছর পরে আজ যদি বিদ্যপতি শৈব ছিলেন বলে কেউ দাবী করেন, তাহলে বৈষ্ণবের ভক্তি-বিশ্বাসের ভিতেই যেন ফাটল ধরে পায়ের নিচে চোরাবালি যেন সরে যায়। কেননা সাধন-ভজনের পবিত্র বাহন আকস্মিকভাবে যেন আদিরসের পঙ্কমণ্ডিত হয়ে উঠে। তাই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব রাখতেই হয়, অথচ বিদ্যাপতি ছিলেন রাজপণ্ডিত ও স্মার্ত। সমাজকে স্মৃতির শাসনে রাখা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব বলেই তিনি জানতেন। তাই কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, পুরুষ পরীক্ষা ও গোরক্ষবিজয় নাটক ছাড়া তাঁর সব রচনাই স্মৃতিগ্রন্থ। আর রাধাকৃষ্ণ পদ তাঁর মানবিক প্রণয় সঙ্গীত। তার প্রমাণ তাঁর বিবিধ বিষয়ক গান ও আদিরসাত্মক পদ। যেমন :

অপনা মন্দির বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা
তহিখনে পহিয়া পাহুন আয়ল
বরিষয় লাগল দেবা।
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনী
বচনক ভেল অবকাশে।
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভাণে
কঞোনক কহব হমে কে পতিয়ায়ত
জগত বিদিত পচবাণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[নগেন্দ্র গুপ্ত, বসুমতী সং পৃ. ২৩৮, পদ সং ১৫]

অথবা

বালম নিঠুর বয়স পরবাস
চেতন পড়োসিয়া নাহি মোর পাশ।
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ শাও নহি সুঝ।
হসে ভরে যৌবতী রজনী অন্ধার
স্বপেনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার। ইত্যাদি

(গুপ্ত পৃ. ২৩৯-৪০ পদ সং ২১)

এসব পদও বৈষ্ণবপদের মতোই। কেবল রাধা-কৃষ্ণের নাম নেই। তাছাড়া বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ, গঙ্গা ও রাম-সীতা বিষয়ক পদ আর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। রসিক কবি সব দেবতাকে সমভাবেই ভক্তি করেন, বিদ্রূপও করেন অকাতরে। কাজেই পদাবলীতে বিদ্যাপতির ধর্মীয় আবেগ নয়—রসবোধই অভিব্যক্তি পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অতএব রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ তাঁর বৈষ্ণব মতের পরিচায়ক নয়। প্রেম-সঙ্গীতের জন্যে বিষয় হিসেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই আর্কষণীয় বলে কবি রাধাকৃষ্ণলীলার পদই অধিক রচনা করেছেন। কবি, রসিক, পণ্ডিত ও ভাষার যাদুকর বিদ্যাপতি সংস্কৃত, অবহট্ট ও মৈথিল বুলিতে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা, রসবোধ ও কাব্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন অবলীলায়।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

শতেক বছর ধরে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বাঙলা ও বিহারে। কিন্তু করদ রাজ্য মিথিলার রাজবংশের রাজপঞ্জী, কুলপঞ্জী, লোকশ্রুতি নির্ভর আলোচনা কোনো স্থির সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে দেয়নি। লক্ষ্মণ সংবতের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারই এজন্যে অনেকটা দায়ী। এজন্যে বিদ্যাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে নি:সংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আজো সম্ভব হয়নি। বিদ্বানেরা আজ অবধি যে-সব মত চালু করেছেন, সেগুলো এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে। তার আগে বিদ্যাপতি ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন কিংবা তাঁর পদাবলী সংকলন করেছেন অথবা তাঁর রচিত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করছি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রই প্রথম (১৮৫৮-৫৯ সনে) বিবিধার্থ সংগ্রহে 'বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির পরিচয় দেন। এর পর আলোচনা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭২ সনে)। এসব ছাড়াও হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবি চরিতে' (১৮৬৯ সন), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাসে' (১৮৭২ সনে) এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহে' (১৮৭২) বিদ্যাপতির লোকশ্রুতিমূলক পরিচয় দান করেন।

কিন্তু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা শুরু হয় জন বীমসের প্রবন্ধ দিয়ে।[১] এ প্রবন্ধের সমালোচনা স্বরূপ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকায় 'বিদ্যাপতি' নামে তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ লেখেন।[২] জন বীমস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন Indian Antiquary-তে[৩]। এরপর G. A. Grierson ১৮৮১ সনে তাঁর An introduction to the Maithili language of North Bihar,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

containing a grammar, Chrestomathy and vocabulary (vol II) নামের গ্রন্থে এবং পরবর্তী দুটো প্রবন্ধে[৪] বিদ্যাপতির বিশেষ পরিচয় দেন। তারপর জগদ্বন্ধুভদ্র ১৮৭৪ সনে 'মহাজন পদাবলী' (১ম খণ্ড) নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সংকলন করেন। আর ১৮৭৮ সনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ সংকলিত হয়। ১৮৯২ সনে (১২৮৫ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয় সারদাচরণ মিত্রের 'বিদ্যাপতির পদাবলী' নামক সংকলন গ্রন্থ। এরপর ১৯০৯ সনে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংগৃহীত ও সম্পাদিত প্রখ্যাত 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে নগেন্দ্র গুপ্ত সংকলিত 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড) : মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৯৩৫ সনে)। এর এক বছর আগে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বের করেন (১৩৪১ বাং ১৯৩৪ সন) বিদ্যাপতি পদাবলী। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে তথা ১৯৫২ সনে প্রকাশিত হয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 'বিদ্যাপতি পদাবলী', ডক্টর শহীদুল্লাহর সংকলিত 'বিদ্যাপতি শতক' বের হয় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে বা ১৯৫৪ সনে। এগুলো ছাড়াও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলী (১৮৯৪ সন), পঞ্চানন তর্করত্নের বিদ্যাপতি পদাবলী (১৮৯৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'নবাবিষ্কৃত বিদ্যাপতি পদাবলী' (১৯০০-০৬), কীর্তিলতা (১৯২৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়াও রয়েছে ব্রজানন্দ সহায়-এর 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' (১৯১০), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি ঠাকুর (১৯১০), রামকৃষ্ণ শর্মার 'বিদ্যাপতি কি পদাবলী' (১৯৩১), বসন্ত কুমার ময়ূরের 'বিদ্যাপতি কি পদাবলী' (১৯৫২), শম্ভু প্রসাদের মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত পদাবলী (১৯৪৭), লাল্য দেবেন্দ্র সিংহ ও সূর্যাবলী সিংহের বিদ্যাপতি (১৯৫০), সুভদ্র ঝা-র বিদ্যাপতি Songs of Vidyapati (১৯৫৪), অরবিন্দ ঘোষের Songs of Vidyapati (১৯৫৬) প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও যে-কোনো পদাবলী সংকলন গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ রয়েছে, এবং সবাই বিদ্যাপতির অল্প- বিস্তর পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' 'পুরুষ পরীক্ষা' ও তাঁর স্মৃতিগ্রন্থগুলোর সম্পাদনা কিংবা আলোচনা প্রসঙ্গেও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া বাঙলা ও মিথিলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসেও রয়েছে বিদ্যাপতি সম্পর্কে নানা তথ্য।

এবার বিদ্যাপতির জন্ম-মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানের মতগুলো এখানে তুলে ধরছি।

১. সারদাচরণ মিত্র : খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাঁহার পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। (বিদ্যাপতির পদাবলী ১৮৭৮ খ্রী.)

২. জি. এ. গ্রিয়ার্সন : Vidyapati flourished and was a celebrated author during at least the first half of the 15th century (Introduction, p 11, Puruhsa Pariksa).

৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : [ক] বিদ্যাপতি ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু হয় ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে (বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী)

[—বা. সা. প. সং ভূমিকা পৃ.]

[খ] বিদ্যাপতি সাতাশী-অষ্টাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। [মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির পৃ. ১|

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : জীবনৎকাল ১৩৪৭-১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দ [কীর্তিলতা, ভূমিকা পৃ.]

৫. কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ : জন্মসন ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে।

(বিদ্যাপতি কি পদাবলী পৃ. ১১, ৩১)

৬. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : End of 14th, begining of 15th century. (Original and Development of Bengali language vol. 1)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭ দীনেশ চন্দ্র সেন : জন্মসন ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোনো সময় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৩৭২, মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দ, [Journal of Development of Letters, Calcutta. vol. XVI, p 36]

৯. অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ : জন্ম : ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দের পর নিকটবর্তী কোনো সময়। [বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা]

১০. খগেন্দ্রনাথ মিত্র : (ক) জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে,
[পদামৃত মাধুরী পৃ. ৪৮]
(খ) জন্ম : ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দে (বৈষ্ণব রস সাহিত্য)

১১. সতীশচন্দ্র রায় : জন্ম ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ এবং শতাধিক বৎসর সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া নানা গ্রন্থ রচনা করেন [পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃ. ১৬৬-১৬৭]

১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জন্ম ১৩৫৪ এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দেও বিদ্যাপতি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিদ্যমান ছিলেন। রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে (১৪৭৫ থেকে শুরু) বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। (ক) বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৬। বিদ্যাপতি শতক, ভূমিকা পৃ. -১০)

১৩. সুকুমার সেন (ক) ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশিদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না (বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, পৃ. ২২-২৩) (খ) বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৮৩)।

১৪. বিমান বিহারী মজুমদার : ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকছি সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। (বিদ্যাপতির পদাবলী, ভূমিকা পৃ.)

১৫. উমেশ মিশ্র : কবির জীবৎকাল ১৩৬০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। বিদ্যাপতি ঠাকুর (হিন্দুস্থানী একাডেমী, এলাহাবাদ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পৃ ৩৬-৩৭)

১৬. শিবনন্দন ঠাকুর : জন্ম ১৩৫১ ও মৃত্যু ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দ। (মহাকবি বিদ্যাপতি পৃ. ৩৭-৩৯)

১৭. জয়কান্ত মিশ্র : জন্ম ১৩৬০ ও মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দ (History of Maithili literature)

১৮. সুখময় মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৩৭০ ও মৃত্যু ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের মতো সময়ে।' (বাংলা সাহিত্যের কালক্রম পৃ. ৪৭-৪৮)

১৯. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম আ. ১৩৮০ ও মৃত্যু আ. ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ, (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯)

২০. সুভদ্র ঝা : মৃত্যু ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের পরে। (Songs of Vidyapati, Introduction)

লক্ষণীয়, এর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাপতির মৃত্যু সন ১৪৪৮ অথবা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ ধরেছেন। যাঁরা ১৪৪৮ সন বলে মনে করেন তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে বিদ্যাপতির রচনা বলে অনুমিত একটি পদ :

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ
বতিস বরস পর সামর রূপ।
বহুত দেখল হম গুরুজন প্রাচীন
অব ভেলহুঁ হম আয়ুবিহীন।

[নগেন্দ্র গুপ্ত : বসুমতী সং পৃ. ২৩৮ পদ সংখ্যা—১১ মিত্র ও মজুমদার পদসংখ্যা ৯১৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁরা শিবসিংহের মৃত্যু সন ধরেছেন ১৪১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দ এবং বিশ্বাস করেছেন পদোক্ত স্বপ্নফল অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ১৪১৬+৩২=১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়েছিল। কেননা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-মতে স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।

আর যাঁরা বিদ্যাপতির মৃত্যু সন ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ বলে নিরূপণ করেছেন তাঁদের দলিল হচ্ছে একটি পুথির লিপিকাল। হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন বিদ্যাপতির ছাত্র রূপধর। পুষ্পিকায় লিপিকাল ও জীবিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। যথা :

"লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকুল কুমুদিনী চন্দ্রবাদি মণ্ডভ সিংহ পরম সচ্চরিত্র পবিত্র শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়েভ্য পঠিতা ছাত্র শ্রীরূপ ধরেণ। লিখিত মদ: পুস্তকম।'

৩৪১ লক্ষ্মণ সংবেতের সঙ্গে ১১১৯ যোগ করেই তাঁরা ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু ৩৪১ এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮ কিংবা ১১২৯ যোগ করিলে যথাক্রমে ১৪২১' ১৪৪৯ এবং ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দও পাওয়া যায়। তবে পুষ্পিকা সূত্রে মনে হয় বিদ্যাপতি তখন যশ ও মনে অনন্য, কাজেই লিপিকাল ১৪৪১ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। বিশেষ করে যিনি নেপালের দ্রোণবাররাজ পুবাদিত্যের আশ্রয়ে (রাজাবনৌলি গাঁয়ে) থেকেও জীবকার্জনের জন্যে 'লিখনাবলী' রচনা করেছেন ২৯৯ লং সংবতে তথা (২৯৯+১১২৯) ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দে[৫] বা তৎপরে, তাঁর তখনো খ্যাতি-প্রতিপত্তি উক্ত সব বিশেষণের আনুপাতিক হয়ে না-উঠারই সম্ভাবনা।

বিদ্যাপতি নাকি তালপাতায় একখানি ভাগবতের প্রতিলিপি তৈান করেছিলেন। তার পুষ্পিকায় বিদ্যাপতির নাম ও অস্পষ্ট লিপিকাল রয়েছে : 'শুভমস্তু সর্বর্থগতা সংখ্যা লং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজাবনৌলি গ্রামে শ্রী বিদ্যাপতের্লিপিরিয়মিতি।' [দ্বারবঙ্গের রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত]

বিসফী গাঁয়ের কবি বিদ্যাপতি কিংবা রাজসভার কবি ও রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি ১৪৩৮ সনেও রাজাবনৌলি গাঁয়ে বসে ভাগবত নকল করেছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পদ্মসিংহের মৃত্যু ও নরসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সন্ধিকালে হয়তো রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে কবি নেপালে দ্রোনবারের রাজার আশ্রয় নিয়েছিলেন। লিখনাবলী সূত্রে বোঝা যায় তিনি ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দেও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাই বলে আরো দশ বছর সেখানে বাস করার কথা নয়। কেননা, তিনি নরসিংহ পরিবারের প্রীতি অর্জন করেছিলেন। কাজেই উক্ত প্রতিলিপি হয়তো অন্য কোনো বিদ্যপতির কৃতি। নাম-সাদৃশ্যে গুরুত্ব আরোপ না-করাই সঙ্গত। আর (৩০৯+১১২৯=) ১৪৩৮ খ্রীস্টাব্দেই এ পুথি লিপীকৃত। কেননা ঐ বছরের শ্রাবণ মাসের শুদি ১৫ বা পূর্ণিমা তিথি মঙ্গলবারে পড়েছিল এবং ঐদিন তারিখ ছিল ৫ই আগস্ট।[৬]

এ ছাড়া বিদ্যাপতি রচিত 'দানবাক্যাবলী'র একটি প্রতিলিপি রয়েছে নেপাল রাজ গ্রন্থাগারে। ওটি নাকি বিদ্যাপতির স্বহস্তে সংশোধিত। নকলের তারিখও রয়েছে লং সং ৩৫১। এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮, ১১১৯ ও ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে ১৪৩১, ১৪৫৯, ১৪৭০ ও ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ হয়। তবে ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দ ধরাই সমীচীন।

১৩০৭ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাপতির ভনিতাযুক্ত একটি অবহটঠপদ উদ্ধৃত করেছিলেন। পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি পদাবলীর বসুমতী সংস্করণে বিধৃত রয়েছে (পৃ. ২৩৬-৩৭ পদ সং ৯ ও পরিষৎ সং; পদ সং ৫৩১)। পদটির শুরু এভাবে :

অনল রন্ধ্রকর লকখন নরবই সক সমুদ্দকর অগিনি সসী
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ এ জাউলসী।
দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ অদ্ধাসন সুররাএ সরু
দুহু সুরতনি নীন্দে অবে শোয়উ তপন হীন জগতিমিরে ভরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ— আরন্তিয় অন্তেষ্টি মহামখ রাজসুয় অসমেধ যঁহা
পণ্ডিতঘর আচার বখানিয় যাচক কাঁ ঘর দান কঁহা।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবয় মানব মন আনন্দ ভয়ও
সিংহাসন শিবসিহ বইঠ্‌ঠো উচ্ছব বৈরস বিসরি গয়েও।

এখানে প্রদত্ত সন (অনল-৩, রন্ধ্র-৯, কর-২) = ল সং ২৯৩ এবং শক (সমুদ্র - ৪, কর - ২, অগ্নি - ৩, শশী-১) = ১৩২৪ শক।

ল. সংবত থেকে ১৩৭৩, ১৪০১, ১৪১২ বা ১৪২২ খ্রীস্টাব্দ মেলে আর শকাব্দ থেকে পাই ১৪০১-০২ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই ১৪০১-০২ খ্রীস্টাব্দই নির্দেশিত হয়েছে বলে মানতে হয়। কেউ কেউ শকাব্দের 'কর' স্থলে 'পুর' ধরে একে ১৩৪৩ শক বা ১৪১২ খ্রীস্টাব্দ পেতে চান। এই সন শিবসিংহের ['কাব্য প্রকাশবিবেক' সূত্রে সিংহাসন আরোহণ ১৪১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে] রাজত্বকালে পড়ে। কিন্তু এ পদটি অনেকের মতেই জাল। কেননা প্রথমত দেবসিংহের মৃত্যুর আগেই পিতৃদ্রোহী শিবসিংহ পিতাকে তাড়িয়ে রাজ্য দখল করেন, এ সংবাদ আমরা মোল্লা তাকিয়ার 'বয়ায' সূত্রে জানতে পাই।[৭] দ্বিতীয়ত, 'পুরুষ পরীক্ষা' সূত্রে বোঝা যায়, এই গ্রন্থ রচনাকালে দেবসিংহ জীবিত ছিলেন, 'ভাতি যস্য জনকোরণজেতা দেবসিংহ গুণরাশি:।[৮] তৃতীয়ত নৈমিষারণ্যে আশ্রিত দেবসিংহের আদেশেই যে বিদ্যাপতি ভূপরিক্রমা রচনা করেছিলেন, তা 'ভূপরিক্রমা' থেকেই জানা যাচ্ছে। অতএব শিবসিংহের রাজত্বকালে দেবসিংহ মৃত নয়, নির্বাসিত অথবা পলাতক ছিলেন।

কেউ কেউ কীর্তিলতার দুটো শ্লোকের তাৎপর্য অনুসরণে বিদ্যাপতির জন্ম সন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ নিরূপণে প্রয়াসী। শ্লোক দুটো এরূপ :

১. বালচন্দ্র বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নহি লগ্‌গেই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হরশির সোহই
ঈ নিশ্চই নাঅর-মন মোহই।

"বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা—এ দুইয়ের কোনোটিতেই দুর্জনের উপহাস লাগিবে না। যেহেতু চন্দ্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর বিদ্যাপতির ভাষা নাগর জনের মনোমোহন করে।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

২ মাধুর্য প্রসবস্থলী গুরু যশো শিক্ষাসখী
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী।

"মাধুর্যের প্রসব স্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষাসখী সদৃশ 'খেলন কবি' বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

প্রথমটাতে বালচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাষা তুলিত হয়েছে। বিদ্বানরা মনে করেছেন, বিদ্যাপতি তখনো তরুণ। আর দ্বিতীয় শ্লোকে 'খেলনা কবি' অর্থে (খেলুড়ে-বাল্যক্রীড়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি যার) বালক কিংবা কিশোর কবি নির্দেশ করা হয়েছে বলেই তাঁদের ধারণা। কীর্তিলতা ১৪০১-০৪ সনের মধ্যে রচিত। কাজেই এঁদের মতে এটি কবির বিশ-বাইশ বছর বয়সের রচনা। এজন্যে তাঁরা কবির জন্ম সন ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করেন।

আগে কয়েকটি গীত রচনা করলেও পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে কীর্তিলতাই বিদ্যাপতির প্রথম কৃতি। এজন্যেই কবি এই নব প্রয়াসকে নবচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন : নবচন্দ্র যেমন নতুন ও ক্ষীণকায় বলে নিন্দনীয় নয়, তেমনি নতুন কবির প্রথম কাব্য বলে কীর্তিলতাও অবহেলার বস্তু নয়। এমনি তাৎপর্যেও উক্ত শ্লোকটি গ্রহণ করা সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি 'খেলনকবের্বিদ্যাপাতর্ভারতী' পাঠ কেউ কেউ অশুদ্ধ ও অর্থহীন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে শুদ্ধ পাঠ হবে 'খেলতু কবের্বিদ্যাপতের্ভারতী।'[৯]

অতএব যা ছিল বিনয়বচন, তা গর্বিত আহবানে হল পরিণত। কাজেই উক্ত দুই শ্লোক অপরিণত অল্প বয়সের সাক্ষ্য নয়। বিশেষ করে বিদ্যাপতির পদে রাজা ভোগীশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। জীবিত রাজা ভোগীশ্বরের প্রশস্তিই গেয়েছেন কবি তাঁর ভণিতায়। ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দের আগে ভোগীশ্বরের মৃত্যু হয়। কাজেই এ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স ১৫-২০ না হলে পাঠযোগ্য পদ রচনা সম্ভব হ না।

তথ্য-সঙ্কেত

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : লক্ষণ সংবৎ রহস্য : ১৯৫৮, পৃ. ২১-৩২।

২. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড : মহাকবি বিদ্যাপতির পদাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির : ১২৪২ সন। পৃ. ২১২ পদসংখ্যা ১৭।

৩. কীর্তিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। পৃ. ৪।

৪. ৫ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫. তীন সেন বিহার চাপিন : কীর্তিলতা : পৃ. ৫০-৫১। —সাকসেনা। ১৩৭১ বা ১৩৮১ (২৫২ ল সং) খ্রীস্টাব্দে যদি আরসালানের হাতে গণেশ্বর নিহত হন, তাহলে তাঁর সন্তানেরা ৩০ বা ২০ বছর পরে ইব্রাহিম শর্কীর সহায়তায় হৃতরাজ্য (১৪০১-০২ খ্রী.) উদ্ধার করেন। এতকাল পরে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আকস্মিক প্রয়াসের নজির ইতিহাসে দুর্লক্ষ্য। কাজেই আরসালান ২৫২ ল. সংবতের (১৩৮১ খ্রী.) যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অনেককাল পরে তৈমুরের ভারত আক্রমণকালে (১৩৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে) বন্ধুত্বের সুযোগে গণেশ্বরকে হত্যা করে ত্রিহুত দখল করেন, এই ধারণাই সঙ্গত। বিশেষত আরসালান কর্তৃক ২০/৩০ বছর ধরে মিথিলা শাসনের সাক্ষ্য নেই। এবং 'তারিখ-ই মুবারক শাহী'-মতে খানজাহান শর্কীই তখন কনৌজ, আগ্রা, অযোধ্যা, ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতির অধিপতি। Elliot vol. IV, p. 29

৬. কীর্তিলতা ২য় পল্লব।

৭. শিরি ইমরাহিম শাহ গুনে নাহি চিন্তা নাহি শোক কীর্তিলতা : সাকসেনা, পৃ. ৩৮।

৮. ইব্রাহিম শর্কীর (১৪০১-৪০) সহায়তায় যদি কীর্তিসিংহ মিথিলার সিংহাসন পেয়ে থাকেন, তাহলে ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে (ল সং ২৯৩ শক ১৩২১, বিক্রম সং ১৪৫৫, ফসলী সন ৮০৭) রাজা হিসেবে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করতেই পারেন না।

৯. Bengali Past & Present : LXVII 1948 note 31.

১০. ibid

১১. "ইতি তর্কাচার্য ঠক্কুর শ্রীশ্রীধর বিরচিতে কাব্য প্রকাশ বিবেক দশম উল্লাস:। শুভমস্তু। সমস্ত বিরুদাবলী মহারাজধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহ দেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ শ্রগজরথপুর নগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া খৌয়াল সং শ্রীদেবশর্ম বলিয়ামসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈ যা হস্তাভ্যাং ল সং ২৯১ কার্তিক বদি ১০। পুস্তক লিখন পরিশ্রম বিদ্বজ্জনো নান্য:। সাগর লঙ্ঘনখেদং হনুমানে ক: পর: বেদ।" India govt. MS, folio-117A.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. Radha Krishna Chowdhury : Oinwaras of Mithila : Journal of Bihar Research Society vol. XL. pt 2, 1954. pp. 117 – 20
১৩. ঐ, 1934, pp. 15 – 19
১৪. New Indian Antiquary, vol nos 3 & 4, 1944, P. 50. গণেশচরণ বসু নিম্নলিখিত স্মৃতিগ্রন্থগুলো থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন:
   ক. স্মৃতিতত্ত্ব-রঘুনন্দ রচিত, জীবানন্দ সম্পাদিত : পৃ. ৬, ১৫, ৫৯, ৬৮, ১১৩, ১৩৪, ১৫০, ১৫২, ১৬৫, ১৬৭।
   খ. শুদ্ধি কৌমুদী, গোবিন্দানন্দ, পৃ. ১৬০, ১৬২, ১৭৪, ৩২৫।
   গ. শ্রদ্ধ কৌমুদী (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা) পৃ. ৮৫, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৮০।
   ঘ. বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (ঐ) পৃ. ২০, ২২, ১১১, ২১৬, ২৩৬।
   ঙ দুর্গোৎসববিবেক (শুলপানি ssp) পৃ. ২, ৭, ৮, ১৫, ২১, ২৩ ইত্যাদি।
১৫. Radha Krishna Chowdhury : প্রাগুক্ত
১৬. ঐ পৃ. ১০৬, ১১১
১৭. ক. বিদ্যাপতি শতক পৃ.
   খ. ড. শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড ২য় সং) পৃ. ৭২-৭৩।
   গ. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা
   ঘ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : পৃ. ৪৭। ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্টাংশের তথ্য-নির্দেশ

১. The Early Vaisnava poets of Bengal : Indian Antiquary, Feb, 1873 A.D.
২. বঙ্গদর্শন : জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ সন (১৮০৫ খ্রী.) : বিদ্যাপতি।
৩. On the Age and Country of Vidyapati, Indian Antiquary, Oct. 1875 A.D.
৪. ঐ 1885 & 1899 A.D.
৫. JASB, 1915, p. 422.
৬. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায় : পৃ. ৩৯। জয়কান্তমিশ্র ও রমানাথ ঝা—উভয়ে একসঙ্গে গিয়ে পুথি পরীক্ষা করে ল. সং ৩০৯ পেয়েছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ণিত ল. সং ৩৪৯ এবং উমেশমিশ্র কথিত ল. সং ৩৮৯ গ্রহণীয় নয়। Jayakanta Misra, p. 185 History of Maithili literature :
৭. ক. Raja Kans, Hindu Zamindar, acquiring ascendency in Bengal, oppressing the muslims and instigating, the rebellious sons Devasingh, the Raja of Tirhut, to commit depredations upon the Muslims .... Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur marched against Bengal but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

pursued and captured .... his (Sheo Singh's) father, the dispossessed Raja of Tirhut was restored to power on condition of allegiance and loyalty. (Bengal : Past & Present LXVII 1948.)

খ. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ১৩০৭ সন পৃ. ২৯, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের প্রবন্ধ।

গ. বিমান বিহারী মজুমদার : বিদ্যাপতির পদাবলী : ভূমিকা : পৃ. ।

৮. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : পৃ. ৪৩-৪৫।

৯. ক. Subhadra Jha : Songs of Vidyapati p. 26

খ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ৪২।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ অন্বেষা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশ্রূমাতা
মরহুমা রাবিয়া খাতুন চৌধুরীর
স্নেহের ঋণ স্মরণে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির মুকুরে আমরা

পরিশীলিত ও পরিস্রুত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে উঠে সংস্কৃতিবান মানুষের মন। তার আত্মার লাবণ্য তার আচরণ ও কর্মকে দেয় মাধুর্য। তার কৃতি পরিবেশকে করে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। তার মনের রঙে ও প্রীতির সুবাসে জগৎ-সংসারের মানুষ মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। সংস্কৃতির অপর নাম তাই সৌন্দর্য-অন্বেষা। যা- কিছু কুৎসিত ও অসুন্দর তা দেখা, শোনা, বলা ও করা থেকে বিরত থাকাই সংস্কৃতিবানতা। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্যাণবুদ্ধি সংস্কৃতির পরিবর্ধক।

সংস্কৃতি আবার বিদ্যা, জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা, মনন-শক্তি ও চারিত্রিক প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। তাই একই পরিবারের বা সমাজের কিংবা দেশের লোকের মধ্যেও সংস্কৃতিগত তারতম্য দৃশ্যমান। তাছাড়া সংস্কৃতির জন্ম হয় ব্যক্তিমনে এবং লালন হয় সামাজিক জীবনে। অর্থাৎ একের সৃষ্টি বহুর অনুকরণে ও অনুসরণে দৈশিক ও জাতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য হয়ে উঠে।

সংস্কৃতির উৎসও অনেক। কেননা জীবনচেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এজন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নৈতিক বোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈক্ষিক মান, রাজনীতিক প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি সংস্কৃতির।

www.amarboi.com

যেহেতু মানুষে মানুষে চিন্তা, চেতনা ও প্রয়োজনগত ঐক্য রয়েছে, সেহেতু দুনিয়ার সব মানুষেরই ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং সংস্কৃতিতে যেহেতু প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ও মানবিক প্রয়োজন রয়েছে, অথচ সংস্কৃতি নির্মাণের যোগ্যতা বা প্রতিভা সবার নেই, সেহেতু অপরের অনুকরণে ও অনুসরণেই অর্থাৎ গ্রহণে-বরণেই সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয়। যারা সৃজন করতে পারে না, এবং গ্রহণও করতে জানে না অর্থাৎ যারা বরণ-বিমুখ, আদিম আরণ্য জীবন তারা আজো অতিক্রম করতে পারেনি। সংস্কৃতি হচ্ছে বহতা নদীর স্রোতের মতো—প্রতি মুহূর্তে নতুন। নিত্য নতুনের সাধনাই সংস্কৃতিবানতা। প্রবাহহীন বদ্ধজল যেমন ক্ষয়িষ্ণু ও আবিলযুক্ত, স্থিতিশীল সংস্কৃতিও তেমনি বিকাশ-বিরহী, কুসংস্কার-প্রবণ, রক্ষণশীল, নতুন-ভীরু ও ক্ষয়শীল।

সুন্দর ও কল্যাণকে যে সহজে গ্রহণ করতে পারে সে-ই সংস্কৃতিবান। দেশ ও কালগত জীবন-চেতনা যার সুষ্ঠু সে-ই সংস্কৃতিবান। যে জীবন-চেতনার ও জীবন-প্রতিবেশের বিকাশ ও বিস্তারকামী, যে সমাজবোধকে, নীতিচেতনাকে, ধর্মবুদ্ধিকে এবং আচারনিষ্ঠাকে জীবনের অনুগত করতে জানে, সেই সংস্কৃতিবান।

আমরা বাঙালিরা সৃষ্টি করে ও প্রয়োজনমতো গ্রহণ করেই হয়েছি সংস্কৃতিবান। ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম বাহির থেকেই নিয়েছি। আমাদের শাসন করেছে বিদেশী বিজাতিরা। তাদের থেকেই পেয়েছি প্রশাসনিক ঐতিহ্য। পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবাদিও এসেছে নানা জাতি থেকে, তা সত্ত্বেও আমরা সবকিছু আমাদের মতো করে নিয়েছি। আমরা ধার করেছি বটে, কিন্তু অনুকরণ করিনি। আমরা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং ইসলামকেও আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধ রূপ দিয়েছি। নিজেরা তার রূপান্তর যেমন ঘটিয়েছি, তেমনি নতুন মতবাদেরও সৃষ্টি করেছি। আমাদের বজ্রযানী-সহজযানী, যোগতান্ত্রিক ও থেরবাদী বৌদ্ধমত, আমাদের লৌকিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, আমাদের স্বসৃষ্ট দেবতা, অপদেবতা ও উপদেবতা, আমাদের নব স্মৃতি, নব ন্যায়, নব বৈষ্ণববাদ, সহজিয়া-বাউলমত, পীরবাদ, ব্রাহ্মমত, ওহাবী-ফরায়েজী-মুহম্মদী মত আমাদের দেশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের প্রয়োজন ও যুগ-জীবন চেতনার সাক্ষ্য। আমরা এ জীবনকে, এ জগৎকে সত্য বলে জেনেছি, প্রিয় করে নিয়েছি। তাই এই জীবনের প্রয়োজনকেই মেনেছি। এবং জীবনের অনুগত করে তুলেছি সবকিছুকে। আমাদের ধর্ম, আমাদের নীতিবোধ, আমাদের আচার-আচরণ আমাদের বিকাশকামী চেতনর রঙে রূপান্তর লাভ করেছে। আমরা জীবনকে চালু আচারের ও বাঁধা নীতির দাস করিনি। রীতি ও নীতিকে চলিষ্ণু জীবনের সহায়ক সহচর করতে চেয়েছি। চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা চিরকালই বন্ধন ভীরু বিহঙ্গ। আচারের ক্ষেত্রে অনুগত উদাসীন। তাই ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা নতুনের পিয়াসী ও স্রষ্টা। আচারের ক্ষেত্রে সাহসিক নিরীক্ষাপ্রবণ।

আগেই বলেছি, অনেক ব্যাপারেই মানুষে মানুষে দেশ-কালহীন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থাকে। কেননা মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন মূলত অভিন্ন। তা সত্ত্বেও কোনো দু'টো মানুষের সাংস্কৃতিক মান সমান নয়। কারণ কোনো দুটো মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, কল্যাণবোধ ও আর্থিক অবস্থা অভিন্ন নয়। এ অনেকটা ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিভাস।

তাই ধর্মমতের অভিন্নতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতিই থাকত। কেবল ভাষাই যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হত, তাহলে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমানির্ভর হত, তাহলে ভৌগোলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এতদিনে সারাবিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত।

অতএব দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ামকও নয়। সবকিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে, সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশ-কালের উপযোগী হয়েছে।

এজন্যেই কোনো দেশের, সমাজের বা জাতির সংস্কৃতিকে ধর্মের বাঁধনে, সমাজের শাসনে, নীতির নিগড়ে, কালের পরিসরে, দেশের সীমায় বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে অথবা গোত্র বা জাতি-চেতনার অনুগত করে রাখা চলে না।

যে-কোনো মানুষের সংস্কৃতিতে কিছু ধর্মীয় আচারের রঙ, কিছু দেশের জলবায়ুর প্রভাব, কিছু ভাষার রস, কিছু প্রয়োজনের রেশ, কিছু শিক্ষার ফল, কিছু সম্পদের ছাপ, কিছু জ্ঞানের লাবণ্য, কিছু বিদ্যার দান, কিছু হৃদয়বৃত্তির প্রসূন, কিছু মননের মসৃণতা, কিছু প্রজ্ঞার দীপ্তি, কিছু মানবিকতার মাধুর্য, কিছু কল্যাণ-চিন্তার স্নিগ্ধতা থাকেই। সবকিছুর সমন্বয়ে সংস্কৃতি মানুষকে সৃজন করে। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। সুজন মাত্রেই মনুষ্যত্বসম্পন্ন। কাজেই সৌজন্যের অপর নাম পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। অতএব সংস্কৃতি মানবতারই নামান্তর। একজন মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষই কেবল সুজন ও সুনাগরিক হতে পারে। এমন মানুষ অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণের শত্রু। একজন জীবনসচেতন সত্যসন্ধ সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ তার মানবিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলা করে না।

এমন সৌজন্য, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি যে-দেশের অধিকাংশ মানুষে সুলভ, সে-দেশের মানুষ সামগ্রিক পরিচয়ে তাই সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত হয়। এ অর্থে সংস্কৃতি জীবনবোধের ও জীবনাদর্শের বা জীবননীতির পরিমাপকও। বলেছি, বিশ্ব-মানবের মধ্যে বৈচিত্র্যে ঐক্য এবং ঐক্যে বৈচিত্র্যই সংস্কৃতির সাধারণ লক্ষণ।

আমরা বাঙালিরা অন্তত দু-হাজার বছরের পুরোনো সংস্কৃতিবান জাতি। মানবিক ঐতিহ্য আমরা একদিকে যেমন দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এক কথায় আমরা সামান্য ও স্বকীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে, আমরা পরধর্ম গ্রহণ করেও তাকে নিজের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র করে নিয়েছি বারবার। আমরা ধার করেছি কিন্তু অনুকরণ করিনি। বীজ নিয়েছি অন্যের থেকে, কিন্তু স্বকীয় চেতনার, মননের ও আদর্শের পরিচর্যায় আমরা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের মতো ফল ফলিয়েছি। ধর্মে, দর্শনে, ন্যায়ে, আচারে ও চিন্তায় আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছি। সুন্দরের অনুধ্যান ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, মানবতাকেই মানবধর্ম বলে স্বীকার করেছি। লোকহিতের অঙ্গীকারে জীবনপ্রয়াস নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছি। স্বদেশকে, স্বভাষাকে, স্বজাতিকে ও স্বরাষ্ট্রকে ভালোবাসতে শিখেছি। যুদ্ধকে, বিসম্বাদকে, উৎপীড়নকে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করতে জেনেছি। বিশ্বের পীড়িত-শোষিত মানুষের কান্নায় বিচলিত হয়ে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছি। মনুষ্যত্ব অর্জনে নিষ্ঠা, জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস, মানববাদের জয় কামনা, শান্তির সাধনা, আমাদের সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল ও কালানুগ করেছে। আবার আমাদের ভাষার স্বাতন্ত্র্য, অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রার আঞ্চলিক প্রভাব, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার অসমতা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস আমাদের সংস্কৃতিকে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

অতএব সংস্কৃতিতে রয়েছে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব। সংস্কৃতি একাধারে যেমন দেশ-কাল- জাত ধর্ম-নিরপেক্ষ [কেননা, সৌন্দর্যে, কল্যাণে ও মানবতায় দেশ-কাল-জাত-ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত নয়], তেমনি দৈশিক-কালিক-জাতিক, ধার্মিক ও বৈষয়িক আভরণও থাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংস্কৃতিতে লগ্ন। কেননা মানুষের প্রয়াস দেশগত ও প্রয়োজনগত চেতনার অনুগত। কাজেই মানুষের সংস্কৃতি একই লক্ষ্যে অনুশীলিত বলেই তা যেমন সর্বমানবিক; আবার দেশ, কাল ও প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকার করে বলে তা তেমনি ব্যক্তিক, সামাজিক, আঞ্চলিক আর ধার্মিকও বটে। সংস্কৃতিতে আমরা তাই বহুতে একের সংহতি, এককে বহুর বিকাশ লক্ষ্য করি।

পুনরুক্তি দোষ ঘটছে জেনেও বলছি—সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূন, বীজ ও ফল। কেননা মনুষ্যত্বই মানুষের সৌন্দর্য-অন্বেষা, কল্যাণ-বুদ্ধি ও মানবপ্রীতি জাগায়। আর কে অস্বীকার করবে যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কল্যাণকামিতা ও মানবপ্রীতিই সংস্কৃতিবানতার শেষ লক্ষ্য?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির সংস্কৃতি

অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্য প্রাণী প্রকৃতির অনুগত জীবন ধারণ করে আর মানুষ নিজের জীবন রচনা করে। প্রকৃতিকে জয় করে, বশীভূত করে প্রকৃতির প্রভু হয়ে সে কৃত্রিম জীবন যাপন করে— এ-ই তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অতএব, এইভাবে জীবন রচনা করার নৈপুণ্যই সংস্কৃতি। স্বল্প কথায় সুন্দর ও সামগ্রিক জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। চলনে-বলনে, মনে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচারে-আচরণে অনবরত সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিবানতা। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি অসুন্দর, অকল্যাণ ও অপ্রেমের অরি। সুরুচি ও সৌজন্যেই তাই সংস্কৃতিবানতার প্রকাশ। সংস্কৃতিবান মানুষ কখনও জ্ঞাতসারে অন্যায় করে না, অল্যাণকর কিছুকে প্রশ্রয় দেয় না, অপ্রীতিতে বেদনাবোধ করে এবং কৌৎসিত্যকে সহ্য করে না। অন্য কথায়, যেখানে কথার শেষ সেখানেই সুরের আরম্ভ, যেখানে Photography-র শেষ সেখান থেকেই শিল্পের শুরু, নক্সার ঊর্ধ্বেই সাহিত্যের স্থিতি, তেমনি যেখানে স্থূল জৈব প্রয়োজনের শেষ, সেখান থেকেই সংস্কৃতির শুরু। সংস্কৃতিবান মানুষ জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়, অভিজ্ঞতায় ও প্রয়োজনবোধে চালিত হয়ে অনবরত জীবনকে রচনা করতে থাকে এবং পরিবেশকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করবার প্রয়াসী হয়। এজন্যে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেই কেবল নিজের প্রতি নয়, প্রতিবেশীর প্রতিও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে। এবং সচেতনভাবে ও সযত্নে নিজেকে সুন্দর করে, সৃষ্টি করে এবং নিজের আচারে-আচরণে, মনে-মননে, কথায়-কাজে অপরের পক্ষে স্মরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও আকর্ষণীয় লাবণ্য ছড়িয়ে তৈরি করে প্রতিবেশীদের সুষ্ঠু জীবনের ভিত্।

বীজের আত্মবিকাশের জন্যে যেমন কর্ষিত ক্ষেত্র প্রয়োজন, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের জন্যেও তেমনি সুকর্ষিত মনোভূমি তথা পরিস্রুত চেতনা আবশ্যক। তাই সংস্কৃতির স্রষ্টামাত্রেই বিজ্ঞ ও বিবেকবান, সুন্দরের ধ্যানী ও আনন্দের অন্বেষ্টা, বুদ্ধি ও বৃদ্ধির সাধক,মঙ্গল ও মমতার বাণীবাহক এবং প্রীতি ও প্রফুল্লতার উদ্ভাবক।

চরিত্রবল, মুক্তবুদ্ধি ও উদারতার ঐশ্বর্যই এমন মানুষে সম্বল ও সম্পদ। বেদনা-মুক্তি ও আনন্দ-অন্বেষাই মানুষের জীবনসত্য। এক্ষেত্রে সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। আর এই সৌন্দর্য-অন্বেষা ও কল্যাণকামিতাই সংস্কৃতি।

মানুষের জীবনে সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা পাশাপাশি চলে, বলা যায় একটি অপরটির সহচর। কিন্তু এগুলো যখন আনুপাতিক ভারসাম্য হারায়, তখন সুখ কিংবা দুঃখ বাড়ে। সুখ বৃদ্ধি পেল তো ভালই, কিন্তু সমস্যা ও যন্ত্রণার চাপে যখন জীবন-জ্বালা আত্যন্তিক হয়ে উঠে, তখনই বিচলিত-বিপর্যস্ত মানুষ স্বস্তি কামনায় সমাধান খোঁজে। এ সমাধান দিতে পারেন এবং দেনও কেবল সংস্কৃতিবান মানুষই।

মানুষ মাত্রেই সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে সংস্কৃতিকামী। কিন্তু সাধনার মাত্রা ও পথ-পদ্ধতি সবার এক রকম নয়। তাই সংস্কৃতিতে আসে গৌত্রিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, আর্থিক ও আত্মিক বৈষম্য ও বিভিন্নতা। এবং স্তরভেদে তা হয় নিন্দনীয় কিংবা বন্দনীয়, অনুকরণীয় কিংবা পরিহার্য।

আগের কথা জানিনে, কিন্তু ইতিহাসান্তর্গত যুগে দেখতে পাই বাঙালি মনোভূমি কর্ষণ করেছে সযত্নে। এবং এই কর্ষিত ভূমে মানবিক সমস্যার বীজ বপন করে সমাধানের ফল ও ফসল পেতে হয়েছে উৎসুক। এই এলাকায় বাঙালি অনন্য। এ যেন তার নিজের এলাকা, সে এই মাটিকে ভালবেসেছে, সে এ জীবনকে সত্য বলে জেনেছে। তাই সে দেহতাত্ত্বিক, তাই সে প্রাণবাদী, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যোগী ও অমরত্বের পিপাসু। এজন্যেই নির্বাণবাদী বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেও সে কায়া সাধনায় নিষ্ঠ। তার কাছে এ মর্ত্যজীবনই সত্য, পারত্রিক জীবন মায়া। মর্ত্যজীবনের মাধুর্যে সে আকুল, তাই সে মর্ত্যে অমৃতসন্ধানী। সে বিদ্রোহী, সে বলে :

কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জেঁ
কিংতো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিংতো তিথ-তপোবন জাই
মোখ্‌ক কী লবভই পানী হ্নাই।

—কী হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কী হবে তোর, তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কী দেবে? পানিতে স্নান করলেই কী মুক্তি মেলে?

অনেককাল পরে এই ধারারই সাধক বাউলের মুখে শুনতে পাই :

সখিগো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সনে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্বসার।
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

জীবনবাদী বাঙালি তাই বৌদ্ধ হয়েও মর্ত্যের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার বাঞ্ছায় অসংখ্য উপ ও অপদেবতার সৃষ্টি ও পূজা করেছে। সাংখ্যকেই সে তার দর্শনরূপে এবং যোগকেই তার সাধনপদ্ধতি রূপে গ্রহণ করেছে। তন্ত্রকেই সার বলে মেনেছে, দেহে-মনে আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই জীবনকাঠি বলে জেনেছে। আর যোগ-তান্ত্রিক কায়া সাধনার মাধ্যমে সে কামনা করেছে দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব। এ জীবনকে সে প্রত্যক্ষ করেছে চলচঞ্চল ও তরঙ্গভঙ্গে লীলাময় মন-পবনের নৌকারূপে। বৌদ্ধ যুগে তার সাধনা ছিল নির্বাণের নয়—বাঁচার, কেবল মাটি আঁকড়ে বাঁচার। মন-ভুলানো ভুবনের বনে বনে, ছায়ায় ছায়ায়, জলে-ডাঙায় ভালবেসে, প্রীতি পেয়ে মমতার মধুর অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকার আকুলতাই প্রকাশ করেছে সে জীবনব্যাপী। হরগৌরীর মহাজ্ঞান, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা-কানুফা, ময়নামতী-গোপীচাঁদ প্রভৃতির কাহিনীর মধ্যে আমরা এ তত্ত্বই পাই। অবশ্য এ বাঁচা স্থূল ও জৈবিক ভোগের মধ্যে নয়, —ত্যাগের মধ্যে সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সহজ মানসোপভোগের মধ্যে বাঁচা। কিন্তু এই জীবন-সত্যে সে কী নিঃসংশয় ছিল?—মনে হয় না। তাই বিলুপ্ত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতে তার দ্বিধা ও মানস-দ্বন্দ্বের আভাস পাই। পাল আমলের গীতে মনে হয়, সে মধ্যপন্থা (golden mean) অবলম্বন করেছে। যোগেও নয়, ভোগেও নয়, মর্ত্যকে ভালবেসে দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই যেন সে বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে। তার সেই জানা-বোঝার সাধনায় আজও ছেদ পড়েনি। বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক, বৈষ্ণব বৈরাগীরা তাই ঘর করে, আর ফকিরেরা বাঁধে ঘর।

সেন আমলে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধসমাজ বর্ণে বিন্যস্ত হয়ে বল্লালসেনের নেতৃত্বে উগ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলে। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। গীতা-স্মৃতি-উপনিষদের মত সে মুখে গ্রহণ করলেও মনে মানেনি। তার ঠোঁটের স্বীকৃতি বুকের বাণী হয়ে উঠেনি। কেননা সে ধার করে বটে, কিন্তু জীবনের অনুকূল না হলে অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে না। তাই সে তার প্রয়োজনমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রতীক দেবতা সৃষ্টি করে পূজা করেছে, আশ্বস্ত হতে চেয়েছ ঘরোয়া ও মানস জীবনে। তার মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি তার স্বসৃষ্ট দেবতা। জীবনের সামাজিক সমস্যার সমাধানে ও অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ সাধনে সে আরো এগিয়ে এসেছে। জীমূতবাহন ও বল্লালসেন, রঘুনাথ, রামনাথ প্রভৃতির স্মৃতি ও ন্যায় দৈবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চাননের মেল-পটি প্রভৃতি গোত্র ও বর্ণবিন্যাস প্রয়াস, চৈতন্যের ভগবৎপ্রেম ও মানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রীতিবাদ বাঙালি জীবনে রেনেসাঁস আনে। এবং তার প্রসাদে আপামর বাঙালির দেহ-মন-আত্মা গ্লানিমুক্ত হয়। এ নতুন কিছু ছিল না, গৌতমের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্বের ঐতিহ্যে সূফীমতের প্রভাবেই মানব-মহিমা বাঙালি চিত্তে নতুন মূল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়। বাঙালি নতুন করে 'জীবে ব্রহ্ম' এবং 'নরে নারায়ণ' দর্শন করে। তখন বাঙালির মুখে উচ্চারিত হয় মানুষের মর্যাদা ও মনুষ্যত্বের মহিমা "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"—মানবিক সম্ভাবনার এ স্বীকৃতি সেদিন জীবন-বিকাশের নিঃসীম দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তাই বাঙালির কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম চরম সত্য ও পরম কাম্য বাণী—"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বাঙালি এই ঐতিহ্য আজও হারায়নি। আজো হাটে-ঘাটে-প্রান্তরে বাউলকণ্ঠে সেই বাণী শুনতে পাই। মানববাদী বাউলেরা আজো উদাত্তকণ্ঠে মানুষকে মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়, আজো তারা মানবতার শ্রেষ্ঠ সাধক ও চিন্তানায়কের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সাম্য, সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির বাণী শোনায়। তারা বলে :

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

কাজেই কাকেই বা দূরে ঠেলবি আর কাকেই বা কাছে টানবি! তোরা তো ভাই ফুল কুড়োতে কেবল ভুলই কুড়োচ্ছিস। কৃত্রিম বাছ-বিচারের ধাঁধায় কেবল নিজেকেই ঠকাচ্ছিস। গোত্রীয়, ধর্মীয় ও দেশীয় চেতনা বিভেদের প্রাচীরই কেবল তৈরি করেছে— বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি করেছে, হানাহানির প্রেরণাই কেবল দিয়েছে, তাই বাউল বলেন :

যদি 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কী করে?'

একালের ইংরেজি শিক্ষিত কবি যখন বলেন :

"সবারে তুই বাসরে ভাল, নইলে তোর মনের কালি ঘুচবে না রে।"

কিংবা — 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা'

অথবা, — 'গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান;

তখন তা আমাদের কাছে নতুন ঠেকে না। কেননা প্রকৃত বাঙালির অন্তরের বাণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখেছি আমরা কত কত কাল আগে।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে এখানে শরীয়তী ইসলামও তেমন আমল পায়নি। একপ্রকার লৌকিক তথা দেশজ ইসলামই লোকের অবলম্বন হয়েছিল। তখন পার্থিব জীবনের স্বস্তির ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য কল্পিত হয়েছিলেন দেব-প্রতিম পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্ আর শিরনী পেয়েছেন দেশের সেনানী-শাসক জাফর-ইসমাইল-খান জাহান-গাজীরা এবং বিদেশাগত বদর-আলম-জালাল-সুলতান প্রভৃতি সুফীরা, তার পরেও প্রয়োজন হয়েছিল সত্যপীর-খিজির-বড়খাঁ-গাজী-কালু-বনবিবি-ওলাবিবি প্রভৃতি দেবকল্প কাল্পনিক পীরের। এঁরা বাঙালির ঐহিক জীবনের নিয়ন্তা দেবতা। জীবনবাদী বাঙালি এঁদের উপর ভরসা করেই সংসার-সমুদ্রে ভাসাত জীবন-নৌকা। এখানেই শেষ নয়। চিন্তাজগতে বাঙালি চিরবিদ্রোহী। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম ধর্ম সে নিজের মতো করে গড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে যুগে যুগে সে চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাহ্যত সে ভাববাদী হলেও, উপযোগ-তত্ত্বেই তার আস্থা ও আগ্রহ অধিক।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযান, থেরবাদ, অবলোকিতেশ্বর ও তারা দেবতার প্রতিষ্ঠা এবং যোগতান্ত্রিক সাধনায় বিকাশ সাধন করে সে তার স্বকীয়তার, সৃষ্টিশীলতার, মনন বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ব্রাহ্মণ্যযুগে জীমূতবাহন, বল্লালসেন, রামনাথ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি নবস্মৃতি ও নবন্যায় সৃষ্টি করে তাঁদের চিন্তার ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞার প্রভায় জ্ঞানলোক সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করেছেন।

মুসলিম আমলে চৈতন্যদেবের নবপ্রেমবাদ, সত্যপীর-কেন্দ্রী নবপীরবাদ, চাঁদ সদাগরের আত্মসম্মানবোধ ও তেজস্বিতা, বেহুলার বিদ্রোহ ও কৃচ্ছ্র-সাধনা, গীতিকায় পরিব্যক্ত জীবনবাদ আমাদের সাংস্কৃতিক অনন্যতা ও বিশিষ্ট জীবনচেতনার সাক্ষ্য।

তারপরেও কী আমরা থেমেছি! রামমোহনের ব্রাহ্মমত, বিদ্যাসাগরের শ্রেয়োবোধ, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ, রবীন্দ্রনাথের মানবতা, নজরুল ইসলামের মানববাদ কী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে দেয়নি?

মনীষা ও দর্শনের জগতে বাঙালি মীননাথ, কানপা, তিলপা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, জীমূতবাহন, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামনাথ,চৈতন্যদেব, রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথাদি গোস্বামী, সৈয়দ সুলতান, আলাউল, হাজী মুহম্মদ, আলিরজা, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস-কাশীদাস-রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন, তীতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্-দুদুমিয়া, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রমথ-নজরুল নির্মাণ করেছেন বাঙালি মনীষার ও সংস্কৃতির গৌরব মিনার। এঁদের কেউ বলেছেন ঘরের ও ঘাটের কথা, কেউ জানিয়েছেন জগৎ ও জীবন-রহস্য ; কারো মুখে শুনেছি প্রেম, সাম্য ও করুণার বাণী ; কারো কাছে পেয়েছি মুক্তবুদ্ধি ও উদারতায় দীক্ষা ; কেউবা শিখিয়েছেন ঘর বাঁধা ও ঘর রাখার কৌশল, কেউ শুনিয়েছেন ভোগের বাণী, কেউ জানিয়েছেন ত্যাগের মহিমা, আবার কেউ দেখিয়েছেন মধ্যপন্থার ঔজ্জ্বল্য। আত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, পারমার্থিক সব চিন্তা, সব মন্ত্রই আমরা নানাভাবে পেয়েছি এঁদের কাছে।

বাঙালির বীর্য হানাহানির জন্যে নয়, তার প্রয়াস ও লক্ষ্য নিজের মতো করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার। স্বকীয় বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে তত্ত্ব ও তথ্যকে, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের জীবনের ও জীবিকার অনুকূল ও উপযোগী করে গড়ে তোলার সাধনাতেই বাঙালি চিরকাল নিষ্ঠ ও নিরত। এই জন্যেই রাজনীতির তত্ত্বের (Theory) দিকটিই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি—বাস্তব-প্রয়োজনে সে অবহেলাপরায়ণ; কেননা তাতে বাহুবল, ক্রূরতা ও হিংস্রতা প্রয়োজন। এজন্যেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বাঙালির মানস-সন্তান হলেও নেতৃত্ব থাকেনি বাঙালির। বিদেশাগত ভূঁইয়াদের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জানমাল উৎসর্গ করতে বাঙালিরা দ্বিধা করেনি বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা কিংবা সম্পদ কামনা করেনি। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে সে অনন্য। নতুন কিছু করার আগ্রহ ও যোগ্যতা তার চিরকালের। প্রজারা যেদিন 'গোপাল'কে রাজা নির্বাচিত করেছিল, ইতিহাসের এলাকায় সেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হল। সেদিন এ বিস্ময়কর পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কেবল বাঙালির পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ওহাবী, ফরায়েজী ও সশস্ত্র বিপ্লবকালে বাঙালির বল ও বীর্য, ত্যাগ ও অধ্যবসায় বাঙালির গৌরবের বিষয়।

স্বাতন্ত্র্য আসে উৎকর্ষে, অনন্যতায় ও অনুপমতায়—বৈপরীত্যে ও বিভিন্নতায় নয়। বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও তার উৎকর্ষে, নতুনত্বে ও অনন্যতায়। আমাদের দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙালি লেখাপড়া করে কেবল হিন্দু হয়েছে কিংবা মুসলমান হয়েছে, বাঙালি হতে চায়নি। হিন্দুরা ছিল আর্য-গৌরবের ও রাজপুত-মারাঠা বীর্যের মহিমায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত এবং মুসলমান ছিল দূর অতীতের আরব-ইরানের কৃতিত্ব-স্বপ্নে বিভোর। এরা স্বাদেশিক স্বাজাত্য ভুলেছিল, বিদেশীর জ্ঞাতিত্ব গৌরবে ছিল তৃপ্তমন্য। এদের কেউ স্বস্থ ও সুস্থ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তাই বাঙলা সাহিত্যে আমরা কেবল হিন্দু কিংবা মুসলমানই দেখেছি। বাঙালি দেখেছি কচিৎ। এজন্যেই আমাদের সংস্কৃতি আশানুরূপ বিস্তার ও বিকাশ পায়নি। আজ বাঙালি পায়ের তলার মাটির সন্ধান নিচ্ছে। এই মাটিকে সে আপনার করে নিচ্ছে। এর মানুষকে ভাই বলে জেনেছে। আজ আর কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে সে চলে না। স্বদেশের ও স্বভাষার নামে পরিচিত হতে সে উৎসুক। দুর্যোগের তমসা অপগতপ্রায় —প্রভাত হতে দেরী নেই —সামনে নতুন দিন, নতুন জীবন । নিজেকে যে চেনে, অন্যকে জানা-বোঝা তার পক্ষে সহজ। আজ বাঙালি আত্মস্থ হয়েছে। তার আত্ম-জিজ্ঞাসা হয়েছে প্রখর, সংহতি কামনা হয়েছে প্রবল। শিক্ষিত তরুণ বাঙালি জেগেছে, তাই সে তার ঘরের লোককে জাগাবার ব্রত গ্রহণ করেছে। বলছে —"বাঙালি জাগো"। জাগ্রত মানুষই সংস্কৃতি চর্চা করে। এবার স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ বাঙালি জাগবে ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবে। জীবনে ও জগতে সে নতুনকে করবে আবাহন এবং নতুন ও ঋদ্ধ চেতনায় হবে প্রতিষ্ঠিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ও বাঙালি

মা জন্ম দেয়, মাটি লালন করে।

তাই দেশের মাটিকে মায়ের মতোই ভালবাসতে হয়। এক সময় মায়ের প্রয়োজন ফুরায়। কিন্তু মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মানুষের জীবন একাকিত্বে সম্ভব নয়, তাই পরিজন-প্রতিবেশী নিয়েই যাপন করতে হয় তার জীবন। এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মিলনে, সহযোগিতায় ও বিরোধেই তার জীবনের বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব। অতএব চেতনার গভীরে দেশের মাটি ও মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা।

দেশের মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা থাকলেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও হয় সহজ। কেননা জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই কেবল স্বদেশের মাটির জল ও বায়ু, দোষ ও গুণ এবং স্বদেশী মানুষের মন ও মেজাজ, যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সম্পদ, ভয় ও ভরসার কথা জানা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে[১] লেখক বাঙালির কাছে বাঙলা ও বাঙালির অতীত পরিচয় তুলে ধরবার মহৎ প্রয়াসে নিরত। এ গ্রন্থ পণ্ডিতদের জন্যে নয়, লেখাপড়া-জানা আত্ম-জিজ্ঞাসু বাঙালির জন্যে। এই দেশের ও মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা-দোষ ও গুণ, ভয় ও ভরসা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বন্দ্ব ও মিলন, আশা ও নৈরাশ্য, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগ্লানি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরতি, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সংগ্রাম ও পরবশ্যতা প্রভৃতির ইতিকথাই স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের তথা স্বরূপের অভিজ্ঞান।

বাঙলার রাঢ়-বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাঙলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সেখান থেকেই নানা পথ ঘুরে আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক-মোঙ্গল। এরাই অস্টিক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুন, কুশান, গ্রীক, মোঙ্গল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের গায়ে আর্য-রক্ত সামান্য, নিগ্রো-রক্ত কম নয়, তবে বেশি আছে দ্রাবিড় ও মোঙ্গল রক্ত, অর্থাৎ আমাদেরই নিকট-জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, তিব্বতী, কাছাড়ী, অহোম প্রভৃতি।

এদেশে যারা বাস করত তারা ছিল আধা বর্বর। এদের নিকট-জ্ঞাতি নেপালী-বিহারীরা বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজ বরণ করে। কিন্তু পীড়ন-শোষণ অসহ্য হওয়ায় যাদের দোহাই কেড়ে নির্যাতন চালানো হত, সেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে উঠে তারা। যুগে যুগে নেতৃত্ব দেন আজীবক, তীর্থঙ্কর ও বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যাত বহু নেতা। অবশেষে দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে পীড়নমুক্ত হল তারা।

এই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই বাঙালিরা উত্তর ভারতীয় আর্য-ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, সমাজ ও নীতি বরণ করে সভ্য হয়ে উঠে। তাই কিছু প্রাচীন শব্দ, কিছু বাক্-রীতি, কিছু আচার-সংস্কার ছাড়া বাঙালির বহিরাঙ্গিক অন্য স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য।

এভাবে যুগে যুগে বাঙালির ধর্ম, সমাজনীতি, পোশাক, প্রশাসনিক বিধি প্রভৃতি আচারিক ও আদর্শিক জীবনের প্রায় সবকিছুই এসেছে বিদেশী, বিজাতি ও বিভাষী থেকে।

---

১ এই প্রবন্ধ অজয় রায়ের 'বাঙলা ও বাঙালি' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু বাঙালির চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনো অবলুপ্ত হয়নি এবং তা একাধারে লজ্জার ও গৌরবের।

বাঙালি চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দিন ছাড়া বাঙলার কোনো শাসকই বাঙালি ছিলেন না। এটি নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙালি চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর গূঢ় কারণ।

যে ভোগেচ্ছু অথচ কর্মকুণ্ঠ, তার জীবিকার্জনের দুটো পথ—ভিক্ষা ও চৌর্য। বাঙালির এই কাঙালপনার পরিচয় রয়েছে তার স্বসৃষ্ট উপদেবতা-অপদেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-কবচ-মাদুলীপ্রীতিতে। আপাতসুখ ও আত্মরতি তাকে করেছে স্বার্থপর, ধূর্ত ও লোভী। তাই সে যৌথকর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালির স্থায়ী কলঙ্কের কথা।

কিন্তু তার গৌরব-গর্বের বিষয়ও কম নেই। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়-বেদ্য না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। সে পুজো করেছে তার স্বসৃষ্ট উপ ও অপ-দেবতার। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় মতবাদ ও আচার-আচরণ বিধি। বৌদ্ধ যুগে বাঙালির কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান; ব্রাহ্মণ্য সমাজে বাঙালির লৌকিক দেবতা-নিষ্ঠা, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, চৈতন্যের প্রেমবাদ; মুসলিম সমাজে সত্যপীরবাদ, যৌগিক-সূফী তত্ত্ব, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মমত তার সাক্ষ্য।

এভাবে দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতাপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও সঙ্ঘ-শক্তির সাক্ষ্য নগণ্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্ত্যপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে,সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সমধর্মিতার বন্ধনকে।

যখন সে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তখনো কৌমচেতনা ছিল প্রবল এবং সম্ভবত বৌদ্ধ-মৌর্য শাসনেও তার বিচলন ঘটেনি। ব্রাহ্মণ্যগুপ্ত শাসনেই বৃত্তিগত বিভাগ বর্ণবিভাগে বিকৃত হয়। কেননা সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং বৌদ্ধ পাল আমলের প্রথম যুগে এ চেতনা ম্লান হলেও শেষের দিকে শঙ্করাচার্যের নব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীর বাহুল্যে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ দ্রুত অপসৃত হয়ে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠতে থাকে আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে তা পূর্ণতা লাভ করে। এজন্যেই বাঙালির বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। মোটামুটি ভাবে দশ থেকে ষোলো শতক অবধি মেল ও পটি বন্ধনের কাজ চলে। বল্লাল চরিত, দৈবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চানন ঘটক ও জাতিমালা কাছারি তার সাক্ষ্য। এমনি করে নির্বর্ণ বৌদ্ধ সমাজ থেকে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজ গড়ে উঠে। ফলে এখানকার হিন্দু-মুসলমান—কারো জাত-বর্ণ পরিচয় সন্দেহাতীতরূপে যথার্থ নয়। বিশেষ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো-মোঙ্গল কারো মধ্যেই যখন বর্ণবিভাগ ছিল না, তখন এ যে আরোপিত ও অর্বাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীনকালে এখানে লোকসংখ্যা ছিল কম, গোত্রে বিভক্ত কৌমের নিবাস ছিল অঞ্চলে সীমিত। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষার পরেই তারা গৌত্রিক গ্রাম থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাদেশিকতা নিতান্ত আধুনিক চেতনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাষিক ঐক্যের ফলে তারা স্থানিক ঐক্য লাভ করেছিল বটে; কিন্তু দেশগত জীবন-চেতনা ছিল অনুপস্থিত। তাই বাঙালি হিন্দু ছিল উত্তর ভারতীয় আর্য-গৌরবে এবং রাজপুত-মারাঠার ঐতিহ্যগর্বে স্ফীত। আর মুসলমান ছিল আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্ব মোহে ও গৌরবে অভিভূত। ইদানীং-পূর্ব যুগে কেউ সুস্থ ও স্বস্থ ছিল না। স্বদেশে প্রবাসী এই বাঙালির রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার ও স্বাদেশিক কর্তব্যবুদ্ধির বিরলতার কারণ এই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে : মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালি কী স্বাধীন ছিল – সুখী ছিল? স্বাধীন পাল কিংবা সুলতানী আমল কী বাঙালিরও স্বাধীনতার যুগ? বারোভূইয়ার বিদ্রোহ ও বীরত্ব কী স্বাধীনতাকামী বাঙালিরও সংগ্রাম ও ত্যাগের ঐতিহ্য? জাতীয়তার ভিত্তি হবে কী–গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, দেশ কিংবা রাষ্ট্র?

বাঙলাদেশ ক্বচিৎ একচ্ছত্র শাসনে ছিল। তাই বাঙলা দেশান্তর্গত সব ঐতিহ্যে সর্ব বাঙালির অধিকার ছিল না। আঞ্চলিক মন, মনন ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ আঞ্চলিকতা বিস্ময়করভাবে সুপ্রকট। যেমন ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে, মনসামঙ্গল হয়েছে পূর্ববঙ্গে, বৈষ্ণব সাহিত্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; বাউল প্রভাব পড়েছে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে। সত্য-পীর বা সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী উপদেবতার প্রভাব-প্রসার ক্ষেত্র হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ। গীতিকা হয়েছে ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে, মুসলিম রচিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামে। গাজান, গম্ভীরা, বৈষ্ণবগীতি, বাউলগান, ভাবাইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতিরও স্থানিক বিকাশ লক্ষণীয়।

দারু, কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাই মসলিন ও শঙ্খশিল্প, সিলেটী গজদন্ত ও বেতশিল্প, নদীয়ার পাট-শিল্প, রাজশাহী-মালদাহ-মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প, পাবনা-টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ ও দারু-শিল্প স্মতব্য।

বাঙালির লজ্জা ও গৌরবের কিছু ইঙ্গিত দিলাম। কিন্তু বাঙালি যেখানে স্বকীয় মহিমায় সমুন্নত, যেখানে সে অতুল্য এবং প্রাচ্যদেশে প্রায় অজেয়, তা বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালির অবদান। তার সাহিত্য ও তার দর্শন তার গৌরবের ও গর্বের এবং অপরের ঈর্ষার বস্তু।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালির সুচির কালের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং তাঁর প্রয়াস অনেকাংশে সফল ও সার্থক হয়েছে বলেই মেনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আজো প্রায় অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। কাজেই প্রমাণে-অনুমানে রচিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের ভিত। এই গ্রন্থের লেখক অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও অনুমিত তথ্য ও তত্ত্বের স্বাধীন প্রয়োগে রচনা করেছেন এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমে উৎসুক ও জিজ্ঞাসু বাঙালির আত্মদর্শন হবে। এটি গ্রন্থকারেরও সম্ভবত লক্ষ্য। এ গ্রন্থের অনেক গুণ—ভাষা স্বচ্ছ ও সচল, ভঙ্গি প্রাঞ্জল, বক্তব্য সুস্পষ্ট। কিন্তু স্থানে স্থানে অসতর্কতার ছাপ রয়েছে, তথ্যের ভুলও কিছু আছে। সামান্যীকৃত (generalised) সিদ্ধান্তপ্রবণতা কম হলেই ভালো হত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর তমোনাশ দাসগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর আবদুর রহিম, ডক্টর মোমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ রচিত সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলো বাঙলা ও বাঙালির কালিক ইতিহাস। আর শ্রীঅজয় রায়ের বইটি সাধারণের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলো পাঠে এই গ্রন্থে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণতা পাবে। সুচির বাঙালির জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এমনি আলোচনা গ্রন্থ আরো আরো কামনা করি। এমনি আত্ম-পরিচিতিমূলক গ্রন্থে বাঙালির আজ বড় প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে পথিকৃৎ শ্রীঅজয় রায়কে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানেই বক্তব্যের শেষ করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের ধারায় বাঙালি

১

আমাদের দেশের নাম বাঙলা দেশ, তাই ভাষার নাম বাঙলা এবং তাই আমরা বাঙালি। আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্য-ধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই ; আরবি, ইরানী কিংবা তুর্কিস্তানীও আমরা নই। আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য।

২

আমরা আগে ছিলাম animist,পরে হলাম Pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান। আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি,ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজের মতো করে রচনা করবার জন্যেই। তার প্রমাণ নির্বাণকামী ও নৈরাত্ম্য-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল, তা নয় ; অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়। হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরি করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী। এতে নিহিত তত্ত্বের নাম গুরুবাদ।

এই বিকৃত বৌদ্ধ জীবন-চর্যায় মিলে এদেশের আদিবাসীর জীবন—তত্ত্ব ও জগদ্দর্শন। এদেশের মানুষ চিরকাল এই কাদামাটিকে ভালবেসেছে, এর লালনে তার দেহ গঠিত ও পুষ্ট, এর দৃশ্য তার প্রাণের আরাম ও মনের খোরাক। সে এই আশ্চর্য দেহকেই জেনেছে সত্য বলে, দেহস্থ চৈতন্যকে মেনেছে আত্মা বলে—পরমাত্মারই খণ্ডাংশ ও প্রতিনিধি বলে। তাই চৈতন্যময় দেহ তার কাছে মানুষ আর দেহ বহির্ভূত অখণ্ড চৈতন্য হচ্ছে তার কাছে মনের মানুষ, রসের মানুষ কিংবা ভাবের মানুষ।

সে জীবনবাদী, তাই বস্তুকে সে তুচ্ছ করে না, ভোগে নেই তার অবহেলা। তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যা কর্তব্য, তাতেই সে উদ্যোগী। সেজন্যেই সে তার গরজ মতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা সৃষ্টি করেছে। পারলৌকিক সুখী জীবনের কামনা তার আন্তরিক নয়—পোশাকীই। তাই সে মুখে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছিল, অন্তরে কোনদিন বরণ করেনি। তার পোশাকী কিংবা পার্বণিক জীবনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আচার আবরণ ও আভরণের মতো কাজ দিয়েছে, কিন্তু তার আটপৌরে জীবনে ঠাঁই পায়নি। সে জানে, চৈতন্যের অবসানে এ দেহ ধ্বংস হয়, চৈতন্যের স্থিতিতে এ দেহ থাকে সুস্থ, স্বস্থ ও সচল। তাই সে দেহকে জেনেছে কালস্রোতে ভাসমান তরী বলে। প্রাণকে বুঝেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র বলে আর চৈতন্যকে মেনেছে মন বলে। তাই এই জীবনটাই তার কাছে মন-পবনের নৌকার চলমান লীলা রূপে প্রতিভাত হয়েছে, কাজেই পার্থিব জীবনই তার কাছে সত্য এবং প্রিয়। জীবনেতর জীবন অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে প্রসারিত জীবন তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারেনি কখনো। তাই বৈরাগ্যে সে উৎসাহ বোধ করেনি, বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক।

তার দর্শন সাংখ্য, তার শাস্ত্র যোগ। তাই দেহতত্ত্বই তার সাধ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফীরা এদেশের এই ঐতিহ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। চর্যাপদে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে, বাউল গানে, বৌদ্ধ বজ্র-সহজ-কালচক্র ও মন্ত্রযানে, শৈব-শাক্ত সাহিত্যে, বাউল-সুফী সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রী তত্ত্ব ও সাধনার সংবাদই পাই। ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যক্ষ-দানব-প্রেত ও দেবতা-পূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সেনদের নেতৃত্বে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে কার্যত টেকেনি। আদিবাসী বাঙালির জীবন-জীবিকার মিত্র ও অরি দেবতা—শিব, শক্তি (কালী),মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী. গণেশ প্রভৃতিই পেয়েছেন পূজা।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে শরীয়তী ইসলাম এখানে তেমন আমল পায়নি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্ আর শিরনি পেয়েছেন সত্যপীর-জাফর-ইসমাইল-খান জাহান-গাজীরা কিংবা বদর-বড়খাঁ-সত্যপীর। এঁদের কেউ পাপ-পুণ্য তথা বেহেস্ত-দোজখের মালিক নন, তাহলে এঁদের খাতির কেন? সে কী পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার জন্যে নয়?

কেবল এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহী বাঙালি , নতুনের অভিযাত্রী বাঙালি নব-নব চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে চিরকাল। বৌদ্ধযুগের শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, মীননাথের কথা কে না জানে? সেন আমলের জীমূতবাহনের মনীষা আজো বিস্ময়কর, নব্যন্যায় ও স্মৃতি বাঙালি মনীষার গৌরব-মিনার। চৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,—মানবিক বোধের ও মনুষ্যত্বের সুউচ্চ বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষের মর্যাদার ও মানবিক সম্ভাবনার বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, যিনি স্থূল চেতনার বাঙালিকে সূক্ষ্ম জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে তার চেতনার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সাম্য ও প্রীতির সুমহান মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বাঙালি চিত্তে মানব-মহিমা-মুগ্ধতার বীজ বপন করেছিলেন তিনি। তার পরেও রামমোহনের মনীষা ও মুক্তবুদ্ধি এক সঙ্কট থেকে, এক আসন্ন অপমৃত্যু থেকে সেদিন হিন্দুকে রক্ষা করেছিল ; মুসলমান পেয়েছিল পরোক্ষ ত্রাণের পথ। তারও আগে পাই সত্যপীর-কেন্দ্রী মিলন-ময়দানের সন্ধান, আর পাই বাউলের উদার মানবতাবোধ। এভাবে দেশকালের প্রতিবেশে বাঙালি যুগে যুগে নিজেদের নতুন করে রচনা করেছে, গড়ে তুলেছে নিজেদের কালোপযোগী করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙালির বীর্য বর্বর লাঠালাঠির জন্যে নয়, তার সংগ্রাম নিজের মতো করে বেঁচে থাকার। নিজের বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে নিজেকে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে গড়ে তোলার সাধনাতেই সে নিষ্ঠ। এসব তার সে-সাধনারই সাক্ষ্য ও ফল।

AMARBOI.com

৩

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন তার স্বতন্ত্র জীবন-বোধের ও মননের মৌলিকতার স্বাক্ষর রয়েছে, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি রয়েছে তার বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সাক্ষ্য।

সে চিরকালই শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তাই উত্তরভারতীয় গুপ্ত শাসনে সে স্বস্তি পায়নি। এজন্যেই গুপ্তদের পতনের পর শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাঙালি একবার জেগে উঠেছিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার আত্মসম্মানবোধ। গুপ্ত যুগের বদ্ধবেদনা ও সঞ্চিত গ্লানি প্রতিহিংসার আগুনে নিঃশেষ হতে চেয়েছিল। এরই ফলে স্বাধীন ভূ-পতি বঙ্গ-গৌরব শশাঙ্ককে দেখতে পাই উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজা হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়।

তারপর একদিন বাঙালির ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হয়েছিল। আমরা পাল রাজাদের কথা বলছি। স্মরণ করুন সেই গৌরবময় দিন, যেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। প্রজারা যেদিন 'গোপাল'কে রাজা নির্বাচিত করেছিল, সেদিন এই বাঙালির জীবনে মননে ও সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় হয়েছিল শুরু। স্বাধীনতার স্বস্তি তার জীবনে সেদিন যুগদুর্লভ স্বপ্ন জাগিয়েছিল। বাঙালির হৃদয় সেদিন নব-সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নব অনুভবের আবেগে। তার চিত্তলোক আন্দোলিত হয়েছিল নবীন জীবন-চেতনায়—জন্মলগ্নের বেদনায় সদ্য উন্মোচিত জীবনবোধের রূপায়ণ-প্রেরণায় সে ছুটেছিল আদর্শের সন্ধানে। 'যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতি' তারই প্রতীকী রচনা। মানুষের চেতনার রাজ্যে—আদর্শ-লোকের চিরন্তন প্রশ্নের গভীরতম সমস্যার সমাধানে সেদিন বাঙালি-মনন জয়ী হয়েছিল। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। সে ত্যাগের নয়, ভোগেরও নয়, গ্রহণ করেছিল মধ্য পন্থা— Golden mean। ত্যাগ তার লক্ষ্য নয়, নিছক ভোগ তার কাম্য নয়, পার্থিব জীবনের সার্থকতার পথই তার বাঞ্ছিত। পরলোকের মিথ্যা আশ্বাসে সে বিধাতার সৃষ্টির জাগতিক জীবনের মহিমা খর্ব করতে চায়নি. কিংবা ভোগের পঙ্কে ডুবে কলঙ্কিত করেনি জীবনকে। পৃথিবীকেই সার জেনে, জীবনকে সত্য মেনে, মাটিকে ভালবেসে সে জীবনের বিচিত্র রস আহরণ করতে চেয়েছে, উপলব্ধি করতে চেয়েছে জীবনের প্রসাদ। এজন্যে তার লক্ষ্য হয়েছে জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোটানো, ফল ফলানো। এরই মধ্যে সে সমাজকে ভেবেছে উদ্যানরূপে, সংস্কৃতিকে জেনেছে সিঞ্চিত জল হিসেবে, ঐতিহ্যকে বরণ করেছে 'সার' বলে। সেদিন বাঙালির আত্মোপলব্ধির জন্ম হয়েছিল, জীবন-ধারণায় তার মুক্তি ঘটেছিল. পেয়েছিল সে যথার্থ চলার পথের সন্ধান। তাই পাল আমল ছিল বাঙালির জীবনে ও বাঙলার ইতিহাসে সোনার যুগ। ধনে, ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতিতে, সম্ভ্রমে, চেতনায় ও চিন্তায় বাঙালি সে-গৌরব, সে-সুখ, সে-আনন্দ পরে অনেক অনেক কাল আর পায়নি।

সব সুদিনের শেষ আছে। মৃত্যুর বীজ ঢোকে দেহে, তা-ই একদিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ঘটায় মৃত্যু। পালদেরও পতন হল শুরু : তার কারণ সে স্বাজাত্য ভুলল। হারাল আত্মবিশ্বাস, ছাড়ল অভিমান। শেষের দিকে বৌদ্ধ পাল রাজারা নিজেদের উদার সংস্কৃতি ছেড়ে উত্তরভারতীয় বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার জনপ্রিয় হল। বৌদ্ধমত ত্যাগ করে লোকে ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ করতে লাগল। সে-সূত্রে বাঙালির দৃষ্টি হল বহির্মুখী। পতনের বীজ উপ্ত হল এভাবেই। স্বাজাত্যবোধ গেলে সহধর্মিতা ও সহযোগিতা যায় উবে। অনেকতায় আসে অনৈক্য। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের প্রেরণা না থাকলে বাঁধন যায় টুটে। সেদিন বাঙালির সোনার যুগ এভাবে হল অবসিত।

সেনদের পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যে—কর্নাটে। হয়তো তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড়। পাল রাজত্বের অবসানে তাঁরা হলেন দেশপতি। কিন্তু বাঙালির সঙ্গে ছিল না তাঁদের আত্মার যোগ। উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তাঁরা ছিলেন ধারক ও বাহক। কল্যাণবোধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি বশেই বাঙলাকে ও বাঙালিকে তাঁরা উত্তরভারতীয় আদলে গড়ে তুলতে হলেন প্রয়াসী। এই কৃত্রিম প্রয়াসে তাঁরা বাহ্যত সফল হলেন বটে, কিন্তু আত্মার ঐশ্বর্য হারাল বাঙালি। জীর্ণতা তার আত্মার কন্দরে বাঁধল বাসা। বাইরের আয়োজন-আড়ম্বর অন্তর্লোক করে দিল দেউলিয়া। তাই ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ মিশ্রের চোখের সামনে পালাতে হল লক্ষ্মণ সেনকে।

রাজার সঙ্গে ছিল না প্রজার যোগ। স্বাজাত্যর অচ্ছেদ্য বন্ধন হয়েছিল শিথিল। তাই রাজার দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয়নি প্রজারা। নতুন অধিপতিকে ছেড়ে দিল রাজ্য-পাট।

বিদেশী-বিভাষী তুর্কীরা দখল করে নিল এদেশ। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থেই চাইল স্বাধীন হতে। বাঙালির তাতে ছিল সায়। কেননা, বাঙালির ধন তাহলে তেরো নদীর ওপারে দিল্লীর ভাণ্ডারে যাবে না। তুর্কীদের প্রতি বাঙালি বাড়াল সহযোগিতার হাত। তুর্কীরা লড়ল দিল্লী-পতির সাথে। বহু জয়-পরাজয়ের পর অবশেষে ১৩৩৯ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙলা আর্থিক সৌভাগ্যসমৃদ্ধির গৌরব-গর্ব অনুভব করবার সুযোগ পেল। বিদেশাগত হলেও তখন সুলতানরা স্বাধীন ছিলেন বলে রাজস্ব মোটামুটি দেশেই খরচ হত। কিন্তু ১৫৩৯ সনে শেরশাহের গৌড় বিজয় থেকে বাঙলার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। শূরেরা প্রায় বাইশ বছর বাঙলা দেশ শাসন করলেন বটে, কিন্তু তারা ছিলেন বিহারী এবং বহির্বঙ্গীয় স্বার্থ, বিশেষ করে আফগান স্বার্থরক্ষা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আফগান কররানীরা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং ১৫৭৫ সনে আকবর জয় করে নিলেন বাঙলা দেশ। তেরো নদীর ওপারের দিল্লীর বাদশাহর রাজত্বে ও রাজস্বে যত আগ্রহ ছিল, তার কণা পরিমাণও ছিল না বাঙালির জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় উৎসাহ।

তাছাড়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬২৪ সন অবধি বাঙলায় এক রকম অরাজকতাই চলছিল। অবাঙালি বংশোদ্ভব স্থানীয় সামন্তরা প্রায় বিয়াল্লিশ (১৬১৭ সন অবধি) বছর ধরেই মুঘল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁরা মুঘলের অধীনতা সহজে স্বীকার করতে চাননি, ফলে একরূপ দ্বৈতশাসনই চলেছিল—যার স্বরূপ ছিল পীড়ন ও লুণ্ঠন। তাছাড়া মুঘল সেনানীদের মধ্যেও ছিল অন্তর্বিরোধ ও বিদ্রোহ। তবু সেদিন পুরোনো সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বাঙালিরা এই বিদেশী সামন্তদের হয়ে সংগ্রাম করেছিল বাঙলার স্বাধীনতা এবং বাঙালির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে। সামন্তদের ঐক্যের অভাবে বাঙালির সে প্রয়াস সেদিন ব্যর্থই হয়েছিল।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ১৬২৪ থেকে ১৭০৭ সন অবধি বাঙলায় মুঘল শাসন দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু সেনানী ও বেনে-সুবেদারের শাসনে বাঙলা উপনিবেশের দুর্ভোগই কেবল বেড়েছে। তার উপর বাঙালিকে বইতে হয়েছিল আসাম, কোচবিহার ও চট্টগ্রাম অভিযানের বিপুল ও ব্যর্থ ব্যয়ভার। মুঘল-শোষণ ছাড়াও য়ুরোপীয় বেনেদের শোষণে তখন দেশে আকাল। এদিকে ষোলো শতকের প্রথম পাদ থেকে পর্তুগীজ দৌরাত্ম্যের শুরু, তার চরম রূপ দেখা দেয় সাজাহান-আওরঙ্গজেবের শাসনকালে। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রজার জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যেন তাঁদের নয়, কেবল রাজস্বের অধিকারই তাঁদের। তাই বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন, সুবাদারের ঔদাসীন্য সেদিন বাঙালিকে ধনেও কাঙাল, মনেও কাঙাল করে ছেড়েছিল।

বিজাতি-শাসিত বাঙালির দেউলিয়া জীবনের সাক্ষ্য মেলে তাদের চিন্তার দৈন্যে, সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্ফলতায় ও রুচির বিকাশে এবং ধর্মবোধের নতুনত্বে। সেদিন অসহায় বাঙালি আস্থা হারিয়েছিল পুরোনো ধর্মবোধে ; ছেড়েছিল মন্দির, মসজিদ। জীবন ও জীবিকার ধাঁধায় পড়ে বিভ্রান্ত বাঙালি সন্ধান করেছিল নতুন ইস্ট দেবতার—যাঁরা পার্থিব জীবনে দেবেন দুর্লভ সুখ ও আনন্দ, আনবেন প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। সেদিন বিমূঢ় বাঙালি বৃহৎ ও মহতের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা কত ক্ষোভ ও হতাশায় না ত্যাগ করেছিল! সেদিন তার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' মুর্শিদকুলি-আলিবর্দীরা বাঙালির সে ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষাও সেদিন মেটানোর গরজ বোধ করেননি। তাই মুঘল যুগের শুরু থেকেই দুর্দিনের যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার ফলে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী ইষ্টদেবতার পূজা-শিরনির মাধ্যমে নিপীড়িত নিঃস্ব হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছিল। বল-বীর্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না আর। কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, দক্ষিণ রায়-বড়খাঁগাজী, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, ষষ্ঠীদেবী-ষষ্ঠীবিবির পূজা-শিরনি দিয়েই স্বস্তি খুঁজছিল।

১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাঙালির আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিল, মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন রাজস্বব্যবস্থায় প্রজা-শোষণ বেড়েছিল। কেননা তিনি মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন এবং দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। সামন্তরা হয়ে উঠলেন এ সুযোগে প্রবল। আলিবর্দী এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই হলেন বাঙলার নওয়াব। এজন্যে এদেরকে শাসনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁর ষোলো বছরের নওয়াবীকালে বারোটি যুদ্ধও করতে হয়েছিল। ফলে দেশে শোষণ-পীড়ন বেড়ে গেল। মারাঠার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে সেদিন আলিবর্দী একজন সেনাপতিও পেলেন না তার সামন্ত সিপাহীর মধ্য থেকে। কিশোর সিরাজুদ্দৌলা হলেন সেনাপতি। যুদ্ধ-প্রহসনের পরে আলিবর্দীকে ছাড়তে হল উড়িষ্যা, দিতে হত বারো লক্ষ টাকা চৌথ। এভাবে মারাঠা শক্তিকে ঠেকিয়ে তিনি আরো কিছুকাল নওয়াবী করলেন!

কালের চাকা স্থির ছিল না। এই কুশাসন ও চরিত্রহীনতার পরিণাম সমাজের সর্বস্তরের দেখা দিল দুষ্টক্ষতরূপে। যুদ্ধ, ছল-প্রতারণা ও লুণ্ঠন-শোষণে মানুষের জীবন জীবিকায় এতটুকু নিরাপত্তা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত ছিল না দেশের লোকের, বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজস্বের হার। বেনিয়া-দালালের দৌরাত্ম্যে ঘরেও স্বস্তি ছিল না লোকের। অভাব, পীড়ন ও অনিশ্চয়তায় জনগণের দুঃখের ভরা হয়েছিল পরিপূর্ণ।

তারপরে পলাশীর প্রহসনে বদল হল শাসক, পালটে গেল নীতি, পরিবর্তিত হল রীতি আর দ্বারে এল নতুন যুগ। বিশ্বাসভঙ্গে মীরজাফরের সহযোগী ও সমকক্ষ এবং জামাতা মীর কাসেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলি খাঁ ঘুষে-লব্ধ নওয়াবী করতে গিয়ে টের পেলেন নিজেদের অবস্থা। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাল তখন ইংরেজ প্রায় গুটিয়েই এনেছে। ফাঁদের দোর বন্ধ, কাজেই পরিণামে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাঁর ভাগ্যে।

ইংরেজ বেনেরা স্থিরই করতে পারল না পঁচিশ বছর ধরে শাসন করবে কী শোষণ করবে!

ফলে ১৭৯৩ সন অবধি চলল একপ্রকারের দ্বৈত-অদ্বৈত শাসন, যার ফলে দেশে অরাজকতা, লুণ্ঠন, পীড়ন চলছিল অবাধে। এর মধ্যেই ঘটেছিল খণ্ড প্রলয়ের চেয়েও ভয়াবহ মন্বন্তর—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যার নাম। এ কেবল দুর্ভিক্ষ নয়— মহামারী, সে মহামারী অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল দেহের—মনের— আত্মার। মনুষ্যত্ব সেদিকার বাঙলায় ছিল অভাবিত সম্পদ।

অবশেষে বেনেবুদ্ধির জয় হল। কোম্পানি স্থির করল তারা শাসনও করবে, শোষণও করবে। ১৭৯৩ সন থেকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় শাসন-শোষণ হল শুরু।

এর মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা ওহাবী-ফরায়েজী প্রভৃতি ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে আযাদী আন্দোলনও চালাতে চেয়েছিল। মজনু শাহর ফকিরদল ছিল মূলত Saboteurs গেরিলাযোদ্ধা। ১৭৬০ সন অবধি এসব বিপ্লব চলছিল।

৪

কিন্তু তখন বিপর্যস্ত জীবনে শিথিল চরিত্র জনগণের পক্ষে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ১৮৬০ সনের পর থেকে মুসলমানরা বৃটিশ-প্রীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সন অবধি অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা চাকরির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়। এর মধ্যে আযাদীকামী স্বস্থ মুসলমানরা ও চাকরির প্রত্যাশাহীন মোল্লা-মৌলানারা কংগেসের মধ্যেমে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর অন্যেরা মুসলিমলীগের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব জিয়ে রেখে। এই সংগ্রাম মূলত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অফিসবাবুর বিরুদ্ধেই। তখন মুসলমান মাত্রেরই এই তিন শত্রু— ইংরেজ নয়। কিন্তু হিন্দু-বিরল অঞ্চলের অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানে মুসলিমদের হিন্দুবিদ্বেষ তেমন ছিল না, যেমন ছিল না মুসলিম-বিরল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মনে মুসলিম-বিদ্বেষ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের এই ক্ষোভের সুব্যবহার হয়েছিল। মুসলিম লীগের পতাকাতলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা সমবেত হল ইংরেজ তাড়াবার জন্যে নয়—হিন্দুর থেকে সম্পদ ও চাকুরির অধিকার ছিনিয়ে নেবার উত্তেজনায়। এটিই কালে কালে পৃথক ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিত্বের প্রলেপে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্রসত্তার স্বীকৃতিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভের উদ্দীপনা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। মুসলিমলীগ যে বৃটিশবিরোধী ছিল না এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতাকামী ছিল, তার প্রমাণ কংগ্রেসীদের জেলে যেতে হয়েছে, মুসলিম লীগ কর্মীরা কখনো বৃটিশের কোপদৃষ্টি পায়নি।

৫

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম বাঙলায়। কিন্তু বাঙালির হীনমন্যতা এবং কিছুটা উদারতার জন্যে দুটোই হল হাতছাড়া।

এগুলোর নেতৃত্ব ও সাফল্যের কৃতিত্ব পেল অবাঙালিরা। অথচ পাকিস্তান এল বাঙালির আন্দোলনে, স্বাধীনতাও এল ১৯৪২ সনের বাঙালির আগস্ট-আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবে। ১৯৪৬ সনের কলকাতার দাঙ্গা, তার প্রতিক্রিয়ায় বিহার-নোয়াখালির হাঙ্গামাই স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছিল। আজকে যেসব অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত, সেদিন বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও মুসলিমলীগ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, অথচ মুসলিমলীগের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের মা-বাবা আজ সেসব অঞ্চলের লোকেই। কেবল কী তা-ই? বাঙালির দেশপ্রেম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রিক আনুগত্যেও সেসব মোড়ল মুরুব্বিদের সন্দেহের অন্ত নেই। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা কল্পনাতীত।

অবশ্য বাঙালির এ ক্ষতি বাঙালির দালাল-নেতাদেরই দান। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাষ্ট্রের নামে সর্বপ্রকার বঞ্চনা হল শুরু।

সৈন্য বিভাগে বাঙালি দেড় লক্ষ চাকুরির হকদার। হীনমন্যতাগ্রস্ত বাঙালির কাছে সেদিন সে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারণও ছিল অশোভন ও অযৌক্তিক। পাঞ্জাব-করাচী-বোম্বাইয়ের মুসলমানরা পাকিস্তানের অর্থনীতির চাবিকাঠি রাখল নিজেদের হাতে। অর্থাগমের পথ রইল আগলে। ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানা রইল তাদেরই খপ্পরে। কেরানীগিরিতে ও তার উপরি প্রাপ্তিতেই বাঙালি রইল কৃতার্থমন্য হয়ে।

আগে পদ ও পদবি লোভে দালালি করে, পরে প্রসাদ-বঞ্চিত হয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে এসব দালাল-নেতারা মায়াকান্না শুরু করে দেয় জনগণের জন্যে, মুখস্থ ফিরিস্তি দেয় অবিচারের, ছদ্ম সংগ্রাম চালায় বাঙালির অধিকার আদায়ের।

বাঙালির থেকে সংখ্যাসাম্য নীতির স্বীকৃতি আদায় করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালির যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনা বিরল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সুবিধাবাদ-নীতি বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীদের করেছে আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন। স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা আজ এ-দলে, কাল ও-দলে থেকে দেশের, গণমানুষের ও গণচরিত্রের যে ক্ষতিসাধন করেছেন, তা আমাদের উত্তরপুরুষের কালেও পূরণ হবে কী না সন্দেহ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিষদে, মন্ত্রিসভায় কখনো বাঙালির অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের দান কি, প্রয়াসের ফল কি, কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না।

জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের সেই জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফরাসি ভাষায়। অধিকাংশ পাকিস্তানীর প্রাণের যোগ নেই সে কওমী সঙ্গীতের সঙ্গে। খেতাবের ভাষাও ফরাসি। কয়জন বোঝে তার গুরুত্ব? সর্বত্রই এমনি বিড়ম্বনা।

পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষাই উর্দু নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন উত্তরভারতীয় Civilian এবং লিয়াকত আলির প্রভাবে ও দাবীতে দেশবহির্ভূত ভাষা উর্দু পেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার অধিকার ও মর্যাদা। অথচ যে-স্তরেই থাকুক পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও মাতৃভাষারূপে আজো প্রীতি ও পরিচর্যা পাচ্ছে এবং সেই প্রবণতাই লক্ষণীয়রূপে বাড়ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা না হলে যে কোনো বিদেশী ভাষাই টিকে থাকতে পারে না, তার বড় সাক্ষ্য রয়েছে এদেশের ইতিহাসে। তুর্কী-মুঘল-ইরানীর প্রতিপোষণ পেয়েও এদেশের এককালের রাষ্ট্রভাষা ফরাসি তার অস্তিত্ব হারাল। কেনো এটি সাম্রাজ্যের কোনো অঞ্চলের লোকেরই মাতৃভাষা ছিল না। শাসক হয়েও সংখ্যালঘু বলেই শাসকেরা তাদের মাতৃভাষা তুর্কীও ধরে রাখতে পারেননি। তাই কারো প্রীতির পরিচর্যা সে ভাষা পায়নি। ফলে মৃত্যুই ছিল তার অনিবার্য পরিণাম। উর্দুরও সে পরিণাম সম্ভব ও স্বাভাবিক। তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ জেনে আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি প্রচারে। উত্তরভারতীয় Civilian কিংবা তাদের উত্তরপুরুষের প্রভাবের আয়ু কয়দিন! সিন্ধি, বেলুচী, পশতু ও সারাইকীভাষীরা যখন ঐ Civilian-দের আসন এবং শাসনের দণ্ড ধারণ করবে, কোন্ মমতায় তারা বিদেশী উর্দুর লালনে উৎসাহ রাখবে? কাজেই অবিলম্বে উর্দু চালু না হলে, অদূর ভবিষ্যতে ভাষিক-দ্বন্দ্ব ভারতের মতো তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার ভাঁওতা দিয়ে অগ্রগতির পথরুদ্ধ করে দেশী-দালালের মাধ্যমে পাঞ্জাবীরা ও করাচীওয়ালারা আর কতকাল এখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাবে—এ জিজ্ঞাসার অবকাশ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নয়। স্বস্বার্থে মানুষ বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বলকে বঞ্চিত ও শোষণ করা কতকাল সম্ভব!

অর্থনৈতিক কারণেই তো অধিকার-বঞ্চিত মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধুয়া তুলে পাকিস্তান চেয়েছিল। নানা অজুহাতে পাক-ভারতে সংখ্যালঘু হত্যার পশ্চাতেও এই সম্পদ-সংগ্রহের অবচেতন প্রেরণাই কাজ করে।

পাঁচ কোটি হিন্দুস্তানী মুসলমানের স্বস্তি, সম্মান ও জীবন-জীবিকার বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় যদি সহ-অবস্থান মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব না হয়, তা হলে কাদের হিতার্থে এ পাকিস্তান!

অতএব, যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জিকির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত; আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালি স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কিংবা অর্ধ-স্বাধীনতা দাবি করবে এই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তা-ই বলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতি গঠনে ভাষার প্রভাব

আত্মীয়তা ও ঐক্যের বন্ধন হিসেবে রক্ত-সম্পর্কের পরেই ভাষার স্থান। গভীরভাবে বিবেচনা করলে মনে হবে ভাষার গুরুত্ব রক্ত-সম্পর্কের চাইতেও বেশি। কেননা, বোধগম্য ভাষার মাধ্যমেই হয় জানাজানি ও মন দেয়া-নেয়া। অপরিচয় যেমন অনাত্মীয়তার নামান্তর, তেমনি পরিচয় মানে চাক্ষুষ করা নয় বরং পরস্পরের মন-মেজাজ ও মত-পথ জানা। এটি কেবল কথার মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব, অর্থপূর্ণ ধ্বনিই মানুষের ব্যষ্টি জীবন ও সামষ্টিক-সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার মাধ্যম ব্যতীত আমরা যেমন ভাবতে পারিনে, তেমনি ভাষা ছাড়া আমরা নিজেদেরকে অনুভব করতেও অসমর্থ। কাজেই চেতনা প্রকারান্তরে ভাষারই অন্য নাম। মানুষের মানসিক কিংবা বৈষয়িক জীবন তাই ভাষানির্ভর। বলতে গেলে, অন্য প্রাণী থেকে মানুষ যে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তার মন-বুদ্ধি-অন্তরের যে বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে, তা মুখ্যত ভাষার কারণেই এবং গৌণত তার কায়িক-সৌকর্যের দরুণ। অসংখ্য ধ্বনি-সৃষ্টির শক্তি ও হাত প্রয়োগের সামর্থ্যই রয়েছে তার যাবতীয় বিকাশের মূলে।

প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, ঘৃণা-বিদ্বেষ-অবহেলা প্রভৃতির উদ্ভব আর অবসানও অনেকখানি নির্ভর করে কথার উপরই। ব্যক্তিগত জীবনে ভাষার মাধ্যমে পরিচয় না ঘটলে রাগ বা বিরাগ জন্মাবার কারণ সহজে মেলে না। অতএব, রক্ত-সম্পর্ক ও ভাষার অভিন্নতাই পারস্পরিক মিলনের আদি ভিত্তি। অভিন্ন ভাষাই আদিকালে বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে সমাজ গঠনের সহায়ক হয়েছে।

ভাষার মাধ্যমেই ভাব-চিন্তার বিকাশ ঘটে বলেই সৌজন্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বৃদ্ধিরও মুখ্য অবলম্বন হয়েছে এ ভাষাই। স্বভাষার বিকাশবিরহী কোনো মানবগোষ্ঠীই সভ্য নয়। কেননা, ভাষার মাধ্যমেই শ্রেয় ও প্রেয়বোধ সমাজে বিস্তার লাভ করে। অভিন্ন ভাষার মাধ্যমেই বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-ভাবনায় ও জীবন-রচনায় ব্রতী হয়।

জন্মসূত্রে মানুষ যে ভাষা পায় অর্থাৎ আশৈশব মানুষ যে ভাষায় অভ্যস্ত হয়, সেটিই তার স্বভাষা বা মাতৃভাষা। ঐ ভাষাই তার চেতনার নিয়ামক বলে তার প্রাণেশ্বর হয়ে উঠে। অতিক্রান্ত শৈশবে পড়ে-পাওয়া ও শুনে-শেখা ভাষা ঐ ভাষার মতো চেতনা- সংপৃক্ত হয় না, প্রিয়ও হয় না। ফলে স্বভাষী ব্যতীত অন্যভাষী লোকও প্রীতির ক্ষেত্রে আনুপাতিক দূরত্বে অবস্থান করে।

বিদ্বানেরা বলেন, মানুষের বাকযন্ত্রে কোনো ধ্বনিই অবকল ভাবে দ্বিরুক্ত হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে। কায়িক অসামর্থ্যই তার মুখ্য কারণ। যেহেতু প্রতি মানুষেরই রয়েছে স্বতন্ত্র অবয়ব, সেহেতু কোনো দুটো মানুষের ধ্বনি-সৃষ্টির শক্তি অভিন্ন নয়। তাছাড়া অজ্ঞতা ও অনবধানতাবশেও ধ্বনি বিকৃত হয়। অতএব, দৈহিক অসামর্থ্য ও অজ্ঞতাই ধ্বনি-বিকৃতির কারণ। ভাষার ক্ষেত্রে এই বিকৃতিকে আমরা সৌজন্যবশে বিবর্তন বা রূপান্তর বলে থাকি। একটা পরিমিত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই বিবর্তনটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। অর্থাৎ চার-পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে তা কানে ধরা দয়। এমনি করেই এক মূল ভাষা বিবর্তিত হয়ে অসংখ্য বুলি ও ভাষাতে পরিণত হয়। আমাদের আর্য ভাষাও এমনি করেই এশিয়া-য়ুরোপে অসংখ্য ভাষা হয়ে বিশিষ্ট বিকাশ লাভ করেছে।

ঋগ্বেদের আমলের ভাষার ক্রমবিবর্তনে গড়ে উঠেছে উত্তরভারতের আধুনিক ভাষাগুলো। বাঙলাও এদের একটি। ভাগলপুর থেকে কক্সবাজার, মালদহ থেকে গোয়ালপাড়া অবধি এ ভাষার লেখ্যরূপ আজো অভিন্নরূপে চালু রয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বুলি হয়েছে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। বুলিতে বুলিতে পার্থক্য এত বেশি যে, অনভিজ্ঞের চোখে এদের গোত্রিক অভিন্নতা সহজে ধরা পড়ে না।

amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

অতএব কেবল লেখ্যরূপের মাধ্যমেই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এ লেখ্যরূপের উদ্ভব বিলম্বিত হলে আমরা আজকের বাঙালি জাতিকে এত বড় ভূখণ্ডে আজকের সংখ্যায় পেতাম না।

প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, এক সময় মাগধী-প্রাকৃত চালু ছিল বিহারে, উড়িষ্যায়, বাঙলায় ও আসামে। মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকৃতিতে উদ্ভূত হয় অবহট্টের। তখনো আঞ্চলিক পার্থক্য তেমন প্রকট ও প্রবল হয়ে উঠেনি। তাই লেখ্য অবহট্ট ছিল এসব অঞ্চলে অভিন্ন। প্রাকৃত-পৈঙ্গল, দোহাঁকোষ প্রভৃতিই তার প্রমাণ। আরো পরে অর্বাচীন অবহট্ট যুগেও লেখ্যরূপে আনুগত্য ছিল অবিচল। তাই চর্যাগীতিতে পাই বঙ্গ-কামরূপ ও বিহার উড়িষ্যার পদকার।

একচ্ছত্র শাসনই অভিন্ন লেখ্য ভাষার উদ্ভবের মুখ্য কারণ। দশ শতক অবধি মোটামুটিভাবে এসব অঞ্চল গুপ্ত ও পাল শাসনে ছিল। তাই অর্বাচীন অবহট্ট যুগেও ভাষিক ঐক্য দৃশ্যমান। পালরাজত্বের অবসানে এই রাষ্ট্রিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়। তাই যদিও তেরো শতক অবধি বাঙলা-উড়িষ্যা এবং ষোলো শতক অবধি বাঙলা-আসামী অভিন্ন ছিল, তবু একচ্ছত্র শাসনের অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসন-সংস্থার অনুপস্থিতির দরুন অর্বাচীন অবহট্ট-উত্তর ভাষা সর্বজনীন লেখ্যরূপ পায়নি। তাই আঞ্চলিক বুলিই স্থানিক প্রয়োজনে লেখ্য ভাষায় উন্নীত হয়। ফলে বিহারে, উড়িষ্যায়, বাঙলায় ও আসামে চালু হল চারটি স্বতন্ত্র লেখ্য ভাষা। আর এর সুদূরপ্রসারী ফল এই দাঁড়াল যে মাগধী প্রাকৃত- ভাষী একটি ভাষিক জাতি বা সম্প্রদায় কালে চারটি ভাষিক জাতিতে পরিণত হল। যদি গুপ্ত ও পাল আমলের মতো একচ্ছত্র শাসন আধুনিক বুলিগুলোর স্বরূপ প্রাপ্তির সময়ে ও লেখ্যরূপ গ্রহণকালে চালু থাকত, তাহলে বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা ও আসাম জুড়ে একটি বিরাট ভাষিক জাতি গড়ে উঠতে পারত, এবং তাহলে আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক শক্তিরূপে পূর্ব-ভারতে একটি মর্যাদাবান রাষ্ট্রের স্থিতি অবধারিত ছিল। কিন্তু একচ্ছত্র শাসন-সংস্থার অভাবে তা হতে পারেনি এবং আর কোনদিন হবেও না। অবশ্য অভিন্ন ভাষা দিয়ে যে একক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে এমন নিশ্চয়তা আগেও কখনো ছিল না, এখনো নেই। তবে এ-কথা সত্য যে এমনি পরিবেশ সংহতির ও একক রাষ্ট্রগঠনের অনুকূল।

বাঁকুড়া ও চট্টগ্রামের এবং মালদহ ও গোয়ালপাড়ার মানুষ যে একই লেখ্য ভাষার বন্ধনে ধরা দিয়েই বাঙালি হয়েছে, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। নইলে তাদের স্থানিক বুলি এতই পৃথক যে তারা কোনক্রমেই অভিন্নভাষী জাতি হতে পারত না। মালদহ কিংবা বাঁকুড়ার লোক সহজেই হতে পারত বিহারী, যেমন মেদিনীপুরের লোক হতে পারত উড়িয়া এবং সিলেটীরা হত আসামী। কাজেই আজকের বাঙালির স্বাজাত্যবোধের উৎস স্বভাষা। কেননা এ জাতি পরিচয়ে নৃতত্ত্ব, গোত্রচিহ্ন, ধর্মমত ও বর্ণবিন্যাস অস্বীকৃত। এমনকি আঞ্চলিক অভিমানও এক্ষেত্রে অবহেলিত। তাই পুরেনো রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, বরেন্দ্র, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি গোত্রবাচক ও অঞ্চল নির্দেশক পরিভাষাগুলোও আজ অবলুপ্ত।

এককালের অবজ্ঞেয় যে বঙ্গ সেই নামেই সব কয়টি অঞ্চল হয়েছে সংহত। যদিও লেখ্য ভাষাটি রূপ নিয়েছে দক্ষিণ রাঢ়ের বুলি ভিত্তি করেই। মুঘল আমলে প্রায়ই বিহার-উড়িষ্যাও যুক্ত থাকত বাঙলার শাসন-সংস্থার সঙ্গে। বস্তত ১৯০৫ সন অবধি 'সুবে বাঙ্গালাহ' বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে। এ ব্যবস্থা যদি পাল আমলের পরেও চালু থাকত, তা হলে সেই সুবে বাঙ্গালাহই হত আজকের বাঙালির স্বদেশ বা মাতৃভূমি। কেননা, তা হলে লেখ্য ভাষারূপে রাজধানী অঞ্চলের বাঙলাই গৃহীত হত সর্বত্র। এবং সে ভাষা হত সবারই মাতৃভাষা। কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে, দেশে লেখ্য ভাষার অনুপস্থিতির সুযোগে বহিরারোপিত ধর্মের কিংবা বহিরাগত শাসকের ভাষা শাসিত-অঞ্চলে লেখ্য ভাষারূপেও স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন আমরা বাঙালিরা কেউ আর্য ছিলাম না। আমরা অস্ট্রিক ও ভোটচীনার রক্ত-সঙ্কর মানুষ। আমাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একসময় অস্ট্রিক (দ্রাবিড়) ও মঙ্গোলীয় বুলি চালু ছিল। কিন্তু উত্তরভারতীয় ধর্ম ও লেখ্য ভাষা গ্রহণ করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বভাষা ও স্বাজাত্য পরিহার করে বিস্মৃত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর্যত্বের' মিথ্যা গৌরব-গর্বে স্ফীত হয়েছিল। ফলে আমাদের নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, গৌত্রিক অভিমান, মাতৃভাষার মমতা, জীবনযাত্রার রীতিনীতি প্রভৃতি সবকিছু সানন্দে বিসর্জন দিয়ে হয়তো তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল।

নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য ও গোত্র-চেতনা বিলুপ্তির পক্ষে ধর্মের চেয়ে ভাষার প্রভাব যে অধিক এবং অমোঘ ফলপ্রসূ, তা দুনিয়ার অন্যত্রও দেখতে পাই। এখনকার আরব জাতি বলতে ইরাক থেকে জিব্রাল্টর অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরই নির্দেশ করে, অথচ তারা আদিতে এক গোত্রীয় কিংবা অভিন্ন ভাষী ছিল না—বেবেলীয়, কালদীয়, আশিরীয়, ফিনিশীয়, হিত্তি, কপ্ট, অর্য, শক, হুন প্রভৃতি নানা পুরোনো স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ আরব জাতি। এবং তা ধর্মের অভিন্নতায় সম্ভব হয়নি, ভাষার ঐক্যেই নির্মিত হয়েছে। আজকের য়ুরোপীদের কিংবা ল্যাটিন আমেরিকানদের জাতি-চেতনাও রক্ত-নির্ভর নয়—ভাষাভিত্তিক।

যারা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, তাদেরকে অভিন্ন ধর্মের বন্ধন কিংবা অভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থিতি অপরের মধ্যে আত্মমিশ্রণে প্রেরণা দেয়নি। তারা অন্যদের সঙ্গে থেকেও স্বতন্ত্র। অন্যভাষীর সঙ্গে সহঅবস্থান করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অসংলগ্ন। বিগতকালের য়ুরোপে এবং আধুনিক ভারতে, কানাডায়, আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায় এটিও সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক বিরোধের ও বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। আজকের পাকিস্তানও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধি, বেলুচ এবং পাখতুন অসন্তোষও মূলত ভাষিক স্বাতন্ত্র্যজাত অর্থাৎ এর যতটা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা প্রসূত, ততটা আঞ্চলিক ব্যবধানগত কিংবা গোত্র-চেতনাজাত নয়। পাঞ্জাবের সারাইকী-ভাষী মুলতানীদের সাম্প্রতিক মনোভাবও আমাদের এ ধারণার সমর্থক। পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক বাঙালি-বিহারী দ্বন্দ্বেরও উৎস এই ভাষাই। তাই পশ্চিম বাঙলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করা যেমন দুঃসাধ্য, বিহারীদের স্বজন বলে গ্রহণ করা তেমনি দুষ্কর। ভাষাগত ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যই এই মিলন ও বিরোধের, এই আপন-পর পার্থক্যের মূলে ক্রিয়াশীল, বলতে গেলে আজকের দুনিয়ার তাবৎ মানুষ বর্ণ-সঙ্কর বা রক্ত-সঙ্কর। বিচিত্র কারণে যুগ যুগ ধরে যাযাবর মানুষ স্থানান্তরে গেছে, নিঃশেষে মিশে গেছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে, এবং ভাষার ঐক্যে গড়ে তুলেছে সংহত সমাজ। যেখানে ভাষা অভিন্ন হয়ে উঠেনি, সেখানে বিরোধ-বিদ্বেষ চিরন্তন হয়ে রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে আমাদের দেশে বলখী, সমরখন্দী, বোখারী, খোরাসানী, সবজওয়ারী, সিরাজী, নিশাপুরী, মক্কী, মদনী, হেজাকী, ইয়ামিনী কিংবা সৈয়দ, কোরাইশী, ফারুকী, সিদ্দিকী, উসমানী, আলাভী, ফাতেমী প্রভৃতি দেশ-গোত্র জ্ঞাপক ও আভিজাত্য সূচক কুলবাচির আধিক্য সত্ত্বেও ভাষাগত ঐক্যের কারণে জাতি-পরিচয়ে এগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এবং পাকিস্তানীর জন্যে এক সাধারণ ভাষা নির্মাণের আড়ালেও রয়েছে এই অভিপ্রায়।'

৪

আদিকালের ধর্মপ্রবর্তক, শাসক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এ তত্ত্ব জানা ছিল, তাই তারা দীক্ষিত মানুষকে, বিজিত জাতিকে, শাসিত জনগোষ্ঠীকে স্বভাষা গ্রহণে বাধ্য, প্ররোচিত কিংবা অনুপ্রাণিত করত। এমনি প্রয়াস ও রেওয়াজ আজকের দিনেও দুর্লভ নয়। পাকিস্তানে উর্দুভাষা ও হরফ চালু করার পশ্চাতে ছিল এমনি অভিসন্ধি। আজ উপনিবেশিক প্রতিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ অবসিত। কাজেই প্রবলের এই প্রবণতাও আজ নিষ্ফল ও নিষ্ক্রিয়। বৈদিক, ল্যাটিন, ফরাসি, আরবি ও আধুনিক ইংরেজি ভাষা এমনি করেই স্বগোত্রের মানুষে ও অঞ্চল-বহির্ভূত ভূ-খণ্ডে ভাষিক আধিপত্য বিস্তার করেছে।

অবশ্য ধর্মপ্রবর্তকেরা, শাসক-সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাও দীক্ষিত ও বিজিত জনের ভাষা শিখতে পারতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধিত হত না। নিজেদের ভাষার মাধ্যমে নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শনের সঙ্গে শাসিতদের পরিচয় ঘটিয়ে শাসকদের প্রতি একপ্রকারের অনুরাগ ও আনুগত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। এভাবে শাসকদের অন্তরঙ্গ পরিচয়-মুগ্ধ অনুরাগী ও অনুগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজাগোষ্ঠী বিদেশী-বিজাতি শাসকের প্রতি সহিষ্ণু হয়ে উঠে। ইংরেজ আমলে আমাদের শিক্ষিতশ্রেণীর ইংরেজ এবং ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি-প্রীতি এ সূত্রে স্মর্তব্য। ভাষা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে এই অনুরাগ ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা সম্ভব হত না। কেননা, কেবল বাহুবলে প্রভাব ও প্রতাপ চালু রাখা চলে না। কেননা, যেখানে মন জানাজানির উপায় নেই, সেখানে সমঝোতা ও প্রীতি অসম্ভব। অপরিচয়ই অপ্রীতি ও অসহিষ্ণুতার উৎস। এসব কারণেই সম্ভবত বাক্ অন্যতম ব্রহ্মরূপে পরিকীর্তিত।

৫

আবার বাঙালির কথাই বলি। লেখ্য বাঙলার প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বাঙালি জাতিরূপে সংহত হল বটে, কিন্তু ভাষিক ও ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্বেও আঞ্চলিক দূরত্বের দরুন আচারে-সংস্কারে, মনে-মননে, জীবন-ভাবনায় ও রীতি-নীতিতে পার্থক্য সুপ্রকট হয়ে বিদ্যমান ছিল। এই আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব আঠারো শতক অবধি নির্বিঘ্ন ছিল। উনিশ শতকে যান্ত্রিক যানবাহন চালু হওয়ার ফলে এবং মুখ্যত মুদ্রণ-শিল্পের দ্রুত বিকাশের বদৌলতে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সংহতি ও সান্নিধ্যের সুযোগে, আর প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির সেই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আজ লুপ্তপ্রায়।

এভাবেই বাঙালি শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, আচারে, আচরণে, ধ্যানে ও ধারণায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে ও আজো উঠছে। মধ্যযুগের সাহিত্য- শিল্প এবং ঘরোয়া আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতিই এর সাক্ষ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, ধর্মমঙ্গল কেবল উত্তর রাঢ়ের সম্পদ ; তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশও কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমিত, চণ্ডীমণ্ডপ ও চণ্ডীমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলেই নিবদ্ধ; তেমনি মনসা মঙ্গল ও লোকগীতিকা পূর্ববঙ্গেরই ঐশ্বর্য, বাউল-সহজিয়া মতের প্রভাব ও প্রসার-ক্ষেত্র হয়েছে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ। প্রণয়োপাখ্যানের উদ্ভব হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে। খাদ্যবস্তুর রন্ধন- প্রণালীর আঞ্চলিক রকমফের যেমন ছিল ; দারু, কারু ও চারুশিল্পেরও তেমনি স্থানিক বিকাশই কেবল সম্ভব ছিল। শাস্ত্রনিরপেক্ষ আচার-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ছিল স্থানিক পার্থক্য। আসবাব-তৈজসেও ছিল আঞ্চলিক রূপ। কাজেই কোনো কিছুই ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে দেশময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে পারেনি। গ্রামীণ জীবনে রীতিনীতির এ পার্থক্য আজো নিশ্চিহ্ন হয়নি। তবু অন্তত হাজার বছর ধরে লেখ্য ভাষার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষ এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয় সমাজ গড়ে তুলছে যার আধুনিক নাম বাঙলা দেশ ও বাঙালি। অতএব অভিন্ন ভাষাই জাতি-চেতনার অকৃত্রিম ভিত্তি ও জাতি-নির্মাণের মৌল উপাদান। আর সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাই স্বল্পস্থায়ী। অর্থাৎ ভৌগোলিক ঐক্য, ধর্মীয় অভিন্নতা, মতবাদের একতা, রাষ্ট্রিক বন্ধন ও গোত্রিক পরিচয় কখনো অকৃত্রিম জাতি গড়ে তুলতে পারে না—অন্তত অতীতে কোনো দিন পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা প্রসঙ্গে : বিতর্কের অন্তরালে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। শিক্ষায় ও সম্পদে অগ্রসর সাবেক যুক্তপ্রদেশের নেতারা ও পদস্থ কর্মচারীরা এবং পাঞ্জাবের মুসলমান জমিদাররা ও পদস্থ চাকুরাই পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করে। এদের ভাষা ছিল উর্দু। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো আঞ্চলিক বুলিই তখনো লেখ্য ভাষা হিসেবে প্রয়োজনানুরূপ বিকাশ পায়নি। তার উপর পাকিস্তানভুক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনসমাজে তখনো অশিক্ষার অন্ধকার বিদ্যমান।

উর্দুভাষী শাসক-প্রশাসকেরা যখন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের সুযোগে তাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে কৃতসংকল্প, তখন প্রায়-বুলি-নির্ভর পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তির কোনো কারণ ঘটেনি। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তির উল্লাস এবং বিজাতি বিদ্বেষজাত ইসলামী বেরাদরী ভাবটাও ছিল তখন জনমনে প্রবল। পূর্ব-বাঙলার একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরও ছিল এই বেরাদরী উদারতা ও হিন্দুভীতি। তারাও হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবী বেরাদরের প্রতি সর্বব্যাপারে ছিল শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশীল। তার উপর, জিন্নাহর 'কায়েদে আযম' নামের ফাঁকে একটা personality cult বা ব্যক্তিপূজার প্রবণতা জনসমাজে গভীর ও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। উর্দুভাষী অনুচরদের প্রভাবে গুজরাটী-ভাষী জিন্নাহও উর্দুর পক্ষে রায় দিলেন। কাজেই অনুগ্রহজীবী বাঙালি নেতারাও [এদের কেউ কেউ ছিলেন উর্দুভাষী] জুটে গেলেন উর্দুর দলে। বাকি রইল বাঙলার ছাত্র, সাহিত্যিক ও তরুণ বুদ্ধিজীবীরা। ছাত্রদের সক্রিয় সংগ্রামে অবশেষে বাঙলা মৌখিক স্বীকৃতি পেল, কিন্তু অকপট অন্তরে গৃহীত হল না অবাঙালি সমাজে। তার গূঢ় কারণ ছিল।

২

মাতৃভাষার প্রতি নিছক প্রীতিবশেই তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি, চেয়েছিল সাম্রাজ্যিক স্বার্থলোভে। কেননা তারা জানত স্বাধর্ম্যের নামে বিধর্মী-বিদ্বেষ জাগিয়ে সাময়িক সাফল্য অর্জন সম্ভব হলেও বৈষয়িক ব্যাপারে এ কখনো স্থায়ী প্রেরণার আকর হতে পারে না। কাজেই বিধর্মী বিদ্বেষপুষ্ট ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উত্তেজনা দুই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সাময়িক সংহতি দান করলেও তা নিতান্ত নশ্বর। অতএব পরিণাম ভেবেই তারা সাম্রাজ্যবাদীর সাম্রাজ্যিক নীতি গ্রহণ করে শোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা রাখার উদ্দেশ্যেই। ইতিহাস বলে এবং সবাই জানে, কেবল বাহুবলে শাসন-শোষণ কায়েম রাখা চলে না। শাসিত জনকে অনুরক্ত করেই আনুগত্য আদায় করতে হয়। এর পরীক্ষিত ও অমোঘ ফলপ্রসূ উত্তম উপায় হচ্ছে, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে শাসিত জনের মনে-মেজাজে একপ্রকার মুগ্ধতার কুয়াশা রচনা করা। শাসকজাতির ভাষার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দর্শন ও ইতিহাস শাসিত জনের মনে মাকড়সার জাল তৈরি করে, তার ফলে শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি শাসিতজন শ্রদ্ধাবান ও সহিষ্ণু হয়ে উঠে। ধনের, মানের ও মর্যাদার ক্ষেত্রে শাসিতজনের হীনমন্যতা এবং শাসকগোষ্ঠীর উত্তমন্যতাও এ ক্ষেত্রে আনুকূল্য করে। চিরকাল এমনি উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসকরা শাসিতজনের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বা তার বিকাশ রুদ্ধ করে নিজেদের ভাষা ও বর্ণমালা চালু করেছে। এর ফলে শাসিতজনের বুদ্ধি হয় আড়ষ্ট, চিন্তাশক্তি পায় হ্রাস, দৃষ্টি হয় আচ্ছন্ন, মন থাকে অনুরক্ত। এমনি অবস্থায় আনুগত্যের স্বস্তিই হয় প্রজার কাম্য। প্রতীচ্যবিদ্যার ও সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশের শিক্ষিত সাধারণেও ব্রিটিশ-প্রীতি এমনি গাঢ় হয়ে উঠেছিল বলেই সিপাহী-বিপ্লব কালে তা যে শুধু নিষ্ক্রিয় ছিল তা নয়, ইংরেজদের বিপর্যয়ে উদ্বিগ্নও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল এবং ব্রিটিশ-বিজয়ে তাদের উল্লাসের সীমা ছিল না। অতএব শাসিত-মনে জরা ও জীর্ণতা দানের মোক্ষম উপায় হচ্ছে তাদের ভাষা কেড়ে নেয়া এবং শাসকগোষ্ঠীর ভাষা চালু করা।

৩

গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা অবচেতনভাবেই উপলব্ধি করেছিল পূর্ব বাঙলা হবে তাদের খাজনা উসুলের জমিদারী এবং শুল্ক আদায়ের বন্দর—একটি অনায়াসলব্ধ উপনিবেশ। ভেতো ও ভীতু বাঙালি নেতাদের প্রাণী বিশেষের মতো আনুগত্য তাদের লোভ ও ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল, বাঙালিরা তখন বেরাদরীভাবে বিগলিত। সামরিক ও বেসামরিক চাকরির ব্যাপারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিংবা আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের ন্যায্য দাবি উত্থাপনে তারা পরম উদারতায় উদাসীন। এই ঔদাসীন্য যেন চিরস্থায়ী হয়, তার জন্যে তারা নানা ছলাকলা উদ্ভাবনে সদাতৎপর। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'ইসলাম'। দেশে অমুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তবু বাঙালির স্থায়ী আনুগত্য লাভের দুরাশা বশে তারা বাঙালির মনে ইসলামী উত্তেজনা জাগিয়ে রেখে, তাদের মনে বিধর্মী-বিদ্বেষকে তথা হিন্দু-ফোবিয়ায় স্থায়িত্ব দানে প্রয়াসী, তার আনুষঙ্গিক উপসর্গ হচ্ছে মুসলিম তমদ্দুনের ধুয়া। আর তমদ্দুন রক্ষার জন্যে প্রয়োজন ইসলামী সাহিত্য এবং তা মিলবে উর্দুভাষায় ও সাহিত্যে এবং আরবি ফরাসি শব্দে। আবার এই উর্দুভাষা ও আরবি-ফরাসি শব্দ অনায়াস আয়ত্তে পেতে হলে উর্দু হরফে (বিকল্পে রোমান হরফে) বাঙলা লেখা প্রয়োজন।

এ সহজ সদ্বুদ্ধি যদি কুফরী মন না-ই গ্রহণ করে, তবে অন্তত কিছু হরফ বর্জন করে, বানান সরল করে বাঙলা ভাষাকে বিকৃত কর, যাতে তা পৃথক রূপ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় কাফের-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। অতএব, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিপ্রায়, এবং সে-প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে হরফ বদলানো, বানান পাল্টানো, আরবি-ফারসি শব্দ বসানো প্রভৃতির অভিসন্ধি মূলত এই ষড়যন্ত্রে সিদ্ধি-লক্ষ্যে প্রযুক্ত। পোষা হাতি দিয়ে বুনো হাতি বাঁধার মতো এসব অপকর্মে যারা নিয়োজিত, তারা আমাদেরই পরিজন। এজন্যে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সরল সাধারণ বাঙালির কাছে স্পষ্ট নয়। তাই তারা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত।

AMARBOI.COM

৪

বাঙালি-মনে জড়তা ও জীর্ণতা দানের গোপন উদ্দেশ্যে তারা যেসব পন্থা উদ্ভাবন করেছে এবং জাতীয় জীবন বিকাশে সেসবের উপযোগ ও ফলপ্রসূতা প্রমাণের জন্যে তারা সাধারণত যেসব যুক্তি উপস্থাপিত করে, আমাদের মন্তব্য-সমেত সেগুলো এখানে তুলে ধরছি :

১. তারা বলে বাঙলা আরবি-ফারসি শব্দ-বহুল ছিল। উনিশ শতকে পাদরী ও পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রে বাঙলা সংস্কৃতি-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। এর মূলে কোনো সত্য নেই। পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি চুহর অবধি কবির লিখিত রচনায় এবং গোপীচাঁদ-ময়নামতীর গান, পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহগীতিকা, বাউলগান থেকে অল্পশিক্ষিত আজকের কবির মৌখিক রচনা অবধি কোথাও আরবি-ফরাসি শব্দবহুল বাঙলার নমুনা মেলে না।

হাওড়া-হুগলী-কোলকাতা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ছিল আন্তর্জাতিক ও আন্তরাঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র। য়ুরোপীয়রা ছাড়াও ভারতের, ইরানের ও মধ্য-এশিয়ার লোক এখানে বাস করত। ফারসি ও হিন্দি ছিল Lingua Franca ভাব বিনিময়ের ভাষা। স্থানীয় বাঙলার সঙ্গে ফারসি-হিন্দির মিশ্রণে গড়ে উঠে খিচুড়ি বাঙলা। এর উদ্ভব ও প্রকৃতি অবিকল দাখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতোই। এটি ছিল বন্দর এলাকার সঙ্কর বাঙালির বুলি। উক্ত অঞ্চলের বাইরে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। 'সত্যপীর' পাঁচালী প্রণেতা এই অঞ্চলের হিন্দু কবিরা সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর বংশোদ্ভব বলে কথিত সত্যপীরের মুখে বিকৃত হিন্দুস্থানী বুলি প্রয়োগ শুরু করেন সতেরো শতক থেকেই। এঁদের অনুকরণে ১৭৬০ সনের পরেরকার কবি হুগলী বন্দরের শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ বাঙলা ও হিন্দুস্থানী বাক্‌রীতির মিশ্রণে কাব্যরচনা করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন হাওড়াবাসী কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ হামজা। উনিশ ও বিশ শতকে এ অঞ্চলের মালে মুহম্মদ, জনাব আলী, রেজাউল্লাহ, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ দানিশ, আবদুল মজিদ প্রভৃতি প্রায় শতোর্ধ্ব পেশাদার শায়ের উক্ত মিশ্ররীতি প্রয়োগে অনুবাদমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মীর মশাররফ হোসেন, রিয়াজ আল দীন, মাশহাদী প্রমুখ মুসলিম লিখিয়েরা এর নাম দেন 'দোভাষী রীতি'। বিশ শতকে হিন্দুরা এর নাম রাখেন 'মুসলমানী বাঙলা'। আর ১৯৪০ সনের পরে মুসলমানরা এ সাহিত্যের নাম দেন 'পুথি-সাহিত্য'। কোলকাতার ছাপাখানার বদৌলতে এগুলো সারা বাঙলা দেশে প্রচার লাভ করে। বিকল্প পাঠ্যগ্রন্থের অভাবে গ্রাম-বাঙলার স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান শতোর্ধ্ব বছর ধরে এগুলো পড়েছে—শুনেছে বটে, কিন্তু এর বাক্‌রীতি বা ভাষার দ্বারা কোথাও কেউ কখনো প্রভাবিত হয়নি। প্রমাণ পুথিসাহিত্য পড়ুয়া গ্রাম্য বাঙালির রচিত গান-গাথা, কবিতা এবং কথাবার্তা।

পূর্বোক্ত অঞ্চলে ছাড়া অন্যত্র বাঙলা ভাষায় যে আরবি-ফারসি শব্দ বিরল ছিল, তা কেবল হ্যালহেড্ বা ফরস্টারের উক্তি থেকেই নয়, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ-এর ভাষা থেকেও প্রমাণিত। উক্ত বন্দর ও শাসন-কেন্দ্রের সঙ্কর বাঙালিরা ছাড়াও দরবারীভাষা ফারসি শিক্ষিত অসাহিত্যিক বাঙালিরা কথাবার্তায় ও বৈষয়িক চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে দেদার ফারসি শব্দ ব্যবহার করত, এখনকার অসাহিত্যিক রচনায় কিংবা কথাবাতায় ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা যেমন অজস্র ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করে। তাই বলে গ্রাম-বাঙলার অশিক্ষিত মানুষকে পূর্বে ফারসি এবং এ যুগে ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত করেছে বললে সত্যের অপলাপই হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে বাঙলার পল্লী অঞ্চলের মুসলমান নারী-পুরুষদের যারা পুরুষানুক্রমে চিরকাল নিরক্ষর, তাদের উপর নিশ্চয়ই উনিশ শতকের পাদরী ও পণ্ডিতের কিংবা এ যুগের পুস্তকী ভাষার প্রভাব পড়ার উপায় ছিল না বা নেই। তবে তাদের আঞ্চলিক বুলিতে শাস্ত্রীয় কিংবা সরকার সম্বন্ধীয় পরিভাষা ব্যতীত অন্য আরবি-ফারসি-হিন্দির প্রভাব নেই কেন!

২. তারা আরবি-ফারসি শব্দের মধ্যেই ইসলাম ও তমদ্দুনের স্থিতি প্রত্যক্ষ করে। অথচ এ দুটোই ইসলাম-পূর্ব যুগের পৌত্তলিক-বেদীনের ভাষা। তবু 'আল্লাহ' ও 'ইলাহী' শব্দদুটোকে নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করতে অসুবিধে হয়নি। সাকার সকন্যা দেবতা মুহূর্তে নিরবয়ব স্রষ্টার ভাবরূপ লাভ করেছেন মুসলিম মনে, এমনকি ইসলামী অঙ্গীকারের মৌল শব্দগুলো—আল্লাহ, রসুল, মল্‌ক, জান্নাত, জাহান্নাম, সালাত, সিয়াম প্রভৃতি ইরানে খোদা, পয়গম্বর, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, নামায, রোযা রূপে অনূদিত ও গৃহীত হয়েছে। পাক-ভারতে ইরানী পরিভাষাই গৃহীত হয়েছে, তৎসঙ্গে খোদার দেশী পরিভাষাও যুক্ত হয়েছিল : নিরঞ্জন, নাথ, ধর্ম, করতার এবং বেহেস্ত-দোজখও হয়েছিল স্বর্গ ও নরক।

উল্লেখ্য যে একটি আরবি শব্দও সরাসরি পাক-ভারতের ভাষায় গৃহীত হয়নি। সব কয়টিই এসেছে ফারসির মাধ্যমে। আর উর্দু বলে কোনো ভাষা ছিল না বা নেই। বৈদিক ভাষার উত্তরভারতীয় আঞ্চলিক বুলিতে ফারসি শব্দের আধিক্যে ও ফারসি হরফ প্রযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু। উর্দু নামটাই অর্বাচীন। এটি একটি মঙ্গোলীয় শব্দ, অর্থ সৈন্য-শিবির। সামরিক বাহিনীর তথা সৈন্য-শিবিরের Lingua Franca অর্থে চালু হল এটি।

বিদেশাগত শাসক-প্রশাসক ও তাদের অনুচরেরা প্রয়োজনানুরূপ দেশী শব্দ আয়ত্ত করার অসামর্থ্যবশে উত্তরভারতীয় ভাষায় তুর্কী-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাব প্রকাশ করত এবং দেশী হরফ শিক্ষার ঝামেলা এড়িয়ে ফারসি হরফে পরবর্তীকালে লেখাও শুরু করল। এভাবে ফারসি শব্দবহুল এবং ফারসি হরফে লিখিত একটি ভাষা দাঁড়িয়ে গেল। তবু জাতি বিচারে উর্দু একটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। কেননা শব্দ দিয়ে ভাষার জাতি নির্মিত হয় না, হয় বাক্য-গঠন রীতি বা ব্যাকরণ দিয়ে। তাছাড়া শব্দের দিক দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই—সভ্যজাতির ভাষা মাত্রই মিশ্র। অবশ্য ফারসিও যে বৈদিকি ভাষার জ্ঞাতি-পহ্‌লবী ভাষার আধুনিক রূপ, তাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে ষোলো শতকের উত্তরভারতীয় কবি কুতবন, মালিক মুহম্মদ জায়সী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিয়া সাধন, এয়ারী, কবীর, দাদু, রজব, দরিয়া প্রমুখ সবাই আঞ্চলিক হিন্দিতে নাগরী হরফেই কাব্য রচনা করেছেন, তখনো ঐ রিখতার ভাষা ছিল হিন্দবী (আমীর খুসরু) দাখানী (দাক্ষিণাত্যে) দেহ্‌লবী (আবুল ফজল), হিন্দি বা গুজারী বা গুজরাটী (গুজরাটে)। শিবিরের ভাষা হিসেবে উর্দু নাম সতেরো শতকের শেষের দিকে সৈন্য-সমাজে হয়তো চালু হয়েছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 'উর্দু' নাম সাধারণ্যে চালু হতে থাকলেও উনিশ শতকের আগে এ নাম সর্বজনগ্রাহ্য বা তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। আঠারো শতকেও উর্দু গদ্য 'হিন্দি' নামে এবং উর্দু কবিতা 'রিখতা' নামে পরিচিত ছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের পত্রসূত্রে জানতে পাই উনিশ শতকের শেষার্ধেও দিল্লী থেকে বিহার অবধি অঞ্চলের ভাষার নাম ও হরফ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল। হিন্দুরা ছিল হিন্দি-নামের ও নাগরী হরফের পক্ষপাতী আর মুসলমানেরা ছিল 'উর্দু' নামের ও ফারসি হরফের অনুরক্ত। আরো দুটো তথ্য স্মর্তব্য : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন গিলখ্রাইস্টের প্রবর্তনাতেই উর্দুভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং এ ভাষা মুসলিম রাজশক্তির ও সংস্কৃতির পতন যুগেই বিকাশ লাভ করে। অতএব, এটি উজ্জীবিতের নয়, নির্জিতের ভাষা ও সাহিত্য। এ কারণেই সম্ভবত প্রখ্যাত মুসলিম কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার বাহন হয়েছে ফারসি—উর্দু নয়।

৩. এদের আর একটি যুক্তি : উর্দুভাষা ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য ও তমদ্দুনের আকর।

ভাষার গুণেই কী ধর্মীয় শাস্ত্র, সাহিত্য ও তমদ্দুন গড়ে উঠে? ধর্মভাব থাকে মনে, তা-ই প্রকাশিত হয় ভাষায় ও আচরণে। মুসলমানের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টাতেই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে। অমুসলমানের আগ্রহে যেমন ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় রচিত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিম সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ। বাঙলায় যে শাস্ত্রগ্রন্থ নেই—এ-তথ্যই বা তারা সংগ্রহ করল কিরূপে? আর যদি না-ই থাকে, তাহলে প্রয়োজনবোধে বাঙলায় ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন গ্রন্থ রচনা করতে ভাষাগত কিংবা স্থানগত বাধা আছে কি?

মানুষের মনের যে ভাব-ভাবনা জেগে উঠে, তা-ই তার ভাষায় লিখিত বা রচিত রূপে প্রকাশ পায়। বাঙালি যদি ইসলাম চর্চায় মনোযোগী হয়, সে প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে যেমন সে গ্রন্থ রচনায় সমর্থ, এ বিষয়েও সে কাজ করবে, বই লিখবে, বাইরের লোকের এ-ব্যাপারে মুরুব্বিয়ানা অহেতুক। কেননা বাঙালি মুসলমানরা হাজার বছরের পুরোনো মুসলমানের বংশধর। ইসলামের কী তার অজানা রয়েছে যে, সে রাজনৈতিক কারণে নতুন পীরের মুরিদ হবে? তাছাড়া নিছক ধর্মীয় কোনো তমদ্দুন থাকতে পারে না। তাই যদি হত, তাহলে ভূগোল ও কাল নিরপেক্ষ একটি নির্বর্ণ ও চিরন্তন বিশ্বমুসলিম সংস্কৃতি থাকত। দেশান্তরে ও কালান্তরে তা রূপান্তর লাভ করত না। বস্তুত দেশ-কাল-ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং শৈক্ষিক, আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রতিবেশবিরহী কোনো সংস্কৃতি কল্পনাতীত। সংস্কৃতি তাই স্বরূপত ব্যক্তিক ও অবস্থানিক বা পারিবেশিক। ইসলামে অনুরাগই যদি উর্দুপ্রীতির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে আরবিকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। স্মর্তব্য যে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দুর সবটা শাস্ত্রীয়ও নয়, সু-মুসলমানের রচনাও নয়। আজো উক্ত তিন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সব মুসলিম নন। আজো আরবিভাষী লোকের শতকরা পনেরো জন খ্রীস্টান ও ইহুদী। উর্দুও কেবল মুসলমানের দানে ঋদ্ধ হয়নি। কাজেই আরবি-ফারসি শব্দ ও সাহিত্য মাত্রই ইসলামী নয়, একাধারে অমুসলিমেরও। অতএব বাঙলা ভাষার নিন্দা-কলঙ্ক রটানোর মূলে অভিসন্ধিই ক্রিয়াশীল। ন্যায়ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাঙলাই হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বেরাদরীভাবে বিগলিত আত্ম-প্রত্যয়হীন হীনমন্য ও প্রভুগত প্রাণ বাঙালিরা সে-কথা ভাবতেও সাহস পায়নি। ফলে উত্তরভারতের ভাষা আপাতত আসন জুড়ে বসেছে পাকিস্তানে। এ অন্যায়েরও জবর-দখলের পক্ষে নৈতিক সমর্থন সঞ্চয়ের জন্যেই এত ছল-চাতুরীর আশ্রয় ও প্রশ্রয় জরুরি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে উর্দুকে অস্বীকার করবার মতো ভাষার ঐশ্বর্য ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানীদের। আজ তারাও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের অনলস সাধনায় তারা স্ব স্ব ভাষাকে অনেকখানি উন্নত করেছে। কাজেই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলবার মতো নৈতিক ভিত্তিও রচিত হয়েছে তাদের। এর মধ্যেই সিন্ধি, সারাইকী, পশ্‌তু ও বেলুচ ভাষীরা ভাষার ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তারা আত্মসম্মানবোধে ও পরিণাম চিন্তায় বিচলিত। তাই তারা আজ প্রবুদ্ধ ও উচ্চকণ্ঠ। আজ যখন পাকিস্তান প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস ও উল্লাস অপগত, আর স্ব-ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সচেতন এবং উর্দুও যখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আজো স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়, তখন পাকিস্তানে উর্দুর ভবিষ্যৎ নতুন করে যাচাই কর‍্যার সময় এসেছে। রাষ্ট্রভাষা হিন্দির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যেমন, উর্দুর বিরুদ্ধেও তেমনি প্রতিবাদী দল অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠবে—সে আশঙ্কা অমূলক নয়। ইতিমধ্যেই তার আভাস সুপ্রকট। পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্বতন প্রদেশগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ আশঙ্কাকে প্রবল করছে। কেননা, প্রদেশগুলোর সংস্থিতি ভাষা-ভিত্তিক।

৫

বাঙলা ভাষার সংস্কার-প্রয়াস সরকারি-উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানে তখন অনেক সমস্যা ছিল। বাঙলা ভাষার হরফ ও বানান কোনো সমস্যা ছিল না, তবু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাঙলা ভাষা সম্পর্কিত একটি কাল্পনিক সমস্যার সমাধান সরকারি অফিসে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে ভাষা-সংস্কার কমিটিগুলো পর পর গড়ে উঠে—সরকারি কমিটি, বাঙলা একাডেমী কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও ব্যক্তিগত প্রয়াস চারদিক মাতিয়ে তোলে। ঐদিকে আরবি হরফে বাঙলা লেখানোর অভিযানও সরকারি অর্থে চলতে থাকে। প্রয়াসটা যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক তা বুঝতে কারো বাকি থাকল না। উক্ত সব কমিটির সদস্যদের সবাই ভাষাবিদও ছিলেন না। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও ক্ষোভজনক আনাড়ির অনধিকার চর্চার আগ্রহ। অতএব কলকাঠি ঘুরাচ্ছিল যারা, তারা ছিল নেপথ্যে ; পুতুল ও যন্ত্ররূপে যাদের সুমুখে দেখেছি, তাঁরা আমাদের ঘরের লোক—অনেকেই শ্রদ্ধেয়। তাই জনমনে প্রভাব পড়েছিল তাঁদের। এই কপট হিতৈষীরা তাই আজো নির্বিঘ্নে 'ভাষা সংস্কার' রূপ মহাসমস্যা নিয়ে উদ্ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। মাঝে মাঝে তাঁরা দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠেন। আতঙ্কিত করেন আমাদের। এর পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য বাঙলা ভাষাকে বাঙালির মতানৈক্যের সুযোগে রাষ্ট্রভাষার অধিকারচ্যুত করা। আর আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য রোমান হরফ বা আরবি হরফ চালু করে এর বিকৃতি সাধন করে বিকাশ-পথ রুদ্ধ করা এবং তৎসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

১. তাঁরা বলেন, শব্দের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়া উচিত।—প্রশ্ন জাগে, পূর্ব বাঙলার কোনো দুটো অঞ্চলের উচ্চারণ একরকম নয়। ভাষাবিজ্ঞান বলে—কোনো দুটো মানুষই অবিকল একরকম উচ্চারণ করতে পারে না। এমনকি কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো শব্দ একই রূপে দুবার উচ্চারণ করাও সম্ভব নয়। তাহলে তাঁরা কোন্ অঞ্চলের কোন্ ব্যক্তির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান-পদ্ধতি নির্মাণ করবেন? তাছাড়া, যেহেতু উচ্চারণ জনে-জনে, স্থানে স্থানে ও কালে কালে বদলায়, সেহেতু উচ্চারণের অনুগত করে বানান সংস্কার করতে হলে প্রায় প্রতিজনের জন্যে ও প্রতিস্থানে এবং প্রতি পঞ্চাশ বছরে বর্ণ ও বানান বদলাতে হবে। তাহলেই কেবল বিজ্ঞান সম্মত সংস্কার সম্ভব। দুনিয়ার কোথাও কখনো শব্দের বানান উচ্চারণ-অনুগ হয় না।

উপরোক্ত কারণে হতে পারে না বলেই হয় না। লেখ্য ভাষার মাধ্যমেই এক দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহ্যিক জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করে। কেননা আঞ্চলিক বুলি প্রতিমুহূর্তে রূপান্তর লাভ করছে ও দেশের মানুষকে পারস্পরিক আত্মীয়তা ঘুচিয়ে স্বাতন্ত্র্য দান করছে। সেই লেখ্য ভাষার জোর নিহিত থাকে তার দীর্ঘকালীন অপরিবর্তনীয়তায়। অতএব, লেখ্য ভাষা মাত্রেই কৃত্রিম। কাজেই সাধারণ অর্থে 'মাতৃভাষা' বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা বুঝায়, আসলে এ তা নয়। বুলির মতো এ শৈশবে লভ্য নয়। একজন বিদ্বান বলেছেন, 'মাতৃভূমি মানে যেমন মামার বাড়ি নয়, মাতৃভাষাও তেমনি মায়ের মুখের বুলি নয়।' অন্যান্য বিদ্যার মতো লেখ্য ভাষাও একটি বিদ্যা এবং তা অনায়াসলভ্য নয়। অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভাষাও পরিশ্রম করে আয়ত্ত করতে হয়।

২. তাঁদের আর একটি যুক্তি—কিছু বর্ণ বর্জন করে বানান সংস্কার করলে, শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাষা শেখা সহজ হবে। কিন্তু তাতেই কী বানান ভুলের খপ্পর থেকে বাঁচা যাবে? বাধাকে—বাঁধা, চোরকে—চুর, বিধাতাকে—বিদাতা, বাড়িকে—বারি, ঘনিষ্ঠকে—ঘনিষ্ট, সম্বন্ধকে—সম্মন্দ লেখার বিড়ম্বনা থেকে শিক্ষার্থীরা উদ্ধার পাবে কী করে? আসল কথা: শিখবার, জানবার, বুঝবার যোগ্যতা ও আগ্রহ যাদের থাকে তারাই কেবল ভাষা সমেত যে-কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে।

কেউ কেউ বলেন Type, Telegraph ও stenography'-র জন্য বর্ণসংখ্যা কমানো দরকার। যন্ত্র তো আমাদের প্রয়োজনেই তৈরি। যন্ত্রকে আমরা আমাদের অনুগত করে নেব, আমরা কেন যন্ত্রের অনুগত হব? আরবি-উর্দু হরফের রয়েছে শব্দের আদ্যে-মধ্যে-অন্ত্যে তিনটি ভিন্ন রূপ। ইংরেজিরও Capital ও small letter যেমন রয়েছে, তেমনি হস্তাক্ষর পায় একেবারে ভিন্ন অবয়ব। তাছাড়া ইংরেজির কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। যেমন, C—ক, চ, Th—ত,দ, gh—ফ,উহ্য,ch—চ, ক, ou—আ, E—আ, এ, ই, a—এ্যা, আ, I—ই, আই, ইত্যাদি। এছাড়াও বর্ণের উচ্চারণ উহ্য তো থাকেই। কোনো ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বানান-অনুগ নয়। তবু আমরাই এ বিদেশী ভাষার প্রত্যেকটি বানান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করেছি! বাঙলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজানো, প্রত্যেকটা বর্ণ উচ্চারণসাধ্য। কেবল জ+ঞ=জ্ঞ ব্যতীত আর কোথাও বানানে ও উচ্চারণে অসঙ্গতি নেই। আধুনিক মুদ্রণালয়ে যুক্তবর্ণের অবয়ব সংস্কারের ফলে ব্যঞ্জন বর্ণগুলো প্রায় সর্বত্রই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল স্বরবর্ণের 'কার' ও কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা'-ই যা ব্যতিক্রম।

৩. তাঁদের কাছে, ত-ৎ, ই-ঈ, উ-ঊ, ঋ-রি, ন-ণ, জ-য, খ-ক্ষ, ঙ-ং, ব-ভ মহাসমস্যার বিষয়। অথচ সব ভাষাতেই এমনি আপাত ঐক্যের পৃথক বর্ণ রয়েছে। ইংরেজিতে g-j-z, c-k, a-u-e, j-s, F-gh, x-ks, ct, cz ইত্যাদি এবং আরবিতে রয়েছে জিম-জাল-ডাল-জে-জোয়াই, কাফ-ক্বোয়াফ, হে-হামজা, আলিফ-আইন ইত্যাদি। তাছাড়া কৃত্রিম স্বর-চিহ্ন যুক্ত না হলে যে-কোনো স্বর যোগে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের শুদ্ধ-প্রতিম বিকৃত উচ্চারণ সম্ভব।

৪. পাকিস্তানে সম্প্রতি চারটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। শাস্ত্রীয় ভাষা আরবি, সরকারি ভাষা ইংরেজি এবং রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাঙলা। কেবল বাঙলা বানান সংস্কার করে কোনো লাভ হবে না, করতে হলে উক্ত চারটি ভাষারই উচ্চারণ-অনুগ বানান সংস্কার করতে হবে। তাহলেই আমাদের মহৎ জাতীয় উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হবে। অর্থাৎ উক্ত চার ভাষারই একটি করে পাকিস্তানীরূপ রচনা করতে হবে। তা কেবল পাকিস্তানীর হিতার্থে পাকিস্তানেই চলবে। যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজি, আরবি, উর্দু ভাষা সংস্কারে আমাদের অধিকার না থাকে, তাহলে বাঙলাতেও কী সে-অধিকার থাকে? কেননা, পাকিস্তানের বাইরেও বাঙলা ভাষার মালিক আছে। অতএব, অপর তিনটে ভাষাই যখন যথাপূর্ব সকল জটিলতা ও অসঙ্গতি নিয়ে আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত রয়েছে, তখন বেচারা বাঙলাকেও দয়া করতে বাধা কি?

৫. তাছাড়া, লেখ্য ভাষার প্রয়োজন কেবল শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত লোকেরই। শিক্ষার্থীর শিক্ষা কেবল ভাষার উপর নির্ভর করে না। জটিলতর বিষয় ও বিদ্যা তাকে অর্জন করতে হয়। ভাষা বুঝলেই অঙ্ক কষা যায় না; কিংবা ইতিহাসে দর্শনে জ্ঞান অর্জিত হয় না। কিংবা দ্বিতীয় পাঠের সুবোধ বালকের গল্পের ঋজু ভাষা দিয়ে দর্শন বা মনোবিজ্ঞান শেখা চলে না। অতএব ভাষার সারল্য ও জটিলতা বিষয়ানুসারী। যে বয়সে শিশু বর্ণশিক্ষা করে সে-বয়সে তার ধীশক্তি বিকশিত থাকে না। কাজেই তার শিক্ষা অনেকটা চোখ-কান নির্ভর ও স্মৃতিভিত্তিক। এজন্যে তার কাছে সরল-জটিলের পার্থক্য সামান্য। 'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই' যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত, 'যাহা চাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহা ভুল করে চাই'-ও তেমনি। তাই বলে কী যে-কোনো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকই কী শেষোক্ত চরণের তাৎপর্য বুঝবে? তার জন্যে বয়স ও বিদ্যার প্রয়োজন হয় না কি?

অতএব, অশিক্ষিত লোকের লেখ্য ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই। এবং সব শিক্ষিত লোকেরও ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তাদের বৈষয়িক জীবনে প্রযুক্ত ভাষায় বর্ণাশুদ্ধি কিংবা বাক্যাশুদ্ধি চিন্তায় বা কর্মে কোনো বিপর্যয় ঘটায় না। আর বানান শুদ্ধ হলেই যে ভাষাও বিশুদ্ধ এবং অর্থগ্রাহ্য হবে—তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ব্যাকরণ তথা শব্দের অভিধা, আসত্তি ও বাক-রীতি (syntax) আয়ত্তে না থাকলে ভাষা শুদ্ধরূপে বলা বা লেখা চলে না; আর ভাষা শুদ্ধ হলেই যে সুন্দর ও অভিপ্রেতভাব প্রকাশক হয় না, তার জন্যে যে বক্তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রুচি, ভাব ও প্রকাশ-সামর্থ্য প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজন শিক্ষকের, সাহিত্যিকের, চিন্তাবিদের ও পণ্ডিতের। তাঁরাই নতুন ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে বিদেশী ভাব ও বস্তুর পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে ভাষার অনুশীলন করেন। ভাষা তাদের পেশার ও নেশার অবলম্বন। তাই ভাষা তাদের সর্বক্ষণের সাথী এবং অস্ত্র ও শাস্ত্র। এঁদের জন্যেই ভাষার অবিকৃত রূপ রক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে ধাতু ও শব্দমূলের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকে। কেননা প্রকাশের প্রয়োজনে তাঁরা সর্বক্ষণ শব্দ খুঁজে বেড়ান এবং প্রয়োজনবোধে তাঁরা শব্দ সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টির উপকরণ হচ্ছে ধাতুমূল বা শব্দমূল। ওগুলো জানা না থাকলে নতুন শব্দ সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পূর্ব বাঙলার সরকার, বাঙলা একাডেমী ও বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ইংরেজি শব্দের বাঙলা পরিভাষা তৈরির জন্যে তামদ্দুনিক প্রবণতাবশে আরবি ও ফারসির সাহায্য নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বহুনিন্দিত সংস্কৃত ধাতু ও শব্দমূলকেই সম্বল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক : 'ক্ষা', ও 'সা'—এ দুটোই ইচ্ছা বাঞ্ছাব্যঞ্জক প্রকৃতি। এগুলো দিয়ে আকাঙ্ক্ষা, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, তিতিক্ষা কিংবা বুভুক্ষু, তিতিক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ তৈরি হয়েছে ; তেমনি পিপাসা, জিজ্ঞাসা, জিঘাংসা, উপচিকীর্ষা, অপচিকীর্ষা, লিপ্সা, বিবমিষা প্রভৃতি শব্দ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এমনি করে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে প্রয়োজনমতো অসংখ্য শব্দ রচিত হয়ে ভাষাকে ঋদ্ধ ও সর্বপ্রকার ভাব-চিন্তা-অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য করেছে। এভাবেই শব্দগুলো বিভিন্ন তাৎপর্যে সূক্ষ্ম ভাব-প্রতিম ও প্রমূর্ত-অনুভব হয়ে উঠে। মানব-মনীষার বিমূর্ত জগৎ এমনি করে সমূর্ত হয়ে ধরা দেয় সাধারণের কাছে।

জীবন যেহেতু গভীরতর অর্থে অনুভবের সমষ্টিমাত্র এবং যেহেতু সে-অনুভূতি অনুভবযোগ্য হয়ে রূপ পায় ভাষায়, সেহেতু ভাষা জীবানুভূতির নামান্তর মাত্র। মানুষের মানসার্জিত যা-কিছু সম্পদ তা বলতে গেলে এই ভাষারই দান। কাজেই সে-ভাষা নিয়ে আনাড়ির আস্ফালন শুধু-যে ঔদ্ধত্য, তা নয়, মারাত্মকও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের আলোকে আত্ম-দর্শন

মুঘল-পূর্ব যুগের ভারতের মুসলিম শাসকরা পরিচিত ছিলেন তুর্ক বা তুরুক নামে। এঁদের অবশ্য স্বতন্ত্র গোত্রীয় ও দৈশিক নাম ছিল, যেমন খালজি, তুঘলক, লোদী, উজবক, আইবক, ঘোরী প্রভৃতি। তাঁরা যেমন একগোত্রীয় ছিলেন না, তেমনি তাঁরা এক অঞ্চল থেকেও আসেননি। মধ্য এশিয়ার ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল তাঁদের বাস।

মুঘল-পূর্ব যুগে ভারতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই এঁদেরকে তুর্ক বা তুরুক বলে অভিহিত করা হয়েছে; জাতি-পরিচয়ে কোথাও মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ধর্ম প্রসঙ্গে মুসলমান বলে আখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালেও মুঘল, ইরানী, হারুই, বলখী, খোরাসানী, পার্সী, বোখারী, সমরখন্দী, কাশঘরী, তাব্রেজী, কুনিয়াঈ, কাবুলী, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফিরিঙ্গি, আমানীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, হার্মাদ, ফরাঙ্গিস প্রভৃতি নিবাসগত নামই পাই। অতএব মধ্যযুগে জাতি-পরিচয় ছিল দেশগত—ধর্মগত নয়। হিন্দু ও হিন্দুস্তানী পরিচয়ও দেশগত। এও বলা চলে বিদেশীরা এভাবেই এদেশে পরিচিত হত।

প্রমাণে ও অনুমানে বোঝা যায়, দেশজ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতি-পরিচয় শুরু হয়। এবং তা মুঘল আমলেই বহুল প্রচলিত হয়। তখন থেকেই ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দুর্ভাগ্যের শুরু। কেননা, ধর্মচেতনা প্রবল হলে চৈত্তিক সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায়। স্বধর্মী না হলেই মানুষকে পর ভাবা, শত্রু মনে করা এবং অবিশ্বাস করা ধার্মিক মানুষের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। এই হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরিচয়ের প্রাবল্যবশে মুঘল আমলেই শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈর, দাঙ্গা ও হাঙ্গামা। ইংরেজ আমলে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যখন ঘুচে গেল, তখন সমকক্ষতার ঔদ্ধত্যে ও দ্বন্দ্বিক স্বার্থের প্ররোচনায় লোভের ও লাভের বৈষম্যে এই বিরোধ ও বিবাদ বেড়ে চলে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তা বর্বর পাশবিক মত্ততার রূপ ধারণ করে। নরহত্যার বীভৎসতা তাদের মনে উল্লাস জাগায়।

এ ব্যাপারে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগই অধিক। একে তো ভারতরাষ্ট্রে তারা সংখ্যালঘু ও হিন্দুর অনুগ্রহজীবী, তার উপর মিথ্যা পরিচয়ে তারা হিন্দুর প্রতিহিংসাবৃত্তির শিকার। মধ্য এশিয়ার ও আরব-ইরানের বহুলোক শাসক ও শাসক-সহচর রূপে ভারতে আসলেও তাদের সংখ্যা এখনকার মুসলমানদের শতকরা তিনজনের বেশি যে নয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা যেসব দেশ থেকে মুসলমান শাসকরা এসেছে, সেখানেও জনসংখ্যা আজো বেশি নয়। এই ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের ফলে দেশী মুসলমানেরা কিছুটা মিথ্যা গৌরব লাভের দুর্বলতা বশে এবং কিছুটা আত্মপরিচয় বিস্মৃতির দরুন এই বিদেশী শাসক ও শাসক সহচরদেরকে নিজেদের জ্ঞাতি ভাবতে অভ্যস্ত হয়। এভাবে তাদের নিন্দা-গৌরবের ভাগীও হয়ে যায়। বিদেশী, বিজাতি ও বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে স্বাভাবিক ক্ষোভ ও বিরূপতা ছিল, ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবোধ বিকাশের ফলে তা তাদের মনে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে এবং সাহিত্যে, ইতিহাসে ও রাজনীতিতে বিষবৃক্ষ জন্মাতে থাকে। আত্মবিস্মৃত দেশী মুসলমান যেমন তুর্কী-মুঘলদের নিন্দা-গৌরবকে নিজেদের বলে ভাবে, তেমনি তুর্কী-মুঘল শাসকের প্রতি অমুসলমানদের আরোপিত ও উচ্চারিত কলঙ্ক আর নিন্দাও তাদের গায়ে লাগে। তারা গায়ে মাখে বলেই হিন্দুরাও তাদেরকেই তুর্কী-মুঘলের বংশধর বলে জানে এবং পুরোনো পীড়ন ও ক্ষোভ স্মরণ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

আজকের সংখ্যালঘু ভারতীয় মুসলমানের দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের অর্ধেক কারণ এ-ই। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি থেকে সাধারণ হিন্দুর মুক্তিলাভের আশু সম্ভাবনা কম। কাজেই ত্রস্ত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানের যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাদের ত্রাণপথ দৃষ্টি-সীমার মধ্যে নেই। পাকিস্তানেও হিন্দুনিধন হয়েছে, তবে তা সবসময় প্রতিশোধমূলক। উত্তেজনার কারণ ঘটিয়েছে ভারত। ভারতে হাজারোর্ধ্ব বার বড়-ছোট মুসলিম হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান অনুপম সংযম ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব বাঙলায় প্রতিশোধমূলক দাঙ্গা হয়েছে মাত্র চারবার কী পাঁচবার এবং নিজেরা বাধিয়েছে দুবার। এ তারতম্যের কারণও হয়তো শাসক জাতির অভিমান-পুষ্ট মুসলিম-মনে হিন্দু-বিদ্বেষের অভাব।

তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদেরকে ধনে-মানে-বিদ্যায় উন্নত দেখেও অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, সেই শ্রদ্ধার রেশও উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর হয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, তাই সেখানে হিন্দুরা মুসলমানকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে না। তাদের বর্তমান অস্তিত্ব গ্রাহ্যের মধ্যে নয় বলেই হিন্দুরা তাদের প্রতি উদাসীন, তাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। একই কারণে খ্রীস্টান কিংবা পার্সীরাও নির্বিঘ্ন। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম সংখ্যা নগণ্য নয়, আর দিল্লী-কেন্দ্রী মুসলিম শাসনের স্মৃতিও হিন্দুমনে অম্লান। কাজেই পূর্বের লাঞ্ছনা-স্মৃতি, সম্পদ-লোভ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তর ও মধ্য ভারতীয় হিন্দুমনে মুসলিম-নিধনে ইন্ধন যোগায়। এছাড়াও ধনে-জনে হৃতসর্বস্ব উদ্বাস্তুদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও অসহিষ্ণুতা এবং জীবিকাসমস্যাও উত্তরভারতে ঘন ঘন মুসলিম-হত্যায় প্ররোচনা দান করে। এর উপর সুবিধাবাদী রাজনীতির খেল্ তো রয়েইছে।

২

AMARBOI.COM

তুর্কী-মুঘল ও আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্ববোধ অন্যদিকেও মধ্যবিত্ত দেশী মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করেছে। তারা নিজেদের চিরকাল স্বদেশে প্রবাসী ভেবেছে। তারা অনুকরণ করেছে বলখী-বোখারীর, স্বপ্ন দেখেছে আরব-ইরানের, অনুসরণ করেছে দেশ-কাল-প্রতিবেশহীন জীবন-পদ্ধতি। তারা প্রতিবেশের অনুগত করে জীবন রচনায় ব্রতী হয়নি। এই প্রাতিবেশিক প্রয়োজনের অস্বীকৃতিতে তাদের জীবন ছিন্নমূল ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। তাই বিগত হাজার বছরের মধ্যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই দেশজ মুসলমানের উচ্চমানের কোনো অবদান প্রত্যক্ষ নয়। যে-মাটিতে তারা লালন পেয়েছে, সে মাটিকে তারা ভালবাসেনি। ধাত্রীরূপেও গ্রহণ করেনি। ইসলাম গ্রহণের পরে মধ্যবিত্ত দেশজ মুসলমানের দৃষ্টি আর কখনো মরুভূ আরব ও সরাব-সাকীর ইরান অতিক্রম করে স্বদেশে ফিরে আসেনি। তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম লিখিয়ে-আঁকিয়েদের আলোচ্য ও অনুধ্যেয় বিষয় ছিল ইসলামপূর্ব ও ইসলাম-উত্তর যুগের আরব-ইরানী পুরাণ, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শন। হাফিজ জালন্ধরী, ফররুখ আহমদ অবধি সে-ধারা রয়েছে আজো অব্যাহত।

এই পদ্মা-কোকিলের দেশের মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে রূপ দেখে বসোরাই গোলাপের, গান শোনে নাইসাপুরী বুলবুলের। বিন্ধ্য-হিমালয়ে তাদের মন ভরে না, হেরা-সিনাই-তুরে তাদের আকর্ষণ, আম-কলা-কাঁঠালে তাদের রুচি নেই, আরবি খেজুরে তাদের লোভ, দেশের শ্যাম-নীলিমায় তারা ক্লান্ত, সাহারা তাদের মন ভোলায়। অমুসলিম হাতেম-নওশেরোয়াঁ-রুস্তম তাদের আত্মীয়, পর হল কর্ণার্জুন-যুধিষ্ঠির। এমনি বিকৃত মন-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিল বলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ ছিল না। বাস্তবকে তারা অবহেলা করেছিল, কিন্তু স্বপ্নও ছিল অনায়ত্ত। যদি দেশ-কাল-প্রতিবেশের প্রয়োজনানুগ জীবন-ভাবনায় তারা ব্রতী হত, তাহলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ জীবনের ফসলে ভরে তুলতে পারত তাদের জগৎ। তাতে তাদের মানস-জগৎ হত প্রশস্ত, চিত্তলোক হত আলোকোজ্জ্বল, গড়ে উঠত তাদের স্বকীয় একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। জীবনে, সাহিত্যে, দর্শনে তাদের অবদান হত গৌরবের ও গর্বের। স্বধর্মীর ইতিহ্য-গৌরবের সন্ধানে রিক্তচিত্তে কাঙালের মতো স্পেন থেকে গোবী মরু অবধি এমনি মানস-বিচরণের প্রয়োজন হত না। আধুনিক আরব, ইরান, মধ্য-এশিয়াও নয়, মধ্যযুগের মধ্য-এশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে আজো তারা আওয়ারা হয়ে শক্তি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শ, ঐশ্বর্য ও প্রেরণার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা বাস করে একালে, ধ্যান করে অতীতের, স্বপ্ন দেখে মরুভূর।

৩

আরো বড় বিড়ম্বনার কথা, যে-তুর্কী-মুঘলের জাতিত্ব-স্বপ্ন দেশজ মুসলমানদেরকে চেতনার ক্ষেত্রে দেউলে করেছে, সে-তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী কখনো দেশী মুসলমানকে আপনজন ভাবেনি। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যই করেছে চিরদিন। তারা ছিল ঐশ্বর্যের উল্লাসে, প্রতাপ ও প্রভাবের দাপটে, আভিজাত্যের গর্বে, উপভোগের আনন্দে ও প্রতিপত্তির গৌরবে আকাশচারী। দেশী মুসলমানের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক কোনো সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। দেশী খ্রীস্টান ও ইংরেজের মতোই ছিল সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য। তারা তুর্কী-মুঘল শাসকের অনুগ্রহে আর্থিক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়নি। বড় চাকরিগুলো পেত বিদেশাগত মুসলমানেরা। এ পার্থক্য মুঘল আমলের শেষ দিন অবধি বর্তমান ছিল। তারা এদেশকে ও দেশের মানুষকে স্বদেশ ও স্বজাতি বলে গ্রহণ করেনি। সাতশ বছর শাসন-শোষণ করেও তাঁরা এদেশকে মনে করত 'দারুল হরব্'। অতএব দেশী মুসলমানকে তারা—ইংরেজ যেমন করত দেশী খ্রীস্টানকে—কী অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যই না করত! তুর্কী-মুঘলের জাতিত্বগর্বী উত্তরভারতীয় আজকের মুসলমানদের বাঙালির প্রতি অবজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সেই পুরোনো স্মৃতির রেশ। তার প্রমাণ পাই এক ঐতিহাসিক দলিলে। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ দরবারের পদস্থ মুসলিম কর্মচারীরা মেজর মুন্‌রোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদনের জন্যে চুক্তিপত্রের যে-খসড়া তৈরি করেছিল, তার দু-একটি শর্ত এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যাবে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী সাতশ বছর পরেও বিদেশী শাসক-শোষকই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ্ এবং আকবর ও জাহাঙ্গীর এর ব্যতিক্রম।

"The company should in every respect regard as its own the honour and reputation of the Mughals who are strangers in this country and make them its confederates in every business. Whatever mughals whether Iranis or Turanis come to offer their services should be received on the aforesaid terms..... [and that] should anyone be desirous of returning to his own country... he should be discharged in peace." [Quotation from Foot note 5. (pp. 12-13)] "India, Reza Khan maintained. as a Dar-ul-Harb." (Reza Khan's note, Francis MSS. (I.O) Eur E 13 P. 417) He obviously shared the current notion of the Muslim Rulers in India, To whom it was not strictly a Dar-ul-Islam—a muslim homeland. Muslims living in Hindustan (that is, North India) did so according to the same notion, as rulers or as sojourners only]—Calender of Persian Correspondence Vol. 1. No. 2423. Quoted by Dr. abdul Majed Khan in 'The transition in Bengali'. (1765-75A. D.) p.12, and see also his Foot note 5. at PP. 12-13*

অথচ বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানরা সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, টিপু ও বাহাদুর শাহ্-ওয়াজেদ আলির জন্যে পরম মমতায় ও চরম আত্মীয়তাবোধে কী কান্নাটাই না কাঁদে! দেশী মুসলমান যে বাদশাহ্‌র জাত ছিল না এবং মুঘল-শাসনের অবসানে তারা যে রাজ্যহারাও হয়নি, এ সত্য যতদিন উপলব্ধি না করবে, ততদিন তারা আত্মস্থ হবে না এবং আত্মত্রাণ, আত্ম-নির্মাণ ও আত্মোন্নয়নের সত্য ও সুষ্ঠু পথও তারা খুঁজে পাবে না।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সূত্রে মুঘলদের দুর্ভাগ্যের কথাও মনে জাগে। পারস্য রাজ্যের সহায়তায় দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন হুমায়ুন। সেই কৃতজ্ঞতায় ও অনুরাগে হুমায়ুন ইরানীদের চাকুরির আকারে আশ্রয় ও প্রশয় দিতে থাকেন। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে শাহ্ আলমের কালাবধি বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে রাজ্যে ও রাজকার্যে ইরানী প্রভাব ও প্রতাপ পূর্ণতা পায়। এসব লোক ব্যক্তিগত লাভ ও লোভকেই জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য করে নিয়েছিল। এদের সঙ্গে জুটেছিল মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার আরো বহু গোত্রীয় মানুষ। ভারত ছিল তাদের চোখে সম্পদ আহরণের নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র। রাজা ও রাজসরকারের সঙ্গে তাদের কোনো মমতার সম্পর্ক ছিল না। আনুগত্য ছিল চাকুরিগত। তাই দুর্বল বাদশাহর অক্ষমতার সুযোগে তারা মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করে নিল।

মুঘল বাদশাহ্রা যদি স্বগোত্রীয়দের উপর নির্ভর করতেন, তাহলে গোত্র-স্বার্থেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সাধনে তারা যত্ন করত। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ছিল অমুঘল শাসক ও সেনাপতির আধিক্য। এরা সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে স্ব স্ব স্বার্থে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল। এখানে ইবন-খালদুনের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, কৌমচেতনা ও কৌমের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসেই রাজশক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও স্থিতি সম্ভব হয়। এবং সাম্রাজ্যের আয়ত্তাতীত ভৌগোলিক বিস্তৃতি, রাজ-পরিজনের বিলাসিতা, কৌম-চেতনায় শৈথিল্য ও আলস্য, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রভৃতিই রাজবংশের পতনের মুখ্য কারণ। অন্তত মুঘল সাম্রাজ্য বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত কারণগুলি সত্য হয়ে উঠেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন খালদুনের আমলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তার উন্মেষ হয়নি। তাই তিনি গোত্র ও কৌম-চেতনার কথা বলেছেন। এ যুগে হলে তিনি দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাধ ও দেশপ্রেমের অভাবই দেশ বা জাতির রাষ্ট্রিক-পতনের কারণ বলে নির্দেশ করতেন।

পরিশিষ্ট

কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

Calender of Persian Correspondence.

1764 2416. Zainul-abidin Khan to Major Munro. Has
Sept. 22. received through Asad khan his letter desiring the writer to joint the English army with as many able-bodied and well-mounted Moghals, Turanis, etc as possible. Although it is dishonourable for all men, particularly for men of family, to desret the service they are engaged in and go over to their Master's enemies, yet there are several reasons which justify such conduct in the Moghals. First, the Wazir, not withstanding his oath upon the Quarn, murderd the Nawab Muhammad Quli Khan, who was the glory of the Moghals, and who to the writer was dearer than a father or a brother. Secondly, the Wazir's behaviour to the Nawab Mir Qasim, who is a descendant of the Prophet, has been very shameful. It is not allowed by any religion that a person, who flees to another for protection with his family and effects, even if he be a person of low rank, should meet with treatment other than friendly. "Why then has he in violation of his oath and agreement behaved in such a manner as to incur universal censure and reflect disgrace upon the Moghal name?" Thirdly, he has never failed to break every engagement he has entered into and every oath he has taken. Fourthly, neither he

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

nor his ministers pay any regard to his own sign-manual. Fifthly, with regar to the Moghals, who are starngers in this country, and who, having nothing to depend upon but their monthly pay, are brought ot distress whenever that is stopped, he thinks of nothing but how to oppress and ruin them. Moreover, he takes no notice of men and family, but places all his confidence in low and worthless people. Sixthly, he by no means makes a proper distinction between his friends and his enemies, but makes a practice of countenancing the latter and ill-treating the former. The assisting and supporting of such an oppressor is neither conformable to reason, nor to the Quran, nor to the rules of any religion, and the quitting of his service can reflect no dishonour upon anyone either in the sight of God or man. There fore if the English, who are celebrated for thir Justice and good faith, are desirous of an alliance with the Moghals, and are willing to agree to their just demands and swear to the observance of the agreement by the names of Jesus and Mary, and if the gentlemen of the Council put their seals to it and speedily forward it, a great number of Moghals and Turanis will without delay join the English army. Praises Ali Riza Khan and desires the Major to invite him back to the English service. Assures him that the said Khan was carried away to the Wazir's camp, contrary to his own inclinations, by his troop of horse and the people of Tikari, that inspite of his Highness's solicitations, he has refused to enter his service, that he has been greatly oppressed on account of his connection with the English, and that he is sincerely attached to them. Refers him to Mirza Iwaz Beg for particulars.

(Trans P. L. R., 1759-64, No. 239. p.p. 476-478. Abs. P. L. R, 1759-65. P. 85.

Sept. 22. 2418. Zainul-abidin Khan to Asad Khan. Has received his letter together with Major Munro's letters for the writer and Muhammad Baqir Khan. The Moghals, who have all been informed of the addressee's commands, met and unanimously resolved to draw up a treaty and send it to him for his approval and for transmission to the gentlemen of the English council, that they may set their seals to it and swear to the observance of it upon the Bible and "in the name of the Prophet Jesus and the Prophet Mary." "God forbid" that in the service of the English, the Moghals should meet with the same treatment as in that of the Wazir, and that when their business is done, they should be turned away, remote as they are from their native country and brouht to shame and distress. The addressee is a chief of the Moghals and a man of family and understanding. He should settle matters to his satisfaction. Whatever staisfies him,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

will satisfy the writer. And Whatever satisfies the writer, will satisfy all the Moghals. The merit or demerit of whatever may be done will be attributed to the writer, and the writer, before God, The prophet, and the common father of the Moghals, will attribute it all to the addressee. Desires that the territory by the Ganges and the Jumna may be made over to the Moghals rent-free. Mirza Taqi Khan, Muhammad Baqir Khan, Ali Riza Khan, Rustam Beg, Baba Beg Khan, Muhammad Taqi Khan, Muhammad Tahir Beg, Masum Ali Beg and all the other chiefs have empowered the writer to act for them. Mirza Muhammad Hasan is also ready to join in the conspiracy. Has heartily engaged himself in this dangerous business, Which may be the cause of much bloodshed. Ali Riza Khan has refused to enter the Wazir's service, although His Highness has offered him Rs. 1,000 a month besides a present of Rs. 2,000, which is more than he gives to any of his officers. Requests the addressee to prevail upon the English to invite him back to their army. Requests him also not to invite Mirza Mahdi Ali Khan to join the Moghals, lest he should take the first place. Will rejoice at the addressee's elevation to the Nizamat of Oudh, irrespective of whether he is favourable to the writer or not, as it will conduce to the happiness of thousands of people, and as the interest of one individual must not be put in competition with that of the public. He is a man of understanding, but as the writer is more advanced in years, he takes the liberty of advising him that he should not do anything that may lessen him in the estimation of the English, who are men of penetration and foresight, and whose undertaking are conducted with wisdom. Requests to be favoured with a speedy reply. Refers him to Mirza Iwaz Beg for other particulars. PS.—Requests him to procure as soon as possible a line or two from Major Munro to Rustam Beg Afshar and Baba Beg Khan, who are both men of consideration among the Moghals. (Trans. P.L.R., 1763-64, NO. 241, PP. 480-483. Abs P.L.R., 1759, P. 85).

Sept. 22. 2423. Paper of articles sent by the Moghals to Major Munro.

(1) The Company should in every respect regards as its own the honour and reputation of the Moghals, who are strangers in this country, and make them its confederates in every business. (2) They should be granted a proper place in the country of the habitation of their families and dependendants. (3) Whereas sixty rupees a month have been fixed for all but Jamadars, Hawaldars, and Dafahdars, there are several privates who have always been distinguished and have received from one to three hundred rupees a month. These men

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

should be allowed something more than what they received in the Wazir's army. (4) Whatever Moghals, whether Iranis or Turanis come to offer their services, they should be received on the aforesaid terms. Moreover, a present of Rs. 100 per head should be immediately given them and a month's pay advanced them. (5) At present there should not be raised any difficulties as to the size of horses. (6) Whenever a Moghal is killed in battle or dies a natural death, his son or relation should be received in his place. (7) As several men are in debt, a small sum of money should be sent to enable them to discharge their debt. (8) Should anyone be desirous of returning to his own country, his arrears should be immediately paid and he should be discharged in peace.
(Trans. P.L.R. 1763-64, NO. 246, pp. 491-492)

Sept. 22 2424. Shah Mal, Qaladar of Rohtas, to Major Munro. Has answered his several letters. Remains firm in the fort in the hope of his favour and protection. Mir Sulaiman has arrived at Batein (?) fort in Akbarpur, idly relying upon his Highness's deceitful promises of kindness and reward. But he has been plainly told that the people of Rohtas fort will by no means submit to the Wazir, Whose behaviour to the Nawab Ali Jah (Mir Qasim) has not been such as to make them believe that it will be for their interest to do so. Hopes that the Major will send some assistance as soon as possible. Numbers of the enemy's troops are coming towards Rohtas. Some have already arrived at Tilloot, while other are stationed at Sasaram. If he is not speedily supported, he has no expectations but of becoming a sacrifice. Has already sent a paper of requests. Desires that an agreement properly executed and assuring him of protection may be sent. Desired also that some money may be granted to the people of the fort. They are now the company's servants, and any disgrace that they may suffer, will fall upon the English.
(Trans. P.L.R, 1763-64, No. 247, pp, 486-488. Abs. P.L.R, 1759-65, p. 83)

Sept. 22 2424A. Shah Mal, Qal-adar of Rohtas, to Major Munro. Has received his letter agreeing to set his hand to the writer's paper of requests, but saying that Mir Asad Ali, the bearer of it, has not yet arrived. Encloses another paper. Although he is fully satisfied with what the Major has said in his letter, yet in compliance with the custom of the world, he requests that the paper will be properly signed, sealed and speedily sent to Rohtas together with some money

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

and a body of troops. The enemy's troops, which were at Tilloot, have scattered themselves on every side. Should they surround the fort, the garrison will be greatly distressed for want of provision. Makes repeated appeals for help. Refers him to Mir Asad Ali and Dr. Fullarton for particulars.
(Trans. P. L. R, 1763-64, No. 248, pp, 488-490. Abs. P.L.R. 1759-65, p, 84)

N.B : Abbreviations.

Abs. P.L.R.— Represents the volume of Abstracts of Persian Letters received.

Trans. P. L. R.— Represents the volume of Translations of Perisian letters received.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি প্রতারক প্রত্যয়

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উন্মেষ যুগে তা আক্ষরিকভাবে অনুসৃতির প্রয়াস ছিল। তবু স্বার্থের ব্যাপারে সে-শিক্ষা ও সৌজন্য অবহেলিত হয়েছে বারবার। এতে একটি সত্য প্রতিষ্ঠা পায় : লোভের ও লাভের ক্ষেত্রেই হয় আদর্শের পরীক্ষা, আর লিপ্সার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এবং স্বার্থের সংগ্রামে আদর্শ সাধারণত হার মানে। লোভ ও লাভ-চেতনা চিরকালই প্রবল এবং সে-কারণেই বাস্তব। আদর্শবাদ ও নীতিবোধ সুন্দর বটে, কিন্তু সহজ-লভ্য নয়। বোধগত আদর্শ আবেগগত না হলে জীবনে আচরণ-সাধ্য হয়ে উঠে না। ইসলামী সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বও তাই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে কার্যকর হয়নি। এর কার্যকরতা হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা অস্বাভাবিকই প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন, রসুলের ওফাত-মুহূর্তেই নেতৃত্বের দাবিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আনসারে-মোহাজেরে। অবশেষে রসুলের স্বজনের দাবীই স্বীকৃতি পায়। প্রথম চার খলিফার চার জনই মক্কী এবং যথাক্রমে রসুলের দুই শ্বশুর ও দুই জামাতা। পরবর্তীকালে খিলাফতে আব্বাসীয় প্রতিষ্ঠাও আসে রসুলের জ্ঞাতিত্বের দাবিতে। তাছাড়া হযরত উস্‌মানের পতনের কারণ ও হযরত আলীর প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মুখ্যত গোত্র-দ্বেষণা। এ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ও বিরোধ-বিবাদ ইসলাম-সংপৃক্ত মুসলিম ইতিহাসকে ম্লান করেছে।

AMARBOI.COM

হাশেমী-উম্মাইয়ার এ জ্ঞাতি-বিদ্বেষ আব্বাসীয়দের পতনকাল অবধি তীব্র ছিল। এবং তা কেবল উক্ত দুই বংশে সীমিত ছিল না। রসুলের স্বজন ও আত্মীয় হিসেবে হাশেমীরা পায় বিশ্ব-মুসলিমের সহানুভূতি ও আনুগত্য। আর চিরঘৃণ্য হয়ে থাকে উম্মাইয়ারা। এ সহানুভূতি বশেই কারবালার যুদ্ধে নিহত হোসেন মুসলিম জগতে প্রিয়তম হয়ে উঠেন এবং কারবালা পায় তীর্থের মর্যাদা।

যদিও ইসলামী শাস্ত্রকে সুসংবদ্ধকরণ, ইসলামী সমাজকে পূর্ণাবয়ব দান, মুসলিম সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রায় সবকিছু উম্মাইয়াদেরই কৃতি এবং কীর্তি, আর হাশেমীদের দান প্রায় দুর্লক্ষ্য, তবু রসুলের আত্মীয় হিসেবে শ্রদ্ধেয়তার সুযোগে মুসলিম জগতে তারা উম্মাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জনমনে উম্মাইয়াদের প্রতি গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, যা চিরকাল দুরপনেয় হয়ে থাকবে। এ কারণেই ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রতি উসমান-মালেক-উমর-ইয়াজিদ প্রমুখ কীর্তিমান শাসকদের অবদানও প্রায় অস্বীকৃত। এজন্যেই দেখতে পাই, সমাজে শ্রদ্ধেয়তা অর্জনের জন্যে যেমন হাশেমী কুলবাচি গ্রহণে মুসলিম সমাজে আগ্রহের আজো অভাব নেই, তেমনি মুসলিম সমাজের ঘৃণা এড়ানোর জন্যে আসল উম্মাইয়ারাও কুলবাচি পরিহার করে সমাজে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্য ক্ষেত্রেও সাম্য, সমদর্শিতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসৃত হয়নি। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে উমর আরবদের পক্ষে বিজিত আজমে বসবাস ও বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তেমনি ইরানী মায়ের সন্তান বলেই আল্‌-মামুন সিংহাসনে বঞ্চিত হন। এবং মাতৃকুলের সাহায্যে বাহুবল প্রয়োগে তাঁকে দখল করতে হয় খিলাফৎ। আবার তা আয়ত্তে রাখার জন্যেও ফাতেমীদের তোয়াজ করতে হয় তাঁকে। এমনি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইসলামের ও মুসলমানদের ইতিহাসের সর্বত্র। বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনে সাম্য, সহযোগিতা কিংবা সহ-অবস্থানের দৃষ্টান্ত মুসলিম ইতিহাসেও গোড়া থেকেই বিরল। এদিকে ইসলাম গোত্র-চেতনা যেমন বিলোপ করতে পারেনি, তেমনি স্বধর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও গড়ে উঠেনি কখনো। যদি তাই সম্ভব হত; তাহলে খলিফা বা আমীরুল মুমেনীনের কর্তৃত্বে দুনিয়ায় সব সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র থাকত।

আজো আরবেরা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তায় আস্থাবান নয়—গৌত্রিক কিংবা ভাষিক অভিন্নতা ভিত্তিক জাতীয়তার সাধক। ইরানীরা আর্য-চেতনাতেই সংহত। তাই দেশের নাম ইরান এবং শাসক 'আর্যমিহির ও পহ্লবী'। পাক-ভারতের ইতিহাসে আফগান-তুর্কী-মুঘলের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আকস্মিক ও নয়, একদিনেরও নয়। অতএব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা মুসলিম-ইতিহাসেও অনুপস্থিত।

পাক-ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল ইংরেজ আমলে ও প্রতীচ্য প্রভাবে। ইংরেজ আমলেই নেপাল থেকে সিংহল এবং বার্মা থেকে খাইবারপাস অবধি ভূ-ভাগ ব্রিটিশের একচ্ছত্র শাসনে আসে। বিদেশী শাসকের একচ্ছত্র শাসন ও শোষণ এবং যন্ত্রণার সমানুভূতি এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসিত জনদেরকে ঐক্য দান করে। ইতিপূর্বে এত বড় মহাদেশ কখনো এক-কেন্দ্রিক শাসনে ছিল না। এর নতুন নাম হল ভারত সাম্রাজ্য।

উৎপীড়িত শাসিত জনেরা একক জাতি রূপে সংহত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে হল উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গোত্রে, নানা ধর্মে, বহু ভাষায় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশে বিভক্ত এখানকার মানুষেরা সম সংখ্যার ও সম স্বার্থের অভাবে একই মিলন ময়দানে দাঁড়াতে পারল না। অসম সংখ্যা ও বিষম স্বার্থ সংহতি ও সংগ্রামের অন্তরায় সৃষ্টি করল। জাতীয় কংগ্রেস পরিণামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সংগ্রাম-সংস্থার রূপ নিল। সাম্রাজ্যভুক্ত মুসলমানরাও স্বাধর্ম্যের আশ্রয়ে সংগ্রামী শক্তি অর্জনে হল তৎপর। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের এ সংগ্রাম ছিল প্রত্যাশিত ধন-মানের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর বিরুদ্ধে। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এর শুরু আর উনিশশ সাতচল্লিশে এর সমাপ্তি।

আমাদের এ ধারণার সমর্থনে প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি। পলাশীর যুদ্ধে বিদেশী খ্রীস্টানদের হাতে বাঙলার সুবাদারের পরাজয় ভারতের কোনো রাজন্যকেই বিচলিত ও বিব্রত করেনি। তারও প্রায় দু'শ, বছর আগে বিদেশী বিধর্মী বেনেরা গোয়া-দামন-দিউ-কারিকল-মাহে দখল করেছিল। কিন্তু কোনো দেশী রাজন্যের আত্মসম্মানে তা আঘাত করেনি। তারা বরং ওদেরকেও কাড়াকাড়ি আর শাসন-শোষণের খেলায় নবাগত প্রতিযোগীরূপেই গ্রহণ করেছিল। খেলোয়াড়-সুলভ প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য ছিল। কিন্তু বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি বলে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। কেননা, শাসক বা শাসিত জনের মধ্যে স্বাদেশিক কিংবা স্বাজাতিক চেতনা ছিল অজাতমূল। তাই পলাশীর যুদ্ধের পরেও একশ বছর ধরে গোটা ভারত গ্রাসকালে স্বাজাতিক বা স্বাদেশিক প্রেরণা বশে ব্রিটিশকে বাধা দেবার চিন্তাও করেনি কেউ। সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগও তাই নিতে চায়নি অনুগত ও অনুরক্ত রাজন্য কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত সৃজ্যমান ধনী ও মানী সমাজ।

অতএব দৈশিক জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্যশিক্ষার দান। এই শিক্ষার মাধ্যমে দেশী লোকের মনে ক্রমে যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়, যে-জীবন-চেতনার উদয় ঘটে, তারই ফলে বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার স্পৃহা ঘনীভূত হতে থাকে। এ স্পৃহা যে কেবল ব্রিটিশ ভারতেই জেগে ছিল তা নয়, বিশ শতকের উষাকাল থেকে গোটা দুনিয়ার শাসিত-শোষিত জনেরা দৈশিক জাতীয়তার মাধ্যমে মুক্তি ও সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেছিল। এই দৈশিক জাতীয়তার প্রেরণায় আরব মুসলিমরাও তুর্কী খলিফার আনুগত্য ও শাসন অস্বীকার করেছিল। অতএব স্বাধর্ম্য সংহতির সহায়ক নয়। আসলে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে সমস্বার্থ। এবং এই স্বার্থ সবক্ষেত্রেই ভৌগোলিক অবস্থানগত। পৃথিবীর সর্বত্র তাই আজ আঞ্চলিক ফলত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রিয় ও প্রবল।

ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরাও—স্বাধর্ম্য বশে নয়, সম-স্বার্থেই সংহত হয়েছিল সংখ্যাগুরু হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। সুযোগ ও সম্পদের নিরাপত্তা-বাঞ্ছাই তাদেরকে সংহতি দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত তাদের সঙ্ঘ- শক্তি ফলপ্রসূ হয়েছিল। লক্ষ্য বা গন্তব্যের অভিন্নতা যে-সাহচর্য ও সহযোগিতার আবেগ ও আগ্রহ জাগিয়েছিল, গন্তব্যে উত্তরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর তাতে স্বভাবতই শৈথিল্য এল। এর কারণ দুটো। এক. সাফল্যে প্রয়াসের প্রেরণা এখন অপগত। দুই. আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও ভাষিক বিভিন্নতার দরুন সমস্বার্থের সমতল ভূমি এখন দুষ্প্রাপ্য।... কাজেই বন্ধনসূত্র এখন শিথিলগ্রন্থি। বৈষয়িক স্বার্থের যে-মানস-প্রেরণা সংহতি দিয়েছিল, দৃশ্যত তার বাহ্যিক আবরণ ছিল স্বাধর্ম্য। যদিও তা ত্রাণের বর্মরূপে ক্রিয়া করেনি, তবু বক্তব্যের আবরণ রূপে কেজো ছিল।

আমাদের এ ধারণার সমর্থনে সাক্ষ্যও রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ও বিধর্মী-বিরল তখনকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার পশ্চিম পকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রচারণা সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয়তার আহবানে সাড়া মেলেনি। এ আবেদন বিপুল বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের শোষিত মুসলিম সমাজে ও চাকুরি-বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিম মনে। কাজেই স্বাধর্ম্যের অঙ্গীকার জাতীয়তার প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয় ছিল না ব্রিটিশ ভারতের সর্বাঞ্চলের মুসলিম মনে। সুতরাং স্বাধর্ম্যভিত্তিক জাতীয়তার নজির মেলে না ইতিহাসে।

অতএব রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে মিলনের অন্য ময়দান খুঁজতে হবে। ইসলামের দোহাইতেও যখন আত্মীয়তা গড়ে উঠছে না, তখন ঐক্যের সূত্র সন্ধান করতে হবে অন্যত্র ও অন্যভাবে। সুযোগ ও সম্পদের ক্ষেত্রে সুবিচার ও সমদর্শিতার অঙ্গীকারে অবশ্য মিলন স্থায়ী ও স্বস্তিকর করা সম্ভব। প্রীতিপ্রসূত পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভরসাই কেবল মিলন-রাখী অটুট রাখতে পারে। নইলে মিশর-সিরিয়ার মিলনের মতো তা নশ্বর হতে বাধ্য। আজকের আরব রাষ্ট্রগুলো যেমন স্বতন্ত্র থেকেও স্ব স্ব স্বার্থে অভিন্ন শত্রু ইসরাইলকে ঘায়েল করবার জন্যে আরব জাতীয়তার নামে ও আবেগে ঐক্য ও সংহতি কামনা করছে, ব্রিটিশ ভারতেও স্ব স্ব আঞ্চলিক স্বার্থে মুসলিমরা স্বাধর্ম্যের নামে আবেগ সঞ্চয় করে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেয়েছিল আপাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই।

তাছাড়া ধর্মীয় জাতীয়তার পথে একটি গুরুতর সমস্যাও রয়েছে। এক ধর্মের লোক কেবল এক অঞ্চলে বাস করে না, সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। কাজেই স্বধর্মীকে নিয়ে যদি জাতি-চেতনা লালন করতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জন্মাতে পারবে না, অথচ এটি এ-যুগে রাষ্ট্রিক স্বার্থে জরুরী। তাছাড়া দুনিয়ার কোনো দেশেই কেবল এক ধর্মাবলম্বী বা এক মতাবলম্বী মানুষ বাস করে না। নানা জাত-মত ও বর্ণ-ধর্মের মানুষ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জাতীয়তাই যদি রাষ্ট্রিক জাতীয়তার নামান্তর হয়, তাহলে রাষ্ট্রে বিধর্মীরা স্বাধীনতার স্বস্তি বা গৌরব বোধ করে না। তখন তারা সংখ্যাগুরুর পাশে থেকেও পড়শী হয় না। জাতীয় কিংবা সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যে অনধিকার তাদেরকে প্রবাসীর মতো পর ও আশ্রিতের মতো অসহায় অনুগ্রহজীবী করে রাখে।

ফলে বাইরে তাদেরকে রাষ্ট্রানুগত দেখায় বটে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অন্তরে থাকে বিরূপতা, এবং রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে তা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ইহুদী বিতাড়ন এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে জার্মান-ইহুদীর ভূমিকা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জার্মানিতে ইহুদী-নিধন এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ যুগে জাতীয়তা দেশগত না হলে রাষ্ট্রিক জীবনে স্বস্তিকর হয় না।

এক্ষেত্রেও পূর্ব বাঙলার সমস্যা ও দুর্ভাগ্য বিবেচ্য। মুসলমানের পক্ষে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো কাম্য বিষয়েও নিহিত রয়েছে বাঙালি মুসলিমের অস্বস্তির ও অমঙ্গলের বীজ। এখানে অমুসলিম প্রতিবেশী নিয়ে ঘর করি আমরা। ইসলামী বিধি ও রাষ্ট্রাদর্শের অঙ্গীকারে যে-নাগরিকত্বে আমাদের উল্লাস, তাতে তারা মনে মনে বঞ্চিতের বেদনা ও অপমানিতের ক্ষোভ অনুভব করে। এভাবে আমরা ঘরের মানুষকে পর ও বিরূপ করে তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার ফসল থেকেই যে কেবল নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি, তা নয়, আমাদের স্বস্তি-সুখও বিঘ্নিত ও বিপন্ন থাকছে। মাঝে-মধ্যে বিধর্মী-হত্যা—যার ভদ্র নাম দাঙ্গা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর দেশপ্রাণতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও রাষ্ট্রানুগত্যে কী হবে তাদের প্রেরণার উৎস ও অবলম্বন? জিম্মি-জীবনের গ্লানি ঘুচবে কোন্ অনায়াসলভ্য চিত্ত—সম্পদের ঐশ্বর্যে? বিধর্মীবিরল পশ্চিম পাকিস্তানে এ সমস্যা অনুপস্থিত। তবে কী ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণের মতো মহৎ অভিপ্রায়ের মধ্যেও ভেদনীতির প্রশ্রয়ে পূর্ব বাঙলায় স্থায়ী শাসন ও কায়েমী শোষণের অভিসন্ধি নিহিত!

পূর্বকালের রাজ্যে এ সমস্যা ছিল না। কেননা তখন রাজ্য ছিল রাজার, প্রজা ছিল শাসন-শোষণের ও কৃপা-পীড়নের পাত্র। রাজ্য ছিল রাজার আয়ের ও আরামের জমিদারী। রাজস্বের জন্যেই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও প্রজারক্ষণ। কেননা সুখ-সৌভাগ্যে যেমন থাকত তাঁর একাধিকপত্য, তেমনি দুঃখ-দুর্ভাগ্যও তাঁকেই বহন করতে হত। আজ মানবাধিকারের সীমা দূরবিস্তৃত। তাই আজ মানুষ আর প্রজা নয়—পৌরজন। এ যুগে দেশগত বা রাষ্ট্রগত জাতীয়তা জরুরী নয় কেবল, রাষ্ট্রের ভিত্তিও। অতএব ধর্মীয় জাতীয়তা একটি আত্মধ্বংসী প্রতারক প্রত্যয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতি ও গণমানব

প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাতীয়তার স্থান ছিল না, তখন ছিল প্রবল ও পরাক্রান্ত ব্যক্তির রাজ্য ও সাম্রাজ্য। তখন জোর যার, মুলুক ছিল তার। বসুন্ধরা ছিল বীরভোগ্যা। সে-বীরের জাত-জন্ম ও বর্ণ-ধর্ম বিচারের অধিকার ছিল না কারো।

আদিকালের গোত্র-ভিত্তিক সর্দারতন্ত্রই সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় ক্ষুদ্র ও খণ্ড অঞ্চলভিত্তিক রাজতন্ত্রে এবং আরো পরে সামন্ত সমর্থিত সাম্রাজ্যের বিকাশ লাভ করে। আমাদের পাক-ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঐতিহাসিক স্মৃতির যুগে আমরা দক্ষিণ ভারতে যেমন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সন্ধান পাই উত্তর ভারতেও তেমনি ইরানী-আর্য ও মধ্য-এশিয়ার শক, হূন, কুশান, তুর্কী, মুঘল সাম্রাজ্যের সংস্থিতি লক্ষ্য করি। সবাই বাহুবলেই ভোগ-দখল করেছে দেশের ঐশ্বর্য। জনগণের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিল শাসকের ও শাসিতের, শোষকের ও শোষিতের। এক্ষেত্রে স্বাজাত্য স্বাধর্ম্য ব স্বাদেশিকতা ছিল অনুপস্থিত।

গোত্র-চেতনা অবশ্যই ছিল, ছিল স্বধর্মী প্রীতিও, আরো ছিল স্ব-ভাষীর প্রতি মমতা। কিন্তু সামাজিক স্তর অতিক্রম করে এসব কখনো রাষ্ট্রিক ঐক্য-বোধের কিংবা আর্থিক স্বার্থবোধের উদ্ভব ঘটায়নি। তাই দন্তশক্তি বিদেশী বিজাতি কিংবা বিধর্মী বলেই তারা কখনো বিক্ষুব্ধ হয়নি। যদিও ধর্মমতের ক্ষেত্রে ও সামাজিক স্তরে বিধর্মী ও বিজাতির প্রতি ছিল অসীম ঘৃণা ও অপরিমেয় বিদ্বেষ। কিন্তু স্বার্থ ও অর্থের ক্ষেত্রে কিংবা শাসন ও শোষণের ব্যাপারে তারা দেশ-জাত বা বর্ণ-ধর্ম বিচার করেনি। তাই শক-হূন- কুশানদেরকে এদেশবাসীরা বিদেশী, বিজাতি কিংবা বিধর্মী বলে প্রতিরোধ করতে এগোয়নি। এমনকি হাজারোর্ধ্ব বছর পরেও তুর্কী, মুঘল বা বৃটিশকেও বিদেশী-বিধর্মী বলে কেউ ঠেকানোর বা তাড়ানোর চেষ্টা করেনি। রাজা বদল ছিল প্রজাদের চোখে অনেকটা এ-যুগের জমিদার বদলের মতোই। কোনো অবস্থাতেই তার অধিক কিছু ছিল না। হাত-বদলের সময়ে খাজনাদির ব্যাপারে জনগণের জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ অবশ্যই ঘটত। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। রাজা ছিল শাসক—সেবক নয়। মানুষের উপর তার সর্বাত্মক অধিকার ছিল, তাদের প্রতি দায়িত্ব ছিল না কিছুই। বলতে গেলে একপ্রকারের দায়িত্ব অবশ্যই ছিল, সেটা গৃহস্থের অর্থকর পোষা মেষপাল কিংবা গোধন রক্ষণের ও লালনের দায়িত্বের মতোই। অর্থাৎ রাজস্বের নিশ্চয়তার জন্যে রাজ্যসীমা সুরক্ষিত রাখা ও প্রজাদের শাসনে রাখাই ছিল রাজার দায়িত্ব।

আমাদের এই ধারণার সমর্থনে প্রমাণ অবশ্যই মিলবে। দূর-অতীতের অন্ধকারে না হাতড়িয়ে মধ্যযুগের ভারত থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী বেনে জাতেরা গোয়া, দামন, দিউ, কারিকল, মাহে দখল করেছিল। এগুলি কোননা-কোনো দেশীয় রাজ্যের এলাকা ছিল। কিন্তু স্বদেশ-চেতনা কিংবা স্বাজাত্য বশে ভারতের কোনো রাজা-বাদশাই তাদের উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেনি। পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, ইংরেজ ও ফরাসি বেনেদের সহায়তায় প্রতিবেশীকে জব্দ ও পরাজিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ষোলো শতকের গোড়া থেকেই। কারো মনে এ প্রশ্ন কখনো জাগেনি যে তারা নিজেদের কোন্দলে কোনো বিদেশীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। চোরা কারবারে কিংবা চুরিতে যেমন জাতভেদ নেই, রাজ্য কাড়াকাড়িতেও তেমন জাতধর্মের পার্থক্য-চেতনা ছিল না।

কর্ণাট দরবারের ঘরোয়া বিবাদে ইংরেজ ফরাসির সাহায্য কামনা ; পর্তুগীজ, আর্মেনীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসি কর্মচারীর হাতে দেশীয় রাজন্য কর্তৃক রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ ; টিপু সুলতানকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে নিযাম মারাঠার অস্বীকৃতি; পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজকে দিল্লীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানের দেওয়ানী দান, স্বাধর্ম্যবোধে ভারতের মুসলমান কর্তৃক নাদিরশাহ-আহমদশাহকে মারাঠা দমনার্থে ভারত বিজয়ে প্ররোচনা দান আর নাদিরশাহ-আহমদশাহ কর্তৃক দিল্লী বিজয়, গৃহদ্বারের বিদেশী-বিধর্মী শত্রু ইংরেজকে ছেড়ে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বালাকোটে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মীর কাসিম আলির পতনকালে দিল্লীর সম্রাটের ব্রিটিশ পক্ষাবলম্বন, ইংরেজ প্রতিরোধে মারাঠাদের সঙ্ঘশক্তি প্রয়োগে অনীহা, সিপাহীবিপ্লব কালেও দেশী রাজন্যের উচ্ছন্ন-প্রায় ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে রাজা-বাদশাহর দেশ-জাত প্রীতি ছিল না, ছিল কেবল স্বার্থ-চেতনা।

তাই সে-যুগের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে রাজা ও প্রজার সমস্বার্থের কোনো মিলন-ময়দান ছিল না। কাজেই রাজার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, এবং উত্থান ও পতনের লাভক্ষতি ছিল একান্তই রাজার ও রাজ-পরিজনের ব্যক্তিগত দুর্যোগ-দুর্ভোগের বিষয়। এতে প্রজার কোনো ভূমিকা বা হাত ছিল না। রাজ্য ভাগাভাগির জন্যে দ্বন্দ্ব-মিলনে রাজাদের দেশ-জাত ও বর্ণ-ধর্মের বিচার ছিল না; কেবল সম বা বিষম স্বার্থের গুরুত্ব ছিল। তাই দেশী-বিদেশী বা স্বধর্মী-বিধর্মীর পার্থক্য-চেতনা তাদের চিন্তায় ও কর্মে প্রশ্রয় পায়নি। রাজকীয় ব্যাপারে প্রজাদের অধিকার ছিল না বলেই, এক্ষেত্রে তাদের কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল না। আর তাই তাদের আনুকূল্য কিংবা প্রাতিকূল্যের গুরুত্বও ছিল সামান্য।

পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে পলাশীর যুদ্ধে যে-গুরুত্ব আমরা একালে দিয়েছি, সমকালে এই যুদ্ধের এমনি গুরুত্ব ছিল অভাবিত। ইংরেজ আমলে প্রতীচ্য প্রভাবে লব্ধ জাতীয়তাবাবোধ ও স্বদেশপ্রীতিপ্রসূত এই বোধ আমাদের দেশে অজাতপূর্ব। তাছাড়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে আধুনিক সংজ্ঞানুগত দেশ-জাত চেতনার উদ্ভব ছিল অসম্ভব। এ বোধ জাগে অধিকার ও দায়িত্ব-চেতনা থেকে। রাজকীয় ব্যাপারে প্রজার কোনো অধিকার ছিল না, তাই দেশরক্ষার ও দেশবাসী মানুষের হিতচিন্তার দায়িত্ব ছিল না প্রজার। দায়িত্ব-চেতনাই কর্তব বুদ্ধি জাগ্রত করে আর কর্তব্যেবোধই উপায় উদ্ভাবনে প্রবর্তনা দেয়। এতেই ঘটে বোধের বিকাশ, এমনি বিকাশের অন্যতম প্রসূন হচ্ছে স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা। সেদিনকার রাজন্য ও জনগণের চোখে পলাশীর যুদ্ধ ছিল রাজ্য কাড়াকাড়ির আর দশটা যুদ্ধেরই একটি। তাই ইংরেজের সাফল্যে ভারতীয় রাজন্য- সমাজে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। দিল্লীর দুর্বল রাজা বরং অর্থলোভে অভিনন্দিত করেছেন ইংরেজদের। শুধু কী তাই! পলাশীর পরেও একশ, বছর সময় পেয়েছিলেন ভারতের রাজারা; কিন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু ইংরেজশক্তিকে ঠেকানোর জন্যে তৈরি হননি কেউ। ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের পলাশীর যুদ্ধকে এক বছর পরে ইংরেজ কর্তৃক পশ্চিম প্রান্তের পেশোয়ার বিজয়ের জন্যে দায়ী করা চলে না। এ হচ্ছে ছলনার আশ্রয়ে বিবেককে প্রতারিত করে অক্ষমের আত্মপ্রবোধ লাভের অপচেষ্টা মাত্র।

২

রাজ্য যে রাজার রাজস্ব উসুলের জমিদারী নয়, জনহিত সাধনের জন্যে সমবায় সংস্থামাত্র—এ সত্যের তত্ত্বগত স্বীকৃতির ভিত্তিতে মধ্যযুগের অবসানে গড়ে উঠেছিল য়ুরোপীয় রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলো। এমনি রাষ্ট্রচেতনা সহজে আসেনি। উপলব্ধির এই স্তরে উত্তরণের জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শোষণ, নির্যাতন ও মৃত্যুর শিকার হয়ে অর্জন করতে হয়েছে এ অধিকার। তাজা প্রাণের, নির্ভীক বুকের পলাশ-লাল রক্তের গঙ্গা বয়ে গেছে য়ুরোপে। এ সাফল্য অর্জন-লক্ষ্যে প্রায় চারশ বছর ধরে ধনে-প্রাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। মনুষ্য জগতে আধুনিকতা রক্তস্নাত য়ুরোপের দান। চারশ বছরের অনলস অবিরাম সাধনায় লব্ধ এই য়ুরোপীয় জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা তাদের বহির্বিশ্বস্থ উপনিবেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে য়ুরোপীয় ভাষার মাধ্যমে।

তেরো শতকের অন্তিমে দান্তের আবির্ভাব থেকেই মধ্যযুগীয় তমসা তরল হতে থাকে। পেত্রার্ক ছিলেন প্রভাতী পূর্বাশা। এমনি করে য়ুরোপ শাস্ত্রের খাঁচা ডিঙিয়ে সাহিত্য-শিল্পের উদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গনে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে তারা মেরীর চাইতে সত্যকে, যিশুর চাইতে জীবনকে বেশি ভালবাসতে শিখে। এ অঙ্গন যদিও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তবু ইটালীয় শিল্পী-ভাস্কর-বিজ্ঞানী লিউনার্দো দ্য ভিনসি, রাফেল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ও টাইটিয়ানের নতুন জীবন ও রূপচেতনা; পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৪৫৩ খ্রী.) মুসলিমদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফলে বাজেন্টাইন গ্রীক বিদ্বানদের য়ুরোপে প্রত্যাবর্তন এবং মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার এ সাধনাকে অপ্রতিরোধ্য ও বেগবান করে তুলল। তারপর নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রভাব প্রসূত reformation ও revolution-এর মাধ্যমে শাস্ত্রীয় Indulgence-এর ফাঁকি ও Inquisition-এর পীড়ন-মুক্ত হয় বহু শতাব্দীব্যাপী নির্যাতিত মানুষ। চারশ বছরব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই মানববাদ, এই শাস্ত্রদ্রোহিতা, এই সৌন্দর্য-অন্বেষা, এই আত্মবিস্তার, এই বিজ্ঞান-বুদ্ধি, এই সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় প্রভৃতির সামগ্রিক নাম রেনেসাঁস। ভাষিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা তথা জাতীয়তাবোধ এই নবযুগের প্রসূন।

৩

য়ুরোপীয়দের অন্যান্য উপনিবেশের মতো ব্রিটিশ ভারতেও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যার প্রভাবে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে থাকে। তবে য়ুরোপে যা ছিল সাধনা ও সংগ্রামলব্ধ, বহির্বিশ্বে তা ছিল অকালে আকস্মিকভাবে অনায়াসপ্রাপ্তি। হঠাৎ করে মধ্যযুগীয় অমানিশা শীত-সকালের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। এজন্যে কারো মানসিক, সামাজিক, বৈষয়িক, আর্থিক কিংবা শৈক্ষিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই গোড়াতে এই প্রভাব বিচিত্র ও বিকৃত হয়ে দৃশ্যমান হল। পণ্যবিনিময়-ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি আকস্মিকভাবে মৌদ্রিক অর্থনীতির রূপ নিল, প্রতীচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিশ্বাস সংস্কারে দেখা দিল দ্বন্দ্ব, শাস্ত্রে ও সাহিত্যে-দর্শনে বিরোধ হল প্রকট, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক স্থিতি ঘটাল নতুন বিপর্যয়; যন্ত্রচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভাব, পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিদেশী শাসকের শোষণ আনল আয়-ব্যয়ে অসমতা। এক কথায়, মানস কিংবা বৈষয়িক জীবনে কোথাও আর আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা গেল না।

এমনি প্রতিবেশে প্রতীচ্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মনে জাতীয়তাবোধ এবং তজ্জাত জাতিবৈর অঙ্কুরিত হয়। এ জাতি-চেতনা সুষ্ঠু ছিল না। কখনো ভাষিক, কখনো ধার্মিক, কখনো আঞ্চলিক, কখনো প্রাদেশিক এবং কখনোবা ভারতীয় জাতীয়তারূপে তা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে স্বধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাই প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠে। রামমোহনে-বিদ্যাসাগরে-বঙ্কিমে এবং হিন্দু-মেলায় এই স্বধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন হালী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখও ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী।

হিন্দুমনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার অবলম্বন হয়েছিল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা ঐতিহ্য আর মুসলমানেরা প্রেরণার উৎস করেছিল আরব-ইরানী পুরাণ ও ঐতিহ্যকে। দেশ-কাল-পরিবেশ চেতনা কারো ছিল না। এভাবে তারা কেবল হিন্দু ও নিছক মুসলমান বনেছিল, অর্থাৎ প্যান হিন্দুইজম ও প্যান ইসলামই ছিল তাদের আদর্শিক জাতীয়তার লক্ষ্য। এমনিভাবে দেশকালের প্রয়োজন অস্বীকার করে তারা অতীতে, বিদেশমুখিতায় ও স্বাতন্ত্র্যে খুঁজেছে স্বস্তি ও শ্রেয়সকে। কল্যাণের পথ তাদের জানা ছিল না, জানতে চায়ওনি তারা ; তাই কল্যাণ আসেনি, সুখ দেয়ওনি, পায়ওনি, কেবল লাভের ও সুখের মরীচিকায় আত্মক্ষয় করেছে।

তারপর এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন-বাঞ্ছায় কংগ্রেসের ধ্বজা ধরে তারা ময়দানী-মিলনে প্রয়াস পায়। 'ময়দানী-মিলন' বলছি এজন্যে যে তারা আসলে হিন্দু কিংবা মুসলমানই রয়ে গেল, কেবল সমলক্ষ্যে কারখানা শ্রমিকের মতোই সাময়িক স্বার্থে রাজনৈতিক সংগ্রামার্থ মিলন কামনা করেছিল—এ ছিল অনেকটা নীলনদের ধারার মতো। কেননা তারা দেশের সন্তান হিসেবে অভিন্ন সত্তায় ও পরিচয়ে আস্থাবান ছিল না। মুসলিম লীগে ও হিন্দুমহাসভাতেই তাদের চেতনার ও লক্ষ্যের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অতএব, কংগ্রেসী নিবর্ণ জাতীয়তা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা ছদ্মরূপ। এবং বিপন্ন খিলাফৎ-প্রীতিই মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের সাহায্য প্রত্যাশী করে তোলে। সেই প্রয়োজনের অবসানে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান কংগ্রেস ত্যাগ করে। আর স্বাধীনতাকামী মোল্লা-মৌলভীরা তখনো কংগ্রেসে থেকে যায়— হিন্দু প্রীতিবশে নয় অবশ্যই, স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুর শক্তির প্রতি আস্থাবশে। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান চাকুরির ক্ষেত্রে ছিল হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই মুসলিম লীগই ছিল তাদের প্রিয়।

ইংরেজি অজ্ঞ মোল্লা-মৌলভীরা চাকুরির প্রত্যাশী ছিল না, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুর সঙ্গে হাত মিলাতে পেরেছিল সহজেই। আবার সেকালের পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল নগণ্য, তেমনি দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য প্রদেশে মুসলমান ছিল বিরল ; রাজনীতি ক্ষেত্রে তাই ওদের বিধর্মী-সমস্যা ছিল না, বিধর্মী-বিদ্বেষও ছিল না। শেষাবধি ওসব অঞ্চলে কংগ্রেস প্রভাবও ছিল প্রবল। এদিকে তৎকালীন যুক্ত প্রদেশে চাকুরি ও জমিদারীর অর্থ-সম্পদের অধিকাংশ ছিল সংখ্যালঘু মুসলমানদের করতলগত, যেমনটি সংখ্যালঘু হিন্দুর ছিল বাঙলা দেশে।

যুক্ত প্রদেশের মুসলমান এই স্বার্থ ও সুবিধা দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল। তাদের নেতৃত্বে ও বাঙালির সংগ্রামে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ওহাবী সংগ্রামের অবাসনে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-দ্বেষণা ও ব্রিটিশ-প্রীতি প্রবল হতে থাকে। হিন্দু-বিদ্বেষের মূল ছিল সরকারি অনুগ্রহের প্রত্যাশা। অতএব ১৮৬০ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানেরা স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিল না, সরকারি সহযোগিতায় হিন্দুর কবল থেকে নিজেদের প্রাপ্য ধন-সম্পদ উদ্ধারেই ছিল ব্রতী। সে ধন-সম্পদ অবশেষে পাকিস্তান রাষ্ট্ররূপে আয়ত্তে এল।

যে ভাগ-বাঁটোয়ারার দাবী উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলিম-মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল, তা-ই মুসলিম লীগের মাধ্যমে প্রখর ও ফলপ্রসূ হল। মূলত হিন্দুর জন্যে হলেও কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিল। ব্রিটিশ বিতাড়নে সাফল্য আসে কংগ্রেসের মাধ্যমেই। তার আনুষঙ্গিক ফল পাকিস্তান।

AMARBOI.COM

৪

ব্রিটিশ যুগে কিছুসংখ্যক বর্ণহিন্দু চাকুরে-মহাজন-জমিদার বাঙলার অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করে। বর্ণ-ধর্ম অবিশেষে আর সব বাঙালিই ছিল নির্জিত, শোষিত ও নির্যাতিত। ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বর্ধিষ্ণু মুসলিম সমাজ দেশের ধন-সম্পদে, বাণিজ্যে ও চাকুরিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ওদের প্রতিপক্ষতা শুরু করে। এ ছিল স্বস্বার্থে সমশ্রেণীর প্রবল শোষকের বিরুদ্ধে দুর্বল বঞ্চিত শোষকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর মধ্যে গণ-কল্যাণের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। চাকুরি-সদাগরী-জমিদারীতে শিক্ষিত মুসলমানের আনুপাতিক হার প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম জনগোষ্ঠী শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত হত না। যেহেতু চাকুরে-মহাজন-জমিদার ছিল হিন্দু, সেহেতু এইসব উচ্চাভিলাষী মুসলমান স্বধর্মীর অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের সুযোগে স্বস্বার্থে মুসলিম মনে জাতিবৈর জাগাতে সমর্থ হল সহজেই। ফলে শোষক-শোষিত নির্বিশেষ হিন্দুর প্রতি মুসলিম-মনে জাগল ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। গণ-কল্যাণে যে-সংগ্রাম শুরু হওয়া উচিত ছিল ব্রিটিশ শাসক ও দেশী শোষকের বিরুদ্ধে, তা এভাবে বিধর্মী-বিদ্বেষের রূপ নিল। গণমানবের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে মুসলিম লীগ গণ-সমর্থনে অর্জন করল পাকিস্তান। যারা পূর্বে ধন-সম্পদ দখলে ছিল হিন্দুর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী, পাকিস্তানে তারাই হল পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ চাকুরির নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন মালিক। জনগণের দুর্ভাগ্য-দুর্ভোগ রইল পূর্ববৎ।

৫

এদিকে কালক্রমে পাকিস্তান প্রাপ্তির প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে ও উল্লাসে যখন ভাটা পড়েছে, তখন ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষিত বাঙালিরা দেখছে তারা অর্থ-সম্পদের সর্বক্ষেত্রে ঠকছে। তাদেরই স্বস্বার্থে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার পূর্বতন নীতিরই অনুবর্তন কামনা করছে রাজনীতিক্ষেত্রে। তারা দেখছে চাকুরি ও ব্যবসা—ধনাগম ও মর্যাদার এই দু-ক্ষেত্র তাদের হাতছাড়া, সেখানে প্রবেশাধিকার বর্তমান অবস্থায় একরকম অসম্ভব। পাকিস্তান যখন হল তখন সামরিক বিভাগে বাঙালি ছিলই না, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পদস্থ বাঙালি মুসলিমান ছিল নেহাত নগণ্য। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ছিল অনীহা ও আর্থিক অসামর্থ্য। বিশেষ করে হিন্দু-বিদ্বেষজাত বেরাদরী উদারতা বশে তখন বাঙালিরা ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করেনি। না-পেয়েও তারা পাওয়ার আনন্দে ছিল অভিভূত। আগে জাতি- দ্বেষণাবশে তারা ছিল বেরাদরী-ভাবে বিভোর। ইদানীং দারিদ্র্য, শোষণ ও হতবাঞ্ছার আঘাতে শিক্ষিত বাঙালি আবার স্বাধিকার সংগ্রামে অবতীর্ণ। আগে গণসমর্থন লাভের জন্যে তাদের অবলম্বন হয়েছিল হিন্দু-দ্বেষণা, এখন তারা উত্তেজনা দানের ইন্ধন করছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও ভাষিক স্বাতন্ত্র্যকে। পূর্বে মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যেমন করে প্রবল হয়েছিল, অবিকল তেমনি ধারায় ও তেমনি যুক্তিতে দানা বাঁধছে উর্দুভাষী-বিদ্বেষ। কেবল প্রতিপক্ষ বদল হয়েছে, উপায় ও উদ্দেশ্য রয়েছে অবিচল। এর মধ্যেও পূর্বেকার ফাঁক ও ফাঁকি উভয়েই বর্তমান।

পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে বোম্বাই থেকে আগত মেমন ও ইসমাইলী সম্প্রদায়, সামরিক ও বেসামরিক বড় চাকুরিগুলো রয়েছে পাঞ্জাবী ও উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের হাতে। মেমন ও ইসমাইলী ধনপতি-পুঁজিপতিদের পরিচয়ও জানে না বাঙালিরা, তারা চোখের সামনে দেখে পাঞ্জাবী বড় সাহেবদের। পশ্চিম পাকিস্তানী বলতে এরা সিন্ধি, বেলুচ, পাঠান, মোহাজের-ভেদ মানে না, তাদের চোখে সবাই উর্দুওয়ালা ও পাঞ্জাবী। এমনকি বাঙলার বিহারী মোহাজেরেরাও উর্দুওয়ালা বলে বিহারী-পাঞ্জাবী তাদের কাছে সমার্থক।

এখানকার বিহারীদেরও দোষ আছে। ভাষিক ঐক্যের দরুন তারা পাঞ্জাবীদের মনে করে জ্ঞাতি এবং পাঞ্জাবী শাসনকে তারা ভাবে নিজেদেরই শাসন, ফলে ইংরেজ আমলের দেশী খ্রীস্টান ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতো তারাও নিজেদের মনে করে শাসকজাত। আর পশ্চিম পাকিস্তানীর স্বার্থ, লাভ ও গৌরবের তারাও যেন অংশীদার! সেজন্যে বাঙলার বিহারী মোহাজেরেরা রাজনীতিক্ষেত্রে এ অংশের স্বার্থে কিছু তো করেই না, বরং তাদের আনুগত্য থাকে করাচি-লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডির প্রতি। এভাবে তারা নিজেদেরকে নিজেরাই বিপন্ন করছে। আর মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত উঠতি বাঙালি বুর্জোয়া এবং চাকুরেরাও তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা মানসে পূর্বের মতো এ সুযোগ গ্রহণ করে উর্দুওয়ালা নামে অভিহিত অবাঙালি মাত্রেরই বিরুদ্ধে অজ্ঞ-দরিদ্র জনগণকে লেলিয়ে দিতে উৎসুক। স্ব-স্বার্থেই এই বিকাশমান বাঙালি সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বী অবাঙালি পুঁজিপতি ও চাকুরেদের সম্পদে ও সম্মানে ভাগ বসাতে চাচ্ছে—বাঙালি জনগণের স্বার্থে নয়।

আযাদী-উত্তর যুগে হিন্দু চাকুরে-মহাজন-জমিদার ও ব্যবসায়ীর স্থলে শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী বসে মজা লুটছে, জনগণের তকদির রয়েছে অপরিবর্তিত। এও তেমনি এক চাল, এখন যেমন বিশ-বাইশটি অবাঙালি পরিবার পাকিস্তানের ধন-সম্পদের মালিক, তখন ছিল তেমনি কয়েকজন হিন্দু-জৈন আগরওয়ালারা। আগে যেমন হিন্দু শোষক শ্রেণীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে আপামর হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়েছে তারা, এখন আবার তেমনি পুঁজিপতি ও চাকুরে পশ্চিমাদের থেকে সম্পদ-সম্মানের ভাগ আদায় করবার জন্যে আপামর অবাঙালি-দ্বেষণা জাগানোর চেষ্টা চলছে। এর নাম বাঙালির স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, নামান্তরে বাঙালির জাগরণ। উঠতি মধ্যবিত্তের স্বার্থে এ আন্দোলন গড়ে উঠছে বলেই এতে আমাদের আপত্তি।

৬

নইলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপূত নয়। সমস্বার্থে মিলন অসম্ভব নয় বটে, তবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা যে আর্থিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনধারণ পদ্ধতির পার্থক্য ঘটায়, তাতে আধুনিক রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাও নিতান্ত কৃত্রিম ও অকেজো হয়ে পড়ে। এ কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একক রাষ্ট্র-গঠনে কিছুসংখ্যক লোকের আপত্তি গোড়াতেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তখন সাফল্য ও প্রাপ্তির উল্লাস বশে কেউ স্বস্থ ছিল না, তাই এ সদ্বুদ্ধি তখন পাত্তা পায়নি।

বাঙালির সর্বাত্মক স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ রক্ষিত হোক, তা আমাদেরও কাম্য। কিন্তু তা জনস্বার্থে ও জনকল্যাণের জন্যেই হওয়া চাই,—অবাঙালি বুর্জোয়াকে তাড়িয়ে বাঙালি বুর্জোয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে নয়। আগে একবার 'বেরাদরানে ইসলাম'-এর মোহে পড়ে ঠকেছি, আবার 'বাঙালি ভাইয়ের' মমতায় পড়ে প্রতারিত হতে চাইনে। স্বার্থের জন্যে আমরা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে দ্বিধা করিনে। বাঙালি ভাইকে পুঁজিপতি ও ধনপতি করবার জন্যে নিজের প্রাণ দেবার মতো নির্বোধ থাকা এ-যুগে নৈতিক অপরাধ ও শোচনীয়রূপে বেদনাকর। জনগণের এমনি অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগে চিয়াঙকাইশেকরা চীনে রাজত্ব করেছিল; স্বদেশী স্বজাতি বেরাদরের শোষণ থেকে গণমানব মুক্তি খুঁজেছিল অন্য পন্থায়। চিয়াঙকাইশেকরাও সেদিন গণস্বার্থ রক্ষার ভাঁওতা দিয়ে বিদেশী বিতাড়নে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে হয়েছিল গণনেতা। তারপর ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

আর গণমানবেরা দেখল তারা প্রতারিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত এবং স্বদেশী ও বিদেশী শাসনে পার্থক্য নগণ্য। স্বদেশী বা বিদেশী শাসন এ-যুগে বড় সম্পদ বা সমস্যা নয়, এ-যুগে বঞ্চক-বঞ্চিত সম্পর্ক সব সমস্যার মূলে। বঞ্চিত জনের কল্যাণ চিন্তাই, তার শোষণ ও দারিদ্র্য মুক্তিই এ-যুগের রাষ্ট্র-ভাবনার একমাত্র বিষয়। বুর্যোয়া স্বার্থের সংগ্রামকে গণ-সংগ্রাম বলে চালিয়ে দেয়ার দিন অপগত-প্রায়—এই প্রত্যয় নিয়ে মানুষের রাষ্ট্র-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গণ-মুক্তি ও গণ-কল্যাণে নিয়োজিত হবে—এই আশ্বাসে ও অঙ্গীকারে আমরা সুদিনের প্রতীক্ষারত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলন-ময়দানের সন্ধানে

আদিম অসহায় ও অকুশল মানুষের শিকারে ও শস্য উৎপাদনে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এই যৌথ জীবন। ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে রক্ত সম্পর্কে আরোপিত হয় অশেষ নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব। তাই জ্ঞাতিত্ববোধই মানুষের প্রথম পবিত্র দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করে আদিম সমাজে। জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবচেতন গরজে গড়ে উঠা এই বোধ ক্রমে আজন্ম লালিত সংস্কারে ও বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এভাবে গভীর প্রত্যয়ে শুরু হয় গোত্রীয় জীবন।

মানব সমাজের শৈশবে-বাল্যে এ গোত্র-চেতনা ও গোত্রীয় জীবন অশেষ কল্যাণ এনেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা সেদিন যৌথ প্রয়াস ছাড়া মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ সম্ভব হত না। তারপর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশে মানুষ ধর্ম তথা অভিন্ন আচার ও মতাদর্শের ভিত্তিতে রচনা করেছে বৃহত্তর সমাজ। গোত্রীয় চেতনাকে অতিক্রম করে জীবনের সংকীর্ণ পরিসরকে তারা সম্ভাবনার বিস্তৃত প্রান্তরে উন্নীত করল বটে, কিন্তু চেতনার গতি ও প্রকৃতি রইল অপরিবর্তিত। ফলে স্বাধর্ম্য ও নবপ্রত্যয়ের প্রাচীর দিয়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান বাড়িয়ে দিল। আগে যেমন স্বগোত্রীয় না হলেই শত্রু মনে করা হত, এক্ষেত্রেও স্বমতের না হলেই পর মনে করা স্বাভাবিক হয়ে রইল।

আদিতে মানুষের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজনীয় ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে। বিভিন্ন আঞ্চলিক গোত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন যৌথ জীবনের প্রয়োজন হল প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের কবল থেকে খাদ্য ও খাক তথা ভূমি ও জীবন, জল ও জন্তু, প্রাণ ও মাল রক্ষার গরজে।

এই আত্মধ্বংসী গোত্রীয় বিবাদ নিরসনের জন্যেই মতবাদ ও আদর্শভিত্তিক জীবন-ভাবনায় প্রবর্তনা পায় মানুষ। তার থেকেই আসে 'ধর্ম' নামের জীবন-নীতি। এতে পরিবর্তন মাত্র এটুকু হল যে ক্ষুদ্র গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এখন গোত্র সমষ্টির সমবায়ে গঠিত বৃহৎ সাম্প্রদায়িক হানাহানির রূপ নিল। অতএব চারিত্র্যে ও আদর্শে কোনো রূপান্তর কিংবা উন্নয়ন ঘটেনি।

অভিজ্ঞতা, প্রকৌশল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নব উদ্ভূত মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যে যে আনুপাতিক চিন্তা-ভাবনা, পরিহার-সামর্থ্য, গ্রহণশীলতা ও সৃজনপ্রবণতা থাকা আবশ্যিক ছিল ; অদূরদর্শী মানুষে তা কখনো সুলভ ছিল না। জ্ঞানী-মনীষীরা স্বকালের সমস্যার আপাত সমাধান পেয়েই চিরকালের মানুষের জন্যে প্রশস্ত জীবন-পথ রচনার গৌরব-গর্ব ও সাফল্য-সুখ অর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মতাদর্শকে চরম ও পরম বলে জেনেছেন এবং জনগণকেও সে-ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় করে রেখেছেন। এভাবে তাঁদের অজ্ঞাতেই তাঁরা মানুষের মন করেছেন আনুগত্যের দীক্ষায় নিষ্ক্রিয় এবং মননক্ষেত্র করেছেন অসীম ভরসা দানে বন্ধ্যা।

বৈষয়িক ও জাগতিক আর সব ব্যাপারে মানুষ জানে অতীতের চেয়ে বর্তমান অনেক উন্নত। হোমারের চাইতে শেক্‌সপীয়ার, ভিঞ্চির চাইতে পিকাসো, সেন্ট অগাস্টাইনের চাইতে টয়নবী, জুলিয়াস সিজারের চাইতে জর্জ ওয়াশিংটন, ইডিপাস থেকে ফাউস্ট যে অনেক অগ্রসর তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আদ্যিকালের শাস্ত্রের চাইতে উন্নত নিয়ম-নীতি কোথাও কখনো আর কিছু যে হতে পারে, তারা বরং প্রাণ দেবে, তবু তা স্বীকার করবে না। এখানে তারা প্রত্যয়-সর্বস্ব, অন্ধ ও গোঁড়া। বৈষয়িক ব্যাপারে তারা শ্রেয়সকে সহজেই গ্রহণ করে, নতুন স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে ; কিন্তু মতের ক্ষেত্রে, মননের জগতে, পুরোনোই তাদের প্রিয়, প্রাচীনত্বেই তারা পরিতৃপ্ত, বিশ্বাসেই তাদের ভরসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে মানুষের বৈষয়িক ও প্রাকৌশলিক অগ্রগতির সঙ্গে তাদের মন-মানসের আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হয়নি। এ অসামঞ্জস্যজাত অসঙ্গতিই হচ্ছে আজকের দিনের মানবিক সমস্যার উৎস। তাদের জৈব জীবন এগিয়ে চলেছে, মনোজীবন রয়েছে অবিচল। জাগতিক জীবনে তারা বরণ করেছে চলমানতাকেই, মানস-জীবনে কামনা করছে স্থিতিশীলতাকে।

ইতিমধ্যে মানুষে মানুষে পৃথিবী ভরে উঠেছে। ভূ-তে বসতি-বিরল ভুবন নেই আর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় ও প্রাত্যহিক প্রয়োজন বৃদ্ধির ফলে খণ্ড জগৎ অখণ্ড অঞ্চলে হয়েছে পরিণত। ঘেঁষাঘেঁষির জীবনে রেষারেষি হয়েছে প্রবল। প্রভাবের ও প্রতাপের টানাপড়েন অপরিসর জীবনকে প্রতিমুহূর্তে করছে প্রকম্পিত ও আন্দোলিত। অথচ গোত্রজ সংহতি ও ধর্মজ ঐক্য-ভিত্তিক সমাজ-চেতনা আজো জগদ্দল হয়ে চেপে রয়েছে মানুষের বুকে। এ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের মন ও মেজাজ। আজকের দিনে যখন অব্যাহত গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য কিংবা একক ধর্মীয়-সমাজ অসম্ভব, তখন পরকে আপন করে নেয়ার মানস-প্রস্তুতি না থাকলে নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন জীবন কিংবা সমাজ অথবা রাষ্ট্র থাকবে কল্পনাতীত। স্বগোত্রের, স্বধর্মের, স্বমতের ও স্বদেশের নয় বলেই মানুষকে যদি পর ভাবি, শত্রু মনে করি কিংবা অনাত্মীয় করে রাখি ; তাহলে আজকের দুনিয়ার মিশ্র সমাজে, এজমালি জমিতে ও বারোয়ারী রাষ্ট্রে কেউ সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে না। পারছে না যে তা কে অস্বীকার করবে? আফ্রিকার গোত্রীয় কোন্দল, য়ুরোপের জাতি-বৈর, আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ, ভারতের সাম্প্রদায়িক চেতনা, পৃথিবীব্যাপী পরমত অসহিষ্ণুতা, ধর্মদ্বেষণা ও বিদেশী-বিদ্বেষ আজ মর্ত্যমানবের যন্ত্রণার গোড়ার কথা। এই মৌল সমস্যার সমাধান না হলে স্বস্তি-শান্তির কোনো আপাত প্রলেপে মানব মনের এ দুষ্ট ক্ষতের নিরাময় নেই। এই দেশ-জাত-বর্ণ- ধর্ম চেতনা থেকে মুক্তি—সমাধানের প্রথম ও প্রধান শর্ত। কিন্তু এ মুক্তি সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টায় অবশ্য সাফল্য সম্ভব। এজন্যে উদার রাষ্ট্রাদর্শ প্রয়োজন।

ধর্ম মানুষ ছাড়বে না। তবু ধর্মবোধের পরিবর্তন সাধন সম্ভব এবং এই লক্ষ্যেই চিন্তাবিদের ও রাষ্ট্রনায়কের প্রয়াস নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক। জনগণকে বলতে হবে—ধর্ম হবে আত্মিক, তা থাকবে ব্যক্তির বুকে এবং মন্দিরে-মসজিদে-চৈত্য-গীর্জায় ও সিনাগোগে। বাইরে বৈষয়িক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে তার উপযোগ কিংবা প্রয়োজন নেই। বলতে হবে—বর্ণ বা অবয়ব হচ্ছে আবহাওয়ার দান, প্রাকৃতিক প্রভাবের প্রসূন। তার জন্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনতা বিচারের ভিত্তি হবে শিক্ষা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষা ও চরিত্র। চণ্ডালও হবে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদি থাকে গুণ, জ্ঞান ও চরিত্র। দেশ ভেদে মানুষ শত্রু কিংবা মিত্র হতে পারে না। রুচি ও মনের মিলেই মানুষ হয় আত্মীয়। মানুষে মানুষে প্রীতিই একমাত্র মিলনসূত্র। মনে মনে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেলে বাইরের কোনো বাধাই টিকতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর মতো আপন কে? দাম্পত্যে কী আমরা ঘরে ঘরে পরকে চিরকাল আপন করে নিচ্ছিনে? দেশ-ধর্ম-জাত-বর্ণের বাধাকে অতিক্রম করে কত কত দাম্পত্য গড়ে উঠেছে। এর পরেও কী বলব, অভিন্ন গোত্র-বর্ণ-দেশ-ধর্ম না হলে মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব নয়? অভিন্ন স্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থান যে সম্ভব, তার বহু বহু প্রমাণ কী আমরা অহরহ চারদিকার পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছিনে? গোত্র-প্রীতি আর ভূগোল-চেতনাও আসলে একটা সংস্কার। এ সংস্কার দুর্মুচ্য-দুরপনেয় হলেও, অনপনেয় নয়। আজকের দিনে আফ্রিকাবাসী ছাড়া পৃথিবীর আর কয়জন মানুষই বা স্বগোত্রের খবর জানে? আর কয়জন মানুষই বা স্বদেশের আদি বাসিন্দার বংশধর? যুগে যুগে কত মানুষের ধারা এসে মিশেছে এক এক দেশে। সে-সব মানুষের বংশধরেরা আজ অভিন্ন ধর্মে, ভাষায় ও বর্ণে গড়ে উঠেছে একক জাতিরূপে—হয়েছে অভিন্ন সত্তায় ও আত্মায় বিশ্বাসী। পূর্বপুরুষের মিশ্র ধারার খবরও জানা নেই—অনুভূতি তো দূরের কথা। কাজেই দীর্ঘ সহবাসের ফলে কালে মানুষ একক সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে অভিন্ন সমাজসত্তায় স্বাতন্ত্র্য হারায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যাযাবর জীবনেই ছিল মানুষ অভ্যস্ত। মানুষ স্থিতিকামী হয়েছে খোরপোষের দায়ে ঠেকেই। আজো কী আমাদের অন্তরের গভীরে সে-যাযাবর তৃষ্ণা জেগে নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে দেশ বলে কোনো মাটির মমতা মানুষের নেই, যা আছে তা পরিচিত মনুষ্য পরিবেশের মোহ। অপরিচয়ের অস্বস্তি, আর পরিচিত পরিবেশের প্রশান্তিই রয়েছে দেশ-বিদেশ চেতনার মূলে। এটাকে ভুল করে আমরা মাটির মমতা বলি। স্বগ্রাম-স্বদেশ আসলে মাটি নয়—মানুষ, যে-মানুষ আজন্ম পরিচিত। এজন্যেই প্রবাসে বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষ সেখানেই স্থায়ীভাব বাস করতে চায়। স্বদেশে শহরে বাসের আগ্রহ ও বিদেশকে ভালবাসার প্রেরণা জাগে প্রীতির প্রসারে ও প্রাবল্যে। অতএব, যে-সব সংস্কার বশে আমরা মানুষের প্রতি বিমুখ ও বিরূপ হয়ে থাকি—তার সব কয়টাই কৃত্রিম। পরিহার করা দুঃসাধ্য নয় মোটেই।

স্বার্থ-বুদ্ধির প্ররোচনাতেই আমরা তিলকে তাল করে তুলি, তুচ্ছকে করি উচ্চ, মোহকে ভাবি মমতা, স্বপ্নকে মানি সত্য বলে।

রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা যে নিতান্ত কৃত্রিম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তার জন্ম-মৃত্যু ঘটে। অতএব মানুষে মানুষে মিলনে বাধা কোথায়? আজকের দিনে সরকারি উৎসাহ ও সামাজিক উদারতা থাকলেই দেশে দেশে এ সমস্যার সমাধান কঠিন নয়।

যদি পোশাকে ও নামে দৈশিক ও ধার্মিক ছাপ না থাকে, তাতেও মিলন-ময়দান প্রশস্ত হবে। কুলবাচি পরিহার করলেও অনেকটা ঘুচবে অবাঞ্ছিত ব্যবধান। সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে নির্বিচার বৈবাহিক সম্পর্ক। দেশ-জাত ও বর্ণ-ধর্মের কৃত্রিম বাধা অস্বীকার করে স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের নির্বিঘ্ন রেওয়াজ চালু হলে অখণ্ড পৃথিবীতে একক জাতি ও অভিন্ন সমাজ গড়ে উঠবে। কেননা বিবাহের মাধ্যমেই গড়ে উঠে আত্মীয় সমাজ, আর আত্মীয়তা বোধেই মানুষের কোমলতম ও শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধির বিকাশ সম্ভব হয়।

যে-সব রাষ্ট্রে গোত্রের, বিভিন্ন ধর্মের, একাধিক ভাষার, নানা বর্ণের ও অনেক সম্প্রদায়ের লোকের বাস ; সেখানে একক জাতি গঠনে উক্ত সব রীতি-পদ্ধতি অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। এবং কালে ও ক্রমবিকাশে রাষ্ট্র সীমা অতিক্রম করে এই সমমর্মিতা ও সহযোগিতা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে। এইভাবেই গড়ে উঠবে পুরোনো নামে ও নতুন তাৎপর্যে মনুষ্যজাতি। তখন একক বিশ্বে মনুষ্যজাতির সামগ্রিক সমস্যার সমাধানের জন্যে সমবেত প্রয়াসে উদ্যোগী হবে প্রতিটি মানুষ। তখন বসতি-বহুল অঞ্চল থেকে মানুষ বসতি-বিরল এলাকায় গিয়ে বাস করতে পারবে, জাত-জন্ম ও বর্ণ-ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কেননা খাদ্য বণ্টনে ও বসতি বিন্যাসে সমতা সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভাবী মানুষের সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আরাম। মানুষের প্রাণ-ভ্রমরের নিরাপত্তা অর্জন কেবল এ ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণ অন্বেষা

সুস্থ মানুষ যেমন পথ্যাপথ্য বিচার করে না, সুস্থ জাতিও তেমনি কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়ায় না। প্রাণ-প্রাচুর্যের এমন একটি আনন্দিত প্রেরণা আছে, যে-প্রেরণাবশে মানুষ সহজে ও স্বচ্ছন্দে আনন্দ অন্বেষায় ও কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। প্রাণের প্রেরণাতেই এ প্রয়াস চলে বলে তা স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্য শিশুকে চাঞ্চল্য দান করে, আর চাঞ্চল্য বশে সে দুরন্ত হয়। এই দুরন্তপনাকে যে ভয় করে, সে বস্তুত সুস্থতাকেই ভয় পায়। কেননা তাতে তার কাজ বাড়ে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আলস্যের স্বস্তি উপভোগে অভ্যস্ত জীবনে একে সে বিপর্যয় বলেই জানে।

অর্জন যে করতে জানে না, বর্জনের শক্তি তার আয়ত্তে থাকে না। আয় না থাকলে মানুষ ব্যয় করতে ভয় পায়। গ্রহণ-বিমুখ মানুষ স্বাভাবিক কারণেই বর্জন-বিমুখ হয়। বৃষ্টি কিংবা বরফের দাক্ষিণ্য না-পেলে স্রোতস্বিনী যেমন বদ্ধ জলাতে জীর্ণতা পায়, তেমনি গ্রহণ-ভীরু মানুষও রক্ষণশীল হয়। শিশু-পাঠ্য কবিতার কলি মনে পড়ছে :

> "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
> সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
> যে জাতি জীবনহারা অচল অসার
> পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণকে যারা জীবনের পরম আশ্রয় বলে মানে, তারা জগতের নিত্য-নব আলো-বাতাসকে অস্বাস্থ্যকর বলে জানে। তাই নতুনের প্রভাব এড়িয়ে প্রথার-প্রতাপ স্বীকার করে তারা জীবনযাত্রায় স্বস্তি খোঁজে। এমন ব্যক্তি বা সমাজ শামুকের মতো। তার কায়িক বৃদ্ধি আছে, মনের বিকাশ নেই। এমন মানুষ ভোগলিপ্সু হয় কিন্তু চরিত্রবান হয় না। তাই ব্যবহারিক জীবনে সে স্বাচ্ছন্দ্যকামী, এবং এ স্বাচ্ছন্দ্যের ঈহা তাকে চুরি, মিথ্যাচার, লাম্পট্য, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপকর্মে প্রবর্তনা দেয়, এবং বস্তুজগতে সে বিদেশী বিজাতির আবিষ্কৃত নতুন সামগ্রী গ্রহণে হয় উৎসুক। তখন হারাম-হালালের, সুন্নত-নফলের, মকরুহ্-বেদাতের কোনো বাছ-বিচার তার মনে জাগে না। কেবল জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রেই সে শাস্ত্রীয়-প্রত্যয় পরিহার করতে নারাজ। শাস্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসের ইমারত। বিশ্বাস মাত্রই আবেগসঞ্জাত। এবং আবেগ যুক্তির বীজও নয়, প্রসূনও নয়। তাই বিশ্বাস বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের বীজ বুনে। আর জ্ঞান মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়। কেননা, জ্ঞানে কুহেলিকা কিংবা কুয়াশা নেই, জ্ঞান প্রতারিত করে না। অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কেবল মানুষ মিলতে পারে। আর জ্ঞান সব সময়েই বিপন্মুক্ত।

এক হিসেবে বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ। কেননা বিশ্বাসের জন্ম অনুমানে, লালন আবেগে এবং বিস্তার অনুভবে। অন্ধ যখন পথ চলে, তখন সে হাতড়িয়ে চলে এবং অনিশ্চিতে পা বাড়ায়। চক্ষুষ্মানের মতো চলার স্বাচ্ছন্দ্য এবং দেখার আনন্দ সে পায় না। অন্ধ প্রয়োজনের অনুগত। আনন্দ থাকে তার অনায়ত্ত। জ্ঞানই চক্ষু আর বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধতা। জ্ঞানকে যে বিশ্বাসের উপরে ঠাঁই দেয় না, যে বিশ্বাসকে পরিহার করে জ্ঞানকে গ্রহণ করে না, তার জিজ্ঞাসা নেই। সে জগৎ ও জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। দেহ, প্রাণ প্রকৃতির দান বটে, কিন্তু চেতনা-সুন্দর জীবন জ্ঞানের প্রসূন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির দান উদ্ভিদ কেবল অরণ্যই সৃষ্টি করে। মানুষের পরিচর্যায় গড়ে উঠে উদ্যান। তেমনি জ্ঞানের অনুশীলনে পাই সাংস্কৃতিক জীবন—যা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আধার। জ্ঞান মানুষকে বোধিসত্ত্বায় উত্তীর্ণ করে। আসলে বোধিসত্ত্ব অর্জনই তো মানুষের লক্ষ্য। আর কে-ই-বা অস্বীকার করবে যে চিত্ত-সম্পদ ও বস্তু-সম্পদ—মানব-সাধ্য এই দুটো ঐশ্বর্যই জ্ঞানেই কেবল লভ্য?

সচেতন কিংবা অবচেতন ভাবে মানুষের যা কাম্য, কবির ভাষায় তা—

"চাই স্বাধীনতা চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া এ বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।"

শাস্ত্র ও সংস্কারের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করা কেবল জ্ঞান ও যুক্তির জোরেই সম্ভব। কেননা জ্ঞান এবং যুক্তিই শুধু মানুষকে সুস্থ ও স্বস্থ করতে ও রাখতে পারে। জ্ঞানই চক্ষু এবং যুক্তিই চেতনা, এবং চেতনা-সম্পন্ন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আত্মসামর্থ্যে পথ চলে, তাই সে চলার স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দু-ই পায়।

আজ দেখছি শাস্ত্র ও সংস্কারের আনুগত্য এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে প্রতারণার জাল বুনছে। নির্বাচনের সময়ে তাদের দেশ-জাত-ধর্ম-চেতনা এমনি প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে উঠে যে সরল মানুষেরা মনে করে বুঝি আমরা সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি! এদের দস্তান না ধরলে বুঝি অপমৃত্যু সুনিশ্চিত! তারা কেবল কথার বেড়া দিয়ে শাস্ত্রের ও স্বার্থের, স্বত্বের ও স্বর্গের, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের এমন অনুপম মায়ালোক নির্মাণ করে যে বিমূঢ় অভিভূত অজ্ঞ মানুষের এই মরীচিকার খপ্পর এড়ানোর উপায় থাকে না।

www.amarboi.com

সহজ করে বুঝতে গেলে, গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে একটি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক সমবায় সংস্থা। রাষ্ট্রবাসীর ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য দানই তার মুখ্য কাজ। বস্তু-সম্পদে রয়েছে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং তজ্জাত সামাজিক অধিকার। আর চিত্ত-সম্পদ চিরকালই ব্যক্তিক। অতএব ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৈষয়িক বস্তু-সম্পদের বারোয়ারী প্রয়োগ সুনিয়মিত রাখা ও সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে 'সরকার' নামের সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই সরকারি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতকগুলো বিভাগে বিন্যস্ত ; যেমন স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সৈন্য বিভাগ প্রভৃতি।

কোথায় রেলপথ করা দরকার, পাটের বাজার কোথায় সন্ধান করা উচিত, কলেরা-বসন্ত নিরোধের উপায় উদ্ভাবন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিংবা সেচ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি একান্তই ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এসব সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে শাস্ত্র ও সংস্কারের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানে আদর্শের কোনো প্রয়োজন যদি থাকেও, তবে তা বিবেকী আদর্শ। এবং সে-আদর্শ সদিচ্ছার, সর্বজনীন কল্যাণের ও জৈব-স্বাচ্ছন্দ্যের। এ কার্যে যা প্রয়োজনীয় তা আদর্শ নয়, বরং অভিপ্রায় ও উপায়। বারোয়ারী কল্যাণে সদুপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগই কেবল দরকার, আর কিছু নয়।

এ যুগে সে উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা, আর অভিপ্রায় হচ্ছে সংহত ভুবনে জাতিপুঞ্জের সমস্বার্থে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার সদিচ্ছা। জাহাজ আরোহীরা যেমন স্ব স্ব জীবনের নিরাপত্তার জন্যেই জাহাজের নিরাপত্তা কামনা করে, তেমনি স্ব-স্বার্থেই মানুষ রচনা করবে মিলন-ময়দান, কামনা করবে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার জন্যে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তি। এক্ষেত্রে শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বের প্রভাব ও প্রয়োগ অকল্যাণকর। একে তো শাস্ত্র ও সংস্কার রাষ্ট্রিক বিষয়-সংপৃক্ত নয়, দ্বিতীয়ত আজকের দিনে কোনো রাষ্ট্রেই নাগরিকরা অভিন্ন জাত-বর্ণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বকে এই ব্যবহারিক জীবনের সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সংলগ্ন করা গলগ্রহ করারই নামান্তর।

পদলোভী স্বার্থবাজের ছল-চাতুরী ও বঞ্চনা-প্রতারণা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার ও রক্ষণের জন্যে আজ বিবেকী মানুষের বড় প্রয়োজন। এমন তীব্রতায় এদেশে ত্রাণকর্তার প্রয়োজন আগে আর কখনো অনুভূত হয়নি। আজ এমন কতকগুলো সংবেদনশীল মানববাদী কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকারের অঙ্গীকারে এগিয়ে আসবেন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিবেকী আত্মার ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার জন্যে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন মানববাদী কী এখনো দুর্লভ থাকবেন!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প-সাহিত্যে গণরূপ

জীবন আছে অথচ প্রয়োজন নেই, এমন হতেই পারে না। আমি আছি বলেই আমার ভুবন আছে। আমার জীবন সেই ভুবনের সঙ্গে একই নাড়িতে যুক্ত, একই সূত্রে গাঁথা। আমার জীবনের তুচ্ছ-উচ্চ সর্বপ্রকার প্রাত্যহিক কিংবা মৌহূর্তিক প্রয়োজন আমার ভুবনই মিটায়। আমি আছি তাই আমার পেটের ভাত, পরনের কাপড়, রোগের প্রতিষেধক, শোকের প্রবোধ, দেহের পুষ্টি ও মনের তুষ্টির দরকার। রুচি বদলের জন্যে আমি বন্ধনে মুক্তি, যন্ত্রণায় আনন্দ, সমস্যায় সমাধান যেমন সন্ধান করি ; তেমনি কখনো কখনো মুক্তি এড়িয়ে বন্ধনকে, আনন্দকে হেলা করে যন্ত্রণাকে, সম্পদ ছেড়ে সংকটকে বরণ করে জীবনের অন্য স্বাদ খুঁজি।

জীবন আমার কাছে কখনো দায়িত্ব, আর কখনো বিলাস, কখনো দায়, কখনো সম্পদ, সকালে আনন্দ আবার সন্ধ্যায় যন্ত্রণা, কখনো খেলনা কখনো ঐশ্বর্য, কখনো বোঝা, কখনো পাথেয়, কখনো বেদনা, কখনো বা আকুতি, কখনো প্রাণময়, কখনো মনোময়, কখনো রূঢ়িক, কখনো সামাজিক, কখনো বৈষয়িক, আবার কখনো বা দার্শনিক। সবটা মিলে জীবন এক অনন্য অনুপম দুর্লভ ঐশ্বর্য। এই জীবনের স্বাদ যে একবার সচেতনভাবে পায়, সে আনন্দলোকেরই সন্ধান পায়। জীবন-ধনে যে ধনী, তার কাছে নিখিল জগৎ রূপবান হয়ে অপরূপ হয়ে আবির্ভূত হয়। সেই রূপসী ধরণীর অনুরাগে তার স্বভাবে আসে কমনীয়তা, তার হৃদয়ে জাগে ঔদার্য, প্রীতির সঞ্চয়ে ভরে উঠে তার বুক। চিত্তলোকে তার গড়ে উঠে মাধুর্যের মৌচাক। তখন সে প্রীতি ও শুভেচ্ছার পুঁজি নিয়োগ করে তার ভুবনে। বিনিময়ে পায় মানুষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। জীবনে এর চেয়ে বড় সম্পদ, এর চেয়ে কেজো পাথেয় আর নেই। 'মানব জমিন' আবাদ করলে যে ফসল মেলে, তা কখনো নিঃশেষ হয় না—বন্ধ্যা হয় না।

মন-প্রাণের এমনিধারা অনুশীলনের নামই সংস্কৃতিচর্যা, আর এ স্তরে উত্তরণই সংস্কৃতি। এমনি করে সংস্কৃতিবান হলেই মানুষ হয় প্রীতিপরায়ণ, সংবেদনশীল, পরিণামদর্শী ও কল্যাণপ্রবণ। কেননা, সে বোঝে—নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না, একে নষ্ট করলে সবাই দুঃখ পায়। এমন মানুষ অনুকম্পা বশে উদার হয় না, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে মহৎ হয়। তেমন মানুষ বাদশা কিংবা ফকির হতে পারে, চালু অর্থে মূর্খ কিংবা জ্ঞানী হতে পারে, নিরক্ষর কিংবা বিদ্বান হতে পারে। কিন্তু তাতে তার মানবিক চেতনায়, তার প্রীতিশীলতায়, তার হিতবুদ্ধিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অবশ্য তা ব্যক্ত হওয়া কিংবা অব্যক্ত থাকা, তার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে তার সামাজিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও ধার্মিক প্রতিবেশের উপর। কিন্তু তাতে তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের ঔজ্জ্বল্য কমে না, বরং অবরুদ্ধ আবেগের বেদনায় তপ্ত কাঞ্চনের মতো—কষিত সুবর্ণের মতো তার রূপ, তার লাবণ্য বাড়ে।

এমন মানুষ যখন লোকসেবায় নামে তখন সে বুদ্ধ-যীশু-কবীর-নানক-চৈতন্য-বায়যিদ হয়, যখন নৃপ হয় তখন ইউসুফ-রাম-নওশেরোয়া হয়। যখন লিখিয়ে হয় তখন শেক্‌পীয়র ভল্টেয়ার গ্যেটে-টলস্টয়-রঁলা-রবীন্দ্রনাথ হয়। যখন গাইয়ে-বাজিয়ে হয় তখন তানসেন-হরি বৈজু-বিটোফন হয়। যখন আঁকিয়ে-বানিয়ে হয় তখন ভিঞ্চি-এ্যাঞ্জেলো-পিকাসো হয়— তখন আমরা পাই অজন্তা-ইলোরা-এথেন্স-আগ্রার ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও আলেখ্য। যখন দার্শনিক হয় তখন তার মধ্যে প্ল্যাটো এ্যারিস্টোটল-রুশদ-হেগেল-নীৎসে-সার্ত্রেকে পাই। যখন সমাজতাত্ত্বিক হয় তখন সেন্ট অগাস্টাইন-খলদুন-মার্কসকে পাই। যখন বিজ্ঞানী হয় তখন ডারউইন-ফ্রয়েডকে পাই। যখন বিপ্লবী হয় তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেনিন-মাও-গুয়েভারাকে দেখি। এ যুগে যন্ত্র-প্রভাবে মানুষের জীবিকা ও জীবন-পদ্ধতি পালটে গেছে। তাই যুগ-প্রয়োজনে গণচেতনা, গণসাহিত্য ও গণতন্ত্রের কথাই প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রায় সর্বক্ষণ শুনতে হয় আমাদের।

যন্ত্রায়ত জীবিকার ফলে উদ্ভূত জীবন-প্রতিবেশে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ আজ আর আগের মতো আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সে এখন দৈব-নির্ভর নয়, রোদ-বৃষ্টি-রোগ-অন্নের জন্যে ভাগ্যের উপর ভরসা রাখে না। সে বুঝেছে এতে প্রকৃতির প্রভাব যতটুকু, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রয়েছে মানুষের হাত। মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা ও অপ্রেম-অবিবেচনাই মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ। কাজেই স্বায়ত্ত জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা, সুষ্ঠু বিন্যাস ও সুনিয়ন্ত্রণের কথাই সে সর্বক্ষণ ভাবছে, না-ভেবে পারছে না। তার অন্ন চাই, আনন্দ চাই, ওষুধ চাই, প্রবোধ চাই। প্রাচুর্যহীন কাড়াকাড়ির যুগে তাই মানুষকে শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তারা অক্ষম বলেই তাদের সৈনাপত্য নিয়েছে সংবেদনশীল মানববাদী লোকসেবক, লেখক, গায়ক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সবাই। এই লড়িয়ে লোকগুলোই স্ব স্ব ক্ষেত্রে লড়াই করে যাচ্ছে মানুষের মুক্তির জন্যে। তারা মুক্তি কামনা করে শোষণ থেকে, অশিক্ষা থেকে, দৈন্য থেকে, বিশ্বাস থেকে, সংস্কার থেকে, পীড়ন থেকে, অন্ধকার থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অমঙ্গল থেকে, হীনমন্যতা থেকে।

এদের মধ্যে যারা লিখিয়ে তারা গণসাহিত্যিক, যারা নেতৃত্ব দেয় তারা গণনেতা, যারা আঁকে তারা গণশিল্পী, যারা চিন্তাবিদ তারা মানববাদী, যারা ঐতিহাসিক তারা সমাজতাত্ত্বিক। এ সংগ্রাম চলছে লেখা ও রেখার, কথা ও সুরের মাধ্যমে। তারা লিপ্সু শোষক ও পীড়কদের মনের কাছে, মস্তিষ্কের কাছে, বিবেকের কাছে এ আবেদনই জানাতে চাচ্ছে যে—পরিণামদর্শী হও, বিবেকবান হও এবং সংবেদনশীল হও, আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই যৌথ জীবনের সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সমভাবে ভাগ করে নিতে এগিয়ে এসে, নইলে নিষ্কৃতি নেই তোমার—"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে টানিছে যে নীচে।" সমস্বার্থের ভিত্তিতে সহযোগিতা ও সহঅবস্থানে রাজি হতেই হবে। এরই নাম গণসাহিত্য, গণসংগীত ও গণশিল্প। কাজেই গণশিল্প-সাহিত্য, শোষিত-পীড়িত অজ্ঞ-অশিক্ষিত চাষী-মজুরের জন্যে নয়, পীড়ক-শোষক লিপ্সু বেনে বড় লোকের উদ্দেশ্যেই রচিত।

আমার লেখায় ও রেখায়, আমার কথায় ও সুরে আমার জীবনের চাহিদার দাবি ; আমার ভাত-কাপড়ের, আমার তেল-নুন-লাকড়ির, আমার ওষুধ-পথ্যের অভাবের কথাই অভিব্যক্ত পাবে। কেননা এ অভাব আমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে, আমার জাগ্রত মুহূর্তগুলো বিষিয়ে তুলেছে; আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। যন্ত্রণার প্রকাশপথ রুদ্ধ করা সহজও নয়, স্বাভাবিকও নয়। এই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ও তার নিরসনের আবেদন ও আকুতিই গণশিল্প-সাহিত্য বা সঙ্গীত। অভাবজীর্ণ পাঁজর থেকে এ ছাড়া আর কী আশা করা যায়! আজো তকদির-বাদী ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে যারা আস্থা রাখে আর যাঁরা অন্যের শোণিত পানে পুষ্ট, অথচ যাদের সংবেদনশীলতা কিংবা পরিণামদর্শিতা নেই, কেবল তাদের মুখেই আমরা শুনতে পাই আদ্যিকালের ফুল-পাখি ও প্রেম-প্রকৃতির মহিমা কীর্তন।

এ শতক মানুষের মুক্তির বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে। অজ্ঞতা থেকে, দাসত্ব থেকে, পরাধীনতা থেকে, দারিদ্র্য থেকে, লিপ্সা থেকে, অমানুষিকতা থেকে প্রত্যহ মুক্তি আসছে কারো-না-কারো, কোথাও-না-কোথাও। অতএব শতাব্দীর আহ্বান ব্যর্থ যাবে না। আলো ঝলমল আনন্দঘন সুপ্রভাত আসন্ন। সামনে নতুন দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য

ধর্মকে ধারণ করেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার পথ করে নিতে চায়। অবশ্য এ ব্যাপারে সে কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য কামনা করে না। সে জন্মসূত্রে তার ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশ থেকে যা পায়, তা-ই সে নির্বিচারে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। আশৈশব লালিত সংস্কারই তার এ বিশ্বাসের ভিত্তি। এবং তার জীবন ও জগৎ চেতনাও অনেকাংশে এই বিশ্বাস-সংস্কার প্রসূত। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ কৃচিৎ জিজ্ঞাসু—এর জন্যে কিছুটা ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য আর অনেকটা সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও শাস্ত্রীয় নিষেধই দায়ী। এই অসহিষ্ণুতা ও নিষেধের গোড়ায় রয়েছে জীবনের পথ ও পাথের সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হবার আগ্রহ। এ কারণেই কোন-না-কোনো জ্ঞানী-মনীষী প্রদত্ত দিশার অনুসরণে সে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবন-দর্শন গ্রহণে অভিলাষী। তাই মানুষ সাধারণভাবে পরবুদ্ধিজীবী।

কিন্তু ধর্ম বলতে কোনো অবিমিশ্র একক মত বা শাস্ত্র বুঝায় না। আদিম আরণ্য মানবের আঞ্চলিক জীবন ও জীবিকা পদ্ধতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল যে জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা, তাই প্রাতিবেশিক ও জৈবিক প্রয়োজনে ক্রমবিকাশের ও ক্রমবিবর্তনের ধারায় কালিক রূপান্তর লাভ করেছে। মানব-চেতনার বিকাশ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রসারই তার সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির মূলে ক্রিয়াশীল। এ কারণে এর উপর স্থানগত ও কালগত জীবিকা-পদ্ধতির প্রভাব অপরিমেয়। তাই ধর্মের স্থানিক ও কালিক অবয়ব ও বিকাশ ছিল—দেশ-কাল নিরপেক্ষ রূপ ছিল না। এমনকি এর মধ্যে প্রকৌশল, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধের প্রভাব এত অধিক ছিল বলেই আরণ্য মানবের ধর্মে আর সভ্য ও সভ্যতার মানুষের শাস্ত্রে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রয়োজনগত পার্থক্য এবং মনন ও রুচির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সর্বক্ষেত্রে সুপ্রকট।

অতএব, ধর্ম বলতে ঈশ্বর, ভূত-প্রেত, জীন-যাদু, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমন্বিত এক বিরাট-বিপুল চির রহস্যাবৃত মায়াময় কল্পলোক বা মানস-জগৎ বোঝায়—যার জটিল আলো-আঁধারীর মধ্যে রয়েছে—আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার, স্বপ্ন ও সত্যের রহস্যসূত্র। অজ্ঞ অসহায় মানুষ অনুমানে ও অনুভবে এই রহস্যভেদে ছিল প্রয়াসী। যা বুঝেছে তার ভিত্তিতেই সে জীবনের ও জীবিকার সেই অদৃশ্য অরি ও মিত্র শক্তিগুলোর সঙ্গে একটা আপোষ-রফা করবার চেষ্টা করেছে পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর জন্যেই প্রয়োজনীয় হয়েছে নিয়ম-নীতি। যৌথ জীবনের অবচেতন প্রেরণায় ও প্রয়োজনে সে-চুক্তিতে এসেছে মানুষেরও সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের নিয়ম-নীতির শৃঙ্খল। তাই এ চুক্তি ত্রিপক্ষীয়—দেব, দানব ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিক আনুগত্যের অঙ্গীকারে দেবতা-দানবের অনুগ্রহ, সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে।

এখানেই কিন্তু মানুষ থামেনি। নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এ ব্যবস্থায়। তার প্রসারমাণ জীবনের প্রয়োজনে সে নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির মধ্যে নিজকে নিবদ্ধ করে যৌথ জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করেছে। এমনি করে মানুষ এক বিপুল ও বিচিত্র জীবন-যন্ত্র এবং জটিল-জীবিকা যান তৈরি করে এগিয়ে এসেছে আজকের দিনে। আজ ধার্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের নিগড়ে মানুষ স্বেচ্ছাবন্দী। এ বন্দিত্ব বরণ করেছে সে শান্তি, স্বস্তি, প্রগতি ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে মানুষের বিস্ময়কর অগ্রগতি পৃথিবীকে করেছে সংহত এবং মানুষের সমাজ করেছে সংমিশ্রিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রত্যয়ী যন্ত্রী মানুষ আজ আর কোনো ব্যাপারেই দৈব-নির্ভর নয়। দেব-দানবের সঙ্গে তার চুক্তি ভেঙে গেছে। জীবনের কোনো প্রয়োজনের জন্যে সে আর আসমানের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী নয়। মানতেই হবে, যাঁরা মানব-শক্তির এমনি অচিন্ত্য বিকাশ সাধন করেছেন, তাঁরা চিত্ত-সম্পদে অতুল্য। এঁদের সাধনা ও শ্রমের, এঁদের ভাব, চিন্তা ও কর্মের দান যে যন্ত্রজ বস্তু-সম্পদ—তা অকাতরে দ্বিধাহীনচিত্তে পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছে কর্তব্যে উদাসীন, পরচিন্তাজীবী ও পরশ্রমজীবী ভোগেচ্ছু মানুষ। কিন্তু মানুষ নির্বোধের মতো পরিহার করে চলে তাঁদের চিত্ত-সম্পদ, অবজ্ঞা করে তাঁদের মননের মহাঅবদানকে। ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে তারা বরণ করেছে বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে, চলমানতাকে ; কিন্তু মানস-জীবনে গ্রহণ করেনি এই যান্ত্রিক বস্তুর জনন-শক্তিকে, সেখানে তারা ধরে রেখেছে স্থিতিশীলতাকে। জীবন-ভাবনায় ও জগৎ- চেতনায় মানুষের এই অসঙ্গতি, বস্তু-সম্পদে এই আগ্রহ এবং চিত্ত-সম্পদ অর্জনে এই অনীহাই আজকের দিনের সব চাইতে মৌলিক মানবসমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হলে, আমাদের বিশ্বাস অন্য সব মানবিক সমস্যার সমাধান হবে অনায়াসলভ্য।

২

আমাদের পাকিস্তানে এই সমস্যা আরো বিকৃত হয়ে দেখা দিয়েছে। সে কথা এখন বলব।

ধর্ম-বিরহী দেশ নেই। এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম ও আচারিক, আনুষ্ঠানিক আর পার্বণিক ধর্ম মানুষের আটপৌরে জীবনে চেতন-অচেতনভাবে জড়িয়ে রয়েছে! এতকালের পুরোনো ধর্ম মানুষের ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে কোনো সহায়তাও করে না, স্বস্তি-শান্তির বিঘ্নও ঘটায় না। এ একরকম গৌরব-গর্বের ও প্রবোধ-প্রশান্তির অবলম্বন হয়েই আভরণের মতো জীবনে সংলগ্ন।

কিন্তু পাকিস্তানের সরকার, সরকারি লোক ও জননেতার কাছে ধর্ম একটি তরতাজা প্রাত্যহিক ও বৈষয়িক সম্পদ ও সমস্যা। তাঁরা যেন ইসলাম ও মুসলমানের প্রাচীনত্ব—সাড়ে তেরোশ বছর বয়স—স্বীকার করতে চান না। উন্মেষ যুগের সাহাবী-প্রচারকদের মতো তাঁরা যেন সদ্যোজাত ইসলাম প্রচারে এবং নও-মুসলিম রক্ষণে সদাব্রিত। তাঁদের চোখে ইসলাম ও মুসলমানের ভয়ঙ্কর সঙ্কটজনক অবস্থা। উভয়েরই যেন এখন-তখন হাল। কখনো ইসলাম ডোবে, কখনো মুসলমান মরে, আবার কখনো বা সিরাজুল ইসলাম' নিবে!

তাঁদের ঘরোয়া জীবনে ইসলামের প্রতি ঔদাসীন্য সাধারণ লোকের চাইতে বেশি বলেই শোনা যায়। কিন্তু তাঁদের দফতর ও ময়দানী-জীবনে তাঁরা ইসলামের সমর্পিত চিত্ত, ইসলাম-সর্বস্ব ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গিতপ্রাণ। তাই তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী জীবন-পদ্ধতি, ইসলামী-শিক্ষা ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকামী। তাঁদের অভিপ্রায় অতি উত্তম এবং আপাত দৃষ্টিতে সবটাই ভালো।

কিন্তু তাঁদের উৎসাহের আতিশয্য দেখে মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও ইসলাম ও মুসলিম নেই। কেবল পাকিস্তানেই বিপন্ন ইসলাম ও মুমূর্ষু মুসলমান শিবরাত্রির সলতের মতো সধূম শিখা নিয়ে টিকে রয়েছে এবং তাও নির্বাণোন্মুখ। তাই জননেতা ও সরকারের এই বিচলন এবং তজ্জাত উদ্বেগ ও উত্তেজনা। 'অছি'র দায়িত্ব চিরকালই গুরু ও মহৎ দায়িত্ব। সে দায়িত্বে অবহেলা অসম্ভব!

৩

এবার পাকিস্তানীর হালফিল অবস্থা বিবেচনা করা যাক। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সবাই এবং পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জন অধিবাসীই মুসলমান। সরকার ও জননেতারা বলেন ইসলাম ও ইসলামী জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ বশেই তাঁরা পাকিস্তান তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কামনা করেছিলেন। এর মধ্যে তথ্যের ভুল যা-ই থাক, তাঁদের অভিপ্রায়ের অকৃত্রিমতায় আস্থা রাখতে আমাদের আপত্তি নেই।

বিগত কয় বছর ধরে পাকিস্তানও ইসলামী রাষ্ট্র। এবং ঘরে-বাইরে তা সগৌরবে ও সগর্বে প্রচারও করা হয়। পাকিস্তানী মুসলমানদের সবাই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হোক, প্রাত্যহিক জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণীয় ও অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষিত- অশিক্ষিত কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবহিত। অন্তত শাস্ত্রীয় পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে কেউই অজ্ঞ নয়।

তবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে কোন্ পাপ কোন্ অন্যায় কম! ওরা অবশ্য পাকিস্তানীদের মতো অত ধর্মভীরু বা ধর্মপ্রিয় নয়, তাদের রাষ্ট্রও ধর্মরাষ্ট্র নয়। তবু সততায়, ন্যায়পরায়ণতায়, কর্মনিষ্ঠায়, দায়িত্বশীলতায় কিংবা কর্তব্যবুদ্ধিতে ধর্মে অনুরক্ত ও অনুগত ইসলাম-সর্বস্ব পাকিস্তানীদেরকে ঘরে-বাইরে কোথাও আমরা বিজাতি-বিধর্মীদের চেয়ে ভালো দেখিনে। ঘরোয়া জীবনে, সামাজিক অঙ্গনে, অফিসে-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে—মিথ্যার বেসাতি, অন্যায়ের নির্লজ্জ প্রকাশ, বিবেকের অবমাননা সর্বত্র দৃশ্যমান। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও পীড়ন-লুণ্ঠন-হনন প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায়-প্রবণতা, ঘুষ, ছল, প্রতারণা, মিথ্যাচার, জুয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় পাপে পাকিস্তানীদেরকে যে-সংখ্যায় আসক্ত দেখি, তার চাইতে বেশি সংখ্যায় পাপে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ ব্যাপারে গণ-অভিভাবকদের মনোভাবও অদ্ভুত। এসব কিছুতেই যেন ইসলামের ক্ষতি হয় না, মুসলমানের জাত যায় না। কিংবা কোনো বিদেশী-বিজাতির আচারে-প্রভাবেই তাঁদের আপত্তি নেই—সর্বনাশ হয় কেবল ভারতীয় প্রভাবে ও হিন্দুয়ানী আচারে! আবার মুসলমান চোরা-ডাকু-মিথ্যুক-লম্পট-বদমাশ হলে সমাজের কিংবা ইসলামের যেন কোনো ক্ষতি নেই,—ক্ষতি হয় কেবল কেউ নাস্তিক হলে। তাঁরা আমাদের ভাত-কাপড়-ওষুধের দায়িত্ব নেন না, আমাদেরকে শুধু ভেহেস্তে পাঠানোর কর্তব্য পালনেই তাঁদের আগ্রহ। আর তাও সর্বত্র এবং সর্বদা নয়—কেবল দফতরে ও ময়দানে এবং সরকারি সমস্যার কালে ও নির্বাচন সময়ে।

তাহলে এই আদর্শিক ইসলাম-প্রীতির রহস্য অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

প্রথমত, ধরা যাক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কী কী পাপ ও অনাচার থাকে, যা ধর্ম-রাজ্যে চালু নেই। বলতেই হবে তেমন পার্থক্য নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। ইসলামে নিষিদ্ধ বা ধিক্কৃত সিনেমা, জুয়া, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীত, সুদ, নারী-স্বাধীনতা, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য, বীমা প্রভৃতি পাকিস্তানেও চালু রয়েছে। তবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বা সরকারের বৈশিষ্ট্য কি?

দ্বিতীয়ত, ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেই মুসলমান চরিত্রবান হবে, ধার্মিক হবে এমন ধারণার স্বপক্ষে যুক্তিও প্রবল নয়। চুরি, ঘুষ, সুদ, মিথ্যাচার, পীড়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক পাপবোধ জাগানোর জন্যে কোনো বিশেষ শাস্ত্রীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। কেননা দুনিয়ার কোনো সভ্য-অসভ্য, আস্তিক-নাস্তিক সমাজেই এসব দুষ্কর্মের সমর্থন নেই। তাছাড়া বিদ্যা বা শিক্ষা কিংবা জ্ঞান মানুষের চরিত্র গড়ে না। বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত রাখার সদিচ্ছাই ব্যষ্টিকে চরিত্রবান, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শপরায়ন করে। বিদ্বান বা জ্ঞানী হলেই চরিত্রবান হবে—এমন কথা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব হলেও সামাজিক তথ্য নয়। তার প্রমাণ আমাদের শিক্ষিত লোকের মধ্যে চরিত্রহীনের সংখ্যা যত বেশি, অশিক্ষিত সমাজে তত নেই।

আমাদের দুর্নীতির সমস্যা তো শিক্ষিত ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী সমাজেই সীমিত। বরং নিরক্ষর লোকেরা আজন্মলালিত ঘরোয়া বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বলেই বিশেষভাবে দৈবনির্ভর ও নিয়তি-ভীরু। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে দৈব রোষ ও প্রসন্নতা-সচেতন বলেই তারা ভয়ে ভয়ে বাঁধা নিয়মে ও নীতিতে নিষ্ঠ থেকে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিঘ্ন ও নির্দ্বন্দ্ব হতে প্রয়াসী। তাদের বিশ্বাসের ধর্ম তাদেরকে যান্ত্রিক-জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। এতে তাদের মানসক্ষেত্র বন্ধ্যা থাকে বলে চিত্ত-সম্পদ অর্জনের পথ রুদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু সংস্কারলব্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতির আনুগত্যে তাদের পতন-পথও থাকে বন্ধ। সুতরাং তাদের আত্মিক উৎকর্ষ-উন্নয়ন যেমন নেই, তেমনি অবনতিও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব, চরিত্র গঠনের জন্যে শাস্ত্র-শিক্ষার যৌক্তিকতা সামান্য। আর রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, মৃৎবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ভূগোল, বাণিজ্য, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতিতে ধর্মীয় শিক্ষানীতির সম্পর্ক ও সংলগ্নতা আবিষ্কার অসম্ভব। এসব জ্ঞানজ বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বাসভিত্তিক শাস্ত্রনীতির কী সম্পর্ক রয়েছে যে শিক্ষানীতিও শাস্ত্রীয় হবে?

শাসনতন্ত্র ইসলামী করার সার্থকতাও দুর্লক্ষ্য। আমরা জানি, মুসলমান বা যে- কোনো ধর্মাবলম্বীর শাস্ত্রীয় জীবন ও আচার সব সময়েই শাস্ত্রীয় আইনে নিয়ন্ত্রত হয়। এর জন্যে হিন্দু বা মুসলিম আইন রয়েছে। এর বাইরে বৈষয়িক জীবনে শাস্ত্র শাসন অনভিপ্রেত নয় কেবল, অকেজোও বটে। বাণিজ্য, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, উন্নয়ন, সেচ, কৃষি প্রভৃতি সরকারি দায়িত্বে ও কর্তব্যে শাস্ত্রীয় কী কাজ আছে যে শাসনতন্ত্র শাস্ত্রীয় হওয়া দরকার?

অতএব পাকিস্তানীদের সবক ও সরব ইসলাম প্রীতির অন্তরালে তিনটে কারণ অনুমান করা সম্ভব।

এক. অজ্ঞ জনসাধারণ যেহেতু চিত্তলোকে মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা লালন করে; সেজন্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য, গৌরব-গর্ব, জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা আজো স্বধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা স্বধর্মের মাহাত্ম্যে এবং স্বজাতির কৃতিত্বে ও সংখ্যাধিক্যে গৌরব-গর্বের আনন্দ ও কৃতার্থমন্যতা লাভ করতে চায়। তাই তারা ইসলামী ও মুসলিম শাসনেই তুষ্ট। লাভ-ক্ষতির কথা তাদের মনে জাগে না।

দুই. মোহাজেরমাত্রেই নিরাপত্তার অবচেতন প্রেরণায় ইসলাম, ইসলামী শাসন ও ইসলামী জাতীয়তা-প্রবণ। কেননা বিদেশে বিভাষীর মধ্যে বসবাসের পক্ষে এটাই তাদের একমাত্র Locus Standi—স্বাধর্ম্যের অধিকারেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের স্থিতি। এই ইসলাম ও মুসলিম প্রীতির পশ্চাতে অবশ্য বিধর্মীর নিষ্ঠুর পীড়নে ধন-জন-বাস্তু হারানোর ক্ষোভ আর বেদনাও সক্রিয়। আমাদের পরিচিত মোহাজেরদের প্রায় সবাই ইসলামী তথা মুসলিম জাতীয়তায় ও ইসলামী শাসনতন্ত্রে আস্থাবান।

তিন. অভিন্ন জাতীয়তার নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের, গোত্রের, ভাষার, সংস্কৃতির ও জীবিকা-পদ্ধতির মানুষকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করে শাসন ও শোষণ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও Locus standi হচ্ছে ইসলাম। কাজেই সে সুপরিকল্পিত সামাজিক নীতি অনুসৃতির ফলে বাঙালিকে তারা ভাষা বদলাও, হরফ বদলাও, বানান বদলাও, শব্দ বদলাও, পোশাক বদলাও, আচার বদলাও, দেশ ও দেশবাসীর নাম বদলাও বলে বুলে উদ্ব্যস্ত করেছিল ; সেই নীতিরই আর এক চাল হচ্ছে ইসলামের জিকর, তথাকথিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও ইসলাম-ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তার অপরিহার্যতা বয়ান। শুনে শুনে শুধু গণ-মানব নয়, শিক্ষিতলোকও বিচলিত, বিব্রত ও বিগলিত। এতে বাঙালির দ্বিবিধ ক্ষতি ঃ এক, এই ইসলামী বেরাদরীর মোহবশে সে কখনো স্বস্থ ও স্বতন্ত্র হতে পারবে না। দুই. অমুসলিম-অধ্যুষিত এই পাক-ভূমে ইসলাম জোশ বিধর্মী-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখবে।

আর নাগরিকত্বের সহজ অধিকারে বঞ্চিত বিধর্মীরাও স্বভূমে প্রবাসী হয়ে বাস করার লাঞ্ছনা ও গ্লানি এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তাদের মানস-বিরূপতা এ অঞ্চলের শান্তি, শক্তি ও প্রগতি বিঘ্নিত ও বিপন্ন রাখবে। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামী চেতনা, ইসলামী শাসনতন্ত্র, এবং ইসলামী জাতীয়তা প্রভৃতির মতো বাঙালির সংহতি বিনষ্টির এবং ভেদনীতি প্রয়োগের এমন মোক্ষম উপায় সম্প্রতি আর একটিও জানা নেই।

এ ছাড়াও অমুসলিমকে জিম্মিরূপে আলাদা করে রাখলে ভারতে তাদের জ্ঞাতি হত্যার প্রতিশোধ নেয়া যাবে, আবার বাঙলা থেকে হিন্দু উচ্ছেদ হলে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হবে—এ দ্বিমুখী লাভের চিন্তাও যে তাদের প্রশ্রয় পায় না, তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। তার উপর, বাঙালি মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যে পরিমাণে তাজা ও প্রবল থাকবে, মুসলিম বেরাদরীভাবও সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপাতে ঠাঁই করে নেবে বাঙালি চিত্তে এমন একটা আশাও হয়তো উঁকি মারে মনের কোণে। এমনি করে নানা ছল-চাতুরীর মায়াজালে জড়িয়ে,নানা ছন্দবাঁধনে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বাঙালি সত্তার ইতি সাধনে তৎপর রয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীরা।

শাসন-শোষণের এমন যাদু-যন্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। তাই এই বিভ্রান্তি ও অভিভূতি আজ তাদের পেয়ে বসেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ মনীষী ইবন্ খলদুনের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করলে আজকের দিনেও আমরা হয়তো উপকৃত হব। ইবন্ খলদুন বলেছেন—ধর্মশাস্ত্রকে মানুষ নিজের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে টুকরো টুকরো করে কাজে লাগায়—তাতে ধর্মও মাহাত্ম্য হারায়, কাজও নষ্ট হয়। [১]

এ-ও স্মর্তব্য যে আজ বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, তাই দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটো বিচ্ছিন্ন দেশ নিয়ে পাকিস্তানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহঅবস্থানের ভিত্তিতে অকৃত্রিম ও অকপট প্রীতির পরশে পরকে ভাই করার সাধনা না করলে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

AMARBOI.COM

১ "আমরা ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আমাদের বৈষয়িক ব্যাপারকে জোড়াতালি দিয়ে থাকি। তার ফলে আমাদের ধর্মও টেকে না এবং যে বৈষয়িক ব্যাপার আমরা জোড়াতালি দিচ্ছি, তাও টেকে না।"
—ইতিহাসের দর্শন : ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার সম্পাদিত, পৃ. ৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্য-সঙ্কট : বিশ্বসমস্যা

মানুষের জীবন নির্দ্বন্দ্ব কিংবা নির্বিঘ্ন হবে এমন আশা কেউ করে না। কেননা নিজের জীবনের উপর সর্বাত্মক অধিকার মানুষের নেই। প্রকৃতির দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু ছাড়াও সীমিত শক্তিতে মানুষ প্রাকৃতিক রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা প্রভৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে সব সময় পেরে উঠে না। তাছাড়া জীবিকার জন্যে সম্পদ প্রয়োজন এবং সম্পদ অর্জনে ও রক্ষণে রয়েছে নানা সমস্যা। আর সমস্যা মাত্রেই কমবেশি যন্ত্রণা। কাজেই নির্বিঘ্ন আনন্দও বাস্তবাতীত।

অতএব জীবনে কেবল সম্পদ ও আনন্দই কাম্য হলেও সমস্যা ও যন্ত্রণাকে এড়িয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। অভাবিত নয় বলে এর জন্যে মানুষমাত্রেরই মানস-প্রস্তুতি থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রেও মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় ও সহজে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। তাই ক্রমে এই প্রাকৃত শক্তিকেও সে জয় করেছে, বশ করেছে এবং দাসও করেছে। এক্ষেত্রে তার সাফল্য গর্বের ও গৌরবের, বিস্ময়কর ও মহিমময়।

কিন্তু আজ অবধি মানুষ যা করতে পারেনি, তা হচ্ছে তার প্রবৃত্তি-বশ্যতা থেকে বিবেকের মুক্তিসাধন। তাই অধিকাংশ মানুষ আজো জৈব প্রয়োজনের অনুগত জীবই রয়ে গেছে, প্রাণ-ধর্মের বশ্যতায় প্রাণী হয়েই আছে, বিবেক-চালিত বুদ্ধির আনুগত্যে মানুষ হয়ে উঠেনি। মানুষের বারো-আনা দুঃখের উৎস এখানেই। মনুষ্য জীবনের যন্ত্রণার ও Tragedyর কারণ এ-ই। প্রকৃতির কোলে লালিত পিঁপড়ে থেকে হাতি অবধি কোনো প্রাণীকেই সম্ভবত খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাতে হয় না। কেবল সমাজ-লালিত মানুষকেই হয়তো আদমের আমল থেকেই অনাহারে মরতে হয়েছে। অজন্মার ফলে যে খাদ্যাভাব তাতে হয়তো খুব কম মানুষই প্রাণ হারিয়েছে। চিরকাল প্রবল দুরাত্মার হাতে বঞ্চিত বুভুক্ষু মানুষই মরেছে লাখে লাখে। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ও মৃত্যুর নিশ্চয়তাই তাদের হয়েছে ললাটলিপি।

সব মানুষের বুদ্ধি থাকে না, বিদ্যে হয় না, দৈহিক সামর্থ্য থাকে না, মানসিক যোগ্যতা থাকে না, চরিত্রও গড়ে উঠে না। তাই বলে তাকে বাঁচার অধিকার থেকে—প্রাণের দাবি থেকে বঞ্চিত করবার বা রাখবার কারণ হতে পারে না এসব। মানুষকে জীব হিসেবে— প্রাণী হিসেবেই বাঁচতে দেওয়া মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের শর্তে সমাজ গড়েছে মানুষ। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রবল মানুষ চিরকাল দুর্বল মানুষকে শোষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হত্যা করেছে। এই সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় মানুষ গোষ্ঠী-চেতনা, গোত্রীয় ঐক্য, দৈশিক সংহতি, জাতীয়-মৈত্রী ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য প্রভৃতির বোধ-বুদ্ধি জাগানোর সাধনা করেছে চিরকাল।

কিন্তু লক্ষ্য মহৎ হলেও উপায় শুভকর ছিল না। তাই জীবন-প্রতিবেশ সরল ও সুন্দর করতে গিয়ে বার বার জটিল ও বীভৎস করেছে। এজন্যে মানুষের ইতিহাস মুখ্যত প্রবলের পীড়ন-শোষণ ও হননের ইতিকথা—শোণিত-শোষণ ও রক্তপাতের করুণ কান্না। আজো এই ভুল পথের মরীচিকাই তাদের টানছে। স্বাধর্ম্য, স্বাজাত্য ও স্বারাষ্ট্র্য চেতনা ও মমতা নিয়ে আজো মানুষ জীবন-সাধনায় ও স্বাচ্ছন্দ্য-সন্ধানে নিরত।

আজকের পৃথিবীই ধরা যাক। যেসব রাষ্ট্র শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তিতে প্রবল, সেগুলো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বর্বর উল্লাসে মত্ত। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রক্ষণে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদাব্যস্ত। মাকড়সার জালবদ্ধ পতঙ্গের মতো, অক্টোপাস কবলিত প্রাণীর মতো বিশ্বের অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো অনুপম ও অননুভূত মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকছে। যন্ত্রও যে এ যন্ত্রণার উপশমে সমর্থ নয়, তা তারা আজো উপলব্ধি করেনি। তাই যন্ত্রযোগে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারেই তারা মুক্তি খোঁজে। কিন্তু বিশ্বের সব দেশগুলো যদি শিল্পায়িত হয়, তাহলে বানিজ্য করবে কার সঙ্গে? তখন তো 'কারো পুকুরের পানি কেহ নাহি খায়' অবস্থা হবে। তখন পণ্য বিনিময়ে সমস্যা দেখা দেবেই। কেননা তখন পারস্পরিক প্রয়োজনে সঙ্গতি থাকবে না। শিল্পায়িত য়ুরোপ আজ সে মহাসমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে হয়েছে উদ্যোগী—এরই নাম য়ুরোপীয়ান কমনমার্কেট।

কিন্তু এভাবে কয়দিন চলবে! জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এমনি জনসংখ্যার চাপে ষোলো শতকে য়ুরোপীয়রা রাক্ষসের ক্ষুধা, দস্যুর প্রবৃত্তি ও অক্টোপাসের কৌশল নিয়ে ছুটে বেরিয়েছিল বাঁচবার তাগিদে, আরো আগে যেমনটি করত মধ্য-এশিয়ার শক-হুন-ইউচিরা, তাতার-মোঙ্গলেরা। তখন তাদের ভাগ্য ভালোই ছিল। এশিয়া-য়ুরোপ তখনো ছিল বসতিবিরল। তাই মধ্য-এশিয়ার জনগোষ্ঠী ঠাঁই করে নিতে পেরেছিল সহজেই। ষোলো-শতকের য়ুরোপীয়দের ভাগ্যও ছিল প্রসন্ন। বসতি-বিরল তিন-তিনটে মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়ে তাদের বাঁচার পথ করে দিল। বিগত পাঁচশ বছর ধরে তারা বাঁচল সম্পদে, গৌরবে ও ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে।

কিন্তু এবার সে-সুযোগ কল্পনাতীত। অবশ্য গ্রহ-লোকে যদি কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই। এশিয়া-য়ুরোপে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণে তার সমাধান নেই। সমাধান নেই কেবল কম্যুনিজমেও। কেননা জনসংখ্যার সঙ্গে ক্ষেত-খামারের আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও রাষ্ট্রগুলো বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে—অস্ত্রের ও অর্থের জোরে, যান্ত্রিক যোগ্যতায় ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনায় বেঁচে থাকার সাধনা করছে; তবু এতে শেষ রক্ষা হবে না। এখনকার জীবন ও জীবিকার আদর্শ হচ্ছে : সেই পুরোনো—'জোর যার মুলুক তার' কিংবা 'যোগ্যতমের উর্ধ্বতন'-নীতি। কিন্তু এ-সব নীতি এ যুগে স্থায়ী ফলপ্রসূ হবে না। কেননা অজ্ঞতা ও নিয়তিবাদের যুগ অপগত। এ যুগের সচেতন মানুষ বাঁচার তাগিদেই নাস্তিক ও নির্ভীক, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল।

বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিরল সামন্ত-যুগে সম্পদগত যে-স্থিতিশীলতা সম্ভব ছিল, ভূমি-নির্ভর জীবনে ও জীবিকায় নিয়তির মতো যে অমোঘতা ছিল, যে অবিচলিত সংস্কারাচ্ছন্নতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা ছিল, তা আজ অবসিত। বিশ্বাস-সংস্কার আজ দেউলে—কোনো প্রবোধ, কোনো ভরসা, কোনো ভীতি, কোনো আশ্বাসই তা আজ দান করতে পারে না।

অতএব এ যুগে আনুগত্য নেই, নেই দাসত্ব। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আশঙ্কাহীন কোনো শোষণ-পীড়ন এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে শুধু মার, শুধু হনন, শুধু কাড়ার সুযোগ তিরোহিত। এ যুগে কেবল দ্বিপক্ষীয় মারামারি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি চলতে পারে ও চলে। কিন্তু এতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। কারণ দুর্বলকে যারা কাড়ে, যারা মারবার যোগ্যতা রাখে, যারা হত্যা করেই নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন হতে চায়, তারা নিজেদের মধ্যেই লুণ্ঠিত সম্পদ ও শোষিত শোণিত নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে সুন্দ-উপসুন্দের পরিণাম পায়।

একটি অনূদিত কোরিয়ো কবিতা আজ বড় ভাল লাগল, যদিও অনুবাদ ভাষার দৈন্যে সুষ্ঠু ও সুন্দর নয়, কল্পনায় মূল্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়েছি। কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি :

> "এসো আমার কাছে, বলছি এসো তাড়াতাড়ি, আগুন লেগেছে ঘরে, সোনার বাড়িতে আগুন, সবুজ পাহাড়ে আগুন, গোলাপী ফুলের বাগান জ্বলছে, আর আমাদের প্রতিবেশীরা, বন্ধু প্রতিবেশীরা কেঁদে কেঁদে প্রাণ-ভয়ে চলে যায়, ঘরগুলি খালি করে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেকড়ে বাঘেরা গর্জন করছে, মেষের দল কাঁপছে, আর নেকড়ের দল গর্জায় আর হুঙ্কার দেয় আর একে অন্যের মাংস ছিঁড়ে নেয়, রক্ত ঝরে যায়। তারা হত্যা করে আর নিহত হয়। নিশ্চয় নেকড়ের দল নিজেরা ঝগড়া করে ধ্বংস হয়ে যাবে।
রক্তাক্ত এ রাত্রি, কিন্তু আকাশে জ্বলছে তারা। তারাদল রয়ে যাবে, আর এখানা উঠছে। তাই বলি, এসো তাড়াতাড়ি.—দুজনে যাব মাঠে, পোড়ামাটি আবার চষবো তুমি আর আমি; আর আমরা বুনব ফসল। পাহাড় আবার সবুজ হবে, আর সাজাব আবার গোলাপী ফুলের বাগান। . . . ইত্যাদি। [নীল আকাশের নিচে : পাক দ্যু-জিন, অনুবাদ : জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কোরিয়ার কবিতা, পৃ. ৪১]

অর্থ-গৌরবে, বাস্তব চিত্রে, আশাবাদে ও আত্মপ্রত্যয়ে এ কবিতা ঋদ্ধ। কিন্তু এই আশা ও আত্মপ্রত্যয় খণ্ডদৃষ্টি প্রসূত। কেননা আজ মানবিক সমস্যার সমাধান দেশগত বা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। নেকড়েরা আত্মকলহেই মরবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আহতরাও আর কখনো দগ্ধ মাটিতে ফসল ফলিয়ে প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না। এককভাবে য়ুরেশিয়ার কোনো রাষ্ট্রই আর স্বনির্ভরতায় বাঁচতে পারবে না। কেননা এখানে খাদ্যাভাব অনিবার্য। Common market বা কম্যুনিজম আজো সাময়িক সমাধান দিতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বের মানুষকে জীবনের অপরিহার্য অভাব মিটিয়ে শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হলে যৌথ প্রচেষ্টায় অন্য উপায় বের করতেই হবে। মানববাদকে মুখ্য করে সংহত ও সংযত জীবনে দীক্ষা নিতে হবে। Equitable-distribution of population & Food—পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার ও খাদ্যবস্তুর সমবন্টনেই আপাতত এ সমস্যার দৃষ্টিগ্রাহ্য সমাধান নিহিত। গোত্র-বর্ণ-জাত-ধর্ম চেতনার উর্ধ্বে উঠে এশিয়া-য়ুরোপের বাড়তি মানুষকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ঠাঁই করে দিতে হবে। সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষ অতিক্রম করে কেবল মানববাদকে আদর্শ করে এগিয়ে আসতে হবে সমাধানের সন্ধানে। তা হলেই কেবল মানুষকে অপঘাত, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করা যাবে।

অবশ্য বর্তমানে এ সমাধান মানব-প্রবৃত্তি বিরোধী ও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই একমাত্র উপায়, যা করলে মানুষ আরো কয়েক শতাব্দী নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। নইলে বাঁচবার প্রেরণায় মানুষ পরাক্রান্ত হয়ে বন্যার বেগে দিগ্বিদিকে ছুটে বের হবে আর হানাহানি করে যাদবকুলের মতো, শাক্যগোত্রের মতো ধ্বংস হবে।

আত্মঘাতী এ সংগ্রামে আত্মনাশ অনিবার্য। আত্মসংহারে এ আত্মবিনাশ আসলে বাঁচার সংগ্রামের ছদ্মবেশে। আজ তার লক্ষণ সর্বত্র দৃশ্যমান। বাঁচবার জন্যেই মারবার ও মরবার এ প্রবৃত্তি জৈবিক-পাশবিক বটে, কিন্তু অমানবিক। কেবল জীবের মতোই যদি আচরণ করবে, তা হলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সাধনার, প্রেম-প্রীতি-ন্যায়-নীতি অনুশীলনের কী প্রয়োজন ছিল! আজই বা এত ভাব-ভাবনার ও এত মহৎ বুলি কপচানোর সার্থকতা কী!

২

জন্মনিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে দেশগত সমাধান প্রয়াস। কিন্তু এভাবে সমস্যা এড়ানোর প্রত্যাশা আপাতত বিজ্ঞতার পরিচায়ক হলেও জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠোর আইন প্রয়োগ সাপেক্ষ। এবং এ আইন যে নীরবে সবাই মেনে নেবে, তাও মনে করার কারণ নেই। এক্ষেত্রেও বিদ্রোহ সম্ভব। আকাঙ্ক্ষার কথা বাদ দিলেও এর সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক প্রশ্ন জড়িত। সেদিন এক বন্ধু বলছিলেন : জন্ম নিয়ন্ত্রণে আস্তিক মানুষের স্রষ্টা-দ্রোহিতাই প্রকাশ পায়। কেননা, স্রষ্টাকে পালনকর্তা হিসেবে সে কার্যত অস্বীকার করে। তাঁর মঙ্গলময়ত্বে সে আস্থা হারায়। তার চোখে তিনি 'রাজ্জাক' নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া এর মধ্যে একটা হীন আত্মসর্বস্বতা আছে। নিজের সুবিধের জন্যে অন্যের অস্তিত্ব প্রাপ্তির স্বাভাবিক অধিকার হরণ করা অমানবিক। আমরা ভাবছি, নিয়ন্ত্রণাভাবে অসংখ্য উদর-সর্বস্ব প্রাণী আমাদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাবে। তাতে আমরাও মরব, তারাও বাঁচতে পরবে না। কিন্তু এ সঙ্গে আমরা ভাবীকালের সক্রেটিস-এ্যারিস্টটল-প্লেটো, ফ্রয়েড-ডারুইন-আইনস্টাইন; কান্ট-হেগেল-নীৎসে, মার্কস-লেনিন-মাওকেও তো হারাচ্ছি। যারা হয়তো এ সমস্যার অভাবিত সমাধান দিতে পারত!

এ ধারণার বিরুদ্ধে অবশ্য দুটো প্রবল যুক্তি রয়েছে।

এক. মানুষ মুখে যা-ই বলুক, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সে কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকেনি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে সবসময় বিধাতার দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। সবকিছু অমোঘ জেনেও সে অনমনীয় রয়েছে—আত্মসমর্পণের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হারায়নি; এদিক দিয়ে সে চিরকাল প্রতিবাদী ও প্রতিরোধ প্রয়াসী—এভাবেই সে নিজের জন্যে কৃত্রিম জীবন ও জীবন প্রতিবেশ রচনা করেছে। এরই নাম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়াসে নতুন কোনো বিদ্রোহ নেই।

দুই. জীবনের অন্য অনেক প্রাণীর মতো মানুষও আত্মরক্ষার ও আত্মবিস্তারের গরজে চিরকাল জিঘাংসু। অন্য প্রাণীকে তো নয়ই, স্বজাতি মানুষকেও সে কখনো কৃপা করেনি। কাজেই সহচর মানুষকে যে হত্যা করতে পারে, অভব-অদৃশ্য সম্ভাব্য মানুষের সৃষ্টি-রোধ করার মধ্যে তার কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। হীন-স্বার্থপরতা যা রয়েছে তাও তুলনায় অতি তুচ্ছ। আর মহৎ মানুষ প্রাপ্তির আশায় সৃষ্টির দ্বার অবারিত রাখা জুয়াকে জীবিকা করার মতোই বিড়ম্বনাকে বরণ করা মাত্র।

অবশ্য এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় : জাত হিসেবে মানুষ কী আরো মহৎ হতে পারে না? তবে Destructive-এর চেয়ে Preventive measure—ধ্বংসাত্মক উপায়ের চেয়ে বারণাত্মক বা নিরোধাত্মক পদ্ধতিই কাম্য।

আপাতত, জন্মনিয়ন্ত্রণে, সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে জীয়নকাঠির সন্ধান চলবে বটে, কিন্তু এই দেশগত বা রাষ্ট্রগত খণ্ড প্রয়াসে স্থায়ী সমাধান নেই। একক বিশ্বে সহযোগিতা, সহঅবস্থান ও বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও খাদকের সমবন্টনের মধ্যেই স্থায়ী কল্যাণ ও ভাবী মানব-ভাগ্য নিহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার ধর্ম

সাংখ্য ও যোগ —এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা একরকম সুনিশ্চিত।

না বললেও চলে যে বাঙালি গোত্র-সঙ্কর বা বর্ণ-সঙ্কর জাতি। বাঙালির মধ্যে অস্ট্রিক প্রাধান্য থাকলেও ভোট-চীনার রক্তমিশ্রণ যে বহুল পরিমাণে ঘটেছে, তা নৃতাত্ত্বিক বিচারেই যে প্রমাণিত তা নয়, তাদের নানা আচার-আচরণেও দৃশ্যমান। বলতে কী বাঙালির দেহে আর্যরক্ত বরং দুর্লক্ষ্য। আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাবেই আভিজাত্যকামী বাঙালি আর্যনামে পরিচিত।

বাঙালির শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানস প্রসূত। তেমনি অনাদি-আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজো- দাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোনো সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হুন-ইউচি-তুর্কী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশি দিন রক্ষা করতে পারেনি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগ-পদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত: এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া, দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান এবং কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মনন-প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন এবং একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র —তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্য শাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব—কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদিরূপও —তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের (সূর্য) দেবতার স্মারকগুণও বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত দেবাধিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগ-পন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথপন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সংপৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথ পন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথ-পন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও এ যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউএন সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবন-বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে(শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির প্রভাব ও উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যেরই স্মারক।

"মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম, ঝুলি, ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া।" (গোরক্ষ বিজয়)

এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের।

দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের অন্ধি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ-অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ি, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্য পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন! এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ইঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুশ্চক্র বা ষটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকনল, কুলকুণ্ডলিনী, উলটা সাধনা প্রভৃতি নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এই সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ-সূর্য বা অগ্নি, ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ—শুক্র ও রজ:-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগজ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধ কা জোগ—গোরখবাণী : ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, পৃ. ১৬]।

অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালি তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করেনি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা দেশেই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণ কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে-জালন ধারায়-সমন্দরে?), কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল।

পূরবদেশ পছাঁহী ঘাটি
[জন্ম] লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা নাঁবগর কহী এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেটৈ ভরম বিরোগঁ —[গোরখবাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত
বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।]

—পূর্বদেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী, গুরু [আমার]ভব-সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।

শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের 'গোর্খা' নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলা দেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল গীতি, যোগীর গান ও যুগী কাচ আজো বাঙলা দেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত।

এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি ও চাঁড়ালই ছিলেন।

ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রণা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি গোটা কাঢ়ি লীয়া পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়াঁ খুলি দীবী মেলী।
—[গোরখবাণী, পিতাম্বর সম্পাদিত, পৃ. ১১৭]

এতেও এঁদের বাঙালিত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণঅবধি সবকিছুর সন্ধান করেছেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র, শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃতরসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজ: ও শুক্র সৃষ্টি-শক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী-শক্তি অক্ষত থেকে আয়ুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসের পথও হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের—

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

বিন্দুর উর্ধ্বায়নের ফলে ললাট-দেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এরই নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া ও আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মর রজ: ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজ: ও শুক্র রূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজ:রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহধারে আবদ্ধ রাখে।

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। এখানেই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউলগীতি, ধর্মমঙ্গল,শূন্যপুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষবিজয়, অনিলপুরাণ, যোগীর গান, যুগীকাচ, হাড়মালা, জ্ঞানপ্রদীপ, যোগকলন্দর, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্যপরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক , দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষও বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি। পাক-ভারতের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধশাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী—উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল-রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র-শাসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীন কালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত বাঙালি ভারতবর্ষকে দান করেছে।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালি। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ'—অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত [সৈয়দ সুলতান]। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীদ্ধি রূপকাত্মক। তিনি বলেন, 'চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মতো চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যামাত্র।' [ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খাবিজয়'-এর ভূমিকাস্বরূপ নাথ পন্থের 'সাহিত্যিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১—খ(৬)।]

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এইজন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালির এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালির জীবনে এবং মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে উজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ-বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্যবিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীর-কেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর—যাদের দু-চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতিনীতিতে আদিম Animism, Magic-belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিখতের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিকভাবেই সত্য। তিনি বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech ...... the ideas of 'Karma' and transmigration, the practice of 'Yoga', the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hundu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of some of our

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the coconut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our Pre-Aryan ancestors.'

[Indo-Aryan and Hindi PP. 31-32]

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচার বর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচারবর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষমতবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জ্বালন্ধরী পাদ অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিক যোগী। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠে। আর পা-পন্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমত ভিত্তিক তথা আদি সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য-প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য-মনন প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এজন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও অপান বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :

"মনথির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।"

[অক্ষয় কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ১১৮]

বাঙালি মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু-চারটা আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ, খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতি বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া-সাধনাকে ইসলামী রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের 'বালকানামা'য় পাই :

দিল্‌সে বৈঠে রাম-রহিম দিল্‌সে মালিক-সাঁই
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
ঘরে বৈঠে চৌদ্দ ভূবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা। .....

[প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮]

অতএব, বাঙলার ও বাঙালির আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন—পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলা দেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে উঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য এবং ক্ষেত্রপ্রাধান্যও—তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তাছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তথা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে [লাঙ্গলের ফাল] গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে [যাতে হল পড়েনি] প্রাণ দান প্রভৃতি রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়াও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছাসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কী বাধা আসে। কার্য-কারণ জ্ঞানের অভাবে এ প্রাতিকূল্য কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি ও মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারেনি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়—ধ্বংস হয় না। সে বীজও বিচিত্র—কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব।

আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জ্বরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপেক্ষার।

---

১ শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে 'ধর্ম' বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষপুরাণ সব রচনায় সুলভ।

ইউসুফ জোলেখায় :

ক. মনে মনে ধর্ম আরাধন।
খ. বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।
গ. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
ঘ. ধর্মপথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর।
ঙ. জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
চ. ধর্মপদ স্মরি সত্বরে গমন।
ছ. ধর্মের প্রসাদে আজি পুরিলেক আশ।
জ. ধর্ম-আজ্ঞা তোমার পূরিব মনস্কাম। ইত্যাদি অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের নিয়ামক। এরই আধুনিক নাম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোনো কোনটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত প্রতিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতারূপে পরিকীর্তিত। যে-কোনো সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি।

অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জনমানবের জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন। গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণ-সংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালির পরিচয় ও আধুনিক বাঙালির ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালির ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরিবঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখ-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্যজীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল তত্ত্ব

মৈথুনতত্ত্ব ও টোটেম-বিশ্বাস অতি প্রাচীন। দুনিয়ার তাবৎ জাতির আদিম বিশ্বাস ও জীবনচর্যার সঙ্গে এ দুটো জড়িত। টোটেম-বিশ্বাসের একটি পরিচায়ক হচ্ছে পশু-পাখির নামানুসারে গোত্র ও ব্যক্তির নাম গ্রহণ। এটি আমরা প্রাচীন ভারতে যেমন দেখি, তেমনি অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যেও পাই।[১] মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে প্রধানত কৃষিজীবী সমাজেই—বিদ্বানদের মত এই। তার কারণ মৈথুন ও প্রজনন প্রাচীনকালের চেতনা অনুসারে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল।[২] এবং ধন উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতর ধারণা থেকেই মৈথুনতত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়। এই জন্যে মৈথুন-ক্রিয়া ও উৎসবের সঙ্গে ফসলের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। জাভা, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি আদিবসী অঞ্চলে এবং ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতির মধ্যে আজো মৈথুন উৎসব বিদ্যমান।[৩] এ হচ্ছে ফসল প্রাপ্তির বাঞ্ছায় সিদ্ধির আবহ সৃষ্টির প্রয়াস। আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আজো অনাবৃষ্টির সময়ে ছেলেমেয়েরা কুলো নিয়ে ঘরে ঘরে পানি মাগে। তখন যেসব ছড়া আওড়ায় তাতে আছে 'কলাতলে এক গলা পানি, বৌ নাইয়রের নৌকা আনি' ইত্যাদি। এতে বোঝা যায়, প্রবল বারিপাত জাত পরিবেশটা এরা কল্পনা করে, এবং তা-ই উচ্চারিত হয় বৃষ্টির আগমনী গানে। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুনের এমনি প্রতীকী আবহ সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। R. Briffault তাই বলেন :

> The assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing women is universal ..... the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.[৪]

James Frazer-ও বলেন :

> In the opinion of those who performed them (ceremonies) the marriage of trees and plants could not be fertile without the real union of the human sexes .... ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still of were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of similar practice.[৫]

G. Thomson-ও বলেন :

> The desired reality is described as though already present.[৬]

এ বিশ্বাসের আরো একটি দিক রয়েছে। 'পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে আজো এ বিশ্বাস টিকে আছে যে, নারীদেহ থেকেই আদি শস্যের উদগম হয়েছে'।[৭] আমাদের দেশেও এ বিশ্বাস চালু ছিল তার প্রমাণ রয়েছে মার্কেণ্ডেয় পুরাণে, আর আভাস আছে অনেক ক্ষেত্রে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন :

ততোহহম খিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈ:।
ভবিষ্যামি সুরা: শাকৈরাবৃষ্টৈ: প্রাণধারকৈ: ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদাযাস্যাম্যহং ভূবি ॥[৮]

[অনন্তর আমি নিজদেহ উদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে যত দিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন জগৎ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালন করব। এইজন্য আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব | এই শাকম্ভরীই দুর্গা। দুর্গোৎসব হয় শরৎকালে। এতে সেই শস্যদেবীর পূজা উৎসবের আভাস মেলে। 'দুর্গাপূজার ভিতরেই দেখিতে পাই ..... একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে যে শস্যবধূ নির্মাণ করা হয়, ... এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়।' শাকম্ভরী বলেই দুর্গা অন্নদা-অন্নপূর্ণা রূপেও পরিচিতা।[৯] হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি সীলে দেখা যায় একটি নগ্ন নারীমূর্তির দুটো পা দুপাশে ছড়ানো আর তার যোনি থেকে একটি লতা বেরিয়ে এসেছে। এ নারী যে শস্যদেবী এবং ফসল যে এদেবীর 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈ : ' তাতে সন্দেহ নেই।[১০] এদেশের 'উমা' ও প্রাচীন আনার্যদেবী ; কেবল তাই নয়, এর বহির্ভারতিক অস্তিত্বও দেখা যায় :

> The babylonian word for mother is Ummu or Umma, the Accadian Ummi and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other and with Uma the mother goddess.[১১]

কৃষির শুরু নারীদের হাতেই। প্রসবিনী নারীরা হয়তো নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ফসলি উৎপাদনী ভূমির প্রজননক্রিয়া কল্পনা করেছে। তা থেকেই মৈথুন-প্রজননে এবং প্রসব-উৎপাদনেও অভিন্ন পদ্ধতি কল্পিত হয়েছে। R. Briffault বলেন :

> The art of cultivation has developed exclusively in the hands of women.[১২]

G. Thomson বলেন :

> Food-gathering led to the cultivation of seed in plots adjacent to the settlement and so garden tillage is women's work.[১৩]

অন্যান্য বিদ্বানেরাও এ মত সমর্থন করেন।[১৪] পিতৃপ্রাধান্য অর্থে 'বীজ' প্রাধান্য, আর মাতৃপ্রাধান্যসূচক 'ক্ষেত্র' প্রাধান্য—শব্দদুটোর অভিধার মধ্যেও কৃষিপদ্ধতির আভাস রয়েছে। নারী-উদ্ভাবিত কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে নারীদেবীর যোগ থাকাই স্বাভাবিক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র 'বসুমাতা'র কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছিল।[১৫] পশুজীবী[১৬] আর্যেরা এদেশে এসে কৃষিজীবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি-সংক্রান্ত ও কৃষিজীবী সমাজের সংস্কারের প্রভাবে পড়েছিল বলে অনুমান করি। তাই বাজসনেয়ী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে মৈথুন, প্রজনন, জীবন ও সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে।[১৭] ছান্দোগ্যে আছে :

ক. হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হলো স্ফুলিঙ্গ ৫/৮/১।
অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়।

খ ছান্দোগ্যের বামদেব্য ব্রতকথায় আছে।
'যে একইভাবে বামদেব্য সামকে মৈথুনে প্রতিষ্ঠিত জানে; সে মৈথুনে মিলিত হয়। (তার) মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয় ; সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না—এই-ই ব্রত।' ২/১৩/২/[১৮]

এসব আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত আদিম আচার আজো নতুন তাৎপর্যে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ হয়ে আছে। আজো তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র প্রভৃতি সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। কেবল এখানেই শেষ নয়, দেবতার হাতের ডালিম হচ্ছে রক্ত তথা রজ : ঋতুর প্রতীক। রজ: আবার সিন্দূরেও প্রতীকীরূপ নিয়েছে। আর পদ্ম হচ্ছে নারীযোনির প্রতীক।[১৯]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে চেয়েছি যে আর্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজারী ছিল। পশুজীবী[২০] আর্যরা প্রকৃতি-প্রতীক দেবতা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা করেছে। আব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনার্যেরা গুণময় শক্তির পূজারী ছিল। প্রকৃতির প্রসাদ নির্ভর আদিকালের অজ্ঞ অসহায় মানুষ কল্পনাশ্রয়ী না হয়েই পারেনি। অসহায় অসমর্থের অপ্রাপ্তি-অসাফল্যের ভয় থেকেই বিশ্বাস উৎসারিত। আজো দুর্বলচিত্তে তুক-তাক ও শুভাশুভ প্রতীকের প্রভাব অপরিমেয়। নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পেলে যে-কোনো মানুষ তার প্রয়াসে ও বাঞ্ছায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে ওঠে। বাহ্য নিদর্শন ঘিরে এই যে সিদ্ধির বা অসিদ্ধির কল্পনার প্রশ্রয় তা আজো কম নয়। তুক-তাক, দারু-টোনা এবং শুভাশুভ প্রতীক, তিথি, নক্ষত্র ও দিনক্ষণের উপর কর্মের ফলাফল নির্ভরতায় বিশ্বাস আজো অধিকাংশ লোকের মনে দৃঢ়মূল। অক্ষম মানুষকে বাঞ্ছা সিদ্ধির কামনার তীব্রতাই যাদু বিশ্বাসের প্রবর্তনা দেয়। মনের এমনি অবস্থায় সিদ্ধির অনুকূল কাল্পনিক ও আচারিক আবহ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার মানুষের আদিম জীবন-জীবিকা সংস্থায় স্বাভাবিকভাবেই তাই এ মনোবল সঞ্চয়ের সহায় যাদুবিশ্বাস চালু ছিল। প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুসারে নানা বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয়ে আজকের দিনের সমাজে ও ধর্মে রূপ নিয়েছে।

কৃষিজীবী[২১] অনার্যেরা দুনিয়ার আর আর আদিম কৃষিজীবীর মতো মৈথুন তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। নারী-উদ্ভাবিত কৃষি-পদ্ধতিতে ভূমির ফসল উৎপাদন নারীর সন্তানধারণের অনুরূপ বলে কল্পিত হয়েছে। এ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকেই জগৎ-সৃষ্টিতেও তারা প্রকৃতি ও পুরুষের—নর ও নারী স্বরূপার মৈথুনতত্ত্বে আস্থা রেখেছে। মনোবল সঞ্চয় ও বাঞ্ছাসিদ্ধির সহায়ক আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে তারা 'মৈথুন'কে বীজ বোনার শুভযোগ সৃষ্টির প্রারম্ভানুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে। পরে সমাজ ব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং আদিম সংস্কারও নানা তাত্ত্বিক চিন্তাযোগে কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। কালিক ব্যবধানে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন ও জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। বসুমতী বা শস্যদেবীরূপে যেই মানস-প্রসূতার প্রথম আবির্ভাব, তিনি আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকেই পরম-পুরুষের উৎপত্তি। শক্তিস্বরূপা নারীর সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান তাত্ত্বিক কল্পনায় একসময় অদ্বয়, অভিন্ন বা অদ্বৈত সত্তারূপেও কল্পিত হয়, আবার দ্বৈতরূপেও তার প্রকাশ-সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয়নি। ফলে মায়া-ব্রহ্ম, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি আদ্যশক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। এখানেও সৃষ্টি-সম্ভব মৈথুনতত্ত্ব স্বীকৃত। মৈথুন মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এই নারী-পুরুষ তত্ত্ব-ভাবনায় তথা মিলন-তত্ত্ব কল্পনায় প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কালে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং নতুন তাৎপর্য পেয়ে অধ্যাত্ম-মাধুর্যে মহৎ এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। এর বিচিত্র প্রকাশ আমরা সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্যে-লিঙ্গায়েতে দেখছি। তবু এর আদিরূপের রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, নিলগিরি, ছোটনাগপুর, এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে। মৈথুন যেমন আদিতে ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তারও পরিচয় রয়েছে।[২২] J. Frazer বলেছেন :

> Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals; or he may imagine that the vigour that he refuses to extend in reproducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegetable or animal, will somehow benefit in propagating their species. Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.[২৩]

কাজেই বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন হতে বাধা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য-মানস উদ্ভূত আদিম মত ও আচার—আজকাল এ- কথা আর অস্বীকৃত হয় না। বাঙলা দেশ মূলত-আর্য অধ্যুষিত দেশ নয়, এদেশে আর্য-অনুপ্রবেশ বেশি হয়নি। গুপ্ত ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয়, আর পাল শাসনে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়। কাজেই এদেশে অবিমিশ্র আর্য প্রভাব কোনদিন পড়েনি। বেলভেলকার ও রানাডে বলেন, 'যোগ আদিতে অবৈদিক সাধন- পদ্ধতি ছিল।' এবং এর সঙ্গে আদি যাদুবিশ্বাসের সম্পর্কও তাঁরা অস্বীকার করেননি। বলেছেন, Sympathetic magic-এর ধারণাও এর মূলে রয়েছে।[১] A.E. Gough ও বলেন—স্থানীয় অনার্য আদিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগ সাধন-পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল।[২] H.H. Zimmer বলেন, সাংখ্যের তত্ত্বগুলি বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। দুইটি ধ্যান-ধারণা স্বতন্ত্র। সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সাংখ্য ও যোগের মূল ধারণাগুলি অত্যন্ত প্রাচীন ও বেদপূর্বযুগের।[৩] পাঁচকড়ি বানার্জী বলেন, 'তন্ত্র অতি প্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।[৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরান, উহা মানুষের করা এবং পূর্বদেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মতো নহে ; বঙ্গ, বগধ ও চের জাতির কোনো আদি বিদ্বানের মতো। বৌদ্ধমত সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন"।[৫] বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম ও উদ্রক—দুজনই সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তও তন্ত্রকে আদিম অনার্য গুপ্তশাস্ত্র বলেছেন।[৬]

এসব মতের ধারকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে লোকায়তিক বলে পরিচিত ছিল; যদিও বেদাদি সব শাস্ত্রগ্রন্থেই আমরা এসব মতের প্রভাব লক্ষ্য করি। তার কারণও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এও স্মর্তব্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের আচার-সংস্কারের প্রতি সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেও উদাসীন বা শ্রদ্ধাহীন থাকা আর্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তন্ত্র সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin, it seems to be a religious under-current, originally independent of any obstruse metaphysical speculation flowing on from an obscure point of time in the religious history of Inida, with these practices and yogic processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological systems got closely associated in different times .... these esoteric practices (yogic) when associated with the theological speculations of the saivas and saktas, have given rise to Saiva and Sakta Tantrism, when associated with the Buddhistic speculations have given rise to the composite religious system of Buddhist Tantrism, and again, when associated with the speculations of Bengal Vainavism the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite Cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.[৭]

তিনি আরো বলেন, 'বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমি ভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাঙলাদেশ—হিমালয় পর্বত সংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয় সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কী তন্ত্র বর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন ? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ট চীন ও মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবদন্তিও আমাদের অনুমানের পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্গকামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনা স্থান—নেপাল-ভুটান-তিব্বত-অঞ্চলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ। .... তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষটচক্রের .... অধিষ্টাত্রী দেবী হইলেন ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। .... এই ডাকিনী দেবী কোনো নিগূঢ় জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। ... ভুটানে লাকিনী ও হাকিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।'[৮] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস এবং জাদু অনুষ্ঠান।' তাঁর মতে 'তন্ত্র' শব্দটিও সন্তান উৎপাদন সম্পর্কীয়।[৯]

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহাত্মবাদী ও নাস্তিক মত। যোগে ও তন্ত্রে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে 'ঈশ্বর' স্বীকৃত হলেও, এসব সাধনায় ঈশ্বরোপাসনার স্থান অপ্রধান। দেহতত্ত্বই মুখ্য। এই দেহাত্মবাদী নাস্তিক মতকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গোড়ার দিকে অসুর-মত বলে আখ্যাত করেছেন।[১০] গীতায় বলা হয়েছে অসুর মতে 'অপরস্পর সম্ভূত কিমন্যং কামহৈতুকম' অর্থাৎ জগৎ নারী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত। ১৬।৮। একে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা লোকায়ত বলে অবজ্ঞা করেছেন। সাধারণত মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, শঙ্করাচার্যের (?) সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, হরিভদ্রসূরীর ষড়দর্শন সমুচ্চয়, কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রিকা নাটক, ভাগবত, বৃহদারণ্যক, গীতা, বিষ্ণু পুরাণ, মনুসংহিতা, এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির আলোকে লোকায়ত তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এসব গ্রন্থ থেকে মতবাদটির স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আসলে আদিম তান্ত্রিক, যোগী এবং সাংখ্য মতবাদীরাই লোকায়তিক। তাই শীলাঙ্ক রচিত সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য ও লোকায়তিকে বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি।[১১] তিন মতই মূলে এক এবং এমনকি গীতার আমলেও যোগ ও সাংখ্য অভিন্ন ছিল। সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব আর যোগ হচ্ছে সাধনশাস্ত্র। সাংখ্য এবং তন্ত্রের সম্পর্কও তাই। পরবর্তীকালে যোগ ও তন্ত্র দুটো ভিন্ন ধারায় যেমন চলেছে, তেমনি আবার যোগতান্ত্রিক মিশ্রধারাও সৃষ্টি করেছে। এতে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন তান্ত্রিক সম্প্রদায় যেমন পেয়েছি, তেমনি কামাচার বর্জিত বিশুদ্ধ যোগী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব দেখি। এসব মত কালে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শাখা ও উপমত রূপে গৃহীত হয়েছে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতের অন্তর্গত হয়েও এগুলো মর্যাদা পেয়েছে। তারই জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া, সহজিয়া, নাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ঘেঁষা সম্প্রদায়ে আর অবলুপ্ত রেশ রয়েছে সাঁওতাল, হো, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতির সমাজে।

AMARBOI.COM

৩

আদিতে 'হিন্দু' 'সিন্ধুবাসী' অর্থে প্রযুক্ত হলেও কালে গোটা উপমহাদেশ হিন্দুস্তান এবং জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে দেশের সব অধিবাসী হিন্দু নামে পরিচিত হতে থাকে। এভাবে আর্য-অনার্য বহু উপধর্মে ও মতে আস্থাবান এক বিপুল মনুষ্য-সমাজ 'হিন্দু'—এই সাধারণ নামে অভিহত হয়। অতএব 'হিন্দু' বললে কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতবাদীকে বুঝায় না। তারা জাতি অর্থে অভিন্ন হলেও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বহুধা বিভক্ত। অন্যান্য দেশে কোনো ধর্মমতে দীক্ষিত জনসমষ্টি ধর্মের বা ধর্মপ্রবর্তকের নামে পরিচিত হয় ; যেমন মুসলিম, খ্রীস্টান, কনফুসিয়ান, জোরাস্টীয়ান প্রভৃতি। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোনো একজনের প্রবর্তিত ধর্ম নয় বলেই 'হিন্দু' নামের এমন ব্যাপক ও দ্ব্যর্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই এই ধর্মের উন্মেষ, বিকাশ ও বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার প্রশাখাগুলোকে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিকাশও বলা চলে। আধুনিক সমাজতত্ত্বে এই বিবর্তনের গুরুত্ব অনেকখানি। তাই W.W. Hunter বলেছেন :

> "India thus forms a great Museum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture. The Specimens are not fossils or dry bones, but living communities. :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সত্যই Fragments of a Pre-historic world কিংবা remnants to our own day of the stone age মেলে।[১]

হিন্দুর উপমতগুলোর বাহ্যত এক-একজন প্রবর্তক থাকলেও আসলে বিভিন্ন মতের মিশ্রণে গড়ে-উঠা প্রবল আঞ্চলিক মতবাদের তাঁরা প্রচারক মাত্র। কেননা, এগুলো মূলত ইষ্টদেবতার প্রাধান্য এবং লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যজাত উপমতই। এগুলাকে বলা যায়—বৈদিক মতের প্রশাখা। এখানে উল্লেখ যে ঋগ্বেদেও কোনো একক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই। বিস্তৃত কালিক পরিসরে বিভিন্ন কবি-রচিত সূক্তসমষ্টিই ঋগ্বেদ বা ঋক্-সংহিতা। এ জন্যে কোনো কোনো মতাদর্শের প্রাধান্য থাকলেও ঋগ্বেদে পরবর্তী প্রায় সব মতেরই কিছু কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন তারাপদ চৌধুরী বলেন :

> যে সকল ভক্তিমার্গে পরব্রহ্মেরই প্রকাশরূপে কোনো ইষ্ট দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদের সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রীতির তপশ্চর্যা, এমনকি তান্ত্রিক আচারগুলির পূর্বাভাস বেদে বর্তমান। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং মায়া সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে ইঙ্গিত, মীমাংসা মতানুযায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত্তা, সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা, যোগদর্শন সম্মত ইন্দ্রিয় সংযম এবং চিত্তের অভিনিবেশ এবং ন্যায়-বৈশেষিক মতানুসারে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যথার্থ বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা—এই সকলেরই পূর্বাভাস বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আত্মা, মন, পরব্রহ্ম, বিশ্বের অভিব্যক্তি, কর্ম, পুনর্জন্ম এবং মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনাও আছে। পরবর্তীকালে বেদগুলিকে যে যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই।[২]

তেমনি পরবর্তীকালের মহাভারতে তথা গীতায়ও নানা মতের অসমন্বিত মিশ্রণ ঘটেছে।[৩] অতএব সব কয়টি মত ও উপমতের উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং দুর্নিরীক্ষ্য ও দুর্নির্ণেয়। দেশী-বিদেশীর, শাসক-শাসিতের এবং আর্য-অনার্যের নানা ধারণা, সংস্কার, আচার, আদর্শ ও লক্ষ্যের বিচিত্র মিশ্রণে ও সমাবেশে—কখনো সমন্বয়ে, কখনো বা অজ্ঞতাপ্রসূত বিকৃত-প্রভাবে—সব শাখা ও উপশাখাগুলো গড়ে উঠেছে। তাই নিশ্চিত বিশ্বাসে কিংবা যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শেষ অবধি বিদ্বানে বিদ্বানে মতানৈক্য থেকেই যায়। অবশ্য যতই আলোচনা হচ্ছে, জটিলতাও ততই হ্রাস পেয়ে গবেষণার পথ খুলে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে বৈদিক বিধি-বিধান এবং ভাবকল্প একান্তভাবে আর্য নয়। পশুজীবী আর্যেরা মূলত প্রাকৃত শক্তির পূজারী এবং কর্ম ও কর্মফলে আস্থাবান। কিন্তু কৃষিজীবী অনার্য গোষ্ঠীরা তাদের জীবিকার গরজেই ভাববাদী ও প্রতীকপ্রিয় না হয়ে পারেনি।

অনুমান করি, উর্বরা ভারতভূমির অনিঃশেষ চারণক্ষেত্র আর্যদের স্থায়ী বসবাসে প্রলুব্ধ করে, আর অনায়াসলভ্য ফলমূল তাদেরকে জীবিকার ভাবনা-মুক্তির আশ্বাস দিয়ে কৃষিকার্যে প্রবর্তনা দেয়। এভাবে এ নতুন দেশে নতুন জীবিকার মাধ্যমে আর্যরা কৃষি সম্পর্কিত আচার-সংস্কারেও গোড়া থেকেই প্রভাবিত হতে থাকে। এই প্রভাবেরই স্বাক্ষর রয়েছে হয়তো বেদের বিভিন্ন মণ্ডলের নারী, অদ্বৈততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও ভাব প্রতীকী কল্পনার মধ্যে—যা সাধারণভাবে আর্য মননের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। বেদে-ব্রাহ্মণে-উপনিষদে যা আছে সবই আর্যমানসজাত, এ ধারণা তাই যৌক্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সি. কুন্হান রাজা বলেছেন—সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা এবং দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রভাবেই—'১. সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব, ২. মন্দিরে উপাসনা ও তার সঙ্গে অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অনুধ্যান, ৩. বিশ্বজগতের পরিকল্পনা ধারার মধ্যে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ, ৪. ঐশী-শক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান, ৫. ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব এবং ৬. জাতীয় মহাপুরুষ হিসাবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বে উন্নয়ন।'[৪] তাঁর মতে সাংখ্য মত অবৈদিক।[৫] ভক্তির বিকাশও অবৈদিক প্রভাবজ।[৬] বেদান্ত ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনও ঘটে প্রধানত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় দিয়ে। 'কুমারিল ভট্ট অন্ধ্রদেশের লোক, শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কেরলা, রামানুজ তামিল দেশে আর মাধবাচার্য কর্ণাট দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'[৭] এবং বিষ্ণু আর শিবের শক্তিমহিমা ও ক্রিয়ার ধারণাও অবৈদিক।[৮] তাই আগম শাস্ত্রও অবৈদিক।[৯]

তারাপদ চৌধুরীও বলেন, বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের 'পাশাপাশি মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ এবং ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এ বিষয়গুলির ইতস্তত উল্লেখ আছে বটে, তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ কৌশিক-সূত্র উহাদের বিষয়। সেইজন্যই এই গ্রন্থ দুইটিতে পরবর্তী তন্ত্রশাস্ত্রের সূচনা রহিয়াছে।'[১০] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech ..... the ideas of 'Karma' and transmigration, the practice of 'Yoga' the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the coconut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (The dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of Vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our Pre-Aryan ancestors.'[১১]

এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও দর্শনগুলো অবলম্বন করে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করব।

উপনিষদ

উপনিষদগুলোতে সমাজ-স্বীকৃত বৈদিক মূলতত্ত্ব, দেবতা, যজ্ঞ ও অন্যান্য আচার-বিরোধিতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—প্রাচীন বলে স্বীকৃত এ দুটো উপনিষদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বৃহদারণ্যকে আছে —'যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দেবতার আরাধনা করে, সে দেবগণের গৃহপালিত পশুবিশেষ।'[১২]

পরবর্তীকালে শঙ্করও যজ্ঞাদি আচার ও দেবপূজায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[১৩] বস্তুত আরণ্যক রচনাকাল থেকেই ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী আর্যেরা ভাববাদী হয়ে উঠল।[১৪] তার ফলেই উপনিষদে যজ্ঞ ও দেবতাদির প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। এমনকি পরবর্তী উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে যজ্ঞের মহিমা পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও[১৫] তাতে যজ্ঞের উদ্দিষ্ট ঈশ্বর দেবতা নন।[১৬] এভাবে উপনিষদে একক ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই কঠোপরিষদ বলেন, 'পরব্রহ্মের ভয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতারা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করে থাকে।'[১৭] বৃহদারণ্যকে[১৮] এবং ছান্দোগ্যেও [১৯] তাই চরম কথা ঘোষিত হয়েছে—'আত্মাই ব্রহ্ম'।

মহাভারত

মহাভারতে বিষ্ণু ও বিষ্ণু অবতারের কথাই আছে। অন্য দেবতার অবতারের কথা নেই।[২০] কাজেই বিষ্ণুই প্রাধান্য পেয়েছেন এ কাব্যে। অবশ্য বৈদিক দেব মণ্ডলে মহাভারতোক্ত দেব-দেবীরই ঠাঁই হল। এতে 'দেবতারা' একই ঈশ্বর হইতে 'উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ' এই মত গৃহীত হইল। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোগ ও সাংখ্য মহাভারতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।[২১] তাত্ত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাকাব্যে বিভিন্ন মতবাদ সকলের এক অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ..... মহাকাব্যে বর্ণিত তত্ত্ব-বিদ্যায় বিভিন্ন ভাবধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ..... এই সকলই প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগদর্শনের সাধারণ অঙ্গস্বরূপ ঈশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত। .... অপরদিকে আমরা পাশুপত, বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত সম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাদী ভক্তিবাদ দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উৎস হইতে তাহাদের ভাবধারা সকল সংগ্রহ করিয়াছিল।'[২২] মহাভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা 'ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত দ্বৈতবাদী।'[২৩] "সাধারণ আর্যদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইগুলি উপত্যকার অনার্য সাংস্কৃতিক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল (রুদ্র শিবের ধারণাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।) ..... ইহা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে-সংমিশ্রণ সম্ভবত বৈদিক যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বেদোত্তর যুগেও ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। (এবং এইরূপে) বেদবিরোধী লোক-প্রচলিত ধর্মসম্মত দেব-দেবী ও আচার নূতন ব্যাখ্যা দিয়া বৈদিক ধর্মের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হইল। .... (এইভাবে) রুদ্রশিব, বিষ্ণু-নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লোকপ্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগ-প্রধান ভক্তিবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রহ্মমূলক ধর্মগত নিশ্চয়ই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল।'[২৪]

পুরাণ

Pargitar বলেন, 'সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি (পুরাণগুলি) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী বিশ্বকোষ'।[২৫] 'পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ও বিশিষ্টাদ্বৈত এমনকি সাংখ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা আছে।'[২৬] পুরাণগুলোর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। সর্বপুরাণেরই সারকথা ও তাৎপর্য বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণে মেলে।[২৭] ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের ঐশ্বরিক লীলাবাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, শৈব সম্প্রদায়ের শক্তিবাদ এবং মীমাংসা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ন করা হইয়াছে।'[২৮]

চার্বাক দর্শন

বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী, এ কারণে তাঁদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়। এঁরা বস্তুবাদী—অধ্যাত্মবাদী নন। বেদের আমল থেকে এঁদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার আগেও যে লোকমনে এর 'জড়' ছিল, তা অনুমান করা যায় বেদে এইমতের উল্লেখ থেকে। রামায়ণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেন, গৌতম বুদ্ধের সমকালীন অজিত কেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, আর ভাগুরি, পুরন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নাস্তিক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন।[২৯] এ ধারার চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো নিজ নিজ ভূতে মিশে যায় ; কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। 'জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি'—এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্রবিরোচন' উপাখ্যানে।[৩০]

জৈন-বৌদ্ধমত

সর্বজীবের প্রাণের মূল্যবোধ ও জীব নির্বিশেষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই অহিংসার জন্ম। এটি মানব-সংস্কৃতির ও সংবেদনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশের পরিচায়ক, মনুষ্যত্বের এমনি বিকাশ কালের দিক দিয়ে বিস্ময়কর। আদি তীর্থঙ্কর পার্শ্ব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মহাবীরের আড়াইশ বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের আগেও বহু বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছেন বলে বুদ্ধ দাবী করেছেন। কাজেই অহিংস মত আর্য আগমনের পূর্বেকার বলে মনে হয়।[৩১] বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল 'এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ। (তখন) প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল'।[৩২] হয়তো অনার্য যৌগিক ধ্যান, কৃচ্ছ্র সাধনা, জন্মান্তরবাদ, শিবপূজা প্রভৃতি অনার্য আচার-সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই বৌদ্ধমতে দেব, দ্বিজ ও বেদের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য চার্বাকরা আগে থেকেই এসবের প্রতি অবিশ্বাস ও বিরূপতা প্রচার করে চলেছিলেন। 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' মতে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিরোধী সম্প্রদায় ছিল বহু এবং বিবিধ। এ সময়ে বিভিন্ন পন্থী তীর্থকগণ (নাস্তিক-আচার্য)—যথা, পুরাণ, কস্‌সপ, মকখলি, গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, নিগণ্ঠনাট পুত্ত, সঞ্জয়—বেলট্‌ঠপুত্ত এবং আরো অনেক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ্য মতবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাতেন।[৩৩] বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরাই পরবর্তীকালে সাধনপন্থ হিসেবে যোগাচার গ্রহণ করে।

AMARBOI.COM

সাংখ্য ও যোগ

বেদ ও কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়নী উপনিষদে সাংখ্যসম্মত ধারণা লক্ষ্য করা যায়; কাজেই সাংখ্য মত নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী নয়। তবু সাংখ্য মত যে ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত দর্শন, তা নানা কারণে অস্বীকার করার উপায় নেই। আড়ার কলমের নিকট গৌতম বুদ্ধের সাংখ্য দর্শন শিক্ষা, ন্যায়সূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির সমালোচনা প্রভৃতি থেকেও এর প্রাচীনতা অনুমান করা সম্ভব।[৩৪] 'গীতায় সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। .... যোগ হচ্ছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ। যোগ ও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বর-রূপ যে অপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার জন্যই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য।'[৩৫]

আমরা ভারতিক অভিজাতশ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধারার কিছুটা পরিচয় পেলাম। এতে আমরা দেখেছি দেশীয় গণমানসপ্রসূত নানা মত উঁচুস্তরের মানুষের ধর্মে ও দর্শনে বার বার হানা দিয়ে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। এবার সে গণমানস উদ্ভূত ধর্মসংস্কার ও দেবতার পরিচয় নেওয়া যাক।

ভয় থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ভয় কিসের ? ভয় অপ্রাপ্তির, ক্ষতির এবং অ-সুখের। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার ও আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা আবশ্যক তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার নাম বাঞ্ছা। বাঞ্ছামাত্রই চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধ হয় না। নিজের অসামর্থ্য আছে, আছে আরো অজানা অকারণ বাধা। এই বাধাস্বরূপ অজ্ঞাত শক্তিই অমূর্ত অরি-শক্তি, আর সিদ্ধির সহায়ক শক্তি হচ্ছে ইষ্ট-শক্তি। এই অরি-শক্তির দমন ও ইষ্ট-শক্তির আবাহন প্রয়াসই জাদু-বিশ্বাসে প্রবর্তনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে। বাঞ্ছা-সিদ্ধির আত্যন্তিক কামনা থেকেই জাদু-বিশ্বাস উৎসারিত। আদি অমূর্ত জাদু-বিশ্বাস পরে পরে প্রমূর্ত ইষ্ট ও অরি দেবতার রূপ নিয়েছে।

এদেশের এক দেবতা গণপতি গণেশ। ইনি ছিলেন আদিতে অরি দেবতা—বিঘ্নরাজ।[৩৬] ইনি অনার্য দেবতা।[৩৭] ভিলেরা চাষাবাদের প্রারম্ভে শিলাখণ্ডে সিন্দূর মেখে 'গণেশ'রূপে পূজা করে।[৩৮] ঋগ্বেদেও[৩৯] গণপতির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে গণপতি ও বৃহস্পতি অভিন্ন। লোকায়ত মতের প্রবর্তক বলে পরিচিত বৃহস্পতি ও বৈদিক বৃহস্পতি অবশ্য অভিন্ন কী না, বলা যাবে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নগ্ননারীর সঙ্গে মৈথুনরত গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে।[৪০] আনন্দগিরির 'শঙ্কর বিজয়'-এর সতেরো সংখ্যক প্রকরণে আছে যে গাণপত্য মতে গণেশ বামাচারের সঙ্গে সংযুক্ত। এতেই বোঝা যায়, আদি 'মৈথুনতত্ত্ব' থেকেই গণপতি গণেশ দেবতার পৌরাণিক রূপান্তর ঘটেছে।

৪

॥ তন্ত্র ॥

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের ধর্ম বা সংস্কার হিসেবে তন্ত্রের ব্যাপকতা দেখেই এক বিদ্বান বলেছেন :

> In the popular knowledge and belief they have practically superseded the Vedas over a large part of India. In all writings (Tantric writings) these female principle is personified and made prominent to the almost total exclusion of the male.[১]

তান্ত্রিক সাধনায় নারীর গুরুত্ব যে অত্যধিক তার সাক্ষ্য আচারভেদ তন্ত্রেও আছে :

> পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
> বামাচারো ভবত্ত ত্রবামাভূত্বা যজেৎ পরাম ॥

শাক্তদের সাধনাও এরূপ। R. G. Bhandarkar বলেন :

> The ambition of every pious follower of the system (sakta) is to become identical with Tripura-Sundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a woman.[২]

সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বও এরূপ। মনীন্দ্রমোহন বসু বলেন :

> 'The sahajias also believe that at a certain stage of spiritual culture the man should transform himself into a woman and remember that he cannot have the experience of true love so long as he cannot realise the nature of woman in him.[৩]

এখানে বৈষ্ণবের রাধাভাব ও গোপীভাব স্মর্তব্য।

তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।[৪] সাংখ্যেও তাই। 'বাচ্যবস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে, যেমন নারী পুরুষকে বশ করে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং ভাবও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে।' চীনেও বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল। সৃষ্টি হচ্ছে Yang (পুরুষ) ও Yin (নারী)-এর যৌন মিলনের ফল। 'He (man) is described as a Microcasm—a world in miniature[৬] এ সব দেখে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হয় যে ভারতের অনার্য সমাজে মিথুনতত্ত্ব, জাদু বিশ্বাস এবং মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্য ছিল। ময়েনজোদাড়োর আবিষ্ক্রিয়া এবং দ্রাবিড় সমাজের নারীদেবতা প্রভৃতি এ বিশ্বাসের অনুকূল।[৭] দেবীপ্রসাদ বলেন, 'আমাদের যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের মতোই ওই সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে।'[৮] পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন—'তন্ত্রের যে-কোনো পুথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি ধর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নতুন ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরে নব্যহিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।[৯] তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন, 'যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা : সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।' ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। ..... তন্ত্র বলিতেছেন যে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একই পদ্ধতির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল হইবে। .... এদেশের সিদ্ধগণ বলেন যে মনুষ্যদেহের মতো পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই। .... অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।[১০] এই উক্তির সমর্থন পাই ছান্দোগ্যে, বিরোচন বলেছেন, 'এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়লোকই লাভ করা যায়।' ৮।৮।৪।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, বাঙলাদেশে এবং তৎসলগ্ন পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। ..... বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। .... ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধন মূলত: একটি সাধনা। .... এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহা কোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। এবং সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর প্রভাবান্বিত করিয়াছে[১১]। এজন্যেই পাঁচকড়ি বানার্জি বলেছেন, 'সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরী-ভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া-সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত[১২]।

'এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন।'[১৩] তাই তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া বাউল সবাই দেহচর্যাকেই মূলব্রত করেছে। আবার তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা রতিপ্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে এ সাধনা করে। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এ সাধনা চলে, যোগ তাই বামাচারী ও বামাবর্জিত—এই দুই প্রকার। কামনিরোধ যোগাচার সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন:

> The most important of the secret practices, is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same-time conducive to health both of the body and the mind.[১৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'যোগাচারমতে যেমন কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজমতে তেমনি কিছুই থাকে না, আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন, সে-সুখ স্ত্রীপুরুষ সংযোগজনিত সুখ।'[১৫] তন্ত্রের মতো এখানে নারীশক্তিই মুখ্য। তাই শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Another thing that deserves special attention in connection with the yogic practce of the sahajia Buddhists is the conception of the female force. In the charya songs we find frequent reference to this female force variously called as the chandi, Dombi, Savari, Yogini, Nairamani, Sahaja-Sundari etc. and we find frequent mention of the union of the yogin with this personified female deity .... This

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

conception of Sakti of the Buddhist-Sahajias is an adoption of the general Tantric conception of the sakti.'[১৬]

আদি মৈথুনতত্ত্ব থেকে এসব বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভবের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবু পরোক্ষ ও বিচ্ছিন্ন প্রমাণে এটুকু বোঝা যায়, আদি কৃষিজীবীরা মৈথুনতত্ত্বের বিকাশ লোকায়তে এবং তার পরিণতি শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, রাধা-কৃষ্ণ, প্রজ্ঞা-উপায় প্রভৃতি রস-রতি তত্ত্বে বা বিজ্ঞানবাদে।

মহাভারতের উদ্দালক ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান (আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়) থেকে জানা যায় তখনও গাভীগণের মতো স্ত্রীগণ শতসহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই নিত্যধর্ম। কাজেই তখনও নারীর একনিষ্ঠতাজাত সতীত্ব ধারণা গড়ে উঠেনি।

বার্হস্পত্য সূত্রমে আছে : সর্বথা লোকয়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে কাপালিকমের কামসাধনে।

গুণরত্ন বলেছেন—কাপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। এবং বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তারা সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয়। মাধ্বাচার্য বলেছেন, লোকায়তিকেরা কামাচারী—অর্থ ও কামসাধনাই তাদের লক্ষ্য।

গুণরত্নকথিত মৈথুন-উৎসব আজো হয়। সাঁওতাল, হো, পাঞ্চা, কোটার প্রভৃতি দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং চিলি, নিউমেক্সিকো, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি বিদেশী আদিবাসীর মধ্যে তা চালু আছে। গুণরত্ন বলেছেন, "চার্বাকরা (লোকায়তিকরা)

> They drank wine and ate meat and were given to unrestricted sex-indulgence. Each year they gathered together on a particular day and had unrestricted intercourse with women. They behaved like common people and for this reason they were called Lokayata.[১৭]

সাঁওতালেরা এমনি উৎসব আজো করে।

Five days are spent in dancing, drinking and debauching. It is significant that at the commencement the village headman gives a talk to the village-people in which he says that they may act as they like sexually, only being careful not to touch certain women, otherwise they may amuse themselves. The village people reply that they are putting twelve balls of cotton in their ears and will not pay any heed to, nor hear or see anything.[১৮]

এরই বিকশিত তাত্ত্বিকরূপ পাই পরবর্তী ধর্মমতগুলোতে। হরপ্রসাদ সে-মতগুলোর কথা এভাবে বলেছেন :

> The influence of the Lokayatas and Kapalikas is still strong in India. There is a sect and numerous ones too, the followers of which believe that 'Deha, or the material human body is all that should be cared for and their religious practices are concerned with the Union of men and women and their success (siddhi) varies according to the duration of the union. They call themselves Vaisnavas, but they do not believe in Vishnu or Krishna or their

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> incarnations. They believe in 'Deha'. They have another name Sahajia, which is the name of a sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last four Centuries of their existence in India.[১৯]

দোল, হোলী বা মদনোৎসবে আজো সেই মৈথুন উৎসবের রেশ রয়ে গেছে। W. Crooke এই হোলী বা মদনোৎসবের মূলে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বাড়ানোর কামনা ছিল বলে অনুমান করেছেন।[২০]

অতএব, আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই : সৃষ্টিসম্ভব মৈথুনতত্ত্ব থেকে সাংখ্যতত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বের প্রকৃতির উপর আত্যন্তিক গুরুত্বদানের ফলে তন্ত্রমত এবং পুরুষের উপর গুরুত্বদানের কারণে লিঙ্গায়েত মত ও যোগ-পদ্ধতির বিকাশ। নিজের মধ্যে অলৌকিক শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ সাধনার লক্ষ্য। তাই মূলত এটি শক্তিবাদ। যোগপদ্ধতি, তান্ত্রিক আচার অথবা যোগতান্ত্রিক মিশ্র আচার মাধ্যমে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস চলেছে। যেখানে শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি প্রাধান্য লাভ করেছেন, সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু গুরুত্ব পেয়েছেন, সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতবাদের উদ্ভব। যোগ ও তন্ত্র প্রায় সব মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। যারা অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়, সে-সব সাধকের সাধনার আবশ্যিক অঙ্গ হয়েছে তন্ত্র অথবা যোগ। বাঙলা দেশে পাল আমলে আদি অনার্য-সংস্কার ব্রাহ্মণ্যমত এবং মহাযান বৌদ্ধ মতের সমন্বয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান ও শেষে সহজযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, মণ্ডল, লতা, ভগ, যোগ ও নানা গুহ্যপ্রক্রিয়াই এসব মতের ভিত্তি। এবং সাধারণভাবে আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক বর্ণরেখাত্মক-যন্ত্র, যোগ-ক্রিয়া, দীক্ষাগ্রহণ এমনকি সম্প্রদায় বিশেষে মূর্তিপূজার মাধ্যমেই উপাসনা চলে। বাঙলা দেশে 'অষ্টাদশ শৈব আগম নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগে রচিত হয় এবং খুব সম্ভব গুপ্তযুগের শেষের দিকে ও পালযুগে তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রচলন হয়।'[২১] বর্তমান হিন্দু পূজাপদ্ধতিতেও তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং উচ্চশ্রেণীর অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান ও নাথপন্থের উদ্ভব। এর জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতে। 'এই তত্ত্বসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ ও চর্যাগীতির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙালাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়াসাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।'[২২] এবং 'সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।'[২৩] ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত—যার নাম নাথপন্থ্। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। একসময় এই নাথপন্থ্ ও সহজিয়ামতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল-মতের উদ্ভব। 'সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।'[২৪] ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদই বাউলমতের প্রবর্তক এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই (বা বীরচন্দ্র) বাউলমত জনপ্রিয় করেন।[২৫] এ মতের সমর্থন মিলেছে 'বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা' নামের এক অজ্ঞাতপ্রায় পুথিতে। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলছেন :

> শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা শহরে ...
> তথা যাই শিক্ষা লহ মাধববিবির সনে
> তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধববিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, 'মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। .... বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল। ..... বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্বযুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পর থেকে বাংলাদেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিকভাবের দু'টি ধর্মমত চলিত ছিল—শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজিয়ামত। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের যোগী বা কাপালিক বলত, এরা কানে নরাস্থি-কুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাহিরে ছিল এদের কুঁড়েঘর।[২৬] যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ'। বর্তমান সময়ে যুগী জাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধক-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে।"[২৭] ছকে ফেলে দেখলে বাঙলার তান্ত্রিক ধর্মের বিবর্তন এরূপ দাঁড়ায় :

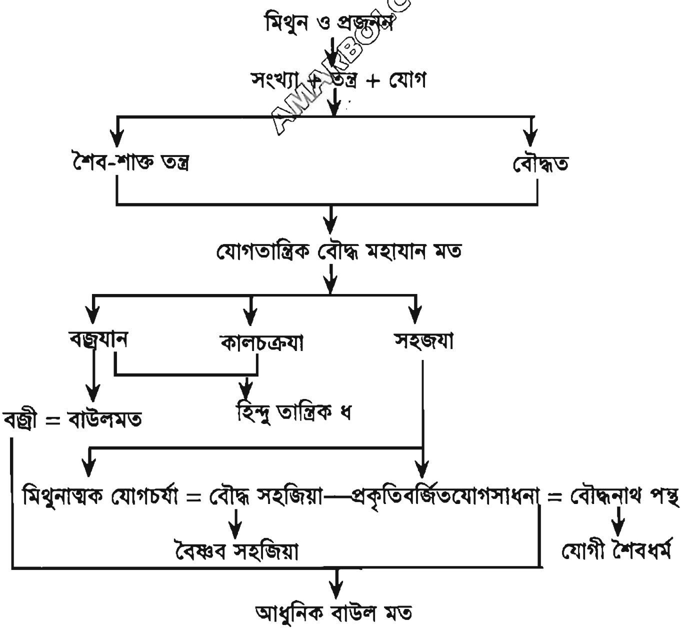

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্ত্রিক শৈব-শাক্ত ধর্ম

তন্ত্র হচ্ছে ভোগ-মোক্ষবাদ—ভোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভই আদর্শ। নারীই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া, কালী, তারা, শিবানী। নারীশক্তিতেই পুরুষ হয় শক্তিমান। শিব হচ্ছেন শক্তিমান। শিবশক্তি অদ্বয়ও বটে, ভিন্নও বটে। শক্তি সাধনায় শক্তিমান হওয়া তথা শিবত্ব উপলব্ধি করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। এর সঙ্গে বৌদ্ধ 'বোধিচিত্ত' বা মহাসুখ তুলনীয়। এ সাধনায় প্রকৃতিসঙ্গ প্রয়োজন। মৈথুনে বীর্যধারণের দরকার হয় না। রেতক্রিয়া অবিধেয় নয়। এ সাধনা করতে হয় নারীভাবে—'বামা ভুত্বা যজেৎ পরাম।' লতা, ভগবান-যন্ত্র, পদ্ম তথা নারীর যোনি-প্রতিম পূজার উপাদান। আসন, ন্যাস, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, যোগক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এরা গুরুবাদী। সাধনাও গুহ্য। পঞ্চ 'ম'কারে তথা মাংস, মৎস্য, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনে এরা বিশেষ আসক্ত। এরাও পরকীয়া বামা মৈথুনই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মানে। এদের গুরু চার প্রকার—গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্টি গুরু ও পরাৎপর গুরু। তাঁরা সবাই শিবের অংশ। হিন্দুতন্ত্রে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে পর পর ছয়টি চক্র [ষট্‌চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র (দ্বিদল চক্র)] ও তাদের সন্নিহিত পদ্ম, এবং ইড়া (গঙ্গা) পিঙ্গলা (যমুনা) সুষুম্না (সরস্বতী) প্রভৃতি বহু নাড়ির কল্পনা করা হয়েছে। সর্বনিম্নের চক্রের নাম মূলাধারচক্র। এতেই সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী সুষুপ্ত রয়েছে। ষট্‌চক্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে সহস্রার (সহস্রদলপদ্ম), তাতে থাকেন পরম শিব। যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই কুণ্ডলিনীকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বে নিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ত্রিগুণাতীত শিবত্ব উপলব্ধি হয়। এটি এক পরমানন্দময় অদ্বয়সত্তা—শিবশক্তির অদ্বয়সত্তা—এই মিলনজাত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। শিব পুরুষশক্তির প্রতীক—উমা নারীশক্তির প্রতীক—উভয়ের মিলনজনিত যে সামরস্য তাই কেবলানন্দ, বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মহাসুখ ও বৈষ্ণব সহজিয়ার মহাভাবরূপ সহজাবস্থা। মূল পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই হিন্দুর শিবশক্তি, বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায় এবং বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব সহজিয়ার রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে রূপ নিয়েছে।

শাক্তমন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাচার নামে দুই সাধনপদ্ধতি আছে। বামাচার পঞ্চ 'ম'-কার ভিত্তিক। আর দক্ষিণাচার 'ম'-কার বর্জিত, যোগনির্ভর।

ছকে হিন্দুতন্ত্র

	চক্র	দেহস্থান	পদ্মদল	অধিষ্ঠাত্র দেবতা
১.	মূলাধার	গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	৪	ব্রহ্ম + ডাকিনী
২.	স্বাধিষ্ঠান	জননেন্দ্রিয়ের মূলে সুষুমন্নর মধ্যস্থ চিত্রিনী নাড়ীস্থ	৬	মহাবিষ্ণু + রাকিনী
৩.	মণিপুর	নাভিমূলে	১০	রুদ্র + লাকিনী
৪.	অনাহত	বক্ষ	১২	ঈশ + কাকিনী
৫.	বিশুদ্ধ	কণ্ঠ	১৬	অর্ধনারীশ্বর (শিবশক্তি) + শাকিনী
৬.	আজ্ঞা	ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থ	২	পরশিব + হাকিনী

এর উপরে রয়েছে সহস্রদলপদ্ম, নাম সহস্রার। এটি পরমশিব ও কুণ্ডলিনীর মিলনস্থল। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়িই বায়ুপ্রবাহ পথ। ইচ্ছামতো বায়ু সঞ্চালনই যোগক্রিয়ার মূলভিত্তি। তাই নাড়ির সঙ্গে যোগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু অনৈক্যও রয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতির তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিব্যাচার, সমায়াচার, দক্ষিণাচার ও পশ্বাচার প্রভৃতি নামমাত্র তান্ত্রিক আচার। যথার্থ তান্ত্রিক আচার হচ্ছে : বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলাচার। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই স্বীকৃত, নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। বেশ্যা, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী প্রকৃতিই যোগ্য সাধন সঙ্গিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধতন্ত্র

প্রকৃতি ও পুরুষকে বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায় নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুতন্ত্রের ঘটচক্র বা পদ্ম বৌদ্ধতন্ত্রে চারচক্র বা পদ্ম। এবং তা 'কায়'রূপে পরিকল্পিত। প্রথম চক্রটি নাভির নিচে অবস্থিত। এর নাম 'নির্মাণকায়'। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়দেশে অবস্থিত। এর নাম ধর্মকায়। তৃতীয় চক্র কণ্ঠদেশে। এর নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থটি ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত। এর নাম সহজকায়। এই সহজকায় বা উষ্ণীষ কমলকে মহাসুখচক্র বা মহামুখকমলও বলা হয়। 'হে বজ্রতন্ত্র' অনুসারে 'জননেন্দ্রিয়ের স্থান হইতে চেতন-অচেতন সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রদেশে নির্মাণকায় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মচক্র সমস্ত ধর্মের তত্ত্বরূপ বলিয়া হৃৎপ্রদেশে স্থাপিত, সম্ভোগ অর্থে ষড়রস সম্ভোগ, সম্ভোগকায় আনন্দ-রস সম্ভোগস্বরূপ, ইহা কণ্ঠদেশে স্থাপিত। মহাসুখচক্র তথা মহাসুখকায় মস্তকে স্থাপিত।'[২৯]

দেহস্থান	চক্র বা	কায়	পদ্ম	মুদ্রা	আনন্দ	দেবী	ক্ষণ
নাভি	নির্মাণচক্র	কায়	নাভিপদ্ম চৌষট্টিদল	কর্মমুদ্রা	আনন্দকায়	লোচনা	বিচিত্র
হৃদয়	ধর্মচক্র	"	হৃৎপদ্ম বত্রিশ দল	ধর্মমুদ্রা	পরমানন্দ	মানকী	বিপাক
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র	"	কণ্ঠ পদ্ম ষোড়শ দল	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	পাণ্ডরা	বিমর্দ
মস্তক	সহজচক্র	"	উষ্ণীষ পদ্ম চতুর্দল	সময়মুদ্রা	সহজানন্দ	তারা	বিলক্ষণ

AMARBOI.COM

এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ—সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা।

চার আর্য সত্য— দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায়।

চার তত্ত্ব— আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব

এর সঙ্গে চার নিকায়, ষোড়শ সংক্রান্তি, চৌষট্টি দণ্ড ও চার প্রহরাদির সম্পর্ক রয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে (যেমন সেকোদ্দেশ টীকা) কায়-বাক-চিত্ত-জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের চার প্রকার ভেদ ধরে মোট ষোলো প্রকার আনন্দ নির্দেশ করা হয়েছে।[৩০] বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া নাড়ির নাম ললনা, আলি, ধমন, চন্দ্র প্রভৃতি। পিঙ্গলার নাম রসনা, কালি, চমন, সূর্য প্রভৃতি। সুষুম্না নাড়ি, অবধূতী, দেবী, প্রজ্ঞা, নৈরাত্মা, যোগিনী, সহজ সুন্দরী প্রভৃতি নামে পরিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে ললনাকে প্রজ্ঞা (চন্দ্র) এবং রসনাকে উপায় (সূর্য) বলা হয়েছে। এ দুটো নাড়ির মিলন হয় অবধূতীতে। এ মিলন প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। ললনা বিন্দু বহন করে, রসনা রজ : বহন করে, অবধূতী বহন করে প্রজ্ঞা-উপায় মিলনজনিত বোধিচিত্তকে। এই অবধূতীই সহজানন্দ স্বরূপিণী।[৩১]

বৌদ্ধতন্ত্র সাধনায় হঠযোগের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা বিন্দুধারণ এবং তা উর্ধ্বে সঞ্চালনই এর লক্ষ্য। খড়গ, অঞ্জনা, পাদলেপা, অন্তর্ধান, রস রসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল বৌদ্ধতন্ত্রের এই অষ্টসিদ্ধি (সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০)। নটী, রজকী, ডোমনী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণীই সাধন সঙ্গিনীরূপে বিশেষ উপযোগী। যোগিনী-ডাকিনীরা সিদ্ধিপ্রভাবে অলৌকিক শক্তিধর হয়।

মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত উপমত সমূহ

বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে হয়, তা সঠিক বলা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে 'বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে, বুদ্ধদেবই সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য মুদ্রা, মন্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করেন।[৩২] মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসই তান্ত্রিকতার ভিত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে মন্ত্রকে বলত ধারণী (যাহা দ্বারা কিছু ধারণ করা যায়)। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলো রচিত হতে থাকে। এ সময় বৌদ্ধ ক্ষান্তি-পারমিতা দান-পারমিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি তত্ত্ব দেবীরূপে কল্পিত হয়ে প্রমূর্তরূপে পূজা পেতে থাকেন। ধারণী বা বীজমন্ত্রও এ সময় থেকে রচিত হয়।[৩৩] অষ্ট সাহস্রিক প্রজ্ঞা পারমিতা > প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র > প্রজ্ঞা পারমিতা ধারণী > প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্ররূপ সংক্ষেপকরণ পরম্পরায় অবশেষে 'প্রং' এই বীজমন্ত্রে (তুলনীয় ওঁ) রূপ নিয়েছে। এই মন্ত্রনির্ভর পূজা-ধ্যান পদ্ধতির নাম মন্ত্রযান। সম্ভবত: এই মন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের যোগাচার পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এর দার্শনিক ভিত্তি হয়। তার থেকেই ক্রমে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়ে পাল আমলে তিনটি বিশিষ্ট উপমত হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ তিনটি হচ্ছে : বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান।

নাগার্জুনের মতে শূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। এ মত পরে বসুবন্ধুরও সমর্থন পায়। তিনি বলেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা আর এই শূন্যতাই নির্বাণ। অর্থাৎ বাহ্যত সবকিছু থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব মায়ামাত্র—ভ্রমস্বরূপ—এটি অবিদ্যাজাত।

বজ্রযান

বজ্রযানে এই শূন্যতার নাম বজ্র। এটি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী বস্ত্র। এই তত্ত্বই বজ্রসত্ত্ব—তার প্রমূর্তরূপ আদিবুদ্ধ। তিনিই পরমদেবতা। এই পরমদেবতা আত্মাও বটে, আবার সর্বজনীন পরমসত্তারূপে পরমাত্মাও বটে। এ বোধ মূলত ঔপনিষদিক এবং আস্তিক্যসূচক। এই বজ্রসত্ত্ব পরমব্রহ্মের মতো নির্গুণ, আবার সগুণও বটে। এই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা শূন্যতা ও করুণা জ্ঞানরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা।

বৌদ্ধ ধর্মচক্র বা ধর্মকায় বজ্রযানে বজ্রকায়রূপে অভিহিত হয়। এই বজ্রকায় বজ্রসত্ত্বস্বরূপ এবং জ্ঞান ও করুণারূপ বুদ্ধ। এই আদি বুদ্ধের পঞ্চগুণ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের নাম পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক দেবতা হচ্ছেন—বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, আমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। উক্ত সব স্কন্ধের ধ্যানের প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে দেবতারা ধ্যানী বুদ্ধ বলে অভিহিত হন। এঁদের প্রকৃতি বা শক্তি হচ্ছেন যথাক্রমে তারা (বজ্রধাত্বেশ্বরী) মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা বা তারা ও লোচনা। এঁদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন চক্রপাণি (সমন্তভদ্র), রত্নপাণি, পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর), বিশ্বপাণি ও বজ্রপাণি। এরা ভূতপিশাচদেরও নাকি পূজা করত। যোনি প্রতীক যন্ত্রপূজাও করত।

দেবীদের মধ্যে আর্যতারা—শ্যামাতারা, শেততারা, উগ্রতারা প্রভৃতি নানা নামে বিশেষ জনপ্রিয় হন। তাছাড়া হারিতা, মারীচি প্রভৃতি নামের প্রকৃতিও পরিকল্পিত হয়েছে। এই তারা পরে হিন্দু কালিকাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্ব হচ্ছে হেরুক বা হে বজ্র এবং তাঁর প্রকৃতির নাম হচ্ছে বজসত্ত্বাত্মিকা, বজ্রবরাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা পারমিতা প্রভৃতি আর তাঁর আবাহনের বীজমন্ত্র হল 'হুং'। শূন্যতা ও করুণাকে কমল (প্রজ্ঞা), বজ্র (পুরুষ), প্রজ্ঞা (নারী), উপায় (পুরুষ), চন্দ্র (নারী), সূর্য (পুরুষ), এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। এ দুটোর মিলনজনিত এক তুরীয় আনন্দময় অবস্থা বা চেতনার নাম বোধিচিত্ত। এইটিই তান্ত্রিকতত্ত্ব। শৈব-শাক্ত তন্ত্রের সঙ্গে এখানেই বৌদ্ধতন্ত্রের মৌলিক ঐক্য। বোধিচিত্তেই মহাসুখ, কমলকে (প্রজ্ঞা তথা নারী) বৌদ্ধতন্ত্রে (যোনির) এবং বজ্রকে (উপায় তথা পুরুষ) পুংলিঙ্গের প্রতীকরূপে ধরা হয়েছে ! তাই 'বজ্রকমল সংযোগ' অর্থ মৈথুনক্রিয়া। এই মৈথুনে যে সামরস্য তাই 'যুগনদ্ধ' বা অদ্বয় এবং এই সামরস্যজাত আনন্দাবস্থাই বোধিচিত্ত। [এতদ অদ্বয়ং ইতি উক্তং বোধিচিত্তং ইদম পরম—সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭] অতএব প্রজ্ঞা-উপায় মৈথুনজাত মহাসুখরূপ বোধিচিত্ত লাভ করাই এ সাধনার লক্ষ্য। এ বজ্রতন্ত্রে হে বজ্র (বজ্রসত্ত্ব) নারী যোনিতে শুক্ররূপে বাস করেন বলে এবং শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। বজ্রযানীরা চর্যাগীতির মতো বজ্রগীতিতে তাদের সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করত। উল্লেখ্য যে আদিকাল থেকেই গানের মাধ্যমে সাধন-ভজন রীতি চালু রয়েছে। সব ধর্মেই গান [কৃচিৎ নাচ] সাধনা ও উপাসনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালচক্রযান

বজ্রযানের সঙ্গে কালচক্রযানের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। কালচক্রযানে কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। অর্থাৎ এখানে 'কাল'-এর উপরই অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা 'কাল ঘসতি ভূতানি'। কালচক্র হচ্ছে—শূন্যতা ও করুণার তথা প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়সত্তা। কালকে জয় বা অতিক্রম করে চিরন্তন বোধিচিত্ত লাভ তথা জন্ম ও মৃত্যু (উৎপত্তি ও ক্ষয়) নিরোধক শক্তিলাভই এ সাধনার লক্ষ্য। তাই কালচক্র বুদ্ধের জনকস্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায়ের ধারক। (বিমলপ্রভা—বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫)। 'সাধন সম্বন্ধে কালচক্রযানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়। অভয়াকর গুপ্ত 'কালচক্রাবতার' গ্রন্থে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, কালচক্রপন্থী সাধকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাঁহাদের সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন।'[৩৪] বৌদ্ধতন্ত্রে—বজ্র ও কালচক্রযানে—তুকতাক্-উচাটন-বশীকরণ-মারণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারাদি ছিল।

সহজযান

সহজযান দেব-দেবী, পূজা, মন্ত্র, প্রভৃতি সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ও আচারিক ধর্মের বিরোধী। কিন্তু বজ্রযানের সাধনপদ্ধতি ও সহজ যানের সাধনপদ্ধতি অভিন্ন। এমনকি বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্বকে তারা মানে। সহজযানের প্রসারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। এ মার্গের শাস্ত্রগ্রন্থগুলোও তাই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত। আমাদের দোহাকোষ ও চর্যাপদগুলো সহজযানী সিদ্ধাদের রচিত। চর্যাপদে বামাচার ও প্রকৃতিবর্জিত সাধনার মিশ্রণ আছে। সহজযানী মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনজনিত সামরস্য থেকেই মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব। এটিই বোধিচিত্ত। বৌদ্ধ চৌরাশী সিদ্ধার সবাই সহজিয়া ছিলেন না। তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী—এঁরা প্রকৃতিবর্জিত পরম যোগী। কেউ কেউ সহজিয়া ছিলেন, তা চর্যাগীতিতে লক্ষণীয়।

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজকীয় প্রয়াস চলে। এ সময়েই 'কালবিবেক', 'দায়ভাগ' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থোল্লেখিত ব্রাহ্মণ্য আচার সমাজে বহুল প্রচলিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণের শুরু হয় এভাবেই। চর্যাপদ থেকে এমনও অনুমান করা যায় যে, এ সমস্ত সহজযানীদের মধ্যে দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতি চালু ছিল; একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিকপদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত—বিশুদ্ধ যোগ-প্রণালী, হঠযোগের (চন্দ্র+সূর্য) মাধ্যমে দেহ বা কায়াসাধনই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

বিন্দুধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন করে সহস্রার মধ্যে নিয়ে সচ্চিদানন্দ রূপ 'মহাসুখ' ও 'সহজানন্দ'-এর অবস্থা সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। এটিই নির্বাণানন্দ তথা 'শূন্যতা'।

নাথধর্ম :

বলেছি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজধর্মরূপে গৃহীত হয়। ফলে বিভিন্ন ও বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে পড়ে। বিশেষ করে, স্মৃতির বিধান-অনুগ সমাজ ও শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় লোকজীবনে সে-প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। সেনদের রক্ষণশীলতা আর অনুদারতাও বৌদ্ধ বিলুপ্তির জন্যে অংশত দায়ী। এ বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিছু হিন্দু-দেবতা ও আচার গ্রহণ করে হিন্দুয়ানীর আবরণে পৈত্রিক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসী হয়। এরূপে এক যোগী-তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিব-উমা' নাম দিয়ে নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার চালু রাখে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-হাড়িপা-কানুপা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মীননাথ-গোরক্ষনাথের নাম অনুসারেই এ সম্প্রদায় 'নাথপন্থী'রূপে আমাদের কাছে পরিচিত। বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের কালে দুটো ভিন্ন পথে রূপান্তর লাভ করে : বামাচার বর্জিত যোগীরা শৈবনাথরূপে এবং কামাচারীরা বৈষ্ণব সহজিয়া রূপে হিন্দু সমাজের উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রাবিড় দেবতা শিব ও উমাকে[৩৫] অনেক আগেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পুরুষ-প্রকৃতির বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছিল, পরে শৈব-শাক্ততন্ত্রের শিব-উমাই (বা গৌরী) অবলম্বন হয়। তেমনি বৌদ্ধরাও পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রজ্ঞা-উপায় রূপে কল্পনা করে। আবার বৌদ্ধ বিলুপ্তিকালে প্রজ্ঞা-উপায়ের প্রতীকী পরিবর্তনে 'রাধাকৃষ্ণ' তথা বিষ্ণু-লক্ষ্মী আরাধ্য হয়ে উঠেন। এ কারণে এ সম্প্রদায় 'বৈষ্ণব-সহজিয়া' নামে এক উপসম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণু ও তাঁর অবতার কৃষ্ণ মহাভারতীয় যুগ থেকেই উত্তরভারতিক ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছেন। নাথপন্থ যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ থেকে উদ্ভূত তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুশীল কুমার দে প্রমুখ স্বীকার করেছেন।[৩৬] অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও কল্যাণী মল্লিকের মতে নাথপন্থ একটি প্রাচীন শৈবমত। কিন্তু ডক্টর মল্লিক বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও স্বীকার করেছেন—'নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সাধর্ম্য আছে। .... নাথ ধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধ যোগ-তত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।'[৩৭] আসলে প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিবশক্তি'র প্রতীকীরূপে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েই ডক্টর মল্লিক—হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়ামত ও নাথপন্থে নানা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেও—নাথমার্গকে শৈবমত বলেছেন। নাথেরা যে ব্রাহ্মণ্য শৈব নয়, তার একটি প্রমাণ নাথেরা শূন্যবাদী ও কায়াসাধনব্রতী। আর ব্রাহ্মণ্য 'আদিনাথ' শিব 'আদিবুদ্ধে'রই প্রতিশব্দের মতো। নাথদের এক পীঠস্থান কামাখ্যা। কদলিনগরও নাকি কামরূপে। নাথযোগী সম্প্রদায় (তাঁতিরা) তাদের সমাজ, আচার, পূজাপদ্ধতি ও সৎকারাদি আজো স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা ও পালন করে। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অবশ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে এরা হিন্দু-শৈবযোগীদের প্রভাবে পড়েছে। 'ভৈরব' নামে শিবপূজা তার অন্যতম। নাথপন্থী সাধকরাও নানা মতগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তারা যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখন এসব উপসম্প্রদায়ের কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বা (বৌদ্ধ) যোগী, তাই এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্গাপূজা, চক্রপূজা, যোনি ও লিঙ্গপূজা, শ্রীযন্ত্রপূজা প্রভৃতি চালু রয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে বলেই শক্তিকে এরা 'মাতৃকা' জ্ঞান করে না। বৌদ্ধতন্ত্রের অষ্টসিদ্ধির অন্তর্ধান খেচর প্রভৃতি সিদ্ধি আমরা মীননাথ-গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কাহিনীর মধ্যে পাই। মারণ—বশীকরণ—উচাটন—জ্যোতিষী প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচার-সিদ্ধিও নাথপন্থের লক্ষ্য ছিল। নাথমার্গেও শূন্যবাদ আছে। শৈব ব্যোমবাদ—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ বৌদ্ধ সহজযানীদের শূন্য, অতিশূন্য ও সর্বশূন্যের তুল্য। শূন্য ও বোধিচিত্ত এবং নির্গুণ তুরীয় অবস্থা একই। এ-ই নির্বাণ।

বৈষ্ণব সহজিয়া :

বলেছি, বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পর বাঙালি বৌদ্ধসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে মিশে গিয়ে হিন্দুয়ানীর আবরণে তাদের মতাবলী প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া, ধর্মপূজারী, নাথযোগী, হিন্দুতান্ত্রিক প্রভৃতির উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়ার পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। কেবল শূন্যতত্ত্ব বা নির্বাণ বা বোধিচিত্তের স্থলে 'মহাভাব' রূপ সহজ তথা পরমানন্দ এবং প্রজ্ঞা উপায়ের পরিবর্তে 'রাধা-কৃষ্ণ' নামই পার্থক্য সূচিত করেছে। এ কারণে পরকীয়া নারী-মৈথুন, বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চালন এবং রাগানুগা সাধনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নামান্তর ঘটেছে। বৌদ্ধদের মতো এরাও বেদ-বিরোধী। বৌদ্ধদের মতো এরাও একান্তভাবে গুরুবাদী। সৎগুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে কেউ মহাভাব বা 'সহজ-'এর অধিকারী হতে পারে না। এভাবে হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মও গড়ে উঠেছে বৌদ্ধতন্ত্রের কোনো কোনো পরিভাষা ও পদ্ধতির রূপান্তরে ও তত্ত্বের কলেবর বৃদ্ধিতে। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি-শিল্পে তার সাক্ষ্য রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। তারাই অন্য লোকের চোখে 'নেড়ানেড়ী'। নেড়ানেড়ী কথাটিও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী [মুণ্ডিত মুখ ও মস্তক]। কেবল রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্যে (তথা পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে) যারা সাধন ভজন আবদ্ধ রেখেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। আর যারা নির্বিচারে নানা রূপক ও প্রভাব গ্রহণ করেছে, তারাই বাউল। দুইয়ের পার্থক্য এ-ই।

বাউল :

বাউলদের জনশ্রুতিজাত ধারণা, স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধনপ্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক। রূপ, সনাতন, নিত্যানন্দ, জীব প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকগণের পরকীয়া সঙ্গিনী ছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং মুসলমান আউলচাঁদ রূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধনপ্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আউলচাঁদের পুত্র রাম শরণ, তাঁর পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে। সম্ভবত আউলচাঁদের শিষ্যা মাধববিবি এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র ও বীরচন্দ্র এই সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। আউলচাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত এবং কর্তাভজা মতের আদি গুরু বলে পরিচিত। বাউলেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। বাউলদের লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। তাই তারা কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। এজন্যেই পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনেকটা অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

না বললেও চলে যে 'রাধাকৃষ্ণ' নামের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার চৈতন্যদেবকে বাউল মতের উদ্ভাবকরূপে প্রচার করে তারা এই সাধনতত্ত্বকে শ্রদ্ধেয় করার এবং আভিজাত্য দানের প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া বা রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই হয়তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আউলচাঁদ। আর অপর শাখার প্রবর্তক ছিলেন মাধববিবি। এই শাখার বিস্তৃতি ঘটে সম্ভবত বীরভদ্রের চেষ্টায়। এটিরই লোক-প্রচলিত নাম 'বাউল সম্প্রদায়'। যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিলেন আর যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দুসমাজ ভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।

AMARBOI.COM

হিন্দুপ্রভাবে বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজমুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গনি, রসুল, রুহ, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধনাথ এবং নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরাণিক উপমা ও কুরআন হাদীসের বাণীর নানা ইঙ্গিত [যেমন বর্জখ]। অবশ্য বাউল রচনায় এসব শব্দ ও পরিভাষা তাদের মতানুগ অর্থান্তর তথা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও সুফী সাধনার সঙ্গে বাউল মতের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার করে যে-মিলন-ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক ও স্থায়ী করার জন্যে পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেরও এক সর্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় 'পরম তত্ত্ব' পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছে মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী), 'অচিন পাখী', মনুরা (মনোরায়, মনোরাজা) প্রভৃতি পরমাত্মা—আত্মারই পূর্ণাঙ্গরূপ। দেহস্থিত আত্মাকে কিংবা আত্মা সম্বলিত নরদেহকে যখন 'মানুষ' বলে অভিহিত করি, তখন পূর্ণাঙ্গ বা অখণ্ড আত্মা বা পরমাত্মাকে মানুষ বলতে বাধা কী?

বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদও ভোগমোক্ষবাদ। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ ও পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সুফীমত ও নানা লৌকিক-তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে বাউল মতে অসঙ্গতিও কম নেই। তবু বাউলদের উপর বৈষ্ণব মতের (চৈতন্য চরিতামৃতের মাধ্যমে) এবং সুফীমতের (কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে) প্রভাবই অত্যধিক। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সতেরো শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যভাগ থেকেই বাউল মতের উদ্ভব। গুরু, মৈথুন ও যোগ—তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউল মতে। তাই গুরু, বিন্দুধারণ ও দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বাউল গানে অত্যধিক। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউলমতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা হয়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই। বাউলের 'রসস্বরূপ' হচ্ছে সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এটিই অটলমানুষ তথা আত্মতত্ত্ব। এ হচ্ছে অরূপের কামনায় রূপসাগরে ডুব দেয়া, স্বভাব থেকে ভাবে উত্তরণ। সহজিয়াদের 'সহজ'ই সহজ মানুষ। মৈথুন মাধ্যমে বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চালনের সময়ে গঙ্গা (ইড়া) ও যমুনা (পিঙ্গলা) বেয়ে সরস্বতীতে (সুষুম্নায়) ত্রিবেণী (মিলন) ঘটাতে হয়। তারপর সেখান থেকে সহস্রায় (মস্তকস্থিত-সহস্রদল পদ্মে) যখন বিন্দু গিয়ে পড়ে, তখনই সৃষ্টি হয় মহাভাব বা সহজ অবস্থা। মুলাধারের রজঃকে ফুল, শক্রকে ক্ষীর ও নিঃসৃত রজঃকে নীর বলে। এই রজো-বীজে বা নীর-ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজ মানুষ। বৌদ্ধ মতে হেবজ্র (বজ্রসত্ত্ব) শুক্ররূপে নারী-যোনিতে বাস করেন। সহজিয়াদের মতেও 'ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষ্ণশক্তি' [বিবর্ত বিলাস—অকিঞ্চন দাস]। এজন্যে পুরুষ নারীরজ : এবং নারী পুরুষের শুক্র পান করে। সাধনার দ্বারা সহজ মানুষের বা মহাচৈতন্যের তথা আত্মার অবিমিশ্র সত্তাবোধ জাগাতে হয়। মৈথুন পদ্ধতিই রাগানুগ পদ্ধতি। চারিচন্দ্র হচ্ছে—মল, মূত্র, রজ : ও শুক্র। এসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। রস বলতেও উক্ত চারি পদার্থকে বোঝায়, আবার সাধারণভাবে প্রেম বা শৃঙ্গার রসও নির্দেশ করে। 'বাণ' পুরুষশক্তি এবং 'গুণ' প্রকৃতি-শক্তি।

বাউলদের মনের মানুষ, মনুরা, সহজমানুষ, অধরমানুষ, ভাবের মানুষ বা অলখ সাঁই-এর সঙ্গে আদিবুদ্ধ, আদিনাথ, বোধিচিত্ত ও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের মৌলিক ঐক্য রয়েছে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে হিন্দু-বাউলের অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন গুরুর মত বা নামানুসারে এরা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত, যথা কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বলরামী, শম্ভুচাঁদী প্রভৃতি। মুসলমান বাউলরা নেড়ার ফকির, আউল, সাঁই, সাহেব ধনী, হযরতী, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরুপন্থী সমাজে বিভক্ত। 'দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। এই ধারণা দেহতত্ত্বে আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে দেহের চর্যা ও দেহ-সম্বন্ধীয় তথ্য উদঘাটন আবশ্যিক হয়েছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের আমল থেকে দেহ ও সাধনা সম্বন্ধীয় যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছি। এতে দেহের বাম ও দক্ষিণের একটি স্থূল পরিচয় মিলবে :

দেহের দক্ষিণাংশে : রসনা, পিঙ্গলা, সূর্য, রবি, অগ্নি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, উপায়, যমুনা, রক্ত, পলিতা, সূক্ষ্ম, রেত :, ধর্ম, স্থির, পর, দ্যৌ, ভেদ, চিত্ত, বিদ্যা, রজ :, ভাব, পুরুষ, শিব, জিনপুর, নির্মাণকায়, গ্রাহ্য ও গগন।

দেহের বামাংশে : ললনা, ইড়া, চন্দ্র, শশী, সোম, আপান, ধমন, আলি, নাদ, প্রজ্ঞা, গঙ্গা, শুক্র, বলি, স্থুল, রজ:, অধম, অস্থির, অপর, পৃথিবী, অভেদ, অচিত্ত, অবিদ্যা, তামস, অভাব, প্রকৃতি, শক্তি, সম্ভোগকায় ও গ্রাহক।

অবশ্য এসব পরিভাষার সবগুলো বাউল সাধনায় ও বাউল রচনায় মিলবে না। কারণ কালে অনেকগুলোর গূঢ়ার্থের স্মৃতি লোকমানস থেকে মুছে গেছে। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের ও সাধন-প্রণালীর প্রভাবে পড়েছে বলে বাউল সাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এজন্যে মুসলমান বাউলদের মধ্যে পরকীয়া ও মৈথুনাত্মক সাধনা দুর্লক্ষ্য; তারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দেয়।

বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়। তাই পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

মানুষ নির্বিশেষকে এমন উদারদৃষ্টিতে দেখা যে-জীবনবোধের দ্বারা সম্ভব, তার উৎস যে-ধর্মমত বা মরমিয়াবাদ তা কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। মুসলমান বাউলের হিন্দুগুরু, হিন্দু বাউলের মুসলমানগুরু এমন প্রায়ই দেখা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে মুসলমান বাউলেরা আধা-মুসলমান। এরাই বাঙলা দেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সূফী-দরবেশরা তাদের এমনি আধা-মুসলমান করে না রাখলে, সরাসরি শরীয়তী ইসলাম প্রচারে এত লোককে দীক্ষিত করা যেত না হয়তো। আগে নামত মুসলমান সমাজভুক্ত ছিল বলেই উনিশ-বিশ শতকে তাদের অধিকাংশকে সহজেই পুরো মুসলমান করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে বাঙলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফরায়েজী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ-বিশ শতকে শরীয়তী ইসলামে ফিরে এসেছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল-সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে। নইলে বাঙলার বিশেষ করে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের, এককথায় পদ্মার ওপারের নিম্নশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে বাউলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

বাউলধর্মে বৈরাগ্য নেই। বাউলেরা মুখ্যত তাত্ত্বিক, গৌণত প্রেমিক। এই তাত্ত্বিকতা অনেককেই বিষয়ে অনাসক্ত রাখে। তাই বাউল দুই প্রকার : গৃহী (বিষয়ী গৃহী) ও বৈরাগী (অনাসক্ত গৃহী)। বাউল বৈরাগীরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালির মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালির জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্যে বাঙালিকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলত।

'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। নামটি বাউলদের স্বপ্রদত্ত নয়। পনেরো শতকের শেষপাদের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এবং ষোলো শতকের শেষপাদের চৈতন্যচরিতামৃতে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের আদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের কাছে প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের একটি হেঁয়ালিতেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখেছি। রাঢ় অঞ্চলে এখনো বাউলকে 'ক্ষেপা' বলে। কেউ বলেন 'বাউর' (এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল) থেকেই 'বাউল' নামটির উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য উত্তরভারতের 'বাউরা'র সঙ্গে আমাদের 'বাউল'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবু 'আকুল' থেকে 'আউল' এবং ব্যাকুল থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেন—এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা বাজিয়েদেরকে লোকে 'বাতুল' বলে উপহাস করত। এ 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' নামের উদ্ভব। কারুর কারুর মতে 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'স্বার্থে ল' যুক্ত হয়ে, বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা সাধনাকারী অর্থে বাউল শব্দ তৈরি হয়েছে। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বাউল' শব্দটি 'আউল' শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, 'আউল' আরবি 'আউলিয়া' (ওলির বহুবচন) সম্ভূত। ডক্টর সৈয়দ আবদুল হালিমের মতে 'আউল' শব্দটি 'আউয়াল' শব্দজ। আগমের আরবি পরিভাষা হিসেবে 'আউয়াল' শব্দটি গ্রহণ করে মুসলমান আগমতাত্ত্বিকেরা আউয়াল বা 'আউল' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য 'আগম'-এর আরবি পরিভাষা 'আউয়াল'-এর 'আউল' রূপে বহুল প্রয়োগ বাউল গানে দেখা যায়। উপরোক্ত এ কয়টি ব্যাখ্যার কোনটাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' থেকেই 'বাউল' নামের উদ্ভব বলে অনুমান করি। আমাদের এ অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উঁচুস্তরে বাউলেরা কোনো কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পায়নি। তাই মনে হয়, ব্যাকুল (ভাবোন্মত্ত) কিংবা 'বাতুল' (অপদার্থ) অর্থে উপহাসস্থলে তাদের এই নামকরণ হচ্ছে। আর 'আউয়াল' থেকে আউল শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না। আবার বাউল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নামটিও আউলচাঁদ। হয়তো আউয়ালবাদী (আগম-বাদী) বলেই তাঁর নাম আউল চাঁদ। কিংবা গোড়ার দিকে আউল চাঁদের অনুসারীরাই ছিল 'আউল' নামে পরিচিত।

সম্প্রতি অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্য' নামের প্রবন্ধে[৩৮] 'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেছেন। তিনি অবহট্ট রচনায় ও চর্যাগীতিতে[৩৯] ব্যবহৃত বাজিল, বাজুল, বাজির, বজ্জিল শব্দগুলোকে বাউল শব্দের পূর্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বজ্রী > বজ্জির > বাজির / বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ যদি 'বজ্রকূল' নামে অভিহিত হত বলে অনুমান করা সম্ভব হয়, তাহলে 'বজ্রকুল' থেকে 'বাউল' হওয়া আরো সহজ। যেমন বজ্রকুল > বজ্জউল > বাজুল > বাউল। যা হোক, বাউল যে বজ্রযানী নির্দেশক, সে সম্পর্কে আমাদেরকে নিঃসংশয় করার গৌরব অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রাপ্য।

বাউল গান তাত্ত্বিক রচনা—তত্ত্বসাহিত্য। স্বল্পশিক্ষিত লোকের রচনা বলে এগুলো লোক-সাহিত্যের উপর উঠতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন আঙ্গিক সৌষ্ঠবে, ভাবের সুষম অভিব্যক্তিতে, কাব্যরসে, শিল্পসৌন্দর্যে, ছন্দলালিত্যে ও সুচিত শব্দ-সম্পদে উৎকৃষ্ট কবিতার লাবণ্য লাভ করেছে, বাউল গান তেমন নয়। আঙ্গিকে, ছন্দে ও অভিব্যক্তির অসঙ্গতিতে ও শিল্পরুচির অভাবে এসব রচনা কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিশেষ করে লালন, পাঞ্জ, হাউরে, মদন, যাদুবিন্দু প্রভৃতি কয়েকজনের রচনায় কাব্য-মাধুর্য দুর্লভ নয়। সাহিত্য হিসেবে বিচার করলে বাউল গান লালিত্য-বিরল লোকগীতিমাত্র, আর কিছু নয়। সুরের একঘেয়েমিও তত্ত্ব-বিমুখ শ্রোতার পক্ষে পীড়াদায়ক। বাউল গানের কদর আছে ভাবুক ও তত্ত্বপ্রিয় লোকের কাছে এবং তা গান হিসেবে নয়—তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবে। বাউলেরা গানকে তত্ত্বপ্রচারের, ভজনের ও আত্মবোধনের কাজে লাগায়। গানের প্রথম চরণেই সাধারণত মূল বক্তব্যের আভাস মেলে এবং তার সৌন্দর্যও অবশ্য স্বীকার্য।

সব গুহ্য সাধনাই যোগ-নির্ভর। তাই এখানে যৌগিক সাধন প্রণালীর স্থূল পরিচয় দেয়া হল : দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ি। তার মধ্যে তিনটে প্রধান—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ; বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এ তিনটিকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতোস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র রজ:, নীর-ক্ষীর-রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ুচালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।

আবার শুক্র, রজ: ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত—জীবনীশক্তি ও বিনাশ-বীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস, কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রণ করলে গোটা দেহের উপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়িতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতাই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম।

ললাট-দেশে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি রজ:বিষ বা কামবিষের প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দলাভ করাই সাধ্য।

এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। এখন যে-শুক্রের স্খলনে নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়িমাধ্যমে ঊর্ধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি সংরক্ষিত হয়। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।

যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক সর্পস্বরূপ মনে করা হয়েছে। কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই কুণ্ডলিনী নাম পেয়েছে। এর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে কাম বিষ। কাম বিষ-রূপ সৃষ্টিশীল শুক্র স্খলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনীশক্তি। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করা দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের বিনাশ নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ির মাধ্যমে উর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট-দেশে সঞ্চিত করে রাখলেই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। এটিই সামরস্য, সহজাবস্থা, চিররমণানন্দাবস্থা বা সচ্চিদান্দাবস্থা—শিব-শক্তি, প্রজ্ঞা-উপায় বা রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় সংস্থিতি। এটিই সিদ্ধি। আজকের যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে একপ্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, আর তাতেই তারা হয়তো মনে করে যে তারা অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।

সাধনার তিনটে স্তর : ১. প্রবর্ত, ২. সাধক ও ৩. সিদ্ধি।

১. প্রবর্তাবস্থায় যোগী সুষুম্নামুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃতধারায় স্নাত হয়।

২. শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে তথা বিন্দুধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নামুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃত ধারার স্নান।

৩. এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়িপথে শুক্র ইচ্ছামতো চালু রেখে অজরামরবৎ বোধগত সামরস্যজাত পরমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যমৃত পারাবারে স্নান। এতে স্থূল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাব স্বরূপ শৃঙ্গারানন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধভাণ্ড শৃঙ্গার-রূপ মথনদণ্ড সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা যায়। এর ফলে জরা-গ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজমান থাকে।

AMARBOI.COM

তথ্যপঞ্জি

১. ক. Golden Bough : James Frazer
খ. Ancient Society : H. L. Morgan
গ. লোকায়তদর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৪, ২৮২-৮৩।
ঘ. জাতিভেদ—ক্ষতিমোহন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৯৮-১০৭।
২. Ancient Symbol worship : H. M. Westropp. PP. 23-29.
৩. লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা ১০১, ১১৩-১৪, ১১৭-৩৪।
৪. The Mothers : R. Briffault Vol. III PP 54,57.
৫. Golden Bough (as Quoted in Lokayata Darshan P 119)
৬. Studies in Ancient Greek Society : P 151.
৭. লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৭৯।
৮. মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৭২ ঃ ৪৩-৪৪ (রমাপ্রসাদচন্দের Indo-Aryon Races)
৯. ক. শাক্ত সাহিত্য—ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ২৫।
খ. Indo-Aryan Races : R. P. Chanda P 131.
১০. Mohenjodaro and the Indus Civilization : J. Marshall Vol. I, P 52.
১১. ক. শাক্ত সাহিত্য : পৃষ্ঠা ৪০।
খ. Mother Goddess : S. K. Diksit.
১২. The Mothers : Vol III, P 2.
১৩. Studies in Ancient Greek Society : PP 41-42.
১৪. ক. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩০৮-৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. Encyclopedea of Religion and Ethics; Vol I, P. 227.

১৫. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩৭৬-৮০

১৬. The Aryans; Gordon Childe.

১৭. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ১০২-২১, ৬৪৬, পাদটীকা নং ২৫।

১৮. লোকায়তদর্শন-ধৃত অনুবাদ।

১৯ ক. Iconography of Hindu India : T. Gopinath Rao.

খ. বৃহৎতন্ত্রসার

গ. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩৩৪-৪০, ৩৭৯-৪১৫।

২০. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩২২-২৪।

২১. ঐ পৃষ্ঠা ৩২২-২৪।

২২. ক. Golden Bough; পৃষ্ঠা ১৩৮।

খ. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৪৭৯।

২৩. Golden Bough; পৃষ্ঠা ১৩৮।

দুই

১. History of Indian Philosophy; PP 81, 451-52.

২. Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Metaphysics, P. 8.

৩. Philosophy of the India (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫১৩-১৪)

৪. ক. রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪-৮৩।

খ. বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃষ্ঠা ১৮৬।

৫. বৌদ্ধধর্ম : পৃষ্ঠা ৩৭।

৬. The Obscure Religious cults as background for Bengali Literature, Dr. S. D. sgupta. P. 27.

৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৭।

৮. শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১২-১৩।

৯. লোকায়তদর্শন, পৃষ্ঠা ৫৩৯, ৪৫০।

১০. বিষ্ণুপুরাণ, ছান্দোগ্য ও মৈত্রেয়ী উপনিষদ।

১১. History of Indian Philosophy —Dr. S. N. Dasgupta. Vol. III, P. 257

তিন

১. Imperial Gazetteer of India. Vol. IV. PP 174, 176, 183.

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

৩. ঐ পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮, ৯০-৯১।

৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৩।

৫. ঐ পৃষ্ঠা ৭।

৬. ঐ পৃষ্ঠা ৯।

৭. ঐ পৃষ্ঠা ১০।

৮. ঐ পৃষ্ঠা ১০।

৯. ঐ পৃষ্ঠা ৯।

১০. ঐ পৃষ্ঠা ১৭।

১১. Indo-Aryan and Hindi PP. 31-32

১২. বৃহদারণ্যক ১/৪/১০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭।
১৪. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।
১৫. শ্বেতাশ্বতর ২/৬/৭।
১৬. ঐ ২/১৫।
১৭. কঠোপনিষদ ৬/৩।
১৮. বৃহদারণ্যক : স বা ইয়মাত্মা ব্রহ্ম। ৪/৪/৫ : ৩/৭/১৫
১৯. ছান্দোগ্য; ৬/৮/৭।
২০. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; প্রথম খণ্ড পাদটীকা সং ২০, পৃষ্ঠা ১০৭।
২১. ঐ পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।
২২. ঐ পৃষ্ঠা ৮২।
২৩. ঐ পৃষ্ঠা ৮৬।
২৪. ঐ পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯।
২৫. Encyclopedea of Religion and Ethics—Puranas.
২৬. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২৭।
২৭. History of Indian Literature : Winternitz, P. 545.
২৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; পৃষ্ঠা ১৩২।
২৯. ঐ পৃষ্ঠা ১৪৫-৪৬।
৩০. ঐ পৃষ্ঠা ১৪৮।
৩১. ঐ পৃষ্ঠা১৫৩।
৩২. ঐ পৃষ্ঠা ১৭০।
৩৩. ঐ পৃষ্ঠা ১৭১-৭২।
৩৪. ঐ পৃষ্ঠা ২৯৪।
৩৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩১১।
৩৬. ক. মানবগৃহ্য সূত্র।
খ. যজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,
গ. অথর্ব-শির: উপনিষদ
ঘ. Vaisnavism, Saivism and Minor Religious systems—R. G. Bhandarkar.
ঙ. শিক্ষা ও সভ্যতা : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪।
৩৭. জাতিভেদ; ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৬৪।
৩৮. Religion and Folk-lore of Northern India, P. 250.
৩৯. ঋগ্বেদ : ২/২৩/১।
৪০. ক. Elements of Hindu Iconography Vol. I, Pt. I, T. Gopinanth Rao.
খ. Vaisnavism, Saivism etc. R. G. Bhandarkar, P. 213.

চার

১. Encyclopedea of Religion of Ethics Vol XII, P 193.
২. Vaisnavism etc : P 146
৩. Post Chaitanya Sahajia Cult of Bengal, M. M. Bose, P 42.
৪. ক. রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪।
খ. গৌড়পাদসাংখ্যকারিকা ভাষ্য। পৃষ্ঠা ২১।
৫. ভারত দর্শনসার—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৪৯।
৬. Encyclopedea of Religion and Ethics, Vol. IV, P 149 (লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. a. Mohenjodaro and the Indus Civilization : J. Marshall Vol. I, P 50.
b. The Mother Goddess. S. K. Diksit
c. ভারতের সংস্কৃতি : ক্ষিতিমোহন সেন, পৃষ্ঠা ১১।
৮. লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা ৪৬৭।
৯. রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪।
১০. ঐ পৃষ্ঠা ২৮৪।
১১. শাক্ত সাহিত্য ,পৃষ্ঠা ১১-১২।
১২. রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যো : পৃষ্ঠা ৩২৫।
১৩. ঐ পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬।
১৪. Obscure Religious cult etc P 134.
১৫. বৌদ্ধধর্ম, পৃষ্ঠা ৬৯।
১৬. Obscure Religious cult etc PP 115-16, 120.
১৭. History of Indian Philosophy : Dr. S. N. Dasgupta, Vol. III P 533.
১৮. Journal of Asiatic Society of Bengal (Science), Vol. XIX 1953, (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১১৭-১৮)
১৯. Lokayata, P 6.
২০. The Holi : A Vernel Festival of the Hindus (in Folklor XXV) (লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৯।
২১. Studies in the Tantras : Dr. P. C. Bagchi, P 102.
২২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ—চৈত্র, ১৩৬২ সন, পৃষ্ঠা ২০২।
২৩. উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা ৬।
২৪. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫—২৬।
২৫. বাংলার বাউল ও বাউলগান—ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮।
২৬. শূদ্র সম্বন্ধে মনুসংহিতার পাঁতি হচ্ছে

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ
পুলকাশ্চৈব ধ্যান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদা।

ঋষি গৌতমও বলেছেন : জীর্ণান্যুপানচ্ছত্র বাসা :
—কুর্চান্যুচ্ছিষ্টাশনং।

২৭. প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালি।
২৯. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃষ্ঠা ৪৪৯-৫০।
৩০. ক. সেকোদ্দেশ টীকা। পৃষ্ঠা ২৭। (বাংলার বাউল ও বাউলগানে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৫)
খ. Tantric Buddhism, PP 165—66.
৩১. ক. ibid PP 169—74.
খ. Studies in Tantras, P 69
৩২. An Introduction to Buddhist Esoterism, P 48.
৩৩. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৬১।
৩৪. ক. বিমল প্রভা (বরোদা সংস্করণ)
খ. বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : প্রবোধচন্দ্র বাগচী : পৃষ্ঠা ৪৬ (বাংলার বাউল ও বাউল গানে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫)
৩৫. Indo Aryan and Hindi, P 44.
৩৬. ক. বৌদ্ধগান ও দোহা : ভূমিকা : ১৬।
খ. Religion — P.C. Bagchi, History of Bengal, Vol I, D. U. P423.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. শূন্যপুরাণ : চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবেশক : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩-৭।

ঘ. Sanskrit Literature : Dr. S. K. De. History of Bengal Vol. I, D. U. P 338-39.

৩৭. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—দর্শন ও সাধন প্রণালী : পৃষ্ঠা ১৮৮—৯১, ১৫৬।

৩৮. বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা—এস. এম. লুৎফর রহমান, সাহিত্য পত্রিকা, শীতসংখ্যা, ১৩৭৬ সন, পৃ. ৯৩-১৩৭।

৩৯. ক. বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ—ভাদেপাদ।

খ. নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী—বীণাপাদ।

গ. সো বাজির নাহুরে মযি বুত্ত পবমখো—কানুপার দোহাকোষ।

ঘ. জোইনি গাঢ়ালিঙ্গণ হি বজ্জিল লহ্‌ উপসন্ন। —সরহের দোহাকোষ। [অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রবন্ধে উদ্ধৃত]

বিভিন্ন তান্ত্রিকতত্ত্ব ও পদ্ধতির পরিচয়দানের জন্যে আমরা কোনো একটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিনি। হাড়মালা, সাধনমালা, কৌলজ্ঞান, নির্ণয়, বৃহৎ তন্ত্রসার (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পাদিত), Studies in the Tantras by P. C. Bagchi, Introduction to Tantric Buddhism by Dr. S. B. Dasgupta, বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাঙালির ইতিহাস : ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, নাথধর্ম ও সাহিত্য : প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী : ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, সহজসাধনা : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, বিবর্তবিলাস : অকিঞ্চন দাস প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার সহায়ক হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলায় সূফী প্রভাব

১

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে সূফী-দরবেশ এসেছিলেন কী না, ইতিহাস তা বলতে পারে না।[১] তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলীফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি[২] ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং 'হূদুদুল আলম' গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে[৩] স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আটশতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য 'Periplus in the Erythrean Sea'-র আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রীস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব।

চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরের কয়েক মাস থেকে যেত। সে-সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্পর্ক পাতিয়েছিল কি-না জানা নেই। তবে পরবর্তীকালের পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবনযাপন রীতির কথা স্মরণ রাখলে, এ সম্পর্কও অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালি মুসলমানেরা বার্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জোরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছুটা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে, ময়নামতীতে, কিংবা কামরূপে যাতায়াতও ছিল কি-না বলা যাবে না। কেননা, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গী কেউ ইসলামপ্রচারে আগ্রহী হয়নি এমন কথা ভাবব কেন? আমাদের মনে হয়, তখনো মুসলিম সমাজে সূফীমতবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তি বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যাঁরা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দরবেশ না হলে তথা কেরামতির আভাস না পেলে অজ্ঞলোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতি রক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর (?) মতো সূফীরা এসেও থাকেন তাহলেও মুসলিম-বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না।

সূফীমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাকেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।[৪]

কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত বাঙলাদেশে তার আগেই বহু সূফীর আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর সাগরেদ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর নিকট লিখিত পত্রে আছে :[৫]

---

১ সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষাসংখ্যা, ১৩৭০, বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ : ড. আব্দুল করিম, পৃ. ৯২-১০২।

২ ক. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম—ডক্টর এনামুল হক পৃ. ১২।
   খ. Memories of the Archaeological Survey of India. —K. N. Diksit P. 87.
   গ. F. A. Khan, Pakistan quarterly (মাহেনও, মার্চ ১৯৬৪ সন)

৩ History of India etc. Elliot & Dawson Vol. I P.2.

৪ Akbar-Al-Akhyar : P. 166.

৫ Bengal : Past & Present : Vol. LXVII, SL. No. 130, 1948, PP 35-36.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

God be praised ! What a good land is that Bengal where numerous saints and asceties came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon, followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying burried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh Ahmed Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharfuddin Maneri is lying burried at Sonargaon. And then there was Hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number."

এতে বোঝা যায়, যে চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে সূফীপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহ্‌র খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদম শহীদ।[৬] বিক্রমপুরস্থিত রামপালের এই আদম শহীদ বিক্রমপুরের এক সেন রাজা বল্লালের সমসাময়িক। অনন্দভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবন চরিত[৭] —লক্ষণসেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লালসেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুম্বা' সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৮] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[৯] বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ইশ্-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং বদর-মোকান খ্যাত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচপীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ।[১০]

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'শেকশুভোদয়া'র সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ একে জাল

---

৬ JASB, 1889 Vol. LVII P. 12 FF

৭ JASB, 1896 (N.N. Basu) PP. 36-37

৮ Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A. D.—Dr. A. Karim P. 87.

৯ JASB, 1896 PP. 36-37.

১০ ক. বঙ্গে সূফীপ্রভাব : পৃ. ১৩২-৩৩।
খ. District gazetteers—Chittagong, 1908, P. 56
Dinajpur, 1912, P. 20.
গ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য; পৃ. ২৩।
ঘ. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম
ঙ. মকবুল হোসেন, লায়লী মজনু।
চ. Buddur Mokam (M. S. Khan) JASP, 1962.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেন।[১১] এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রীস্টাব্দের পর বেঁচে থাকেন, তাহলে শেখ শুভোদয়া তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে ভাষার বিকৃতি ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাস-বিরল সে-যুগে গ্রন্থকার হিসেবে হলায়ূধ মিশ্রের ও শাসকরূপে লক্ষ্মণ সেনের নাম জড়িয়ে, আর্যা প্রভৃতির প্রাচীনরূপ রক্ষা করে ষোলো-সতেরো শতকে জালগ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। শেখ শুভোদয়া সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে তথা বাঙলায় বাস করতেন। 'অমৃতকুণ্ড' তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরাই মাহাত্ম্য-মুগ্ধ হলায়ূধ মিশ্র তাঁর কৃতিকথা বর্ণনা করেছেন শেখ শুভোদয়ায় (শেখের শুভ উদয়)[১২]। আবদুর রহমান চিশতির মতে[১৩] জালালউদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবুল কাশেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী। তিনি শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরওয়ার্দীর সাগরেদ ছিলেন।[১৪] তিনি কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া, নিযামুদ্দীন মুগরা ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লী এলে তাঁকে সুলতান ইলতুৎমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙলায় আসেননি। কেউ কেউ আবার শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালউদ্দীন বহুল আলোচিত সূফী।[১৫] ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সূফীর দরগাহ্ আছে। ইনি ৪৪৫ হিজরি বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালে দলিলসূত্রে দাবী করা হয়।[১৬] এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetter-এ উল্লেখ আছে।[১৭] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] অতএব, উক্ত কোচ রাজা

---

১১ ক. Memories of gaud and pandua, A. A. Khan & Stapleton P.P. 105-6
খ. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ—সুকুমার সেন।
গ. শেখ শুভোদয়া—সুকুমার সেন।

১২ ক. Ain-I-Akbari : Vol. II
খ. Akbar-Al-Akhyar : P. 44
গ. Khazinat-al-Asfiya : Vol. I P.P. 278 ff.
ঘ. Social History of Bengal : Dr. A. Rahim
ঙ Social History of Muslims in Bengal down to 1538 A. D.—Dr. A. Karim PP. 91-96

১৩ Mirat-Al-Asrar, D. U. Ms. No 16/AR/143/folio 19

১৪ Akhbar-al-Akhya'r : PP 44-45.

১৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির অতিরিক্ত :
ক. Khurshidi-Jahan-Numa -Ilahi Buksh, JASB 1895
খ. Sufism and its Saints etc. J.A. Sobhan P 331.
গ. Ta'dhkira't-I-Auliya'-Hind P. 56 : Mirza Muhammad Aktar Dehlavi
ঘ. বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ৯৬
ঙ Afdalul Fawa'd—Amir Khasru : P. 47
চ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) —সুখময় মুখোপাধ্যায়

১৬ বঙ্গে সূফীপ্রভাব (১৯৩৫) পৃ. ১৩৮

১৭ District gazetteer, Mymensingh : 1917, P 152

১৮ History of Assam 1926, E. Gait P. 46 ff.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মুখদুম শাহ্ দৌলা শহীদের দরগাহ্।[১৯] ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[২০] অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী ওর্ফে শাহরাহী পীরের দরগাহ্ রয়েছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রম কেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ্ সুলতান মাহি-আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হি. ১৬৮৫-৮৬) মিলে।[২১] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল, তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[২২] ইনি সম্ভবত চৌদ্দশতকের লোক। মনে হয় মাহি-আসোয়ার (মৎস্যাকৃতি নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দশতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগীজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ্ জালাউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দশতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[২৩] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মুলক্ শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহীয়া ও তাঁর উস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ সোনারগাঁয়ে (১২১০-৩৬, বা ১২৭০-৭১, কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে)[২৪] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান-বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কী না বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দীন শাহ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[২৫] ইনিই সম্ভবত শূন্য পুরাণোক্ত 'নিরঞ্জনের রুস্মার' দম মাদার। এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী, মাদার শাহ্ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশ তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সূফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর এনামুল হক মনে করেন।[২৬]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওর্ফে জালালউদ্দীন সুর্‌কপুশ্ (Surkpush) নামে এক দরবেশ বাঙলায় এসেছিলেন। জাহানগ্সতের মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উছে (Uchh) তাঁর সমাধি আছে।[২৭]

---

১৯ District Gazetteer, Pabna : 1923, P. 121-26

২০ Sufism and its Saints etc. J. A. Sobhan P 236

২১ ক. District Gazetteer, Bogra 1910, PP 154-55
   খ. JASB, 1878, PP 92-93

২২ বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৪০-৪১

২৩ Ibn Battuta : Gibb.

২৪ ক. Hadith literature in India. Dr. M. Ishaque PP 53-54.
   খ. Islamic Culture Vol. XXVII No. 1 Jan. 1953 P 10. Note 9.
   গ. Social History of the Muslims in Bengal—Dr. A. Karim PP 67-72.

২৫ Mirat-i-Madari by Abdur Rahman Chisti A. H. 1064, MS. D.U. No. 217 [ডক্টর করিমের Social History-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৩]

২৬ বঙ্গে সূফীপ্রভাব, পৃ. ১১২-১৩

২৭ ক. Memories of Gaud and Pandua P 92.
   খ. Sufism and its Saints etc. —J. A. Sobhan (1938) PP. 236-37.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলাদেশে চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশ্‌তিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাহ্', তাঁর পুত্র নূর কুতুব-ই-আলমের সাগরেদরা নূরী[২৮] এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সূফীরা 'হোসেনী' নামে পরিচিত ছিল।[২৯] শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষযুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ-বিন-ওলীদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হতেন। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-ই-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নূর কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ ওর্ফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৩০]

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম সর্কীর সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানী ইব্রাহীম সর্কীকে লিখিত এক পত্রে বদর আলম ও বদর আলম জাহিদী নামে দুইজন সূফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ কিছু সোহরাওয়ার্দীয়া ও রুহানিয়া সূফীকে হত্যা করেন। "Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrawardia and Ruhania saints of the part, of that in near future that kingdom of Islam will be free from the hands of the luckless nonbelievers.[৩১]

শেখ বদরুল ইসলাম নূর কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। 'রিয়াজুস-সালতিন'[৩২]-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ : রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।

এঁরা ছাড়া শাহ্ সফিউদ্দীন, জাফর খান গাজী[৩৩] খাঁ জাহান আলী, শাহ্ আনোয়ার কুলি হালবী[৩৪], ইসমাইল গাজী[৩৫], মোল্লা আতা[৩৬], শাহ্ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬

---

২৮ Bengal Past & Present —Prof S. Hasan Askari' 1948 P. 36 note 13.

২৯ Social History of Bengal, —Dr, A. Rahim P 72.

৩০ Riyad-as-Salatin—Abdus Salam P. 115-16

৩১ Bengal Past & Present (1948, PP 36-37)

৩২ Riyad-As Salatin, P. 110-11

৩৩ District Gazetteer : Hoogly P. 297 ff. PP. 302-03

৩৪ District Gazetteer : Hoogly P. 297 ff. PP. 302-03

৩৫ ক. JASB, 1874, P 215 ff.
খ. Risalat-al-Shuhda.
গ. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা–ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ১৩৬৭ সন।

৩৬ JASB, 1872 PP 106-07, 1873 P, 290.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রী.)[৩৭] , শাহ মোয়াজ্জম দানেশমন্দ ওর্ফে মৌলানা শাহ্ দৌলা (রাজশাহী : বাঘা)[৩৮] , শাহ আলী বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরিদউদ্দীন শাহ্, লঙ্গর শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি[৩৯] প্রভৃতি দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালুদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রী.), মখদুম জাহানিয়া (১৩০৭-৮৩) ও শাহজালাল কুনিয়াঈ (মৃত্যু ১৩৪৬) সোহরাওয়ার্দীয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদউদ্দিন শখরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নুর কুতুব-ই-আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।

শাহ্ সফীউদ্দিন (মৃত্যু ১২৯০-৯৫ ?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন।

শাহ্ আল্লাহ্ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশমন্দ নকশবন্দিয়া সূফী ছিলেন।[৪০] ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ্ সুলতান বল্‌খী (বায়জিদ ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলাম, কাতাল পীর, শাহ মসন্দর বা মোহসেন আউলিয়া, শাহপীর, শাহচাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকূলের পীর শরফউদ্দীন থেকে সদরজাঁহা আবদুল ওহাব ওর্ফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পীর প্রখ্যাত।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্, সিকান্দর শাহ্, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু), রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ প্রমুখের দরবেশ ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নুর কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলী খাঁ, খান জাহান খান প্রমুখ সূফীরা রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতি দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।

AMARBOI.COM

২

মুসলমানদের বিশ্বাস : হযরত মুহম্মদ হজরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। হাসান, হোসেন, খাজা কামীল বিন জয়ীদ ও হাসান বসোরী সে-জ্ঞান আলী থেকে প্রাপ্ত হন। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসোরী (মৃ. ৭২৮ খ্রী.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহম (মৃ. ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দাউদ তায়ী (মৃ ৭৮১), মারুফ করখী (মৃ ৮৫) প্রমুখই সূফী মতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সূফী জুননুন মিশরী (মৃ. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। "আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ। আমরা তার (মানুষেরা) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে (রয়েছি)।"[৪১]—এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত বিশ্বব্রহ্ম বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের

---

৩৭ ক. Akhbar-Al Akhy'ar : P .173.
খ. Ka'zinat-al-Asfi'ya Vol. I P 399.

৩৮ JASB, 1904 No. 2. P. 108 ff

৩৯ বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ১৪৩-৪৪।

৪০ ক. Riyad-as-Salatin—Abdus Salam, PP 115-70.
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ৯৩-১১৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে এগিয়ে যায়। জিকর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরানের অপর এক আয়াতে—"অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর। কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র।"[৪১]

সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা 'ইরফান' কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সূফীদের বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহউস্ত' (সবই আল্লাহ্) বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মতত্ত্ব। এই হল তৌহিদ-ই-ওজুদী তথা আল্লাহ্ সর্ব ভূতে বিরাজমান—এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন।

বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খয়ের খোরাসানী (মৃত্যু ১০৪৯ খ্রী.) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। শরীয়তপন্থ বিরোধী এসব সূফীদের অনেককেই নতুন মত পোষণ ও প্রচারের জন্যে প্রাণ হারাতে হয়। মনসুর হল্লাজ, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ্ প্রমুখ এভাবেই শহীদ হন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন—'ভারতে সূফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে, সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপর্বের সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট চাপ দেখিতে পাই।' তাঁর মতে এ প্রভাব পড়ে ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে ও ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে। এবং আলবিরুনীর অনুবাদ, পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্য তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ। বায়জিদ বোস্তমীর ভারতীয় (সিন্ধু দেশীয়) গুরু বুআলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি আরও বলেন, '(বাঙলা) দেশে সূফীমত প্রচার ও বঙ্গে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগ সাধন প্রভৃতি পন্থা, বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বাঙলার সূফী মতবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফীমতবাদ ও সাধনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে থাকে।

...... "চিশতীয়হ্ ও সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা, ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে আগমনের পর, এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারতবিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০ খ্রী.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও সূফীদের 'তস্ববফ' বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের আর ভারতীয়েরা সূফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন।"[৪২]

আইন-ই-আকবরীতে[৪৩] চৌদ্দটি সূফী খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে। আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন এক এক পীর-কেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে উঠার ফলে সম্প্রদায়-সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে। আর অপ্রধানগুলো কালে লোপ পায়, অথবা স্থানিক সীমা অতিক্রমণের যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল কথিত চৌদ্দটি খান্দানের অনেকগুলোই লোপ পেয়েছে।

●

---

৪১ কোরান, সুরাহ্ ২৪/ আয়াত ২৫
ঐ ৫০/ ঐ ১৬।
ঐ ৮৮/ঐ ১৬।

৪২ বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ৭৪-৮০. ৩৮, ৪৫।

৪৩ Ain-i-Akbari—Jarret, Vol. III PP 360 ff.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিশতিয়া ও সুহরওয়ার্দিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।[৪৪] এরপরে নক্‌শবন্দিয়া এবং আরও পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোলো শতক অবধি চিশতিয়া, মদারিয়া ও কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্নরূপ নিল। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবীরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন-বিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পর 'মুজদ্দদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী' আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে উঠে। কিন্তু সে-সংস্কার আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারেনি। নকশবন্দিয়া এবং কিছুটা কাদিরিয়া সম্প্রদায়েই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফসানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া।

বাঙলায় এ আন্দোলন দেশী তত্ত্ব চিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহির্বয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করি।

ভারতীয় যোগ-চর্যা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয় নামত। কেননা আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামী রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন : নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনীশক্তি হল নকশাবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড় পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোক-কেন্দ্র। এঁদেরও অবলম্বন হল দেহ চর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে উঠে। এ ইচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয়সত্তা-এর সঙ্গে 'সামরস্য' জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৪৫]

সূফীর জিকির ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল। বর্হিভারতিক বৌদ্ধ-প্রভাবে (ইরানে, সমরখন্দে, বোখারায় বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও যোগতান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতি বশে সূফী সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সূফী মাত্রই তাই পীর-মুর্শিদ-নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর পূজারও (দরগাহ্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর 'স্তূপ' পূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল। সূফীরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ায় অবস্থার উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা-ফিশ্-শেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানা ফিল্লাহ্'। প্রথমটি 'রাবিতা' (গুরুসংযোগ), দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ্' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 'মুরাকিবায়' যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চতুরঙ্গ যোগ পদ্ধতি থেকেই পাওয়া। পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), 'হালকা' (ভাবাবেগে নর্তন), দা'রা (আল্লার নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি), সাকী, ইশ্‌ক প্রভৃতি খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।[৪৬]

সূফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণ শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধান বশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, "তাহারা ক্রিয়াকলাপে আচার ব্যবহারে, ভাষায় ও

---

৪৪ বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ৫৫।

৪৫ ক. Develoment of Metaphysics in persia—Dr. M. Iqbal PP 110 - 11

খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ৮১। [এই গ্রন্থে উদ্ধৃত : এরশাদ-ই-খালিক্বীয়হ্—আবদুল করিম, ২য় সং, পৃ. ১২৫-৩৩]

৪৬ ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ১৬৯-৮২।

খ. মুসলিম কবির পদ সাহিত্য : ভূমিকা—আহমদ শরীফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায় প্রায় পুরোপুরি বাঙালিই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে পুরোপুরি বর্জন করিতে পারিল না।"

দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল—"তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগও দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন। .... এখনও পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গীয় 'শয়খ' শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দু ভাব, চিন্তা ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন (রয়েছে)। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত যত হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।"[৪৭]

AMARBOI.COM

৪৭ বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ১৬৩-৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কার-সততা-সাহিত্য-প্রজ্ঞা-শিক্ষা

সংস্কার

ধর্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তা এমন একটি সংবিধান, যা বুদ্ধিমানের দ্বারা প্রবর্তিত আর নির্বোধ দ্বারা অনুসৃত। এ এমন একটা idea দেয়, এমন একটা চেতনা দান করে ;যা শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে—প্রত্যয়ের ও প্রথার; বিশ্বাসের ও ভরসার, স্বস্তির ও সংস্কারের এক অক্ষয় পাথুরে কেল্লা নির্মাণ করে। সামুক-কূর্মের দেহাধারের মতোই এটি মানুষের সংস্কারার্জিত চেতনাকে সারাজীবন সযত্নে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

ফলে অতিক্রান্ত কৈশোরে মানুষ যা-কিছু দেখে বা শুনে, তা ঐ কেল্লার বাইরে মরিচার মতো, ধূলিস্তরের মতো কিংবা আবরণ-আভরণের মতোই সংলগ্ন থাকে মাত্র, চেতনায় সমন্বিত হয় না। এজন্যেই অর্জিত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা মানুষের বৈষয়িক জীবনে কেজো বটে, কিন্তু অন্তর্জীবনে ব্যর্থ।

ব্যবহারিক জীবনে বিদ্যা-জ্ঞান-প্রজ্ঞার উপযোগ ও প্রয়োগসাফল্য প্রত্যক্ষ। তাই এগুলো সর্বথা ও সর্বদা বহুল প্রযুক্ত। কিন্তু অন্তর্জীবনে—ভাবলোকে এগুলো প্রবেশপথ পায় না। তাই মানুষের এতকালের জ্ঞান-গবেষণা, বিদ্যাবত্তা ও প্রজ্ঞা-প্রদীপ মানুষের বৈষয়িক জীবনে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য দিয়েছে, তার সিকি পরিমাণও বিস্তৃত কিংবা ভাস্বর করেনি অন্তর্জগৎ। সেজন্যে আজো মানুষ প্রাণের পরিচর্যাই কেবল করে, বিবেকের অনুশীলনে উদ্যোগী হয় না। ফলে মন-রথীর বিবেক-সারথি ছিন্ন-বল্গা অশ্বের প্রতীয়মান নিয়ন্তামাত্র। তাই জগৎ-সংসার এক বিরাট বিচিত্র খেদার রূপ নিয়েছে। বাহ্যত সব বাঁধনই যেন ফস্‌কে গেরো, কিন্তু তবু মুক্তি অসম্ভব। খেদায় হাতীর বল-বীর্য-বুদ্ধি কোনটাই কাজে লাগে না। প্রথম জীবনে ঘরোয়া পরিবেশে নির্মিত প্রত্যয়ের এবং প্রথার খেদায়ও মানুষের অর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা মানুষের মুক্তির সহায় হয় না। অনুগত হাতীর পীড়নে বুনো হাতীর জীবন যেমন পারবশ্যতায় অপচিত, তেমনি পুরোনো সমাজ-সংস্কারের আনুগত্যে ভূমিষ্ঠ মানুষ পোষাপ্রাণীর যান্ত্রিক জীবন-ভাবনায় বিড়ম্বিত।

মুক্তির উপায়—লব্ধ-প্রত্যয় ও প্রথা পরিহারের অঙ্গীকারে অর্জিত জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা ও অনুশীলিত বিবেকের প্রাধান্য দান। তাহলেই কেবল আত্মায় ও আত্মীয়ে, স্বভাবে ও সংসারে, প্রজ্ঞায় ও প্রত্যয়ে, জীবনে ও জগতে, বিদ্যায় ও বিশ্বাসে, বিবেকে ও বিষয়ে দ্বন্দ্ব ঘুচবে। নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিংবা বৈষয়িক জীবনে বিরোধ ও বিবাদ কমবে—অন্তত তা তার জীবন-বিনাশী প্রাবল্য হারাবে।

সততা

সততা তিন প্রকার: পাপভীরুতা জাত, পার্থিব শাস্তিভীরুতা জাত এবং আত্মসম্মান ও আদর্শ প্রসূত। প্রথম দুটো সাহসের অভাবজনিত। আর তৃতীয়টি যথার্থ চরিত্রবলের অবদান। প্রথম দুটোর সামাজিক প্রভাব সামান্য, কেননা ঐরূপ সততা ব্যক্তিত্ব দান করে না। শেষোক্তটির প্রভাব সামাজিক মানুষের নৈতিকচরিত্র উন্নয়নের সহায়ক। কেননা, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন তেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব তাঁর চারদিককার মানুষকে প্রভাবিত করে এবং তাঁকে অনুসরণের প্রেরণা দেয়। এমন মানুষের সততা নির্ভীকতাপ্রসূত এবং তা ক্ষতি স্বীকারের ও যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তিদান করে। এমন সততার ভিত্তি নির্লোভতা, আদর্শচারিতা ও মর্যাদা-চেতনা। পাপ ও কলঙ্কভীরুতা একপ্রকার Negative ব্যক্তিত্ব, পক্ষান্তরে নিজের মর্যাদা-চেতনা একটি Positive গুণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপ-ভয় কিংবা নিন্দা-কলঙ্ক-শাস্তি ভয় জাগিয়ে মানুষকে সৎ রাখা সহজ নয়। বিশেষ বয়সে প্রবল প্রলোভনের তোড়ে পাপ-ভয়জনিত সততা স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে যায়। আর গোপনে অপকর্ম করে সহজেই নিন্দা-কলঙ্ক-শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি মেলে। যখনই সুযোগ মিলবে, সততার মুখোশ পরিহার করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হবে না। সামাজিক জীবনে সততা স্থায়ী করতে হলে পাপ ও নিন্দা-ভীরুতার ভঙ্গুর বাঁধনে আস্থা রাখা চলবে না। মানুষের অতীত ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। কেবল মর্যাদাবোধের দৃঢ় ও ধ্রুব ভিত্তিতেই সততার অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর আইন ও শাসনের কঠোরতায় কোনো স্থায়ী ফল মেলে না। ওটি আপাত উপশমের উপায়মাত্র।

আসলে সমাজে প্রতিষ্ঠাকামী না হলে মানুষের মনে সততা-প্রীতি স্থায়ী হয় না। এজন্যে কিছু শিক্ষা, কিছু আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং সমাজে গণ-জীবন উন্নয়নের ও বিকাশের কিছু সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সামন্ত-প্রধান সমাজে তা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। বুর্জোয়া সমাজে ধনের ও পদের মর্যাদা আর সর্বপ্রকার মূল্যবোধকে ছাপিয়ে উঠে বলে সেখানেও সততার সুপ্রসার সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই মানুষের সততা ও আদর্শ-চেতনা প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। কাজেই নৈতিক জীবনের মানোন্নয়নকামীরা অন্য উপায়ে অভীষ্ট ফল পাবেন না। কেবল সাফল্য-মরীচিকায় আশ্বস্ত থাকবেন মাত্র।

নিঃস্ব লোকের আকাঙ্ক্ষা প্রয়াস-প্রেরণা যোগায় না—তা বন্ধ্যা। তেমন লোক প্রাণে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় থাকে, পাপ-পুণ্য কিংবা নিন্দা-লজ্জামানের কথা ভাবে না। তা তার পক্ষে অসম্ভব ও অনর্থক জেনেই সে উদাসীন কিংবা বেপরওয়া। সমাজে প্রতিষ্ঠা যে পাবেই না, সে কেন নিন্দা-লজ্জার ভয় করবে? সৎপথে যার জীবিকা অর্জন সম্ভবই নয়, পুণ্যের প্রত্যাশা তার ত্যাগ করতেই হবে। অতএব ধর্ম বল, নীতিবোধ বল, পুণ্য বল আর মান বল, সবই আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা-বাঞ্ছা থেকেই উৎসারিত।

AMARBOI.COM

সাহিত্য

মানুষের জীবন-চেতনার ও জীবন-চর্যার পরিচয় তার আচরণে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে অভিব্যক্তি পায়। সে-প্রকাশ কখনো অকৃত্রিম হয় না। কেননা সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষই নানা অদৃশ্য বন্ধনের বান্দা। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দেশ, কাল, ধর্ম, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির প্রভাবে। তাই মানুষের মন ও মেজাজ, লোভ ও ক্ষোভ, ন্যায় ও অন্যায়বোধ, রুচি ও শ্রেয়োচেতনা স্থান-কাল-পাত্র সংপৃক্ত ও আপেক্ষিক। কখনো স্বার্থচেতনা, কখনো হিতবোধ, কখনো গৌত্রিক স্বার্থ, কখনো জাতিক আদর্শ, কখনোবা মানবিক-চেতনা প্রবল হয়ে মানুষের চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

ষড়রিপুর প্রেরণায় যেমন সে পরিচালিত, তেমনি কোনো আদর্শ এবং নৈতিক দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধও তাকে চিন্তায় ও কর্মে প্রবর্তনা দেয়। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের বিপরীতমুখী আকর্ষণেও মানুষের ভাব-চিন্তা-আচরণে দ্বান্দ্বিক অসঙ্গতি প্রমূর্ত হয়ে উঠে। এজন্যে সামাজিক মানুষের জীবন-চেতনা ও জীবনযাত্রা দ্বান্দ্বিক অসঙ্গতির সমষ্টি মাত্র। তার জৈব স্বভাব তাই কখনো স্বরূপে প্রকাশ পায় না।

এজন্যেই মানুষের চেতনায় কিংবা জীবনাচারে কোনো চরম ও ধ্রুব সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ নেই। সব সত্যই সাময়িক। সব শ্রেয়োবোধই পারিবেশিক। এরই ফলে মানুষের সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে, আদর্শে, নীতিবোধে, শিল্পকলায় কোনো চিরন্তন ও সর্বমানবিক সত্যের উপলব্ধি ও প্রকাশ নেই। তাই, ধর্ম, সমাজ, আদর্শ, নীতিবোধ, সাহিত্য ও শিল্পকলা স্থানে স্থানে এবং কালে কালে রূপ বদলায়, রঙ বদলায়, বদলায় ঢঙ, বদলায় ভাষা, বদলায় বক্তব্য।

এ্যাডাম-ডেভিড-সলোমনের কালে কিংবা মহাভারতীয় যুগে অথবা গ্রীকপুরাণে নারী সম্বন্ধে চেতনা ছিল একরকম, পরে হয়েছে অন্যরকম। সে-যুগে রাবণেরা সীতা হরণ করেই হত বীর, পরের যুগে নারীর রূপ-বহ্নিই জ্বালিয়েছে দেবলোক, পুড়িয়েছে সমাজ-সংসার। আজো কুমারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপমুগ্ধতাই প্রেম আর পরস্ত্রীর রূপানুরাগ কাম। তাই বহুপত্নীক রত্নসেনেরা প্রেমিক ও নায়করূপে প্রশংসিত আর আলাউদ্দীন-দেবপালেরা কামুক বলে নিন্দিত। আজকাল বিবাহিত পুরুষের কুমারী রূপানুরাগও কাম বলে ঘৃণিত। রমা-রোহিণী-সাবিত্রীরা যদি হিন্দু না হত, তাহলে তাদের বৈধব্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াত না।

তেমনি এককালের গোত্রীয় ঐক্য সংকীর্ণতা ও বর্বরতা বলে গর্হিত হয়ে ধর্মীয় ঐক্যে মহিমা আরোপিত হয়েছে, আবার তা বর্জিত হয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য হয়েছে কাম্য; তাও নিন্দিত হয়ে দৈশিক-রাষ্ট্রিক ঐক্য হচ্ছে বন্দিত। এর পরে আসবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের আহ্বান। এমনি করে জীবন-জীবিকার সবক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন ও বিবর্তন। জীবনের বিকাশ-ধারায় প্রয়োজন ও প্রয়াসের সমন্বিত প্রেরণায় রূপান্তর আসছে মনে-মেজাজে। তাই পালটাচ্ছে ভাব, চিন্তা ও কর্ম, বিবর্তিত হচ্ছে আচার ও আচরণ, শিল্প ও সাহিত্য, রুচি ও হিত, নীতি-চেতনা ও জীবনদৃষ্টি।

বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি থেকেই বৈচিত্র্যের উদ্ভব। জীবনের ও সমাজের বিচিত্র বিকাশ এতেই হচ্ছে সম্ভব। যারা চিরকালের জন্যে জিয়নকাঠি আবিষ্কারের উৎসুক, তাদের কামনা তাই কখনো পূর্ণ হবে না। ধ্রুবতাকামীরা স্বল্পবুদ্ধি। চলমানতাই জীবন, গতিশীলতাই জিয়নকাঠি। মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনা দিগন্তহীন নিঃসীম।

প্রজ্ঞা

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংবাদের সিন্দুক করা নয়, সুন্দর ও স্বস্থ জীবন রচনায় প্রবর্তনা দেয়া, সফল সার্থক জীবনযাত্রার পথ ও পাথেয় দান। তেমনি জীবনযাত্রা সুখকর করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনেই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিয়োজিত। পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটানো ও নিরাপত্তা সাধনই বিজ্ঞানের কর্তব্য। কিন্তু মনোভূমে কল্যাণ-লক্ষ্যে প্রীত, করুণা ও মৈত্রীর চাষ করা এবং ফসল ফলানো হচ্ছে বিবেকী আত্মার দায়িত্ব।

বিজ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও জিজ্ঞাসা। এ অন্বেষা প্রসারিত করে বহির্দৃষ্টি। এর নাম জ্ঞান। জ্ঞান শক্তি দান করে এবং শক্তি প্রয়োগেই আসে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। যন্ত্রশক্তি তাই আজ অজেয় ও অব্যর্থ। কিন্তু ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনযাত্রা বাঁচা নয়, বাঁচার উপকরণ মাত্র। কেননা, মানুষ বাঁচে তাঁর আনন্দে ও যন্ত্রণায় অর্থাৎ অনুভবের মধ্যে। সে অনুভবকে সুখকর সম্পদে পরিণত করতে হলে চাই প্রজ্ঞা—যে প্রজ্ঞা কল্যাণ ও সুন্দরকে প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার, প্রযোজন ও প্রীতির সমতা রক্ষিত না হলে আজকের মানুষের প্রয়াস ও প্রত্যাশা ব্যর্থতা ও হতাশায় অবসিত হবেই। কেবল তা-ই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসা জিইয়ে রাখবে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘর্ষ-সংঘাত। রাসেল তাই বলেছেন—বিজ্ঞান-লব্ধ শক্তিকে সুপথে চালিত করার সুমতি নেই বলে মানুষ আজ ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

অতএব, আজ যন্ত্রের সঙ্গে জানের, কালের সাথে কলিজার, মেশিনের সাথে মননের, বলের সাথে বিবেকের নিকট ও নিবিড় যোগ থাকা আবশ্যিক। নইলে মানবিক সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। মানব-কল্যাণে প্রাপ্তির সাথে প্রীতির, জ্ঞানের সাথে প্রজ্ঞার, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিবেকের সমন্বয় ও সমতা সাধনই আজকের মানববাদীর গুরু দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য।

শিক্ষা

শাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ ঘুচবার নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন। কেননা জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানমাত্রই বর্ধিষ্ণু। কারণ, জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা অশেষ, তা-ই জ্ঞানও কোনো সীমায় অবসিত নয়। বিদ্যা জ্ঞান দেয়। নব নব চিন্তা-ভাবনায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় জ্ঞানের পরিধি পরিসর কেবলই বাড়ছে। যত জানা যায়, তার চেয়েও বেশি জানবার থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যের স্বরূপ ও তত্ত্বের গভীরতা ধরা পড়ে। এজন্যে জ্ঞানের সাথে ধর্মশাস্ত্র সমতা রক্ষা করতে অসমর্থ।

ধর্মশাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে চিরন্তনতায় ও ধ্রুবতায় অবিচল। তার হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, বদল নেই, নেই পরিবর্তন ও পরিমার্জন। পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান, তার উন্মেষ আছে, বিকাশ আছে, প্রসার আছে, আছে তার বিবর্তন ও রূপান্তর। নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটন, নব সত্যের আবিষ্কার পুরোনো জ্ঞানকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে তথ্যগত ও তত্ত্বগত সত্যের রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে এবং জিজ্ঞাসু মানুষ তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে ও করছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে প্রত্যয়জাত সত্যের কোনো পরিবর্তন নেই বেদে-বাইবেলে। জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের বিরোধ এখানেই। জ্ঞান প্রমাণ-নির্ভর আর বিশ্বাস হচ্ছে অনুভূতি-ভিত্তিক। জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ আর বিশ্বাস হচ্ছে মনোজ। চোখ-কানের সাক্ষ্য মানুষ কত সহজেই না অগ্রাহ্য করে! আর মনের দাবী পূরণে কত উৎসুক সে! তার কাছে জ্ঞান অপরিহার্য আর বিশ্বাসই শিরোধার্য। চিত্তলোকে আজো মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত এবং বিশ্বাসের অরণ্যে পথের সন্ধানে দিশহারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদাবলী : কাম ও প্রেম

তত্ত্ববিদের চোখে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সামান্য ও বিজ্ঞানীর চোখে দু-ই নিরেট জৈবিক বৃত্তি। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স অবধি মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে কাম-প্রেমের লঘু-গুরু লীলা চালু থাকে। কাজেই কাম মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি। সে-বৃত্তি অভিব্যক্তি পায় প্রেমরূপে এবং কখনো কখনো স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরূপে। সবার চেতনায় প্রেমের প্রভাব থাকলেও সবার জীবনে প্রেম প্রকাশ ও বিকাশ পায় না। অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছা তখন পরোক্ষ উপায় খোঁজে উপভোগের। শৃঙ্গার তথা রতিরস তাই কর্ম ও কলার মুখ্য অবলম্বন হয়েছে। এ কারণেই আদি মানুষের সমাজে Art ও Ritual ছিল অভিন্ন। অন্ন ও আনন্দ প্রয়াস, কর্ম ও ধর্ম সাধনা এক ধারায় ছিল একাকার। রাগ-বিরাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গতি পেয়েছে জীবন।

আদি কৃষিজীবী সমাজে মৈথুন ছিল ফসল উৎপাদনের প্রতীক ও সহায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত সমাজে আজো তা অবিলুপ্ত। এদেশে ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে এ তত্ত্ব—বাজসনেয়ি সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে, মহাভারতে ও ছান্দোগ্যে। এ তত্ত্বের ক্রমবিকাশে পাই সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র এবং সহজিয়া, বাউল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, লিঙ্গায়েত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়। অতএব দেবতত্ত্বের ও মানবমনের বিকাশ ধারায় রূপ ও রতিবোধের দান গভীর ও ব্যাপক।

AMARBOI.COM

২

শিল্প-সাহিত্যের সব শাখাই রূপ ও রতিভিত্তিক। অন্যকথায় রূপ ও রতি একাধারে কারণ ও কার্য এবং বীজ ও ফল। এ দৃষ্টিতে রূপ ও রতির অনুধ্যানেরই প্রসূন মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

চিত্র ও মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প, নাচ ও গান, কবিতা ও গাথা, ধর্ম ও দর্শন, রূপকথা ও উপন্যাস সবকিছুই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে রূপ-রতি ভিত্তি করেই। বলতে গেলে মানুষের জীবনধারায় থাকে কাম ও প্রেমেরই বিচিত্র বিকাশ। এর প্রকাশ প্রতিবেশ-নির্ভর। সেজন্যে এর অভিব্যক্তি ও বিকাশ সরল ও একরঙা হয়নি। জীবন প্রবাহ ঝর্ণাধারার মতোই উপল ও বাঁক মেনে চলে। তাই জীবনে আসে বৈচিত্র্য, বিকৃতি ও বক্রতা।

জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্র, মূর্তি, সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীত তাই প্রেম-প্রতীক। এক কী বহু ধর্ম আর দর্শনও প্রেমবাদী। পৃথিবীব্যাপী আদি সমাজে মানুষের মনে ও মননে, কর্মে ও ধর্মে শৃঙ্গারই পেয়েছে প্রধান্য। শৃঙ্গারের নামই তাই আদিরস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে জীবনের ক্ষেত্রে এ আদিরসের বিচিত্র ও বহুধা প্রভাব স্বীকার করে ধন্য হয়েছে মানুষ, ধন্য করেছে দেবতাদের। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণ তার সাক্ষ্য।

৩

পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি। তবু সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দাম্পত্য প্রেমকেই আদর্শ ও মহিমান্বিত করবার প্রয়াস চলল। এই নৈতিক চেতনার যুগেই আমাদের দেশে হর-গৌরী, ইন্দ্র-সচী, রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি দাম্পত্য প্রেমের মহিমা কীর্তনচ্ছলে নিজেদের প্রণয়াকৃতি প্রকাশ করেছে মানুষ। এই কৃত্রিম প্রয়াসে মানুষের তৃষ্ণা মেটেনি, ভরে উঠেনি তার বুক। তাই আবার পরকীয়া রসে সিক্ত হয়েই প্রস্ফুটিত হল তার চিত্ত-উৎপল। এই রসেই তার হৃৎ-কমলে সঞ্চিত হল মধু, সৃষ্টি হল মহিমান্বিত। মানুষের অবদমিত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

অবেচতন বাঞ্ছা-অপূর্ণতার আকুতি গানে, গাথায়, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, চিত্রে, নৃত্যে, প্রতিমায়, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় আজো অভিব্যক্তি পাচ্ছে বিচিত্র ও বর্ণালী হয়ে।

ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কৃষ্ণ-নিপ্পিনাই বা রাধা-কৃষ্ণ—এ প্রেম প্রকাশের আদর্শ ও বিকাশের অবলম্বন হয়ে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মনের আকুতি মিটিয়েছে। সমাজ-কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক চেতনা যতই প্রবল হয়েছে, ততই সূক্ষ্ম অনুভবের স্তরে উন্নীত হয়েছে স্থূল প্রয়োজন, বাস্তব চাহিদা পেয়েছে মানসোপভোগে চরিতার্থতা। তাই বাস্তব জীবনে যা পাপ (sin), যা নৈতিক দোষ (vice) ও সামাজিক অপরাধ (crime) এবং সেহেতু ঘৃণ্য ও পরিহার্য ; ভাবলোকে তা-ই আত্মার উল্লাস জাগায়। এ জীবনে কেবল আনন্দানুভবের উৎস হয়ে থাকেনি, পারিত্রিক সুখ-স্বপ্নেরও আধার হয়েছে।

দেহে রূপ, রূপে কাম, কামে প্রেম আর প্রেমেই আত্মার মুক্তি। সূফী-বৈষ্ণবের এ ধারণা একদিনে গড়ে উঠেনি। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে বিস্তর, বাধা থাকে দুর্লঙ্ঘ্য। বাঞ্ছিত বস্তুমাত্রেই দুর্লভ ও দুঃসাধ্য। অথবা দুর্লভ না হলে কিছু বাঞ্ছনীয় হয় না। কাজেই তার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও প্রয়াস প্রয়োজন। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই এ সাধনার সম্বল। হৃদয়ে দাহ ও চোখে অশ্রু প্রেমিকের নিয়তি। আর মিলনাকাঙ্ক্ষা তথা বিরহবোধই তার প্রেরণা ও সামর্থ্যের উৎস। এইজন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহী আত্মার কান্নায় করুণ।

৪

এই রূপ ও রতি, কাম ও প্রেমবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এগুলোতে অধ্যাত্মতত্ত্ব ছিল না। এ দৈহিক প্রেম ঐহিক জীবনে আনন্দিত স্বপ্ন জাগানোতেই ছিল সীমিত। চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে এ সংগীত পারত্রিক ত্রাণের অবলম্বন হল। তখন অপ্রাকৃত হৃৎ-বৃন্দাবনে জীবাত্মা রূপিণী রাধার ও পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যান ও আস্বাদনই এর অপার্থিব মহৎ ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এভাবে প্রেমকে তত্ত্বের অনুগত করে রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রেমকে করা হল মহিমান্বিত ও অনন্য। চৈতন্য-পূর্ব যুগে গোটা ভারতব্যাপী যা ছিল শৃঙ্গার-রস উপভোগের বাহন, চৈতন্যোত্তরকালে তা-ই হল অধ্যাত্মরসের আকর।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাসের পদাবলী ছিল শারীর প্রেমের আকুতিমুখর। বৈষ্ণব ভক্তের চোখে পদকারেরা হলেন মহাজন ও গোস্বামী; আর পদাবলী হল সাধন-শাস্ত্র ও ভজন-গীতি। তার পরে চৈতন্যোত্তর যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় সব সঙ্গীতই আধ্যাত্মরসাশ্রিত।

যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীরা রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা কিংবা হর-গৌরী বিষয়ক পদ অভিন্ন লক্ষ্যে রচনা ও আস্বাদন করেছেন, তবু তত্ত্বগত পার্থক্য যে ছিল না, তা নয়। কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবাদে নয়, ভক্তি আর প্রেম তত্ত্বেও ছিল তফাৎ। দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দীনচণ্ডীদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস, আবদুর রহীম খান খানান, দাদু, এয়ারী, দরিয়া, রজব, তাজবেগম, আহমদ, রসখান কিংবা চাঁদ কাজী সৈয়দ সুলতান, আলাউল, সৈয়দ মর্তুজা, আলিরজা, মীর ফয়জুল্লাহ্ প্রভৃতি পদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তাই অভিন্ন নয়।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব বাঙালির এবং ষোলো শতকের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক গণ-নেতা। হয়তো বাঙলাদেশে থাকেননি বলেই বাঙলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রেমবাদ, তাঁর সাম্য, প্রীতি ও করুণার বাণী, তাঁর উদার মানবতাবোধ বাঙালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গৌতম বুদ্ধের ও ইসলামের বাণীর ঐতিহ্য তাঁর মাধ্যমে নতুন করে পেয়ে বাঙালি-চিত্ত সঞ্জীবিত হল। এজন্যে ষোলো শতক বাঙালির চিৎপ্রকর্ষের কাল—রেনেসাঁসের যুগ। আশ্চর্য, তবু ষোলো-সতেরো শতকে পদাবলী রচয়িতা বাঙলা দেশের সর্বত্র মিলে না। এই সময়কার প্রায় সব বৈষ্ণব কবিই পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একরকম আকস্মিকভাবে আমরা ষোলো শতকের শেষ পাদে আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে এবং সতেরো শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলিম বহু পদকার পাচ্ছি। এই স্থানিক জনপ্রিয়তার ঋজু কারণ দুর্লক্ষ্য। এ কী চৈতন্য পার্ষদ চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তের প্রভাবের ফল !

৫

আমরা দেখছি, রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বাঙলা দেশের তথা উত্তরভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলেছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের রচনা বলতে প্রায় সবটাই তো চট্টগ্রামেরই দান। এমনকি বাঙলা দেশের যে-কোনো অঞ্চলের হিন্দুর চাইতে চট্টগ্রামের হিন্দুর দানও কম নয়। হয়তো আন্তর্জাতিক বন্দর এলাকার লোক বলেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগের আহ্বানে তারা সহজেই সাড়া দিতে পেরেছিল।

মধ্যযুগের চট্টগ্রামী হিন্দু কবিদের মধ্যে ষোলো শতকে পাচ্ছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীকে। এঁরাই বাঙলায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ! সতেরো শতকে পাচ্ছি মৃগলুব্ধ প্রভৃতি রচয়িতা দ্বিজ রতিদেবকে ও লক্ষ্মণ দ্বিগ্বিজয়ের কবি দ্বিজ ভবানীনাথকে। আর আঠারো শতকে পাই সারদা-মঙ্গল প্রণেতা মুক্তারাম সেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মাহাত্ম্য লেখক ব্রজলাল সেন (ইনি মুক্তারামের ভাই), কালিকামঙ্গল রচক নিধিরাম আচার্য ও গোবিন্দ দাস, মনসার ভাসান প্রণেতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ, মৃগলুব্ধ সংবাদ রচক রামরাজা, গোকুল মঙ্গল লেখক ভক্তরাম দাস, সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচক ফকির চাঁদ প্রভৃতি ছাড়াও শঙ্কর দাস, শঙ্কর ভট্ট, বলরামদেব, রামতনু আচার্য, সদানন্দ ভট্ট প্রভৃতিকে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আঠারো শতক থেকে বাঙালি হিন্দুরা প্রণয়োপাখ্যান রচনা শুরু করেন। এবং 'চন্দ্রাবলী' রচয়িতা দ্বিজ পশুপতি ব্যতীত সবাই চট্টগ্রামবাসী। কাজেই এক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব এঁদেরই। আজ অবধি আমরা আঠারো শতকের রামজীবন দাসের 'শশিচন্দ্রের উপাখ্যান', সুশীল মিশ্রের 'রূপবতী রূপবান' উপাখ্যান, রাণীরাম দাসের 'শীত-বসন্ত', গোপীনাথ দাসের 'মনোহর মধুমালতী' এবং উনিশ শতকের কবি মহেশচন্দ্র দাস চৌধুরীর 'সয়ফুল মুলুক জরুখভান' পেয়েছি।[১]

৬

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হিন্দুকবির পদগুলোর বহিরূপ বৈষ্ণব পদাবলীর মতো হলেও অনেক পদেই বৈষ্ণবীয় ভাব-সত্যের অভাব লক্ষণীয়। এমনকি ভণিতাগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মহাজন পদাবলী সুলভ নয়, বরং মুসলিম রচিত পদের মতোই। এ-ও হয়তো আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ফল। মধ্যযুগে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সর্বাঞ্চলিক বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যে চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গলের উদ্ভব ও বিকাশ কেবল রাঢ় অঞ্চলেই নিবদ্ধ দেখি। আবার পূর্ববঙ্গেই যেন মনসা কাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশও সীমিত দেখি পশ্চিমবঙ্গে এবং আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে (সিলেট ব্যতীত) বাউল সম্প্রদায় চিরকালই অনুপস্থিত। এখানে সত্যপীরের প্রভাবও ছিল সামান্য।

এমনকি বহুকাল ধরে মুসলমানদের বাঙলা সাহিত্য চর্চাও বিশেষ করে নিবদ্ধ ছিল চট্টগ্রামে ও রোসাঙ্গে। তেমনি দোভাষী রীতির ও পুঁথিসাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ এবং কবিওয়ালাদের

---

১ Some Hindu Romantic poets : Dr. M. Shahidullah Felicitation volume : Asiatic Society of Pakistan, 1966.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবির্ভাব সীমিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের এখানকার প্রেসিডেন্সী বিভাগে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেই বিশেষ চর্চা হয়েছিল লৌকিক উপদেবতা ও পীরকাহিনীর, এবং গাথা-গীতিকা রচিত হয়েছে বিশেষ করে ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামে।

অতএব, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটা সর্ববঙ্গীয় চরিত্র ও রূপের অনুধ্যানে যতই আমরা আনন্দিত হতে চাই এবং অখণ্ডতা ও ঐক্যবোধের আগ্রহে যতই কেন সামগ্রিক রূপ-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই, ভৌগোলিক দূরত্ব যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙলাভাষীদের পারস্পরিক মানসযোগ রক্ষার অন্তরায় ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-জিজ্ঞাসা

প্রিয়জন ও শ্রদ্ধাভাজনের গুণকীর্তন ও দোষ-খণ্ডন মানব-স্বভাব। শ্রদ্ধাবানেরা একে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। ভাল কবিতার কবি এবং ভাল কাজের কর্তাও প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। কাজেই তাঁর কথা বলতে আবেগজাত অভিভূতি, শ্রদ্ধাপ্রসূত দোষগুপ্তি এবং পক্ষপাত দৃষ্টি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। কেননা, অনুরক্ত মাত্রই অনুগত হয়। অনুরাগ স্বভাবতই আনুগত্য দান করে। তাই সব জনপ্রিয় কবি-লেখক কিংবা সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রনেতা সম্বন্ধেই অনুরাগীরা প্রশস্তিমুখর ও বিচারবিমুখ।

কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বভাব যা-ই হোক, ঐতিহাসিকের কিংবা সমালোচকের ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ, তাঁদের পক্ষে এ দুর্বলতা দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্টতা। এ দুর্বলতা যাঁরা অতিক্রমণের সামর্থ্য অর্জন করেননি, তাঁদের পক্ষে লেখনী ধারণ অনুচিত। কারণ বাস্তব প্রতিবেশে সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়াই ঐতিহাসিক ও সমালোচকের দায়িত্ব। মিথ্যার প্রলেপে ক্রূর ও রূঢ় সত্য আবৃত করলে ইতিহাস ও সমালোচনার ফলশ্রুতিলব্ধ প্রাপ্তি ও প্রজ্ঞা থেকে সমাজ বঞ্চিত থাকে। ফলে চেতনার ও মননের জ্ঞানজ বিকাশধারা হয় বিকৃত। না বললেও চলে যে খণ্ড ও ভুল জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞতা শতগুণে শ্রেয়। উপকার করবার অধিকার সবার থাকলেও ক্ষতি করার অধিকার স্বীকৃতি পায় না। ঐতিহাসিক ও সমালোচক হবেন সত্যসন্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকানুগত। আমাদের ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে এসব গুণ বিরলতায় দুর্লক্ষ্য।

AMARBOI.COM

কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গেই এ ভূমিকাটির অবতারণা। আমাদের পূর্ব বাঙলায় নজরুল আজকাল বহুল আলোচিত ঘরোয়া কবি। প্রবন্ধের তো সংখ্যাই নেই, তাঁর সম্বন্ধে লেখা বড় ছোট বইয়ের সংখ্যাও দিনদিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু সে অনুপাতে আমাদের নজরুল সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং বিভ্রান্তি বাড়ছে। তার মুখ্য কারণ, সমালোচনা যে অংশত গবেষণাও এবং সমালোচককে প্রয়োজনমতো যে ঐতিহাসিক আর গবেষকের দায়িত্বও পালন করতে হয়, তা আমাদের সমালোচকগণ যেন স্বীকার করেন না। তাই তত্ত্ব ও তথ্য, সত্য ও শ্রুতি, স্মৃতি ও সদিচ্ছা, বাস্তব ও কল্পনা তাঁদের চোখে একাকার এবং ভালকথা ও সত্যকথা তাঁদের কাছে একই মূল্যে বিকায়। প্রতিজ্ঞায় (Promise-এ) যদি ভুল থাকে, সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে না। অঙ্গীকারে গলদ সিদ্ধান্ত অসার্থক করবেই। প্রস্তাবের ফাঁকির দরুন প্রাপ্তিতে প্রবঞ্চনার ফাঁক থাকবেই।

কবিও মানুষ। তাই তাঁরও রয়েছে গৃহগত জীবন, তাঁরও মন-মেজাজ গড়ে উঠে ধার্মিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও প্রাতিবেশিক প্রভাবে। কাজেই এই পারিবেশিক পটে অর্জিত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করে মানুষ তার প্রাত্যহিক আচরণে। অতএব, ব্যবহারিক কিংবা মানসিক কোনো অভিব্যক্তিই স্থান-কাল প্রসূত চেতনা-নিরপেক্ষ নয়। কবি-কৃতি বুঝবার জন্যে যাঁর মন-মননের সন্ধান নিচ্ছি, তাঁর মন-মনন কখন কোথায় কেমন করে লালন পেয়েছে, তা যদি না জানি তাহলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে বাধ্য। খণ্ডদৃষ্টি কেবল খণ্ড সত্যের সন্ধান দিতে পারে এবং খণ্ড সত্য মিথ্যারও অধম এবং ক্ষতিকর।

নজরুল সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম যদিও নজরুল চরিত-মানস, নজরুল-সমীক্ষা, নজরুল-প্রতিভা প্রভৃতি তবু এগুলোতে আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ যতখানি আছে, তথ্যবিচার ও সত্য নির্ধারণের প্রবণতা ততখানি নেই। ফলে সমালোচনাগুলো আলোড়িত আবেগ উঁচুমাত্রায় প্রকটিত করেছে বটে, যথার্থ মূল্যায়নের সহায়ক হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলকে পাঠকের বোধগত করবার জন্যে যেসব গ্রন্থকার ও সংকলকের প্রয়াস, তাঁদের কাছেই তাঁদের বিবেচনা-প্রত্যাশায় নজরুল সম্পর্কিত আমদের কয়েকটি জিজ্ঞাসা পেশ করছি :

১. ১৮৯৯ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ যে নজরুল ইসলামের জন্ম—এ তথ্য কোনো প্রমাণে স্বীকৃত ? একি পারিবারিক লিখিত কাগজ সূত্রে না বিদ্যালয়ে ভর্তির খাতার প্রমাণে ?

২. সম্রাট শাহ্ আলমের আমলে এ পরিবার কোথা থেকে চুরুলিয়ায় এলেন ? এঁরা কোন্ কাজীর বংশধর ? শাহ্ আলমের আমলে বাঙলা দেশে বসতি করে দু-তিন পুরুষের মধ্যে বাঙালি হয়ে উঠেছে, তেমন ভদ্র পরিবারের নজির বিরল। বিশেষত পলাশীর যুদ্ধোত্তরকালে অবাঙালিরা উত্তরভারতের দিকেই হিজরত করছিল। সেখান থেকে তখন এদেশে লোক আসার সাক্ষ্য বিরল।

৩. দশ-এগারো বছর বয়সেই লেটোর দলের গান বাঁধার যোগ্যতা অর্জন স্বাভাবিক নয়। কচি বালকের প্রতিভার এমন বিকাশের তথ্য কোন্ সূত্রে সংগৃহীত ?

৪. গাঁয়ের গরিবের ছেলে নজরুল মাঝে মাঝে পড়া ছেড়েছেন, রেল-গার্ডের বাসায়, রুটির দোকানে চাকরিও করেছেন, অমনোযোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার খবরও মেলে, তবু সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই দশম শ্রেণীতে পড়ছেন, দেখতে পাই। এ-ই বা কোন্ যাদুবলে সম্ভব ?

৫. চুরুলিয়ায় যখন ছিলেন, তখন নজরুল নিতান্ত বালক। সে বালকই ইমামতি করেছেন, আর মুসলমানেরা সেই বালকের মুবতদী হয়ে নামায পড়ছে—যোগ্যতা ও বৈধতার কোনো প্রশ্নই উঠল না ?

৬. রেল-গার্ডের বাসায় নজরুল কী ঘটিয়েছিলেন ?

৭. রুটির দোকানে নজরুল যে-কাজে নিযুক্ত [ময়দামাখা, রুটি-তৈরি ও বিক্রি] তাতে গান গাইবার অবকাশ ছিল কী ? হারমোনিয়ামই বা সেকালের রুটির দোকানে যোগাড় হল কী করে ?

৮. আলি আকবরের ভাগ্নী নার্গিস বেগম এখনো হয়তো জীবিতা এবং ঢাকাবাসিনী। সম্ভবত আলি আকবর সাহেবও জীবিত আছেন। তা ছাড়া কবি আজিজুল হাকিমের সঙ্গে পরে নার্গিস বেগমের বিয়ে হয়েছিল। আলি আকবর সাহেবের গাঁয়েও তাঁর শত্রু-মিত্রের অভাব নেই। নজরুলের জীবনীকার কিংবা কাব্য-সমালোচকদের কেউ এ যাবত সদ্য-বিয়ে-করা বউয়ের সঙ্গে নজরুলের বিচ্ছেদের কারণ সন্ধানে উৎসুক হননি। অথচ কোন্ কোন্ কবিতায় এ বিচ্ছেদ-বেদনার প্রভাব পড়েছে তাও আলোচিত হয়েছে। তাহলে এ ব্যাপারে তাঁদের এমন ঔদাসীন্যের কারণ কী ?

৯. মা জাহেদা খাতুনের প্রতি সন্তান নজরুলের বিরূপতার কারণ আবিষ্কারেও কেউ উদ্যোগী হননি। মুসলিম সমাজে মা যদি চাচার কাছে নিকাহ্ বসে থাকেন, তাতে কী অন্যায় আছে যে লেখকগণ তা গোপন করতে চান ? তাঁদের সঙ্কোচের ফলে এমন একটি নির্দোষ ব্যাপারও রহস্যময় হয়ে উঠে এবং পাঠকের মনে বীভৎস কল্পনা প্রশ্রয় পায়।

১০. নজরুল যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, লিখে টাকা পাচ্ছেন, তখনও তাঁর ঘন ঘন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়ার কারণ কেউ উল্লেখ করেন না। গান বেঁধে কিংবা পত্রিকা সম্পাদক হয়েও তাঁর অভাব ঘোচেনি, কিন্তু কেন ? একি 'নেশা' করতেন বলে ?

১১. তাঁর রোগের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণও কেউ চিকিৎসকদের থেকে জানবার চেষ্টা করেননি। এ রোগের লক্ষণও কেউ বর্ণনা করতে চাননি। একি 'নেশা' করার পরিণাম ?

১২. তাঁর বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ি গৃহগত কোন্ বিসম্বাদের ফলে নির্লক্ষ্য নিরাশ্রয় জীবন বরণ করলেন, তারও কোনো হদিশ মেলে না এঁদের আলোচনায়।

১৩. নজরুলের যদি ইসলামেই আস্থা থাকে, তাহলে কালী-সাধনার প্রেরণা পেলেন কী করে ? আর ঘরোয়া জীবনে যদি তিনি কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-ভীরু হন, তাহলে তাঁর বিপ্লব-বিদ্রোহ মূলক কবিতা কিংবা আচারিক ধর্মবিরোধী বাণী কৃত্রিম ফরমায়েশী রচনা হয়ে যায় না কী ?

১৪. তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া হিন্দুয়ানী হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর-যে কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না, তা স্বীকার করতেই হয়। অথচ এসব নিদর্শন কোনো কেতাবে মেলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. স্ত্রী ও শাশুড়ির প্রভাবে ও প্রতাপে যদি হিন্দুয়ানীতেই তিনি সমর্পিত চিত্ত এবং সে কারণেই যদি ছেলেদের খৎনা না করিয়ে থাকেন, তাহলে প্রমীলা নজরুলের চিতার বদলে কবর হল কী করে ?

১৬. মানুষ নজরুলের চরিত্রে কী কোনো দোষ-দুর্বলত ছিল না কেবলই গুণ এবং সবই ছিল গুণ? সগুলোয় বর্ণনা থাকে না কেন?

১৭. তাঁকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলেই প্রচার করা হয়। পাকিস্তান ও মুসলিম জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁর পরিব্যক্ত অভিমত নবযুগের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও কবিতার আলোকে আলোচিত হয় না কেন ?

এমনি নানা জিজ্ঞাসার পূর্ণাঙ্গ জবাব না থাকলে আলোচনা-সমালোচনা যে বৃথা ও ব্যর্থ তা উপলব্ধি করবার সময় আজ সমাগত। কেননা, কবি জীবন্মৃত। যেখানে জিজ্ঞাসা নেই, সেখানে উত্তরও অনায়ত্ত। আর উত্তরই যে জ্ঞান, তা কে না বোঝে ! অতএব যে-প্রয়াস জ্ঞান দেয় না, বোধের বিকাশ ঘটায় না, তা পণ্ডশ্রম মাত্র। পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এমনি গ্রন্থরচনার উৎসাহ না-থাকাই শ্রেয় ও বাঞ্ছনীয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নববর্ষ

প্রবুদ্ধ মানুষের জাগ্রত জীবন প্রতি নববর্ষে নবজীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। যে-মানুষ দু:খী, যে-মানুষ জিজ্ঞাসু ও অন্বেষ্টা, সে-মানুষেরই আসে নবজীবনের আহ্বান। কেননা, সুখ ও তৃপ্তি বন্ধ্যা। দুঃখ ও আর্তিই কেবল সৃষ্টিশীল। সুখ ও তৃপ্তি লক্ষেই মানুষের জীবন-প্রয়াস নিয়োজিত বলেই সুখ ও তৃপ্তি স্বস্তি আনে এবং তখন প্রয়াসের প্রেরণা অবসিত হয়। বঞ্চিতের অভাববোধই অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা হয়ে প্রয়াসে ও সংগ্রামে রূপ পায়।

নববর্ষের পূর্বাশার নতুন সূর্য জাগ্রত মানুষের মনে নতুন আশা জাগায়। ভরসাপুষ্ট মানুষ হৃত-অতীতের আচ্ছন্নতা ও অবসাদ পরিহার করে নবোদ্যমে এগিয়ে চলে উত্তরণের পথে সাফল্যের স্বর্ণমিনার লক্ষ্যে। তখন সে অকুতোভয়, আত্মপ্রত্যয়ে দুর্জয় ও অত্যুঙ্গ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত। তখন তার অমিততেজ, অপরিমেয় উদ্যম। প্রতি নববর্ষে প্রবুদ্ধ-চেতনা উচ্ছল প্রাণবন্যার উত্তল উর্মি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে চারদিকে। জাগিয়ে দেয় ও মাতিয়ে তোলে আধমরা, আধ-ভোলা বিকৃত চেতনার মানুষগুলোকে। বর্ষণের ছোঁয়া-লাগা দূর্বার মতো জেগে উঠে জীবন্মৃত মানুষ, প্রাণের সাড়া দোলা দিয়ে যায় চিন্তায় ও কর্মে।

নববর্ষ তাই নবজীবনের নকীব। নববর্ষ চেতনাকে ঢালাই করবার, চিন্তাকে ঝালাই করবার এবং ক্রটি শোধনের, ভ্রান্তি নিরসনের ও নব পরিকল্পনায় জীবন-রচনার আহ্বান জানায়। প্রতি নববর্ষ তাই এক-একটি জীবন-বসন্ত। হৃত-অতীতের সুপ্তি থেকে, গ্লানি থেকে, ব্যর্থতা থেকে, অনুশোচনা থেকে নির্জিত জীবনকে নববর্ষের বাসন্তী হাওয়ায় উজ্জীবিত করে চেতনার কিশলয়ে, চিন্তার প্রসূনে, প্রাণময়তার পরাগে মণ্ডিত করার লগ্নরূপে আসে এক-একটি নববর্ষ।

আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রথমদিন আসে আমাদের জন্মদিনের মতো হয়ে। জন্মবার্ষিকী কিংবা বিবাহবার্ষিকীর দিনটি যেমন আনন্দের ও উৎসবের, মনের উপর এর যেমন একটি স্বপ্ন-মধুর ও অনুভূতি-সুন্দর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, নববর্ষের প্রথম দিনও আমাদের প্রাণে তেমনি এক আনন্দ-সুন্দর শিহরণ জাগায়। স্বল্প-অনুভূত এক অব্যক্ত মাধুর্যে, এক অস্ফুট ঊষার আভাসিত লগ্নের লাবণ্যে, এক সুদিনের অনুচ্চারিত আশ্বাসে আমাদের চিত্তলোক ভরে তোলে এই নববর্ষ।

২

মধ্যযুগেও আমাদের দেশে নববর্ষের উৎসব হত। শাসকগোষ্ঠীও উদ্‌যাপন করত নওরোজ। কিন্তু আমাদের মধ্যযুগীয় চেতনায় এর গুরুত্ব যতটা বৈষয়িক ছিল, মানসিক ছিল না ততটা। তাই এর পার্বণিক প্রকাশ নিষ্প্রাণ রেওয়াজে ছিল সীমিত, কখনো তা মানস-বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেনি। স্থিতিশীলতার সাধক মধ্যযুগীয় মানুষ তাই জন্মদিন পালন করত না, মৃত্যুদিবসই স্মরণীয় করে রাখবার প্রয়াসী ছিল। জন্মোৎসবে আমাদের আগ্রহ জাগে প্রতীচ্য প্রভাবে। জন্ম ও জীবনের মহিমা প্রতীচ্য প্রভাবেই আমাদের হৃদয়বেদ্য হয়ে উঠে। সেই থেকে বছরান্তে জন্মদিন কিংবা নববর্ষ আমাদের জন্যে নবজীবনের, নবজাগরণের ও নতুন আশার বাণী বয়ে আনে।

পাশ্চাত্য প্রভাব গাঢ় হওয়ার সাথে সাথে আফ্রো-এশিয়ার গণমনের সুপ্তি টুটে গেল, তখন জাগ্রত জীবনের চাঞ্চল্যের জন্য ছিল দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। সম্ভাবনার প্রসারিত দিগন্তে মনবিহঙ্গ পক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তার করল জীবনের অনন্ত তৃষ্ণাতৃপ্তির বাসনা নিয়ে। মন-চাতকের সে অভিসারে ছিল অভিযানের আয়োজন ও দাপট। কেননা অভিপ্রেত বর্ষণবিন্দু নির্বিঘ্নে লভ্য যে নয়, তা বোঝা কঠিন ছিল না। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মুখেই যে অগ্রসর হতে হবে, তা তারা কেবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েই নয়, প্রাণের মধ্যেও অনুভব করেছিল। সে ঝড় কালবৈশাখীর ঝড়; কালান্তরের, রূপান্তরের ও বিবর্তনের ঝড়—সেই যুগান্তকর বিপ্লবী ঝড় ভাঙল বিশ্বাস, টুটল সংস্কার, উড়িয়ে নিল অন্ধতা, ঝেঁটিয়ে নিল ভীরুতা, আরো নিল কত কত জান-মাল। সে-ঝড়ে আনল রক্তবন্যা, জাগাল রক্তোচ্ছ্বাস। প্রাণের প্রেরণাপ্রসূত জীবনতৃষ্ণা তাতে আরো তীব্র হয়ে, তীরতীক্ষ্ণ সংকল্প হয়ে দুর্জয় করে তুলল গণমানবকে। তারই ফলে এ শতকের প্রথম সূর্যের কাল থেকে জাগ্রত গণমানব জগতের কোথাও-না-কোথাও প্রতিদিন কোন-না-কোনো ক্ষেত্রে মরণ-পণ সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে। সংগ্রাম চলছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার ও অবিদ্যার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য ও বৈষম্যর বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে রোগ-জরা মৃত্যুর বিরুদ্ধে, প্রকৃতির কার্পণ্য ও রহস্যময়তার বিরুদ্ধে।

আমাদের দেশেও সংগ্রাম চলছে। সংগ্রামী গণমানব আজ সুন্দর ও কল্যাণের অন্বেষ্টা। নৈতিক ও বৈষয়িক অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেতনা-চঞ্চল মানুষ আজ সংগ্রাম-মুখর। কিন্তু তার মানস-নৈপুণ্য অশিক্ষাজাত অপ্রত্যয়ে আজো অনার্জিত ও অনায়ত্ত। তাই তার সংগ্রাম বহুমুখী ও সর্বাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সে বিচিত্র ও বহুধা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হতে। তাই তার দুঃখ ঘোচেনি, সংগ্রাম পায়নি পূর্ণতা, সিদ্ধি রয়েছে অনায়ত্ত, সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নববর্ষের প্রথম সূর্যের আলোয় তার সংগ্রামী সংকল্প ঝালাই করবার, দৃঢ়তর করবার সুযোগ আসে বৎসরান্তে একবার। এই শতকে পলাশ-লাল সূর্য মন ও মাটি রাঙিয়ে রাঙিয়ে নবজীবনের আল্পনা এঁকে দিচ্ছে। দেশে দেশে ঘরে ঘরে সেই রাঙা-প্রভাতের প্রসাদ-পুষ্ট মানুষ তৈরি হচ্ছে, যারা রচনা করবে নতুন জগৎ ও মহিমান্বিত নবীন জীবন। 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'—মানববাদীর এই মন্ত্রে দীক্ষা নেবার লগ্ন হচ্ছে নববর্ষের প্রথম প্রভাত। প্রতি নববর্ষই মুক্তির প্রতীক। অজ্ঞতা, অন্ধতা, অবিদ্যা আর অন্যায়, পীড়ন, শোষণ, দারিদ্র্য থেকে কাম্য-মুক্তির প্রতিভূ প্রতিটি নতুন বছর। প্রতিটি নববর্ষ হচ্ছে মুক্তির প্রমূর্ত সংকল্প, শপথ ও সংগ্রাম। মানব-মুক্তি সংগ্রামে, মানব-কল্যাণে আমার দেহ-মন-আত্মা নিয়োজিত হোক, সমর্পিত হোক—নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এই দৃপ্ত শপথ স্মরণ করেই শুরু হোক এ বছরের জীবন।

৩

বিশ শতকের পলাশ-লাল সূর্য বিশ্বমানবের জন্যে মুক্তির বাণী বয়ে এনেছিল। সে-সূর্য আজো রোজ ভোরে খুন-রাঙা রূপ নিয়ে পূর্বাশায় উদিত হয়। বদ্ধ মানুষকে দেয় আশ্বাস ও অভয়, শোনায় আশার বাণী, পীড়ক-শোষকদের করে দেয় সতর্ক।

বিশ শতকের সূর্য প্রতি প্রভাতে মানুষের জন্যে মুক্তি বয়ে আন্‌ছে। সে-মুক্তি আসে পরাধীনতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অবিদ্যা থেকে, অশিক্ষা থেকে, কুসংস্কার থেকে, দারিদ্র্য থেকে, কাপুরুষতা থেকে, পীড়ন থেকে, শোষণ থেকে। দুনিয়ার কোথাও-না-কোথাও প্রতিদিন মানুষের জীবনের কোন-না-কোনো ক্ষেত্রে মুক্তি আসছে। এই সাফল্যে, এই আশ্বাসে ও এই প্রত্যয়ে মানুষ আজ বিদ্রোহী, সংগ্রামী ও আত্মপ্রত্যয়ী। আমাদের দেশ-দুনিয়ায়ও সে-রাঙা প্রভাত আসে। আমাদেরও আশ্বস্ত করে যায়। প্রতি নববর্ষে আমাদের প্রথম সূর্য আমাদেরও মনে জাগিয়ে তোলে রঙিন স্বপ্ন। প্রতি নববর্ষে আমাদের আকাশেও জাগে কালবোশেখী—নববর্ষের সওগাত ও আশীর্বাদ। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মধ্যে জাগে প্রাণের সাড়া। বন্দীর বেদনা, শোষিতের ক্ষোভ ঝড় হয়ে দেখা দেয়। তাতে মুছে যায় সব গ্লানি, খসে পড়ে জীর্ণতা, উড়ে যায় জড়তা, নতুন ভুবনে নব সৃষ্টির আশা ও আশ্বাসে ভরে উঠে বুক। উল্লসিত প্রাণপুরে জেগে উঠে গান :

ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়—
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন
আস্‌ছে নবীন জীবনহারা—অসুন্দরের করতে ছেদন।

অতএব, তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন জীবনের
সমস্যা ও যন্ত্রণার মধ্যে
পিতা মরহুম আবদুল আজিজের
আদর্শনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা
স্মরণ করি—

AMARBOI.COM

একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা

উনিশ শতকের য়ুরোপে জাতীয়তাবাদ যখন উগ্ররূপ ধারণ করতে থাকে তখন কয়েকটি আনুষঙ্গিক চিন্তাও জাতীয়তাবাদীর মনে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেগুলোর মধ্যে তিনটে প্রধান—স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের সন্ধান ও সৃজন, স্বতন্ত্র সংস্কৃতির রক্ষণ ও উদ্ভাবন, এবং সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন।

সাহিত্যের ব্যাপারে সমাজবাদীদের আগ্রহ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। তাঁরা গণসাহিত্য সৃষ্টির গরজে লোক-সাহিত্যে ও লোক-ঐতিহ্যে অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। নিতান্ত কৌতূহলের আনন্দে যে Folklore-এর চর্চা শুরু হয় শতেক বছর আগে, তা-ই সামাজিক-রাজনীতিক মতবাদ দৃঢ়মূল করবার অবলম্বন হয়ে উঠল। আবার সমাজ, সংস্কৃতি ও নীতিবোধের বিবর্তন ধারার ইতিহাসের উপকরণ-উপাদান হিসেবেও Folklore গুরুত্ব পাচ্ছে। আইরিশ, ইসরাইল ও নিগ্রো জাতীয়তা যেমন স্বদেশী ভাষা, ঐতিহ্য ও লোকসাহিত্য অবলম্বন করে বিকাশ কামনা করছে, সমাজ-বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকরাও তেমনি Folklore-কে মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচনার উপকরণ ও মানব-প্রকৃতি ব্যাখ্যার অবলম্বন করেছেন। কাজেই লোক-ঐতিহ্য ও লোক-সাহিত্য তথা Folklore আজ মানবিক প্রগতির উপকরণ ও উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতীতকে অতীতের নিরিখে যাচাই করা ও প্রত্যক্ষ করা সদ্বুদ্ধিজাত সদুপায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পুঁজি করার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা কিংবা কল্যাণ নেই—আছে অন্ধ আবেগ যা আপাতদৃষ্টে কেজো বটে, কিন্তু পরিণামে রক্ষণশীলতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার জনক। কেননা, পুরাতনে আসক্তিহীনতা এবং পরিহার-সামর্থ্যই অগ্রগতির স্বাভাবিক সদুপায়। জাতীয় জীবনের জাগরণ মুহূর্তের আবেগ, উৎসাহ ও কর্মোদ্যমকে পুরাতনের প্রেরণা বলে ভুল করার ফলেই পুরাতনকে জীবন-প্রয়াসের মহিমান্বিত উৎস বলে প্রতীতি জন্মায়। পুরাতনের অঙ্গীকারে নতুনের জন্ম-প্রত্যাশা স্ববিরোধী অদ্ভুত চিন্তার প্রসূন। পুরাতনে আস্থাহীনতাই বরং ভবিষ্যতে নতুন প্রত্যয় লাভের সহজ উপায়।

'ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস' বলে চালু কথাটির তাৎপর্য কিন্তু ভিন্ন। যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অতীতে ব্যক্তিক কিংবা জাতীয় জীবনে কল্যাণ ও সাফল্য এনেছে, তা-ই ঐতিহ্য। দেশকালের প্রেক্ষিতে যা সেদিন মঙ্গলকর ও ফলপ্রসূ ছিল, পরিবর্তিত পরিবেশে তা অহিতকর এবং নিষ্ফলও হতে পারে। কাজেই ঐতিহ্যের অবলম্বন মানে তার অনুকরণ নয়, তার নব রূপায়ণ নয়, তার আশ্রয় গ্রহণ নয়, নয় তার প্রশ্রয় কামনাও, বরং প্রয়োজন ও পরিবেষ্টনীর দিকে দৃষ্টি রেখে হিতকর ও ফলপ্রসূ উপায় গ্রহণ ও রীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন। কখন, কী অবস্থায়, কোন্ সঙ্কটে কিংবা সৌভাগ্যে কেমন করে কী করা হয়েছিল তা কিভাবে ব্যক্তিক, পারিবারিক অথবা জাতীয় জীবনকে রক্ষা ও ঋদ্ধ করেছিল, তা স্মরণ করার নামই ঐতিহ্য-চেতনা। অতএব ঐতিহ্যের অনুরণন-অনুসরণ বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কিন্তু অনুকরণ কিংবা রূপায়ণ কখনো কাম্য নয়। তাছাড়া অতীতে যাঁরা আমাদের জন্যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরাও একে নিত্যকালের জন্যে ধরে রাখেননি। তাঁরা নতুন নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্যে তাঁদের প্রাত্যাহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে। একবারের সৌভাগ্যের ও সাফল্যের উপায়কে তাঁরাও চিরকালের উপায় বলে গ্রহণ করেননি। তাই ঐতিহ্যমাত্রই অতীতের। সেই পরিত্যক্ত রীতি-পদ্ধতি ও কর্মচিন্তা লোকস্মৃতির প্রশ্রয়ে কিংবদন্তির আশ্রয়ে বেঁচে থাকে কালান্তরে। স্রষ্টারই পরিত্যক্ত সামগ্রীকে তাঁর উত্তর-পুরুষেরা মহামূল্যজ্ঞানে যদি পাথেয়রূপে জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করে, তাহলে তাঁদের চলা চক্রের আবর্তন বই কিছুই নয়। ব্যবসায় মূলধন যেমন উপার্জনের ভিত্তি, ঐতিহ্যের পুঁজিও তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রগতির সহায়। মূলধনে হাত পড়লে ব্যবসা টেকে না, তেমনি ঐতিহ্য আঁকড়ে বসে থাকলেও গতি হয় রুদ্ধ।

আবার উদ্যমহীন নিষ্কর্মার ঐতিহ্যপ্রীতি ও ঐতিহ্যগর্ব আরো মারাত্মক। ধনী-সন্তানের সম্পদ-চেতনা যেমন, ঐতিহ্যগর্বীর গৌরব-স্মৃতিও তেমনি তৃপ্তমন্যতা জাগায়, যা প্রয়াসহীন জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। তৃপ্তমন্য গৌরব-গর্বী পরিবার কিংবা জাতির পতন অনিবার্য। অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস—দু-ই এই আপ্তবাক্যের যাথার্থ্য সমর্থন করে।

নিজের ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে মানুষ যখন তার চারপাশে কোনো আধার বা অবলম্বন খুঁজে পায় না, তখন সে অতীতের দিকে ফিরে তাকায়; অতীতের ঘটনা, চিন্তা বা কাহিনী সে উপস্থাপিত করে বর্তমানের ভাব-চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এবং উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষারূপে অথবা কাহিনীরূপে ব্যবহৃত হয়ে তা ভাবকল্প ও চিত্রকল্পের অবয়বে তখন আত্মপ্রকাশ করে। অতীতকে এভাবে বর্তমান করে তোলাতে দোষ নেই। কিন্তু বর্তমানকে স্বকালে, স্বস্থানে ও স্বরূপে খুঁজতে না-জানার অসামর্থ্যের কিংবা বর্তমানকে দিয়ে বর্তমানের ভাব-চিন্তা প্রকাশের অক্ষমতার স্বাক্ষর থাকে। কাজেই ঐতিহ্য-নির্ভরতা বর্তমান অবস্থার পরোক্ষ প্রকাশের বাহন মাত্র—প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির উপায় নয়। অতএব সাহিত্যশাস্ত্রবিদ যখন বলেন :

An Artist of the first rank accepts tradition and enriches it, an artist of the lower rank accepts tradition and repeats it, and artist of the lowest rank rejects tradition and strives for originality. (Sampson)

তখন কথাগুলো শুনতে চমকপ্রদ বটে; কিন্তু সত্যের বিপরীত। যেমন ঔপন্যাসিক তাঁর চারদিকে কোনো উপকরণ যখন খুঁজে পান না, তখন তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে আনন্দিত হন।

অপরের সৌভাগ্যে ও পীড়নে যাঁরা ঈর্ষা ও ক্ষুব্ধ অথচ অসহায় ও অক্ষম, তাদের চিত্তে জন্ম নেয় Revivalism-এর স্বপ্ন। তাদের বর্তমান অযোগ্যতা তাদেরকে অতীত গৌরবগর্বী করে তোলে। তাতে তারা বর্তমানের আত্মগ্লানি ও আর্তনাদ গৌরবময় ঐতিহ্যের আস্ফালনে ঢাকা দিতে চায়। বর্তমান দীনতার দুঃখ-লাঞ্ছনা ভুলবার উপায় হিসেবেই ঐতিহ্যের আশ্রয়ে তারা প্রবোধ ও প্রশান্তি খোঁজে। উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির যেমন পিতৃসম্পদেই ভরসা ও নির্ভরতা, Revivalism-এ আসক্তিও অনেকটা সেইরূপ। অতএব Revivalism অক্ষমের সান্ত্বনা। পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহের মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশাহীনতা। বর্তমানে কিছু করবার নেই, ভবিষ্যতে কিছু পাবার কিংবা হবার নেই—এমনি প্রত্যয়হীনতাই মানুষকে করে অতীতমুখী। তাদের চোখে পৃথিবী যেন সহসা এক জায়গায় আকস্মিকভাবে স্তব্ধ ও স্থবির হয়ে যায়। তার গতিপ্রবাহ যেন চিরকালের জন্যে থেমে গেল, যেমন এগুবার আর উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। কাজেই বর্তমানে না কুলায় তো অতীতের সঞ্চিত সম্পদ কাজে লাগাও, দুর্দিনের সম্বল কর। কেননা অতীতের সে-পরিবেশে আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন স্বগৌরবে, স্বশক্তিতে ও স্বমহিমায় বেঁচেছিলেন—কাজেই অতীতের সেই কোটরই অভয়-শরণ —তখন এমনি অপবুদ্ধি মনে সহজেই জাগে। Revivalism-এ মনের বিকাশ-বিস্তার হওয়া তাই অসম্ভব।

মানুষের চোখ দুটো যখন সম্মুখেই স্থাপিত আর পায়ের পাতাও সামনের দিকেই প্রসারিত তখন বুঝতে হবে—মানুষের সম্মুখদৃষ্টি আর অগ্রগতিই ছিল বিধাতার অভিপ্রেত। কাজেই পিছুহঠা বিকলাঙ্গ অন্ধের অনাচার মাত্র।

বর্তমানে উৎকৃষ্টতর কিংবা যোগ্যতর কিছু না পেলে অথবা ভবিষ্যতে পাবার আশা বা বিশ্বাস না জাগলে কেউ অতীতকে পরিহার করে না। কাজেই পরিত্যক্ত অতীতের ভাব-চিন্তার সামগ্রীমাত্রই বর্তমান ভাব, চিন্তা ও কর্ম থেকে নিকৃষ্ট কিংবা অপূর্ণ। কেননা মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রয়াস মানুষের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করছে—সামগ্রিকভাবে তার মানসিক ও বৈষয়িক জীবন প্রতি মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎকর্ষ লাভ করছে। এজন্যেই তো বলা হয়েছে 'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে রে ভবিষ্যৎ।' পুরোনো জীবনযাত্রার কোনো অবলম্বনই আমাদের শ্রদ্ধা জাগায় না, চরম তাচ্ছিল্যে পরিহার করি সেসব, কেননা সেগুলো উপযোগ হারিয়েছে। অথচ পুরোনো কালের ভাব-চিন্তা-আদর্শ-বিশ্বাস-সংস্কারেরই কেবল উপযোগ রয়ে গেল, নিরাসক্ত মনে এ বোধ ঠাঁই পায় না। কিন্তু আবেগপ্রবণ মনে এ বোধের প্রভাব অশেষ ও অনড়। তবু যুক্তিপ্রবণ বুদ্ধিজীবীর কাছে আবেদন করা চলে এই বলে যে,

"ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনে কো কুড়াতে
ফুরায় যা—দে রে ফুরাতে"

কেননা ওতে কল্যাণ নেই।

এখানে আইরিশ Revivalism-এর কথা কারো কারো মনে জাগতে পারে। ইংরেজের সৌভাগ্য ও পীড়নই আইরিশদের স্বাতন্ত্র্যকামী করেছিল। দুর্বলের স্বাতন্ত্র্য কামনা হীনমন্যতার এক পরোক্ষ প্রকাশ। যারা আত্মশক্তিতে আস্থাহীন অথচ মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকামী তাদের মনেই স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল হতে থাকে। এবং যেহেতু নিজে সামর্থ্যহীন তাই অতীত সামর্থ্যের সঞ্চয়কে সম্বল করে সে নিজেকে ভাবে ঋদ্ধ ও সম্মানিত। 'এখন আমার কিছু নেই বটে, কিন্তু কী না ছিল আমার এককালে'—এমনি একটা বোধের আশ্রয়ে সে আশ্বস্ত হতে চায়, জাগ্রত করতে চায় আত্মসম্মানবোধ। আসলে সে মনকেই চোখ ঠাওরায় এভাবে। কেননা তার মধ্যে সদাজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমই তাকে শক্তি দান করে মুক্তিলাভের—প্রেরণা দেয় সংগ্রামের। সে মনে করে—বুঝি এসব ঐতিহ্য-চেতনা ও স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির দান। কিন্তু তা যে নয়, তার প্রমাণ আজকের প্রগতিশীল বিজ্ঞান ও যন্ত্রজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত হয়ে সেও টিকতে পারে না—পারে না এগুতে। সে বেঁচে আছে বর্তমানকে বরণ করেই, অতীতকে ধরে নয়।

স্বাতন্ত্র্যকেও তার স্বরূপে গ্রহণ করা উচিত। যোগ্যের উৎকর্ষই তার স্বাতন্ত্র্য। কেবল অযোগ্যরাই আত্মসংকোচনকে স্বাতন্ত্র্য মনে করে আত্মপ্রবোধ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সবলের স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রসারে ও আত্মপ্রভাব বিস্তারে প্রবর্তনা দেয়। আর দুর্বলের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছোঁয়া ও প্রভাব এড়িয়ে চলার আগ্রহ জাগায়। দুর্বলের এ পদ্ধতি কেবল হীন ও নির্বোধের কাজেই প্রশংসনীয়।

কেউ কেউ য়ুরোপীয় রেনেসাঁসে রিভাইভেলিজমের লক্ষণ খুঁজে পান। রেনেসাঁস কোনো একদিনের ব্যাপার ছিল না। আড়াইশ বছরের পরিসরে তার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে ভাঙা-গড়ার বহু ও বিচিত্র আন্দোলন ও ঘটনা ঘটে গেছে, ফ্লোরেন্সের লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) কেবল সৌন্দর্যপিপাসু চিত্রশিল্পী ছিলেন না; মনীষী, বিজ্ঞানী এবং ভাস্করও ছিলেন। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ছিলেন ভাস্কর ও স্থপতি। রাফেলও কেবল শিল্পী ছিলেন না, জীবন-জিজ্ঞাসুও ছিলেন। এই ফ্লোরেন্সেই জন্মেছিলেন তেরো শতকে কবি দান্তে ও চৌদ্দ শতকে কবি পেত্রার্ক। পনেরো, ষোলো ও সতেরো শতকে নেদারল্যান্ডের মুক্তিসংগ্রাম কলম্বাস-ভাস্কো-ডা গামার সমুদ্রপথে নতুন দেশ আবিষ্কার ও অপরিমেয় ধনাগম, ফলে সামন্তসমাজে বেনে-বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব, কৃষক-বিদ্রোহ, মুদ্রারীতির প্রসার; যাজক ও শাসকের, সামন্ত ও বুর্জোয়ার বিরোধ, Inquisition-এর বিরুদ্ধে Huss ও মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ, কোপারনিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিওর উচ্চারিত তথ্য, ছাপাখানার প্রবর্তনে বিদ্যার বিস্তার, বাইজেনটাইন গ্রীক বিদ্বানদের য়ুরোপে পুনর্বাসন প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই ছিল রেনেসাঁসের মূলে।

এসব আর্থনতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনীতিক ও কলা-বিদ্যা-জ্ঞান-চিন্তাবিষয়ক আন্দোলন-বিদ্রোহ-বিপ্লব —রেনেসাঁস, রিফরমেশন ও রেভলিউশন —এ তিন শাখায় সংহত রূপ নিয়েছে ঐতিহাসিকের চোখে। এই পুনরুজ্জীবন, সংস্কার ও বিপ্লবের মূলে যে-প্রেরণা যে-উদ্যম ক্রিয়াশীল ছিল তা ছিল এক কথায় মুক্তি-অন্বেষা। পীড়ন থেকে, কুসংস্কার থেকে, বদ্ধচিত্ততা থেকে, দারিদ্র্য থেকে, অজ্ঞতা থেকে, দুর্বলতা থেকে, ভীরুতা থেকে মুক্তির অভিব্যক্ত উল্লাসের নাম রেনেসাঁস। সুতরাং এখানে রিভাইভেলিজমের দান কোথায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ্যত মুসলিমদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর বাজেন্টাইন গ্রীকবিদ্বানেরা যখন য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েন, এবং টোল খুলে তাঁরা যখন মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে বিদ্যাবিতরণ করতে থাকেন তখন শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত চিত্তে যে জীবন-চেতনা জাগে, সে-চেতনায় তাঁরা জগতের ও জীবনের নতুন রহস্য আবিষ্কার করে। নতুন দৃষ্টিতে খুঁজে পায় জগৎ ও জীবনের নতুন তাৎপর্য। জানার ও পাওয়ার সে-উল্লাসই তাদেরকে নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মে প্রবর্তনা দেয়। উপকরণ ও মাধ্যম হিসেবে তাঁরা প্রথমে গ্রীক পুরাণকেই গ্রহণ করে এবং এভাবে তাঁরা জীবনের সৌন্দর্য ও আনন্দকে অভিব্যক্তি দান করতে থাকে। তাঁদের অনুভবে তখন তাঁদের সমকালীন পরিবেষ্টনী তুচ্ছ ও সাময়িক। তাই তাঁদের স্বপ্নের, কল্পনার ও আর্দশের জগৎ রচনার উপকরণ হয়েছে প্যাগান ও খ্রীস্টীয় পুরাণ। এই রোমান্টিক জগৎ ও জীবন-দৃষ্টিতে যে-কৌতূহল, যে-জিজ্ঞাসা, যে-সৌন্দর্য-চেতনা, যে-শিল্পবোধ, যে-রূপানুরাগ ও যে-আত্মসচেতনতা সুপ্রকট তা নবলব্ধ চেতনা, নতুন-জাগা আকাঙ্ক্ষা, নতুন-পাওয়া উদ্যম ও মুক্তি-অন্বেষারই অভিব্যক্তি। কাজেই তা প্যাগান-পুরাণ-প্রীতির ফল নয়। গ্রীক পুরাণের অপরিমেয় ও অনবরত ব্যবহার দৃষ্টিকে এতই বিভ্রান্ত করে যে আমরা অবলম্বনকে কারণ ও উপকরণকে প্রেরণার উৎস ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এভাবে উপায়কে মনে করেছি কারণ বলে আর অবলম্বনকে জেনেছি লক্ষ্য বলে। প্রাণের প্রেরণা ও চেতনার দান রইল অস্বীকৃত ও অগোচর।

দেশী দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথে পুরাণের ব্যবহার প্রাচীন ভারতকে ফিরে পাবার অভিপ্রায়প্রসূত যে নয়, নতুন-জাগা চেতনা প্রকাশের মাধ্যম মাত্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই রিভাইভাল নয়, নবচেতনাই জীয়নকাঠি।

কারো কারো চিন্তায় রেনেসাঁস ও রিভাইভাল সমার্থক হয়ে গেছে। যেন একটির সঙ্গে অপরটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। যেন রিভাইভালিজমই রেনেসাঁসের প্রসূতি অথবা রেনেসাঁসই রিভাইভালিজমের জনক কিংবা অগ্রজ; অর্থাৎ একটি অপরটির কখনো কারণ এবং কখনো ফলরূপে প্রতীয়মান। এমনকি বাঙলা তর্জমায় পার্থক্য প্রায় দুর্লক্ষ্য। শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্যাদি কলা কিংবা চিন্তার ক্ষেত্রে নবজন্ম, নবজাগরণ, পুনরুজ্জীবন, পুনর্জীবন, পুনর্জাগরণ, পুনরভ্যুদয়, পুনরুদ্দীপন, পুনরুদ্যম, পুনরুদ্বোধন প্রভৃতি অর্থেই শব্দদুটো ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অভিধা হচ্ছে রিভাইটালাইজেশন। যে-ঐতিহ্য যে-অতীত ভরে তুলে না, কেবলই ধরে রাখে; যে tradition অগ্রগতির অন্তরায় তা পরিহার করবার, তার প্রতি নির্মম ও বীতরাগ হবার শক্তি থাকা চাই—নইলে আবেগের ঘূর্ণিপাকে অপচিত হবে জাতীয় সব প্রয়াস।

কাজেই প্রাণে প্রেরণা, চিত্তে চেতনা এবং মনে স্বতঃউৎসারিত উদ্যম না জাগলে, কেবল ইতিহাস পাঠের ফলশ্রুতির অনুসরণে কিংবা অনুকরণে revivalism-এর চর্যা গ্রহণ করলেই রেনেসাঁস আসবে না অথবা রেনেসাঁস এসেছে কল্পনা করে revival-এর উৎসাহ-বোধ করলেই প্রয়াস সফল ও সার্থক হবে না।

মনে রাখা দরকার, যাত্রা অভিন্ন হলেও ফল ভিন্ন হতে বাধা নেই। বস্তুত প্রায়ই ভিন্ন হয়। তাছাড়া অনুকৃতিতে নির্বোধ পায় আনন্দ, বুদ্ধিমানে পায় লজ্জা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার হের-ফের

লেখাপড়া করলেই বা জানলেই লোক শিক্ষিত হয় না। কাজেই লেখাপড়া জানা আর শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়। অর্জিত বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ বোধ-বুদ্ধির আয়ত্তে এনে জীবনচর্চার অন্তর্গত করে নিতে না জানলে বা না নিলে মানুষ শিক্ষিত হয় না। এজন্যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা মানুষের রুচি করে পরিস্রুত, বুদ্ধি করে তীক্ষ্ণ, মন করে পরিচ্ছন্ন, মনন করে মার্জিত ও বিন্যস্ত। অতএব শিক্ষা পরিশীলন ও পরিস্রুতির মাধ্যম ও বাহন। লেখাপড়াই তাই মন-বুদ্ধি-আত্মার পরিমার্জনা ও বিকাশের উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত। কিন্তু তা কোনো দেশেই বিশেষ করে আমাদের বেলায় আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়নি।

তার কারণ যে-বিদ্যা অর্জনের জন্যে আমাদের মানসিক ও পরিবেশিক প্রস্তুতি নেই, সে-বিদ্যা আকস্মিকভাবে আমাদের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে। ফলে আমাদের অর্জিত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান আর লালিত বিশ্বাস নীলনদের প্রবাহের মতো তিনটে পৃথক ধারায় আমাদের মন ও মননের ক্ষেত্রে জীবনরস সিঞ্চিত করে।

সন্তানদের লোকে স্কুল-কলেজে পাঠায় বিদ্যার্জনের জন্যে, জ্ঞান বা শিক্ষা লাভের জন্যে নয়। এ-বিদ্যা যে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মীর সরকারি বিদ্যা এবং তা যে কেবল অর্থোপার্জনের জন্যে প্রয়োজন, জীবনের আর কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে নয়—এ চেতনাও জিইয়ে রাখার চেষ্টা থাকে অভিভাবকদের এবং সতর্কতা থাকে বিদ্যার্থীর।

ফাঁক-ফুকুরে যদি জ্ঞানের ছিটেফোঁটা চিত্তলোকে প্রতিষ্ঠা পায়, তা হলেও তা জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয় না, কেবল কেতাব লেখার আর কথা বলার ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে তার উপযোগ।

লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই আমাদের জীবনযাত্রার ভিত্তি— জীবন যাপনের দিশারী। বিশ্বাস-সংস্কারের নিয়ন্ত্রণেই আমাদের জীবন চালিত। কেননা এগুলোই আমাদের আচরণীয় ধর্মবিধির উৎস। অতএব বিদ্যা ও জ্ঞান আমাদের বহিরঙ্গের আভরণ ও আবরণ আর বিশ্বাস-সংস্কার আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পদ। ফলে আমরা স্কুল-কলেজে যা পড়ি তা দুর্লভ সম্পদরূপে মন-বুদ্ধির স্পর্শ বাঁচিয়ে রক্ষা করি; অথবা বিস্মৃত হয়ে দায়মুক্ত হই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তায়, কর্মে কিংবা অনুভবের পরিসরে তা ছায়াও ফেলতে পারে না। যেমন স্বধর্মের কথা ছাড়া অন্য ধর্মের কথা যতই ভালো হোক, তা যে আমার জন্যে নয়—এ সচেতনতা আমাকে গোড়াতেই বিরূপ করে রাখে। তাই তেমন কথা শ্রুতিমধুর ও যুক্তিগ্রাহ্য হলেও হৃদয়ভেদ্য হয় না।

এজন্যেই রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকও পড়া-পানিতে খুঁজে পান রোগের ও দুর্ভাগ্যের নিদান, পদার্থবিজ্ঞানী ঝাড়ফুঁকে লাভ করেন বৈদ্যুতিক সেকের ফল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছেও বেলপাতার মর্যাদা আলাদা। জীববিজ্ঞানীও হুতোম, পেঁচা কিংবা টিকটিকির দৈব-প্রতীকতায় আস্থা রাখেন। এমনি করে নৃতত্ত্ববিদ কিংবা সমাজবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক কিংবা জ্যোতির্বিদ কেউই অধীত বিদ্যাকে জীবনে অধিগত বোধে পরিণত করেন না। জর্ডন-জমজম কিংবা গঙ্গার পানি, বার-তিথি-নক্ষত্র, হাঁচিকাশি-হোঁচট, জীন-পরী-অপ্সরা, ভূত-প্রেত-দৈত্য অথবা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও দৈব-কাহিনী তাঁদের কাছে তাঁদের অধীত বিদ্যা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের চেয়ে বেশি সত্য ও বাস্তব।

তাই নিজের সন্তানই যখন পিছু ডাক দেয়, তখন সে আর আত্মজ থাকে না, মুহূর্তের জন্যে হয়ে উঠে দৈব-প্রতীক, তেমনি হাঁচি কিংবা কাশিও থাকে না নিছক দৈহিক প্রক্রিয়া—বিশেষ বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মুহূর্তে হয়ে ওঠে দৈব-ইশারা। সেরূপ কাক, হুতোম পেচক কিংবা টিকটিকির ডাক হয়ে যায় দৈববাণী।

এ কারণে অধীত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান, আর লালিত বিশ্বাসের টানাপড়েনে স্থিতধী বুদ্ধিমান মানুষের জীবনেও ঘোচে না কর্মে ও চিন্তায় অসঙ্গতি, ভাব ও অনুভবের জটিলতা।

এই অসমন্বিত বিদ্যা ও বিশ্বাস লেখাপড়া-জানা মানুষকে সুস্থ হতে দেয় না। মানুষ হয় বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হোক, অথবা জ্ঞানকেই পাথেয় করুক—এই দুটোর অসমন্বিত মিশ্রণে মানুষ তার চরিত্রের ও চিন্তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে।

এর জন্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদও অনেকখানি দায়ী। আমরা বিজ্ঞানের বই ও দীনিয়াত একই ছাত্রের জন্যে একই সঙ্গে পাঠ্য করি। ফলে সে বিজ্ঞানের বইতে সৃষ্টিতত্ত্ব কিংবা প্রাণিতত্ত্ব পায় এক রকম, দীনিয়াতে পড়ে অন্য রকম। বদ্ধমনের ছাত্র দীনিয়াতকেই জানে জীবনের সত্য বলে, আর বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে পরীক্ষা পাসের বিদ্যারূপে। এ অসঙ্গতি তার জীবনে কখনো ঘোচে না। যে-ছেলে সমাজবিজ্ঞানে মানুষ, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবতত্ত্ব পড়ে ও মুখস্থ করে এবং প্রশ্নহীনচিত্তে যান্ত্রিক-নৈপুণ্যে পরীক্ষার খাতায় পুনরাবৃত্তি করে পরীক্ষককে চমকে দিয়ে আশি-নব্বই নম্বর পায়, সে হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে দেও-দানু-ভূত-প্রেত প্রভৃতির ভয়ে অস্থির কিংবা তাবিজ-কবচ মাধ্যমে দৈবানুগ্রহ লাভে তৎপর।

আবার যে-ছাত্র মুক্তমনের কিন্তু দুর্বলচিত্ত তারও জ্ঞানে-বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব কখনো ঘোচে না। তার অবস্থা আরো শোচনীয়। কেননা, তার জীবনে অসঙ্গতি আরো প্রবল ও প্রকট। সে কখনো সন্দেহ-তাড়িত, কখনো বা বিশ্বাস-চালিত। সে ঘরেও সুস্থ থাকে না, ঘাটেও পায় না স্বস্তি। এমনি লোকের যৌবন ও বার্ধক্য দ্বৈতসত্তায় হয় বিকৃত, প্রৌঢ়ত্ব থাকে পীড়িত।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় চান, তাঁরা চাঁদ-সূর্যের অদ্বয়রূপে উপস্থিতিই কামনা করেন। পরস্পর বিপরীত সত্যে আস্থা স্থাপন, কেবল যে চরিত্রহীনতার পরিচায়ক তা নয়, কোনো সত্যকেই গ্রহণ না-করার নামান্তর মাত্র। সামাজিক মানুষের জীবনে মূল্যবোধ জাগে যুক্তি অথবা বিশ্বাস থেকে। মূলত উপযোগ-চেতনাই মূল্যবোধের উৎস হলেও যুক্তি ও বিশ্বাসই তার বাহ্য অবলম্বন।

কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ। বলতে গেলে যুক্তির অনুপস্থিতিই বিশ্বাসের জন্মদাতা। যুক্তি দিয়ে তাই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণাও তেমনি বিড়ম্বনাকে বরণ করা ছাড়া কিছুই নয়।

আজকাল একশ্রেণীর জননেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজকল্যাণকামী মনীষী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুক্তি ও নীতিবোধের সমন্বয় ও সহ-অবস্থান কামনা করছেন। নতুন ও পুরোনোর, কল্পনার ও বাস্তবের, যুক্তির ও বিশ্বাসের অথবা দুই বিপরীত কোটির সত্যের সমন্বয় সাধন করে নতুনে ও পুরাতনে, সত্যে ও স্বপ্নে সঙ্গতি স্থাপনে তাঁরা আগ্রহী। তাই পুরোনো ধর্ম ও পুরোনো নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবন-চেতনার মেল-বন্ধনের উপায় হিসেবে তাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা দানেও উদ্যোগী। কিন্তু এর পরিণাম যে শুভ হবে না—অন্তত যে হয়নি তার প্রমাণ পাদ্রি স্কুল ও নিউস্কিম মাদ্রাসা।

অবশ্য উক্ত শ্রেণীর চিন্তাবিদদের সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত; তবে তাঁরা বিভ্রান্ত এ-ই যা। য়ুরোপে যাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যর আবিষ্কারক ও দার্শনিক সত্যের প্রবর্তক তাঁরা হয় নাস্তিক নয়তো সংশয়বাদী। আমরা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁদের বাণীই শুনি এবং চোখ মেলে দেখি তাঁদেরই কৃতি। অথচ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাই য়ুরোপীয় সাধারণ মানুষের দিকে—যেন এরাই এ কৃতিত্বের দাবীদার। এবং দেখি যে, এরা জীবনে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ও ধর্ম ছাড়েনি। কাজেই আমরাই বা ছাড়ি কেন? মনে ভাবি, বিজ্ঞানে-বিশ্বাসে বুঝি বিরোধ নেই। দুটোর সমন্বয়েই যেন সম্ভব হয়েছে য়ুরোপের প্রগতি ও ঐশ্বর্য, প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা। এমনি একটা ভুল অথচ দৃঢ়মূল ধারণার বশেই আমাদের শিক্ষাবিদদের এই সৎ-প্রয়াস। বহতা নদীর দুইকূল রক্ষা করা যায় না এবং দুই নৌকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা রাখাও বিপদসঙ্কুল—এই আপ্ত বাক্যদ্বয়ে আজো আস্থা রাখা নিরাপদ। তাই বিশ্বাস অথবা বিজ্ঞান—দুটোর একটা ছাড়তেই হবে। নইলে মানুষের চারিত্রিক বিকৃতি বাড়বে বই কমবে না।

অবশ্য এককালে বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানুষ দুঃখে-বিপদে প্রবোধ ও শক্তি পেয়েছে সে-পথেই। তখন কিন্তু জ্ঞানের প্রসার হয়নি, তখন বিজ্ঞানও হয়নি জীবন-যাত্রার অবলম্বন। বিশ্বাসই ছিল মানুষের অভয় শরণ। আজ যুক্তি ও বিজ্ঞানের মোকাবিলায় বিশ্বাস দেউলে। বিশ্বাসের মহিমা কীর্তনে আজ আর কী ফল! চালু ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতারিত করা অসুস্থ মনেরই পরিচায়ক মাত্র।

যাঁরা মানুষের নৈতিক জীবনের মানোন্নয়ন-বাঞ্ছায় ধর্মশিক্ষা কামনা করেন, তাঁদেরকে এ আশ্বাসটুকু হয়তো সঙ্গত কারণেই দেয়া যায় যে, যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞান-চেতনার মাধ্যমেও জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে নতুন নীতিবোধ জাগানো সম্ভব এবং নৈতিক জীবনও উন্নততর করা দুঃসাধ্য হবে না। কেননা মানুষের মানবিক গুণের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পাঠে। যুক্তিপ্রবণতার উদ্ভব ও বৃদ্ধি এতেই হয়। আর বিজ্ঞান করে যুক্তিনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধ।

কিন্তু এতেও মাকড়সার জালের মতো এক সূক্ষ্ম বাধা মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। আজকাল সরকার, শিক্ষক ও অভিভাবক সবাই বৃত্তিমূলক বিদ্যার অনুরাগী ও পক্ষপাতী। তাঁরা জনগণকে ও ছাত্রকে বৃত্তিমূলক বিদ্যার উপযোগ সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেয়ার প্রয়াসী। 'পেশাগত লক্ষ্য স্থির করেই পড়'— এ-ই হচ্ছে তাঁদের স্লোগান। শুনে শুনে ছাত্রছাত্রীরাও লেখাপড়াকে 'পেশা শিক্ষা' বলেই মনে করে। বিদ্যার্জন যেন ভাবী পেশারই Training। ফলে 'লেখাপড়া করে— বিদ্যার্জন করে শিক্ষিত হও, মানুষ হও —এমন কথা আজকালকার ছেলেমেয়েরা শুনতেই পায় না। মানবিক বৃত্তির পরিশীলন, পরিস্রুতি ও বিকাশের জন্যেই বিদ্যার্জন এবং বিদ্যার্জনেই যে বিদ্যাচর্চার শেষ —এর বৈষয়িক গুরুত্ব থাকলেও তা যে ছাত্রছাত্রীদের অমন করে জানিয়ে দিতে নেই, এ যুগে সে-কথা কেউ স্বীকারই করেন না। ফলে লেখাপড়া শিখে লোক যন্ত্রীই হচ্ছে, মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা পাচ্ছে না। তাই সমাজে এখন লেখাপড়া-জানা যুবকেরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-অধ্যাপক বা সরকারি-সওদাগরী কর্মচারী হয়। সততায়, প্রীতিবানতায়, পরার্থপরতায়, উদারতায়, মানবিকতায় ও বিচারশীলতায় মানুষ হয় কৃচিৎ। এর পরিণাম যে সমাজের পক্ষে শুভ হচ্ছে না, তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাকে এভাবে বিষয়বৃত্তির অনুগত করে সীমিত লক্ষ্যে নিবদ্ধ রাখা আর মানবমনীষা ও মানবিক বৃত্তিতে জৈবিকতার সংকীর্ণ সীমায় নিয়ন্ত্রিত করা একই কথা। এতে প্রাণ বাঁচে কিন্তু মন নিশ্চিতই মরে এবং প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

WWW.AMARBOI.COM

প্রতিকার-পন্থা

অন্যায়ের প্রতিকার-পন্থা, হৃত-অধিকার আদায়ের উপায় ও পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির নানা রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নানা চিন্তা-ভাবনা করেছে। এবং বিচিত্র পথে এই প্রতিকার-প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রত্যেকটা উপায় ও নীতি আপাতদৃষ্টে যৌক্তিক। কেবল দেশ-কাল ও ব্যক্তি ভেদে সেগুলোর উপযোগ ভেদ ঘটেছে মাত্র। এক গোষ্ঠীর মতে যে-নীতি বাঞ্ছিত ও প্রযোজ্য, অপর গোষ্ঠীর ধারণায় তা অবাঞ্ছিত ও পরিহার্য। এমনি করে কাল এবং কর্তা ভেদেও পরিবর্তিত হয়েছে নীতি-পদ্ধতি। ক্রমবির্বতন ও ক্রমউৎকর্ষ-ধারায় এই নীতি-পদ্ধতি আজ যে-স্তরে উন্নীত তাও সন্তোষজনক নয়, সবার মনঃপুত তো নয়ই। এখনো তা উন্নয়ন ও বিকাশ সাপেক্ষ। এই নীতি-পদ্ধতি দৈশিক, গৌত্রিক, কিংবা জাতিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিকবোধ বিকাশের অন্যতম পরিমাপক হলেও তা দেশ-গোত্র-জাতির সব মানুষের বোধ-বুদ্ধি-সংস্কৃতির আনুপাতিক মান নির্ণয়ের মাপকাঠি যে নয়, তাও উল্লেখ্য। কেননা, এ নীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত ও প্রযুক্ত হয় দেশ, গোত্র বা জাতির নেতা বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা। নেতা বা কর্তাগণের মন-বিদ্যা-বুদ্ধি ও নীতিবোধই থাকে এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল, অন্যমানুষের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ। আবার ব্যক্তিগত প্রতিকার- নীতি ও গোষ্ঠী বা জাতিগত প্রতিকার-পদ্ধতিতে পার্থক্যও সামান্য নয়। এখানেও উপযোগ ও প্রয়োগভেদ স্বীকৃত।

ব্যক্তিগত প্রতিকার-প্রয়াসে কেউ প্রতিহিংসা নীতিতে আস্থাবান, কেউ ক্ষমার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ, কেউবা স্থান-কাল-পাত্রভেদে কখনোবা শাস্তি, কখনোবা ক্ষমার পক্ষপাতী। কিন্তু গোত্রীয়, জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রায় সবাই প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ নীতিকেই মোক্ষম বলে মানে। তাই হন্তা ও যোদ্ধাই বীর ও মহাপুরুষরূপে পরিকীর্তিত।

এক্ষেত্রে 'বিষে বিষ ক্ষয়' 'বুনো কচু ও বাঘাতেঁতুল' এবং 'শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ' —এই সুপ্রাচীন নীতির তত্ত্বগত সত্য ও তথ্যগত যাথার্থ্য বহু পরীক্ষিত। বহুলপ্রযুক্ত এই নীতি বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলে নির্ভরযোগ্য। কেননা, 'মানুষ শক্তের ভক্ত, নরমের যম'। এ পন্থা বাহুবল ভিত্তিক এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপ্রসূ। এক্ষেত্রে কুশলী দুর্বলের নীতি হচ্ছে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা' কিংবা 'হাতী দিয়ে হাতী বাঁধা'।

শামীয়জগতে প্রতিকার-নীতির ক্রমবিকাশের ধারায় তিনটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি দেখতে পাই। হযরত মুসা বলেন, 'দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ উপড়াও'। অর্থাৎ বাহুবলে প্রতিরোধ কর, প্রতিশোধ নাও, কিন্তু অপরাধ ও শাস্তির সমতা রক্ষা করো তথা অন্যায় ও তার প্রতিকার আনুপাতিক হওয়া চাই।

হযরত ঈসা বলেন— 'একগালে থাপ্পড় পেলে তো অপর কপোলও থাপ্পড় নেয়ার জন্যে উন্মুক্ত কর'। অর্থাৎ প্রতিরোধ করো না, প্রতিশোধ ব্যবস্থা মনে ঠাঁই দিয়ো না, বরং মহত্ত্ব ও ক্ষমা দিয়ে অন্যায়কারীর হৃদয় জয় করো—যাতে সে চিরকালের জন্যেই অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়—ক্ষমা ও মহত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে।

হযরত মুহম্মদ বললেন— 'পারো তো ক্ষমা করো, নইলে শাস্তি দাও।' অর্থাৎ স্থান- কাল-পাত্রভেদে ক্ষমা বা শাস্তির উপযোগ ও প্রয়োগসাফল্য নজরে রেখো।

এদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদে আস্থা রাখে। পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার অমোঘ। গীতায় দুষ্কৃতিদমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ প্রতিকারের চেয়ে অন্যায়-বিরতিতে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তাঁর দশশিক্ষা Precautionary ও Preventive ব্যবস্থারূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিগণিত। পার্থিব সবকিছুকে নশ্বর ও তুচ্ছ জেনে মায়া ও তৃষ্ণা তথা আকাঙ্ক্ষা ও মোহমুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন তিনি। এমনি রীতি ও সংযমের কথা অবশ্য সব ধর্মেই রয়েছে। মহত্ত্ব, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাকেই তিনি উত্তম ও শ্রেয় বলে জেনেছেন। রাজোবাদ জাতকের কাহিনীতে তাঁর এ মনোভাব সুপরিব্যক্ত। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকুমার এবং কোশলরাজ মল্লিক উভয়েই সমসাময়িক এবং আদর্শ ধার্মিক রাজা। প্রজারা তাঁদের শাসনে-পালনে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে। একদিন এই দুইরাজ্যের দুইরাজার রথ একই রাস্তায় এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। এখন কে কাকে পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবেন, সে হল সমস্যা। উভয় রাজাই সমবয়স্ক। কাজেই বয়সের দাবীও টেকে না। এমনকি তাঁদের কুলগৌরব, রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য, যশ এবং জনপ্রিয়তাও সমান। এখন উপায়? অবশেষে স্থির হল, চরিত্রবলে যিনি মহত্তর, তাকেই পথ ছেড়ে দেয়া হবে।

প্রথমে কোশলরাজ মল্লিকের গুণপনা বর্ণিত হল : 'তিনি কঠোরে কঠোর এবং কোমলে কোমল; আর সাধুজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং শঠের সঙ্গে শাঠ্যনীতি অনুসরণ করেন।'

আর বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকুমার 'অক্রোধের দ্বারা ক্রুদ্ধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে শিক্ষাদানের নীতির মাধ্যমে শাসন করেন।'

এমনি কাহিনী মহাভারতেও রয়েছে। সেখানেও কৌরব সুহোত্র এবং উশীনর-পুত্র শিবির রথ মুখোমুখি হলে চরিত্রগুণে শিবিই পথের অধিকার পান। কেননা, তিনিও দানের দ্বারা কৃপণের ক্ষমার দ্বারা ক্রূরকর্মার, সত্যবাদিতার দ্বারা মিথ্যুকের এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুর চরিত্র সংশোধনের আদর্শ অনুসরণ করতেন।

বায়জিদ বিস্তামীকে যে মাতাল আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল 'তাকে পরদিন তিনি বললেন, 'ভাই, আমার মাথায় ঠেকে যে তোমার বীণাটি ভেঙে গেল তাতে আমি দুঃখিত।'

কিংবা চৈতন্যদেবকে যে জগাই-মাধাই লাঞ্ছিত ও আহত করল, তাদেরও তিনি বললেন, 'ভাই মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?' —গৌতমবুদ্ধ বায়জিদ কিংবা চৈতন্যদেবের এসব মহত্ত্ব আদর্শের ক্ষেত্রে মানুষ অত্যন্ত মূল্যবান বলেই জানে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় বলে মানে না।

এ পর্যন্ত যে-সব নীতি-পদ্ধতির কথা বলা হল সবগুলোই পুরোনো কালের। তবে এ-যুগেও সে-সব মূল্য-মর্যাদা হারায়নি।

এ-যুগে বিশেষ করে ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক জীবনে পীড়ন-প্রতিকার নিয়ে মানুষ বিশেষ মাথা ঘামায় না। একালে সব-সমস্যা জাতিক ও রাষ্ট্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সমাধান প্রয়াসও চলছে যৌথপ্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং প্রতিকারনীতিও তাই জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নির্মিত ও প্রযুক্ত হয়।

গ্যারিবল্ডী বাহুবল-নির্ভর হিংসাত্মক সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় ক্ষুধার, যন্ত্রণার ও মৃত্যুর পথেই আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে।

মাও সে-তুঙও আপোষহীন রক্তক্ষরা সংগ্রামে আস্থাবান। তিনি বলেন : Political power grows out of the barrel of a gun—মার্কস লেনিনেরও ছিল এ মত।

নিগ্রো মনস্তত্ত্ববিদ Frantz Fanon তাঁর 'The wretched of the Earth' গ্রন্থে বলেছেন :

Violence is a cleansing force. It frees the native from his inferiority complex and from his despair and inaction, it makes him fearless and restores his self-repect.

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

'ক্ষমা যেথা হীন দুর্বলতা' বলে অপব্যাখ্যাত হয়, সেখানে কঠোর হতে হবে। এই কঠোরতা নিশ্চয়ই হিংসাত্মক বা শাস্তি সমর্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকার পদ্ধতিটা কবিসুলভ হলেও এব্যাপারে তাঁর আরো স্পষ্ট উক্তি রয়েছে :

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

গান্ধী অহিংস প্রতিরোধ ও অসহযোগকেই প্রতিকার পদ্ধতিরূপে বরণ করেছিলেন।

জওয়াহেরলাল নেহেরুর আস্থা ছিল Co-existence নীতিতে। এটি মূলত নৈতিকবোধের প্রীত আবেদন।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নীতি-পদ্ধতি হয়েছে সালিশির মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা। এটিও সদিচ্ছা ও শান্তিপ্রিয়তা সাপেক্ষ।

L. B. Johnson এক বক্তৃতায় বলেছেন, আজকের প্রতিকার পদ্ধতি হবে— To convert hostility into negotiation, bloody violence into politics and hate into reconciliation.

কেউ কেউ বলেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অন্যায় এবং পীড়নের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও নিরস্ত্র প্রতিরোধ কার্যকর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ এবং শাসন ও শান্তির জন্যে সশস্ত্র শক্তির প্রয়োজন। যে গান্ধী অহিংস অসহযোগ ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছেন, তিনিই স্বাধীন ভারতে প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শাসন-শান্তির জন্যে সহিংস-সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কিংবা জনসনের উক্ত নীতিতে নতুন কিছু নেই। প্রতিকার ব্যবস্থায় বাহুবল ও জনবলহীন মানুষ চিরকালই আশ্রয় নিয়েছে আইন-আদালতের। আর ধনবলহীন মানুষ প্রতিকার খোঁজে সালিশে। এ দুটোই শক্তিমান লোকের কাছে অবজ্ঞেয়।

আসলে ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লাহর কাছে গোহারী করে কিংবা নালিশে-সালিশে-ক্ষমায় প্রতিকার চেয়ে নির্বলই প্রবোধ এবং সান্ত্বনা খোঁজে। সবল চিরকালই নিজ হাতে স্বশক্তি প্রয়োগে প্রতিকার করেছে বা প্রতিকারের চেষ্টা করেছে। অস্ত্রাভাবেই গান্ধী ছিলেন অহিংস প্রতিরোধ-প্রতিকারের প্রবক্তা, অস্ত্রাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সশস্ত্র শক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠেন। কাজেই বাহুবল-ধনবল-জনবল যার আছে, সে কখনো সালিশে-নালিশে, দোহাই-গোহারীতে কিংবা শাপে-বরে বিশ্বাস করবে না। বোঝা যাচ্ছে দুর্বল ও অক্ষমই কেবল মহৎ আদর্শের বুলি কপচিয়ে আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষার উপায় খোঁজে। সবল ও পরাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে ওসব হাস্যকর বালভাষণ।

তবু মনে হয়, মহৎ আদর্শে কোনো অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিহিত রয়েছে। নইলে প্রবল পরাক্রমশালীও একে প্রকাশ্যে সোজাসুজি তাচ্ছিল্য করতে সংকোচ ও লজ্জাবোধ করে কেন? কেন তারা অপকর্মের জন্যে ছলচাতুরীর আবরণ খোঁজে? কেন তাদের অন্যায় অপকর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে চায়? কেন আজ অস্ত্রবল সঞ্চয়ে তৎপর হয়েও তারা অস্ত্রসংবরণ ও অস্ত্রবর্জনের কপট বুলি আওড়াতে বাধ্য হচ্ছে?

কাজেই আপাত অকেজো ও অশ্রদ্ধেয় সহিষ্ণুতা সালিশ, ক্ষমা ও নিরস্ত্র প্রতিরোধও যে মানুষের মানবিক বোধ-বুদ্ধির বিকাশের সহায়ক, নৈতিক চেতনা বৃদ্ধির অনুকূল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আজ আর রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্রনায়কেরা আগেকার রাজা-বাদশার মতো প্রভু ও শাসক নন। এখন তাঁরা একাধারে শাসক ও সেবক। সেজন্যে গণসমর্থন ব্যতীত তাঁদের স্থিতি অসম্ভব। নাগরিক মনে নৈতিক-চেতনা ও আদর্শানুগত্য থাকলে তা রাষ্ট্রপতির চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করেই। কেননা তাঁর হুকুম অমান্য করবার লোক তাঁর রাষ্ট্রেই থাকে এবং তাঁরা নিরস্ত্র হয়েও সশস্ত্রবাহিনীর চেয়ে প্রবল। এই জনমত-রূপ আদর্শের প্রেরণা-পুষ্ট মনোবলের মতো বল আর নেই। ভিয়েতনামের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরোধী জনমতে সে ইশারাই পাওয়া গেছে। এমন দিনও হয়তো আর দূরে নয় যখন সৈন্যেরাও প্রাণের প্রেরণা ছাড়া কেবল হুকুমের চোটে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করবে। অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের কারণই হবে অপগত। এ মনোবল আসে বিশ্বাস-মুক্তি ও মুক্তবুদ্ধি থেকে। আগের যুগে মানুষের জীবন ছিল বিশ্বাস-নির্ভর ও সংস্কার-ভিত্তিক; এখনকার অনেক মানুষের জীবনই বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ। তাই আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান এবং তজ্জাত সাহস বেশি। ভয় ও সন্দেহ-সংশয়ের স্থলে আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তিই সাহস করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে। অন্যেরা যখন ভয়ে ও সংশয়-সংকোচে জড়বৎ অচল, তখন সাহসীই প্রথমে কদম বাড়ায়। আর এই পয়লা কদমই পৌরুষ ও কাপুরুষতার পরিমাপক। —'নামর্দমী-মর্দমী কাদমে ফাসেলা দারাদ'। —মর্দামী না-মর্দামীর মধ্যে ওই এক-কদমেরই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধান কত ব্যাপক গুরুতর ও তাৎপর্যময় আর কী যুগান্তকারী পরিণামপ্রসূ! মরদের এই বাড়তি কদমই লক্ষ হৃদয়ে শক্তি ও সাহস যোগায়। এই বাড়তি কদমই নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী—মানবভাগ্যের নিয়ন্তা, দেশ-দুনিয়ার মানুষের শক্তির ও ভরসার আকর। এখনকার দিনে ভয়-সংশয় জয় করে পা বাড়ানোর লোক অনেক। তাই জনতা শক্তিমান, তাই জনতা ও জনমত প্রবলতম শক্তিরও বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী।

জার্মান দার্শনিক Riechl বলেছেন, 'মানুষই একমাত্র প্রাণী যে মেরুদণ্ডের উপর শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।' মানুষ তা পারে, কারণ মানুষের জীবনে আদর্শ আছে, উদ্দেশ্য আছে, আছে মহৎ লক্ষ্যে উত্তরণের আগ্রহ। এ মহৎ লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার মানবমনীষার ও মানবসংস্কৃতির পূর্ণবিকাশ। প্রতিকার-বাঞ্ছা যুক্তি ও প্রয়োজনবুদ্ধি সাপেক্ষ। বিশ্বাসের সঙ্গে যেহেতু নিয়তিবাদ যুক্ত সেহেতু বিশ্বাসের আনুগত্যের চেয়ে বড় কারাগার নেই। বিশ্বাসের কবল-মুক্তির চেয়ে বড় মুক্তিও তাই নেই। আগের যুগে অজ্ঞ অসহায় মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিশ্বাস-ভিত্তিক। তাই তাঁরা বিশ্বাসীর চোখে গরুকেও দেখেছে দেবতারূপে আর বিশ্বাসের অভাবে হযরত নুহকে করেছে বিদ্রূপ। এবং হযরত ঈসাকে চড়িয়েছে শূলে, তাড়িয়েছে মুসা ও মুহম্মদকে। মনে যুক্তিবোধের উদয় হলেই কেবল মানুষ শ্রেয়সকে ও কল্যাণকে সহজেই বরণ করতে পারে, তা যতই নতুন ও অভাবিত হোক না কেন। মনে যুক্তি-বুদ্ধির ঐশ্বর্য থাকলেই তবে মানুষ পরিহার্য পুরাতনে আস্থা ও আকর্ষণ হারাবার যোগ্যতা অর্জন করে। এ-কথাটা বুঝতে চাননি বলেই হাকিম ইবনে সীনা বৃথা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন :

গাও-রা দারান্দা বাওর দর্ খোদায়ে আমি'য়া
নুহরা বাওর না দারান্দ আজ পে পয়গম্বরী।

—গরুকে খোদা বলে মানতে তোমাদের বাধে না, নুহকে পয়গম্বর বলে মানতেই তোমাদের যত আপত্তি!

একালে মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার ও যুক্তি-বুদ্ধির দ্বান্দ্বিক টানাপড়েনে উদ্ব্যস্ত। তাই তারা কখনোবা বিশ্বাস চালিত, কখনোবা সন্দেহতাড়িত, আবার কখনোবা যুক্তিনিষ্ঠ। এ কারণেই কখনো তাঁরা আদিম ও স্থূল আবার কখনো শীলবান ও পেলবচিত্ত।

বস্তুত বাহুবল ও সশস্ত্র প্রতিকার-পদ্ধতি আজো real এবং বিবেক-বুদ্ধির কাছে নিরস্ত্র নিবেদন আজো ideal পাণঘাতী ও রক্তক্ষরা শাস্তিই শায়েস্তা করার মোক্ষম প্রতিকার-নীতি —এটি আজো real; আর প্রীতি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি এখনো ideal প্রতিকার-পদ্ধতি।

অতএব একটি real, অপরটি ideal. Real-এ আপাত কার্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু পরিণাম নিষ্ফল। Ideal-এ আপাত ব্যর্থতা অবধারিত, কিন্তু পরিণাম ফলপ্রসূ। Ideal-এ পৌঁছতে সময় লাগে, real-এর ফল তাৎক্ষণিক। Ideal ভুললে আমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে, আর real-কে অস্বীকার বা অবহেলা করলে আমরা পথে দাঁড়াব। Ideal-হীনতা মনের নিঃস্বতা ও মানবিকবোধের নির্লক্ষ্যতার পরিচায়ক, আর real-এর প্রতি ঔদাসীন্য চলমান জীবনকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর। Real-এর উপযোগ বর্তমানে, আর ideal ভবিষ্যতের পুঁজি। Real প্রাণে বাঁচায়, ideal মন গড়ে তোলে। প্রাণে না বাঁচলে মন অস্তিত্ব পায় না, আবার মনের পরিচর্যা না হলে প্রাণে বাঁচা অসার্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমাদের আপাতকর্তব্য শোভন ও পরিস্রুত পদ্ধতিতে real-কে বরণ করা যাতে তা ideal -এর পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত মানুষের মানবিক বোধের ও কর্মের তথা সংস্কৃতির ও সভ্যতার বিকাশ এভাবেই হচ্ছে। নতুবা যুদ্ধ ও যুদ্ধবাজ ঘৃণ্য হল কী করে? শান্তির সপক্ষে এত মানুষ উচ্চকণ্ঠ কেন? অথবা নিরস্ত্রীকরণের কথাই বা ওঠে কী করে? কাজেই মানুষ ideal-এর দিকে মন্থর গতিতে হলেও—এগুচ্ছে, এটিই আশা ও আশ্বাসের কথা। নইলে কত বর্বরতা ও বর্বরনীতি মানুষ পরিহার করল কী করে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্যসূত্র

প্রাণী হিসেবে মানুষ একটা Species বা প্রজাতি। এ কারণে মানুষ মাত্রেরই জীবন- চেতনায় কতগুলো মৌলিক ঐক্য রয়েছে। ঘৃণায় ও ভালোবাসায়, লোভে ও ত্যাগে, ক্ষমায় ও প্রতিহিংসায়, সমাজবোধে ও সহযোগিতায়, দায়িত্বচেতনায় ও কর্তব্যবোধে, দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে মানুষ প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বোধের তারতম্য বা মাত্রাভেদ আছে মাত্র।

আবার প্রাচীন গোত্রীয় সমাজভুক্ত মানুষে কিংবা পরবর্তীকালের ধর্মীয় মতভুক্ত সমাজেও একপ্রকার আচারিক ঐক্য মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

তাছাড়া, ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীগত অভিন্নতাও মানুষের জীবনযাত্রায় ঐক্যদান করে।

কাজেই মানবিক ঐক্য, গোত্রীয় ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য ও ভাষিক ঐক্য মানুষের মনে, মননে ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় তাদের স্ব স্ব প্রভাব রাখে।

এদের প্রত্যেকটিরই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কখনো অভিন্ন ভাষার প্রভাবে কখনো অভিন্ন ধর্মের প্রেরণায়, কখনো ভৌগোলিক জীবনের প্রয়োজনে, কখনো গোত্রীয় আকর্ষণে অতীতে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনে ও জীবিকায় বিকাশ, প্রসার ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এখনো যে তা একেবারে অবলুপ্ত তা বলা যাবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে চিন্তার ও জীবিকার অভিন্নতা তথা মতের ও স্বার্থের ঐক্যই মানুষকে দিয়েছে সঙ্ঘবদ্ধতা, দিয়েছে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের প্রেরণা। কেননা সাধারণ মানুষের জীবনচেতনা ও অধিকারবোধ তখনো সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেনি। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয়প্রসূ জ্ঞানের ও সামর্থ্যের অভাবে তাঁরা তখনো সর্দার বা গোত্রপতি-নির্ভর জীবনে স্বস্তি খুঁজেছে। বৈষয়িক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য তখনো নিজের হাতে নেবার উপায় ছিল না পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীগত কারণেই। তাই গ্রীক City state থেকে অত্যাধুনিক কাল অবধি প্রবল দুরাত্মারাই জনগণের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণের তথা শাসন-শোষণের নির্বিঘ্ন অধিকার পেয়ে এসেছে। তারাই অজ্ঞ ও দুর্বল জনমনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে রাজার সুখেই প্রজার সুখ, রাজার গৌরবেই রাজ্যের গৌরব, রাজার ঐশ্বর্যই জাতির সম্পদ, রাজার যশই দেশের যশ, রাজার বিলাসেই গণ-সংস্কৃতির বিকাশ। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, রাজা ও রাজপার্ষদ—দু-ই দেশ ও জাতির প্রতিভূ এবং তাঁদের যশ-মান-সম্পদই জাতীয় সমৃদ্ধি ও গৌরবের প্রতীক। আর মানুষের দুঃখ-দুর্ভোগ তার নিয়তি-নির্ধারিত। রাজার কেবল শাসন-শোষণের বিধিদত্ত অধিকারই আছে, পোষণের দায়িত্ব কিংবা দুঃখমোচনের কর্তব্য তার নয়। তাই কোনো রাজা যদি দীঘি-সড়ক-সরাই দিতেন, তিনি হতেন মহানুভব, মহামতি বদান্য রাজর্ষি।

২

সে-দিন ও সে-মন আর নেই। আবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রয়োগে আজকের দিনে মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। ভাব-চিন্তা-কর্মেও এসেছে বক্রতা ও বৈচিত্র্য। পণ্য উৎপাদনের সহজতা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, জনসংখ্যার অসম সংস্থিতি এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে অধিকারের রাষ্ট্রিক তারতম্য প্রভৃতি অসামান্যরূপে জটিলতর করেছে মানুষের জীবিকার সমস্যা। ফলে মানুষ মরিয়া হয়ে খুঁজেছে বাঁচার পথ। সে-বাঁচার পথ এক-এক জনের চোখে এক-এক রকম। মেরে বাঁচা, কেড়ে বাঁচা কিংবা বন্টনে বাঁচা যেমন, তেমনি সহযোগিতায়, সহ-অবস্থানে ও সমদর্শিতায় বাঁচাও সম্ভব। কাজেই নানা বিরুদ্ধ-পথের বিভ্রান্তি ও বিবিধ বিপরীত মতের সংঘর্ষে মানুষের বৈষয়িক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিক তথা জৈবিক ও মানবিক সমস্যা জটিল ও বিপুল হচ্ছে। আর আনুপাতিক হারে মানুষ কখনো স্বাতন্ত্র্যে, কখনো সহযোগিতায়, কখনোবা জাতীয়তায়, কখনো মানবতার আদর্শে, কখনো আত্মরক্ষার নামে এসবের সমাধান খুঁজেছে। তাই দুনিয়াব্যাপী সমস্যা-পীড়িত দুর্বলরাষ্ট্রে নানা আনুষঙ্গিক উপসর্গও দেখা দিয়েছে। ফলে আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র মতাদর্শের হট্টগোল উঠেছে। গরজ ও সুবিধেমতো গলাবাজি করেই জয়ী হতে চায় সবাই।

কোনো কোনো রাষ্ট্র যেমন ধর্মীয় ঐক্য, ভাষার ঐক্য, রাজনীতিক মতবাদের ঐক্য, গোত্রীয় ঐক্য কিংবা ভৌগোলিক ঐক্যের নামে জন-সংহতি রক্ষণে ও গণ-বিদ্রোহ ঠেকাতে ব্যস্ত; তেমনি কোথাও আবার আর্থিক, ভৌগোলিক কিংবা গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে বা মতবাদের অনৈক্যের অজুহাতে একরাষ্ট্র ভেঙে একাধিক রাষ্ট্র গড়ে উঠছে।

উভয়ক্ষেত্রেই বিবেকহীন বড় শক্তিগুলো নির্লজ্জভাবে—এমনকি U NO-ও—নিজেদের স্বার্থানুসারে পরস্পর বিপরীত যুক্তিপ্রয়োগে কখনো সমর্থন, কখনো বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য, জার্মানি, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি ভাঙতে যেমন তারা উৎসাহী ছিল, কঙ্গো-কাশ্মীর-বায়াফ্রা কিংবা নাগাভূমের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে তারা তেমনি কুণ্ঠিত। কিংবা তিব্বত-সাবাহ-বর্ণিও-সাইপ্রাস ব্যাপারে তাদের অন্যনীতি। আবার দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া কিংবা আরব-ইসরাইল সমস্যা সম্পর্কে তারা দার্শনিক।

রাজনীতিক খেল ও আর্থনীতিক চাল গোপন রেখে তাঁরা দেশ বা রাষ্ট্র ভাঙাগড়ার ব্যাপারে তিনটে আদর্শের স্লোগান আওড়ায়—সাংস্কৃতিক ঐক্য বা স্বাতন্ত্র্য, অভিন্ন বা ভিন্ন জাতীয়তা এবং মতবাদের ঐক্য বা পার্থক্য। স্বার্থিক গরজে কখনো ঐক্যের কথা বলে তারা মিলন ঘটায়, কখনোবা স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে। সংহতি ও বিচ্ছেদ দুটোই তাদের সমান প্রিয়। এবং প্রয়োজনমতো প্রয়োগে তাঁরা রীতিমতো সব্যসাচী।

ম্যাকিয়াভেলীই এ যুগের রাষ্ট্রপতি ও দেশনায়কদের গুরু। ছলনা, প্রতারণা ও বাকচাতুরীই তাদের পুঁজি—শক্তির উৎস ও ভিত্তি এবং নীতি ও অস্ত্র। এই নীতি ও অস্ত্র প্রয়োগে তাদের আপন-পর, ঘর-বাহির ভেদ নেই। এই শাস্ত্র ও শস্ত্রের ব্যবহারে তাদের সমদর্শিতা অতুল্য। নতুন ও পুরোনো, ছোট ও বড় সব রাষ্ট্রেরই একরূপ।

AMARBOI.COM

৩

সংস্কৃতিতেও থাকে স্থান-কাল-পাত্রভেদ। সংস্কৃতি তাই কোনো রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের ব্যক্তিক বা সামষ্টিক জীবনে অবিমিশ্র ও অভিন্ন হতে পারে না। কেননা ভৌগোলিক আবহাওয়া, জীবিকা, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মমত, গোত্রীয় সংস্কার, ভাষিক প্রভাব, নৈতিক চেতনা, আচারিক প্রথা এবং উন্নততর বিদেশী ভাব-চিন্তা-আচার প্রভৃতির প্রত্যেকটির প্রভাবে রূপ পায় সংস্কৃতি। এজন্যেই একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জার্মান-ফরাসি-ইংরেজের কিংবা আরব-ইরান-তুরস্কের সংস্কৃতি এক নয়, জাতীয়তাও নয় অভিন্ন।

গোত্রীয় ঐক্য বা নৃতাত্ত্বিক অভিন্নতাও এক সংস্কৃতি কিংবা এক জাতি গড়ে তোলে না—যেমন আর্য, সামীয় অথবা মঙ্গোলীয় মাত্রই এক জাতি ও এক সংস্কৃতিভুক্ত থাকেনি। আবার গোত্র, ভাষা, দেশ, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি অভিন্ন হলেও এক সংস্কৃতি ও এক জাতি থাকে না—শিক্ষা সম্পদ, মত, আদর্শ ও স্বার্থভেদে সংস্কৃতি ও জাতি-চেতনায় স্বাতন্ত্র্য আসে—যেমন আরব রাষ্ট্রগুলো, যেমন কোরিয়া, জার্মানি ও ভিয়েতনাম। বস্তুত জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা আধুনিক উপসর্গ এবং তাই কৃত্রিম। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপেই এ দুটোর উদ্ভব, প্রসার ও স্থিতি এবং রাষ্ট্রগঠন ও রক্ষণকর্মেই কেবল এগুলো প্রযুক্ত। তা ছাড়া আজকের বিশ্বে ও-দুটোর আর কোনো উপযোগ নেই। প্রাগ্রসর বিবেকবান মানবকল্যাণকামী মানুষ যখন আন্তর্জাতিকতায় ও বিশ্বমানবতাবোধের স্বপ্নে আনন্দিত ও আশ্বস্ত, তখন এ দুটো আদর্শ প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা ছাড়া রাষ্ট্র গঠন ও রক্ষণ ব্যাপারে জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতাও যে কেজো নয়—হৃতউপযোগ, তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আসলে সমস্বার্থের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র আর সমস্বার্থের স্বীকৃতিতে সহযোগিতায় ও সমদর্শিতায় টিকে থাকবে রাষ্ট্র। এর থেকে দৃঢ় ঐক্যসূত্র, এর থেকে বড় বন্ধন দুনিয়াতে কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। পরিবারে-গোত্রে-সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে স্বার্থ। এজন্যেই দস্যু-তস্করের মতো দুশ্চরিত্র লোকও সমস্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে। এরা দায়িত্ব-চেতনা, কর্তব্য-বুদ্ধি, সততা, আনুগত্য ও পারস্পরিক আস্থার প্রমূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রচলিত অর্থে অমানুষ এই দস্যু-তস্করের চরিত্রে এক অর্থে সুনাগরিকের সবগুণই বর্তমান। তাঁদের স্বাদল্য, কমরেডীভাব ও নীতিনিষ্ঠা তথা অঙ্গীকারনিষ্ঠতা অনুকরণীয়। মূলত স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে সৌজন্য ও সহৃদয়তার মিশ্রণ ঘটিয়ে, পরিবারে ও সমাজে পারস্পরিক ব্যবহারে প্রীতির মাধুর্য ও শোভনতার লাবণ্য দান করেই সভ্য ও সংস্কৃতিবান হয়েছে মানুষ। এরই নাম ন্যায়-নীতি-আদর্শ তথা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা। অতএব সমস্বার্থের ভিত্তিতে সহ-অবস্থান, সহযোগিতা ও সমদর্শিতাই এ যুগে রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের ঐক্যের ও সংহতির একমাত্র সূত্র। ঠকাঠকিতে বাপ-ভাইয়ের সঙ্গেও ঠোকাঠুকি অনিবার্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা

জিজ্ঞাসা জৈবিক বৃত্তি কিনা জানিনে, কিন্তু মানবিক যে তাতে সন্দেহ নেই। বলতে গেলে বিশেষ অর্থে ওটাই মানুষের RATIONALITY-র ভিত্তি, প্রাণিজগতে মানুষের Differentia. কেননা জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উদয়, চিন্তার উদ্ভব, অনুশীলন তথা বিকাশ। জিজ্ঞাসাই মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের মূল প্রেরণা। জিজ্ঞাসার অশেষ আকুতিই চিন্তা ও কর্মে প্রবর্তনা দেয়। এই জিজ্ঞাসাই কল্পনাজগতের উপর মানুষের আধিপত্যের কারণ এবং বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পাদি কলার জন্মদাতা। এক কথায় মানুষের যা-কিছু স্বকীয় তা জিজ্ঞাসার দান।

কার্যকারণ জানবার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। কার্যের কারণ আবিষ্কারের কৌতূহল মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। বলা চলে যে-কোনো ঘটনার পশ্চাতে অন্তত যেমন-তেমন একটা কারণ অনুমান করতে না পারলে বা না করে সে স্বস্তিবোধ করে না। যেমন পৃথিবী কখনো কখনো কেঁপে ওঠে—নড়ে ওঠে। কিন্তু কেন? ভেবে ভেবে সে বের করল পৃথিবীটা সহস্রমুণ্ড নাগের মাথায় কিংবা গরুর শৃঙ্গে স্থাপিত। ভার যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন নাগ বদলায় মাথা, গরু বদলায় শিঙ। এই স্থানান্তরের সময় কেঁপে ওঠে পৃথিবী, নড়ে ওঠে বিশ্বসংসার। এদের অসাবধানতার কিংবা বিরক্তির ফলে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায় কখনো কখনো। আরো পরে বিজ্ঞ মানুষ বুঝল ওরা ধর্মের অনুগত ও ধর্মের দাস। পাপাসক্ত মানুষের পাপের ভারই ওদের বিরক্তির কারণ।

আকাশে চাঁদ-সূর্য কেবল ঘোরে না, রাহু-কেতুর গ্রাসেও পড়ে। হয় তারা কোনো প্রবল দুরাত্মার কবলে পড়ে দুঃখ পায়, অথবা স্বকৃত অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করে। স্বর্গলোক নিশ্চয়ই পায়ের তলায় থাকার কথা নয়; কাজেই আকাশে তার স্থিতি। অবশ্য স্বর্গ মানেও আকাশ। রাত্রে নির্জন প্রান্তরে আগুনের শিখা থাকবে কেন; নিশ্চয়ই এ ভূতের চেরাগ—আলেয়া। শূন্যতা তো ব্যর্থতারই লক্ষণ। পূর্ণতা যেমন সাফল্যের প্রতীক। অতএব শূন্য ঘট কিংবা কলসি দেখার পরে অভিষ্ট সিদ্ধ না-হওয়ারই কথা। তেমনি হাঁচি, কাশি, টিকটিকি, ডিম, ঝাঁটা, হোঁচট ও পিছুডাকা দুর্লক্ষণ বলে পরিচিত। কেননা কারো কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এই কাকতালীয় ন্যায়ের যাথার্থ্য প্রমাণের নিশ্চয়ই সহায়কও ছিল। প্রয়োজনের তাগিদ ও বাঞ্ছার তীব্রতা মানুষকে গুরুত্ব চেতনা দেয়, তখন অভীষ্টে অসিদ্ধি, প্রয়াসে ব্যর্থতা ও কর্মে অসাফল্য, দৈবিক কারণ সন্ধানে প্রবর্তনা দেয় মানুষকে। তখন প্রকৃতি ও পরিবেষ্টনী, বস্তু ও প্রাণী তার সাফল্য-ব্যর্থতার দৈব প্রতীক হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রায় কিংবা গুরুত্বহীন কর্মে অর্থাৎ লাভক্ষতির ভয়-ভরসা যেখানে নেই, সেখানে মানুষ শুভাশুভ সম্বন্ধে কিংবা দৈবানুকূল্য বা বিরূপতা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। যেমন গ্লাস থেকে যদি পানি পড়ে যায় তখন মানুষ তাতে অশুভ কিছু দেখে না। কিন্তু বহুযত্নে আনা পড়া-পানি পড়ে যাওয়া নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজ্ঞাপক। কিংবা পয়সার জিনিস একবাটি দুধ পড়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে দুর্লক্ষণ। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সব সন্ধিস্থলেই অসংখ্য রেখা রয়েছে কিন্তু কোনো রেখারই কোনো তাৎপর্য নেই—কোনো রেখাই নিয়তি প্রতীক নয়—কেবল হাতের তালুর রেখারই আছে গুরুত্ব।

এমনি করে মানুষ তার জীবনের ও ভুবনের সবকিছুর কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে হয়েছে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

জিজ্ঞাসাবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হলেও, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন মানুষ পরমুখাপেক্ষী, পরশ্রমনির্ভর ও পরান্নজীবী, এক্ষেত্রেও তেমনি সাধারণত তারা অবহেলাপরায়ণ। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে তাঁরা অপরের বুদ্ধি, চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। পরের মুখে শুনেই তারা সন্তুষ্ট। নিজেরা ভেবেচিন্তে বিচার-বিশ্লেষণ করে কিছু যে বের করবে সে-ধৈর্য ও অধ্যবসায় তাদের নেই। এ ব্যাপারে তারা আশুতোষ। প্রয়াসবিহীন প্রাপ্তিতেই তাদের আনন্দ ও সন্তোষ। এই আলস্য ও অবহেলা মানুষের পক্ষে শুভ হয়নি। মানুষের মন্থর অগ্রগতির এ-ই মূল কারণ। বস্তুত পূর্বোক্ত স্তরেই রয়ে গেছে পৃথিবীর পনেরো আনা মানুষ। তারা চিরকালের জন্যে নিশ্চিত হয়েছে তাদের জিজ্ঞসার আপাত যৌক্তিক জবাব পেয়ে ও আপাত রম্য সমাধান নিয়ে। এজন্যে আদিম আরণ্য-জীবন যেমন সুলভ, তেমনি যান্ত্রিক জীবন-চিন্তাও সভ্য-শহুরে মানুষে দুর্লভ নয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ রয়ে গেছে মানবিকতার শৈশবে-বাল্যে। এবং তাদের মনে নতুন করে জিজ্ঞাসা না জাগলে আর সে-জিজ্ঞাসার জবাব নিজেরা মন-বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে সন্ধান না করলে তাদের—মানুষের বাল্যাবস্থা কখনো ঘুচবে না। যে-দেশে বা যে-গোত্রে জিজ্ঞাসু মানুষের সংখ্যা বেশি সে-দেশে ও সে-গোত্রের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মননের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে।

অতৃপ্তি ও কৌতূহল এবং শোনা-কথায় সন্দেহ ও অনাস্থাই জিজ্ঞাসার জনক। এজন্যে উদ্যমশীলতার প্রয়োজন। আবার সে-উদ্যম আসে নতুন আকাঙ্ক্ষা আর বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিরোধ প্রয়োজন, সুখবাঞ্ছা ও জীবনস্বপ্ন থেকে। যে বাঞ্ছাহীন, স্বপ্নহীন তার পক্ষে জিজ্ঞাসা জিইয়ে রাখা ও জবাব খোঁজার প্রয়াসী হওয়া অসম্ভব। তাই সে প্রশ্নহীন গতানুগতিকতায় সে অভ্যস্ত ও নিশ্চিন্ত এবং বিশ্বাসে আশ্বস্ত। এরা বদ্ধজীব, এদের মন-আত্মা বন্ধক রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কারে। এরা পুরোনো ধর্মে, জীর্ণসমাজে, হৃতউপযোগ আদর্শে ও বাড়-বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় স্বস্তি খোঁজে পরমনির্ভরতায়। এগুলোকে বিপদে-সম্পদে জীবনের নিরাপদ আশ্রয় বলেই তারা জানে। দুর্বল ও জিজ্ঞাসাহীন মনের প্রশ্রয়ে বিশ্বাস-সংস্কার বুনোলতা কিংবা অশ্বত্থ-শিকড়ের মতো মানুষের মন-বুদ্ধি-আত্মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জীনতা আনে জীবনে, এমন মানুষ কেবলই প্রাণী—নিয়তিবাদী পোষমানা প্রাণী, তার না আছে জিজ্ঞাসা, না আছে বিদ্রোহ করবার মতো মন। সব মানুষে জিজ্ঞাসার তীব্রতা নেই বটে, কিন্তু সব মানুষই ভোগলিপ্সু ও আরামপ্রিয়। উদ্যমহীন মানুষ সুখের ও ভোগের স্বপ্ন দেখে এবং তারা যে-কোনো স্বপ্নের বাস্তবায়ন চায় কৃত্রিম ও অলৌকিক উপায়ে। তাই সে দৈব-নির্ভর, কল্পনাপ্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। সে আধিদৈবিক কিংবা আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সাধের ও স্বপ্নের ভোগ্যবস্তু হাতের মুঠোয় পেতে অভিলাষী। এক্ষেত্রেও সে পরনির্ভরশীল এবং পরসম্পদজীবী।

কেননা সে দৈবশক্তি অর্জনে কিংবা অধ্যাত্মবিদ্যায় ও সাধনায় সিদ্ধিলাভে প্রয়াসী নয়। সে পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ, তুকতাক, দারুটোনা, তাবিজ-কবচ অথবা ঝাড়-ফুঁকের বদৌলতে ও কেরামতিপ্রভাবে বাঞ্ছাসিদ্ধি কামনা করে। এই নিষ্ক্রিয় দলের জীবন-স্বপ্ন মানুষকে করেছে কল্পনাবিলাসী—ভূত-প্রেত-দেও-দানব-গন্ধর্ব-পরী অপ্সরা তাদেরই কল্পলোক সহচর। মন্ত্রবলে আকাশে উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে, নদ-নদী উল্লঙ্ঘনে অথবা মরু-কান্তার উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পনা ও বাসনার জগতে। রূপকথা, উপকথা, ধর্মকথা, পুরাণকথা প্রভৃতি এদেরই সৃষ্টি।

যারা উদ্যমশীল তারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তবক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে। তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার কৌশল, সাগরতলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ নিরাময়ের নিদান, কর্মে সাফল্যের কল এবং অন্যান্য বাঞ্ছাসিদ্ধির সামর্থ্য অর্জনে হয় ব্রতী। এই মানুষের দ্বারাই বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান সম্ভব হয়েছে। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্তু আবিষ্কার ও নির্মাণ। শস্য-উৎপাদন অথবা মৃতে প্রাণসঞ্চার থেকে আণবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সবকিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও সাধ।

আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতা ও দৈব নির্ভরতায় প্রাচ্য-মানবের পরিচয়। প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তা-ই বাস্তব; প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, প্রতীচ্যে তা-ই যান্ত্রিক সম্পদ। এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা-কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস; আর প্রাচ্য-মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তি-লিপ্সা, আজন্ম লালিত বিশ্বাস- সংস্কারে নিষ্ঠা, প্রশ্নহীন প্রত্যয় এবং আত্মসামর্থ্যে অনাস্থা। জিজ্ঞাসার ও আকাঙ্ক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও জীবিকায়, মনে ও মানসে যে- জীর্ণতা আসে তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে ব্যক্তির বা সমাজের মুক্তি ঘটে না, তার সাক্ষ্য আফ্রো-এশিয়ায় অনুন্নত ও আরণ্য সমাজ।

অতৃপ্তি, কৌতূহল, অনবরত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও উত্তর সন্ধানের অক্লান্ত উদ্যমই মানুষকে প্রগতি দান করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের মূলে রয়েছে এ জিজ্ঞাসা ও উদ্যম। অতএব পুরানো-প্রীতি পরিহার করে নতুনের স্বপ্নে ও আকাঙ্ক্ষায় মন ও মননকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সন্ধানী ও সৃজনশীল হওয়া, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না কারো পক্ষে।

গোড়াতেই বলেছি, জিজ্ঞাসা একটি মানবিক বৃত্তি। এর জাগর আছে, সুপ্তি আছে, মৃত্যু নেই। আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি অনেক অনেক কাল ধরে সুপ্ত। তাই আমরা আজ অনুকারক ও প্রতীচ্য-নির্ভর। আমাদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি উদ্দীপিত না করলে আমরা কখনো স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে স্বকীয়তার ঔজ্জ্বল্যে ও মহিমায় আত্মনির্ভর ও আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারব না।

এ অসাধ্য-দুঃসাধ্য কোনো সাধনা নয়। অভিপ্রায় সাংকল্পিক দৃঢ়তা পেলেই আমরা সফল হব। কেননা মানুষের সামর্থ্য হচ্ছে কচুগাছের মতোই, সে সুপ্তিতে অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু জাগরে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। প্রাণশক্তির অজস্রতায় সে দেহে পায় পুষ্টি ও লাবণ্য।

জাতির জীবনে এমনি নধর-কান্তি নিয়ে আসে জিজ্ঞাসা ও উদ্যম। তৃপ্তমন্য ও কাঙ্ক্ষাহীন, নিরুদ্যম ও প্রশ্নহীন জাতিও মরে না, জীর্ণ জীবনের দুর্ভোগই তার নিয়তি হয়ে ঘাড়ে চাপে মাত্র। কার্য-কারণ সচেতন হলেই জাতির দুর্ভোগ ঘোচে। নতুন চেতনার প্রসাদ পেয়ে সে আবার প্রাণের পূর্ণতা অনুভব করে, ধন্য হয় নিজে, ধন্য করে তার প্রতিবেশকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূর্বা

আমাদের দেশে বরণ-ডালায় ধান ও দূর্বা রাখার রেওয়াজ আছে। দুটোই আদিম অস্ট্রিক সংস্কার। একটি প্রাণের প্রতীক, অপরটি জীবিকার। দূর্বার প্রাণশক্তি দুর্বারই বটে। যতই দলিত হোক, যতই তাপদগ্ধ হোক, একবার পানির স্পর্শ পেলেই জেগে ওঠে। বাসন্তী হাওয়া, বিশেষ করে বৃষ্টির পানি পেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মরা দূর্বা সবুজের সমারোহ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এক ধান জন্ম দেয় শত ধানের। তাই দূর্বা ও ধান হয়েছে আয়ুষ্কামী ও প্রাচুর্য-প্রত্যাশী মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতীক।

সর্বপ্রাণবাদী ও জাদুবিশ্বাসী মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই এ প্রতীকের উদ্ভব। প্রকৃতিই মানুষের আদি ও অকৃত্রিম শিক্ষক এবং চিরন্তন জ্ঞানের উৎস। জীবনের মৌল প্রয়োজনবাঞ্ছা কেমন আশ্চর্য ঋজুতায় অভিব্যক্তি পেয়েছে ধানে ও দূর্বায়। এর মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মনন ও কবিত্বের অনন্য সমন্বয় ও অপরূপ মাধুর্য।

এজন্যে প্রকৃতির মতো শিক্ষক নেই—প্রকৃতির মতো গ্রন্থ নেই। দুনিয়ার বহু মহামানব প্রকৃতি থেকে পাঠগ্রহণ করেই হয়েছেন লোক-শিক্ষক। প্রকৃতির পাঠের আদি অন্ত নেই। এ গ্রন্থ চিরনতুন ও চিরন্তন জ্ঞানের আধার। উৎসুক দৃষ্টিতে কৌতূহল নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকালেই নব নব তাৎপর্যে প্রকৃতি নতুন হয়ে ধরা দেয়। তার বিচিত্র রহস্য-চেতনা মানুষকে করে জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।

দূর্বার সুপ্তি আছে—আত্মগুপ্তি আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই। মানুষেরও প্রয়োজন-চেতনার শেষ নেই। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের যে-চিন্তা তারও ক্ষয় নেই, নেই মৃত্যু। অন্ন ও আনন্দের অন্বেষা মানুষকেও দূর্বার মতোই দেয় দুর্বারশক্তি। তাই মানুষের চিন্তার উন্মেষ কখনো রোধ করা যায় না। তার বিকাশ প্রবলতর শক্তি সাময়িকভাবে হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু নির্মূল করবার শক্তি নেই কোনো মর্ত্যমানবের। শোনা যায়, চারাগাছের ডগা ছাগলে চিবোলে তা বাড়ে না। তেমনি সমাজের কিংবা শাসকের বিরূপতায় চিন্তাও স্বাভাবিক বিকাশ পায় না। ছাগলের মুখ-লাগা চারার মতোই তা রুদ্ধ-বাড় হয়েই বেঁচে থাকে। আবার উদ্ভিদ জগতে এমন অনেক বৃক্ষ দেখা যায় যাদের গোড়া কেটে দিলেও প্রাণ হারায় না। বরং রক্তবীজের মতোই অসংখ্য হয়ে নব নব কিশলয়ের ধ্বজা নিয়ে আকাশের দিকে মাথা বাড়ায়। সামাজিক-রাষ্ট্রিক পীড়নও তেমনি চিন্তার প্রসার ঘটায়। কেননা নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন পরিবেশে চিন্তার জন্ম নেই। সব প্রয়াসের পশ্চাতেই থাকে অভাববোধ। প্রাপ্তির প্রয়োজন-চেতনা না জাগলে প্রয়াসের প্রেরণা জন্মায় না। কাজেই বাধাই বাধা ছিন্ন করার প্রেরণা যোগায়, বন্দিত্বই জাগায় মুক্তির কামনা, পরাধীনের স্বাধীনতাবাঞ্ছাই যোগায় সংগ্রামের শক্তি। তেমনি চিন্তার স্বাধীনতা যেখানে অস্বীকৃত, চিন্তার প্রয়োজন ও প্রেরণা সেখানেই প্রবল।

জীবন-প্রতিবেশে যখন অসঙ্গতি, অন্যায়, পীড়ন ও অভাব দেখা দেয়, অর্থাৎ যখন জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা নেমে আসে, তখনই তার কারণ নিরূপণ ও কারণ অপসারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এবং তখন মননশীল, দায়িত্বসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ মানুষ প্রতিকারের উপায় খোঁজে। এতেই নতুন চিন্তার জন্ম হয় এবং মতরূপে, ধর্মরূপে, নীতিরূপে ও আদর্শরূপে তা কর্মে ও আচরণে অভিব্যক্তি পেতে থাকে। যারা বর্তমান পরিবেশের সুযোগে বড় হয়েছে কিংবা বড় রয়েছে, তারা এ পরিবেশের পরিবর্তনে আতঙ্কিত হয়। কেননা পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কাজেই স্থিতিতে তাদের মঙ্গল, গতিতে অকল্যাণের আশঙ্কাই প্রবল। তাই তারা সর্বপ্রকার নতুন ভাব চিন্তা আচার ও রীতিনীতি-পদ্ধতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরোধকল্পে মরিয়া হয়ে দাঁড়ায়। তারা ইতিহাসে রক্ষণশীল কিংবা গোঁড়া অভিধা পায়। তারা সংখ্যায়ও থাকে গরিষ্ঠ। তবু তাদের আপাতপ্রাবল্য পরিণামে তাদের পরাজয়ের পথই মুক্ত করে দেয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য তারা স্বার্থবশে অস্বীকার করে। ফলে নতুনের জয় যে অবশ্যম্ভাবী তা তারা মানতে চায় না। তারা যতই আঘাত হানে, আহত ততই প্রবল হয়। আপাত পরাজয়ের ছলে জয়ের নিশানই হাতে পায় আহত। হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা, হযরত মুহম্মদকে পালাতে হয়েছিল, মরতে হয়েছিল হযরত ঈসাকে। এর আগে-পরেও এমনি কত কত ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু জয়ী হয়েছেন পলাতক-পরাজিত-নিহতরাই। কাজেই কোনো প্রতিকূল প্রতিবেশেই নতুন চিন্তার মৃত্যু নেই। সে চিন্তা বরং দূর্বার মতোই হয় দুর্বার—কাটাগাছের অঙ্কুরের মতো জেগে ওঠে স্পর্ধায়, ঔদ্ধত্যে ও প্রাণপ্রাচুর্যে।

যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, প্রতিযোগিতা নেই, সেখানে জীবনের বিকাশ নেই, উল্লাস নেই, প্রেরণা নেই, নেই কোনো প্রয়াস। জীবনের জাগরণের জন্য চাই দ্বন্দ্ব, চাই সংঘাত। আর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পূর্বগামী হচ্ছে স্বপ্ন-ভাব-চিন্তা-পরিকল্পনা, সহচর হচ্ছে কর্ম। এ দ্বন্দ্বে-সংঘাতে যারা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে পাপী-অপরাধী-আসামী—পরিণামে জয়ী হয় তারাই। এমনি নতুন চিন্তা আঘাতেই জাগে। তাই এ চিন্তা আঘাতেরই সন্তান। এই অর্থেই 'আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।'

দূর্বা ক্ষুদ্র ও কোমল। পায়ে দলিত হওয়াই তার নিয়তি। তবু সে অমর ও চিন্ময়—সবুজ ও প্রাণময়। তেমনি মানবদরদী ও মানবতাবাদী মনীষীরা সংখ্যায় নগণ্য বাহুবলে তুচ্ছ। নির্যাতনই তাঁদের ললাটলিপি। তবু তাঁরাই মানবভাগ্যের নিয়ন্তা। তাঁরা ভাঙেন কিন্তু মচকান না। নিজেরা মরেন কিন্তু দিয়ে যান আবেহায়াত। চিন্তাবিদ বাহ্যত একক ব্যক্তি, কিন্তু আসলে রক্তবীজ। দূর্বার মতোই চিন্তা ও চিন্তাবিদের ধ্বংস নেই। সে মরে মরেই বাঁচে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের নিয়ামক

আদিকাল থেকে মানুষ দৈবশক্তির অস্তিত্বে আস্থা রেখেছে এবং নিজের ভাগ্যকে সে- শক্তির সঙ্গে করেছে যুক্ত। যে যত বেশি দুর্বল, অসহায় ও অসমর্থ; তার জীবনে দৈব-শক্তির প্রভাবও তত অধিক। জীবনে রয়েছে নানা প্রয়োজন, নানা অভাব এবং তা বাঞ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপে মনের কোণে জেগে থাকে। যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায় না। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেকার ব্যবধান ঘোচানো যখন সাধ্যাতীত বলে নিশ্চিত ধারণা জন্মায় অথচ প্রাপ্তির বাঞ্ছা কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না, তখন বাঞ্ছার তীব্রতা মনের মধ্যে জাগায় একপ্রকার স্বপ্ন কিংবা কল্পনা —যা যুক্তি, বুদ্ধি অথবা দৃষ্টি-গ্রাহ্য উপায়বোধের অতীত। কোনো অলৌকিক উপায়ে কোনো অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে যদি আমার বাঞ্ছা সিদ্ধি হত —এমনি মানস অবস্থা থেকে দৈবশক্তির উদ্ভব। যেখানে সাধ্য-সামর্থ্যের শেষ, সেখান থেকেই কামনার উদ্ভব, আর এই কামনার আশ্রয়েই দৈবশক্তির উদ্ভব ও বিকাশ। অতএব সাধ্যাতীত লিপ্সার প্রশ্রয়ে কামনার জন্ম, এবং কামনা-পূর্তির সহায় হিসেবে অলৌকিক অদৃশ্য সত্তার আবির্ভাব ও স্থিতি। জীবনের মৌল বাঞ্ছা দুটো—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, জীবনের নিরাপত্তা ও জীবিকার সংস্থান। দুটোর কোনোটাই নির্বিঘ্ন নয়। তাই অদৃশ্য শক্তির সহায়তা আবশ্যক। আদিম মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনা ছিল কম; তাই সর্বপ্রাণবাদ, জাদুবিশ্বাস প্রভৃতি দিয়ে তার জীবনযাত্রার শুরু।

ক্রমে ক্রমে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়েছে এবং জীবন ও জীবিকার নিয়ন্ত্রীশক্তির ধারণাও সে-অনুপাতে প্রসার লাভ করেছে। সে দৈবশক্তির শ্রেণীভাগ করেছে—অরি ও মিত্র শক্তিরূপে। ঐ শক্তিতে সে আরোপ করেছে ব্যক্তিত্ব। আবার শক্তির তারতম্য ও কর্তব্য নিরূপণ করে সে অসংখ্য দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতার কল্পনা করেছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে প্রসারিত জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে, কল্পনার যৌক্তিকতা এবং সৌন্দর্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে—মনুষ্য সমাজের বিকাশ ও সম্ভাবনার আদলে সৃষ্টি হয়েছে তার সেই শক্তির ও সম্ভাবনার, সৌন্দর্যের ও ঐশ্বর্যের, আনন্দের ও যৌবনের দেবলোক। সে জগৎ অমরত্বের, চিরবসন্তের, চিরযৌবনের ও চির-আনন্দের। আদি মানবের অবোধ বাসনায় যার জন্ম, ক্রমে তার বিস্ময়কর বিকাশ-বিস্তার হয়েছে। মানুষের দেহ-মন-আত্মাকে আচ্ছন্ন করে বট-অশ্বত্থের মতোই বিপুল হয়েছে সে জড়ে ও কলেবরে। অক্টোপাস ও অশ্বত্থের ধর্ম অভিন্ন। যাকে জড়িয়ে ধরে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে; তাদের প্রীতির বন্ধন—মমতার আলিঙ্গন মৃত্যুর আগে আর শিথিল হয় না। তাই আজ দৈবশক্তির সম্পর্ক, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণবিহীন জীবন কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

মনুষ্য-চেতনার শৈশবে এ অদৃশ্য সত্তার জন্ম। তারপর তার চেতনার বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের ও প্রবীণ বয়সের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনার অনুপাতে এই বোধের বিকাশ ও প্রকাশ ঘটেছে। এতে তার বোধ ও কল্পনার আমূল রূপান্তর হয়েছে কখনো কখনো। ফলে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বোধের জন্ম আর মৃত্যুও কম হয়নি। এ বোধের ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ভাব-চিন্তা, আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের নাম ধর্ম। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যুক্তি, কল্পনা প্রভৃতির প্রয়োগে ধর্ম—তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি, মনন ও আবেগের আধার হয়েও উঠেছে। এভাবে সর্বপ্রাণবাদ, দেববাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদে উত্তরণ ঘটেছে মনুষ্যচিন্তার ও বোধের। এমনকি নাস্তিক্যও এ বোধের ও চিন্তার প্রসূন—বিদ্রোহী সন্তান। জ্ঞানবাদে, ভক্তিবাদে, কর্মবাদে, ভাববাদে ও লীলাবাদে এর বিচিত্র বিকাশও লক্ষণীয়। এটি আর কেবল বাঞ্ছা-সিদ্ধির সহায় থাকেনি। সমাজ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ন্যায়-নীতিবোধ, প্রীতি-করুণা-মৈত্রী, দয়া-ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক গুণ জাগানো লক্ষ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মবোধ হয়েছে নিয়োজিত। বাঞ্ছা-সিদ্ধিকামী অসহায় মানুষের কামনার প্রসূন যে এমনি করে জন্ম-মৃত্যুর পরিসরে সীমিত মানব-জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম, রোগ-শোক-যন্ত্রণা, আরাম-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার অবলম্বন ও নিয়ন্তা হবে তা কে জানত!

ধর্ম মানব-প্রতিভার এক আশ্চর্য উদ্ভাবন। ধর্ম মানুষের প্রাণের উচ্ছলতা, কামনার উদ্দামতা, অভিলাষের অদম্যতা, আচরণের অবাধতা, চিন্তার স্বাধীনতা সম্ভাবনার বিচিত্রতা প্রভৃতি এক নিয়মিত খাতে পরিচালিত করে যান্ত্রিক পরিমিতিতে সীমিত রাখে। ধর্ম দুরাত্মাকে করে নিয়ন্ত্রিত, সু-আত্মাকে রাখে আড়ষ্ট, আনন্দকে করে দুর্লভ, অতৃপ্তিকে করে চিরন্তন, আকাঙ্ক্ষাকে করে বোবা, বেদনাকে করে অন্ধ, অনুভূতি হয় নিরবয়ব আর গতি হয় সীমিত। সবল ও দুর্বল, জ্ঞানী ও মূর্খ, সাধু ও দুষ্ট সমভাবেই থাকে কাবু। ধর্মবোধ মানুষের অন্তরে এমন এক জীর্ণতা এনে দেয়, প্রাণশক্তির উৎসমুখে এমন এক বাঁধ নির্মাণ করে, এমন এক প্রত্যয় ও নিশ্চিত ভাব জাগায় যার কবলমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না কারো পক্ষে। এর প্রভাবের বুঝি সীমা শেষ নেই। তাত্ত্বিকের ভাষায় একে 'মায়া' কিংবা বিষয়ীর ভাষায় একে ' আফিম' বলা চলে বটে, কিন্তু সবটা বলা হয় না। কারণ বোধাতীত এ নেশার স্বরূপ ধরা ভার। মানুষের মর্মমূলে এর বাস। জীবনের সঙ্গে নিঃশেষে জড়িয়ে যায় এ বিশ্বাস।

অনেক মনীষীর মতে "এই যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ও কল্পনার প্রশ্রয়ে রচিত পুরোনো ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যে পরিবেশে ও প্রয়োজনে ধর্মগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল, সে-পরিবেশ আজ আর নেই বলেই তার উপযোগও শেষ হয়েছে। বর্বর মানুষের মনুষ্যত্ব জাগানো লক্ষ্যে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম তার ঐতিহাসিক ভূমিকা কৃতিত্বের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছে। তাই সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ধারায় ধর্মের ভূমিকা ও তার গুরুত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তার ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকার করব অকুণ্ঠ চিত্তে।

"আজ বহু মানুষের আশ্চর্য আত্মিক উন্মুক্তি হয়েছে। তাদের সামাজিক ও মানস সঙ্গ পেয়ে অন্যরা হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্ব-সচেতন। মানবিক তথা সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য প্রকাশ্যত অস্বীকার করে না তারা। কাজেই অলৌকিক চেতনা-লব্ধ পুরোনো ধর্মের প্রয়োজন নেই আর।

"ধর্মও মানুষের সমাজ-সভ্যতার শৈশব-বাল্যের ধাত্রী। স্বীকার না করে উপায় নেই যে মনুষ্য-সভ্যতা আজ কৈশোরও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। লোকে বলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিভা এখন বিকাশের ও প্রকাশের মধ্যগগনে স্থিত এবং এখন মানব-সভ্যতার মধ্যাহ্ন। তাই যদি হয় তাহলে শৈশবের ধাত্রী ধর্মের পরিচর্যার আর প্রয়োজন নেই।

"শৈশব-স্বভাব যতদিন থাকবে ততদিন তো সাবালেগ হওয়া যাবে না। বয়স্ক মানুষের শিশু-স্বভাব নিন্দনীয়, আত্মীয়ের পক্ষে বেদনাদায়ক। তাহলো আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে সমাজ-সভ্যতার প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির পরও শৈশবের সে-ধর্ম ধরে থাকা কল্যাণকর নয়।

"ধর্মের মূল লক্ষ্য সমাজ-প্রেক্ষিতে দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগানো। দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি জোর করে জাগানো যায় না। তার সাথে ব্যক্তি-মনের 'সায়' থাকা চাই। মনের এই সম্মতি আসে সুরুচি ও আত্মসম্মানবোধ থেকে। অতএব আত্মমর্যাদাবোধই দায়িত্বজ্ঞানের ও কর্তব্য-চেতনার উৎস। মর্যাদা সচেতন মানুষই কেবল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্ন করে। আত্মসম্মানজ্ঞান আবার পরিবেশ ও শিক্ষার দান। শিক্ষার গুরুত্ব যে অধিক তার প্রমাণ দুষ্ট শিক্ষিত লোকের অপকর্মের সাধারণত মাত্রা ও সীমা আছে, দুষ্ট অশিক্ষিত লোকের নেই। তাছাড়া মর্যাদাকামী লোক জীবনে ও সমাজে অধিকার ভেদ মেনে চলে।

"বিশেষ করে দেখা গেছে অধার্মিক আস্তিক মানুষও করে না হেন অপকর্ম নেই। কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস কাউকে সৎ ও উন্নত করে না, যদি না সে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি ও মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয়।

"জানামি ধর্ম ন-চ প্রবৃত্তি। জানামি অধর্ম ন-চ নিবৃত্তি। —এই পুরোনো আপ্তবাক্য অপকর্মাসক্ত, লিপ্সু আস্তিক মানুষেরই খেদোক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সভ্য ও আস্তিক যিশুর প্রেমবাদী খ্রীস্টান জার্মানেরা প্রায় এক লাখ ইহুদি হত্যা করেছে, আমেরিকানরা মেরেছে অসংখ্য জাপানি। অতগুলো পিঁপড়ে হত্যা করতেও বিবেকবান নাস্তিক মানুষের প্রাণে লাগে। খ্রীস্টান ও মুসলমান নাইজেরিয়া আজ 'ইবো' গোত্রীয় আশি লক্ষ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বর্বর উল্লাসে মত্ত। দুনিয়ার ইতিহাসে বড় ছোট এমনি হাজার হাজার অমানুষিক দানবীয় নিষ্ঠুরতার ও অপকর্মের সাক্ষ্য রয়েছে। আজো এমনি বর্বরতার অবধি নেই। সবটাই প্রায় আস্তিক ও উন্নত ধর্মাবলম্বী মানুষের একক ও যৌথ স্বার্থে কৃত। গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতি-চেতনা ছাড়াও ধর্মচেতনাও বহু বর্বরতার জন্যে দায়ী। অবশ্য রাজনৈতিক মতও এমনি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়-চেতনা জাগায় আর বর্বরতায় উৎসাহিত করে। ধর্মমতবাদ কিংবা রাজনৈতিক মতবাদ যে-কোনো মতবাদ পরিণামে অসহিষ্ণুতা জাগায় মতবাদীর মনে। হাঙ্গেরী (১৯৫৬) ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় (১৯৬৮) রুশ বর্বরতা, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অমানুষিকতা, ভিয়েৎনামে আমেরিকার দানবিক দৌরাত্ম্য প্রভৃতি এ সূত্রে উল্লেখ্য।

"অতএব ধর্মমত অথবা তার দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ কোনোটাই মানুষের কল্যাণ আনেনি। কোনোটাই সংহত ও সংযত করতে পারেনি প্রবলের দৌরাত্ম্য, পারেনি দুর্বলকে প্রবলের পীড়ন থেকে রক্ষা করতে। ব্যষ্টির হৃদয়ে বিবেকের প্রতিষ্ঠা না হলে নীতিকথা, ধর্মকথা কিংবা তত্ত্বকথা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

"কাজেই সমাজে-সংসারে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যে-শান্তি ও স্বস্তি, যে-সুযোগ ও সুবিধা মেলে, তার জন্যে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রিক বিধিবিধানই যথেষ্ট।

"অতএব আজকের দিনে মানুষের ধর্মগ্রন্থ হবে শাসনতন্ত্রের পুস্তক, হাদিস হবে দেশের আইন-কানুন আর লক্ষ্য হবে দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার-বুদ্ধিসম্পন্ন সুনাগরিকতা। এতেই মানুষের পার্থিব জীবনের মনুষ্য-রচিত সমস্যা মিটবে। অপার্থিব সুখলিপ্সুরা বৈরাগ্যে-সন্ন্যাসে অভীষ্ট খুঁজুক— দীন-দুনিয়া জড়িয়ে ব্যবহারিক জীবনে ঝামেলা বাড়ানোর দুর্বুদ্ধি না-রাখাই শ্রেয়।"

মনীষীরা যাই বলুন ধর্ম কিন্তু থাকবে। কেননা মানুষের অসহায়তায় ও দুর্বলতায় তার জন্ম ও স্থিতি। এবং ধর্মবিশ্বাস দুর্বল মানুষের দুর্যোগ-দুর্দিনে বল-ভরসার আকর— অভয় ও নিশ্চিত আশ্রয়। তাই ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নিয়ামকরূপে পাবে চিরায়ু এবং হবে চিরঞ্জীব। যদিও সামাজিক শক্তি হিসেবে ধর্ম রাজতন্ত্রের মতোই বিলীয়মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অলস-চিন্তা

সুস্থ ও রুগ্ণলোকের মন-মেজাজের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এমনকি ভরপেট ও ক্ষুধার্ত লোকের মেজাজেও মাত্রাভেদ লক্ষণীয়। তাহলে মন-মেজাজ ও স্বভাবের সঙ্গে শরীর-স্বাস্থ্যের যোগ ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য। একারণেই মনে হয় বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে-প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে মানুষের মন-মেজাজের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে।

আবার মানুষের স্বভাবের অভিব্যক্তি পরিবেশ-পরিবেষ্টনী নিরপেক্ষ নয়। অকালে আম খাবার আকাঙ্ক্ষা যেমন জাগে না, তেমনি সাধ্যাতীত বস্তুতেও মানুষ লুব্ধ হয় না। কাজেই প্রাপ্তি-প্রয়াসে মানুষ যা-কিছু করে তাতে সাফল্যের ক্ষীণ সম্ভাবনা অন্তত থাকে, একেবারে অসম্ভব অস্বাভাবিকতার পিছু ধাওয়া করে না। অতএব মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের পশ্চাতে আত্মপ্রত্যয় ও সাফল্য-বাঞ্ছার ভিত তৈরি থাকে। বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা এ কাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ করে। এক বয়সে যা তুচ্ছ, অন্য বয়সে তাই মুখ্য। কেবল তা-ই নয়, এক মুহূর্তে যা প্রাণের প্রেরণা অন্য মুহূর্তে তা ত্রাসের উৎস। যে-সুন্দরীকে কাছে পেয়ে চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল, পরমুহূর্তে তার অঙ্গে কুষ্ঠ কিংবা অন্য ভয়াবহ রোগের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে ত্রস্ত মন ঘৃণায় ও ভয়ে শিউরে উঠল। যে নব-অনুরাগী প্রেম-স্বপ্নের মাধুরী উপভোগে রত, বাস্তু-বিক্রিয়ে যাওয়ার আকস্মিক সংবাদে হতাশার হুলে সে মুহূর্তে বিপর্যস্ত। যাকে না হলে জীবন অচল, সে-প্রেয়সীর মৃত্যুর পরেই নতুন নীড়ের স্বপ্ন ওঠে জেগে।

কাজেই কেবল কাল নয়, পরিবেশও মানুষের মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। দৈহিক পরিবর্তনও ঘটায় মন-মেজাজের বদল। ষাঁড় বলদ হয়ে কেবল দেহে নয়, স্বভাবেও পায় গাভীর রূপ। পাঁঠা খাশি হয়ে অবয়বে ও স্বভাবে হয়ে ওঠে ছাগী। খোজারাও হয়তো হারাত পুরুষসুলভ মেজাজের অনেকখানি, যদিও মানুষ হিসেবে কৃত্রিম মানস ও সামাজিক অনুশীলনে পুরুষালি বজায় রাখার চেষ্টা ছিল তাদের।

অতএব, স্ব-ভাবের পূর্ণ ও অকৃত্রিম অভিব্যক্তির জন্যে আঙ্গিক সম্পূর্ণতা ও স্বাস্থ্যের পূর্ণতা প্রয়োজন। ভর-যৌবনেই কেবল তা সুস্থ মানুষে লভ্য। কিন্তু মানুষের পূর্ণতার আরো এক গুরুতর বাধা রয়েছে। বিশ্বাস-সংস্কার ও আর্থিক-সামাজিক প্রভাবও কিছু বিকৃতি ঘটায়। তাই মানুষ জীবনে হয়তো কখনো সচেতনভাবে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। কর্মে, চিন্তায় ও অনুভবে মানুষের অভিব্যক্ত আচরণ তাই কখনো স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। তাই ক্ষোভ, শোক, ক্রোধ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা, আনন্দ, উল্লাস, দুঃখ, বেদনা, রিরংসা প্রভৃতি বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকাশ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন। তবু ক্ষণে ক্ষণে অবচেতন মুহূর্তে চিত্তের সাবল্য বা দৌর্বল্যবশে মানুষ স্বরূপে ধরা দেয়— বিদ্যুতের মতোই তা ক্ষণস্থায়ী বটে, কিন্তু তা-ই তার স্বরূপ। মানুষকে তা-ই ক্ষণ-প্রভায় বিচার করলেই তাকে যথার্থভাবে চেনা-বোঝা যায়। তার প্রাত্যহিক রূপ একটা সামাজিক সাংস্কারিক মুখোশ মাত্র।

২

শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে পরনির্ভরতায়, যৌবনে স্বনির্ভরতায়, প্রৌঢ়ত্বে সতর্ক-তায়, বার্ধক্যে পরমুখাপেক্ষীর অসহায়তায় জীবন হয় অবসিত। অতএব, জীবনে যৌবনই হচ্ছে চরম ও পরম লগ্ন। কিন্তু তার আবির্ভাব সম্বন্ধে সচেতন হতেই মানুষ উত্তর-তিরিশে পা রাখে, আর তার তিরোভাবের অনুশোচনা জাগে চল্লিশে। তাই সচেতনভাবে যৌবনের মর্ম উপলব্ধি ও স্বাদ উপভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে প্রয়োজন হয় প্রৌঢ়ত্বের কল্পনা ও স্মৃতির রোমন্থন। তখন হৃতযৌবনের কান্নায় ভরে ওঠে বুক। সম্পদ প্রাপ্তির আনন্দকে ম্লান করে দেয় অতীতকে হারানোর বেদনা। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি কখনো মনে জাগে না, যথাসময়ে তাই যথাকর্তব্য করাও হয় না; তাই এ বেদনা, সে কারণেই এ ক্রন্দন। তাই We donot know what we are missing today—চিরসত্য ও চিরন্তন Tragedy-র উৎস হয়ে রয়েছে।

যদি চেতনা দিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ-উপলব্ধি করা যেত, যদি ভ্রান্তির ও অবহেলা-ঔদাসীন্যের অনুশোচনার দংশনমুক্ত হত জীবন, যদি ব্যর্থতার ও হতবাঞ্ছার বেদনাবিহীন হত চিত্তলোক, তা হলেই কি জীবন সুখের হত? মনে হয় না। দুঃখ-বেদনা-ব্যর্থতার ছেদ-দাহ-ঘা না থাকলে চেতনার অপমৃত্যু ঘটত; তার বড় প্রমাণ আমরা যখন দিনের পর দিন মাসের পর মাস শারীরিক সুস্থতা ভোগ করি, তখন মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় না যে আমি সুস্থ, আঙ্গিক বেদনামুক্ত এবং সেজন্যে সুখী, সে কারণেই আনন্দিত।

দুঃখ-সুখের তরঙ্গায়িত চেতনাই জীবন। তাই দুঃখবিহীন চেতনা দুর্লভ আর সুখবিহীন জীবন অকল্পনীয়। অভাবিক সৌভাগ্য, অযাচিত প্রাপ্তি, অকারণ ব্যর্থতা, অসঙ্গত যন্ত্রণা, অযৌক্তিক বঞ্চনার অসমঞ্জস সমষ্টিই জীবন। একে উপেক্ষা করা যায় না বলেই স্বীকার করে নিতে হয়।

তাই কোনো দুটো জীবনের বোধে, উপভোগে, দুর্ভোগে কিংবা যন্ত্রণায় মিল নেই। অভিন্ন পরিবেশেও সবলে-দুর্বলে, সুস্থে-রুগ্‌ণে, যুবকে-প্রৌঢ়ে, বীরে-ভীরুতে, পণ্ডিতে-মূর্খে, ধনীতে-দরিদ্রে, নির্বোধে-বুদ্ধিমানে সুখ-দুঃখের বোধ—স্থান, কাল ও মাত্রা ভেদে বিভিন্ন।

৩

জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা ও বেদনা আছে বলেই মানুষ সুখের কাঙাল ও সহানুভূতির প্রত্যাশী। এইজন্যে মানুষ অন্য মানুষকে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে তার উপর ভরসা রেখে বাঁচতে চায়। নিশ্চিন্ত হতে চায় এইটুকু জেনে যে তার জন্যে ভাববার, তাকে বিপদে সাহায্য করবার, তার দুঃখে বিচলিত হবার লোক আছে। এরূপে বিশ্বাসে, ভালো বাসায় ও ভরসায় আশ্বস্ত হয়েই মানুষ বাঁচে। সে ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়, তাই জীবনের প্রতি সে আসক্ত, জগতের মমতায় মুগ্ধ। তাই পৃথিবী সুন্দর ও আনন্দময়, জীবন মধুময় ও লোকপ্রিয়। কাজেই বেদনা ও ব্যর্থতার অভিঘাত ও আশঙ্কাই মানুষে মানুষে মিলনসূত্র। গোড়াতে জীবনের অবলম্বন মাতাপিতা, ভাইবোন; তারপর স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তান; তারও পরে আত্মীয়-বন্ধু। সুখে-শোকে, আনন্দে-বেদনায়, সম্পদে-বিপদে এদের সাহচর্য, সান্নিধ্য, সহায়তা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা না হলে কারো চলে না। রুগ্‌ণমানুষ প্রিয়-পরিজন-পরিচিতের মুখের একটি কথার জন্যে, হাতের একটু স্পর্শের জন্যে, সান্নিধ্যের এতটুকু উষ্ণতার জন্যে, একটু মমতার দৃষ্টির জন্যে কত যে লালায়িত, উৎকণ্ঠ, উন্মুখ ও আকুল থাকে, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, মানুষ বিশ্বাস-ভরসা ও ভালোবাসাকে পাথেয় করেই বাঁচে। তাই বিশ্বাস- ভরসা-ভালোবাসার পাত্র-পাত্রী থেকে আঘাত পেলে মানুষের জীবন বিষিয়ে ওঠে, বাঁচা অর্থহীন হয়ে পড়ে। পৃথিবী হয়ে ওঠে বাসের অযোগ্য। ম্লান হয়ে ওঠে সমাজ-সংসার। এই বিশ্বাস-ভরসা ও ভালোবাসার বন্ধনেই অনাত্মীয়-অপরিচিত হয় পরমাত্মীয়। তাই স্ত্রী বা স্বামীর মতো আপন আর কে!

আবার গোড়ার কথায় ফিরে আসতে হয়। কেননা এমনি অবস্থায় কেবল দেহে-মনে সুস্থ লোকই বেপরওয়া হয়ে বাঁচতে পারে। এবং বেপরওয়া জীবনেই প্রাণধর্ম পায় তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। অতএব, যার জীবনে বিশ্বাস-সংস্কার ও সমাজের প্রভাব যত কম, সে তত বেশি মুক্ত মানুষ। অকৃত্রিম জীবন-চেতনা, অবিমিশ্র জীবন-সত্য লাভ কেবল সর্বপ্রকারের বন্ধনমুক্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তার জন্যে চাই দেহ-মনের যৌবন। কেননা সুস্থ যুবক-যুবতীই কেবল বাঁচতে জানে বিরুদ্ধ পরিবেশে —আর কেউ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সব হৃত-যৌবনের কান্নায় কাতর। এমনি এক হৃত-যৌবনের কান্না শুনি মোহিতলালের এক কবিতায় :

আমার সকল কামনা ফোটেনি এখনো
ফোটেনি গানের শাখে
চৈত্র নিশীথে বসন্ত কাঁদে দ্বারে হেরি বৈশাখে—ইত্যাদি।

আর সবার কাছে জীবনতত্ত্ব নানা বাহ্যরঙে রঙিন, খণ্ড-চেতনায় খণ্ডিত। তাই আজো তথ্যরূপী তত্ত্ব এত বিচিত্র ও বহুধা। জীবন-সত্যকে এভাবে কোনোদিন সমগ্র সত্তায় পাওয়া যাবে না। তাই মানুষের জীবন সম্পর্কে ধারণ থাকবে বিচিত্র, তার রহস্য থাকবে চিরআবৃত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আষাঢ়ে চিন্তা

মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের মূলে যৌন সংযমের দান অনেকখানি। বলতে গেলে যৌন-নিয়ন্ত্রণই সমাজ সংস্থার ভিত্তি। এই যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করা সম্ভব ও সহজ হয়েছিল।

এ উদ্দেশ্যেই অপ্রতিরোধ্য ও অপরিহার্য জৈবিক প্রয়োজন ও সৃষ্টিসম্ভব প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের ঘৃণা—সে কারণে লজ্জা—জাগানো আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

দেহ-মনের বিকাশ ও স্বাস্থ্যের জন্যেও এর প্রয়োজন ছিল। কেননা, যোগ-সাধনায় এই যৌন সংযমই মূল সাধ্য। পরবর্তীকালে যোগতত্ত্ববিদ বলেছেন, 'যদি স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও কায়াসাধনায় সিদ্ধি পেতে চাও তাহলে রমণ করবে—

মাসে এক বছরে বারো
আরো যত কমাইতে পারো।

আজকের দিনেও কামুকতা ঘৃণ্য এবং লাম্পট্যই মানুষের চরিত্রে মুখ্য দোষ বলে বিবেচিত। এটিরই রূপক রয়েছে শামীয় (Semetic) পুরাণে ও ধর্মগ্রন্থে।

আদম-হাওয়া ছিলেন স্বর্গে। তাঁদের লজ্জা ছিল না, ছিল না কোনো গ্লানি বা পাপবোধ। তাঁরা নারী-পুরুষ হলেও যৌন-সম্পর্ক তাদের ছিল না। যৌনতা ছিল তাঁদের অজ্ঞাত। যৌনবোধ তখনো তাঁদের অনুভবের বাইরে। এঁরা একে অপরের সাথীমাত্র। আদমের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গিনী হিসেবেই হাওয়ার সৃষ্টি— আদমের প্রতি জেহোভার প্রথম অনুগ্রহ— তাঁর প্রথম উপহার। বোঝা যাচ্ছে, নারী সৃষ্টির পরিকল্পনা জেহোভার আদৌ ছিল না। আদমের আনন্দ সহচরীরূপেই হাওয়ার উদ্ভব এবং জেহোভার দ্বিতীয় চিন্তার দান।

স্বর্গে আদম-হাওয়া ছিলেন বন্ধ্যা, উলঙ্গ ও লজ্জাহীন। কেননা রতি-রমণ ছিল তাঁদের অজ্ঞাত। সর্পরূপী শয়তান গিয়ে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করল হাওয়াকে। উল্লেখ্য যে, সাপ কামবিষের ও প্রজনন শক্তির প্রতীক। শয়তানের সর্পবেশ ধারণ সে-কারণেই। সে খাওয়াল নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল। এ জ্ঞান নিশ্চয়ই যৌনবোধ। কেননা এ ফল ভক্ষণের পর তাঁদের যে-বোধ জাগল তা দেহ-চেতনা। সে-কারণেই তাঁরা বৃক্ষপত্রে আবৃত করলেন তাঁদের দেহের যৌনাবেগ জাগাতে সমর্থ তেমন স্থানগুলো।

রূপকের আবরণ উন্মোচন করলে বোঝা যায়, এই গল্পে আদি মানব-মানবীতে যৌনবোধের উদয়-রহস্য বিবৃত। কায়িক সান্নিধ্যে ও স্পর্শে যৌনবোধের দীক্ষা হল উভয়ের। তারপর চিত্ত স্থৈর্যের প্রয়োজনে তাঁরা দেহে দেন আবরণ। এই সচেতন সংযম-প্রয়াসই অভ্যস্ত লজ্জা ও সংকোচের রূপ নেয়। জীবজগতে নারীই রজস্বলা হয় সৃষ্টির প্রয়োজনে। কাজেই যৌনাবেগ প্রাকৃতিক নিয়মেই অপ্রতিরোধ্য হয় নারীতে। এজন্যেই হাওয়াই হলেন কামের প্রথম শিকার—কামবিমোহিতা। সেই থেকে নারী দোযখের দ্বার।

যৌনবোধে জাগ্রত নর-নারীকে নবাবিষ্কৃত সুখ-রহস্য ও নবলব্ধ অনুভূতি আকুল করেছিল। সুখ-উল্লাসে তাঁরা তখন আত্মহারা। যৌনতায় নিমগ্ন মুগ্ধ মানব-মানবীর এই অসংযত কামচর্চা জেহোভা সহ্য করেননি। অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত আদি মানব-মানবী বিক্ষিপ্ত হলেন মর্ত্যে। স্বর্গচ্যুত নর-নারী হলেন সৃষ্টিশীল। রমণ ও প্রজননই ছিল তাঁদের অবশিষ্ট জীবনের ব্রত ও কর্তব্য। অতএব তাঁদের অপরাধ যৌনবোধ আর পরিণাম হচ্ছে মর্ত্যে বাস, রমণ ও প্রজনন। নইলে তাঁরা চিরকাল থাকতেন স্বর্গে এবং থাকতেন বন্ধ্যা ও লজ্জাহীন এবং হতেন অমর। কাজেই স্বর্গ ও মর্ত্যে পার্থক্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনবোধহীনতা ও যৌনতা। স্বর্গ আনন্দ ও আরামের এবং অজরামরতার, মর্ত্য দুঃখ ও যন্ত্রণার এবং জরামৃত্যুর। অতএব, যৌনবোধহীনতাই স্বর্গ-সুখ আর যৌনতাই দুর্ভোগের আকর। যৌনতা তাই ঘৃণার ও লজ্জার। কাম-বিমুক্তিই ব্রহ্মচর্য ও বৈরাগ্য তথা পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও অধ্যাত্মসিদ্ধির সোপান। যে-যৌনতার কারণে আদি মানব-মানবীর স্বর্গচ্যুতি, মর্ত্যে বাস ও মরণশীলতা এবং যে-পাপের দুর্ভোগ কেয়ামত অবধি তাঁদের সন্তানদেরও পোহাতে হবে, সে-যৌনতা ঘৃণ্য না হয়ে পারে না। তাই শামীয় ধারণায় লাম্পট্য ও অসতীত্বই সবচেয়ে বড় পাপ—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

পার্থিব জীবনেও মানুষের আদি পাপের উৎস এই কামুকতা। কাবিল-জীবনে পাপ এই কাম থেকেই উদ্ভূত। কাম থেকেই কাবিলের ঈর্ষার জন্ম, আর ঈর্ষা থেকেই আসে হাবিল-হত্যার প্রেরণা। সে-থেকেই কামানল আর রূপবহ্নি সংযম-সতর্কতা সত্ত্বেও পোড়াচ্ছে হৃদয়, দগ্ধ করছে গৃহ, পুড়ছে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, রাজ্য ও সমাজ। সে-সব কথা অঙ্গারের অক্ষরে লেখা রয়েছে রূপকথায়, কাব্যে, উপাখ্যানে ও ইতিহাসে এবং গানে, গাথায়, চিত্রে, নৃত্যে, নাটকে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে। এই সর্বভুক অগ্নির দহনের কথা বলে বলেই গাইয়ে-বাজিয়ে-লিখিয়ে-আঁকিয়ে চিরকাল কাঁদিয়েছেন, চিরকাল জ্বালিয়েছেন মানুষকে। আজো মানুষ তেমনি জ্বলছে, তেমনি কাঁদছে এবং চিরকাল জ্বলবে আর কাঁদবে। মানব সৃষ্টির সঙ্গে তার শুরু আর প্রলয়ে হবে তার শেষ। যৌনবোধ ও যৌনতা জৈবিক বলেই এর নিয়ন্ত্রণ সমস্যাও জটিল এবং দুঃসাধ্য। তাই বলে মানুষ হাল ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের হাতে—প্রকৃতির খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল না। এই জ্বালা ও কান্না, এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রতিরোধ-লক্ষ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যৌনজীবন। মানুষের এই শুভবাঞ্ছা অনেকখানি সাফল্য পেয়েছে বিবাহ-বন্ধনে। এভাবে মানুষে মানুষে গড়ে উঠেছে দাম্পত্য ও আত্মীয়তা এবং সে-সূত্রে গড়ে উঠেছে পরিবার, পরিজন, গ্রাম, গোত্র ও সমাজ। সমাজ পেয়েছে স্থিতি ও শৃঙ্খলা। বেশ্যাবৃত্তিও হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপূরক এবং সে-সূত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক।

পুরুষ-ভোগ্য নারীর সতীত্বের ধারণাও এর পরোক্ষ ফল। নারীর একনিষ্ঠতাই সতীত্ব। পুরুষের এমন সংযম ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন নেই। তারা 'বয়েস কালে দোষ' যা করে, তা নিন্দনীয় হলেও তেমন ঘৃণ্য ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ নয়। পুরুষ-প্রধান সমাজে পুরুষ নিজেদের জন্যে এ সুবিধেটুকু রেখেছে। নারী তার কাছে সোনা-রুপার মতো মূল্যবান ভোগ্যসম্পদ। সব মূল্যবান সম্পদই অপরের লোলুপতা ও অপহরণ-বৃত্তি জাগায়। তাই নারীকে লোভীর লোলুপ ও লুব্ধ দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হয়। তার একনিষ্ঠতা না থাকলে মালিকের স্বার্থে ও চিত্তে ঘা লাগে। এই এক-লগ্নতা তথা মালিক-নিষ্ঠার নাম সতীত্ব।

যৌনজীবনের এই সামাজিক ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের পক্ষে শুভই হয়েছে। দুনিয়াব্যাপী সভ্য ও বর্বর মানুষের হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে এই নিয়ন্ত্রণের ফলেই। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে মানুষ মূলত তার এই বাধাপ্রাপ্ত যৌন-বৃত্তিরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অমার্জিত ও পরিস্রুত অভিব্যক্তি দিয়েছে। এভাবে কামের উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটেছে প্রেমে। এই যৌন অনুভূতি চেতন ও অবচেতন বোধে রূপচেতনা ও অনুরাগরূপে মানুষের চিত্তলোকে মহিমান্বিত বিভায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

সহজেই বোঝা যায়, অবাধ কামচর্চা মানুষের অনুভব-উপলব্ধির জগৎ কিছুতেই প্রসারিত করতে পারত না। এ বাধা তাই আশীর্বাদ, এ সংযম তাই কাম্য; এ নিয়ন্ত্রণ তাই সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের মুখ্য মাধ্যম হয়েছে।

বলতে গেলে সর্বপ্রকার কলার আয়োজনই ভালো লাগার ও পেতে চাওয়ার অভিব্যক্তি দানের জন্যে এবং কাম্যজন থেকে ব্যবধানের ও বিচ্ছেদের কিংবা অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাকে ধ্বনিত করার জন্যে। তাই দুনিয়ার সব শ্রেষ্ঠ কলাই বিরহজাত—বিরহবোধের দান। বিরহের ও অপ্রাপ্তির বেদনা ও কান্নাই ধ্বনিত হয়েছে সর্বত্র। এজন্যেই শৃঙ্গাররসই আদি, অকৃত্রিম ও সর্বহৃদয়বেদ্য রস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের অনুসরণে বলা চলে, অবদমিত যৌনবোধ মানুষের চিন্তায়, কর্মে ও অনুভবে রূপ পায়। অন্যকথায় মানুষের জীবনে যা-কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার অনেকখানিই যৌনবোধের, যৌনবিকৃতির কিংবা নির্বিঘ্ন যৌনজীবনের দান।

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এও হয়তো বলা যায় যে, মানুষের জীবন যতখানি রক্ত-মাংসের তথা দৈহিক বা জৈবিক, ততখানি ভাব-চিন্তা-জ্ঞান ও হিতবোধ লব্ধ নয়। অর্থাৎ মানুষের জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্মের যতখানি প্রাকৃতিক, এতকালের অনুশীলনেও মানুষ তার সিকিভাগও কৃত্রিম তথা স্বসৃষ্ট করতে পারেনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রেম

তুর্কী-আফগান-মুঘলেরা এদেশে আসে পরাক্রান্ত বিজয়ী শাসকরূপে। বিদেশী বিজাতি, বিধর্মী ও বিভাষী বিজেতার কবলে পড়ার অভিজ্ঞতা এদেশের জনগোষ্ঠীর নতুন ছিল না। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, আর্য, নিগ্রো, শক, হুন, ইউচি, গ্রীক প্রভৃতিও উড়ে এসে জুড়ে বসে এখানে। কিন্তু এদের কারো সুসংবদ্ধ ধর্মদর্শন ছিল না। কেউ ছিল সর্বপ্রাণবাদী, কেউ ছিল জাদুবিশ্বাসী, কেউ ছিল টোটেম-টেবু স্তরে, আবার কেউবা ছিল উঁচুস্তরের প্যাগান-পৌত্তলিক। তাই তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্ন করেনি। সে প্রয়োজনই ছিল না তাদের। এদেশে যা সুন্দর, যা কল্যাণকর ও যা উপযোগসিদ্ধ, তা-ই তারা গ্রহণ করেছে অকাতরে। মানুষ তখনই হয় গ্রহণবিমুখ, রক্ষণশীল ও স্বাতন্ত্র্যকামী, যখন সে নিজের যা-কিছু আছে তাকেই জীবন-জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে, কোনো প্রয়োজনবোধ কিংবা অভাব অনুভব করে না, বরং প্রাচুর্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় সে থাকে গর্বিত ও তৃপ্তমন্য। জাতি হিসেবে এরা ছিল গড়ার মুখে এবং তাদের সভ্যতা ছিল কেবল বিকাশোন্মুখ। এমন মানুষ হয় কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু ও গ্রহণে আগ্রহী। তাই এই নবাগতরা এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণে নিজেদের গড়ে তুলতে ছিল উৎসুক। ব্যবহারিক আচরণে কিংবা মানস-অভিব্যক্তিতে দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে অভিন্ন হয়ে বাস করতে চেয়েছে তারা। অথবা পরিবেষ্টনীর প্রভাবে তা-ই করতে হয়েছে তাদের।

একদা যারা ছিল প্যাগান ও বৌদ্ধ, সেই শক-হুন-উইচি-মোঙ্গলের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-প্রতিবেশী তুর্কী আফগান-মুঘলেরা এল এবার নতুন বৃত ধর্ম, নতুন ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। এরা একসময়ে ছিল কিরাত, এখন ক্ষত্রিয়। দুটোই বাহুবল সাপেক্ষ। জিগীষাই ছিল তাদের প্রাণের প্রেরণা। বাহুবল আর ধনবল যার আছে, তার মর্যাদাবোধও থাকে। অহঙ্কার, গর্ব কিংবা আত্মসম্মানবোধ লালন ও অভিব্যক্তি পায় স্বাতন্ত্র্যে। তাই এদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ছিল তীক্ষ্ণ, স্বধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রীতি ছিল তীব্র। তাছাড়া স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, লোকান্তরে প্রসারিত জীবনের সুনির্দিষ্টতা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রত্যয়-দৃঢ় ধারণা, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ-সাফল্য প্রভৃতি তাদেরকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষায়ও দেয় প্রবর্তনা। আবার দেশীলোকেরাও ইসলাম বরণ করে শাসকদের জ্ঞাতিত্বলোভে ও স্বধর্মের স্বাতন্ত্র্য-চেতনায় পূর্বপুরুষের দেশী ঐতিহ্য ও আচার পরিহারে হল উৎসাহী। এসব কারণে আগের মতো এবার শাসক শাসিত অভিন্ন হয়ে উঠল না।

কাজেই হিন্দুর মনে পরাধীনতার গ্লানি ছিলই। আর শাসকের স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও উত্তমন্যতা সে গ্লানি স্থায়ী ক্ষতে পরিণত করে। ফলে বেদনা, ক্ষোভ ও গ্লানি শাসিত-মনকে অসুস্থ করে রাখে। আর সাতশ বছরের মধ্যে এমন কোনো আবহ তৈরি হয়নি যাতে সুস্থ মনের প্রবর্তনায় সুস্থ হয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্ভব হত। অবশ্য চেষ্টা হয়েছে অনেক। এ সূত্রে রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু প্রভৃতি সন্তদের প্রয়াস স্মর্তব্য। তবে এতেও কেবল বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের প্রাচীরই উঠেছে। এসব মিলন-প্রয়াস বিচ্ছেদের বেদনায় হয়েছে ম্লান, বিভেদের ও স্বাতন্ত্র্যের অহমিকায় হয়েছে তিক্ত।

এ ব্যর্থতার কারণ আছে। এতকাল মানুষ সে-কারণ জেনে-বুঝেও এড়িয়ে গেছে, উচ্চারণ করতে চায়নি। মনের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনাকেই সে শ্রেয় মনে করেছে। কেননা এ কারণ অপসারণের সাহস ও শক্তি ছিল না তার। তাই বৃথা জেনেও সে মিথ্যা উপায়ে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠায় হয়েছে প্রয়াসী। অপ্রেম দূর করার ছলনায় সে আত্মপ্রতারণাই করেছে চিরকাল। সত্যকে দেখেও সে চোখ বুজে ছিল, তাই ফুটো পাত্রে পানি ঢালার বিড়ম্বনাই পেয়েছে সে। সে-যুগে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল নিরুপায়। কেননা বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব ও স্থিতি। ধর্ম মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার ও আদর্শের বন্ধনে মানুষের দেহ-মন-আত্মাও নিয়ন্ত্রিত করে। এতে নিয়ম-নীতির ডিকদড়িবদ্ধ মানুষের বিচরণ-ক্ষেত্রের পরিসর হয় সীমিত। ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাইরে কিছু করা অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের পক্ষে পাপ। ধর্মবোধ ও ধর্মাচারের ক্ষেত্রে যুক্তি-বুদ্ধির প্রশ্রয় মারাত্মক বলেই সে জানে। কাজেই চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা সেখানে কার্যত অস্বীকৃত। বিধর্ম ও বিধর্মীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলাই হচ্ছে সাধারণের পক্ষে নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার উত্তম নীতি। এই ঋজুবোধের রাজপথ ত্যাগ করা জ্ঞানী-গুণীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অন্তরের দিকে এইরূপ বাধা ছিল বলেই বাইরে ব্যবহারিক জীবনেও প্রীতির বন্ধন স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। হাটে-ঘাটে-মাঠে তারা মিলিত হয়েছে বৈষয়িক কাজে, কিন্তু মনে মেলেনি। তাদের চাঁদ-সূর্য-আকাশ ছিল একক, তাদের নদী-নৌকা-হাট-বাট ছিল অভিন্ন, ফসল-পণ্যও তারা দেয়া নেয়া করেছে, কেবল মন ও মত রেখেছিল ভিন্ন। রুদ্ধ রেখেছিল তাঁরা হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহ। এজন্যেই পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মিলন-প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে চিরকাল।

প্রবলপক্ষ তথা শক্তিমান যদিবা আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে সাহস পায়, দুর্বলপক্ষ আত্মবিলয়ের আশঙ্কায় পিছিয়ে যায়। সে আত্মসংকোচনে ও আত্মগোপনেই খোঁজে স্বস্তি ও নিরাপত্তা। হীনবল শাসিত হিন্দুরও এসেছিল এই স্বাভাবিক আত্মসংশয়। হিন্দুর এই বিকৃতবুদ্ধি ও অসুস্থ মন শাসকের ধর্মে দীক্ষিত জ্ঞাতিদের প্রতিও বিরূপ ও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে দেশজ মুসলমানরাও বিস্মৃতগোত্র ও শাসকদের জ্ঞতিত্বকামী হয়ে বিধর্মীর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করাই স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে জানল। আত্মরতি চিরকালই পরপ্রীতির পরিপন্থী। বিধর্মবিদ্বেষের জন্যে স্বধর্মনিষ্ঠ হবার প্রয়োজন হয় না। এটি জীবনের একটি সাধারণ সংস্কারে পরিণতি পায় বলে বিশ্বাসের মতোই দৃঢ়মূল সংস্কার অধার্মিকের মনেও এ বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখে। কাজেই প্রাজ্ঞ ধার্মিকের মনে যদিবা কিছু সহিষ্ণুতা থাকে, আচারনিষ্ঠ ধার্মিক ও অধার্মিকের তাও থাকে না।

কাজেই এই স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও স্বধর্মপ্রীতিই তৃতীয়পক্ষ ব্রিটিশের শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক করে তিক্ততর এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে করে তীব্রতর। পূর্ব গ্লানির স্মৃতিতে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা বুঝল না যাকে এড়ানো-সরানো যাবে না, যার সঙ্গে জীবন-জীবিকা একসঙ্গে গ্রথিত; তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা, তাকে ঘা দেয়া আত্মপীড়নেরই নামান্তর। বিকৃতবুদ্ধি ও অসুস্থ মনের প্রভাবে হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের দু-শ বছর ধরে এ আত্মঘাতী চিন্তায় ও আচরণে উৎসাহবোধ করেছে, পেয়েছে ছদ্ম আত্মোন্নয়নের প্রচুর আত্মপ্রসাদ। কার্যত মুসলমানের ক্ষতি করার সামর্থ্য ছিল তাদের সামান্যই, কিন্তু কথায় ও আচরণে লাঞ্ছিত করে মুসমলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ শত্রু করে তুলল তারা। কে না দেখল, হিন্দুর পক্ষে ভালো হয়নি এর ফল!

শক্তি যার আছে, সে দাপট দেখাবে; সে দাপটের ঘা কোথায় কখন কার গায়ে লাগছে, কেমন করে লাগছে, আর কী পরিমাণ মানস ও ব্যবহারিক ক্ষতি করছে, তা অনেক সময়ে অনেক ক্ষেত্রে থেকে যায় শক্তিমানের অগোচরে। ফলে যে আঘাত হানে সে স্মরণ করতে পারে না বটে, কিন্তু যে পায় সে ভোলে না। এ তত্ত্ব ব্রিটিশ আমলের মুসলমান সম্পর্কে খাঁটি তথ্য ও সত্য।

মুসলমান ছিল শাসক। আর হিন্দু ছিল শাসিত। তাই হিন্দুর মনে ছিল বেদনা ও ক্ষোভ। আর উত্তমন্য মুসলিম চিত্তে হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল না বরং বিধর্মী বলে ছিল তাচ্ছিল্য। আবার শেষের দিকে মারাঠা ও শিখদের প্রতি উত্তরভারতীয় মুসলিম-মনে বিদ্বেষ-বিরূপতা জাগার কারণ ঘটেছিল। তখন সেখানে মুসলমান শাসিত এবং হিন্দু-শিখ শাসক। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশে সে-প্রতিবেশ ছিল অনুপস্থিত। পরে মুসলমানের সর্বনাশ ঘটে ব্রিটিশের হাতে। তাই ব্রিটিশ ভাগানোর লক্ষ্যে মুসলমানরা হাত মিলাতে চেয়েছিল হিন্দুর সঙ্গে ওহাবী-সিপাহী-কংগ্রেস আন্দোলনে। বৃত্তি বেশাত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমান এগিয়ে যাওয়া হিন্দুর কাছে অর্থ-বিত্ত হারিয়ে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে হারানো ধন. বৃত্তি ও চাকরি ফিরে পাবার সাধনায় যত্নবান হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তাদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ হিন্দু-বিদ্বেষের রূপ নেয়। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তখন তারা প্রতিপক্ষ পেল হিন্দুকে। হিন্দুরা আগেই মুসলিমদের নানাভাবে ঘা দিয়ে বিরূপ করে তুলেছিল। ১৯৪৭ সন অবধি এবং তার পরেও তার জের স্বরূপ দুপক্ষের দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও কৌৎসিত্য সবাই দেখছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর—যদিও তার আগের মতো নীতি ও আদর্শবিরোধী, তবু—বাস্তব বুদ্ধি ও শ্রেয়বোধের প্রেরণায় গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা করলেন : হিন্দু ও মুসলমান আর ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, সম-নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় জাতি 'পাকিস্তানী' নামেই হবে পরিচিত।

ভারতও ঘোষণা করল নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু যেমন বিকৃত বুদ্ধি ও অসুস্থমনের প্রভাবে পড়ে হিন্দুয়ানির মোহ ও মহিমা প্রচারে উৎসাহী তেমনি কিছুসংখ্যক মুসলমানও ধর্মীয় জাতীয়তা, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণে-সৃজনে যত্নবান। ভারতে হিন্দিকে করছে সংস্কৃত-ঘেঁষা আর পাকিস্তানে উর্দু হচ্ছে প্রায়-ফারসি। উভয় রাষ্ট্রেই এভাবে ব্যর্থ হয়েছে দেশনেতা ও রাষ্ট্রপতির অভিপ্রায় ও আবেদন। ফলে জাতীয় জীবনে স্বস্তি ও কল্যাণ আসেনি। গড়ে উঠতে পারেনি স্বস্থ ও সুস্থ জাতি। সফল হল না দেশনেতার আনন্দিত স্বপ্ন। ইংরেজ আমলের সে-আধি এখনো চেপে বসে আছে পাক-ভারতের মানুষের মনে-মগজে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের পাঠ্যপুস্তক ও বেতার হিন্দু ও হিন্দুয়ানীর মহিমা কীর্তনে প্রযুক্ত। যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মন ভাঙলে কেবল যে ঘরের শান্তি নষ্ট হয় তা নয়, বিপদকালে সাহায্য-সহানুভূতিও মেলে না। ঘরের শত্রুর মতো ক্ষতিকর শত্রু নেই। কেননা তাকে ঠেকানো যায় না। এ যুগে প্রথম মহাযুদ্ধ কালে জার্মানির ইহুদির ভূমিকা স্মর্তব্য। খ্রীস্টান জার্মানের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষই জার্মান ইহুদিদের স্বদেশের স্বার্থের প্রতি উদাসীন করে তুলেছিল।

সংখ্যালঘুর প্রতি অন্যায় ও সংকীর্ণচিত্ততার পরিণাম হিন্দুদের পক্ষে শুভ হয়নি এবং স্বাধীন দেশের সংখ্যাগুরু নাগরিক হয়েও তারা তা ত্যাগ করেনি; এখনো দাঙ্গা বাধায়, অসহায়কে হত্যা করে। স্বাধীন দেশের সংখ্যাগুরু নাগরিক হয়ে সংখ্যালঘুর ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ার ভীতি জিইয়ে রাখা, আর সে-ভয়ে দিশাহারা হয়ে 'সামাল সামাল' রব তোলা, দুর্বল সংখ্যালঘুকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে উদ্যোগী হওয়া, তার প্রতি সমকক্ষের হিংসা পোষণ করা প্রভৃতি বিকৃতবুদ্ধির, অসুস্থ মনের ও নিজের প্রতি আস্থাহীনতার পরিচায়ক।

এ যুগে ধর্মমতকে বৈষয়িক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সম ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে যে-কোনো দেশের, ধর্মের, ভাষার, সংস্কৃতির ও সমাজের মানুষের সঙ্গে একই মিলন-ময়দানে এসে দাঁড়ানো শুধু সম্ভব নয়, সহজও। পাক-ভারতে আজ এ বোধের অনুশীলনের বড় প্রয়োজন। অবশ্য সঙ্গে 'প্রীতি' ও 'প্রত্যয়' থাকা চাই। কেননা, প্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দু-ই বন্ধ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস

এ বছর দেখছি কোথাও কোথাও 'পলাশী দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য বোধ হয় পরাধীনতার গ্লানি স্মরণ করে স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যের মহিমা কীর্তন করা। ইতিহাস পাঠকের দৃষ্টি আবেগে আচ্ছন্ন হওয়া অবাঞ্ছিত। নিরপেক্ষ বিচারেই ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কেননা তেমন শিক্ষাই কেবল ব্যক্তিক কিংবা জাতিক জীবনে ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব।

আগের যুগে রাজার রাজ্য ছিল, জনগণের রাষ্ট্র ছিল না। কাজেই জমিদারের চর- দখলের মতোই দেশ কাড়াকাড়ি চলত রাজায় রাজায়। দেশের জনগণের তাতে কোনো ভূমিকা ছিল না। ভাড়াটে লেঠেলের মতোই ভাড়াটে সৈন্যেরা পয়সার বিনিময়ে ও ফাউস্বরূপ লুটের মালের লোভে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করত মনিবের পক্ষে। এসব যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর দেশ-জাত চেতনা ছিল না। যে কড়ি দেবে, তার কাজে জান কবুল —এই ছিল তাদের নীতি। তাই ব্রিটিশেরা দেশী সৈন্য দিয়েই ভারত দখল করেছিল। সেই যে কথায় আছে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখড়ের প্রাণ যায়' —তা প্রায় আক্ষরিকভাবেই সত্য ছিল। রাজা বদল হলে প্রজার মনে কোনো ভাবান্তর হত না। কেবল প্রশাসনিক নীতি পরিবর্তনের ফলে প্রজার আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ ঘটত। শাসকের চরিত্র-ভেদে শাসন-শোষণের মাত্রাভেদ অবশ্যই হত।

বাঙলাদেশ চিরকালই বিদেশী শাসিত। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তূর্কী-আফগান-মুঘল কিংবা ইংরেজ—ওদের কেউ বাঙালি ছিল না। শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্ত কিংবা যদু-জালাল উদ্দীন বাঙালি হয়েও বাঙালির স্বাজাত্যবোধের অভাবে বেশি দিন টিকতে পারেননি। রাজা-প্রজার সম্পর্ক বান্দা-মনিবের কিংবা শাসক-শাসিতের ছিল বলেই রাজকীয় ব্যাপারে তথা রাজনীতিতে জনগণের স্বাদেশিক বা স্বাজাতিক চেতনা ছিল অনুপস্থিত। কাজেই মধ্যযুগের কোনো যুদ্ধকে কিংবা হার-জিৎকে জাতীয় সংগ্রাম বা জাতীয় জয়-পরাজয় বলে চিহ্নিত করা চলে না। এ ছিল শাসকগোষ্ঠীর গোত্রীয় লজ্জা-গৌরবের ও শ্রেণীগত লাভ-ক্ষতির বিষয়।

পলাশীর পটভূমিকা আলোচনা করলেও আমরা এ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াব। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বাঙলাদেশ নামত মুঘল শাসনে আসে। ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি এখানকার ভুঁইয়াদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মাধ্যমে মুঘল অধিকার টিকিয়ে রাখার প্রয়াস চলে।

তার পরেও মীর জুমলা-শায়েস্তাখানের সুবাদারি (১৬৮৮ খ্রী.) অবধি বাঙলা দেশ মোটামুটিভাবে সেনানী-শাসক (Military Governor) দ্বারা শাসিত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে বিহার-উড়িষ্যাও বাঙলা-সুবাভুক্ত থাকে। মুঘল আমলে বাঙলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ, অনেকটা ঔপনিবেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। দিল্লী ছিল সাত সমুদ্রের না হলেও তেরো নদীর ওপারে। মুঘলেরা এ অঞ্চলে শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, স্বাদেশিক রাজার মতো পোষণের দায়িত্ব কিংবা প্রজার কল্যাণ সাধনের কর্তব্য গ্রহণ করেনি। এ ছিল খাজনা আদায়ের জমিদারি ও শুল্ক উসুলের বন্দর।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙজীবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙতে থাকে। ফররুখ শিয়রের ঢাকা ত্যাগের পর ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ থেকে পূর্বতন দিওয়ান এবং আওরঙজীবের বিশ্বস্ত কর্মচারী মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে জেঁকে বসেন। তাঁর সময় থেকেই স্বল্পমেয়াদী সুবাদারি দিল্লীর সম্রাটের প্রতি নামমাত্র আনুগত্যে পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে অবসিত হল।

এই মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিনের দরবারেই ধর্না দেন বেকার আলিবর্দী। আলিবর্দীর পিতামহ ছিলেন আওরঙজীবের ধাত্রীপুত্র। তাঁর পিতা মোহাম্মদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী ছিলেন আওরঙজীবের পুত্র আজম শাহর পানপাত্র বাহক। আজমের বিপর্যয় ও মৃত্যুতে (১৭০৭ খ্রী.) তাঁর পরিবারে দুর্দিন দেখা দেয়। পিতৃহীন আলিবর্দী ভাগ্যান্বেষণে সপরিজন চলে আসেন উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় তিনি তাঁর আত্মীয় নায়েব-সুবাদার সুজাউদ্দিনের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। নিজের যোগ্যতায় এবং মুর্শিদকুলি খাঁর ও মাতুল বংশীয় সুজাউদ্দিনের কৃপায় তিনি ক্রমে বিহারের নায়েব সুবাদার পদে উন্নীত হন।

মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর জামাতা নওয়াব সুজাউদ্দিনের সময়ে আলীবর্দীর প্রতিষ্ঠা আরো বাড়তে থাকে। তাঁর ভ্রাতা হাজী আহমদও দরবারে আমীর পদে উন্নীত হন। সুজাউদ্দিন-পুত্র সরফরাজ খাঁর আমলে আলিবর্দী ছিলেন বিহারের নায়েব সুবাদার। উৎকোচে দিল্লী-দরবারের আমীরদের বশ করে তিনি বাঙলার সুবাদারি সনদ লাভ করেন এবং তাঁর ভাই হাজী আহমদের মধ্যস্থতায় মুর্শিদাবাদ-দরবারে ষড়যন্ত্র করে আমীরদের স্বপক্ষে এনে গিরিয়ার প্রান্তরে নামমাত্র যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারি মসনদ তথা নওয়াবী লাভ করেন।

আলিবর্দীর পনেরো বছর নওয়াবীকালে বারোটি যুদ্ধ ঘটে। মুর্শিদকুলির জামাতাদি আত্মীয়েরা, বিহারের বিদ্রোহী সামন্তরা এবং মারাঠারা তাঁকে তাঁর ষড়যন্ত্র-লব্ধ রাজ্য সুখে ভোগ করতে দেননি। ফলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয়বাহুল্য তো ছিলই, তাছাড়া প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করাও যুদ্ধকালে সম্ভব ছিল না। তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধেক বর্গীর লুটতরাজে ছিল বিধ্বস্ত। এখানেই শেষ নয়, উড়িষ্যার আয় চৌথরূপে ছেড়ে দিতে হল এবং অধিকন্তু নগদ বারো লক্ষ টাকা বার্ষিক কর ভোঁসলাকে দিতে হত। সিরাজউদ্দৌলা যখন নওয়াব হলেন তখন দিল্লীর সনদ যোগাড়ের পয়সা ছিল না তাঁর। আবদালী ও দিল্লীর সম্রাটের হুমকিতে বিচলিত সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন, যাতে বিপদকালে ইংরেজদের সাহায্যে দিল্লী-প্রেরিত বাহিনী ঠেকানো যায় —এই ভরসায়। আহমদ শাহ আবদালী-লুণ্ঠিত দিল্লীর রাজার তখন অভিযান করার মতো অবস্থা ছিল না। কাজেই সে দিক থেকে কোনো বিপদ ঘটেনি।

গিরিয়ার যুদ্ধে ও পলাশীর যুদ্ধে আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিণামগত কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। বাঙালির এতে জানবার, বুঝবার ও ভাববার কিছুই ছিল না। কেবল রাজ্য কাড়াকাড়ির চিরকালীন তামাশাই দেখবার ছিল এবং তারা রসিক-দৃষ্টি দিয়ে দেখেওছে। সে যুগে দেশ ছিল রাজার রাজ্য। রাজ্য রক্ষার গরজ, প্রজা শাসনের দায়িত্ব এবং রাজ্য হারানোর দুর্ভাগ্য সবই ছিল রাজার। প্রজার কাছে এসব ছিল মনিব ও মালিক পরিবর্তনের একটি সাময়িক দুর্ভাগ্য মাত্র। সে-মালিক স্বদেশী কিংবা বিদেশী, স্বজাতি কিংবা বিজাতি —এ বিচার তারা কোনো দিনই করেনি। এ বিচারে কেউ কখনো অভ্যস্তও ছিল না। এমনকি আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি এ চেতনা—এ দৃষ্টি ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনুপস্থিত দেখি। ষোলো শতক থেকেই পর্তুগীজদের মাধ্যমে য়ুরোপীয় শক্তির প্রভাব ও অধিকার এদেশে দৃঢ়মূল ও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু বিদেশী-বিজাতি বলে তাদের কেউ ঠেকানোর চেষ্টা করেনি। কেবল প্রতিষ্ঠাকামী প্রবল প্রতাপ উঠতি শক্তিরূপে সমীহ-ই করেছে। এবং স্বস্বার্থে এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বদলে সহযোগিতাই করেছে এদেশের রাজন্যবর্গ। কর্নাটে ফরাসির ও বাঙলায় ইংরেজের ভূমিকা, মুঘল বাদশাহ কর্তৃক ইংরেজকে বাঙলা-বিহারের দেওয়ানী দান, টিপুসুলতানকে সাহায্যদানে নিজাম-মারাঠার অস্বীকৃতি, সিপাহী বিপ্লবকালে রাজন্যবর্গের ব্রিটিশ-প্রীতি প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অতএব স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক চেতনা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও ছিল না। তাঁদের ছিল-দেশ-জাত মানুষ নিরপেক্ষ রাজ্য-চেতনা। কাজেই দেশী-বিদেশী যে-কোনো রাজশক্তিকে তাঁরা সুবিধা ও প্রয়োজনমতো কখনো মিত্ররূপে, কখনোবা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই ভেবেছেন। অবশ্য এরই নাম রাজনীতি।

মুর্শিদকুলি থেকে সিরাজউদ্দৌলা অবধি সবাই দুর্বল প্রভুর স্বৈরাচারী সুবাদার মাত্র। আঠারো-উনিশ শতকে কখনো কখনো কোনো কোনো রাজা-বাদশা, সামন্ত ও ধর্মনেতা স্বস্বার্থে স্বাধর্মিক জাতীয়তার বুলি আওড়িয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস মুঘল-মারাঠা কিংবা ইংরেজ-সাম্রাজ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। নাদির শাহ কিংবা আহমদ শাহ আবদালীর ভারত অভিযানে মারাঠা শক্তি ঘা খেয়েছে বটে, কিন্তু মুঘল শক্তিই হয়েছে বিলুপ্ত, যার ফলে ইংরেজ-শক্তি হল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবার শিখ-হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীসুলভ ঈর্ষা-বিদ্বেষ বশে যতটা সাম্প্রদায়িক হতে পেরেছিল, ওহাবী আন্দোলন ততটা ইংরেজদ্রোহী হতে পারেনি।

অতএব আমাদের দেশের রাজনীতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে স্বাদেশিক, স্বাজাতিক কিংবা স্বাধর্মিক জাতীয়তার কোনো ভূমিকা ছিল না। কাজেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আলিবর্দী, কিংবা মীর জাফর আলী খাঁর ভূমিকা অভিন্ন। এবং সরফরাজ, সিরাজউদ্দৌলা কিংবা মীর কাসিমের দুর্ভাগ্যও নিত্যঘটিত ব্যক্তিগত ঘটনা। বস্তুত পলাশীর বিজয়ে নয়, দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক ইংরেজকে দিওয়ান নিযুক্তির ফলেই বাঙলায় তথা ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। কেননা ওটাই ছিল তাদের Locus standi, ওতেই দেশের রাজনীতিতে ওদের দৌরাত্ম্যের দাবী ও অধিকার স্বীকৃতি পেল।

আধুনিক স্বাদেশিক বোধ ও স্বাজাতিক চেতনা নিয়ে মুঘল সুবাদার অবাঙালি সিরাজউদ্দৌলাকে জাতীয় বীর ও বাঙলার স্বাধীনতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করলে ইতিহাসের তথ্য ও মর্যাদা লঙ্ঘন করাই হবে। বস্তুত পলাশীর যুদ্ধের গ্লানি বা লজ্জা কোনোটাই বাঙালিকে স্পর্শ করার কথা নয়। যেমন মৌর্যযুগ থেকে সুন্দর শ্যামল স্বর্ণ-প্রসূ বাঙলাকে নিয়ে যত লড়াই হয়েছে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে, তার কোনো জয়-পরাজয়ই বাঙালির গৌরব কিংবা গ্লানির বিষয় নয়।

বাঙালারি স্থায়ী কলঙ্কের কথা এই যে, ইদানীং পূর্বযুগে বাঙালি কৃচিৎ স্বদেশ স্বশাসনে রাখবার চেষ্টা করেছে। দেশের মানুষ দ্বারা শাসিত না হলে রাজনৈতিক অর্থে মানুষ কখনো স্বাধীন হয় না। এই তাৎপর্যে পাল কিংবা স্বাধীন সুলতানী আমলও (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী.) বাঙলা বা বাঙালির পক্ষে গৌরবের ও গর্বের নয়।

AMARBOI.COM

বিদ্যা ও বিশ্বাস

বিদ্বানেরা বলেন, আদিতে মানুষ ছিল অরণ্যচর ও পর্বতবাসী। ফল, মূল ও মাংস ছিল তাদের খাদ্য। ক্রমে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়। বুদ্ধি ও কর্মশক্তির প্রয়োগে মানুষ জীবিকা-পদ্ধতির উন্নয়ন, খাদ্যবস্তুর উৎকর্ষ এবং নিবাসের রূপান্তর সাধন করে।

ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনবোধের প্রেরণায় তারা অনবরত সন্ধান, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ক্রমে ক্রমে আগুন, পাথর, ধাতু প্রভৃতি আবিষ্কার করে আর উপযোগ-বুদ্ধি প্রয়োগে এগুলোকে নানাভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। এভাবে তাদের অস্ত্র হল, শাস্ত্র হল, ঘরদোর হল, গরু-ঘোড়া-গাধা-মোষ-উট প্রভৃতিকে তারা পুষতে শিখল এবং বাহনও করল। চাকা বানাল, নৌকা ভাসাল, গরু-ঘোড়া-গাধা-মোষ-হাতির গাড়িও চালু হল। বত্রিশব্যঞ্জনে খেতে শিখল, বিচিত্র পোশাকে সাজতে জানল, ধাতব গয়না বানাতে পারল। কাঠ-পাথর, পোড়ামাটি দিয়ে ঘরও তৈরি করল, চাষ করে কত ফসল তুলল, ফুল-ফলের উদ্যানও রচল। এমনি করে সৃষ্টি ও নির্মাণে তারা প্রাণিজগতের ত্রাস ও প্রকৃতি-জগতের প্রভু হয়ে উঠল। আর করল জরু, জমি ও জেবর নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি। সমাজ গড়ল, দেব-দৈত্য পূজল, রাজ্য গড়ল। ভেতরে ভেতরে রীতি-নীতি-রেওয়াজ, আইন-কানুন-শাসন, ন্যায়-অন্যায়-সত্য, পাপ-পুণ্য-মিথ্যা, বিচার ক্ষমা-শাস্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য-সাহায্য প্রভৃতি কত কত কথা, ভাব, তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্বাস, সংস্কার, স্মৃতি, ভয়, ভরসা প্রভৃতির অদৃশ্য বন্ধনে বদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন-জীবিকার নিশ্চিত অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হতে চেয়েছে মানুষ। বিজ্ঞানের বলে আজ মানুষ মাটি ও আকাশের প্রভু। জ্ঞান তার পরিণতির পথে। বিজ্ঞান তার জগজ্জয়ে উৎসুক।

AMARBOI.COM

মানুষের এই ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনাকালে বিদ্বানেরা এতে কোনো দেব-দৈত্যের ভূমিকা স্বীকার করেন না। মানুষের আত্মোন্নয়নের ও আত্মপ্রসারের প্রয়াসে দেবতার সহায়তা কিংবা দৈত্যের প্রতিকূলতার কথা বিদ্বানেরা অবগত নন। বিদ্বানদের সবাই নাস্তিকও নন। তবু তাঁরা উত্তরকালের মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করেন। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলেন যে গোড়া থেকেই ভূত-ভগবান, দেব-দৈত্য, প্রেত-পিশাচ, জিন-পরি ফিরিস্তা-শয়তান প্রভৃতি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে মানুষের সহায়তা ও বিরোধিতা করে আসছে। মিত্রশক্তির পোষণে ও অরিশক্তির পেষণে মানুষ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও লাভ-ক্ষতি পেয়ে ও সয়ে সংখ্যায় ও সামর্থ্যে বেড়ে উঠেছে। কলিতে দেব-দৈত্যের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সমাপ্ত। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট। নবী-ঋষির কালও অপগত। তাঁদের বাণী দেশ-কাল নিরপেক্ষ চির-মানবের দিশারী।

আশ্চর্য এই দুই বিপরীত তত্ত্বে ও তথ্যে— বিদ্যায় ও বিশ্বাসে আমরা বিরোধ স্বীকার করিনে। কাজ চালানো গোছের একটা আপোশ, একটা সন্ধি —একটা সহঅবস্থান নীতি কেমন যেন অবচেতন প্রয়োজন-প্রেরণায় আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। তাই পাঠ্য বইতে ও বিদ্বানের আলোচনায় শাস্ত্র অবহেলিত। আবার শাস্ত্রীয় আলোচনায় ইতিহাসের তথ্য অস্বীকৃত। পাঠক কিংবা শ্রোতারা ঘরে-সংসারে, মন্দিরে-মসজিদে শাস্ত্র মানে। আর ইস্কুলে-কলেজে ও সভায় ইতিহাসকে যথার্থ বলে গ্রহণ করে। বিদ্যায় ও বিশ্বাসে এই দ্বন্দ্ব, জ্ঞানে ও প্রত্যয়ে এই বিবাদ যেন ক্রীড়াসুলভ প্রতিপক্ষতা। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত আপোশ একালে সর্বত্র সুরক্ষিত। শাস্ত্রকারেরা কিংবা ধর্ম-বিশ্বাসীরা কেন যে এই অশাস্ত্রীয় অতএব মিথ্যা-বিদ্যা নিজেদের ও নিজেদের সন্তানের জন্যে কামনা করে তা বোঝা সহজ নয়। সেই গেলেলিও-ব্রুনো-কপার্নিকাসের পর থেকে আরো উদার ও সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে এ কি তাদের পর-চিন্তা ও পর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিজীবিতার ফল অথবা বিশ্বাস-নিষ্ঠতার অভাবজাত? যাই হোক না কেন, কোনোটাই তাদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। মিশরীয় ব্যাবিলীয়-গ্রীক-ভারতীয়-চৈনিক পুরাণের পাশে পাশে মুসা-ঈসা-বুদ্ধ জোরাস্টার-কনফুসিয়াস প্রভৃতির শাস্ত্র এবং এগুলোর পাশে ডারুইন-ফ্রয়েড-মার্কস-হেগেল-নীৎসে-সার্ত্রের মতবাদ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহঅবস্থানগত বৈচিত্র্য-বৈপরীত্য ও জটিলতা আজকের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে বিচলিত ও বিব্রত করে না— জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বানেরাও ঘরোয়া কিংবা মানসজীবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে-বিশ্বাসে কোনো বিরোধ, কোনো অসঙ্গতি অনুভব করে না। তাহলে বিষয়ী মানুষকে নির্বোধ কিংবা উদাসীন বলে ভাবতে হবে। বলতে হবে তারা জৈব প্রয়োজন-সচেতন প্রাণী এবং জীবন ও জগৎ, তত্ত্ব ও তথ্য এবং রহস্যচর্চা তাদের কাছে ক্লাবীয় খেলামাত্র।

কিন্তু তাও যে নয়, তার প্রমাণ নিস্তরঙ্গ ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যদি কোনো ব্যতিক্রম তারা দেখতে পায় তখন তারা 'সনাতনী' সেজে নীড় ভাঙা পাখির মতো হৈচৈ শুরু করে দেয়। বাহ্যত তাঁরা তর্ক করে, যুক্তি মানে, বিজ্ঞান ও দর্শনকে মান্য করে, সমাজবিজ্ঞান স্বীকার করে, কিন্তু স্বার্থ ও প্রয়োজনানুগ গ্রাহ্য না হলে গ্রহণ করে না। সবকিছুর উপর বিশ্বাসজাত আস্থা, সংস্কারজাত ভীতি এবং স্মৃতিপ্রসূত ভরসাই জয়ী হয়।

একে তারা ধর্মভাব, ঐতিহ্য-প্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা বলে চালিয়ে দিতে সদা উৎসুক। আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবর্তনে তাদের আপত্তি ক্ষীণ। কিন্তু তার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক থাকলে তাদের প্রতিরোধ হয় প্রবল, আর ধর্মীয়নীতির ব্যতিক্রম দেখলে তারা খেপে ওঠে। তখন তারা শিক্ষা জ্ঞান, যুক্তি সব পরিহার করে। সনাতন রীতিনীতির মমতায় তারা তখন ধর্মোন্মাদ ও রণ-মত্ত। যুগে যুগে কত নবী-ঋষি-জ্ঞানী-গুণী এভাবে তাদের হাতে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত ও নিহত হয়েছেন! সমাজের মানুষের এই চরিত্রই মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থনীতিক জীবনে প্রগতির বড় বাধা। এ কারণেই আরণ্য জীবনের রেশ উন্নততম সমাজেও দুর্লক্ষ্য নয়।

তবু মানববাদীর হতাশ হয়ে বসে থাকা চলবে না। অধ্যবসায়ে কী না হয়! ক্রমাগত মানুষের বদ্ধমনের দ্বারে আঘাত হানতে হবে। অর্গল টুটবেই, দ্বার ভাঙবেই —তা যত বিলম্বেই হোক— যেমনটি গুহাযুগ থেকে ঘটে আসছে। তবু এরও একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য। প্রচার-প্রতিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতি কোনোটাই এড়ানো যাবে না। এতে সময় লাগবে বটে, কিন্তু সাফল্য সুনিশ্চিত। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির জন্যেই সনাতনের বেড়া ভাঙতেই হবে। তার জন্যে চাই মানববাদী সৈনিকদের আপোশহীন বিরামহীন নির্ভীক মসীযুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বপুরুষ . উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য

১

নির্বোধ যখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ঘরে-সংসারে তখনই যথার্থ বিপদ নেমে আসে, ক্ষতির ঝুঁকি তখনই বেড়ে যায়। নির্বোধের কোনো স্বকীয় অভিজ্ঞতা থাকে না। পরের জ্ঞানে সে জ্ঞানী, পরের মুখে শোনা যুক্তিপ্রয়োগে সে তার্কিক।

মানুষের সমাজে প্রগতির বড় বাধা এই নির্বোধেরাই। তারা অবশ্য বৈষয়িক ব্যাপারে নির্বোধ নয়। বলতে গেলে তাদের অর্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, উদ্যম সবকিছুই তারা তাদের বৈষয়িক জীবনের নিরাপত্তা ও প্রসারের জন্যে নিয়োজিত করে। তাই তারা সমাজ— ধর্ম-রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির তত্ত্বচিন্তার ভার কয়েকজনের উপরেই ছেড়ে দেয়। এবং নিজেদের পছন্দমতো কারো ভাব-চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি আনুগত্য রেখে দিব্যি সুখে জীবন কাটায়। কিন্তু তাদের সমর্থিত চিন্তা ও চিন্তানায়কদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা ও চিন্তানায়কদের মত-পথের দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হলে কাক-শেয়ালের মতো স্ব স্ব নায়কের পক্ষে হৈ চৈ, মারামারি কিংবা প্রয়োজনমতো হানাহানি শুরু করে দেয়। জীবনের অন্যক্ষেত্রে যতই তাদের দায়িত্ববোধ কিংবা কর্তব্যবুদ্ধির অভাব থাক, এ ক্ষেত্রে তাদের সতর্কতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সজ্ঘপ্রীতি নির্ভেজাল। এভাবে তারা হযরত মুসা-ঈসা-মুহম্মদ প্রমুখ অনেককেই লাঞ্ছিত, বিতাড়িত ও হত্যা করেছে।

AMARBOI.COM

২

তাঁদের বিশ্বাস, যুক্তি ও নীতি একটিই।

“আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের ভাবনা ভেবে রেখেছেন। আমাদের তাঁরা ধর্ম দিয়েছেন, আদর্শ দিয়েছেন, রীতি দিয়েছেন, নীতি শিখিয়েছেন, আচার জানিয়েছেন, আচরণ বাতলিয়েছেন, খাদ্যতালিকা দিয়েছেন, পোশাকের আদল দিয়েছেন, হাসি-কাসি-হাই তত্ত্ব রেখে গেছেন, দিন-ক্ষণ-মাস-রাশি-নক্ষত্র জানিয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবীর তথ্য, ইহ-পরকাল তত্ত্ব পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক চিত্র ---এর কোন্‌টি আমাদের আর জানতে বাকি আছে! এতে দর্শন-বিজ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব নেই! কী তাঁরা দিয়ে জাননি যে আমরা নতুন করে খুঁজে খুঁজে খেটে খেটে হয়রান হব!

“যারা পূর্বপুরুষের গড়া জীবন-ছাঁচ অবহেলা করে তারা পামর। এ সম্পদ, এ রিখ্‌থ যারা অগ্রাহ্য করে তাঁরা জাহিল। যারা বিদ্রূপ করে তারা নাস্তিক, যারা বিদ্রোহ করে তারা অভিশপ্ত শয়তান। কেননা পুরোনো কালেই বিধাতা নিজে এসে বা তাঁর নির্বাচিত প্রিয়জনদের পাঠিয়ে শিশু ও পশু মানুষকে জীবনের যা কিছু জ্ঞাতব্য, যা কিছু কর্তব্য, যা কিছু প্রয়োজনীয়, তা শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। সেসব ত্রিকালজ্ঞ নবী-ঋষির মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে কখনো হয়নি, কখনো হবে না। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি বিশেষ মানুষ— লোক-শিক্ষক।

“অতএব আমাদের কর্তব্য প্রদত্ত জ্ঞান আয়ত্ত করা, বিধি-নিষেধ মেনে চলা, তাঁদের প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণকরা আর নিশ্চিন্তে জীবিকা অর্জনে মনোযোগ দেয়া। আহা তাঁদের দানের তুলনা নেই? আমাদের কাজ কেবল কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকা। নিতান্ত জাহিল অর্বাচীন না হলে কি কেউ এমন নিশ্চিন্ত নীড় ভাঙে, এমন সুখের জীবন পায়ে ঠেলে!”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

অপরপক্ষের কথায় তারা কান দেয় না। কারণ তারা বিশ্বাস ও বিস্ময়কে জীবন-যাত্রার পাথেয় করেছে। বিধির ও ভগবানের অর্থাৎ নিয়ম-নীতি ও নিয়ন্তার অনুগত হলে বিবেক থাকে অবহেলিত। নিজেরা চিন্তা করে না, কাজেই নতুন যুক্তি খুঁজে পায় না, তাই নতুন জীবন-দৃষ্টিও লাভ করে না। বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় তারা অভিভূত। তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তাদের মন ভয়-ভরসায় বিমূঢ়। নইলে তারা খোলা চোখেই দেখতে পেত বিধাতার বরপুষ্ট মানুষ যা ভাবতে-খুঁজতে-বুঝতে-করতে পারেননি, আজকের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-মনীষীরা তা পেরেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন কিংবা অভিজ্ঞতা ও জীবনের ক্ষেত্রে সেদিন যা ছিল অভাবিত ও অসম্ভব, আজ তা মানুষের আয়ত্তে। আজকের মানুষের এত বড় সর্বাত্মক সাফল্য দেখেও যাঁরা প্রাচীন নবী-ঋষির তুলনায় আজকের জ্ঞানী-মনীষীকে তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে নির্বোধ-নির্জ্ঞান ভাবতে পারে তাদের অন্ধতা ঘুচবার নয়।

আশ্চর্য, ছোটখাটো ব্যাপারেও তারা প্রশ্নহীন। পূর্বপুরুষের নির্ধারিত খাদ্য-তালিকাও আমাদের রদবদলের অধিকার নেই। হালাল আর কখনো হারাম হবে না, হারামও হতে পারে না হালাল। পোশাকের পরিবর্তনও দূষণীয়। পৈত্রিক শত্রুকেও বন্ধু করা চলবে না। চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী, কান্তার-মরু-পর্বত-সমুদ্র সম্বন্ধেও আমাদের তাত্ত্বিকজ্ঞানের পরিবর্তন পাপপ্রসূ। কেবল পূর্বপুরুষের কদম মোবারক শরণ ও অনুসরণ করেই মানুষ থাকবে কৃতার্থ ও তৃপ্তমন্য।

তারা অবশ্য জানে, তাদের নবী-ঋষিরা অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান দিয়েছেন এবং অশ্রুতপূর্ব নতুন কথা বলেছেন, নতুন ধর্মমতও প্রবর্তন করেছেন। এবং তা বিধাতার অভিপ্রায় ও অনুমোদনক্রমেই সম্ভব হয়েছে। কলিকালে ঈশ্বর আর কোনো পরিবর্তন কাম্য করেননি। তিনি যে-পাট চুকিয়ে দিয়েছেন কলিকালে শয়তান তা খুলে বসেছে। শয়তানের চেলারাই কেবল পরিবর্তন প্রয়াসী ও নতুনের সন্ধানী। তারা এ-ও জানে তাদের প্রত্যেকেরই পূর্বপুরুষ সুদূর সেকালে কিংবা অনতি অতীত একালে কোনো-না-কোন সমকালীন নতুন ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এবং তাদের মতে শেষবারের মতো সত্যধর্ম বরণ করে তাদের পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বর-দত্ত শেষ সুযোগ লাভের অনুগ্রহ লাভ করেছেন। এটিই ছিল বিধাতার সর্বশেষ আনুশাসনিক ও প্রশাসনিক সংস্কার বা পরিবর্তন। এর পরে তো বিধাতা প্রলয় অবধি বিশ্রাম-সুখই লাভ করেছেন।

৪

বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ধর্মবোধের উদ্ভব ও স্থিতি। তাই ধর্মভাব অশিক্ষিত মানুষের ভূষণ, এবং ধর্মাদর্শ তাদের জীবনের দিশারী। ধর্মীয় নীতি ও রীতি তাদের জীবনযাত্রার পথ ও পাথেয়। লেখাপড়া-জানা ধর্মভীরু মানুষেরও মনোভূমি অনাবাদে অপচিত। আর একশ্রেণীর শিক্ষিত অথচ চরিত্রহীন বুদ্ধিমান দুরাত্মা সব জেনেবুঝেও স্বস্বার্থে এই বিশ্বাস-সংস্কার ও স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে, পুঁজি করে মানুষকে শাসন-শোষণের আনন্দ, আরাম, গৌরব ও সম্মান লাভ করে। ধর্ম কিন্তু সব মানুষের সমান উপকার করে না। ধর্মের বিধি-নিষেধ প্রয়োগে বড়লোকের-ছোটলোকের ও নারী-পুরুষের পার্থক্য স্বীকৃত। রাজা যুদ্ধ করেন, পররাজ্য কেড়ে নেন, মানুষ হত্যা করেন —এতে পাপ নেই। সাধারণ লোক না বলে পরের তৃণখণ্ড নিলেও চৌর্যের কিংবা পীড়নের পাপ স্পর্শ করে। তাছাড়া ধর্ম বাঁধাপথে চলার যান্ত্রিক সুবিধা দান করে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশের কিংবা মানবিক বোধ-বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগের অধিকার হরণ করে। ধার্মিক মানুষ পোষমানা প্রাণী। কেননা তার মন-বুদ্ধি-বিবেকের স্বাধীন প্রয়োগ-পথ থাকে রুদ্ধ। এই মানুষ গোঁড়া, অসহিষ্ণু ও অনুদার না হয়ে পারে না।

অথচ ভাব-চিন্তা-কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাপ্রসূত নতুন কিছু করতে গিয়ে ভুল করার অধিকারই মানুষের স্বাধীনতার ভিত্তি। কারণ ভ্রান্তি থেকেই সত্যকে ও শ্রেয়সকে চেনা যায়। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে মানুষের এই মৌল অধিকারই অহরহ হরণ করছে। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সমাজবদ্ধ মানুষকে শেখায় ফানাতত্ত্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবন হবে সমাজ-স্বার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুগত— যৌথ জীবনের প্রত্যঙ্গ। কারণ তার স্বাতন্ত্র্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। অথচ ব্যক্তি-জীবনের স্বাতন্ত্র্য, নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন বিকাশ লক্ষ্যেই শুরু হয়েছিল যৌথ আবাস, আচার ও কর্ম। অবশেষে মুক্তির অবলম্বন হয়ে উঠেছে বন্ধনের শৃঙ্খল। কিন্তু ভৌগোলিক সংহতি ও গণশিক্ষা—ব্যক্তি-জীবনে না হোক, সামগ্রিক জীবনে আজ নতুন চেতনা দান করেছে। তাই দুনিয়ার সর্বত্র দেখা দিয়েছে দ্রোহ।

৫

জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যেই মানুষ হল যূথবদ্ধ। আর যৌথ জীবনের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠল সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র। এই তিন মনিবের ঘর করে মানুষ, সেবা করে তিন মালিকের, শাসন মানে তিন প্রভুর। মানুষ যেন সেন্ডুইচড, গলে বের হবে, সে সাধ্যও নেই। কিন্তু যাদের কথা বলছি, তারা তা অনুভব করে না, তারা মনে করে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আসমান ও জমিনের মালিকের হেফাজতে পাখির মতো তারা সোনার টঙ্গীর আশ্রয়ে রয়েছে, লীলাময়ের ইচ্ছে ব্যতীত সেখানে সাপ-বেড়ালের উপদ্রব ঘটে না। অথচ জীবন বিকাশের অবলম্বন হিসেবেই সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের উদ্ভব। জীবনবোধ ও প্রয়োজন বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মবুদ্ধির ও ধর্মনীতির প্রসার ও পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি বলে পুরোনো ধর্ম লোপ পেয়ে নতুন ধর্মের ঠাঁই করে দিয়েছে। মানুষ অবশ্য কোনোদিন সচেতন ভাবে তা চায়নি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই তা ঘটেছে। প্রয়োজনের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। সেই প্রয়োজন প্রাকৃত শক্তির মতো অমোঘ, নদীর স্রোতের মতো তীরপ্লাবী ও কূলগ্রাসী। যে-মানুষের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠা পায়, তিনিও জানেন না তিনি কী কারণে কোন্ অমোঘ শক্তির প্রভাবে কী করছেন।

আজো সে নিয়মেই সব ভাঙছে, হচ্ছে, গড়ছে। কিন্তু সমকালীন মানুষ তা বুঝতে পারে না। চলন্ত ট্রেনে বসে সে ভাবছে, পাশের রাস্তাই চলছে তার ট্রেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মন স্থিতিকামী, তাই তার এ বিভ্রান্তি। তারে জীবনে কাজে লাগছে না, তবু সে ধর্ম ও সমাজ-ভূতের ভয়-ভরসা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ধর্ম ও সমাজকে সে ভালোবাসে না, ভয় করে। সে-জুজুর ভয় তার দিবারাত্রির বিভীষিকা। ক্রীতদাসের অসহায়তায় ও আত্মসমর্পণেই তার স্বস্তি। সে কেবলই আত্মরক্ষায় উদ্বিগ্ন, তাই বাঁচার স্বাদ সে পায় না। মৃত্যুভীরু জীবনের মমতায় সদা ব্যাকুল, তাই জীবনের প্রসাদ থেকে সে হয় বঞ্চিত।

৬

যাঁরা নতুন জীবন কামনা করে, আত্মপ্রত্যয় যাদের প্রবল, তারা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রকে জীবনের অনুগত করে। ওগুলোর পুরোনো নিয়ম-নীতির কাছে আত্মবলি দেয় না। অতীত কারো জীবনের আদর্শ হতে পারে না। কেননা অতীত কখনো ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে না। ঐতিহ্যও প্রেরণার উৎস নয়। তাহলে গ্রীক-রোমান-আরবের পতন হল কেন? এটিলা-চেঙ্গিস-বুদ্ধ-হোমারের কী ঐতিহ্য ছিল? ঐতিহ্য বলে যদি কোনো কিছু মানতেই হয় তাহলে 'এক মানুষের পক্ষে যা সম্ভব অন্য মানুষের পক্ষেও তা সাধ্যাতীত নয়' —এই মানবিক ঐতিহ্যে আস্থাই যথেষ্ট। অতীত যদি কোনো কাজে লাগে তবে তা ধর্ম বা সমাজের নীতি-আদর্শ নয়— ইতিহাসের জ্ঞান ও শিক্ষা।

অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটেই পষ্ট নয়। একটা শোনা-কথা আপ্তবাক্য রূপেই আমরা আওড়িয়ে চলছি মাত্র। যা পিছনে ফেলে আসি, যা চুকে-বুকে যায়— হারিয়ে যায়, তাই অতীত। সে-স্মৃতি আমাকে কেবল ধরে রাখতে পারে, এগিয়ে দিতে পারে না। মানুষ তার চোখ দিয়ে সুমুখেই কেবল দেখতে পায়, সচেতন প্রয়াসে পাশেও। কিন্তু পিছনে তাকাতে হলে পিছনকে সুমুখ করতে হয়। অতীতকে স্মরণে রাখতে গেলে ভবিষ্যৎকে ভুলতে হয়। চোখের স্থিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পায়ের পাতার বিস্তৃতি দেখে তো মনে হয় স্রষ্টা মানুষকে সুমুখে দেখবার ও এগুবার ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

আমার প্রপিতামহের জমিদারি ছিল, আমার পিতার প্রপিতামহ কবিতা লিখেছিলেন, আমার পিতামহ দীঘি দিয়েছিলেন, আমার পিতা বিদ্বান ছিলেন, আমি সামান্য লেখাপড়া শিখে সম্প্রতি ঢাকায় এক দোকানে কর্মচারী। নিবাস তাঁতিবাজারের এক মেস। ঐতিহ্য আমাকে কী দিল?

হোমার-শেক্‌স্পীয়র-টলস্টয়-কালিদাস-সাদী লিখিয়ে হলেন, তাঁদের কারো পিতৃপুরুষের কেউ লেখক ছিলেন না। আবার রবীন্দ্র-নজরুলের সন্তান কবি হতে পারলেন না। আদম-সন্তান কাবিল হল লম্পট, নূহর সন্তান হল পিতৃদ্রোহী। ঐতিহ্যের প্রভাব কোথায় পড়ল? সভ্যতায় ও শাসনে কালো আফ্রিকার কী ঐতিহ্য আছে? তাই বলে কি তাঁরা আরণ্য থাকছে? আমার চৌদ্দপুরুষের কেউ লেখাপড়া করেননি, বাবা ছিলেন ক্ষেতমজুর; আমি বিদ্বান, বড় চাকুরে, অবশেষে মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হলাম। এ তো হবার কথা নয়।

ভুঁইফোড় লোক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, আর রাজার ছেলে রাজ্য রক্ষা করতে জানেন না। এই বা হবার কারণ কী! ব্যক্তিক কিংবা জাতিক জীবনে ঐতিহ্যই যদি প্রেরণার আকর ও আত্মোন্নয়নের ভিত্তি হত তাহলে সমাজে কিংবা দেশে কোনো মানুষের বা জাতের জীবনে উত্থান-পতন থাকত না। বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দুসমাজের মতো জন্মসূত্রেই জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রিত হত। কেননা যার ঐতিহ্য নেই, সে তা কখনো অর্জন ও সৃজন করতে পারত না। ঐতিহ্য বলতে আমরা ভালো কৃতিই বুঝি— মন্দকৃতি ঐতিহ্য নয়। মানুষ কি এতই সুবোধ ও সুশীল যে সে কেবল পূর্বপুরুষের ভালোটাই গ্রহণ করবে আর মন্দটা পরিহার করবে? ভালোটা শরণ করতে গেলে মন্দটা মনের কোণে উঁকি দেবে— আর ভালোটাকে কেউ শরণ করলে মন্দটাও তাকে অনুসরণ করবে। কে না জানে মানুষের মন্দের আকর্ষণই বেশি? কারণ শয়তান অলস নয়।

বস্তুত পূর্বপুরুষের বস্তুগত সম্পদের উত্তরাধিকারই মানুষ পেয়ে থাকে-যা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও কেজো। মানস-উত্তরাধিকার বলে কিছু যদি থাকেও তা সামান্য ও প্রয়োগসাপেক্ষ। এবং প্রয়োগের জন্যে চাই প্রয়োজনবোধ। এই প্রয়োজনবুদ্ধি জাগে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মশক্তি সচেতন ও কাঙ্ক্ষী মানুষের। আর এ তিনটে গুণই স্বকীয়তার স্বাক্ষর বহন করে। এ মানুষের ঐতিহ্য থাকা না-থাকায় কিছু যায় আসে না। সে হয় স্বসৃষ্ট —এটি ব্যক্তিক ও জাতিক জীবনে উভয়ত সত্য। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মোন্নয়নের পন্থা এই একটিই। আমার পিতার প্রাথমিক শিক্ষাটাই গৌরবের ও গর্বের হল, আর আমার এম.এ ডিগ্রীটা তুচ্ছ? বাবার কুটিরটারই গর্ব করব, আমার দালানটা কিছুই নয়? সচল ব্যবহারিক জীবনে স্থান-কাল ভেদে আচারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রীতিনীতি— যতই মন্থর হোক—পরিবর্তিত হয়, কেবল ধার্মিক জীবনের নীতিই থাকবে ধ্রুব —এ কেমন কথা। এ ক্ষেত্রে কি জীবনের গতিশীলতার কোনো চাহিদা নেই! কার্যত ধর্মনীতিও লঙ্ঘিত হয়, কেবল স্বীকার করতেই আপত্তি। নইলে একই ধর্মে এত বিভিন্ন মত-পথবাদী সম্প্রদায় গড়ে উঠল কী করে!

তাছাড়া, অর্জন-বিমুখ মানুষ পূর্বপুরুষের ধনে ধনী থাকতে পারে না। সে দরিদ্র হতে থাকে ব্যক্তিক ও জাতিক জীবনে —এ স্বতোসিদ্ধ তথ্য। এবং রিখথ হিসেবে প্রাপ্ত কোনো বাস্তব সম্পদও সমকালীন জীবনের ব্যবহারিক-বৈষয়িক চাহিদা মিটাতে পারে না। কেননা তার কেবল ক্ষয়ই আছে, বৃদ্ধি নেই। স্বোপার্জিত সম্পদ বাড়তির লাবণ্যে প্রাণপ্রদ। পিতৃসম্পদ জীর্ণতার জনক। জোয়ারভাটার মতো আয়-ব্যয়ে বহমানতা থাকা চাই। প্রয়াসবিহীন প্রাপ্তিতে গৌরব নেই। প্রয়াসের মধ্যেই প্রাণের পরিচয় ও বিকাশ। আসলে ঐতিহ্য মানুষকে ধরে রাখে, এগিয়ে দেয় না। স্থিতির জীর্ণতা ও জড়তা তাকে পেয়ে বসে, গতির প্রাণ ও প্রেরণা থাকে অনায়ত্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পুরোনো পৃথিবী প্রতি-মানুষের চোখে নতুন করে দেখা দেয় বলেই পৃথিবী সুন্দর। প্রতিটি জীবন নতুন করে আবিষ্কার করে আপনার ভুবন। নতুন জীবনের চাহিদা মিটাতে দেশগত ও কালগত জীবনের অনুগত করে বদলাতে হয় ধর্মনীতি, সমাজরীতি ও রাষ্ট্রবিধি। প্রাণের সচলতার প্রতীক হচ্ছে সৃজনশীলতা, নতুনের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দিকে এগুবার আগ্রহ। জরা ও জড়তার ধর্ম হচ্ছে অতীতকে ও স্থিতিকে আঁকড়ে ধরে রাখা। কেননা জরা ও জড়তার ভবিষ্যৎ নেই, কেবল অতীতের স্মৃতিই থাকে। ভবিষ্যতে তার মৃত্যু-ত্রাস, অতীতে তার মধুর স্মৃতি।

পূর্বপুরুষের দানে নয়, মানুষকে বাঁচতে হয় স্বকালে স্বদেশে স্বকীয় সৃষ্টিতে। অন্যের কৃতির ফল ভোগ করার গ্লানির মধ্যে নয়, নিজের কৃতি ও কীর্তির উল্লাসের মধ্যে বাঁচাই যথার্থ বাঁচা। মানুষের এ-ই কাম্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য

স্বাতন্ত্র্য আজকাল একটি মুখরোচক ও শ্রোত্ররসায়ন চালু কথা। মানুষ ভাবে কম এবং পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় অভ্যস্ত, আর কানকথা শুনতে উৎসুক, —এমনকি কানকথায় কান ভার করতেও তার দ্বিধা নেই। তাই চলতি বুলির জনপ্রিয়তা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। চলতি কথার প্রভাবও গভীর এবং ব্যাপক। এর প্রভাব ভালো-মন্দ, আবেগ-উদ্বেগ, আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা, সাহস-ভীরুতা, উৎসাহ-নৈরাশ্য, উত্তেজনা-ঔদাসীন্য প্রভৃতি যে-কোনো ভাব মানবমনে জিইয়ে রাখতে সমর্থ। ফলে এর থেকে লাভের লোভ ও ক্ষতির ঝুঁকিও এড়ানো যায় না।

স্বাতন্ত্র্য কথাটিও এখন একটি জনপ্রিয় চলতি বুলি! রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রায় শতেক স্বাতন্ত্র্যের বেড়ায় আমরা নিজেদের বদ্ধ করছি। দেখে-শুনে মনে হয় জগতে স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের মতো গৌরব নেই। স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলন কর, তাহলেই ঘুচবে সব দুঃখ, মিটবে সব অভাব। ইরি ধানের মতো স্বাতন্ত্র্যের চাষে যে ফলন তার যেন তুলনা নেই।

ঘরে যারা এভাবে বিভেদের বীজ বুনে চলেছে, তারাই আবার UNO-এর প্রেক্ষা- মঞ্চে বিশ্বমানবের— বিশ্বরাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্যের বাণী কপচায়। নির্বর্ণ ও নির্বিশেষ মনুষ্যসমাজের প্রচারক যাঁরা, তাঁরা বৈষম্যের ব্যবধান জিইয়ে রাখার উপায় উদ্ভাবনেও উৎসাহী। সত্যিই মানুষ বড় বিচিত্র ও অদ্ভুত প্রাণী। মুখে তার প্রীতি ও মৈত্রীর বাণী, হাতে তার মারণাস্ত্র। সে এক হাতে কাড়ে, আর এক হাতে বাহবা লোটে।

আবাল্য ম্যাকিয়াভেলীকে একজন সুন্দর শয়তান বলে জেনেছি। কিন্তু আজকাল যেন তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠছি। মাঝে মাঝে মনে হয় মানব-প্রকৃতির এতবড় ব্যাখ্যাতা বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর উচ্চারিত তত্ত্ব যে চিরন্তন ও চর্চার বিষয় হয়ে থাকবে তা হয়তো তিনিও জানতেন না। তিনি বলেছেন— A Prince must know how to play at once man and beast, lion and fox. He neither should nor can keep his word, when to do so, will turn against him...I venture to maintain that it is very disadvantageous always to be honest, useful, on the other hand to appear pious and faithful, humane and devout. Nothing is more useful than the appearance of virtue.

আজকের দিনের রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্রনায়কেরা এই নীতি অবিচল নিষ্ঠায় মেনে চলেছেন। প্রজার আনুগত্য লাভের সহায়ক হিসেবে ধর্মের বুলি কপচানো এবং প্রবল পক্ষের ধর্মমতকে সমর্থন করাও সরকারের পক্ষে আবশ্যিক বলে জানতেন ম্যাকিয়াভেলী। বিশ্বের অনুন্নত দেশের কোনো কোনো সরকার তাও আক্ষরিকভাবে মানে এবং নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণের সুযোগ পায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্ণের, গোত্রের ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বুলি। দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষ করে আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় আজ এটিও শাসন-শোষণের একটি ফলপ্রসূ কৌশল ও মোক্ষম উপায়রূপে বিবেচিত, প্রযুক্ত ও প্রমাণিত। ফলে দুনিয়ার সর্বত্র সরকারের পরোক্ষ প্ররোচনায় আজ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। রোমকদের সেই Divide and Rule নীতি আজো উপযোগ হারায়নি, বরং তার গুরুত্ব বেড়েছে।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা এবং স্বাতন্ত্র্য-সাধনা প্রবল হয়ে উঠেছে। সুন্দরের ও আনন্দের আয়োজনে ও উপভোগে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা— নিরপেক্ষ কানে অদ্ভুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনায় বটে, কিন্তু আজ এও সত্য ও স্বাভাবিক হতে চলেছে। এতকাল আমরা জানতাম শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসিকের রুচি ও বোধের মাত্রাভেদ আছে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য যে আছে, তা ইদানীং জানছি।

কিন্তু এ 'স্বাতন্ত্র্য' কোন্ তাৎপর্যে প্রযুক্ত তা আমরা জানিনে। যে-কোনো কলা-স্রষ্টার ব্যক্তিগত বোধ-বুদ্ধি, রুচি-সংস্কৃতি, মন-মনন ও চেতনার কথা জীবন-দৃষ্টির প্রসূন। সে কারণে প্রত্যেক শিল্পীর সৃষ্টি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অনন্য ও মৌলিক। এ অর্থে সাহিত্যে জাতিগত কিংবা দেশগত স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না, পারে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য।

আবার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনগত ঐক্য থাকলে, রূপগত অর্থাৎ আঙ্গিকগত অনৈক্য স্বাতন্ত্র্য দান করে না। যেমন জুতা কিংবা পাজামা প্রত্যেকেই তার পায়ের ও গায়ের মাপে তৈরি করায়, তাতে কিন্তু জুতো বা পাজামা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে না। সাহিত্য-সংগীত-চিত্র-নৃত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতির আবেদন সর্বজনীন। কেননা এগুলো মনের এক নিরূপ চাহিদা পূরণ করে, চেতনার এক মানবিক পিপাসা মিটায়। এগুলো কলা-চেতনার সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় অভিব্যক্তি। এজন্যে প্রাত্যহিক জীবনের স্থূল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এগুলোর স্থিতি। চিত্তে বিশেষ এক চেতনা বা চিত্তবৃত্তি না জাগলে অথবা না থাকলে এগুলোর কোনো আবেদন অনুভব কিংবা এগুলোর অভাববোধ করা সম্ভব হয় না। কাজেই অনুভবের এই বিশেষক্ষেত্রে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম না-থাকারই কথা।

যেহেতু এসব কলার আধার-নিরপেক্ষ অবয়ব নেই, সেজন্যে এগুলোর আধার ভেদ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আধার ভেদে আধেয় রূপ বদলায়, গুণ বদলায় না। কাজেই দেশ-কাল ও নামভেদ থাকলেও সাহিত্যে আর কোনোরূপ স্বাতন্ত্র্য সম্ভব নয়। এবার দৃষ্টান্ত নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমত, ধরা যাক জাতীয় সঙ্গীত ও স্বদেশ-স্বজাতি-প্রীতিমূলক গান ও কবিতা। এগুলো সবদেশের সবজাতের লোকই রচনা করে। তাতে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও বক্তব্য থাকে অভিন্ন। কেবল দেশের নামভেদ থাকে মাত্র। ওটি বদল করে দিলে সর্বজনীন ও সর্বকালিক অনুভূতির বাহন হয় সেই গান বা কবিতা। নাটক-উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্রেও আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন যেহেতু অভিন্ন, পরিবেশ ও পাত্র-পাত্রীর নাম পালটে দিলে তা যে-কোনো দেশের মানুষের জীবনে চেতনার চিত্র হয়ে উঠতে পারে। তেমনি নৈতিক-সামাজিক জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধীয় রচনায়ও ব্যক্তিভেদে মতাদর্শের পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু দেশভেদে প্রয়োজন ও ফল ভেদ হতে পারে না।

প্রেম কিংবা পীড়ন, লোভ কিংবা অসূয়া, ক্রোধ কিংবা সহিষ্ণুতা, ক্ষমা কিংবা প্রতিহিংসা, আনুগত্য কিংবা কৃতঘ্নতা প্রভৃতি জৈব বৃত্তি-প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশভেদে আলাদা হয় না, ব্যক্তিভেদে মাত্রার তারতম্য ঘটে কেবল।

অতএব যথার্থ সাহিত্য-রস দেশ-কালের ঊর্ধ্বে সর্বমানবিক। কেবল প্রচার সাহিত্যেরই দেশ-কাল ও জাত-ধর্ম আছে। বলাবাহুল্য সংস্কৃতিবান কোনো মানুষ তা রচনাও করে না, পড়েও না এবং সাহিত্য বলে স্বীকারও করে না। সৎ-সাহিত্য মানুষকে ভাবায়, পরিস্রুত করে চিত্তবৃত্তি এবং অনুভবের জগৎ করে প্রসারিত। এক-একটি মহৎ সৃষ্টি পাঠকের চেতনায় নতুন ভুবন রচনা করে। এক-একটি মহৎ কথার অনুভবে পাঠক তিলে তিলে নতুন হয়ে ওঠে। তেমন কথায় ঘটে জীবনবোধের উন্নয়ন ও আত্মার স্বাধীন জগতে উত্তরণ। তেমন গ্রন্থ বিদেশীর-বিজাতির কিংবা বিধর্মীর রচনা বলে পরিহার করলে জীবনের আশীর্বাদ ও প্রসাদ থেকেই কেবল নিজেকে বঞ্চিত রাখা হয়, রোধ করা হয় নিজের অগ্রগতি। মানুষের চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রসূন ভাব-চিন্তা-জ্ঞান-অনুভূতি বর্জনের দুর্বুদ্ধি যার মনে বাসা বাঁধে, সেও কি শিক্ষিত!

সাহিত্য-শিল্পাদি কলার ক্ষেত্রে অন্তত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এখানে স্বাতন্ত্র্য নয়, সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানই কাম্য। তা ছাড়া এগুলো যখন বৈষয়িক নয়, মানসিক এবং সাধারণের নয়, কেবল বিশেষেরই চর্চার বিষয় তখন সহিষ্ণুতাই শোভন। এক্ষেত্রে সাড়ে পাঁচশ বছর আগেকার এক মনীষীর বাণী আমাদের হয়তো দিশা দিতে পারে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Love the truth. Let others have their truth and the truth shall prevail. (Jan Huss of Bohemia)

এ সূত্রে গ্যটের বাণী স্মরণ করেও আমরা হয়তো চক্ষুষ্মান হতে পারি :

National literature is now rather and unmeaning term; the epoch of world literature is at hand and each one must try to hasten its approach.

তা ছাড়া বৈষয়িক জীবনেই যখন স্বস্বার্থে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় ও গাঢ় করবার প্রয়াসী, তখন মানসিক-জীবনেই বা স্বাতন্ত্র্য কামনা করে দীনতাকে দীর্ঘস্থায়ী করব কেন!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব

মানুষ তার পরিবেষ্টনীর আনন্দ ও যন্ত্রণা, সম্পদ ও সমস্যার মধ্যেই বাঁচে। এজন্যেই দেশ-কাল নিরপেক্ষ জীবনানুভূতি নেই। তাই বলে প্রতিবেশ আহৃত সব অনুভূতি সবহৃদয়ে সমান গুরুত্ব পায় না। বিদ্যা-বুদ্ধি-বোধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, রুচি-সংস্কৃতি ও মানস-প্রবণতার আনুপাতিক প্রভাবও অনুভবকে লঘু-গুরু করে। ফলে একের কাছে যা অসহ্য গুরুতর বা চাঞ্চল্যকর, অপরের কাছে তা নিতান্ত তুচ্ছ।

এ না হয়ে পারে না। কেননা জীবন ঋজু নয়, ঘটনা-বিরলও নয়। নিতান্ত ঘটনা-বিরল প্রাত্যহিকতার মধ্যেও কি ঘটনা কম! স্ত্রীর মেজাজ, ছেলের অবাধ্যতা, চাকরের ফাঁকি, প্রতিবেশী গৃহে ঝগড়া, রোয়াকে ইয়ারদের মধ্যে বিতর্কের ঝড়, বাজারে বেপারীর সঙ্গে চটাচটি, সংবাদপত্রের নানা খবর, চড়া বাজারদর, ভাগ্নের অসুখ—এমনি শতেক দিকে মন ও নজর আকৃষ্ট হচ্ছে। জীবনে এসব ঘটনার কোনোটাই ফেল্‌না নয়।

শত্রুকল্প প্রতিবেশীর ঘরের ঝগড়া কেমন শ্রোত্ররসায়ন ও মুখরোচক। আবার বাজারে পণ্যের অগ্নিমূল্য কীরকম ক্ষোভ জাগায়! বিরোধীদল জাতীয় পরিষদে সরকার পক্ষকে জব্দ করছে—এ সংবাদও তৃপ্তিকর। এমনি কত বিপরীত রসের অনুভবে চিত্তলোক তোলপাড় করছে। কিন্তু সবটা সমান আকর্ষণীয় নয় কোনো একজনের কাছে। ঘর-সংসারের দায়-দায়িত্ব যার নেই তেমন রাজনীতি-প্রিয় লোক যে-সংবাদে আনন্দিত কিংবা বিচলিত, ছা-পোষা স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে তা পড়ার মতোও নয়। ক্রীড়াপ্রিয় কিংবা সিনেমাপ্রিয় কিশোর-তরুণ যে-কারণে সংবাদপত্র উলটাতে উৎসুক, সে-কারণ আমাতে একবারেই অনুপস্থিত।

AmarBoi.com

অতএব আমার মনের উপর আজকের যে-ঘটনা প্রভাব ফেলেছে, আমার অনুভব ও চিন্তা উদ্রিক্ত করেছে অথবা আমার মেজাজে প্রসন্নতা কিংবা বিকৃতি এনেছে, সে ঘটনাই আমার আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আলাপে কিংবা আমার লিখিত চিঠিপত্রে আভাসিত হবে। অন্য সব ঘটনা ও অনুভূতি চিরকালের জন্যে বিস্মৃতির আকাশে হাওয়া হয়ে যাবে। তা ছাড়া যার উদ্দেশে বলা, তার রুচি, প্রবণতা ও আগ্রহ নেই তেমন ঘটনা কিংবা অনুভূতি তার কাছে প্রকাশ করা অনুচিত—এমন চেতনাও ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই প্রসঙ্গ এবং পাত্র চেতনাও আমাদের অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

তাই গানে-গাথায়-কাব্যে-গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে-ভ্রমণবৃত্তান্তে-বক্তৃতায় কোথাও আমরা সমকালীন-জীবনের-সমাজের-দেশের সামগ্রিক পরিচয় পাইনে। কোথাও বাজার দর মেলে, কোথাও হাট-বাটের বর্ণনা পাই, কোথাও বা ফলমূলের ফিরিস্তি থাকে, কোথাও থাকে ঘর-বাড়ি-আসবাব-তৈজসের বর্ণনা, আবার কেউ বলেন আচার-আচরণ-পাল-পার্বণের কথা, কেউ বয়ান করেন অঙ্গের আবরণ-আভরণের বৈচিত্র্য, কারো কাছে মানুষের ধনদৌলত ও রাজনীতিই বর্ণিতব্য বিষয়— কিন্তু কোনো একজনের কাছে সবকিছুর খবর মিলে না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সমভাবে সত্য। তাছাড়া সব মানুষের জীবন-দৃষ্টি ও জীবন-সমস্যা একরূপ নয়। দেশ কাল ব্যক্তি ভেদে তা ভিন্ন ও বিচিত্র। স্বাধীন দেশে মুক্তিসংগ্রামের গান রচিত হয় না, কিংবা আজকের চীন-রাশিয়ায় গণসংগ্রামের বাণী, নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ কাব্যে ধ্বনিত হওয়ার কারণ অপগত।

ফোর্ড-রকফেলার ডালমিয়া-বিরলা, দাউদ-ভাওয়ানী-ইস্পাহানী-আগা খাঁর মনে জীবন সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা জাগে তা অন্ন-বস্ত্রের নয়, তাঁদের চেতনায় প্রেম-প্রকৃতি-পরকাল বিমূর্ত সত্য ও অম্লান আনন্দের তত্ত্ব ও তথ্যেই মুগ্ধ। এমন মানুষের রচনায় বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-শোষিত মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্না ধ্বনিত হওয়ার কথা নয়। এবং ধ্বনিত হয় না বলে ক্ষুব্ধ হওয়াও কারো পক্ষে অনুচিত। কেননা নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত দৃষ্টি ও মন মানুষে সুলভ নয়। যে যেই গাঁ, দেশ, জাত, ধর্ম, পরিবার এবং আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার অন্তর্গত, সে-সবের প্রতি মমতা ও আনুগত্য তার স্বভাবগত। এ কারণে শ্রেয়ো-বোধ কখনো সর্বজনীন হয় না। জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, আদর্শ-উদ্দেশ্য তাই সবার অভিন্ন নয়। যে-মুহূর্তে যার মনে যে-যন্ত্রণা বা আনন্দ, যে-সমস্যা বা সম্পদ গুরুত্ব পায় তা-ই তার কথায় কাজে কিংবা লেখায় অভিব্যক্তি লাভ করে।

মানুষের বৈষয়িক জীবনে যেমন শ্রেণী আছে, শ্রেণীস্বার্থ আছে, দেশ-জাত-ধর্ম আছে, অন্তর্জগতেও তেমনি রয়েছে শ্রেণীগত মনন। কোনো আনন্দ বা যন্ত্রণা, কোনো সমস্যা বা বিপর্যয়, কোনো সৌভাগ্য বা গৌরব, দেশের সব মানুষকে স্পর্শ করে না, অন্তত সমভাবে করে না। এসব ক্ষেত্রে কেউ হারে, কেউ জেতে, কারো হয় সর্বনাশ, কারো আসে পৌষমাস। কাজেই দেশ-কাল অভিন্ন বলেই ভাব-চিন্তা-কর্ম অভিন্ন হয় না। এমনকি স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবমুক্ত মনও অন্যের হয়ে ভাবতে পারে না। সহানুভূতিও তাই কখনো সমানুভূতির পর্যায়ে ওঠে না। তেমন অবস্থায় মানবিক বোধ ও আদর্শ-চেতনাই যোগায় অনুপ্রেরণা।

অতএব সাহিত্যে-সঙ্গীতে, চিত্রে-ভাস্কর্যে দুইরূপ-দুইতত্ত্ব থাকবেই। যারা বেদনামুক্ত যারা আনন্দিত, যাদের জীবন সমস্যা-সঙ্কুল নয় তারা নান্দনিক কলাচর্চায় পাবে আত্মার খোরাক। আর যারা বঞ্চিত, শোষিত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত তাদের কলায় থাকবে জমাট আর্তনাদ কিংবা মুক্তি-অন্বেষা। এভাবে সাহিত্যাদি কলায় সুন্দরের অনুধ্যান ও আনন্দের অভিব্যক্তি যেমন থাকবে; হাভাতের হাহাকার, আর্তের চিৎকার, বঞ্চিতের অভিশাপ, নির্যাতিতের ক্ষোভ, শোষিতের সংগ্রামী কণ্ঠও তেমনি ধ্বনিময় হয়ে উঠবে।

কাজেই বুর্জোয়ার আনন্দের সাহিত্যের পাশাপাশি পরাধীন নির্যাতিত শোষিত মানুষের বেদনা, বিক্ষোভ ও সংগ্রামের সাহিত্যও থাকবে।

অবশ্য এমন দিনের স্বপ্নও আমরা দেখতে থাকব যখন সংগ্রামী গণসাহিত্যের প্রয়োজন ফুরাবে। তখন সাহিত্যাদি কলা আবার পুরোনো নান্দনিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আবার প্রেম-পাখী-প্রকৃতি সত্য ও সত্তার রহস্য, সুন্দর ও আনন্দের অনুধ্যান আমাদের আঁকার ও লেখার, গানের ও বাজনার, নাচের ও নির্মাণের অবলম্বন হবে। কেননা যন্ত্রণাবিহীন জীবনই তো সবার কাম্য। আনন্দলোক সৃষ্টি করাই তো সবার লক্ষ্য। সে পথে যে-বাধা রয়েছে সে-বাধা অপসারণের চেষ্টার নামই গণ-সংগ্রাম। সে লক্ষ্যে উত্তরণের জন্যেই সংগ্রাম। সেদিন আর শোষিত-নির্যাতিত শ্রেণীর জন্যেই নয়—মানুষ নির্বিশেষের জন্যে প্রীতির অনুশীলনই হবে লিখিয়েদের লক্ষ্য। বঞ্চিত-শোষিত-নির্যাতিত মানবতার সেবার ব্রত তাদের মুক্তির জন্যে সংগ্রামী প্রেরণা যোগানোর সাধনা, তাদের বেদনা-বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দানের দায়িত্ব—মানবতাবাদীদের গ্রহণ করতেই হবে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই আসবে এ সংগ্রামের সৈনাপৈত্য, এ ক্ষোভ-মিছিলে নেতৃত্ব, এ প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা। কাজেই আজকের আফ্রো-এশিয়ায় দরদী ও দায়িত্বশীল লিখিয়েরা সংগ্রামী সাহিত্যই সৃষ্টি করবেন, যেমন প্রতীচ্যের সুখী মানুষেরা করেছেন ভঙ্গিসরস, মনন-প্রধান, লীলা-সখ্য সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—লোক-শিক্ষা, লোকোপকার কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ পাপ। হৃদয়বান মানববাদীরাও বলেন— যেখানে মানুষ আজো অনিকেত, আজো অভুক্ত, আজো দাসত্বে পশুপ্রায়, আজো অশিক্ষায় পঙ্গু, আজো অজ্ঞানে অন্ধ, আজো অবিদ্যায় অবোধ, আজো পীড়নে পৃষ্ঠ, আজো শোষণে অস্থিসার, আজো অকালমৃত্যুর শিকার, আজো রুদ্ধকণ্ঠ, আজো বদ্ধহস্ত; সেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি পাপ— অমানুষিক অনাচার— দানবিক নির্মমতা।

কিন্তু এ নিন্দা ও বিক্ষোভ অবিবেচনাপ্রসূত। কেননা জীবনে যাঁরা অবাধসুখ ও অপরিমেয় সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা হবে আনন্দের জন্যেই অর্থাৎ আনন্দলোক নির্মাণ লক্ষ্যে তাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করবেন। বাধা পেলে বরং লেখনী ত্যাগ করবেন, কিন্তু অন্তরে প্রেরণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই বলেই গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে কখনো পারবেন না। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। এ শ্রেণীর কোনো কোনো মানববাদী গণ-সংগ্রামের সৈনিকরূপে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন পীড়ন পেলে প্রতিকার-প্রয়াস জাগে তেমনি সামাজিক ঔপনিবেশিক, আর্থিক ও কায়িক পীড়ন মুক্তির জন্যে সংগ্রাম না করে অন্য পক্ষের উপায় নেই। তাছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লিখিয়ে-আঁকিয়েরাও তো ঘা-খাওয়া মানুষ, তারাও তো আর্থিক-সামাজিক-মানসিক অনেক ন্যায্য অধিকার থেকেই বঞ্চিত। কাজেই তাঁদের নিজেদের জন্যেও মুক্তিসংগ্রাম প্রয়োজন। মনোবল থেকেই আসে বাহুবল, কাজেই লেখনী মাধ্যমে গণমনে মনোবল জাগানো, চোখ খুলে দেয়া, চেতনা সঞ্চার করা তাঁদেরও গরজ। কারণ এক্ষেত্রে সাফল্যের একমাত্র উপায় হচ্ছে জনমত গঠন তথা গণশক্তি প্রয়োগ। এ হচ্ছে সামাজিক তথা যৌথ কর্ম। একক মানুষের দায়িত্ব কেবল সঙ্ঘশক্তির অনুগত্যে সাড়া দেওয়া। অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকও বুর্জোয়া প্রলোভনে লক্ষচ্যুত হয়ে স্বস্বার্থে সুখ-সুবিধা লাভের লোভে দায়িত্ব এড়িয়ে কর্তব্য-ভ্রষ্ট হয়ে অথবা নিছক মানস-প্রবণতা বশে জুটে যান নিরাপদ নান্দনিক কলার চর্চায়। এঁদের কেউ কেউ সরকারি শিরোপারও উমেদার। এঁরা স্বশ্রেণীদ্রোহী চরিত্রহীন। এবং প্রয়োজন ও প্রতিবেশ চেতনাহীন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোনো কোনো লিখিয়ে কৃপার ও ক্ষমার পাত্র। কেননা তারা জানেন না তারা কী লিখছেন আর কেন লিখছেন। এভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের লিখিয়েদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। একদল যথার্থ সংবেদনশীল, দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠ সংগ্রামব্রতী; এঁরাই জনগণের আশা-আশ্বাসের অবলম্বন। এঁরা সরকার-শত্রু। আর একদল আছেন সরকার-ঘেঁষা—এরা সুবিধাবাদী-স্বার্থবাজ। এরা গণ-শত্রু। তাই ঘৃণ্য । শেষ দল সরকার-ভীরু। এরা গা বাঁচিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশী। এরা কৃপার পাত্র।

কাজেই যতদিন পর্যন্ত কলাকৈবল্যরস উপভোগ করার অবস্থা ও সামর্থ্য সর্বমানবে সম্ভব না হচ্ছে ততদিন এই কেজো—এই বৈষয়িক—এই বাস্তব জীবনের চাহিদা-সর্বস্ব গণ-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন থাকবে।

অতএব সাহিত্যের দুইরূপ— দুইতত্ত্ব—দুইধারা এবং দুটোই রসময়; একটি কেবল উপভোগের জন্যে আর একটি নিছক উপলব্ধির জন্যে। একটির রস হয়তো যথার্থই মধুর, অপরটি ভিন্ন নামে কষ— যা কলিজা-নিঃসৃত এবং প্রথমে লাল ও পরে কালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে

ব্যক্ত ধ্বনির নাম কথা। এই কথা দিয়েই গড়ে ওঠে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি। আর অব্যক্ত ধ্বনির নাম চিত্রশিল্প, অস্ফুট ধ্বনিই নৃত্যকলা এবং গান হচ্ছে স্ফুটধ্বনি।

যে-ধ্বনি দিয়ে মানুষকে চটানো যায়, কাঁদানো যায়, হাসানো চলে এবং ভীত, চকিত, ত্রস্ত, স্তম্ভিত কিংবা আনন্দিত, অভিভূত, উত্তেজিত ও উৎসাহিত করা সম্ভব, সে-ধ্বনির— সে-কথার চেয়ে বড় শক্তি পৃথিবীতে কিছুই নেই। তাই বাক্যবলই শ্রেষ্ঠ বল।

'ওহী' কিংবা 'সূক্ত' সবই এ বাক্য। কাজেই মানুষের জীবনে মুখ্য নিয়ন্ত্রী শক্তিই হচ্ছে কথা। ভাবতে গেলে মানুষ কথায় বাঁচে, কথায় মরে। এই তাৎপর্যেই 'বাকব্রহ্ম' তত্ত্বের উদ্ভব।

সুচিত শব্দের সুবিন্যাসেই ভাব হয়ে উঠে বাঙময় 'মন্ত্র' ও 'ইস্‌ম'। তার সম্মোহনশক্তি অতুল্য। জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্মের অণুত অণুতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকে তার প্রভাব।

সাহিত্য তাই বাকপটুতারই নামান্তর। একের ভাব-চিন্তাকে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং বহুর প্রকাশোন্মুখ বদ্ধ ভাব-চিন্তাকে একের মধ্যে সংহত করে আবার সর্বহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেয়াই সাহিত্যিকের কাজ। চিত্রকর, ভাস্কর, নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পীর লক্ষ্যও তা-ই।

অতএব আঁকিয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, গাইয়ে-সবারই এক ব্রত এক অভীষ্ট—লোকহিতে লোকসেবা। এ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে যারা এক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাদের সৃষ্টি আবর্জনা এবং আবর্জনা মাত্রেই অসুন্দর ও অস্বাস্থ্যকর। এ ধরনের কলাকৈবল্যবাদী স্রষ্টা ও শিল্পী সবক্ষেত্রে গণশত্রু না হোন, গণবন্ধু যে নন তা বলাই বাহুল্য। অকাজের কাজে পণ্ডশ্রম তো আছেই, তাছাড়া তাদের ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক রচনা গণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলেই তা সুগতি ও প্রগতির অন্তরায়।

আপাতদৃষ্টে সাহিত্য-শিল্পাদি কলার দান দৃশ্য নয়, কিন্তু বাকব্রহ্ম তত্ত্বে আস্থা রাখলে দেখতে পাব— মূলত জীবনযাত্রীর জীবনের সবক্ষেত্রেই এর প্রভাব প্রকট। মানুষের জীবনযাত্রার এ কেবল পাথেয় নয়, প্রেরণার উৎসও। বাজিয়েরা যেমন গাইয়ে-নাচিয়েদের তাল ঠুকে সুর তুলে সহায়তা করেন, শিল্পী-সাহিত্যিকরাও তেমনি চিন্তায় উদ্দীপনা, কর্মে প্রবর্তনা ও সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেন। এ তাৎপর্যে তাঁরা মন্ত্রদাতা, চারণ কবি, বন্দী ও দিশারী। এখানে সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা অবশ্যই ব্যাপক করতে হবে। শিক্ষিত কিংবা লোকশিল্পীয় লিখিত কিংবা অলিখিত সব সৃষ্টিকেই এমনকি ছড়া ও স্লোগান, প্রাচীরলিপি ও প্রচারপত্র-ইস্তাহার ও ব্যঙ্গচিত্র সবকিছুকেই এক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে হবে।

কেননা এগুলো মানুষের প্রয়োজন-প্রেরণাজাত চিন্তা ও আবেগের ফলপ্রসূ লেখা ও রেখাচিত্র। মন্ময় বাসনার এই তন্ময় প্রকাশ—ভালো-মন্দ-মাঝারি-ভেদ স্বীকার করেও—অবশ্যই সাহিত্য ও শিল্প। প্রেরণা-উৎসাহ-উত্তেজনা-উদ্দীপনা জাগানো লক্ষ্যে সৃষ্ট এসব লেখন ও অঙ্কন যদি একটি হৃদয়েও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় তা হলেই বলতে হবে প্রয়াস সার্থক। কেননা মানসজীবনের বিকাশ সাধনের এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটানোর সহায়ক হওয়াতেই সাহিত্য-শিল্পাদি কলার সার্থকতা ও সফলতা।

রণে যেমন রণবাদ্য, নৃত্যে-গীতে যেমন যন্ত্রসঙ্গীত, দুর্বহ বোঝা টানায় যেমন বোল, যৌথকর্মে যেমন গান, জাহাজে যেমন পাঞ্জেরী, নৌকায় যেমন হাল; মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সাহিত্য-শিল্পাদি কলাও তেমনি দিশারী ও নিয়ামক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, ধার্মিক কিংবা রাষ্ট্রিক আন্দোলন, বিপ্লব অথবা বিদ্রোহ জাগানোর জন্যে যেমন প্রেরণা-সঞ্চারী সাহিত্য ও শিল্পের প্রয়োজন তেমনি সে-সব সংগ্রাম চালু রাখার জন্যেও সাহিত্য-শিল্প আবশ্যিক। আবার সাহিত্য-শিল্প নতুন ভাব-চিন্তা কর্মের ফসলও। অতএব, সাহিত্য-শিল্পাদি কলা একাধারে বীজ ও ফল দুই-ই। জীবনে জাগরণ আনার জন্যে এবং জাগ্রত জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যে সাহিত্য-শিল্পই মুখ্য অবলম্বন। গণজাগরণ যেমন সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমেই সহজে সম্ভব, জাগ্রত জনতারও তেমনি সাহিত্যাদি কলাই শক্তির উৎস এবং কর্মোদ্যমের আকর। এসব কলা, বলতে গেলে, জীবনেরই উৎস ও অবলম্বন, শস্য ও স্বাক্ষর। অতএব জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্যাদি কলার এত আয়োজন।

আজকের দিনে আমাদের পরিবর্তমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রয়োজন পূরণ লক্ষ্যে আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়েদের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক। ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কারমুক্তি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে সমসুযোগ ও সুবিচার রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব-চেতনা ও অধিকারবোধ প্রভৃতি কাম্যবস্তু লাভের সহায়ক হতে হবে আমাদের আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়েদের সাধনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্যে আমরা জীবনের গানই শুনতে পাই। কেননা সাহিত্যের উৎসই হচ্ছে জীবন। জীবনের ভাব-চিন্তা-প্রয়াসই অভিব্যক্তি পায় সাহিত্যে। জীবনের গান অবশ্যই-সুর-তাল লয়ে ও বক্তব্যে বিচিত্র। কারণ জীবনে রয়েছে আনন্দ ও যন্ত্রণা, ভয় ও ভরসা এবং আশা ও নৈরাশ্য। যেখানে বিকার সেখানেই বিচলন। এ বিচলন থেকেই আসে গানে-গাথায়, গল্পে-উপন্যাসে, কাব্যে-নাটকে, রম্য-রচনায় ও প্রবন্ধে বিচিত্র সুরে জীবনের শ্রেয় ও প্রেয়, উল্লাস ও বেদনা, প্রয়োজন ও সমস্যা প্রকাশ পায়।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো প্রবন্ধ-সাহিত্যের আবেদন পরোক্ষ নয়। উচ্ছ্বাস কল্পনা এবং অলৌকিকতার ভার প্রবন্ধ-সাহিত্য সয় না বলেই বাস্তব জীবন-প্রতিবেশে উদ্ভূত ভাব ও চিন্তা, তত্ত্ব ও তথ্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা-সম্পদ ও আপদ, প্রয়োজন ও সমস্যা, কল্যাণ ও দুর্ভোগ প্রভৃতিই প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিষয়। অতএব দুনিয়ার যাবতীয় ভাব ও বস্তুই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হতে পারে যা গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটক-কবিতার আঙ্গিকে সম্ভব নয়।

আমাদের ভাষায়ও প্রবন্ধ বিভিন্ন বিষয় উপজীব্য। বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস, রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম, সাহিত্য-শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা, রীতি-নীতি-আদর্শ প্রভৃতি চিরন্তন ও সাময়িক সব বিষয়েই অল্প-বিস্তর রচনা চোখে পড়ে। যদিও গুণগত কিংবা সংখ্যাগত দৈন্য আজো ঘোচেনি।

যেহেতু সমকালীন দৈশিক ও জাতিক জীবনের আনন্দ ও উদ্বেগ, প্রয়োজন ও সমস্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শন, শিক্ষা ও সম্পদ, ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্বন্ধেই প্রবন্ধগুলো লেখা হয়; সেহেতু প্রবন্ধ-সাহিত্য নাগরিক চেতনারই প্রসূন। এবং তাই প্রবন্ধ-সাহিত্যে দেশের শিক্ষিত মননশীল কল্যাণকামী মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মন-মনন, রুচি-সংস্কৃতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য, ভাব-চিন্তা প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়।

এ কারণেই প্রবন্ধ-সাহিত্যে দেশগত ও কালগত জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্মের প্রতিচ্ছবি যতটা পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, এমনটি গানে-নাটকে-কবিতায় কিংবা কথা-সাহিত্যে কখনো সম্ভব হয় না। প্রবন্ধ-সাহিত্যেই বিশেষ দেশের ও কালের মানুষের জীবন-দৃষ্টির একটি সামগ্রিক পরিচয় মেলে। এজন্যে সাহিত্যের জাতীয় রূপ প্রবন্ধ-সাহিত্যেই থাকে সুপ্রকট। স্থানিক ও কালিক প্রতিবেশ, শৈক্ষিক যোগ্যতা, নৈতিক চেতনা, আর্থিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক মান, সামাজিক পরিবেশ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ধার্মিক প্রত্যয়, আদর্শিক প্রেরণা প্রভৃতির সামষ্টিক প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠে যে মন ও রুচি এবং যে-প্রবণতা ও অভিপ্রায়, তা-ই অভিব্যক্তি পায় প্রাবন্ধিকের রচনায়। প্রজ্ঞা, চিন্তা, যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব ও সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টি প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাণ বলেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ঐ প্রবন্ধের প্রাণবায়ু। সুলিখিত প্রবন্ধ বুদ্ধিকে জাগ্রত ও তৃপ্ত করে এবং জ্ঞান ও বিচারকে দেয় প্রাধান্য।

সব প্রবন্ধ সাহিত্য হয় না। পাকা লিখিয়ের হাতেই প্রবন্ধ সাহিত্য-শিল্প হয়ে ওঠে জ্ঞান-যুক্তি প্রয়োগ-পরিবেশনের দুর্লভ নৈপুণ্যে। বাঙলায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-প্রমথ চৌধুরীর হাতে প্রবন্ধ 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে।

আমাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ আজো পেশাগত প্রয়াসে সীমিত। কারণ তা উপাধি পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করেনি। তাছাড়া গবেষণাবৃত্তগত বলেই গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশিত হয় ইংরেজিতে। তবু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপকেরা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে বাঙলায় কিছু কিছু লিখেছেন এবং সেগুলো নবলব্ধ জাতীয় চেতনাজাত নতুন দৃষ্টির প্রভাবে কিছু নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি ধর্ম দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্র সমাজ ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত সাধারণ প্রবন্ধের মত, পথ ও দৃষ্টির পার্থক্য ও বৈপরীত্য বিচিত্রভাবে প্রকটিত হয়েছে বিভিন্ন মন ও মননের স্পর্শে বিচিত্র ও বর্ণালি হয়ে উঠলেও তাতে দেশ-কাল-জাত-চেতনা দুর্লক্ষ্য নয়।

জাতীয় জীবনের সম্পদ ও সমস্যা, প্রয়োজন ও অভিপ্রায়-সচেতনতা সর্বত্র সুলভ। কেননা লক্ষ্য তাঁদের বিভিন্ন —আত্মিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কারো দৃষ্টি দেশগত জীবনে নিবদ্ধ, কারো লক্ষ্য ধর্মগত আদর্শে সীমিত, কারো চিন্তা কালিক সমস্যার অনুগত, আবার কারো উদ্যম সর্বমানবিক কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত। অর্থাৎ কেউ স্বাজাতিক পটভূমিকায়, কেউ স্বাধর্মিক প্রতিবেশে, কেউবা আন্তর্জাতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে প্রয়াসী এবং সেভাবেই জাতীয় জীবনে উন্নয়নকামী। তবে আমাদের প্রাবন্ধিকদের মধ্য ধর্মবাদী ও রাষ্ট্রবাদীর চেয়ে মানববাদীর সংখ্যাই বেশি। ধর্মপন্থীরা গোঁড়া রাষ্ট্রপন্থীরা উগ্র এবং মানবপন্থীরা উদার বলে পরিচিত। লিখিয়ে মাত্রেই—কবি কিংবা কথাশিল্পী যেই হোন—প্রবন্ধ লেখেন। তাই জনপ্রিয় বিষয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা অজস্র। কিন্তু নতুন বক্তব্য না থাকলে যে লিখতে নেই, তা তাঁরা বোঝেন না। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, চিন্তা-রুচি, উদ্দেশ্য ও জীবন-দৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠে নতুন বক্তব্য। বক্তব্য ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্ত রূপ। বক্তার স্বাতন্ত্র্যই বক্তব্যকে বিশিষ্ট করে। নিজস্ব বক্তব্যহীন বাচালতায় কেবল আবর্জনারই সৃষ্টি হয়। প্রবন্ধে নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন তাৎপর্য নতুন ব্যক্তিত্বের ছাপ আবশ্যিক। বলা বাহুল্য আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যে অবাঞ্ছিত আবর্জনাই বেশি।

তবু বিভিন্ন মতাদর্শের অনেক প্রাবন্ধিকই পাঠকমনে প্রভাব বিস্তার করেছেন। জাগ্রত জীবনের আহ্বান যাঁদের চিত্তলোকে সাড়া জাগায় তাদের কিছু-না-কিছু বক্তব্য থাকেই এবং জাগ্রত জীবন থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। অতএব এ-যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং তা হবে জাতির মনীষার মুকুর।

প্রবন্ধ দুই প্রকার : সৃষ্টিমূলক ও নির্মিতিমূলক। ভাব ও তত্ত্ব বিষয়ক বিমূর্ত রচনাই সাহিত্য-গুণান্বিত হয় বেশি। আর তথ্য ও সমস্যামূলক Objective রচনা শিল্পায়িত করা অসামান্য শক্তির পরিচায়ক। রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে ছিল এই অনন্য প্রতিভা। নির্মিত প্রবন্ধে বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণ হয়, আর সৃষ্ট প্রবন্ধ ভাবাত্মক বলেই রসাত্মক এবং সে কারণেই কাব্যগুণান্বিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্য ও শিল্প কিংবা ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্ক এ-যুগে বিদ্বানদের ধারণা বদলে গেছে। আগেকার যুগে যে- কিছু সুন্দর করে আঁকলে-শিখলেই শিল্প বা সাহিত্যরূপে গৃহীত হত। তেমনি তথ্যের সমাবেশে হত ইতিহাস এবং তত্ত্বের উপস্থাপনায় হত দর্শন।

এখনকার যুগে ঘনিষ্ঠ জীবন-প্রতিবেশের নিরিখেই এগুলোর গুণাগুণ ও উপযোগ নির্ধারিত হয়। যেহেতু মানুষ তার সমকালীন স্বদেশে আনন্দ ও যন্ত্রণা এবং সম্পদ ও সমস্যা নিয়েই বাঁচে সেজন্যে তার সাহিত্যে ও শিল্পে কিংবা ইতিহাসে ও দর্শনে দেশ-কাল-সমাজ-প্রতিবেশপ্রসূত চেতনার স্বরূপ বিধৃত হবে—পাঠক-দর্শক এই প্রত্যাশাই রাখে। যদি সে প্রত্যাশা পূরণ না হয়, তাহলে রচিত শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন উপযোগ হারায়। কেননা উপযোগই সব সাধনার ও গুরুত্ব নিরূপণের মাপকাঠি।

গবেষণাও আজ আর তথ্যের উদঘাটনে ও সমাবেশে সমাপ্ত নয়। দেশগত কালিক জীবন প্রতিবেশের উন্মোচন ও বিশ্লেষণই গবেষকের লক্ষ্য। তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রে কেবল বাহ্য ঘটনা কিংবা আচরণ ও তার ফলাফলই শুধু জ্ঞাতব্য নয়। স্থানিক ও কালিক পরিবেশ, নৈতিক চেতনা, আর্থিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক মান, ধার্মিক প্রত্যয় ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামষ্টিক প্রভাব জন- চৈতন্যে কীভাবে প্রতিফলিত এবং ভাব-চিন্তা-কর্মে কিরূপে অভিব্যক্ত তা দেখা-জানা-বোঝার জন্যেই ইতিহাস চর্চায় আজকের মানুষ আগ্রহী। দর্শনও আজ জীবন-নিরপেক্ষ তত্ত্বসর্বস্ব চিন্তার প্রসূন নয়—জগৎ প্রতিবেশে জীবন-চেতনার গভীরতর স্বরূপ যাচাইয়ের উপায় মাত্র।

২

গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা বিচরণ করেন, সঙ্গত কারণেই তাঁরা হয় অধ্যাপক নয়তো হবু অধ্যাপক। তাই গবেষণা আজো বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রী। এবং অপ্রিয় হলেও এ-কথা সত্য যে গবেষণা আমাদের দেশে আজো বিশ্ববিদ্যালয়ী উচ্চতম উপাধি পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করেনি। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারের জন্যে গবেষণার অঙ্গনে আজো কেউ তেমন বিচরণ করেন না। পেশার ক্ষেত্রে পদোন্নতি লক্ষ্যেই গবেষণার জগতে তাদের পদচারণা সীমিত। অতএব ব্যক্তিগত প্রেরণার সংকীর্ণ পরিসরেই আমাদের জ্ঞান-চর্চা পরিমিতি মানে, জ্ঞান-লোভীর অভিযাত্রার উদ্যম তাতে অনুপস্থিত। পেশাগত প্রয়াস নেশাগত না হলে আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র অভীষ্ট ফসল-প্রসূ হবে না। তাছাড়া বিভিন্ন বিদ্যা আজো ইংরেজির মাধ্যমে অর্জন সাপেক্ষ বলেই গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয় ইংরেজি গ্রন্থেই এবং কিছু অসুবিধে ও কতকাংশে আমাদের হীনমন্যতার দরুন গবেষণা-স্থানও য়ুরোপ-আমেরিকা। তাই বাঙলাভাষা আজো গবেষণা-সাহিত্যে সমৃদ্ধ নয়। তবু ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত কিছু কিছু গবেষণা গ্রন্থ গত বিশ বছরের মধ্যে বাঙলা ভাষায় রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকরাই প্রধানত এ কৃতিত্বের দাবীদার। এসব গবেষণামূলক রচনা তথ্যে ও তত্ত্বে ঋদ্ধ বটে,কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বহু প্রত্যাশিত স্থানিক ও কালিক জীবন-প্রতিবেশ নিরপেক্ষ। ফলে এসব গবেষণার উপযোগগত গুরুত্ব সামান্য। দেশগত ও কালগত জীবনের পটে উপস্থাপিত না হলে কোনো জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের দৈন্য ঘুচতে মনে হয় আরো দেরি আছে। অবশ্য পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনে প্রবন্ধও প্রায় গল্প-কবিতার মতোই অজস্র লিখিত হয়। বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক উৎসব পার্বণ উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অবধি সবাই প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু এঁদের প্রবন্ধ ক্বচিৎ রচনার স্তর অতিক্রম করে। তার কারণ প্রবন্ধ যে প্রতিবেশ-সচেতন লেখকের জ্ঞান, মন,প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের সমন্বিত অভিব্যক্তির ধারক তা তাঁরা বোঝেন না। তাই বক্তব্যহীন বাচালতা কেবলই আবর্তিত হয়; চিন্তা রুচি কিংবা দৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন ঘোষণা করে না। সাময়িক আনন্দ কিংবা যন্ত্রণাজাত নতুন চিন্তা, রুচি ও অনুভব প্রসূত কোনো নতুন বক্তব্য না থাকলে প্রবন্ধ লিখবার অধিকার জন্মায় না। পুরোনো কথার রোমন্থনে আবশ্যক কী। যেমন ধরা যাক রবীন্দ্র-নজরুল পাকিস্তান-ইসলাম সম্বন্ধীয় একগাদা রচনা প্রতি বছরেই পার্বণিক প্রয়োজনে লিখিত হয়। কারো কোনো নতুন বক্তব্য নেই, অথচ ম্যাগাজিন ও পত্রিকার প্রয়োজনে কিংবা রেডিয়ো-টেলিভিশনের তাগিদে তারা লেখেন। ফলে সব লেখাই হয় নির্বর্ণ ও নির্বিশেষ। প্রবন্ধে যদি লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ না রইল অর্থাৎ কে বলছে ও কী বলছে—এ দুটোর সমন্বয় না হল তাহলে পাঠক মনে সে লেখার কোনো প্রভাবই পড়ে না। যে-কথা কেজো নয়, সে কথা পাগলে ছাড়া কেউ বলে না। বক্তব্য মাত্রেরই উদ্দিষ্ট থাকে শ্রোতা, যে-বক্তব্য বিভিন্ন মুখে বহুশ্রুত তা তাৎপর্যহীন ও আটপৌরে। বহু মনের স্পর্শ তা মলিন ও তুচ্ছ।

প্রবন্ধ যে সবসময় সাহিত্য হবে তা নয়, কিন্তু শোনার মতো বক্তব্য হবে তার প্রাণ। স্বদেশের ও স্বকালের জীবন-প্রতিবেশের আনন্দ ও যন্ত্রণার, সম্পদ ও সমস্যার অভিঘাত যদি মন-বুদ্ধিকে বিচলিত করে, প্রাগ্রসর চেতনায় উল্লাস কিংবা যন্ত্রণা এনে দেয় অথবা কোনো পুরোনো ভাব-চিন্তা-কর্ম বা তত্ত্ব, তথ্য ও বস্তু নতুন তাৎপর্যে চমকপ্রদ হয়ে ওঠে অথবা চেতনায় নতুন দৃষ্টি দান করে তখনই কেবল বলবার মতো বক্তব্য প্রকাশের আবেগ সৃষ্টি হয়। এবং তেমন প্রবন্ধই কেবল পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে।

গত বিশ বছর ধরে কয়েককুড়ি লেখক যে-কয়েক শ প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে থেকে শতখানিক ভালো প্রবন্ধ হয়তো পাওয়া যেতে পারে। মানবশক্তির এ-ও একপ্রকার অপচয়।

স্বদেশের স্বকালীন মানুষের জীবন ও জীবিকার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির, মত ও পথের, ধর্ম ও সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের সমস্যা ও সংকট যাঁদের চেতনায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে যন্ত্রণা জাগিয়েছে অথবা গভীর উল্লাস ও আবেগ সৃষ্টি করেছে, তারাই কেবল সার্থক প্রবন্ধ রচনা করতে পেরেছেন। তেমন প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রবন্ধকারেরা দেশে চিন্তা- নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন, অতুল জ্ঞান-প্রজ্ঞা তত্ত্বের-ভাব-চিন্তা -কর্মের ও মত-পথের দিশা দিয়ে তারা জাতিকে যুগোপযোগী ও কল্যাণাভিসারী করে তোলেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে আমাদের দৈন্যের মধ্যেও আশ্বস্ত হই যখন দেখি আমাদের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্যা ও সঙ্কট-সচেতন অন্তত কয়েকজন প্রবন্ধকার আমরা পেয়েছি, যারা শোষিত পীড়িত নির্যাতিত ও মূঢ় দেশবাসীর জন্যে বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রতিকার-পন্থা সন্ধানে সদানিরত।

তাঁরা অজ্ঞের অজ্ঞতা, অন্ধের অন্ধতা, মূঢ়ের মোহ, পথভ্রষ্টের যন্ত্রণা ঘুচানোর কাজে তাদের মন-মনন নিয়োজিত করেছেন। অবশ্য পিছুটান দেবার লোকেরও অভাব নেই। তাদের সর্বপ্রযত্নও যে প্রায়ই অসাফল্যে বিড়ম্বিত—তার মূলে রয়েছে তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাৎমুখিতা।

প্রবন্ধ সুচিন্তিত, সুযৌক্তিক ও সুলিখিত হবে বটে, কিন্তু সাহিত্য হওয়া জরুরি নয়। কেননা প্রবন্ধ হচ্ছে চিন্তার ও যুক্তির প্রসূন—গরজের সৃষ্টি। তাই সমকালীন সমাজজীবনের ও জীবিকার যে- কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে এবং হয়ও। জ্ঞানগর্ভ ও নৈতিক-তাত্ত্বিক প্রবন্ধই কেবল দীর্ঘায়ুর দাবীদার। অবশ্য জ্ঞান পূর্ণতাসাপেক্ষ আর নীতিচেতনা এবং তত্ত্ববোধও আপেক্ষিক এবং সে কারণে পরিবর্তনশীল। যেমন চুরি করা অপরাধ; তার শাস্তি হস্ত কর্তন। কিন্তু আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানববাদীর চোখে বুভুক্ষুর ভাতচুরি নিঃস্বর পয়সা চুরি—অপরাধ হতে পারে না। অভাবজাত চুরি অপরাধ নয়, স্বভাবজাত চৌর্যই অপরাধ। কাজেই হস্ত কর্তন করতে হবে ঘুসখোর পদস্থ্কর্মচারীর, গরিব চোরের নয়। অর্থাৎ যে-অভাবের ও যে-বেকারত্বের কারণে মানুষ চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে, সমাজ-পরিবেশে সেই আর্থিক অসাচ্ছল্যের অনুপস্থিতির পরও যদি কেউ চোর হয়, তাহলেই হস্ত কর্তন ন্যায়সিদ্ধ। অন্যথায় তা হবে অমানুষিক অযৌক্তিক বর্বরতা।

আবার ভূগর্ভ সমুদ্র আকাশ নক্ষত্র চন্দ্র জল বায়ু নীতি রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞানের তথ্যগত অপূর্ণতাই এ সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী রচনাকে পরিত্যাজ্য করে। অতএব কোনো বিষয়ক প্রবন্ধই স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা পাবে না। অবশ্য কালান্তরে মানুষের ভাষা, ভঙ্গি ও চেতনা বদলায় বলে সৃজনশীল সাহিত্যও অবিনশ্বর হয় না। যদি সাহিত্যগুণও থাকে তাহলেও বক্তব্যের সাময়িকতা তাকে স্বল্পায়ু করবে। শিল্পগুণের ও বক্তব্যের চিরন্তনত্বের সহ-স্থিতি সুদুর্লভ মহামুহূর্তের দান। তেমন প্রবন্ধ অবশ্যই স্থায়ী সাহিত্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ

মানুষ তার স্বদেশে স্বকালের জাগতিক আনন্দ ও যন্ত্রণা এবং সম্পদ ও সমস্যার মধ্যেই জীবন নির্বাহ করে। অতএব দেশগত ও কালগত সম্পদে ও প্রভাবে মানুষের দেহ-মন-আত্মা গড়ে উঠে। অর্থাৎ মানুষ তার দৈশিক জলবায়ু প্রকৃতি-নিসর্গ এবং ভাষা ও জীবিকা-পদ্ধতি এবং কালিক ধর্মবোধ বিশ্বাস, সংস্কার, নৈতিক চেতনা, আর্থিক অবস্থা, আচারিক নিয়ম, সামাজিক বিধান ও রাষ্ট্রিক শাসনের মধ্যেই লালিত হয়। কাজেই মানুষের জীবনচেতনার বারোআনাই দেশ-কালের দান, বাকি চার আনা অনুশীলন লব্ধ। আবার বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষা ভেদে মানুষের চেতনায়ও বিকাশ ভেদ ও বৈচিত্র্য থাকে। এজন্যেই মানুষের অভিব্যক্ত আচরণে মগ্ন চৈতন্যের প্রভাব যত বেশি, পরিস্রুত-চেতনার সাক্ষ্য তত নেই। ফলে বোধ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-সংস্কৃতি সম্পন্ন অগ্রসর মানুষের সংখ্যা কম।

এই স্বল্পসংখ্যক অগ্রসর মানুষই তাঁদের অনুশীলন লব্ধ ভাব-চিন্তা-জ্ঞান প্রত্যয়ে ও কর্মে, আচরণে ও আবিষ্কারে, শিল্পে ও সাহিত্যে এবং দর্শনে ও ইতিহাসে প্রকাশ করেন। সামান্য অর্থে জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। এ তাৎপর্যে প্রত্যেক সভ্য ও অসভ্য ব্যক্তির সংস্কৃতি রয়েছে কিন্তু তা সর্বমানবে সুলভ বলেই আমরা তাকে সংস্কৃতি বলে স্বীকার করিনে। অতএব বিশেষ পরিশীলিত চেতনাই সংস্কৃতি এবং সে-কারণে সংস্কৃতি সব সময়েই ব্যক্তিক। তা কখনো দেশগত কিংবা সমাজাশ্রিত হতে পারে না। সংস্কৃতিকে যদি রুচি ও কর্মে বিভক্ত করি, তাহলে যা দেখতে শুনতে-বলতে-করতে-শুঁকতে চাখতে-ধরতে কুৎসিত তা এড়িয়ে চলা এবং যা সুন্দর—শোভন ও কল্যাণকর- প্রত্যয়ে ও কর্মে, আচারে ও আচরণে, বরণে ও বর্জনে, সৃজনে ও আবিষ্কারে তার অনবরত চর্চাই সংস্কৃতি। ব্যক্তিক সংস্কৃতি অনুকৃত হয়ে দৈশিক, সামাজিক কিংবা জাতিক-রাষ্ট্রিক সংস্কৃতি রূপে পরিচিত হয়। আসলে ব্যক্তিক চেতনাসঞ্জাত সংস্কৃতি অনুকারীদের পক্ষে আচার মাত্র। এবং তা-ই দেশীয়-জাতীয় কিংবা গোত্রীয় সংস্কৃতি নামে অভিহিত হয়।

ব্যক্তিক সংস্কৃতিতে যে সৌন্দর্য-বুদ্ধি, কল্যাণ-চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, গ্রহণপ্রবণতা, সৌন্দর্য- অন্বেষা থাকে; দৈশিক, সামাজিক কিংবা জাতিক সংস্কৃতিতে তা থাকে না বলেই তা প্রাণহীন লোকাচার মাত্র। আর তখন সে-সংস্কৃতি প্রাণের প্রেরণা নয়—সৃজনের সুরুচি সুকর্ম ও সৌজন্য নয়, আচারের বেড়ি বা সংস্কারের শৃঙ্খল মাত্র। যেমন ধুতি-চাদর কিংবা পাজামা-পাঞ্জাবি বাঙালির সংস্কারগত আচার মাত্র। কিন্তু এ পোশাক উদ্ভাবকের পক্ষে ছিল সংস্কৃতিবানতা।

সাধারণত মানুষের সংস্কৃতি প্রকাশ পায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনায়; তার সৌন্দর্য, সুরুচি ও সৌজন্য বোধে; তার ন্যায়-অন্যায় বোধজাত আইন-কানুনে; তার নৈতিক-সামাজিক আর্দশানুগত্যে; তার বরণ-বর্জন ক্ষমতায়, ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-লোভে-ক্ষোভ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তার সংযম সাধনায়; পরের প্রতি তার প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনুশীলনে ও তার মানবকল্যাণ কামনায়। কাজেই সংস্কৃতি পরিস্রুতি ও পরিশীলন সাপেক্ষ।

শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি মানস-সংস্কৃতির প্রসূন। যার সংস্কৃতি নেই, তার সৃজনশীলতা নেই। ব্যক্তিভেদে সংস্কৃতির মাত্রাভেদ আছে। কাজেই শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনেও গুণভেদে উৎকর্ষের স্তরভেদ রয়েছে। সংস্কৃতির প্রকাশ সাহিত্যে সুলভ। আমাদের পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের পরিমাপও তাই আমাদের সাহিত্য দিয়েই সহজে করা সম্ভব।

আগেই বলতে চেয়েছি, দেশগত ও কালগত জীবন মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য সেই জীবনেরই প্রতিবিম্বিত রূপ। শিক্ষা ভেদে, মন ভেদে, আর্থিক সামাজিক অবস্থানভেদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জীবনচেতনা বিভিন্ন হয়। কাজেই সাহিত্যও হয় বিভিন্ন স্তরের, আদর্শের ও লক্ষ্যের। জ্ঞান-রুচি-আদর্শ ও চিত্তের প্রসারভেদে ভাষা, ভঙ্গি, অলঙ্কার এবং অনুভূতি ও দৃষ্টি হয় বিভিন্ন। কাজেই সাহিত্যের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে দৈশিক ও কালিক স্বাক্ষর থাকেই।

সৎসাহিত্যের রস সর্বমানবিক হওয়া সত্ত্বেও দেশ-কালের প্রভাব থাকে বলেই সাহিত্য কখনো নির্বণ, নির্বিশেষ ও নির্লক্ষ্য হয় না। বক্তব্যের অবলম্বন হয় দেশজ-কালজ আনন্দ কিংবা যন্ত্রণা, গৌরব কিম্বা লজ্জা, সম্পদ কিংবা সমস্যা, আশা কিংবা নৈরাশ্য। আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও তা সুপ্রকট।

ভাষার ক্ষেত্রে গল্প-উপন্যাস লেখকদের কেউ বুলির ব্যবহারে উৎসুক, কেউ আরবি -ফারসি শব্দ প্রয়োগে আগ্রহশীল, কেউবা নতুন শব্দ গঠনে তৎপর, কারো বা লৌকিক Idiom-এ বেজায় আকর্ষণ।

বুলির সতর্ক ও সুষম ব্যবহারে উৎসুক দেখি সৃজনশীল প্রগতিবাদী লেখকদের। বুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে আগ্রহ রয়েছে স্বাতন্ত্র্যকামী লিখিয়েদের আরবি -ফারসি শব্দের প্রতি গভীর মমতা আছে আরব-ইরান প্রিয় প্যান-ইসলামী তমদ্দুনপন্থীদের। কিন্তু কবিতা ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে দুই-একজন ছাড়া সবাই চলতি রীতির ও চালু বাঙলা শব্দ সম্পদের প্রয়োগে অভ্যস্ত। দশ বছর আগেকার মোহ ও মূঢ়তা এখন আর কোথাও তেমন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।

তবু সাহিত্যিকের শক্তিভেদে ভাষায় শব্দের অপপ্রয়োগ ও ভঙ্গির ক্রটি প্রায়ই দৃশ্যমান। জ্ঞান-বিদ্যা-মন-রুচি অনুসারে রূপপ্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ দেশী ঐতিহ্যে, কেউ স্বধর্মীর বিদেশী পুরাণে, কিংবদন্তিতে ও ইতিহাসে আশ্রয় খোঁজেন এবং অন্যেরা প্রয়োজনমতো পৃথিবীর যে- কোনো দেশের বা জাতির পুরাণ, কিংবদন্তি ও ইতিহাসের সহায়তা গ্রহণে উৎসুক। এর কারণ একশ্রেণীর লেখক স্থানিক জাতীয়তায়, আর এক দলের লেখক ধর্মীয় জাতীয়তায় আস্থা রাখেন এবং তৃতীয় দল উদারচিত্তে মানবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করেন। এই মানববাদী দল দেশ-কাল-জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ সর্বমানবিক ঐশ্বর্যে ও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

অবশ্য স্বাদেশিক ও স্বাধর্মিক রূপ-প্রতীক প্রীতির আড়ালে জ্ঞানগত অসামর্থ্যও আছে। ডালিয়া ডেইজি ডেফোডিল ক্যামেলিয়া রডেনডড্রো বিদ্যাসাপেক্ষ। অধিগত বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিসরেই মানুষের মন-মননের বিচরণ। আবার পরিচিত দেশী রূপ-প্রতীক সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য। কাজেই সেদিক দিয়ে তা অভিপ্রেত। কিন্তু সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তারকামীর পক্ষে দেশান্তরে রূপ-প্রতীক সন্ধান আবশ্যিক। যাঁরা স্বজাতির ও স্বধর্মীর ঐতিহ্যনিষ্ঠ, তাঁরা ভুলে থাকেন যে ভবিষ্যতের জন্যে ঐতিহ্য সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁদেরও রয়েছে এবং সে দায়িত্ব পালন করতে সম্মুখ দৃষ্টির প্রয়োজন। ফেলে-আসা পশ্চাতের দিকে তাকাতে হলে দেহ ফিরিয়ে পশ্চাৎকেই সম্মুখ করতে হয় এবং তাতে অগ্রগতি কেবল ব্যাহতই হয়। এমনি ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিকের দানে পাঠকের মন-আত্মার বিকাশ অসম্ভব, কেননা এতে লেখক-পাঠক কারো চিত্তের বদ্ধতা ও অন্ধতা ঘুচে না।

মানুষের প্রগতির পথে ঐতিহ্যের পাথেয় কি অপরিহার্য? ঐতিহ্য কি সবার থাকে? দিগ্বিজয়ী সিকান্দর-চেঙ্গিস- এটিলার কি ঐতিহ্য ছিল? হযরত ইব্রাহিম-মুসা-ঈসা- মুহম্মদের, সক্রেটিস-এ্যারিস্টটল-কনফুশিয়াসের, কোপার্নিকাস-রুশো-গেলেলিওর, শেকসপীয়ার- গ্যটে-রবীন্দ্রনাথের কিংবা ডারুইন-মার্ক-ফ্রয়েডের কি ঐতিহ্য ছিল? এঁরা প্রত্যেকেই কি স্ব স্ব ক্ষেত্রে দেশীয়, গোত্রীয় বা জাতীয় ঐতিহ্য পরিহার করে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেননি? বুনো নিগ্রোদের রাষ্ট্রিক ঐতিহ্য নেই বলে কি তাদের আত্মোন্নয়ন ও আত্মপ্রসার রুদ্ধ থাকবে? মানুষের জীবনে সত্যি সত্যি ঐতিহ্য-প্রেরণার প্রয়োজন যদি থাকেও তবে তা হবে মানবিক ঐতিহ্য—প্রয়াসে ও প্রযত্নে মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। এবং এ প্রত্যয় অঙ্গীকার করে এগুলোই হবে তার কর্তব্য।

তাছাড়া ধর্মসূত্রে, শাসনসূত্রে, জ্ঞান ও বিদ্যাসূত্রে মানুষ কি চিরকাল বিদেশী-বিজাতি ও বিভাষী-বিধর্মীর ঐতিহ্যকে নিজের করে নেয়নি? তাহলে স্বাদেশিক ও স্বাধর্মিক ঐতিহ্যে ঐকান্তিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ঠা বদ্ধচিত্তের অন্ধতারই নামান্তর। সাহিত্য-শিল্প-দর্শন মানুষের একই বৃত্তি-প্রবৃত্তির এবং ব্যক্তি-সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্যা, সংকট-আনন্দ যন্ত্রণা ও ভাব-চিন্তার অভিব্যক্ত রূপ।

গদ্যে পদ্যে বাঙলা সৎসাহিত্যে বহিরাঙ্গিক উপাদান-উপকরণ দৈশিক ও কালিক। আর্থিক দৈন্য, সামাজিক পশ্চাৎমুখিতা, প্রশাসনিক ত্রুটি, নৈতিক শৈথিল্যে মানবিক দায়িত্বে অস্বীকৃতি ও কর্তব্যে অবহেলা, রাজনীতিক অনিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির পটভূমিকায় মানুষের দয়া-দ্বন্দ্ব, প্রীতি-অসূয়া ভয়-ভরসা, পীড়ন-পোষণ, মাৎসর্য-রিরংসা, আনন্দ-যন্ত্রণা-সম্পদ-সমস্যা, চাওয়া-পাওয়া প্রভৃতির রূপায়ণ ঘটেছে। এই রস সর্বমানবিক জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে মানবিক সমস্যার সমাধান-প্রয়াস ও প্রতিবেশ- প্রভাবিত মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বরূপ নিরূপণই তাই এ সাহিত্যের অন্তরঙ্গ রূপ।

অতএব ভাষা বা ভঙ্গি, কাহিনী বা বিষয়, গৌরব বা লজ্জা, ক্ষোভ বা উল্লাস, বিশ্বাস বা সংস্কার, আদর্শ বা উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য কিংবা সমস্যা হবে স্থানিক ও কালিক, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকবে সর্বমানবিক। অর্থাৎ স্থানিক ও কালিক বিষয় হবে সাহিত্যের বহিরঙ্গ আর অন্তর্নিহিত রস হবে সর্বজনীন।

আমাদের পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে আমরা পূর্ব বাঙলার মানুষ ও প্রকৃতিকেই প্রত্যাশা করি। এই মানুষ ও প্রকৃতি পৃথিবীর আর কোথাও মিলবে না। অর্থাৎ সব মানুষে ও প্রকৃতিতে গূঢ় সাদৃশ্য থাকলেও বাহ্য স্বাতন্ত্র্য থাকে অলজ্ঘ্য। এখানকার মানুষ তার বিশ্বাসে সংস্কারে, মনে মননে ও আদর্শে উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র। তার ভূত-প্রেত-দেও তার, হুর-পরী-জীন, তার যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব, তার আকাশ-জল-মাটি, তার তুকতাক-দারু-টোনা, তার-ঝাড়ফুঁক-মানত, তার-তাবিজ-কবজ, মাদুলি তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

সে জীবনের ও মানসের রূপায়ণ ঘটে তার সাহিত্যে ও সঙ্গীতে তার নৃত্যে ও চিত্রে, তার দর্শনে ও অধ্যাত্মচিন্তায়, তার জীবন-ভাবনায় ও জীবিকা নির্বাচনে, তার সমাজবোধে ও নৈতিক চেতনায়, তার ধর্ম ভাবে ও রাষ্ট্রিক জীবনে।

এই দেশের নদী-নালা-হাওরের প্রভাব তাকে কখনো করেছে উদাসী, তখন তার বিবাগী মন ও দেহকে ভেবেছে অকুল নীরে মন-পবনের নৌকা বলে। আবার কখনো করেছে সংগ্রামী। পদ্মা-মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের তীরবাসী মানুষ প্রকৃতি ও প্রতিবেশীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই বাঁচে। বাউল-ভাটিয়ালী-ভাবাইয়া-হাপু-জাগ-জারি-সারি গানেই তাই তার জগৎ ও জীবনচেতনা অভিব্যক্ত। তার পারত্রিক চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে পীর, মুর্শিদ ও দরগাহ। তার অধ্যাত্মসাধনার অবলম্বন হয়েছে যোগ ও জিকির। তার জাগতিক জীবন-ভাবনায় নিয়ম ও নিয়তির বাধা তাকে কখনো করেছে উদ্বিগ্ন, কখনো করেছে উদ্বেল, আবার কখনো করেছে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী। চাঁদ-বেহুলার কাহিনীতে ও ময়মনসিংহ-চট্টগ্রামের গীতিকায় রয়েছে তার সাক্ষ্য। আমাদের একালের সৎসাহিত্যেও রয়েছে স্বদেশের ও স্বজাতির সে-পরিচয়। বাঙলার গদ্য-পদ্য রচনায় গ্রাম-বাঙলার প্রকৃতি ও মানুষ সুচিত্রিত এবং জীবন ও জীবিকার ধ্যান-ধারণা সুপরিব্যক্ত। আরও রয়েছে বিশ্বাস-সংস্কার-দুষ্ট পীড়িত, শোষিত ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বিপর্যস্ত জীবনের আলেখ্য এবং পীর-দরগাহ-সংপৃক্ত জীবনচরিত্র।

অনেক তরুণ লেখকের রচনা প্রপীড়িত শোষিত মূক মানুষের জীবনের মর্মবেদনার ও জীবন-যন্ত্রণার বর্ণনায় মুখর।

আমাদের শিক্ষিতের সংখ্যা আজও কম। কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যা শিক্ষিত লোকের তুলনায় আরো কম। তাছাড়া দেশ-কাল ও জনজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরার যোগ্যতা থাকা চাই শিল্পীদের। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালো না বাসলে তার পরিচয় জানা সম্ভব নয়। মানুষকে সত্যই ভালোবাসেন তেমন লেখকও আমাদের বেশি নেই। এসব কারণে আমাদের দেশ-কাল-মানুষের সামগ্রিক পরিচয়—তাদের বিশিষ্টতা আজো সাহিত্যে তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা

পাক-ভারত বর্ণ-সঙ্কর জাতি অধ্যুষিত দেশ। গ্রীক শক হুন কুশান তুর্কী মুঘল ও ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস তো ঐতিহাসিক ব্যাপার। তারও আগে যারা এদেশে এসেছিল তাদের মধ্যে দ্রাবিড় আর্য নিগ্রো অস্ট্রিক মঙ্গোলীয়দের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও আরো কত জাতি এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছে—সে খবর কারুর জানা নেই সত্য, কিন্তু অনুমান করা যায় পাক-ভারত চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল।

ভাগ্যের সে এক পরিহাস। এদেশে যারাই যখন এসেছে কিছুকাল পরে তারা বীর্যহীন হয়ে পড়েছে ফলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের উপর আধিপত্য করেছে। এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়ারই প্রতিক্রিয়া।

আসল কথা, কোনো জাতির চারিত্রিক বিকৃতি না ঘটলে তার পতন হয় না। এ বিকৃতির দরুন যখন সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ দেশের বেশির ভাগ লোক নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে; ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে; মহৎ ও বৃহতের সাধনায় পরাঙ্মুখ হয়; তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

পুরাকালের কোনো খবর ইতিহাস দিতে পারে না। কিন্তু মধ্যযুগে কোনো কোনো ব্যাপারে আমরা এ বিপর্যয়ের আভাস পাচ্ছি। মধ্যযুগে বিদেশী বহু দরবেশ ও প্রচারক এদেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। তাঁদের অনুচররূপে আসে নানা মন ও মতের বহুলোক। এদেশের সমাজ ও শাসন সম্বন্ধে কৌতূহলী লোকেরও অভাব ছিল না এদের মধ্যে। রাজনীতি- সচেতন স্বদেশপ্রাণ ও স্বজাতি-বৎসল কেউ কেউ হয়তো এদেশের দণ্ডশক্তির দৌর্বল্যের খবর দিয়ে স্বজাতি-স্বদেশীকে এদেশ জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্তত আজকাল ঐতিহাসিকেরা তাই অনুমান করেন।

এ অনুমানের সপক্ষে অন্তত কিছু তথ্যের আকস্মিক যোগাযোগও রয়েছে। হযরত খাজা মঈন-উদ্দীন চিশতির আগমনের পর মুসলমানদের দিল্লী রাজ্য দখল বাবা আদমের আগমনে সোনারগাঁ জয়, শাহজালাল ও বদর আল্লামাহ্‌র 'খানকা' করার পরে যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম বিজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের অনুমানের পরিপোষক। এভাবেই ইংরেজ ফরাসির রাজ্যলাভ তো একরকম চোখে-দেখা সত্য। অবশ্য দরবেশ- প্রচারকদের উপর এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেউ আরোপ করে না।

ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার কথাই বলি। য়ুরোপীয় বেনেরা এল বাণিজ্য করতে। এদেশের আদর্শচ্যুত নির্বোধ দণ্ডধরদের দুর্বলতা টের পেয়ে শুরু করল লুটপাট আর জনগণের উপর উৎপীড়ন। বাধা না পেয়ে বেড়ে গেল তাদের সাহস ও লোভ। আর বেনেবৃত্তি একসময় রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হল। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পলাশী আর অর্ধভারতের ভাগ্যবিধাতা দুর্ধর্ষ মারাঠাগণ। কিন্তু তাদের সঙ্ঘ-শক্তি ছিল না। তাই ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিল, সাতসাগরের ওপারের কুমির এসে জুড়ে বসল। এমনি-ই হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এদেশে ক্ষাত্রধর্মের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই 'শক হুন দল পাঠান মুঘল' শক্তি একই পথে লোপ পেল।

২

এজন্যেই পাক-ভারত সঙ্কর জাতির দেশ। বাঙলা দেশের পক্ষে এ-কথা আরো খাঁটি। আদিকাল থেকে এদেশে নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র সুহ্ম বঙ্গ গৌড় রাঢ় প্রভৃতি যে গোত্রবাচক শব্দ তা বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। এগারো বারো শতকের সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বহুবচনের রূপ পাওয়া যাচ্ছে : গৌড়াঃ বঙ্গাঃ রাঢ়াঃ প্রভৃতি। এতে বোঝা যায় এক-একগোষ্ঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল বাসেন্দাদেরই গোত্রীয় নামে পরিচিত হত।[১]

অস্ট্রিক আলপাইন পামিরীয় দ্রাবিড় আর্য নিগ্রো মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধহয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গ-গৌড় রাজ্য গড়ে ওঠে। চর্যাপদে 'বঙ্গ' -এর সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও (আ. ৫ম শতক) 'বঙ্গ' শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী' বা 'অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ' আর সর্বানন্দের 'অমর কোষে' (১১৫৯ খৃ.) 'বঙ্গাল বচ্চার' শব্দ পাচ্ছি। নিত্যাহ্নিকতিলকে (লিপিকাল ১৩৯৫ খৃ.) 'বঙ্গিদেশ' ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলেই কেবল গৌড়- বঙ্গাদি অঞ্চল 'সুবা-ই বঙ্গাল' নামে আখ্যাত হয়। ফলে কয়েকশ বছরের অব্যবহারে অন্য নামগুলো অপরিচিত হয়ে উঠল, আর 'বঙ্গ' নামটি গোটা সুবার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কাজেই 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনতা চর্যাপদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের প্রাচীনতার ও প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করে।

কোল ভীল ওরাও মুণ্ডা সঁওতাল দ্রাবিড় চাকমা নাগা কুকী আর্য শক হুন তুর্কী মুঘল আরবি ইরানি হাবসী প্রভৃতি দুনিয়ার নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির সমবায়ে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালি জাতির মধ্যে তাই বিচিত্র আচার-সংস্কার, মননধারা, চারিত্রিক- বৃত্তি প্রবৃত্তি ও রুচি-সংস্কৃতির আভাস আজো দুর্লভ নয়। দেহাকৃতিগত বৈচিত্র্যও কি কম!

৩

আমাদের দেশে 'আর্য' ছাড়া আর সব গোত্রীয় মানুষই 'অনার্য'—এই সাধারণ নামে পরিচিত। সংস্কারবশত আমরা 'অনার্য' বলতে অসভ্যই বুঝে থাকি, যেন 'অনার্য' 'অসভ্য' -এর প্রতিশব্দ। দেশের পুরোনো ইতিহাসের যেসব উপাদান পাওয়া যাচ্ছে তাদের সবগুলোই আর্য ভাষায় ও আর্য প্রভাবে লিখিত বা উক্ত। তাই ঋগ্বেদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনার্যদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলা হয়েছে তা নিন্দা ও অবজ্ঞাসূচক। অনার্যেরা বিজেতার গৌরব-গর্বী আর্যদের কাছে মানুষ নামের যোগ্যও ছিল না। এজন্যই বিভিন্ন গোত্রের অনার্যেরা আর্যসমাজে দস্যু, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, পক্ষী, কুকুর, দৈত্য প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আদিতে এগুলো ছিল 'টোটেম' নামে। কিন্তু আর্যেরা ব্যবহার করেছে অবজ্ঞার্থে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, রাক্ষসকুলে রাবণ, নাগকুলে বাসুকী-জরৎকারু, যক্ষকুলে কুবের প্রভৃতির কাহিনী আমরা পাচ্ছি। মহাভারত ও পুরাণাদিতে অনার্যদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। অথচ এই যুগে আমরা জানতে পারছি কোনো কোনো অনার্য গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়েরা আর্যদের চেয়েও সভ্য ও উন্নত ছিল। তার প্রমাণ কেবল ময়েঞ্জোদারো, হরপ্পা ও কোটদিজির আবিষ্ক্রিয়ায় নয়—আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের আলোকে উত্তরকালের আর্যশাস্ত্রগ্রন্থগুলো যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে শুধু যে অনার্য দেব-দেবীরাই ভিড় জমিয়েছে তা নয়—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, যোগ আর সাঙ্খ্যদর্শনও গড়ে উঠেছে যা একান্তভাবে অনার্য প্রভাব প্রসূত।

মহাভারতে বর্ণিত 'ময়' দানবের কৌরবের সভা সাজানোর কাহিনীটি অনার্যশিল্প ও সভ্যতার উৎকর্ষের আভাস দিচ্ছে। ভক্তিবাদের উদ্গাতা শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ও ব্যাসদেব অনার্য রক্তসম্ভূত। 'নবঘনশ্যাম' কৃষ্ণ আর 'নব দূর্বাদল শ্যাম' রামও হয়তো অনার্যের রক্তে ঋণী। নারী দেবতা এবং

---

১ মহাভারতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। মহাভারতোক্ত কাহিনী এরূপ : 'বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমাকে রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ধর্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিলেন তদনুসারে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাকে বর দিয়াছিলেন "' তোমার পুত্রগণের অধিকৃতরাজ্যসমূহ তাহাদের নামে খ্যাত হইবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা একান্তভাবেই অনার্য। দৈবকী, বাসুদেব,শিব, উমা উভৃতি অনার্য নাম। আর্য দেবতা প্রকৃতির প্রতীক। কিন্তু অনার্য দেবতা গুণ ও ভাবকল্পের প্রতিমূর্তি। এভাবে আমরা নানা সূত্রে আর্যদের উপর অনার্যদের সাংস্কৃতিক বিজয়ের আভাস ও পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। প্রতিমাপূজা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ও নারী দেবতার পূজা, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, মন্দিরোপাসনা, যোগ, তন্ত্র ও সাঙ্খ্যদর্শন, ধ্যান, সন্ন্যাস এবং ভূত, যক্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পূজা প্রভৃতি অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসূন।

আর্যরা বিজয়ী হিসেবেই বিদেশ থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংখ্যা বেশি হবার নয়। আমরা অনুমান করতে পারি আর্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের উচ্চবিত্তের ও আভিজাত্যের লোকগুলো আর্যসমাজে মিশে গিয়েছিল। নুইলে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা উচ্চবর্ণের আর্যশ্রেণীভুক্ত হল কী করে? আর্যদের বসবাসের সাথে সাথেই উত্তরভারত 'আর্যাবর্তে' পরিণত হল। ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণভারতে সামীয় দ্রাবিড় আজো রয়ে গেছে। এদিকে মগধ পেরিয়ে বহুকাল অবধি আর্যেরা আধুনিক বাঙলা দেশের খবর নেয়নি। এই 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ সম্বন্ধে আর্যদের যেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল, তেমনি এর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ধারণাও তারা পোষণ করত। এভাবে কতকাল কেটেছে জানা যায় না, তবে গৌড়বঙ্গাদি অঞ্চলে যে বর্বর-প্রায় গোত্রগুলোর বসতি ছিল, তার আভাসও জৈন আর ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

৪

অনেককাল অবধি আর্য-অনার্যের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই চলেছিল এও অনুমান করা কষ্টকর নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অনার্য রাক্ষস, নাগ, দৈত্য প্রভৃতি গোত্রশক্তিকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রণে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে চিরদাসে পরিণত করতে বা এদের উচ্চবিত্তের লোকগুলোকে আর্যসমাজভুক্ত করে নিতে আর্যদের সময় লেগেছিল অনেক। যারা বশ্যতা স্বীকার করেনি, তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে কিংবা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। যেসব বিত্তহীন অজ্ঞ মানুষ আর্যসমাজে দাসরূপে ঠাঁই পেল তারা কিরূপ উৎপীড়িত হত ও অবজ্ঞা পেত, তার চিত্র মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ব্রাহ্মণ্য সংহিতার শ্রুতিগুলো থেকে পাওয়া যায়। আর্যেরা সম্ভবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি করে একসময় যখন বিজেতা-বিজিতের স্মৃতি গণমন থেকে মুছে গেল অথচ বেশির ভাগ অনার্য সমাজে হীনবর্ণরূপে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল তখন জৈব নিয়মেই সেকালের প্রথামতো ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিল। এ বিপ্লবের সার্থক নেতা বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ। গৌতম-পূর্ব বহু বোধিসত্ত্বের এবং জৈনদের মহাবীর-পূর্ব তেইশজন তীর্থঙ্করের উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধে উঠছিল, সাফল্য আসে তথা পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় মহাবীর ও গৌতমের নেতৃত্বে। এই দেব-দ্বিজ-বেদদ্বেষী বিপ্লবীদ্বয়ের অনুশাসন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্য সমাজদেহ কিরূপ বিষাক্ত করে তুলেছিল। তারা দুজনেই প্রচলিত ধর্ম-দর্শন তথা সমাজব্যবস্থা অস্বীকার করলেন। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড, বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য— এক কথায় তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুরই বিলোপ সাধনে ব্রতী হলেন। মানুষের দুঃখ ঘুচাতে গিয়ে মানুষের প্রাণ ও আত্মার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়ে তাঁরা সর্বজীবের জীবনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রচারে এগিয়ে এলেন। এতবড় কথা এর আগে আর কোথাও কেউ বলেননি। সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীবাহক মানবতার এই মহাসাধকগণ সেদিন কোটি কোটি নিপীড়িত নরনারীকে (দেবী পূজার যুগেও আর্যসমাজে নারীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না,শূদ্রের চেয়ে নারীর মর্যাদা বেশি ছিল না।) সম্প্রদায়- বিশেষের খামখেয়ালি অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর্য-অনার্যের বিভেদ উঠে গেল- ইতর ভদ্রের ব্যবধান ঘুচে গেল। সাধারণের 'বুলি' অভিজাত ভাষার আসনও কেড়ে নিল। নিম্নবর্ণের নর-নারী নতুন ধর্মচ্ছায়ায় ও সমাজাশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। (উচ্চবর্ণের খুব কম লোকই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করেছিল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিদ্রোহ বিপ্লবের লক্ষণটা আরো পষ্ট করে বলা দরকার: দেবতার নাম করে বামুনেরা শোষণ ও পেষণ করত। গৌতম দেবপূজা অস্বীকার করলেন—আত্মা-নরক-পিণ্ড প্রভৃতির ব্যাপারে নিরীহ লোকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে পীড়ন করা হয়। তাই বুদ্ধ বললেন—সব মিথ্যে। বর্ণাশ্রম-দুষ্ট সমাজে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখা দিল। তাই প্রচারিত হল সাম্যবাদ। দেব ও দ্বিজের দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়ে উঠল—তাই দেব-দ্বিজ পূজা অস্বীকৃত হল। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর অধিকার ছিল না—তাই গণভাষা পালি ও প্রাকৃত মর্যাদা পেল। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদকে অনার্য অভ্যুত্থান বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে। গৌতম জন্মেছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলবাস্তুতে। তিব্বতী ভোটচীনা লিচ্ছবীরা ছিল তাঁর মাতৃকুল। মহাবীরও ছিলেন অনার্য-অধ্যুষিত তথা আর্যাবর্ত বহির্ভূত অঞ্চল-সম্ভূত।

যে- দেবতাকে নিজের সুখ-দুঃখের কথা নিজমুখে নিবেদন করা চলে না, যে, ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড নিজের আচরণ-সাধ্য নয়, যে-ধর্মের বাণী নিজমুখে উচ্চারণ ও নিজ কানে শ্রবণ সম্ভব নয়, তার সঙ্গে কারো আত্মিকযোগ থাকার কথা নয়। একারণে লোকেরও কোনো অন্ধসংস্কারের বন্ধন ছিল না। তাই ভারতময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সহজেই প্রচারিত হতে পেরেছিল।

আর্য-অনার্যের বিভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ অবিশেষের কাছে বুদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পক্ষে কোনো বাধা রইল না। এ সময়েই প্রথম জৈন ওবৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মগধের সীমা অতিক্রম করে রাঢ়ে-পুণ্ড্রে তথা আধুনিক বাঙলাদেশে নবধর্ম প্রচারের জন্যে উপস্থিত হলেন। এদেশের বর্বর-প্রায় জনগণের মধ্যে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির আবরণে এই দ্রোহী-ধর্ম অর্থাৎ জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হল। এদের লিপি ছিল না, সাহিত্যের শালীন ভাষা ছিল না, উঁচুমানের সংস্কৃতি ছিল না; তাই আর্যধর্মের (নামত অবশ্য) সঙ্গে আর্যভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হল। এভাবে বাঙলাদেশে অল্পকালের মধ্যে আর্যধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল এবং এসঙ্গে কিছুসংখ্যক তথাকথিত আর্যও এদেশে প্রচার উপলক্ষে বসবাস করতে শুরু করেছিল বলে অনুমান করতে বাধা নেই।

AMARBOI.COM

৫

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনকে আমরা অনার্য অভ্যুত্থানও যে বলতে পারি তার পক্ষে কিছু তথ্য আছে। মেঘাস্থিনিসের বিবরণে দস্যু সর্দারের রাজ্যলাভ এবং নাপিতপুত্ররূপে ঘৃণিত নৃপতির কথা আছে।[১] রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'শূদ্রগণ অনার্য বংশ সম্ভূত।... .. শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন।... ... মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয় করণের প্রকৃত অর্থ বোধহয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়ছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোনো কোনো রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত অধিকার করিয়া 'একরাট' পদবী লাভ করিতে পারেন নাই।[২]

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে যদি ত্রুটিও থাকে, তবু আমরা বলতে পারি মহানন্দ, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোক—এ তিনজনের যে-কোনো একজনের নেতৃত্বে অনার্য অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। রাজবংশী প্রভৃতি কৈবর্ত শূদ্রগণও একসময় আর্য শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গৌতমবুদ্ধের দেব-দ্বিজ ও বেদদ্রোহিতা এতই তীব্র ছিল যে নির্বাণকালে তিনি নাকি সংস্কৃত-চর্চা করতে নিষেধ করে যান। মহাভারতে আর্য-অনার্যের যুদ্ধ-বিগ্রহের বহু কাহিনী আছে। বাসুকীর বিদ্রোহ, বৃত্রের দেবতাতাড়ন, রাবণের সীতাহরণ প্রহ্লাদের আর্যধর্ম গ্রহণ, রামের হরধনু ভঙ্গকরণ, রামের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণলাভ-অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা প্রভৃতি আর্য-অনার্যের

---

১ সমসাময়িক ভারত ১ ম খণ্ড ভূমিকা—যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

২ বাঙলার ইতিহাস ১ ম খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘর্ষ ও মিলনের কাহিনী। ব্যাস, বশিষ্ট, নারদ, সত্যকাম, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম অনার্যার গর্ভে। আর্যেরা যে অনার্যা সুন্দরীদের ধর্ষণ করত এগুলো তারও নজির।

৬

মনে করা যাক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে বাঙলাদেশে আর্য-প্রভাব পড়েনি। কিন্তু দেশে মানুষ ছিল অথচ তাদের ভাষা ছিল না, সুখ-দুঃখের গান বা গাথা ছিল না, ছড়া ছিল না, 'বচন' ছিল না কিংবা ধর্মসঞ্জাত সংস্কার ছিল না—এমন হতেই পারে না। কাজেই মেনে নিতে হয় যে, আর্যপূর্ব যুগে এদেশে কোনো একটি সর্বজনীন ভাষা কিংবা গোত্রীয় ভাষাগুলো চালু ছিল। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করে নিয়ে তারা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে উন্নত আর্যভাষা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতির ও বস্তুর নির্দেশক কিছু কিছু শব্দ ও বাগ্বিধি আর্যভাষার (সম্ভবত মাগধী প্রাকৃত) সঙ্গে মিশে গেল। কোনো জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিণত থাকলে সেগুলোকে উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে পড়ে অপমৃত্যু বরণ করতে হয়। সবক্ষেত্রে না হলেও কোনো কোনো অবস্থায় এ বিপদ এড়ানো যায় না। বাঙলা সেদিন এই শেষোক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কোনো ভাষা সেকালে কোনো ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার বিকাশ দ্রুততর হত একালে যেমন হয় রাষ্ট্রভাষা কিংবা কোনো মতবাদের বাহন হলে। এর প্রসারও হত কারণ কোনো ভাষা কোনো ধর্মবিপ্লবের বাহন হলে তার প্রভাব এড়ানো সে-ধর্মে দীক্ষিত জাতির পক্ষে অসম্ভব। এবং যে, কোনো ভাষার প্রসার নতুন ভাব-চিন্তা ও নতুন বস্তু ভিত্তিক। জৈন ধর্ম নয়—বৌদ্ধমতবাদই বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা আত্মরক্ষা কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এজন্যেই আজো কোল, ভীল, মুণ্ডা, কুকী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি নিজেদের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে দেখতে পাই। এসব ভাষাকেই সম্ভবত 'আর্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে (৮ম শতক খৃ.) 'অসুরভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে : 'অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা।' কিংবা ঐতরেয় আরণ্যকে 'বায়াংসি'র বুলি বলে নিন্দিত হয়েছে।

AMARBOI.COM

৭

ব্রাহ্মণ্য-উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতির উপায়রূপে জনগণ বৌদ্ধ ও জৈনমত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলেও প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় ধর্মে নানা বিকৃতি দেখা দিল। কারণ এ দুটো ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন জৈব ধর্মের এতই প্রতিকূল যে তা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণসাধ্য নয়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনে সাধনা হচ্ছে ধন- জন-মানের সাধনা। অন্তরের অভাব ও অতৃপ্তিবোধই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম প্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়, ভোগেচ্ছাবিহীন জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অথচ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মূল কথা বৈরাগ্য—তৃষ্ণাবিহীন জীবন সাধনা—অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে পঙ্গু ও অথর্ব করে তোলা। তাই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও বৌদ্ধদের নৈতিক চারিত্রিক দৌর্বল্যের সুযোগে শঙ্করাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য শক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষে দেদার হত্যাকাণ্ড, বহু অত্যাচার ও নানা উৎপীড়ন যে হয়েছিল, তার প্রমাণ সে-যুগের পুঁথিপত্রে নানা সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'শঙ্কর বিজয়ে' আছে: দুষ্টমতাবলম্বিনঃ জৈনান অসংখ্যাতান অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্ব বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণে শ্চূর্ণীকৃত চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসম আচরণ নির্ভয়ো বর্ততে। (অর্থাৎ: অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজ্যমুখদিগকে অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত করিয়া তাহাদের মাথা কুঠার দ্বারা ছিন্ন করে, অনেক উদূখল নিক্ষেপ করে, মুষল দ্বারা চূর্ণ করে, এইরূপ দুষ্টমত ধ্বংস আচরণ করে তিনি নির্ভয় থাকতেন।) এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধগণ নির্মূল হয়ে গেল। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিও বৌদ্ধদ্বেষী নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক হয়তো বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছিল।

বাঙলাদেশের কথায় আসা যাক। বাঙালিরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল সত্য কিন্তু ধর্মের অনুশাসনের সাথে জনগণের আন্তর যোগ ছিল না, তাই নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য বৌদ্ধ চৈত্যগুলো ক্রমে বহুদেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। হীনযান, মহাযান, সহজযান বজ্রযান, প্রভৃতি নানা মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কারণ সুখে- দুঃখে সুদিনে-দুর্দিনে স্বস্তি ও প্রবোধ পাবার জন্যে একটি মহাশক্তিকে অবলম্বন স্বরূপ পাওয়া চাই। নইলে ভরসা কী? বাঙলার পাল-রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁদের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম নামত টিকে ছিল। সেন-রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের প্রতিকূলতায় বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হল। বাঙলাদেশে কোনোকালে যে বৌদ্ধ র্ম ও সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ছিল তা অনুমান করবার সামান্য উপাদান পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। এতেই বোঝা যায় কী অসামান্য উগ্রতা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মধ্বজীগণ বৌদ্ধদের ধর্ম, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধজাতিকে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গেও জনসাধারণের বিশ্বাস সংস্কারের যোগ নিবিড় ছিল না। রাজধর্ম বলে সেন- বংশীয় শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুসৃত হলেও আসলে ধর্মগ্রন্থ, মন্দির, দেবতা প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সম্পর্ক ব্রাহ্মণের মারফত হত বলে তা কখনো অকৃত্রিম হয়ে উঠেনি। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (সেন রাজবংশের পতনযুগেই এর সূচনা) রাজরোষ ভয়মুক্ত জনসাধারণ স্ব স্ব বিশ্বাস সংস্কার দিয়ে নিজেদের ইষ্ট দেবতা সৃষ্টি করল। এটাই বাঙলাদেশে ও সাহিত্যে লৌকিক ধর্মান্দোলন। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, নাথপন্থ প্রভৃতি দেবতার ও মতের সৃষ্টি হল। এইগুলো মূলত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনার্য ধর্ম অবশ্য। এতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব প্রচুর। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রামায়ণ অথবা মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে।

এসব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "এক কালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে ? যে উপায়ে হোক। তারপর যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদবুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।" রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য একটু কঠোর। আসলে সমাজের যে, স্তরের লোক দ্বারা এসব লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচিসংস্কৃতি কোনোকালেই উঁচু ছিল না। যে পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে মানুষের মন ও মননের বিকাশ ও প্রসার হয় তা চিরকাল এদের কাছে রুদ্ধ ছিল। তাই এদের অপরিণত মন-বুদ্ধি-বোধিরই নগ্নরূপ ধরা দিয়েছে দেবতার শক্তি ও ঐশ্বর্য পরিকল্পনায়।

মঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ... "তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণদেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ-কিছু সান্ত্বনা আনে বটে কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। "রবীন্দ্রনাথ মুসলমান বিজয় ও তজ্জনিত অত্যাচারকেই লৌকিক দেবতা ও তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। কারণ খ্রীস্টীয় এগারো বারো শতকে অর্থাৎ সেন-রাজত্বের শেষের দিকে রচিত সংস্কৃত পুরাণগুলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব লৌকিক দেবতার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। বরং 'বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' আশুতোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ) যা বলেছেন তা অনেকটা সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন : "সেন রাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্তু এত কালের একটা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিও—যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল—মুখ্যত না হউক গৌণত হইলেও এই সমাজদেহেই রহিয়া গেল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাত মুহূর্তে বাংলা পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।.. তাহারা (বাঙালি হিন্দুগণ) নূতনকে (ব্রাহ্মণ্যধর্মকে) যেভাবে গ্রহণ করিল তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল; এই দেশীয় প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তঃ স্থলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গল কাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কীভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। ... তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।" সুতরাং ড. সুকুমার সেনের উক্তি যথার্থ বলে গৃহীত হতে পারে না। তিনি বলেছেন : "মুসলমান অভিযান যে আলোড়ন ও বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিল" কথাগুলো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মুসলমান বিজয় ও তারপরে কিছুকাল বাঙলার রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখা যাক।

AMARBOI.COM

১২০২-৪ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে বখতিয়ার খলিজী নদীয়া অধিকার করেছিলেন সত্য কিন্তু গোটা বাঙলাদেশ জয় করা বহুকালাবধি তুর্কীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ এবং অপরাপর সামন্তগণ মধ্য ও পূর্ব বাঙলায় অনেককাল স্বাধিকার বজায় রেখেছিলেন। সুতরাং ড. দীনেশ সেন ড. সুকুমার সেন বা অন্যান্য হিন্দু ঐতিহাসিকগণ "দু'শ আড়াইশ বছর যাবৎ বাঙলাদেশে মুসলমানগণ অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা" চালিয়েছে বলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সত্য নয়।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙালির নৈতিক দৌর্বল্য, চারিত্রিক বিকৃতি ও সামাজিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া' জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' শূন্য পুরাণ বা ধর্ম পূজাবিধানের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতিতে এর আভাস আছে। গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা সন্ধান করা বাতুলতা মাত্র—কারণ এতে তা নেই। বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়নের রেশ তখনো ছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশক্তিতেও শিথিলতা এসেছিল। মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আধিদৈবিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা এ যুগের প্রাসাদ ও কুটিরবাসীর চিত্তদৌর্বল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সেন আমলের রণনীতির একটু নমুনা :

"তুকতাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতটা দৃঢ় ছিল তার একটু নিদর্শন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাকথিত রণনীতির বই থেকে। শত্রুসৈন্য যদি চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষবিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে,

ওং অং হং হালিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিনেহি
মশানেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুংকট স্বাহা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধূতুরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্রজপ করতে হবে। তাহলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে 'ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্য বিজয়'।" (ড. সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি)

দেশের দণ্ডশক্তির যখন এমনি অবস্থা তখন মুসলিমশক্তি দেশ শাসন ব্যাপারে বিশেষ বাধা পেয়েছিল বলে মনে হয় না। কাজেই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাবার কারণ ঘটেনি। বরং ড. সুকুমার সেনের অপর একটি উক্তি যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন : "আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মতো দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্যবিধান বলে মেনে নেওয়া।.... তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করলে।"
(মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি)

৯

মুসলমান অভিযানের সময় বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল। বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেউলদেহারা ও দেশীয় সামন্তশক্তির উপর হামলা করতে যে বাধ্য হয়েছে তা অস্বীকার করবারও কারণ দেখি না। বিজেতাগণের উত্তমন্যতা ও বিজিতদের হীনমন্যতার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক যে কিছুকাল অবজ্ঞা ও বিদ্বেষদুষ্ট ছিল তাও সত্য। তুর্কী অভিযান তথা ভারতে মুসলমান বিজয় যে ধর্ম-সম্পৃক্ত নয় তা সবাই স্বীকার করেছে। সুতরাং শাসক বিশেষের অত্যাচার-উৎপীড়ন জাতীয় কলঙ্করূপে চিত্রিত হওয়াও উচিত নয়। যেমন গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন যে কয়জন ব্রাহ্মণকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করিয়েছিলেন, তা একান্তভাবেই তার ব্যক্তিগত আক্রোশবশে। ইসলাম বা মুসলমানের এর সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। ভারতে ইসলাম প্রচারে কোনো কোনো রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো। কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তুর্কী মুসলমানেরা রাজত্ব করতে এসেছিল' ধর্ম প্রচার করতে নয় : অবশ্য মুসলমান বিজয়ের আনুষঙ্গিক ফল পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় এবং বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোতে মুসলমান অত্যাচারের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সত্যতা স্বীকার করেও বলা যায় এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন অহেতুক ছিল বলে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেও স্বদেশী সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতির উপর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রূঢ় ও কঠোর হতে বাধ্য হয়। বিরোধীদল একে অকারণ অত্যাচার-উৎপীড়ন বলে রটিয়ে থাকে। কে না জানে সকারণ শাস্তি চিরকালই শাস্তিভোগীর দ্বারা অকারণ উৎপীড়ন বলে বর্ণিত হয়? আত্মপক্ষ সমর্থন মানুষের সহজাত বৃত্তি। আবার কোনো কোনো মুসলমানের কাফেরদের প্রতি অবজ্ঞা, কাফের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন উক্তি ও কার্য পুঁথিপত্রে বিধৃত থেকে গোটা মুসলমান জাতিরও কলঙ্কবাদী ঘোষণা করছে। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে যেভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছে এবং হবার কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে কারণ থাকার কথা নয়। ওটাতে প্রতিবেশীসুলভ বহুকাল পোষিত আক্রোশের রেশ ছিল, এটাতে ছিল না। কেননা দীক্ষিত মুসলমানের বিরলতার দরুন মুসলমান তখনো হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী হয়ে উঠেনি। তখন কেবল বিদেশী প্রশাসক মুসলমান ও দেশী হিন্দুই ছিল—অনেকটা ইংরেজ শাসক ও ভারতীয় প্রজার মতো।

হিন্দু ও শাসক মুসলমানের বিরোধই সত্য ছিল, সম্প্রীতি মিলন কাহিনীই কি মিথ্যা? "এ দেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ-মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সেসব ঐতিহাসিক নজীর দিন দিনই নূতন করিয়া বাহির হইতেছে।" (ক্ষিতি মোহন সেন)

তুর্কী রাজত্বের প্রথম যুগে রাষ্ট্রশক্তির স্থিরতা ছিল না। রাজা ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ সময় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না-থাকারই কথা। কিন্তু ইলিয়াস শাহী শাসনে দেশে যে স্থায়ী শান্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ সময় থেকেই মুসলমান শাসকগণ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে তৎপর হন। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তসম্পর্কস্থাপিত হতে থাকে। কোনো কোনো মুসলমানের ব্যক্তিগত লাম্পট্যে হিন্দু-রমণী ধর্ষণ যে চলেনি তা নয়, তবে এগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত নয়—কামজ। সুন্দরীর প্রতি পুরুষসম্ভব আকর্ষণজাত।

শাসকগোষ্ঠী চিরকাল আলাদা একটা জাতি। তাঁদের স্বার্থ ও সুখের প্রেরণাতেই তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা। তা জনসাধারণের পক্ষে কখনও বিপদের কারণ হয়ে উঠে মাত্র। শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ নরশ্রেষ্ঠ, আবার কেউ বা নরদানব। এসবই হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্রনির্ভর ব্যাপার। কোনো বিশেষ জাতি বা গোত্রের সঙ্গে সুশাসন-কুশাসনের কার্য-কারণ সম্পর্ক সন্ধান নিতান্ত নিরর্থক। বাঙলার তথা ভারতের মুসলমান নৃপতিদের অনেকেই সুশাসক ছিলেন, নরদানবও ছিলেন কেউ কেউ। তাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ স্বজাতি-বিজাতি সমভাবে ভোগ করেছে। আস্তিক মানুষেরা কেবল স্বধর্মকেই সত্য বলে জানে। পরধর্মে আস্থার অভাবহেতু ধার্মিক মাত্রেই পরধর্মের প্রতি অবজ্ঞাপ্রবণ। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক ও রাজনীতিক ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধি যে প্রবল ছিল তার প্রমাণ দুর্লভ। প্রতাপ-শিবাজীর মুসলমান অনুচর ছিল বহু। আওরঙজীবের হিন্দুসেনা ও সেনাপতির সংখ্যাও কি কম! তারপর যেসব সূত্রে আমরা বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার, হিন্দুর উপর মুসলমান উৎপীড়নের সংবাদ পাচ্ছি তাতে লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শ নিশ্চয়ই রয়েছে। যেমন পাক-ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন আছে, তেমনি সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছাও কম নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে বিরোধের কথা ফলাও করে বেড়ায় আবার কেউ সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে। অথচ সত্য থাকে এ দুয়ের মাঝখানে। '১২০০ থেকে ১৪৫০ পর্যন্ত আড়াইশ বছর যাবত মুসলমানগণ বাঙলা দেশে অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা' চালানোর ফলেই এ সময়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে ড. সুকুমার সেন প্রভৃতি যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করবার জন্যেই আমাদের এত কথার অবতারণা করতে হল।

AMARBOI.COM

১০

আমাদের ধারণা মুসলমান বিজয় ও তারপরের বাঙলার অবস্থা নিম্নরূপই ছিল ঃ মুসলমানদের বাঙলা অভিযানকালে তারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ধনরত্ন প্রাপ্তির আশায় এবং পলাতক শত্রুর সন্ধানে দেউলদেহারা আক্রমণ করেছে ও ভেঙেছে। বিজয়ী হয়ে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে দেউলদেহারা ভাঙবার কোনো কারণ ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বা আক্রোশবশে সামন্তশ্রেণীর কোনো কোনো হিন্দুর উপর দুর্ব্যবহার যে করতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তেমন অত্যাচার থেকে মুসলমানও নিষ্কৃতি পায়নি। সাধারণ মুসলমানের উত্তমন্যতা ও সাধারণ হিন্দুর হীন-মন্যতাজাত পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ তাদেরকে কিছুকাল অনাত্মীয় করে রেখেছিল বলেও অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করতে পারেনি। কারণ :

১. "রাজ্যশাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমনকি সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" (ড. সুকুমার সেন)। "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।... এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন। (স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস)

২. সাধারণ মুসলমানরা বিশেষ করে প্রচারক দরবেশরা চাইতেন এদেশে ইসলামধর্মের প্রচার ও প্রসার হোক। কাজেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যও সাধারণ মুসলমানকে সংযত হয়ে চলতে হয়েছে। বিশেষত গৌড়েই হযরত জালালউদ্দীন তাবরেজী ও আলাউল হক, তাঁর পুত্র হযরত নূর-কুতবে আলম প্রভৃতি অবস্থান করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. গৌড়ের প্রথম দিককার সুলতান ও রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বার্থ ও ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র, হানাহানি ও মারামারিতে ব্যস্ত ছিলেন। এসময়ে হিন্দু প্রজাদের (যারা ছিল শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জন) তাঁরা উৎপীড়ন দ্বারা উত্তেজিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। ইলিয়াসশাহী শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গৌড়ের সুলতানের অধীনে হিন্দুরাও মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে মনে করত। এজন্যেই মুঘলের বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তারা কখনো উদাসীন ছিল না। ধর্ম-ব্যাপারেও পারস্পরিক সহনশীলতার ভাব বিরাজ করত। বৃন্দাবন দাস বলেন—

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ৷৷
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম ৷৷"

এবং বৈষ্ণবদের হাতে অনেক মুসলমান স্বধর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইলিয়াসশাহী আমল থেকেই বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপতি ও চূড়ামণি মহাচার্য রায়মণি বৃহস্পতি মিশ্র এ সময়কার পরপর কয়েকজন সুলতানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন। হোসেনশাহী আমল বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণযুগ। এ সময়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হল। ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে বাঙালির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। দীনেশ চন্দ্র সেন (বৃহৎবঙ্গ) বলেন—"বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবাল্যের যুগ একবিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।... এই পাঠান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড়পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করিলেন। তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।' একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙলা ভাষায় ধর্মপ্রচার— এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল। শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজ্যশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গালার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনোও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই।"

মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ূধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রালোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে উঠে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, নবদ্বীপসম্ভব কোনো ব্রাহ্মণ বীর মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে বলে গুজব রটে ফলে হোসেন শাহ চঞ্চল ও সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বপ্নসাধ ধসে গেল। রঘুনন্দন, রামনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংহতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে হোসেন শাহ চৈতন্যের মত প্রচারে পরোক্ষ সহায়তা দান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের বাহন দেবভাষা সাধারণ বাঙালিকে বহুকাল মূক করে রেখেছিল। বাঙালি তার বুকের আশা মুখের ভাষায় বহুকাল প্রকাশ করতে পারেনি। সেন রাজাদের আমলে "শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।.... এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল।" (দীনেশ সেন—বৃহৎ বঙ্গ)। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালির যুগযুগান্তের সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ নানা ধারায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালিকে আর্যপ্রভাব মুক্ত পৃথক জাতিরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন শুভযুগ বাঙালির জাতীয় জীবনে এর আগে বা পরে কোনোদিন আসেনি।

শেখ শুভোদয়া বা গীতগোবিন্দের ভাষা তো প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় রীতির তুলনায় নিকৃষ্ট। শেখ শুভোদয়ার ভাষা তো বিশুদ্ধও নয়, তবু এঁরা দেশীভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে সাহস পাননি দেবদ্বিজের ভয়ে। নাথপন্থীদের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ হিন্দু বাঙালির সমাজে তাঁদের কোনো প্রভাব ছিল না। সুতরাং একান্তভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই! মুসলমানেরা কেবল সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা পাঠক ছিলেন না, সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাত দিয়েছিলেন হিন্দুদের সাথেই। আর এ ব্যাপারে তাদের কোনো বাধাও ছিল না। বেশির ভাগ বাঙালি মুসলমান তো হিন্দু থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, কাজেই অনুকূল পরিবেশে তারা যে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহবোধ করবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

১২

AMARBOI.COM

তবু পণ্ডিত ও প্রতিভাবানদের কাছে এ ভাষা মধ্যযুগে কোনোদিন কদর পায়নি। তাঁরা সংস্কৃত ও ফারসিকেই স্ব স্ব অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁরা সেবা করেছেন তাঁদের প্রতিভা খুব উঁচুদরের ছিল না। তাই কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি যতই পাণ্ডিত্যাভিমান দেখান না কেন—আলাউল, দৌলতকাজী, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম যত বড় প্রতিভার পরিচয় দিন না কেন—কেউই সমসাময়িক সংস্কৃত বা ফারসি সাহিত্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা রেখে যেতে পারেননি। বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের মতো অধিকাংশ লেখকও যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। এ জন্যেই চারশ বছর ধরে অনুশীলিত হয়েও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য আশানুরূপ ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও এসব রচনা রূপকল্পে না হোক, রসকল্পে তথা মননভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে বাঙলার সংস্কৃতির কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছিল।

কোনো জাতির মুখের বুলিও যে সাহিত্য সৃষ্টির বাহন হতে পারে তা অসামান্য প্রতিভা ছাড়া কারুর মনে জাগেও না। তাই বাঙলায় হিন্দুদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, জনগণের মধ্যে লৌকিক দেবতার পূজাপ্রচারের আগ্রহ ও গরজই তাদেরকে বাঙলা লেখায় প্রবর্তনা দিয়েছে। এজন্যেই হিন্দুর হাতে আমরা নিছক সাহিত্য-শিল্প পাইনি। গোড়া থেকেই কিন্তু মুসলমানরা এ-কাজে হাত দেন। বাঙলার মাধ্যমে ধর্মকথা শোনানোর সাথে সাথে উত্তরভারতীয় ও ইরানী রস-কথাও শোনানোর ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। আধুনিক পাক-ভারতীয় ভাষার মধ্যে সম্ভবত বাঙলা ভাষাতেই প্রথম রোমান্স রচিত হয়। এ কৃতিত্ব 'ইউসুফ জোলেখা' রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯ খৃ.)। কিন্তু এ প্রয়াস দেখা দেয় সেকালের মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে মাত্র। জনসাধারণ তাদের দিকে চেয়ে বসে ছিল না। তাদের সাহিত্যের ভাষা না থাক, মুখের বুলি ছিল। আরো ছিল জৈব-রস পিপাসা ও হৃদয়-নিঃসৃত বক্তব্য। তাই শিল্প সৃষ্টির মহৎ আদর্শে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই জৈব-প্রয়োজনে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক বুলিতে অঞ্চলবাসীর উদ্দেশে গান গাথা ছড়া বচন রূপকথা ও রসবার্তা তৈরি করে তারা মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে। এগুলোই আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় 'লোক সাহিত্য' বা 'পল্লী সাহিত্য'। বহু মুখের স্পর্শে এগুলো রূপ ও রস বদলেছে, তাই এসব ব্যক্তিক রচনা আর নেই। এ কারণেই গুলোকে 'গণ রচনা' বলে নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হচ্ছে আজকাল। দেশের লেখ্যভাষায় রচিত নয় বলে এসব রচনা কোনোকালেই অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারেনি। আগেই বলেছি 'পল্লী সাহিত্য' সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস প্রসূত নয়। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতাই এগুলোকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে, আর আজকাল মর্যাদা পাচ্ছে সাহিত্য হিসেবে। আমাদের মঙ্গলকাব্যও বলেছি দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়াসের ফল। তবু আনুষঙ্গিক ভাবে তাতে সাহিত্যরস ও সাহিত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। তাই ওগুলোও সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

অতএব অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের মাধ্যম রূপে বা গেঁয়োলোকের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশের বাহনরূপে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, আমাদের বাঙলা বুলির সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরের ইতিহাসও সেরূপ। এর জন্মতারিখ জানা নেই, তবে এর জন্মপদ্ধতি ও জন্মের ইতিকথা আঁচ করা যায় সহজেই।

এবার যে-বাঙালি এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তাদের মন-মননের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যাক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বুঝবার জন্যে বাঙালিকে তথা বাঙালির চরিত্র জানা আবশ্যক। কেননা, জীবের বিশেষত মানুষের কর্ম ও আচরণে তার আন্তর সত্তার (Innerself) নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে। মানুষের কর্ম ও আচরণ তার অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ। আর অভিপ্রায় হচ্ছে মন-মনন প্রসূত। এবং ব্যক্তির বা জাতির মন-মনন গড়ে উঠে তার Heredity (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি) ও environment-কে (পরিবেশ) ভিত্তি করে। যেহেতু মানুষের কর্ম ও আচরণ তার ভাব-চিন্তা ও অনুভূতি উপলব্ধিরই প্রতিমূর্তি এবং যেহেতু ভাষা-সাহিত্যও জাতির কর্ম ও আচরণের অন্তর্গত, সেহেতু ভাষা ও সাহিত্য ব্যক্তি বা জাতির মানস-সন্তান-মানস ফসল। আবার আমরা এও জানি প্রত্যেক ক্রিয়ারই কারণ রয়েছে, তেমনি সব কারণেরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। যেমন কোথাও যদি আমরা দূর থেকে দেখি যে আমাদের অপরিচিত একটি ছেলে অপর একটি ছেলের পিঠে একটি ঘুষি বসিয়ে দিল তাহলে এ ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কেননা এর তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক. হয়তো ওরা বন্ধু, রসিকতাচ্ছলে একে অপরকে ঘুষি মারল; দুই. হয়তো ঘুষি খাওয়া ছেলেটি আগে ওকে চটিয়েছে তাই ও প্রতিশোধ নিল; তিন. হয়তো ঘুষিদাতা ছেলেটি অন্য একটি ঘটনার বর্ণনাচ্ছলে ঘুষিটি কোথায় কেমন করে দেয়া হয়েছিল তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। কাজেই ঘটনার বিশ্লেষণে ও বিচারে পূর্বইতিহাস জানা আবশ্যিক। কারণ আমরা জানি ব্যক্তিকে না জানলে তার কর্ম ও আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তার ফলে ব্যক্তির কর্ম ও আচরণের গুরুত্ব লঘুত্ব ও যাথার্থ্য বিচারেও ভুল হয়। যাকে সত্যবাদী বলে জানি, সে একটা প্রায়-অসম্ভব কথা বললেও পূর্বধারণাবশে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়; আর মিথ্যাবাদীর মুখের সত্যকথাও যাচাই না করে প্রত্যয় করা সম্ভব হয় না। কাজেই বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তথা স্বরূপ জানতে হলে বাঙালির চরিত্রও জানা দরকার। আর চরিত্র জানতে হলে অতীতে-ঘটা পৌনঃপুনিক ক্রিয়া ও আচরণের সাধারণ লক্ষণ বিচারেই তা সম্ভব।

আগেই বলেছি, বাঙালি সঙ্কর জাতি। নানা গোত্রের রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে তাদের জীবনে। এর ফলে বাঙালি চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি ও দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালি ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালি যখন কাঁদে তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয় তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি—ফলে অভিভূতি—গভীর। কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে কিন্তু কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়—যেহেতু উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালির গীতিপ্রবণতার উৎস এখানেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো পিঁপড়ের মতো বাঙালি অতিচালাক। তাই সে ধূর্ততা যত জানে সুবুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না, ফলে আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্মবুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। তাই তার সজ্ঘশক্তি নেই ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে বুদ্ধির অবদান গ্রহণে সে অক্ষম।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালি মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগধর্মী। কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী' গণভাষায় 'জীবনবাদী' এবং নীতিবিদের ভাষায় 'ভোগবাদী'। এজন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার উপর বারবার জয়ী হয়েছে। নৈরাত্ম্য ও নিরীশ্বরবাদী এবং নির্বাণকামী বৌদ্ধধর্ম বাঙালি মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র, সেজন্যেই তার অন্তরের জীবনসাধনা ধর্মের উপর জয়ী হল তাই বৌদ্ধচৈত্য হল দেব-দেবীর আখড়া। নির্বাণের নয়—জীবনের ও জীবিকার আরাম ও বিলাসের দেবতারূপে পূজিত হলেন তারা। পারত্রিক নির্বাণ নয়, ঐহিক ভোগই হল কাম্য। যেহেতু বাঙালি কর্মকুণ্ঠ তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা জীবনোপভোগের প্রয়াস তাদের ছিল না। মহাজ্ঞান, তুকতাক, ডাকিনীযোগিনী প্রভৃতির দ্বারা 'সিসম ফাঁক' আয়ত্ত করে খিড়কিদ্বার দিয়ে জীবনের ভোগ্যসম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তাদের কর্মাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হল। পালদের আমল এমনি করেই কাটল। আবার সেন আমলে যখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য উপশিষ্যেরা সেন-রাজশক্তির সহায়তায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তন করেন তখন বাঙালি বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য মতবাদ গ্রহণ করে নিল কিন্তু হৃদয়ে জিইয়ে রাখল তার জীবন-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা। তাই 'মায়াবাদ' পরব্রহ্মপ্রীতি, জীবাত্মা, পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। শুধু তাই নয়, এতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই নিজের জীবনের নিরাপত্তা ও ভোগের দেবতা সৃষ্টি করে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে চণ্ডী (অন্নদা, দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এসব দেবতা তার পারলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন না। একই কারণে ইসলামোত্তর যুগে বিশেষত মুঘল আমলে বাঙলা দেশে হিন্দুর পুরোনো দেবতাকে ও ইসলামের নির্দেশকে ছাপিয়ে উঠেন সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড়খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি-শীতলা প্রভৃতি জীবন ও জীবিকার ইষ্ট দেবতা। অতএব কোনো বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙালির কোনোকালেই ছিল না। সে একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এ ব্যাপারে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এই একই মানসের ফল। যেখানেই সে ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানে তার লুব্ধচিত্ত কাঙাল হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা তার মজ্জাগত। তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেব-নির্ভর তথা অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় খোঁজাই ছিল তার আদর্শ। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরিয়া হয়ে বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈব-ধর্মবিরোধী নির্জলা অধ্যাত্মচিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করেনি। সে আদর্শবাদের বন্ধনভীরু এবং জীবন-সাধনায় ও ভোগে অদম্য।

বাঙলার বাঙালির যা গৌরব-গর্বের অবদান, তা সব সময়েই ছিল ব্যক্তিক অবদান, সামগ্রিক জীবনে তা ক্বচিৎ ফলপ্রসূ হয়েছে তাই। বাঙালি মহৎ পুরুষদের মহা অবদানের ফলভোগে ধন্য হতে পারেনি তারা। এই বাঙলা দেশেই চিরকাল নতুন চিন্তা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু লালন পেয়েছে সামান্য। তবু যখন আমরা স্মরণ করি এই মাটির বুকেই— এই মানুষের মনোভূমেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযান সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নবন্যায় নবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ কিংবা ব্রাহ্মদর্শন; তখন গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠে। আবার যখন স্মরণ করি মীননাথ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোরক্ষনাথ, দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন রামনাথ রঘুনাথ চৈতন্যদেব রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র তীতুমীর শরীয়তুল্লাহ দুদু মিয়া রবীন্দ্রনাথ নজরুল এদেশেরই সন্তান; তখনো নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালি সাহিত্যে বাঙালির এই চারিত্র— এই মানসই ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্টদেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি জীবন- জীবিকার অবলম্বন। তবু তার প্রাণপ্রাচুর্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্বধর্মে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোনো ধর্মই সে মনেপ্রাণে বরণ করে নেয়নি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা একালে ক্ষেত্রবিশেষে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্ত্র-সাহিত্যের গোড়ার কথা

শোনা যায় আর্যরা ঋগ্বেদ সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসেছিল। কিন্তু ভারতে প্রবেশ করে আর্যরা স্বধর্মে স্থির থাকতে পারেনি। দৈশিক ও কালিক প্রভাবে, ও অনার্য সংশ্রবে আর্যধর্ম বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবতার স্থানে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা চালু হতে লাগল। এরূপে আর্যধর্মে প্রচুর অনার্য সংস্কার এবং বহু অনার্য দেবতা প্রবেশ করে তাকে এতই বিকৃত করেছেন যে, বৈদিক ধর্ম বলতে যা বুঝায়, তার আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রইল না। বৈদিক ধর্ম বলে যে কথাটি আছে তা নাম সার, কথার কথা মাত্র। মূল আর্যধর্মের অনার্য উপাদানে পুষ্টি ও রূপান্তরের ইতিহাস অতি জটিল ও বহুবিস্তৃত। সে বিচার করতে গেলে লোম তুলতে কম্বল উজাড় হবার কথা। ধর্ম-দর্শনের বহুধা বিস্তৃতি, সংস্কারের কলেবর বৃদ্ধি ও তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্ভবে দিশাহারা জনগণের পক্ষে ধর্মের পূর্ণ-রূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তাই উপায়ান্তর না দেখে তারা যে- কোনো একক দেবতার পূজা-প্রথা প্রচলন করতে বাধ্য হল। এভাবে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই ধর্মশাস্ত্রের বিকাশে ও প্রসারে মুসলমান-পূর্ব যুগে কোনো বিদেশী প্রভাব ছিল না। অনার্য মানস-সংস্কার আর্য-মানসের উপর জয়ী হল। অনার্য-সভ্যতা যে আর্য-সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিল তার প্রমাণ মেলে আর্যদের এই সাংস্কৃতিক পরাজয়ে। তবু আর্যগণ বিজেতা এবং শাসক, তাই তারা গায়ের জোরেই সমাজে প্রধান রয়ে গেল। এ অনার্য অবদান আর্য– সংস্কৃতি নামে প্রচারিত ও প্রচলিত হল। শাসক ও অভিজাতশ্রেণী চিরকাল বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা উচ্ছ্বাস বা হুজুগের বশে কিছু একটা করে বসে না। গরজ ও সুযোগ বুঝে তারা এমনিভাবে চলে যে, অন্যের কৃতির দ্বারা নিজেরাই লাভবান হয়, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বও বজায় থাকে। কিন্তু মানুষের অন্ধ ধর্মানুগত্যের সুযোগে আর্যগণ যখন শাসন-শোষণ ও ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন শুরু করল, তখন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে অনার্য অধ্যুষিত পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। বেদ-ব্রাহ্মণদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন একান্তভাবে অনার্য সংস্কার-প্রসূত। বুদ্ধের নির্বাণবাদ ও অহিংসবাদ বলিপ্রিয় ও ত্রিলোকে বিশ্বাসী আর্য-মানসের সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করের 'মায়াবাদ' ও অনার্য -মানস সম্ভূত। কৃষ্ণ মিত্রের (১০ শতক) 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে'র দ্বিতীয় অঙ্কে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অহঙ্কার কাশীতে বেদান্ত চর্চার বাহুল্য দেখে অবজ্ঞা করে বলেছে : "প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধাথিরুদ্ধর্থাববেধিনঃ। বেদান্তাঃ যদি শাস্ত্রনি বৌদ্ধে কিমপরাধ্যতে।'

বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি যে প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারগ্রস্ত অশিক্ষিত অনার্য মানসের প্রভাববশত ঘটেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিব ও নারীদেবতাগুলো একান্তভাবে অনার্যদের দ্বারা পরিকল্পিত। শিবের সম্ভু, আদিনাথ, মহাদেব প্রভৃতি গুণ-নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে—তিনি অনার্য দেবতা। পুরাণ বর্ণিত দক্ষযজ্ঞ কাহিনীটি আর্যগণ কর্তৃক অনার্য দেবতা শিবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার প্রচেষ্টার আভাস দিচ্ছে। বাঙলার বৌদ্ধধর্মে শিবের স্থান হয়েছিল। ধর্মপালের প্রপৌত্র নারায়ণ পাল শিবভক্ত ছিলেন। শিব সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এই শিব হচ্ছেন আদিনাথ, তারও আগে পরমাপ্রকৃতি আদ্যা। এঁর থেকেই সৃষ্টি পত্তন। এ শিব ও তাঁর পত্নী শিবানীকে (তৃতীয় জন্মে আদ্যা শক্তিই শিবপত্নী) কেন্দ্র করেই বিকৃত বৌদ্ধধর্মে যোগশাস্ত্র, দেহতত্ত্ব (কায়াসাধন) সহজ সাধন, গুরুবাদ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এসব যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধমতকে নাথপন্থ ও সহজিয়ামার্গ বলা হয়। এর অপর একটি শাখা ধর্মপূজা। এ সবই বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনার্য ধর্ম। তন্ত্রমতও শিবেপ্রাক্ত। ভক্তিবাদটা আসলে অনার্য-মানস প্রসূত। গোটা ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ অনার্যদের মধ্যেই হয়েছিল। এর উদ্ভবক্ষেত্র দাক্ষিণাত্য— অনার্য অধ্যুষিত উত্তরভারতের নিম্নশ্রেণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(অনার্যদের) মধ্যে ভক্তিভাব প্রথম বিকশিত হয় এবং বাঙলাদেশেতো বটেই। ইতিহাস-পূর্ব যুগেও নারদ, প্রলোদ, শুক প্রভৃতি যাঁরা ভক্তিবাদী ছিলেন, তাঁরা হয় অনার্য অথবা অনার্য রক্ত সম্পর্কিত ছিলেন। মাংসাশী আর্যগণের নিরামিষাশী হওয়াও অনার্য আচারের ব্যাপক প্রভাবের ফল।

এবার বাঙলার কথায় আসা যাক। বাঙলা দেশে ভক্তিধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, "মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলা দেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। এবং উত্তরাপথে বাসুদেব কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন ভক্তিপরায়ণ ভাগবত মত উদ্ভূত হয়েছিল, বাংলা দেশে তেমনি লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্‌গত হয়েছিল। —বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলম্বন করে অত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয়নি, যত হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে।—বৌদ্ধ মতের ভক্তিভাবের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের কথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তিভাবের একটু তফাৎ আছে। বৈষ্ণব মতে ভক্তি জ্ঞানশূন্য এবং লীলাস্মরণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু বৌদ্ধমতে ভক্তি জ্ঞানেরই অঙ্গ।" এখানে নাথ ও সহজপন্থ স্মরণীয়। সদগুরু থেকে 'জ্ঞান' (মহাজ্ঞান) না পেলে সাধনায় সিদ্ধি নেই। বৌদ্ধভক্তিবাদ চৈতন্য ও তাঁর আগের যুগে জয়দেব মিশ্র, চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্র পুরি প্রভৃতিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। (প্রত্যক্ষ প্রভাব এসেছিল সুফী মত থেকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে)। তেরো শতকের বৌদ্ধ রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক ও বৃত্রমালার প্রভাবও হয়তো চৈতন্যদেবের উপর পড়েছিল।

সুতরাং বাঙলার বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল, মুর্শিদা, নাথপন্থ ও বৌদ্ধ সহজিয়া মত প্রভৃতি অনার্য মনোভঙ্গিরই প্রকাশ। ডক্টর সুকুমার সেন (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি) বলেন : "বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্ব যুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পরে থেকে বাঙলা দেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত চলিত ছিল—শৈব-নাথ মত এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মত (নাথ পন্থ ও চর্যাপদের সহজিয়া)। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের 'যোগী' বা ' কাপালিক' বলত। এরা কানে নরাস্থি কুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাইরে ছিল এদের কুঁড়েঘর। যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ'। বর্তমান সময়ে যুগী জাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবি ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে।—চর্যাপদগুলো বাঙলা পদাবলীর আদিরূপ।" ধর্মপূজাকেও আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত অনার্য ধর্ম বলেছি। সমাজের নিম্নস্তরে তখন অনার্য প্রথামতো স্থানীয় দেবদেবী প্রভৃতি উপ-দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জাঙ্গুল, বাসুকী বজ্রতারা চণ্ডিকা মনসা ক্ষেত্রপাল শিব ষষ্ঠী যক্ষ ("মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে"—চৈ. ভা.) শীতলা ওলা ধর্মঠাকুর প্রভৃতি সে-কালীন দেবতা। অধিকাংশ দেবতার উদ্ভব ও প্রভাবক্ষেত্র রাঢ় অঞ্চলেই ছিল বলে মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলে তাই দেখতে পাই—"ব্যাধ গোহিংসক জাতিতে চোয়ার। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।" এ ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুর কথা। 'সদুক্তি কর্ণামৃতে'র একটি শ্লোকে এইরকম গ্রাম্যপূজার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে :

তৈস্তের্জীবোপহারৈর্গিরিকুহরশিলাসংশ্রয়ামচয়িত্বা
দেবীং কান্তার দুর্গা রুধিরমুপতরু ক্ষেত্র পালায় দত্ত্বা।
তম্বীবীণা বিনোদব্যবহৃতসরকামচিহ্ন জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালুরকোষৈর্মু বতিনাহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অনেকগুলো আর্য ও অনার্য দেবতা মিলে ধর্মঠাকুর হয়েছেন। বৈদিক বরুণ ও রথারোহী সূর্য, অবৈদিক কূর্মাবতার, ঈরাণীয় বুটপরা ঘোড়াচড়া সিপাহী মিহির, ভবিষ্য বা পৌরাণিক কল্কি অবতার ও অনার্য পাষাণ, তাম্রধাতু ও বৃক্ষদেবতা—এই সব মিলে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব।

"ধর্মঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। এই শূন্য বৌদ্ধ মহাযান মতের শূন্য নয়। এখানে শূন্য মানে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। ধর্মদেবতা নিষ্কলঙ্ক সবশ্বেত তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে পেঁচা বা শাদা কাক। রূপকচ্ছলে ধর্মঠাকুরকে শাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী মূর্তিতেও তাঁর বাহন শ্বেত-অশ্ব। ধর্মপূজার মন্ত্রে সূর্যকে 'নিরঞ্জন' শূন্য দেহ বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের প্রতীক যা পূজা করা হত, তা হচ্ছে কূর্মাকৃতি পাষাণ খণ্ড অথবা পাষাণ নির্মিত কূর্মবিগ্রহ। কূর্ম-প্রতিমার পৃষ্ঠে সাধারণত ধর্মঠাকুরের পাদুকাচিহ্ন আঁকা থাকত। এই পাদুকাচিহ্নই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক। ধর্মপণ্ডিত অর্থাৎ ধর্মপূজার যাঁরা পুরোহিত তাঁরা সর্বদা গলায় ধর্মঠাকুরের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। ধর্ম ছিলেন আদিতে যোদ্ধা ডোম জাতির দেবতা, তাই ডোমেরাই ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ছিল। এখন কৈবর্ত, বার্মাদ, ধোপা, শুঁড়ি ইত্যাদি নানাজাতির ধর্মপণ্ডিত দেখা যায়। যেখানে ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেছে" (সুকুমার সেন—প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী)।

উপরের মন্তব্যগুলি বোধ হয় বিশদ করবার প্রয়োজন আছে। আমাদের মৌল বক্তব্য ভারতীয় আর্যদের উপর অনার্যদের প্রভাব। এ এত বেশি এবং সুদূরপ্রসারী যে, তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসম্ভব। আর্যগণ শুধু ঋগ্বেদ সম্বল করে ভারতে এসেছিলেন এবং সংখ্যায়ও খুব বেশি এসেছিলেন বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের যে ক্রমপরিণতি ও প্রসার ঘটেছে তাতে অনার্য অবদান তুচ্ছ নয়। অথর্ববেদ পুরো এবং সাম বেদের কোনো কোনো সূক্ত এদেশেই রচিত হয়। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক দুটোও এখানেই রচিত। আরণ্যক বিধিতে যে ভাববাদী দ্রাবিড় প্রভাব পড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ক্রিয়াসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের সহসা কল্পনাশ্রয়ী হবার অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৈদিক ধর্ম একান্তভাবে অনুষ্ঠানপ্রধান। এ ধর্মের আদি দেবতা প্রকৃতি-প্রতীক। যেমন বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি। যাগযজ্ঞই ধর্মাচরণে একমাত্র পন্থা। এক কথায় বেদের কর্মকাণ্ড অবিমিশ্র আর্যধর্ম। ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসাও আর্যসৃষ্টি। সাংখ্য ও যোগ কিন্তু অনার্যদর্শন।

বেদান্ত আর্য–অনার্য উপাদানে রচিত। এগুলোর রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ থেকে খ্রীস্টীয় বৌদ্ধ শতক অবধি। কতগুলো উপনিষদের তাৎপর্য নিয়ে ব্রহ্মসূত্র ও গীতা কবে রচিত হয়, তা কেউ বলতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের আদি রচয়িতা বলে কথিত ব্যাসদেবের সূত্র পাওয়া যায়নি। আবার সব সূত্রই ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন কিনা তাও নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। গীতা ও মহাভারত দুটোই ব্যাসের নামে চলে, সুতরাং মনে করা যেতে পারে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে এগুলো রচিত হয়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র থেকেই বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। এটা সম্ভবত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়। আর্যগণ কবে থেকে তাঁদের আদিম ইষ্টদেবতাগুলোকে পরিত্যাগ করে এদেশের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার আরাধনা শুরু করেন ইতিহাস তা বলতে পারে না। কবে থেকে পূর্ব-মীমাংসা ও তৎসংপৃক্ত স্মৃতিতে অর্বাচীন দেবতাগণের স্থান হল তাও অজ্ঞাত।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই : 'কর্মকাণ্ড'-সর্বস্ব 'ঋগ্বেদ' নিয়ে যখন আর্যগণ ভারতে আসেন তখনো তাঁদের ধর্ম পরিণত রূপ গ্রহণ করেনি। প্রকৃতি-প্রতীক দেবতাগণের তুষ্টিবিধান করে ঐহিক অভিষ্ট সিদ্ধি করাই তাদের ধর্মাচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আবার তা-ও ভক্তি ও জ্ঞানসাপেক্ষ নয়, কর্মসর্বস্ব। "অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্য কোনো ব্যক্তি বেদ রচনা করেন নাই। বেদ অনাদিকাল হইতে আকাশে নিত্য হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন ঋষিদের মনে আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র।—মীমাংসকেরা জগৎকে সত্য বলিয়া মানেন এবং তাহারা কোনো ঈশ্বর মানেন না এবং জগৎ যে কোনো সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোনো সময়ে যে ইহা ধ্বংস হইবে তাহাও তাহারা জানেন না। কাজেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা মীমাংসার বিষয় নহে। যাগযজ্ঞে নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মীমাংসকেরা সেই সমস্ত দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা মানেন না। উচ্চারিত মন্ত্রের মধ্যে তাঁহাদের সত্তা; যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে এবং যথাযথভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে সেই অনুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞফল—যথা স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি লাভ করা যায়। কোনো দেবতার অনুগ্রহে ও বিদ্বেষে কোনো সুফল বা কুফল হয় না। কাজেই স্বতন্ত্র দেবতা মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই। (ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ড. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত)

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য; (১) বৈদিক সাধন-ভজন যজ্ঞের মারফতই চলত। (২) কোনো বিশেষ দেবতার প্রতি আনুগত্য বা ভক্তি প্রদর্শন আবশ্যিক ছিল না, যেমন দেবতাগণ যজ্ঞ মারফত ভোগ পেলেই মূল-স্বরূপ অভিষ্ট বরদানে বাধ্য হতেন (৩) ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ তখনো প্রচলিত হয়নি, শুধু কর্মমার্গই ছিল। (৪) সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা তখনো প্রবল হয়নি। (৫) তখনো পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়নি। এর পরের স্তরে বৈদিক আর্যধর্মের মিশ্র বিকাশ হয় অনার্য সাংখ্য ও যোগদর্শন অবলম্বন করে। পরবর্তী যোগশাস্ত্রে সম্ভবত আর্যপ্রভাবই বেশি। এবং কালিক বিকাশের ধারায় তা জটিল ও বিভিন্নমুখী হয়ে উঠেছে, কপিল সাংখ্য বা পাতঞ্জল যোগের কিছুই এখন অবশিষ্ট রয়েছে বলে মনে হয় না। কপিল-সাংখ্যসূত্র বোধ হয় খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে রচিত হয় আর খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি যোগসূত্র রচনা করেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের চরক ও আড়াঢ় ঋষি সাংখ্যমত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক স্যাংখ্যমতের ভিত্তি হচ্ছে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা। সুতরাং সাংখ্য ও যোগ যে বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই আলোচনা নিরর্থক। সাংখ্য সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব-ভিত্তিক। যোগ ঈশ্বরবাদী, সাংখ্য নিরীশ্বর।

বেদান্ত দর্শনের ভাস্কর বা শঙ্কর সিন্ধুদেশে মুসলমান বিজয়ের পরে আবির্ভূত হন। জ্ঞানমার্গ শঙ্করেরই সৃষ্টি। প্রজ্ঞা দ্বারাই মুক্তি বা মোক্ষলাভ ঘটে। তজ্জন্য "কোনো প্রকার যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম; গ্রহণ প্রভৃতিতে স্নান, দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম; কিম্বা নানা পূজা-অর্চনাদি কার্যকর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেদবিধি নিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নন।"[১] শঙ্করের মায়াবাদ ভাববাদী বৈরাগ্যপ্রবণ দ্রাবিড় প্রভাবের ফল। আনুষ্ঠানিক ধর্মে অস্বীকৃতি বৈদিক প্রভাব-মুক্তির পরিচায়ক। জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক সত্যমাত্র—পূর্ণজ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে এর বিলুপ্তি—এই মায়াবাদ বৈরাগ্যবাদের জন্ম দেয়। শঙ্করের মতবাদকে অদ্বৈতবাদ বলে—ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই; আর সব মিথ্যে; অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার দরুন জীব বা জগৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। কাছেই ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যে—'একেম মেবা দ্বিতীয়ম' শঙ্কর জ্ঞান-প্রজ্ঞালাভের সাধনা ছাড়া অন্য আরাধনা স্বীকার করেন না। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গ প্রবর্তনের মূলে যে ইসলামের প্রভাব রয়েছে—আজকাল তা আর অস্বীকৃত হয় না।

গীতায় ঋগ্বেদের কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে অদৃষ্টবাদ—যা বেদে ছিল না, যুক্ত হয়েছ। ফলে ধর্মের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভক্তির রেশ মিশ্রিত হয়েছে। 'কর্মণ্যে বাদিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—এ নিশ্চিতভাবে অবৈদিক। স্মরণ রাখা দরকার যে, গীতা অনার্যা মেছুনীর গর্ভজাত সন্তানের রচিত।

তারপর মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার আগেও ইরানী সূফীতত্ত্বের প্রভাবে ভারতে ভক্তিবাদের উদ্ভব হয়। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামনুজ, দ্বৈতবাদী মাধ্ব ভেদাভেদবাদী নির্ম্বাকচার্য, শঙ্করের মায়াবাদবর্জিত অদ্বৈতবাদ, চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এর প্রভাবেই উদ্ভূত হয়।

---

১ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ৯৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভক্তিবাদের মধ্যে অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মতো বৈরাগ্যবাদই জয়ী হল—মূলত শঙ্করের মায়াবাদে ব্যবহারিক জীবনের অর্থাৎ পার্থিব জীবনের যে অসারতা ঘোষিত হয়েছে, তাই ভক্তিবাদের আবরণে স্বীকৃত হল— জগৎ সত্য হলেও নিত্য নয়, সুখময় নয়। কাজেই যা নিত্য, যা চরম, যা পরম, যা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব হয়—তাকে পাওয়ার সাধনাই জীবনের চরম ও পরম ব্রত হওয়া উচিত। কাজেই অনিত্য সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাবানের লক্ষণ।

গীতায় কর্মের কথা আছে, শঙ্করে জ্ঞানের কথা রয়েছে। এই কর্মবাদের সঙ্গে আর্যদের মানস সম্পর্ক গভীরতম, জ্ঞানমার্গের সঙ্গেও যোগ সুদৃঢ়। তাই বর্ণহিন্দুগণ গীতা ও অদ্বৈতবাদ সহজে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রসার অনার্যদের মধ্যেই বেশি। প্রজ্ঞালব্ধ মুক্তি সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কর্মলব্ধ মুক্তিও কি সহজ! তাই ভক্তিবাদ আভিজাত্যহীন জনসমাজে সাদরে গৃহীত হল। মানস বৈরাগ্যজাত এই ভক্তিবাদ। নয় শতক থেকেই রাধাবাদের তথা 'রাধাকৃষ্ণ' লীলাতত্ত্বের উদ্ভব। 'রাধাকৃষ্ণ' সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের 'কৃষ্ণ নাপ্পিনাই' লীলার প্রভাবে পরিকল্পিত। আর চৈতন্য সমকালে (মুখ্যত চৈতন্যের দান) ভক্তিবাদ প্রেমবাদে পরিণতি পায়।

এদিকে যোগ ও সাংখ্যের প্রভাবে তান্ত্রিক ও যোগ সাধনার বহুল প্রচলন হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ' উচ্চশ্রেণী অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ এবং নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। বৌদ্ধ বজ্রযানীদের থেকেই নাথ-সহজিয়া মতের বিকাশ। এর জের রয়েছে বাউল মতে ও বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বে এবং শৈব সাধনায়।

অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। এসব ধর্ম ও দর্শন সংস্কার তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তাতে আবার শরীয়তের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয়নি অশিক্ষা ও সূফীমতের প্রবাল্যের দরুন। কাজেই সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখা গেছে সেখানেই মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করেছে। এভাবে বৌদ্ধ নাথপন্থ সহজিয়ার তান্ত্রিক-সাধনা ,শাক্ততন্ত্র , যোগ, ইউনানী-দর্শন প্রভৃতি তাদের আকর্ষণ করেছে এবং এভাবে তারা মিশ্র-দর্শনও খাড়া করেছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন, "আধ্যাত্মিক বা মারফতী সাহিত্যে ইরানের সূফী প্রভাব, বাঙলার বৈষ্ণব প্রভাব এবং হিন্দুর যোগশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। বৌদ্ধ নাথ ও সহজিয়া পন্থের প্রভাবও রয়েছে এবং বাউল-মুর্শিদা সাহিত্য ছাড়াও নিছক দার্শনিক তত্ত্ব এখানে কম মেলে না। এসব বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে যেখানে সব ভেদাভেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধকগণ অতিমাত্রায় আচারবর্জিত ও মর্মনিষ্ঠ। তাই এমন নির্বিচার সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। হরগৌরী সম্বাদ, সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, যোগকলন্দর, আগম, জ্ঞানসাগর, আবদুল্লাহর সাওয়াল, মুসার সওয়াল মল্লিকার সওয়াল, ইউনান দেশের পুথি, গোরক্ষ বিজয়, সিরাজ সবিল, নুরজামাল প্রভৃতি গ্রন্থ এ শ্রেণীর।"[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙালি মুসলমান মরমীয়ারা যে সাধনপন্থ আবিষ্কার করেছেন তা একান্তভাবে ইসলামী নয়। বস্তুত ভারতীয় সূফীমতবাদও একান্তভাবে আরব্য-পারসিক নয়। এতে যেমন ভারতীয় দর্শনের প্রচুর প্রভাব পড়েছে তেমনি বাঙালি মরমীয়াদের দর্শনে ও ধর্মে প্রচুর দেশজ তথা ভারতীয় উপাদান রয়েছে। ফলে এদেশে চিরকাল হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন মিশিয়ে অধ্যাত্মসাধনা করেছে। এভাবেই বাঙলা দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত সাধনায়

---

১ পুথি সাহিত্যের বিষয়বস্তু—এলান, ১৯৫২ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরমীয়াদের উপমতগুলো সৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য নিরক্ষর জনগণের ধর্ম ও দর্শন বলে এগুলো আশানুরূপ পুষ্ট হয়নি। এবং এ-কথাও স্বীকার্য যে বৈষ্ণব মতই প্রথম হিন্দু-মসলমানকে একই সাধন-ক্ষেত্রে আনয়ন করে। অতএব এগুলো কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কারের পরিচয় বহন করে না। জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং তার রহস্য-উদঘাটনের চির কৌতূহল থেকেই এর জন্ম। এ প্রয়াস তাই ধর্মনিরপেক্ষ। যে স্তরের অনুভূতিতে মানবমনে দেশ-কাল, পাত্র ও বিশ্বাসের ভেদাভেদ ঘুচে যায়-এগুলো সে স্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধির অভিব্যক্তি। তাই সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খাঁ, শেখচান্দ প্রভৃতি ইসলাম ও নবীকাহিনী যেমন শুনিয়েছেন, তেমনি আবার এসব মরমীয়াবাদও প্রচার করেছেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম-রচিত তত্ত্বসাহিত্য

চলমান জীবন প্রতিমুহূর্তে বিচিত্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করে চলে। কাজেই কোনো ছকে ফেলে তাকে বিচার করা চলে না। এ-কথা কেবল ব্যক্তি সম্পর্কে নয়, জাতির জীবন সম্বন্ধেও সত্য। সমাজনীতি ধর্ম-বিধি রাষ্ট্রসংস্থা ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য সাহিত্য সঙ্গীত পোশাক আচার আচরণ প্রভৃতি সাধারণভাবে সমাজের বা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচায়ক ও পরিমাপক বলে স্বীকৃত হয় বটে, তবু বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট সামগ্রিক ধারণা পাওয়া দুঃসাধ্য। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় যেহেতু নিবদ্ধ নেই, সামগ্রিক স্বরূপে কোনো জাতিকে চিহ্নিত করাও তাই অসম্ভব। তবু মানুষের বোধের ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার জাতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের রেওয়াজ চালু আছে। এতে অন্তত আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটে।

জাতির পরিচয়-ক্ষেত্রে সাহিত্যকে অন্যতম প্রধান উপাদান মনে করা হয়। কেননা জীবন একান্তই স্থান-কাল ভিত্তিক। কাজেই মানুষের দেহমন গড়ে তোলে পরিবেশ। আর মানুষের অন্তরের অকপট অনুভূতি ও উপলব্ধির সুন্দরতম ও নির্বিড়তম প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। সাহিত্য মানুষের বোধ-বুদ্ধির অবিকৃত প্রতিরূপ। তাই একে জাতীয় জীবনের মুকুর বলা হয়। যে-কোনো ঐতিহ্য ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের প্রেরণার উৎস, কর্মের দিশারী ও মর্মের পরিচায়ক হয়। সাহিত্যে মানুষের মর্মলোকের স্বরূপ বিধৃত থাকে বলে মানুষের অন্তর্সত্তার পরিচায়করূপে সাহিত্যকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। আর মানুষের আচরণে ও মননে স্থানিক ও কালিক ছাপ না-থেকেই পারে না। কাজেই প্রাচীন রচনামাত্রেই সমাজ-সংস্কৃতির কিংবা মন-মননের ঐতিহাসিক উপাদান। এতে সাহিত্যগুণ থাকে তো ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই।

বাঙলা দেশে মুসলমানের প্রায় হাজার বছরের বাস। কালক্রমে তারা দেশে সংখ্যাধিক্যও লাভ করেছে। এবং এ -কথাও এখন আর কেউ অস্বীকার করে না যে, শতকরা নব্বই জন মুসলমানই দেশজ। কাজেই মুসলমান সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষকতায় যে বাঙলা ভাষার চর্চা ও সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু হল, তাতে মুসলমান সাগ্রহে শরিক হয়নি—এ-কথা ভাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অতএব গত পাঁচশ বছরে মুসলমানের রচনা পরিমাণে অমুসলমান বাঙালির রচনার চাইতে কম হওয়ার কথা নয়। এ পাঁচশ বছরে কোটি কোটি মুসলমান কত বিচিত্রভাবে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছে তাদের কারো কারো কত জিজ্ঞাসা কত উপলব্ধি, কত বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা নানাভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে রচনার মাধ্যমে। গোটা বাঙলা দেশে ছড়িয়ে ছিল মুসলমানদের এসব রচনা। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে এর এক বিপুল অংশ লোপ পেয়েছে। অবশিষ্টটকুও লোপ পেতে বসেছে। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, জনাব আলী আহমদ ও বাঙলা একাডেমী পুঁথি সংগ্রহ করেছেন কেবল চট্টগ্রাম বিভাগ থেকেই। কাজেই বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের রচনার খোঁজ আজো বিশেষ নেয়া হয়নি।

তবু একটিমাত্র অঞ্চলে সংগৃহীত রচনারও বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। প্রণয়োপাখ্যান, চরিতাখ্যান জ্যোতিষ, সঙ্গীত, মরমিয়া, মর্শিয়া, ধর্মশাস্ত্র, অধ্যাত্মতত্ত্ব ইতিহাস প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে মুসলমানের দানে।

সব রচনায় অবশ্য সাহিত্য-রস মিলবে না, কিন্তু মানুষের প্রাণের পরশ পাওয়া যাবে এতে। কেননা লেখার পেছনে রয়েছে মানুষ, আর মানুষ প্রাণ-মন বিহীন নয়।

~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের তত্ত্বসাহিত্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার মনোময় উত্তর খোঁজা হয়েছে। মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন প্রশ্ন রয়েছে, তারই জবাব খোঁজার প্রয়াস আছে এতে। কেতাবীদের বিশ্বাস, হযরত মুসা তুর পর্বতে বসে আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করে জগৎ ও জীবনের নানা তত্ত্ব জেনে নিতেন। সাইত্রিশ শ বছর আগেকার হযরত মুসার সে তত্ত্বালোচনা আজো প্রাকৃত মনের কৌতূহলাবেগ তৃপ্ত করে। বাস্তবধর্মী শক্তিমানের যে জিজ্ঞাসা মানুষকে বিজ্ঞানী করেছে, ভাববাদী দুর্বলকে তাই করেছে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক।

তত্ত্বচিন্তা মানুষকে তিনটে মার্গের সন্ধান দিয়েছে : জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মার্গ। জ্ঞানবাদ আস্তিক্য, নাস্তিক্য ও সংশয়প্রবণ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। কর্মবাদ সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলেছে। আর ভক্তিবাদ হয়েছে নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের উৎস এবং ভক্তিবাদের উপজাত (by product)—কারো কারো মতে পরিণতি—হচ্ছে প্রেমবাদ।

বাঙলা ভাষায়ও এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হয়েছে :

এগুলো ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও সাধন সাহিত্য।

ক. ধর্মসাহিত্যে উল্লেখ্য হচ্ছে :

নেয়াজ ও পরাণের (১৭ শতক) কায়দানি কেতাব, খোন্দকার নসরুল্লাহর (১৭ শতক) হেদায়তুল ইসলাম, শরীয়ৎনামা, শেখ মুতালিবের (১৬৩৯ খ্রী.) কিফায়তুল মুসল্লিন, আলাউলের (১৬৬৪ খ্রী.) তোহফা, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৮ শতক) হাজার মাসায়েল, আশরাফের (১৭ শতক) কিফায়তুল মুসল্লিন, আবদুল্লাহ (১৮ শতক) নসিয়ত নামা, কাজী বদিউদ্দীনের (১৮ শতক) সিফৎ-ই-ইমান, সৈয়দ নাসির উদ্দিনের (১৮ শতক) সিরাজ ছবিল, মুহম্মদ মুকিমের (১৮ শতক) ফায়দুল মুবতদী, বালক ফকীরের (১৮ শতক) ফায়দুল মুবতদী, সৈয়দ নুরুদ্দীনের (১৮ শতক) দাকায়েকুল হেকায়েক রাহাতুল কুলুব, মুহম্মদ আলীর (১৮ শতক) হায়রাতু ফেকাহ, হায়াৎ মাহ্মুদের (১৮ শতক) হিতজ্ঞানবাণী, আফজল আলীর (১৮ শতক) নসিয়ত নামা প্রভৃতি।

খ. তত্ত্বসাহিত্যে পাই : হাজী মুহম্মদের (১৬ শতক) নূর জামাল, মুহম্মদ আকীলের মুসানামা, খোন্দকার নসরুল্লাহর মুসার সাওয়াল, শেখচাঁদের (১৬ শতক) শাহদৌলাপীর বা তালিবনামা, আবদুল হাকিমের (১৬ শতক) শিহাবুদ্দিন নামা, আলী রজার (১৮ দশক) সিরাজকুলুব, আগম ও জ্ঞানসাগর ; শেখসাদীর (১৭ শতক) গদামল্লিকা, সেরবাজ চৌধুরীর ফক্করনামা বা মল্লিকার সওয়াল, এতিম আলমের (১৮ শতক) আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, সৈয়দ নুরুদ্দীনের মুসার সওয়াল, বুরহানুল আরেফিন, অ-জানা কবির মুসার রায়বার, হোরান জরীপ (সম্ভবত পুরাণ জরীপ) মীর মুহম্মদ শফীর (১৭ শতক) নূর নামা, কাজী মনসুরের (১৮ শতক) সির্নামা অজ্ঞাতনামা কবির মুসা পয়গাম্বরের কেচ্ছা, শেখ জেবের আগম, শেখ জাহেদের আদ্য পরিচয়, রমজান আলীর আদ্যবক্ত প্রভৃতি।

গ. সাধনসাহিত্য : ভক্তিবাদে রয়েছে দ্বৈতরূপ—সাধন ও ভজন। সাধনস্তরে সূফী ও যোগতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। সাধন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য শেখ ফয়জুল্লহর (১৬ শতক) গোরক্ষ বিজয়, সৈয়দ সুলতানের (১৫৮৪-৬৮ খ্রী.) জ্ঞান প্রদীপ, অজানা কবির যোগকলন্দর, আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ' শেখ চান্দের 'হর গৌরী সম্বাদ', মোহসিন আলীর মোকাম মঞ্জিলের কথা প্রভৃতি। আর ভজন সংগীতরূপে পাচ্ছি : রাধাকৃষ্ণরূপক গীত, বাউল ও মুর্শিদী গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউল মত ও সাহিত্য

বাউলমতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি অন্যত্র।[১] কিন্তু সেসব বাহ্য পরিচয়ই বহন করে। অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্যে তত্ত্বকথার জাল বুনতে হবে এবং তাতে ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। প্রমাণ যা থাকবে তা পরোক্ষ, তাই পঞ্জী হবে বিরল।

চলমান জীবন প্রতিমুহূর্তে বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করে। অভিব্যক্তির এ প্রবাহকে কোনো ছকে ফেলে যাচাই করা চলে না। এ-কথা কেবল ব্যক্তি সম্পর্কেই নয় জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও সত্য। তবু জানবার-বুঝবার সুবিধের জন্য একটা মাপকাঠি স্বীকার না করলেই নয়। তাই সমাজ-নীতি ধর্ম-বিধি রাষ্ট্রসংস্থা ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য সাহিত্য সঙ্গীত পোশাক, আচার আচরণ প্রভৃতি সাধারণভাবে সমাজের বা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচায়ক ও পরিমাপক বলে স্বীকৃত হয়। যদিও এমন কোনো সাধারণ গুণনীয়ক কিংবা সমীকরণ পদ্ধতি নেই যা দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের বিচিত্র আচরণকে একটি সামগ্রিক ধারণার অনুগত করে বিচার করা সম্ভব। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটা জাতির পূর্ণ পরিচয় নিবদ্ধ নেই বলে সামগ্রিক স্বরূপে কোনো জাতিকে চিহ্নিত করাও অসম্ভব। তবু মানুষের বোধের ও ব্যবহারের পরিসরে জাতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের যে রেওয়াজ চালু রয়েছে, আপাতত আমাদের তাই অনুসরণ করতে হবে।

জাতির পরিচয় ক্ষেত্রে ধর্ম ও সাহিত্যকে প্রধান উপকরণ বলে গণ্য করা হয়। কেননা জীবন একান্তই স্থান-কাল ভিত্তিক। কাজেই মানুষের দেহমন গড়ে তোলে প্রতিবেশ। আর মানুষের অন্তরের অপকট অনুভূতি ও উপলব্ধির সুন্দরতম ও নিবিড়তম প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। এবং জীবনের তথা মনের ও আচরণের অলক্ষ্য নিয়ন্তা হচ্ছে ধর্মীয় সংস্কার। ধর্মের অন্তর্লীন প্রভাবের স্বরূপ যাই হোক, সাহিত্য যে মানুষের বোধ-বুদ্ধির অবিকৃত প্রতিরূপ তা মানতেই হবে। কারণ সাহিত্য জীবনালেখ্য নয়, জীবনবোধের অভিব্যক্ত সাক্ষ্য। এজন্যেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর বলে স্বীকৃত। সাহিত্যে মানুষের মর্মমূলের স্বরূপ বিধৃত থাকে বলে মানুষের অন্তর্সত্তার পরিচায়করূপে একে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আর মানুষের মননে ও আচরণে স্থানিক কালিক প্রভাব অনপনেয় বলে কোনো কোনো ঐতিহ্য মানুষের প্রেরণার মাতৃকা, কর্মের দিশারী ও মর্মের পরিচায়ক। কাজেই সাহিত্য ও ঐতিহ্যের উজান পথে সন্ধান নিতে হবে তত্ত্বের।

খ

মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সৃষ্টির রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের মহিমা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে চিরন্তন ও সর্বজনীন জিজ্ঞাসা রয়েছে তারই জবাব খোঁজা হয়েছে ধর্ম ও অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কিত রচনায়। বাস্তবধর্মী শক্তিমানের যে জিজ্ঞাসা মানুষকে বিজ্ঞানী করেছে, ভাববাদী দুর্বলকে তা-ই করেছে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। একই জিজ্ঞাসা আপাত বিরোধী দু-কোটির চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা ও জন্ম দিয়েছে। এই একই জিজ্ঞাসা কাউকে করেছে বহির্মুখী, কাউকে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। বহির্মুখিতা মানুষকে করেছে বিষয়ী ও বিজ্ঞানী, অন্তর্দৃষ্টি মানুষকে করেছে রহস্যবাদী, গড়ে তুলেছে অধ্যাত্মবাদ। বিজ্ঞান এনেছে ভোগবাদ বা ঐহিক জীবনবাদ তথা বস্তুতান্ত্রিকতা। অধ্যাত্মবাদ দিয়েছে বৈরাগ্য বা ইহবিমুখিতা জাগিয়েছে, জীবনেতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। বৈরাগ্য প্রাচ্যের মানস- সম্পদ আর বিজ্ঞান প্রতীচ্যের ঐশ্বর্য। দুটোরই মূল প্রেরণা জিগীষা—একটার লক্ষ্য আত্মজয়, অপরটার

---

১ · 'স্বদেশ অন্বেষা'-গ্রন্থে বাউলতত্ত্ব দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাম্য দুনিয়া-জয়। একটার সম্বল হৃদয় ও মনোবল, অপরটার হাতিয়ার বুদ্ধি ও বাহুবল। একটি হৃদয়বৃত্তির লীলা, অপরটি প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি।

তত্ত্বচিন্তা মানুষকে তিনটে মার্গের সন্ধান দিয়েছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পথ। জ্ঞানবাদ আস্তিক্য, নাস্তিক্য ও সংশয়প্রবণ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। কর্মবাদ সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে তুলেছে আর ভক্তিবাদ হয়েছে নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের উৎস। এবং ভক্তিবাদের উপজাত কিংবা পরিণাম হচ্ছে প্রেমবাদ। বাঙলা ভাষায়ও এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হয়েছে—ধর্মসাহিত্য, তত্ত্বসাহিত্য ও সাধনসাহিত্য। বাউল গান হচ্ছে তত্ত্বাশ্রয়ী মরমীয়া সাহিত্য।

গ

বাউলগান আমাদের তত্ত্ব-সাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুসলিম প্রভাবে তথা সূফীবাদের প্রত্যক্ষ সংযোগে এক প্রাচীন মতের রূপান্তরে বাউল মতের উদ্ভব হয়েছে। সে মতের জড় রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আদিকাল থেকেই মানুষ সাধারণভাবে দৈহিক শুচিতাকে মানস-শুচিতার সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করেছে। এজন্যে যে-কোনো ধর্মমতে উপাসনাকালে দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যিক। মনে হয় এ বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। যোগে, সাংখ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে এবং সূফীসাধন তত্ত্বে দেহকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেহের আধারে যে-চৈতন্য সেই তো আত্মা। এ নিরূপ নিরাকার আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা শারীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে—দেহযন্ত্র নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয় তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহযন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এভাবে সাধনতত্ত্বে যৌগিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অসামান্য। তাই এদেশে অধ্যাত্ম সাধনায় যোগাভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। যোগসাধন পাক-ভারতের একটি আদিম অনার্য শাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা ছিল। বাঙলায় পাল আমলের তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখাই মধ্যযুগে সূফী প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মত রূপে প্রসার লাভ করে। এভাবে চর্চাগীতির পরিণতি ঘটে সহজিয়া পদে ও বাউল গানে। তত্ত্ব-সাহিত্যে তথা মরমীয়া সাধনায় সাধারণভাবে যোগ আর সূফী সাধন তত্ত্বের ও পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। সমাজ ও ধর্মের আচারিক প্রভেদ সত্ত্বেও শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তরালে ভিন্নাদর্শমুখী দুটো জাতির মধ্য কী নিবিড় প্রাণের যোগ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে বাউল গানে ও এ ধরনের অন্যান্য রচনায়। জীবনের যে চিরন্তন প্রশ্নে আত্মার আকুলতা—উদার পটভূমিকায় ও বিস্তৃত পরিসরে তার সমাধান খুঁজতে চাইলে জাত, ধর্ম ও সমাজ চেতনার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। মানস সংস্কৃতির এরূপ লেনদেন, এমনি আত্মিক যোগাযোগ চিরকালই মানুষের চিত্তপ্রসারের ও আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের পরে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ-ভারতে, পরে উত্তরভারতে এবং সর্বশেষে বাঙলা দেশে হিন্দুসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নের বাহ্যরূপ ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ ও তজ্জাত ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সূফীতত্ত্বই এ আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম; উত্তর ভারতের সন্তধর্ম এবং বাঙলার বৈষ্ণব ও বাউল মত সূফীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। সেদিন ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মহিমা যে আবেগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল তারই ফলে মন্দির ছেড়ে মসজিদে না গিয়ে উদার আকাশের নিচে স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতাবার এ নতুনতরো প্রয়াসমাত্র। তারা বুঝেছে যদিও 'হিন্দু ধাবই দেহরা, মুসলমান মসীত' সেখানে তো আল্লাহ নেই। কবীরের ভাষায় তাঁদেরকে আল্লাহ বলেছেন :

মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসর্মে।।

জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপন আত্মার পরিশুদ্ধিই খোদা প্রাপ্তির উপায়—তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই এদের প্রাথমিক ব্রত। এদের আদর্শ হচ্ছে.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"Knoweth thyself; 'আত্মানাং বিদ্ধি'—নিজেকে চেনো, হাদীসের কথায় মান 'আরফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'—যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে।" জীবনের পরম ও চরম সাধনা সে-খোদাকে চেনা।

ঘ

ইরানি সূফী সাধনাও যৌগিক প্রক্রিয়া নির্ভর। পাক-ভারতের যোগ-সাধনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে সূফীদের দেহচর্চায় যোগশাস্ত্রে প্রচুর প্রভাব পড়ে। সূফীদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়ে উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে যিনি পাক-ভারতের মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁর নাম শেখ শরফুদ্দিন বু আলি কলন্দর শাহ (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রী.)। তার প্রবর্তিত সাধনপদ্ধতির বাঙলা নাম 'যোগ কলন্দর।' পানিপথে তাঁর সমাধি আছে। উত্তরভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর তাঁর খ্যাতি আজো ম্লান হয়নি। এক সময়ে বাঙলায় কলন্দর-পন্থী বৈরাগীর এমনি প্রাদুর্ভাব ছিল যে 'কলন্দর' বলতে মুসলিম বৈরাগীই বোঝাত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে "কলন্দর হৈয়া কেহ ফিরে দিবারাতি। ঋণ করি নাহি দাও, নহ কলন্দর।" আর সূফীতত্ত্বের সঙ্গে এদেশের লোকের সাহিত্যিক পরিচয় ঘটে প্রথমে রুমীর মসনবী এবং পরে হাফিজ প্রভৃতির সৃষ্টির মারফৎ। ব্যবহারিক পরিচয় তো আগে থেকেই ঘটেছে, কেননা ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রধানত সূফী দরবেশের ও তাদের অনুচরের মাধ্যমে।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। কাজেই আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা হয় । তাই দেহাধারাস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত।

" খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।'

'এ দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।

বাউলেরা তাঁদের ভাষায় 'অচিন পাখি', অলখ সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী) মনের মানুষ বা 'মানুষ রতন'-রূপ আত্মা তথা পরমাত্মাকে জানবার সাধনা করে। বৈষ্ণব বা সূফীর মতো এরা প্রেমিক নয় যোগীর মতো তাত্ত্বিক। বাউল গান একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন-সাধ, সঙ্গীত ও ভজন গান ও গীতিকবিতা। তথাপি ভাষায়, আঙ্গিকে ও ভঙ্গিতে এগুলো আমাদের লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউলমতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাদই এ মতের প্রবর্তক বলে বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই বাউল-মত জনপ্রিয় করেন। আর উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পূর্ণ বিকাশ।

ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই বাউলেরা সাধনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরা সাম্য ও মানবতার বাণী প্রচার করে। এঁরা রুমী-হাফিজের সগোত্র সাধক। বাউল গুরুরা একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও মরমী। তাঁদের গান লোকসাহিত্য মাত্র নয় বরং বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

বাউলের রূপক অভিব্যক্তিতে পরমাত্মা হচ্ছেন : মনের মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, অটল মানুষ, রসের মানুষ, সোনার মানুষ, মানুষ রতন, মনমনুরা, অলখ সাঁই প্রভৃতি। চর্যাপদ, দোহাঁ প্রভৃতি সব মরমীয়া রচনার মতো বাউলগানও সাধারণত রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত। সে-রূপক দেহাধার, বাহ্যবস্তু ও ব্যবহারিক জীবনের নানা কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে গৃহীত। কারণ All creation-wonders excite the cry of Love. (রুমী)

বলেছি, ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত—যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। একসময়ে এই নামপন্থ এবং সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো সম্প্রদায়ের লোক একসময়ে ইসলামে ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস সংস্কার বর্জন সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেই এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে। তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব। বাউলেরা অশিক্ষিত। এজন্যেই তাদের কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই। এবং তাদের মতবাদের কালিক কিংবা দার্শনিক পরিচয় তারা দিতে পারে না। সমাজের অজ্ঞ ও গরিব লোকের মধ্যেই এ সাধনা আবদ্ধ বলে বাউলমত শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধা পায়নি, সেজন্যে পণ্ডিতের আলোচনার বিষয়ও হয়নি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের ঔৎসুক্য জাগান।

গুণী ও মরমী হয়েও বাউলেরা সমাজে উপেক্ষিত। বাউল সম্প্রদায়ে জাতি ও শ্রেণী-বৈষম্য নেই। হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই। হিন্দু গুরুর মুসলিম-শিষ্য, মুসলিম গুরুর হিন্দু-সাগরেদ গ্রহণে কোনো দ্বিধা-বাধা নেই। তাই বাউল "মনাই শেখের শিষ্য কালাচাঁদ মিস্ত্রি, তাঁহার শিষ্য হারাই নমশূদ্র, তাঁহার শিষ্য দীনু জাতিতে নট, তাঁহার শিষ্য ঈশান যুগী, তাঁহার শিষ্য মদন। নিত্য নাথের শিষ্য বলা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য বিশা ভূঁইমালী, তাঁহার শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য মাধা পটিয়াল বা কাপালী, তাঁহার শিষ্য গঙ্গারাম। গঙ্গারাম ও মদন দুই বন্ধু ছিলেন। গঙ্গারামের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন।"[১]

অনার্য-অধ্যুষিত বাঙলা দেশে জনগণ চিরকাল অত্যধিক ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতা বা হৃদয়োচ্ছ্বাস থেকেই বাঙালির গীতিকবিতার উদ্ভব। বাঙলা কেবল ধানের দেশ নয়, গানের দেশও। এখানকার মাটির ফসল ধান, মনের ফসল গান। শুধু বন্যাতেই দেশ প্লাবিত হয় না, গানেও হৃদয় প্লাবিত থাকে। লাল কাঁকরের পশ্চিমবঙ্গ শুষ্ক উত্তরবঙ্গ ও নদীবহুল পূর্ববঙ্গ-বাসীর দৃষ্টি চিরকাল আকাশের দিকে। শ্যামল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা জানায়, তেমনি প্রকৃতির নিদারুণ রুক্ষতায় কিংবা বিরূপতায় উর্ধ্বে দুচোখ তুলে ফরিয়াদও জানায়। মমতায় আঁকড়ে ধরা নয়, চরম ঔদাস্যে মোহ -মুষ্টি শিথিল করাই এদের জীবনাদর্শ। তাই চর্যাপদের দেশেই বৈষ্ণব-বাউলের উদ্ভব। মূলত সবগুলিই এক। প্রকাশভঙ্গিই ভিন্ন। সিদ্ধ-সূফী-যোগী-বৈষ্ণবেরা যেমন গুরুবাদী, বাউলেরাও তাই। বাঙালির স্বভাবেই রয়েছে মরমীয়াবাদ।

AMARBOI.COM

এই ভাবপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়ে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রহস্যময় মানবজীবন সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে সেই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে বাঙালি কেবল কালে কালে ঘরছাড়া হয়নি আত্মহারাও হয়েছে। সেইজন্যে এদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম লৌকিক দেবতার কাছে হার মেনেছে।

তাই স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শরিয়তী ইসলামের নিষেধের বেড়া ভেঙে, জগৎ ও জীবনের রহস্যসন্ধানী বাঙালি নিজের মনের মতো পথ তৈরি করে নিয়েছে

এজন্যেই এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান একগুরুর দীক্ষা নিয়ে মনে মনে এক হতে পেরেছে। স্রষ্টার একটা সর্বজনীন রূপ দেওয়ার জন্যেই বাউলেরা 'অনামক অলখসাঁই'র সন্ধানী। এজন্যেই তারা সহজে বলতে পারে :

কালী কৃষ্ণ গড খোদা
কোনো নামে নাহি বাধা
মন, কালী কৃষ্ণ গড খোদা বলো রে।

৬

পথের পার্থক্য মতের অনৈক্য এবং সাধন পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাউল, বৈষ্ণব ও সূফীর মধ্যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও পরিণামগত মিল বর্তমান। তাই একের বাণীতে অপরের মনের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এক চরম ক্ষণে দেহাধারস্থিত আত্মায় পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তখন পরমকে

---

১ বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধির আনন্দে সবাই একই সুরে বলে 'আনল হক' কিংবা 'সোহম'। এই অদ্বৈতসিদ্ধি আমরা বাউলে বৈষ্ণবে সূফীতে প্রত্যক্ষ করি। রাগাত্মিকা ভক্তিতে শুনি 'মুই সেই' সূফীরাও বলেন 'আনল হক' বাউলও বলেন 'দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়'। বাউল যেমন বলেন—

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন।

অথবা

ক্ষেপা তুই না-জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়।
আপন ঘর না-বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়
আমি যেরূপ, দেখ্‌না সেরূপ দীন দয়াল।

কিংবা

ডুবে দেখ দেখি মন—তারে—কিরূপ লীলাময়
যারে আকাশ পাতাল খোঁজ এই দেহে তিনি রয়।
লামে আলিফ লুকায় যেমন মানুষে সাঁই আছে তেমন।
তা না হলে কি সব নূরের তন
আদম তনকে সেজদা জানায়।

অথবা,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

বা

কারে বলব কেবা করে বা প্রত্যয়—
আছে এ মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।
আত্মা আর পরমাত্মা ভিন্ন ভেদ জেনো না।
এই মানুষে রঙ্গে রসে বিরাজ করেন সাঁই আমার (পাঞ্জু)

কেননা রুমীও বলেন :

I gaged into my own heart, there I saw Him. He was nowhere else.

কিংবা ,

I, All in All becoming
Now clear see God in All
Ends up from union yearning
take flight the cry of Love.

রবীন্দ্রনাথও বলেন :

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(আমি) তাই হেরি তায় সকল খানে
—ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে আমার বুকে
ওরে দেখরে আমার দু' নয়নে।

কিংবা

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিল দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাইনি।

অথবা,

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জানারই সাথে সাথে তোমায় চেনা।

এমনি বোধেরই গাঢ়তায় জীবাত্মা-পরমাত্মার ব্যবধান ঘুচে যায়। ইরানের সূফীমত ও ভারতের বেদান্ততত্ত্ব বাঙলার মাটিতে বাউল বাণীতে প্রত্যক্ষ বিরাজ করে। সূফী বৈষ্ণবদের মতো গানের মাধ্যমেই বাউলদের সাধন ভজন চলে :

'বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।'

চ

বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই বাউল পদ্ধতি। ইন্দ্রিয় নিরোধ, বিষয় ত্যাগ কিংবা বৈরাগ্য এদের লক্ষ্য নয়। তবু প্রাচীন ভারতিক ঐতিহ্য প্রভাবে মুনি, আজীবক, ভিক্ষু, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতির মতো বাউলেও ভিক্ষাজীবী বৈরাগী আছে। সে হিসেবে বাউল দুই প্রকার: গৃহী ও বৈরাগী। বর্তমানে এরা বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। হযরতী, গোবরাই, পাগল নাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনী, জিকির, ফকির, বাউল, আউল, কর্তভজা, সাঁই, ন্যাড়া, বলরামী, শম্ভুচাঁদী, রামবল্লভী প্রভৃতি নাম থেকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের নাম ও সাধনপন্থার আভাস পাওয়া যায়। এদের সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার ও ধর্ম-দর্শনের কোনো নির্ধারিত ইতিহাস বা শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। তাই এসব মতের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির খবর পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে বাউলেরা প্রায় অশিক্ষিত, তাদের শ্রুতি-স্মৃতির উপর তেমন নির্ভর করা চলে না। বাউল সাধনার মর্মকথা বাউল কবির ভাষায় এরূপ :

সখি গো জন্মমৃত্য যাহার নাই।
তাহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।

এবং —

উপাসনা নাইগো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য —
এ দেহে তার সব মিলে।

AMARBOI.COM

বাউল কবিদের মধ্যে : লালন শাহ, শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ পদ্মলোচন (পোদো) জাদু, দুদ্দু, পাঁচু, চণ্ডী গোঁসাই, রশীদ, হাউড়ে গোঁসাই গোলাম গোঁসাই, চণ্ডীদাস গোঁসাই,ফুলবাসুদ্দিন, ঈশান, বাখেরা শাহ, এরফান শাহ, সৈয়দ শাহ নূর, মিয়া ধন, শীতলাঙ শাহ, আতর চাঁদ, তিনু, শ্রীনাথ, শেখ কিনু প্রভৃতি জনপ্রিয়।

বাউল গানের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় বাউল প্রভাবও কম নয়। তাঁর ভাষাতেই আলোচনা শেষ করছি : "বাউল গান) থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এ মিলনে গান জেগেছে। এ গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলছে। কোরানে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা

মানস প্রয়োজনে ও জৈবধর্মের তাকিদে সঙ্গীত মানবসমাজে স্বতোউদ্ভূত। সে কারণেই কৌম সমাজে art আর ritual অভিন্ন। আদি সমাজে গান কর্মেরই অঙ্গ ছিল—মুখে গান, হাতে কাজ। গানের ছাঁদে হাত চলে, তাই আজো ছাদ নির্মাণে গান অপরিহার্য। এভাবে জীবনকে কলার অনুগত করে কিংবা কলাকে জীবনানুগ করে সাধনার শুরু হয়েছে কবে থেকে তা কেউ বলতে পারে না। তবে জানা অতীতের গোড়ার দিকের কুয়াশার প্রলেপেও যা ঢাকা পড়েনি তা হচ্ছে : কলাশিল্পের ও অধ্যাত্মজীবনবোধের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই চিত্রকলা ভাস্কর্য নৃত্য ও গীতি এমনকি স্থাপত্যও একই উৎসের ইঙ্গিত দেয়। সঙ্গীতের সঙ্গে জীবনের এমনি গভীর যোগ রয়েছে বলেই ইসলামের সুকঠোর নির্দেশও আরবেরা বেশি দিন মেনে চলতে পারেনি। ইসলামের উন্মেষের মাত্র কয়েক বছর পরেই উমাইয়াদের আমল থেকেই সঙ্গীতচর্চা প্রশ্রয় পেতে থাকে।

আরবদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ কেবল গতানুগতিক চর্চায় নিঃশেষ হয়নি, বরং ইরানী, নবেতিক, সিন্ধি, গ্রীক প্রভৃতি সঙ্গীত পদ্ধতির অনুশীলনে ঋদ্ধ ও উন্নত করার প্রয়াসেও অভিব্যক্ত হয়েছে। তফাতের মধ্যে এই : মুখ্যত মানসপ্রবণতাবশে এবং কিছুটা শাস্ত্রীয় প্রভাবে তা কেবল সৌন্দর্যানুশীলন ও আনন্দের উপকরণ রূপেই গৃহীত হয়েছে। আব্বাসীয় পতনযুগে মুসলিম-সঙ্গীতে আবার ধর্মীয় আবেগ যুক্ত হয়েছে। আসলে ইরানী প্রভাবে সূফীমতের প্রসারেই সঙ্গীত হয়ে উঠল বোধন-গীতি, সাধনসঙ্গীত ও ভজন। কেননা আরবে সঙ্গীতচর্চা ইসলামোত্তর যুগে অবাধ ছিল না, তার উপর সৌন্দর্যপিপাসা আনন্দ-অন্বেষা ও স্বপ্নালুতাই ছিল তাদের সাঙ্গীতিক প্রয়াসের মূলে।

এদের লক্ষ্য কখনো সঙ্গীতে অধ্যাত্ম আবেগ সৃষ্টির দিকে ছিল না। "সমস্ত আরব ইতিহাস, তাহার ভাষা ও সামাজিক জীবন সংক্ষেপে যে একটি কথায় বলা চলে, তাহা হইল কল্পনাবিলাস ও খেয়াল। তাহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ললিত কলায় এই কল্পনার যথেষ্ট নির্দশন বিদ্যমান। ইহাদের স্থাপত্য শিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সুদৃঢ় ইমারত অপেক্ষা ইহা জটিল রূপকল্প এবং আলঙ্কারিক নকশামাত্র। ইহাদের চিত্রকলা বর্ণসমাবেশের প্রকাশ এবং ইহা সুসম্বন্ধতাহীন সুর-সৃষ্ট এমন এক কাল্পনিক নকশা যাহাকে কোনো সংজ্ঞায় বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা : শোভা-সৌন্দর্য, সুবৈচিত্র্য এবং অলঙ্করণই হইল ইহার মৌলিক উপাদান। Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে সংকলিত মুসলিম স্থাপত্যাদি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে Berchem (বার্চেম) এই দিকটারই বারবার উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে তিনি বলিয়াছেন 'আরবি য় শিল্পকলা প্রকৃতি নহে, প্রকৃতির স্বপ্ন। ... সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ শিল্পের জন্যই শিল্প হিসাবে আনন্দ ও সৌন্দর্যভোগের উপায় স্বরূপ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় উদ্বেল ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবলম্বনরূপে সঙ্গীতের চর্চা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই ইহার সমগ্রতা, ঔজ্জ্বল্য, ভব্যতা ও শালীনতা লইয়া ইহা বিশিষ্ট।" [১]

অতএব আর্য বলেই হোক কিংবা ভারতিক প্রভাবেই হোক অথবা জোরাস্ট্রীয় মতবাদের সংস্কার বশেই হোক, ইরানে মরমীয়াবাদের পরিণতি কালে সঙ্গীত ও নর্তন সাধন-ভজনের উপায়রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ইরানি মরমীয়াবাদ তথা সূফীমত কোনো ঋজু ও অবিমিশ্র দর্শন-উদ্ভূত নয় ; এটি গ্রীক বৌদ্ধ খ্রীস্টান ইহুদী মানী ও বেদান্তর্দশনের মিশ্রণে এক জটিল ও বহুধা বিভক্ত মতবাদ। ইসলামের মতো বৌদ্ধধর্মেও নাচ-গান বাজনা নিষিদ্ধ ছিল বটে।[২] কিন্তু বৌদ্ধেরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

একই অনিবার্য কারণে তা মেনে চলেনি। ট্রানসকসিয়ানার বৌদ্ধরাই পরবর্তীকালের তুর্কী, পাঠান ও মুঘল মুসলমান। কাজেই তাদের রক্তেও বৌদ্ধগুরুবাদ [৩] ও যোগতান্ত্রিক সংস্কার সুপ্ত ছিল। এদিকে ভারতে কালক্রমে অনার্য যোগ-সাংখ্য-তন্ত্র ও আর্য কর্মবাদ আর জ্ঞানবাদের সংমিশ্রণে যে সর্বেশ্বরবাদমূলক [৪] বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রশ্রয় পেল, তারই পরিণতিকালে ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটে।

যদিও শঙ্কর-দর্শনের প্রভাবেই বৌদ্ধ-উচ্ছেদে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পায়, তবু শঙ্করের জ্ঞানবাদ তথা মায়াবাদ লোকের জীবনচর্যায় ফলত ধর্মাচরণে বিশেষ গৃহীত হয়নি। কাজেই যোগতান্ত্রিক সাধনাই মরমীয়াবাদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শাস্ত্রীয় ধর্মও নানা মিশ্র মতে জটিল এবং আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে বিপুল হয়ে উঠে। বেদান্ত দর্শনের প্রচ্ছায় গড়া এই আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকি কল্পনায় প্রকৃতির স্থান ছিল মুখ্য আর অলৌকিকতার প্রভাব ছিল অসামান্য। এজন্যেই "ভারতীয় কলাশিল্প ধর্মসম্পৃক্ত; ইহা ধর্মের এবং ব্যাপকতর অবস্থায় সমগ্রজীবনের অনুগত। ভারতীয়দিগের নিকট কলাশিল্প সৌন্দর্যানুশীলন অপেক্ষা জীবনকে তাহার সামগ্রিক পূর্ণতায় এবং তাহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্যে উপলব্ধি করার মধ্যেই সমধিক নিহিত। অতলস্পর্শী ব্রহ্মতত্ত্বের রূপায়ণ হইল ভারতীয় ললিতকলার জাগ্রত লক্ষ্য।" [৫]

ইসলাম ও সঙ্গীত *

ইসলাম-পূর্বযুগে অন্য মানুষের মতো আরবেরাও ছিল সঙ্গীতপ্রিয়। আরবি ভাষায় গিনা, মুসিকী (গ্রীক) [৬] এবং সামা (সিরীয়)[৭] —এই তিনটে শব্দ সঙ্গীতবাচক। আরবে পেশাদার গায়িকারা কইনাৎ (Qainat) কিংবা কিয়ান (Qiyan) নামে অভিহিত হত। দেশী গায়িকা ছাড়াও আবিসিনিয়া থেকে অনেক গাইয়ে-মেয়ে আসত। এরা সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল। ইসলাম-পূর্বযুগের সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে আমরা মিযহর (Lute), মি'যাফা (Psalter), কুসাবা (Flute), মিযমার (Reed pipe) এবং ডাফ (Tambourine), সুর, নাকাড়া, তবলা (অতবল) সঞ্জ, জলাজিল প্রভৃতির নাম পাই। মক্কার 'উকায'-এ যে-বার্ষিক মেলা হত তাতে গোটা আরবের গোত্রগুলো জড়ো হত নিজেদের শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে। মুয়াল্লাকাগুলো এখানেই গীত বা আবৃত্ত হত। তখনকার আরবে জাদুকর এবং গণকরাও তাদের পেশা চালাত গানের মাধ্যমেই। হজ উদযাপনের সময়ও গান চলত, তার রেশ রয়েছে তাহলিল ও তালবিয়ায়।[৮] 'আশরিক সবির কয়মা নুঘীর'—এই আয়াত এখনো সুর করেই পড়া হয় মীনায় 'ইফাদা' করবার সময়। [৯] আযানও ইসলাম-পূর্বযুগের প্রথার অনুসরণ। [১০] নারী-পর্দাপ্রথা চালু না-থাকায় রসুলের আমলেও নারীরা উৎসবে-পার্বণে-যুদ্ধে গানে-বাজনায় অংশগ্রহণ করত। ওহুদের যুদ্ধেও নাকি রণগীতি গেয়েছিল নারীরাই। [১১]

দেবতা ও উপদেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্যেও গায়িকার গানই কার্যকর বলে মনে করা হত। এজন্যে তাদের অপর নাম ছিল দজিনা (Dajina) বা মদজিনা (Madjina)। তাই ইসলাম-পূর্বযুগের আরবে নারীর প্রভাব সম্বন্ধে : R.A. Nicholson বলেছেন : 'Wise women inspired the poets to sing and warriors to fight.' [১২]... কাফেলায় কিংবা সরাইখানাতেও গায়িকা পোষা হত।[১৩] আবুল ফারাজ ইসফাহানীর 'কিতাবুল আগানি ইবন', আবদুরব্বিহির (মৃত্যু : ৯৪০ খ্রী.) 'ইকদুল ফরিদ', ভৌগোলিক আল মাসুদীর 'কিতাবুৎ তানবিহ ওয়াল ইশরাক' প্রভৃতি পুরোনো গ্রন্থে এবং কোরআনে-হাদিসে নানা প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত গায়কের নাম আমরা জানতে পাই। নজর বিন হাবিস[১৪], মালিক বিন যোবায়ের[১৫], হরায়রা [১৬], খুলায়দা[১৭], বিলাল হাবসী [১৮], শিরিন, সারা, কুরায়ানা, কুরিল্লা, আমর, হামজা প্রভৃতি।

---

* এই অংশটুকুর উপকরণ ডক্টর মাখন লাল রায় চৌধুরীর Music in islam : JASB—Letters & science 1957 থেকেই বিশেষভাবে সংগৃহীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ইসলাম-পূর্বযুগের আরবে উৎসবে-পার্বণে-হজে, অনাবৃষ্টি-অজন্মায়-দুর্ভিক্ষে, দেবতার আবাহনে, যুদ্ধে, জাদুতে ও ভাগ্যগণনায় গানের প্রয়োগ দেখেছি। তাছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের উপকরণ হিসেবে শুঁড়িখানায়, সরাইতে ও কাফেলায় পেশাদার গায়িকা পোষার রীতিও ছিল অবাধ। এসব গায়িকার সবাই আরব ছিল না ; আবিসিনিয়া, গ্রীস ও ইরান থেকেও আসত।[১৯] এমনকি রসুলের আমলের যুদ্ধে ড্রামবাদক ছিলেন একজন ভারতীয়, তার নাম বাবা Sawandik।[২০]

এতে বোঝা যায় আরবেরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। কাজেই ইসলামোত্তর যুগে সঙ্গীত-বিমুখ হওয়া তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনার মতোই দুষ্কর ঠেকেছিল। ফলে প্রবৃত্তির প্রতিকূল সংগ্রামে তারাও বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি। অবশ্যম্ভাবীরূপে শুরু হল খোঁজাখুঁজি ও ব্যাখ্যা-নিরীক্ষা কোরআন-হাদিসের সমর্থন লাভের আশায়। এবং অভীষ্ট ফল লাভে দেরি হল না।

কোরআন থেকেই সঙ্গীতে আনা আয়াতের অনুমোদন বা অনুমোদনের আভাস ইঙ্গিত বের করা হল :

ক. নিশ্চয়ই গাধার ডাকই সবচেয়ে ঘৃণ্য স্বর।[২১]

খ. তিনি ইচ্ছেমতো তাঁর সৃষ্টিতে বৃদ্ধি করেন সুন্দর স্বর।[২২]

গ. এবং কোরআন আকর্ষণীয় করে পড়ো।[২৩]

এমনি আরে অনেক আয়াত থেকে পরোক্ষ ইঙ্গিত[২৪] সংগ্রহ করে সঙ্গীতের সমর্থনে ভাষ্য তৈরি হয়েছে। আবার একই পদ্ধতিতে সঙ্গীতবিরোধী তথ্যও উদ্ধার করেছে সঙ্গীতবিমুখ গোঁড়ারা।

হাদিস থেকেও পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে প্রচুর। এতে কেবল বিতর্ক বিস্তৃত ও জটিলই হয়েছে; সবার পক্ষে গ্রহণীয় কোনো মীমাংসা মেলেনি।

হাদিসে সঙ্গীতের সমর্থন

ক. যারা দাউদের সুকণ্ঠ শুনতে ইচ্ছে করে, তারা আবু মুসা আল আশারীর কণ্ঠ শুনুক।

খ. রসুল স্বয়ং শ্লোক বা পদবন্ধ রচনা করে গীতিসুরে আবৃত্তি করেছেন :

১। ইন আন্তা ইল্লা অসবুউ দুমিতি
ওয়া ফি সবিলিল্লাহি মা লকিতি।
(হে রক্তপূর্ণ আঙুল, তুমি আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছ)।

২। আতাইনাকুম আতাইনাকুম
ফাহাইয়ানা ওয়া হাইয়াকুম।
(আমি তোমাদের কাছে এসেছি, এসেছি,
আল্লাহ আমাকে এবং তোমাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন)

রসুলের ওফাতে শোকাভিভূতা কন্যা ফাতেমাও পদ রচনা করে বিলাপ করেছিলেন:

৩। সব্বত আলাইয়া মসা'ইবু লউ ইন্নাহা
সব্বত অলালাইয়ামি শররফা লাইয়াহিয়া।
আমার উপর বিপদপাত হয়েছে। যদি তা দিবালোকের উপর পড়ত, তা হলে তা রাত্রি হয়ে যেত।

গ. হযরত আয়েশা বলেছেন : রসুলের উপস্থিতিতে তাঁর সাহাবীরা পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতেন। রসুল মৃদু হাসতেন।[২৫]

ঘ. আমর বিন আশ্‌শারীয়া বলেছেন : আমি রসুলের সামনে উমাইয়া বিন আবিল সাল্‌তের শতেক শ্লোক ((verse) সবই আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। রসুল বলছিলেন, আবৃত্তি করতে থাকো' এবং মন্তব্য করেছিলেন 'উমাইয়া তাঁর কবিতার ভাবে প্রায় মুসলিম হয়ে গেছে'।[২৬]

ঙ. আয়েশা রসুলের আর এক উক্তি উল্লেখ করেছেন : তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও, এতে তাদের জবান মিষ্টি হবে।[২৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. 'তিরমিজী'তে বর্ণিত আছে : রসুল এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে এক মহিলা ডফ (ডাফ) বাজিয়ে গান গেয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করতে চাইলে তিনি অনুমতি দেন।

ছ. তবরানি (Tabarani) তাঁর 'মজমি কবির'-এ বর্ণনা করেছেন : একদিন রসুল নিজেই আয়েশায় কাছে এক গায়িকা এনে হাজির করেন এবং আয়েশার অভিপ্রায়-ক্রমে সে গান গাইল, রসুল শুনে (মুগ্ধ হয়ে) মন্তব্য করলেন : নিশ্চয়ই শয়তান (মিষ্টিস্বরের অধিকারী) তার নাসারন্ধ্র দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। [কদ্ নফখাশ শয়তানু মেন খারাইয়া।]

জ. আয়েশা এক ঈদের দিনে এক আনসার মেয়ের গান শুনছিলেন, রসুল তখন বিছানায় শায়িত ছিলেন। আবু বকর এসে গান-বাজনা হচ্ছে দেখে আয়েশাকে তিরস্কার করে বললেন : শয়তানের যন্ত্র বাজছে রসুলের ঘরে ! রসুল বললেন : তাকে করতে (শুনতে) দাও আবুবকর, আজ ঈদের দিন। [২৮] [আবু বকর: মিযমারুশ শয়তানি ফি বায়ত-ই-রসুলিল্লাহ্। রসুল : দাহুন্না ইয়া আবুবকর, ফা ইন্নাহা আইয়ামু ঈদ।]

ঝ. আয়েশা একবার এক এতিম মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ের উপহার সামগ্রীর সঙ্গে গায়কও পাঠানো হয়েছিল, রসুলের সম্মতিক্রমে এবং রসুল নিজেও এ উপলক্ষে একটি গান রচনা করেছিলেন :

আনা নবীউ লা কন্বিব
আনা ইব্‌ন আবদ-ইল মুত্তালিব। [২৯]

ঞ. একবার রসুলের উপস্থিতিতে আয়েশাকে কয়েকটি গায়িকা ডফ বাজিয়ে গীত শুনাচ্ছিল, উমর এসে বললেন, 'সঙ্গীত হচ্ছে শয়তানের বিদ্যা অতএব হারাম।' রসুল ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। তারপর থেকে উমরও সঙ্গীত উপভোগ করতেন। [৩০]

ট. আব্বাস ইবন মালিক বলেছেন : রসুল 'হুদা' (কাফেলা চলাকালীন গান-উটগীতি) শুনতেন। এবং আয়েশা স্বয়ং মেয়েদের জন্যে এবং আনাসের ভাই 'বারা-ইব্‌ন মালিক' পুরুষদের জন্যে 'হুদা' গাইতেন। [৩১]

ঠ. রসুল আবিসিনিয়াবাসীদের বলেছিলেন : আরফাদ গোত্রের সন্তানেরা, তোমাদের অনুষ্ঠান (গান-বাজনার Performance Acrobatic) চালিয়ে যাও। [দুনাকুম ইয়া বনি আরফাদা ববাজি-মাশুগুল বাশিদ্।] [৩২]

ড. আবিসিনীয়গণের (জঙ্গীদের) ক্রীড়া ছিলো নাচ-গান। [বাজি-ই-জঙ্গীয়ান—রক্স ওয়া সুরূদ বুদা।] [৩৩]

ঢ. আল্লাহ্ মিষ্টি কণ্ঠস্বর বঞ্চিত কোনো নবী পাঠাননি। [মা বাসাল্লাহু নবীয়ান ইল্লা হস্‌ন আসসওত্।]

ণ. মিষ্টিস্বরে কোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। [জাইয়িনুল কোরআন বি অসওয়াতিকুম।]

ত. আল্লাহ্ নবীদের মিষ্টিসুর যেভাবে অনুমোদন করেছেন, এমনটি আর কিছুই করেননি। [মা আজান আল্লাহুতা'য়ালা লিশায়িন কমা আজানা আন নবীয়িতন হস্‌ন অসসওত।]

খলিফাদের মধ্যে হযরত আবুবকর সঙ্গীত নিষিদ্ধ মনে করতেন। [৩৪] হযরত উমরও সঙ্গীতবিরোধী ছিলেন, তবে শেষের দিকে তিনি আর তেমন রুষ্ট হতেন না। [৩৫]

হযরত উসমান গান শুনতেন। নিজে গাওয়া গর্হিত মনে করতেন। তাঁর প্রিয় গায়কের নাম ছিলো আবু সাজ্জাদ। [৩৬] হযরত আলি নিজে কবি ছিলেন এবং ললিত কলার সমাদর করতেন। কিন্তু তিনি পেশাদার গায়িকাদের ঘৃণা করতেন। [৩৭]

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে খলিফারাও সঙ্গীত বৈধ বলে মনে করতেন না। আরবদের বিশ্বাস শয়তান বড় শিল্পী। ভারতে যেমন সঙ্গীতাদি শিবপ্রোক্ত বলে ধারণা, তেমনি শিল্প শয়তান-উদ্ভাবিত বলেই আরবদের বিশ্বাস। রসুলের উক্তিতেও এই শয়তানের কথা আছে। [৩৮]

বিশেষ করে ইসলাম-পূর্ব আরবে মদ, নারী ও সঙ্গীত নিয়েই জনগণ মত্ত থাকত, ইসলামের সংগ্রাম ছিল এসব অনাচারের বিরুদ্ধে। কাজেই যৌন-আবেদনমূলক সঙ্গীত ও পেশাদার গায়িকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। তাই কোরআনে, হাদিসে ও ফেকায় সঙ্গীতের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি কবি ও গায়কের সততায় ও সত্যবাদিতায় অবিশ্বাস করার স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে :

ক. বিপথগামীরাই কবির অনুসরণ করে। [আশু-অরাউ ইবাত্তাবি-উহুমুল গা'উন।][৩৯]

খ. [ওয়া মিনান্নাস-ই-মাই ইয়াশ্‌তারি লাহ্‌ওয়াল হ্‌দিসি লি য়ুদিল্লা' আন সবিলিল্লাহ্‌।][৪০]

গ. রসুল বলেছেন : [ইহ্‌জারুল গিনা ফাইন্নাহু মিন ফি, লি ইব্লিস ওয়া হুয়া শিরকুন ইনদাল্লাহি তা য়ালা'ওয়ালা তাগান্নি ইল্লি শয়তান।][৪১] : সঙ্গীত থেকে আত্মরক্ষা কর। এটি ইব্লিসের লক্ষণ; এটি শির্‌ক। শয়তান ছাড়া কেউ গান গায় না।

ঘ. গায়ক ও শ্রোতা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। [লা আনল্লাহ্‌ অল মুগান্নিআতা ওয়াল মুগান্না লাহু। [৪২]

ঙ. রসুল গান করা ও শোনা নিষিদ্ধ করেছেন। [আনিল গিনা-ই-ওয়াল ইসতিমা-ই-আনিল গিনা।][৪৩]

সব প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে আরব-মনের সাঙ্গীতিক প্রস্রবণ ক্ষীণধারায় ৬৬১ খ্রীস্টাব্দ অবধি বইতে থাকে। তারপর খলিফা মুয়াইয়া (মাবিয়া) যখন শাসনাধিকার পেলেন, তখন থেকে আরব-সমাজে সাঙ্গীতিক প্রবণতা বাড়তে থাকে। কেননা, মুয়াইয়া নিজে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং স্বয়ং গায়িকা পুষতেন।[৪৪] তবু সাহাবী ও ইমামদের মধ্যে সঙ্গীত ব্যাপারে কখনো মতদ্বৈধতা ঘোচেনি। স্থান, কাল, প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী কেউ বলেছেন 'যায়েজ', কেউ করেছেন নিষেধ।

ইমাম আবু হানিফা যন্ত্রসহযোগে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন।[৪৫] কিন্তু ইমাম আবু হানিফা গান শুনতেন। ৪৬ ইমাম মালিকও গান উপভোগ করেছেন।[৪৭] ইমাম শাফী তাঁর 'কিতাবুল উলুম'-এ সঙ্গীতকে সমর্থন করেছেন। গাজ্জালী তাঁর 'কিমিয়া-ই-সা'দৎ-এ 'কিতাবুল উলুম' সম্বন্ধে মন্তব্যসূত্রে বলেছেন যে শাফী সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন। ইউনুস-বিন-আবদুল আলা একবার সঙ্গীত সম্বন্ধে ইমাম শাফীকে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে শাফী বলেন : হেজাজে আমি কাউকে সঙ্গীতবিরোধী দেখিনি।[৪৮]

AMARBOI.COM

ইমাম আহমদ-বিন্‌ হাম্বলের দুই পুত্রের উক্তিতে প্রকাশ, তিনি সঙ্গীত উপভোগ করতেন। নির্দোষ ও মহৎভাবের গানের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন না। [৪৯] মোল্লা আলি কারী হানাফী বলেন : চার ইমাম ও মুজতাহিদগণ সঙ্গীত উপভোগ করতেন। [৫০]

আসলে কোনো ইমামই সঙ্গীতকে যায়েজ বলেননি। বিশেষ অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে কখনো কখনো তাঁদের সঙ্গীত শুনতে বা অনুমোদন করতে দেখা গেছে মাত্র। কিন্তু তাঁরা স্পষ্ট মত দিয়েছেন সঙ্গীতের বিরুদ্ধে। সঙ্গীত হৃদয়ে মন্দভাব জাগিয়ে তোলে, এ-ই হচ্ছে সাধারণ ধারণা। অতএব সঙ্গীত ফাসেকী। যাঁরা চরিত্র ও সাধনা বলে বলীয়ান; কেবল তাঁদের পক্ষেই সঙ্গীতচর্চা বৈধ হতে পারে। রসুল বলেছেন : সঙ্গীত হৃদয়ে উত্তেজনা আনে, যেমন জল (জলের স্পর্শে মাটির বুকে) ঘাস জন্মায়। [৫১] এই মত সাধারণভাবে খলিফা, সাহাবী, তাবিন ও ইমাম সবাই পোষণ করতেন। কাজেই গীত গওনে-শ্রবণে অধিকারী ভেদ আছে।[৫২] সুকণ্ঠ গায়ক যে সুরের জাদুকর এবং মহৎভাবের সঞ্চারক, সে তত্ত্ব দাউদ নবীর কাহিনীর মধ্যে রয়েছে। তখন গান ফাসেকী নয়—সাদেকী। অবশ্য Fakihani [ফাকিহানী] বলেন, "আমি কোরআনে, হাদিসে কিংবা রসুলের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে তথা স্পষ্টভাবে সঙ্গীতবিরোধী কিছু পাইনি।" [৫৩]

গায়িকার প্রতি রসুল, খলিফা, সাহাবী, তাবিন, ইমাম প্রভৃতি সবাই ছিলেন বিরূপ। শিয়ারাও সঙ্গীতবিরোধী।

দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মৌলানা উপরোক্ত পরোক্ষ উক্তির ও তথ্যের প্রমাণে সঙ্গীত যায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম জাফর সাদিক, শেখ আবু এজিদ বিস্তামী, শেখ ইবনুল আরাবী, নুর কুতব-ই-আলম পাণ্ডুবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌, শাহ রফিউদ্দিন, ইব্রাহিম সাদ জহিরী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আবু তালিব মক্কী, আবদুল হক দেহলবী, মৌলনা মুহম্মদ শাহ্ আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ প্রাচীন ও নবীন অনেক সাধক ও আল্লামা সঙ্গীতকে বৈধ বলেছেন।

নক্শবন্দিয়া ছাড়া আর সব মতের সূফীরাই সঙ্গীতকে সাধনার মাধ্যম করে নিয়েছেন।

বলেছি, শেখ আহমদ মুজাদ্দাদী নক্শবন্দী ছাড়া অন্যান্য প্রধান সূফীদের সবাই সাধনায় সঙ্গীতের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। অবশ্য কাদিরিয়া ও শাত্তারিয়া সম্প্রদায় সঙ্গীতচর্চায় শর্তারোপ করেছে। আবু নসর সারাজ, ইমাম গাজ্জালী, শেখ আলি বিন উসমান হুজুইরী(কাশফ উল-মাহজুব লেখক, এটি ফারসি ভাষায় সূফীতত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ), ফরিদউদ্দীন আত্তার, শিহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী, খওয়াজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া, জালালউদ্দিন রুমী প্রমুখ সঙ্গীতকে সাধনার অবলম্বন করেছিলেন। [৫৪]

২

সূফীরা প্রেমধর্মে বিশ্বাসী। 'কিতাব-উল-লুম্মায়' আবু নসর সারাজ এবং 'এহিয়া-উল-উলুম' ও 'কিমিয়া-ই সা'দত' গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম গাজ্জালী সঙ্গীতের তাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আচারবাদীদের কাছে যা গর্হিত, মরমীয়াদের কাছে তা-ই কাম্য। এখানেই যাহের ও বাতেনের পার্থক্য। অতএব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সঙ্গীতে মানব-মনের একটি মহত্তর প্রকাশ স্বীকৃত হয়।

গাজ্জালীর মতে (কিমিয়া) সঙ্গীত হচ্ছে পাষাণে নিহিত সুপ্ত আগুনের মতো। ঘর্ষণে শিলা থেকে যেমন আগুন বের হয়, এবং তা গোটা অরণ্য দগ্ধ করে, তেমনি সঙ্গীতের স্পর্শে আত্মার আগুন জ্বলে উঠে। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ ও রূপবান হয়, তেমনি হৃদয়কে সঙ্গীতের আগুন মুকুরে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় জগতের সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের রূপভেদে তাত্ত্বিক নাম: জমাল, হুসন ও তনাসুব। সঙ্গীত সৌন্দর্যকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়। তাঁর মতে নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচাতে পারে না। সে সঙ্গী খোঁজে। যাকে ভালোবাসে তাকেই সে পেতে চায় সঙ্গীরূপে। কাজেই প্রেম বা মহব্বত করার জন্যে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যাঁকে পেলে আর কিছুই পাবার থাকে না, একের মধ্যে সবকিছুই মেলে, সব অভাব মেটে ; তাঁর সঙ্গেই তো প্রেম করা, তাঁকেই সাথী হিসেবে পাওয়ার কামনা করা উচিত। বিশেষ করে, আল্লাহও মানুষের প্রেমকামী :

ক. আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে। [৫৫]

খ. আল্লাহপ্রেম, পিতামাতা, সন্তান ও ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে বেশি। [৫৬]

গ. রসুলও বলেন : যে তার আর সব সম্পদের চেয়ে বেশি করে আল্লাহ ও রসুলকে ভালোবাসতে না পারে, সে ধার্মিক নয়।

শরীয়তপন্থীদের মতো সূফীরাও সঙ্গীতে অধিকারী-ভেদ মানে। [৫৬ক] তাই আবু নসর সারাজ যোগ্যতানুসারে শ্রোতারা তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

ক. মুবতদী ও মুরীদ (Beginners and disciples) .

খ. মুতওয়াসসিত্ ও সিদ্দিকী (Advanced and Purists).

গ. আরেফিন (Mystics).

জুনাইদ বাগদাদীও স্থান (Makan), কাল (Zaman) ও পাত্র বা সঙ্গকে (Akhwan) [৫৬খ] সঙ্গীত শ্রবণের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। হুজুইরীরও এই মত। তিনিও আমাদের জন্যে নয়,অধ্যাত্মচিন্তা উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে গীত বা শ্রুত সঙ্গীতই বৈধ বা বাঞ্ছনীয় বলেছেন।

যদিও হযরত আয়েশা প্রমুখের দোহাই ও নজির দিয়ে সঙ্গীতকে বৈধ করে নেবার প্রয়াস ইসলামের উন্মেষ-যুগ থেকেই শুরু হয়েছে, তবু বৈধ বলার চেয়ে অবৈধ বলার পক্ষে তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি যে বেশি, তা কেউ সহজে অস্বীকার করে না। আয়েশা-সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় : ঈদের দিনে, বিবাহোৎসবে এবং অন্যদিনে নির্দোষ সঙ্গীত গীত ও শ্রুত হতে পারে। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাত্মসাধনার বাহন হিসেবে সঙ্গীতের উপযোগে আন্তরিক বিশ্বাস রেখে কেউ যদি সঙ্গীতচর্চা করে কিংবা সঙ্গীতকে চর্যা হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার পক্ষে সঙ্গীত অবৈধ হতে পারে না। এমনি সব বিশ্লেষণ ও বিবেচনার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজে সঙ্গীত বৈধ হয়েছে।

অবশ্য পাপ বলে জেনেও যেমন মানুষ লোভের বশে আর দশটা অপকর্ম করে, মুসলমানেরাও তেমনি মানুষ হিসেবে ফাসেকী জেনেও সঙ্গীতকে পরিহার করতে পারেনি। শোনা যায়, বাদশাহ কুতবউদ্দিন আইবেক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; ফলে তাঁর আমলে রাজ্যের জনগণও সঙ্গীতানুরাগী হয়ে উঠে। ইলতুতমিসের সময় গোঁড়া মুসলিমরা রাজকীয় হুকুমে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেয়ার জন্যে ইলতুতমিসকে অনুরোধ করে। ইলতুতমিস কুতবউদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবশে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করাই স্থির করলেন। ফলে মুসলিম শাসনের গোড়া থেকেই ভারতে সঙ্গীত মুসলিম-সমাজে প্রশ্রয় পায়।[৫৭]

পাক-ভারতে চিশ্তিয়ারাই মনেপ্রাণে সঙ্গীতকে সাধন-ভজন ও বোধনের মাধ্যম করেছিলেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪২-১২৩৮) সুলতান মুহম্মদ ঘোরীর বাহিনীর সঙ্গে তিনি ১১৯২ সনে ভারতে আসেন এবং হিন্দুতীর্থ পুষ্করের কাছে আজমীরে খানকা তৈরী করেন।

৩

ভারতের এক বৃহত্তর অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরভারতে এই চিশতিয়ারাই ইসলাম প্রচার করে। ইসলামের আলোদানকারী বলে তাঁদের প্রধানরা চেরাগী বলে অভিহিত হন। এঁদের মধ্যে কুতবউদ্দিন দেহলবী, ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জী, জালালুদ্দীন পানিপথী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া বলখী (প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন আহমদ বিন দাখিয়াল অল বোখারী), মুহম্মদ সাদিক গুনগুবী ও শেখ সলিম ফতেপুরীর মাহাত্ম্য আজো অম্লান। আমীর খুসরুও বুজুর্গ বলে খ্যাত। এরা সবাই সঙ্গীতকে সাধনার অবলম্বন করেছিলেন। এবং এঁরা হিন্দুদেরও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। 'পঞ্চপঞ্জ চিশ্তিয়া' গ্রন্থে সঙ্গীতানুরাগ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে এঁদের ধারণার আলোচনা রয়েছে। শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী বলতেন—যারা সঙ্গীতের বিরোধিতা করে তারা রসুলের ও সাহাবীদের জীবন ও আচার সম্বন্ধে অজ্ঞ। তিনি তাঁর সন্তানকে সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহিত করতেন।[৫৮]

য়া বুনাইয়া লা তন্‌কিজ-ইস্ সামা
ফা ইন্নাহা লাহ্‌ওয়া ওয়ালা ইব।

[বৎস, সঙ্গীত পরিহার করো না, বহু মহাপুরুষ তা চর্চা করেছেন]

সূফীদের মতে সঙ্গীত অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধি ত্বরান্বিত করে।[৫৯] ইবনুল ফরিদ বলেন : সঙ্গীতের মূর্ছনার মধ্যে আমি আমার দয়িতকে (আল্লাহকে) সমগ্র সত্তা দিয়ে দেখি।[৬০]

আবুল কাসিম অল বঘবী (Baghwi) বলেন : সঙ্গীত আত্মার (spirit) খাদ্য। আত্মা যখন খাদ্য পায়, তখন দেহের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়।[৬১]

জালালুদ্দিন রুমীও বলেন, 'আগার আজ বুর্জি মানা-ই বুয়াদ সাইর-ই-উ ফিরিশতাহ্ ফিরু মানাদ আজ তায়র-ই-উ।[৬২]

(If the musician soars up to pinnacle of ecstasy, the angel cannot follow in pursuit of him,)

চিশ্তিয়া সোহরওয়ার্দিয়া, কলন্দরিয়া, মদারিয়া, কাদিরিয়া এবং মখদুমিয়া সূফীদের দান বাঙলাদেশে ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ। আশরাফ জাহাঁগীর তাঁর একটি চিঠিতে সগর্বে লিখেছেন :

In the blessed land of Bangal, there is hardly a village or town where a muslim Sufi is not to be found and the innumerable graves of the muslim mystics which dot the country are a silent testimony to their self-denying devotion to their ideal.[৬৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালালউদ্দিন তাবরেজী সম্বন্ধে Siyar-ul-Arifin (p ১৭১) গ্রন্থে আছে ঃ

> Shaikhul Mashaikh Jalaluddin Tabrezi went to Bengal. All the people of that (place) turned towards him and became his disciples. The Shaikh established a khanqah there and started a free Kitchen...etc.

চিশতি সূফীদের মধ্যে সিরাজুদ্দিন উসমান ওর্ফে আখি সিরাজ তাঁর সাগরেদ আলাউল হক, আলাউল-পুত্র নূর-কুতুব-ই-আলম, তাঁর শিষ্য শেখ হেসামুদ্দিন মানিকপুরী (কারা মানিকপুরের) বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। নূর-কুতুব-ই-আলমের 'ওয়াহাদাৎ-উল ওজুদ' বিষয়ক পত্রের আলোকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণব ধর্মের বিশ্লেষণ করলে এতে সূফী প্রভাবের আভাস পাওয়া যাবে।[৬৪]

শরীয়তী ইসলাম আর পাক-ভারতে সূফী দরবেশ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম এক নয়। কাজেই সূফী-দীক্ষিত মুসলমানেরা পাক-ভারতে অবাধে সঙ্গীতচর্চার সুযোগ পায়। বিশেষ করে চিশতিয়া খান্দানে তো সঙ্গীতের মাধ্যমেই সাধন-ভজন শুরু হয়। পরে কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রায় সব মরমীয়া সম্প্রদায়েই সামা, হাল্‌কা ও দারা সাধনার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। সিন্ধুর লতীফ শাহ, পাঞ্জাবের বুলে শাহ, আজমীরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, দিল্লীর নিযামউদ্দিন আউলিয়া, আমীর খুসরু এবং সুফী শেখ বাহাউদ্দিন, শের মোহাম্মদ ও মিয়া দলু, সাচল, বেদিল, রোহল, কুতব, য়্যারী, দরিয়া থেকে বাঙলার লালনশাহ ও আহমদুল্লাহ শাহ প্রভৃতি সবাই সঙ্গীতকে সাধনার উপায় রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দরগায় আজো সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। কাজেই পাক-ভারতে মুসলমানদের সঙ্গীতচর্চা কলা-বিলাস মাত্র নয়, জীবনচর্যার তথা ধর্মাচরণের বাহন। এভাবে সঙ্গীত সমাজে নতুন মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। কেবল তা-ই নয়, কবীর, দাদু, রজব প্রমুখ দেশী মরমীয়ারাও সঙ্গীতকেই প্রচারের ও ভজনের বাহন করেছেন। আদি সূফী দরবেশদের মধ্যে কেবল খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, কিংবা বাহাউদ্দীন জাকারিয়া কোরায়শী মুলতানীই যে সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীত সাধক ছিলেন, তা নয়, আরো অনেক বিখ্যাত দরবেশ ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য সঙ্গীতানুশীলন জনপ্রিয় করে তোলেন। হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রাগ-রাগিণীরও স্রষ্টা।[৬৫]

কবীর যেমন সূফী ও ভারতিক মরমীয়া ধারার সমন্বয় সাধক[৬৬]; তেমনি আমীর খুসরুই মুসলিম (আরব্য-পারসিক তুর্কী) ও ভারতিক সঙ্গীতের মিশ্রধারার আদি প্রবর্তক।[৬৭] এখন থেকেই শুরু হল পাক-ভারতে সঙ্গীতের সোনার যুগ।

আগেই বলেছি, ইসলামের উদ্ভবের মাত্র কয়েক বছর পরেই উম্মাইয়াদের আমলে মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। অবশ্য ইসলামেও স্বর-মাধুর্যে মর্যাদা আরোপিত হয়েছে। নামাজে শিরিন-সুরে কেরাত পড়ার সামর্থ্য ইমামের অন্যতম যোগ্যতা বলে স্বীকৃত। কিন্তু তবু গোঁড়া শরীয়তী কোনোকালেই সঙ্গীতকে সুনজরে দেখেনি। তা সত্ত্বেও এর সর্বগ্রাসী মায়াবী প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। তাই গোঁড়া মুসলিম সুলতান সিকান্দার লোদী কিংবা নিষ্ঠাবান গোঁড়া শরীয়তপন্থী সম্রাট আওরঙজীবও প্রথম জীবনে সঙ্গীতবিমুখ হতে পারেননি। পরে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শাফী মজাহাবী হয়ে আওরঙজীব সঙ্গীতবিরোধী হলেন।[৬৮]

৪

বাঙালি মুসলমানেরাও যে সঙ্গীতকে অপার্থিব উৎকণ্ঠার তথা অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন করেছিলেন, তা চিশ্‌তিয়া, কাদিরিয়া, কলন্দরিয়া প্রভাবের প্রমাণ ছাড়াও, আঠারো শতকের কবি আলি রজাব জবানীতে পাচ্ছি :

আলি হোন্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহ সব শান্ত হৈতে মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
সর্বদুঃখ দূর হয় গীত যন্ত্র রাএ।
গীত যন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ।
গীত যন্ত্র মহামন্ত্র বৈরাগীর কাম
রাগযন্ত্র মহামন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যথ আছে ভুবন ভিতর
সর্বঘটে যন্ত্র বাজে গীতের সুস্বর।
ঘটে গুপ্ত যন্ত্র গীত যোগিগণে বুঝে
তেকারণে সর্বজীবে সে সবারে পূজে।
গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তা মেলে।
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে
গীতরসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজন কবিও বলেন :

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার
রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তন মধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন-বেশি করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছে যে স্থিতি
ছয় ঋত তার সঙ্গে চলে প্রতিনিত।...
রাগঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেত বসিয়া দেখ ঘটে সর্বরূপ।

বাঙালি মুসলিম সমাজে সঙ্গীতচর্চা যে সূফী প্রভাবেরই ফল, আমাদের সে অনুমান উক্ত চরণ কয়টির দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল। কবি সৈয়দ সুলতান, আলাউল প্রভৃতিও সূফী সাধক ও পীর। তাঁদের সঙ্গীতপ্রীতি সাধনার অনুগত। আর তত্ত্ব-সঙ্গীত রচনার প্রেরণাও তাঁরা সাধন-সূত্রেই পেয়েছেন। আগেই বলেছি, বাঙালি মুসলিম মরমীয়ারা যে-সাধন পন্থা গ্রহণ করেছেন, তা মূলত ইসলামী নয়। ভারতিক সূফীমতবাদও একান্তভাবে আরব-ইরানি নয়। এর অবয়বে যেমন ভারতিক প্রভাব পড়েছে, বাঙালি মরমীয়াদের দর্শনে , ধর্মে ও আচারে প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান রয়েছে। কাজেই এদেশে হিন্দু-মুসলমান চিরকাল হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন মিশিয়ে অধ্যাত্ম সাধনা করেছে। এভাবেই বাঙালি দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় মরমীয়াদের উপমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

বলেছি, মুসলিম অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাঁরা সবাই সূফী ছিলেন। এই মরমীয়াদের অনেকেরই সঙ্গে শরীয়তের বাহ্যানুষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ সাধারণের পক্ষে ধর্ম আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। ফলে মুসলমানেরা তাদের চারপাশেই অবলম্বন খুঁজেছে। এভাবেই তাদের তত্ত্ব-দর্শনে পীরপূজা ও দেহচর্যা মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাদের তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে ভারতিক রূপকল্প।[৬৯] আরাধ্যের প্রতীক হলেন রাম ও রাধাকৃষ্ণ, এমনকি কালীও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

মরমীয়াদের মতে, সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টার আনন্দ সহচর । কাজেই মানুষের সঙ্গে আল্লাহর বান্দা-মনিব সম্পর্ক হতে পারে না ; হতে পারে না পিতা-পুত্রের কিংবা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ। মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের, প্রণয়ের। যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই নামাজ-রোজার বা এই প্রকার আনুগত্যের প্রশ্নই অবান্তর। ফলে শরীয়ত সেখানে নিরর্থক। অনুরাগে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহবোধে উপলব্ধি এবং মিলনে সার্থকতা। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে প্রেমিক প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে, পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এই প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ। স্বরূপত খণ্ডের অখণ্ডে বিলীন হওয়ার আকুলতার নামই প্রেম।

গরজ খণ্ডের তথা জীবাত্মার, তাই সে প্রেমিক, তাই সে রাধা। পরমাত্মারও গরজ আছে। যেমন সমুদ্রও বারিবিন্দুর সমষ্টি মাত্র। বারিবিন্দুর উপরই তার অস্তিত্ব। কিন্তু কোনো বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার বিশেষ আকুলতা নেই। এজন্যেই জীবাত্মা সদা উদ্বিগ্ন, পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে : 'এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে ; না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, যখন বলা চলে 'আনল হক' কিংবা 'সোহম'। এ অবস্থাটা সূফীর ভাষায় 'ফানাফিল্লাহ' অথবা 'বাকাবিল্লাহ' আর বৈষ্ণবের কথায় 'যুগল রূপ' বা 'অভেদ রূপ'। এ দুটোতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তাৎপর্যের প্রভেদ আছে। তবে অবস্থা ও অভিপ্রায় মূলত একই।

'কুন্ ফায়াকুন' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। আর 'একোহম্ বহুস্যাম' অদ্বৈতবাদ নির্দেশক। সূফীরা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী ; কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায় গড়া, তবু তাদের সাধনা চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে অদ্বৈত সত্তার প্রয়াস। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী -বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। কেননা, রুমীর ভাষায় :

দানা চুঁ অন্দর জমিন পেন্হা শওয়াদ
বাদ আজোঁ সারে সবজি বস্তা শওয়াদ।

জীবাত্মা তখন বাঁশীর মতো বলে : বশোনো আজনায়ে চুঁ হেকায়েত নি কুনদ...।

জ্ঞানদাসও বলেন : 'অন্তরে অন্তর কাঁদে কিবা করে প্রাণ' অথবা 'পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে।'

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন :

বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

এজন্যে সূফীগানে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলনপিপাসু বিরহী আত্মার করুণ কান্না শুনতে পাই। সূফীগজল ও বৈষ্ণবপদ মানবাত্মার চিরন্তন Tragedy-এর সুর ও বাণী বহন করেছে। তার বেদনার অন্ত নেই। কেননা, সর্বক্ষণ 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশি লাগিছে অন্তরে', সে কারণেই চিরকাল 'কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।'

এই প্রেমধর্মের আর একটি দিক হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। কেননা, আত্মা এই প্রেমের এক পক্ষ তথা প্রেমিক। আর আত্মা পরমাত্মার অংশ তো বটেই। তাই সক্রেটিসের Knoweth thyself, উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি', হাদিস বলে অভিহিত ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' কিংবা উপনিষদের 'তং বেদ্য পুরুষৎ বেদমা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ—এই আত্মতত্ত্বের ভিত্তি ও লক্ষ্য দুই-ই। মুসলিম মরমীয়া কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গ্রহণের কয়েকটি কারণ অনুমান করেছেন অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য। [৭০] তার মধ্যে তিনটে প্রধান- ক. দেশজ মুসলমান পূর্বসংস্কার বশে চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম প্রচারকালে রাধাকৃষ্ণ লীলারসে মুগ্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরাও পদ রচনা করেছেন। খ. রেওয়াজের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের রূপকে পদ রচিত হয়েছে বটে, তবে কৃষ্ণ অনেক মুসলমান কবির কাছে অপৌরুষেয়। এবং 'কানু ছাড়া গীত নেই' যুগের নৈর্ব্যক্তিক নাগর কানাইরূপে লৌকিক প্রেমের নায়ক হয়েছেন। গ. আর সুফী মতের মুসলমানরা ভাব-সাদৃশ্য বশে জীবাত্মা-পরমাত্মাসূচক জনপ্রিয় দেশী রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের শরণ নিয়েছেন।

সৈয়দ সুলতান প্রভৃতি মুসলিম কবিরা শেষোক্ত কারণেই রাধা-কৃষ্ণ রূপকে পদ রচনা করেছেন। সূফী হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধা-কৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতির কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তারা রূপ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্র হরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুঁজে পাননি। সেজন্যে মুসলমানের লেখায় ওসব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাদের রচনায় অনুরাগ ও বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ ; সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে—এটিই বংশী আর সাধনার আদি স্তরে পাওয়া না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়—এটিই অভিসার। এর পরে সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্ম স্বস্তি আসে—তা-ই মিলন। মিলনে আত্মসমর্পণের আকুলতা প্রশমিত হয়—তা-ই ফানাফিল্লাহ। এরও পরে চরম আকাঙ্ক্ষা—একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা, যার নাম বাকাবিল্লাহ—এই বিরহ। মৃত্যুর আগে সাধারণের পরম মিলন নেই, সেজন্যেই 'বাকাবিল্লাহ' সূচক পদের অভাব। কেউ কেউ সে দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁরাই বাকাবিল্লাহ হন—আর বলেন আনল হক, বা সোহম—যেমন মনসুর, বায়যিদ ও আদহাম বলেছেন।
এজন্যেই মুসলিম রচিত পদ ' রাগানুগ' নয়। শশিভূষণ দাশগুপ্তও তাই বলেন :

> এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইত পারে যে, বাঙ্গালার মুসলমান কবিগণ রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনো বিধিবদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের আওতায় রচিত নহে। ... বৈষ্ণবমতে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোনো স্থান নেই। ... শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। ... কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিলেন; একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোনো স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাঙ্গালার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল, এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন। বাঙ্গালা দেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফীপন্থী সূফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের, বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'এক'-এর সৃষ্টিলীলার প্রধান শরিক—লীলা দাসর। .. সূফী প্রেমধর্ম এবং বাঙ্গালার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি, তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও বিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধা-কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টির ও ইঙ্গিত পাইব।[৭১]

উত্তরভারতীয় সাধক কবিগণও রাম বা রাধাকৃষ্ণকে এমনি ভাবদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করেছেন। দাদু, দরিয়া, রজব, শেখ কাইম, এয়ারী, মইজুদ্দীন, আফসোস প্রমুখ কবির পদাবলী এ সাক্ষ্যই বহন করে।[৭২]

বাঙলাদেশে রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতীক যেমন হয়েছেন, তেমনি দেহ ও আত্মা—ভক্ত ও ভগবানের রূপক হিসেবেও তাদের পাই। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে বাউল সাধনায় দেহতাত্ত্বিক তাৎপর্যেও রাধাকৃষ্ণ চিহ্নিত। অবশ্য দেহতত্ত্বের প্রতীকী প্রকাশে রাধা-কৃষ্ণ তন-মনের প্রতিনিধিত্বে সীমিত থাকেননি, তন-মনের অস্থির ও বিভ্রান্তিকর রূপকল্প হয়েছেন। একে তো সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর, তাদের রক্তের সংস্কারে ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা সুফীমতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মন, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তাই বাঙালি কবি শাহনূরের কথায় মুসলমানদের রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গ্রহণের সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই :

সৈয়দ শাহনুরে কয় রাধাকানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনে রে।

আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি :

তন রাধা মন কানু শাহনুরে বলে।

অথবা, সৈয়দ শাহনুরে কয় ভব কূলে আসি।
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী।

অথবা, উসমানের কথায় :

রাধা-কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন।
কানুরাধা এক ঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

সৈয়দ মর্তুজাও বলেন :

আনন্দমোহন মওলা খেলাএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি
সৈয়দ মর্তুজা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন
পুরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে স্মর্তব্য :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যান্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি।

বিকৃত বৈষ্ণব সাধক বাঙলার বাউল ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের অনেকগুলোই রাধাকৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ত্ব তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যভেদে প্রয়াসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎস নির্দেশ

১. Extract from 'Arab Musical Instruments' by Farmer p 196. Quoted in History of Indo-Pak music : Dr Abdul Halim p. 64. বঙ্গানুবাদ : পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪ সন পৃ. ৩-৪।

২. নচ্চগীতবাদিত বিসুখদর্শনা বেরমনি শিক্ষাপদম্—দশশিক্ষাপদ।

৩. Origin and Development of Bengali Language, S.K. Chatterjee ও বঙ্গে সুফীপ্রভাব—ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

৪. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

৫. পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪ সন পৃ. ৫।

৬. ক. Music in Islam : Dr. Makhan Lal Roy Chowdhury : JASB vol XXII, 1957, F N p. 54.
খ. Encyclopaedia of Islam , vol III pp. 749-55.
গ. Ikhwan's Safa (persian : Maulana Ahmed, 1304 AH)

৭. ক. Music in Islam : P 54.
খ. Dictionary of Islam, Hughes, p 423.

৮. ক. Essay on Manners and Customs of the Pre-Islamic Arabians : Sir Syed Ahmed Khan, p 15 (1870).
খ. Music in Islam, P 55.

৯. ক. Ibid p 55
খ. Encyclopaedia of Islam , vol II p. 250

১০. আল বুখারী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৯।

১১. ক. Muhammad : Muir, P 259
খ. Music in Islam, p 55.

১২. Literary History of Arabs : p 88.

১৩. ক. Influence of Music from Arabic sources : H G. Farmer, p 9 (1926 A D).
খ. Kitab-al, Aghani, Von Kremmer (as mentioned by Dr M L Roy Chowdhury in F. note no 6. p 55)

১৪. Quran, Tran : Muhammad Ali, p 801 (1948).

১৫. Kitabul Aghani XVI, p 48

১৬. Al- Masudi vol III p 296.

১৭. Al-Masudi vol III p 296

১৮. Evliya Chelebi : Travels I &II, p 91(as quoted by M. L. Roy Chowdhury ; p 56)

১৯. Von Kremmer (as quoted by M. L. Roy Chowdhury)

২০. Evliya Chelebi : Travels (do) vol I (11) pp 11 3, 226, 233-34

২১. ইন্না আনকার অল অসওয়াৎ-ই লা সওয়াৎ-উল হ্যমির। সুরাহ ৩১, আয়াত ১৯।

২২. ইয়াযিদু ফিল খালকি মা ইয়াশা ইন্নাল্লাহ অলা কুল্লি শায়িন কদির। সুরাহ ৩৫, আয়াত ১।

২৩. ওয়া রত্তিলি কোরআন তরতিলা। সুরাহ মুযাম্মিল। সুরাহ ৭, আয়াত ৩১ - ৩২।

২৪. Music in Islam , M L Roy chowdhury, JASB 1957

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫. JRAS : 1901, P 207
২৬. কিতাবুল আগানি ৩য় খণ্ড -PP. 189 - 92.
২৭. Iqul Farid, III p 178
২৮. ক. কিমিয়া-ই সা'ত P 219
খ. Iqdul Farid III, p 178
২৯. সহিহ্ ইব্‌ন হব্বান (হাদিস)।
৩০. Kashful Mahjub : p 401
৩১. ইহাইয়াউল উলূম : গাজ্জালী P. 217
৩২. কিমিয়া ই সা'দত : PP 220-21
৩৩. বুখারী : P 123 (Lahore 1341 AH)
৩৪. ঐ, অধ্যায়, ঈদ, পৃ. ২১০।
৩৫. আল হুজুইরী পৃ. ৪০১।
৩৬. লিসানুল আরব।
৩৭. সরদার ইকবাল : P 278, আল হুজুইরী : পৃ. ৪১১।
৩৮. ক. মকাইদুশ শয়তান : ইব্‌ন আবিদ্ দুনিয়া।
খ. তবরানি : মাজমি কবির। শিহাবুদ্দীন : কলিউবি : কিসসা সংখ্যা ২৬।
৩৯. সুরাহ ৩৬।
৪০. ঐ ৩১. আয়াত ৬।
৪১. উমদাতুল কারি : Commentary on Bukhari রফিউল গিনা, হাফিজ আবু মুহম্মদ, উদ্ধৃত পৃ. ৭।
৪২. ক. Dhammul Malahi : Ibn Abid Dunya
খ. At Tirmiddhi : BK 46, Manaqib, 17th chapter
৪৩. তিরবানি ও Baghwi.
৪৪. Sardar Iqbal, p 278.
৪৫. Hidayah : vol III p 453 Hamilton : ওয়া দল্লাতিল মাসা'লাতু অ'লা আন্নাল মলাহি কুল্লুহা হারামুন হত্তা অত তগান্নি বিদরবিল কারিব। "
৪৬. Assama : Allama Abdul Ghani Nabulisi
৪৭. History of Baghdad : Katib Hafiz Abu Bakr Baghdadi
৪৮. Ihqaqu's Sama by Abdul Bari, P 5.
৪৯. Madar-i-Jun Nabuwwat by Abdul Haq.
৫০. Jawaz -i-Sama -এ উদ্ধৃত, p 10-11
৫১. কালা অল গিনা য়ুনবিতুন নিফাকা ফিল কালবী। ক'মা য়ুনবিতুল মাউল বক্‌লা।
৫২. Ihqaqu's Sama p 7.
৫৩. লাম আলামু ফি কিতাবিল্লাহি তা'য়ালা ওয়ালা ফিস সুন্নত। হাদিসান সহিহান সরিহান ফি তহরিমিল মলাহি —Jawaz-i-Sama p 17.
৫৪. ক. Tasawwaf aur Islam by Abdul Majid Dariabadi
খ. Tadhkiratul Aulia : Fariduddin Attar
গ. Futuhat-i-Makkiah : Mahiuddin Arabi
ঘ. Kitabul Lumma fit Tasawwaf : Abu Nasr Saraj Edited by R.A. Nicholson
৫৫. ইয়াহুব্বুহুম ওয়া ইয়াহুব্বুনাহু।
৫৬. কুল ইনকানা আবা উকুম ওয়া আব না উকুম ওয়া অখাওয়ানুকুম।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬. ক Music in Islam .p 93, Kitabul , Lumma : R A Nicholson
৫৭. Sufiism and its Saints and Shrines by John Abdus sobhan, p 251
৫৮. ক Ihqaqu's, Sama, Abdul Bari p 18
খ. Awarif , Shihabuddin Suhrwardi
৫৯. Studies in Islanic Mysticism : Nicholson, p 188
৬০. Odes, Music in Islam p. 99.
৬১. Music in Islam, p 99.
৬২. Music in Islam M L Roy Chowbhury, Mathnawi
৬৩. Bengal Past and Present, vol LXVIII, SL 130, 1948 pp 35- 36.
৬৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব, ষষ্ঠ অধ্যায়।
৬৫. পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৫, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪ সন।
৬৬. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৫৮- ৫৯।
৬৭. History of Indo-Pak Music : A, Halim P 78.
৬৮. History of Indo Pak Music, p 89.
৬৯. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : আলিরজা, আকবর, মীর্জা হোসেন আলি। ক্রমিক সংখ্যা ৩৭২. ৩৯৩ পৃ. ১৯১।
৭০ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি: ভূমিকা।
৭১. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে পৃ. ৩২১-৩৩
৭২. ক. বাংলার হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা : ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।
খ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : পৃ. ৩১-৩৩।

AMARBOI.COM

কবি মুহম্মদ খান ও তাঁর কাব্য

মুহম্মদ খান আমাদের সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় নাম। তিনি প্রখ্যাত 'মক্তুল হোসেন' তথা 'হোসেন বধ' কাব্যের রচয়িতা।

কারবালা কাহিনী নিয়ে অনেক যুদ্ধকাব্য ও মর্সিয়া-সাহিত্য রচিত হয়েছে। কাব্যগুলো সাধারণত জঙ্গনামা এবং গান-গাথাগুলো জারি নামে পরিচিত। যুদ্ধকাব্যের ফারসি নাম জঙ্গনামা। কিন্তু বাঙলায় নামটি যোগরূঢ় হয়ে কেবল কারবালা যুদ্ধ বিষয়ক কাব্যই নির্দেশ করে।

কারবালার যুদ্ধে প্রতারিত ইমাম হোসেনের শোচনীয় পরাজয় ও নিধনের করুণ বৃত্তান্তই এ কাব্যে বর্ণিত। দুর্ভাগ্য লাঞ্ছনা পীড়ন পরাজয় ও হত্যার এমনি অগুণতি ঘটনা দুনিয়াব্যাপী ঘটেছে, আজো ঘটছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে সে সবের বীভৎস কিংবা করুণ বিবরণ। লোকে সব কথা মনে রাখে না, সব ঘটনায় গুরুত্বও দেয় না। মুসলমানের হোসেন প্রীতি রসুল ও আলী-প্রীতির প্রতিচ্ছায়া। কারুণ্য বেদনা উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের অপ্রতিরোধ্য উৎস ঐটিই। তাই বছরে একবার অন্তত মুসলমানেরা প্রিয়জন নিধনের সদ্যশোক অনুভব করে। বিশেষ করে পাকপঞ্জতন'-ভক্ত শিয়া সম্প্রদায় সে শোকের অভিঘাতে বক্ষবিদারী রক্তক্ষরা বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনি করে হোসেন বিষয়ক কাব্য ও গানগাথা রচন, পঠন ও শ্রবণ স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মীয় নিষ্ঠা ও জাতীয় প্রবণতায় রূপ পায়।

মুঘল আমলে বিশেষ করে জাহাগীরের আমল থেকে এদেশে ইরানি প্রভাব প্রবল হতে থাকে। ইরানের সাফাভী বংশীয় শাসনের অবসান ঘটলে বহু শিয়া মুর্শিদাবাদেও আশ্রয় পায়। তার ফলে এদেশে কারবালা মহরমের পার্বণিক বিকাশ ও প্রসার ত্বরান্বিত হয়। সুন্নীদের মানস-প্রশ্রয়ে তা শহরে শহরে সর্বজনীন জাতীয় পার্বণের রূপ নেয়। এদেশের এমনি আবহে লোকের কৌতূহল মিটানোর প্রয়োজনে অনেক জঙ্গনামা রচিত হয়েছে ।

বাঙলায় মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামা কিংবা শহীদ-ই-কারাবালার আদি কবি দৌলত উজির বাহরাম খান (ষোলো শতক), দ্বিতীয় কবি মীর বা শেখ ফয়জুল্লাহ্- র (ষোলো শতক) রচিত চৌতিশায় যয়নবের বিলাপ পাওয়া গেছে। তৃতীয় কবি আমাদের আলোচ্য মুহম্মদ খান। এঁর পরে যাঁরা জঙ্গনামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হায়াত মাহমুদ, জাফর, জিন্নত আলী, আলী মুহম্মদ, আবদুল ওহাব, হামিদুল্লাহ খান, ফকির গরীবউল্লাহ, ইয়াকুব (?), সাদ আলী, রাধাচরণ গোপ, মুহম্মদ মুনশী, জনাব আলি ও আবদুল হামিদের নাম উল্লেখ্য।

২

মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' ঐতিহাসিক উপাদানের আধার হিসেবেও মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে তাঁর সমকাল অবধি চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসের আভাস দিয়েছেন। কবির মাতৃকুল ছিল পীর পরিবার, আর পিতৃকুল ছিল শাসক পরিবার। কবির পীর ছিলেন 'নবীবংশ'-এর কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতান। সৈয়দ সুলতান ষোলো শতকের সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন দিকপাল। অতএব কবি মুহম্মদ খান ছিলেন সতেরো শতকের চট্টগ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃপুরুষের বংশ-তালিকা এরূপ :

মাতৃকুল [পীর পরিবার]	পিতৃকুল [শাসক পরিবার]
১. শেখ শরীফুদ্দীন	১. মাহী আসোয়ার (আনু.১৩৩৯-৪৫ খ্রী.)
২. কাজী আলাম	২. হাতিম
৩ মীর কাজী	৩. সিদ্দিক
৪. খান কাজী	৪. রাস্তিখান (চাটিগ্রাম দেশপতি ১৪৭৪ খ্রী.)
৫. শেখ হামিদ	৫. মিনাখান (রণে ভৃগুপতিরাম)
৬. বাবা ফরিদ	৬. গাভুর খান (কীর্তি গৌড়দেশ ভরি)
৭. হামিদ আলাম	৭. হামজা খান (ত্রিপুর ও পাঠান বিজেতা, মৃত্যু ১৫৫৫ খ্রী.)
৮. শাহ্ নাসিরউদ্দিন	৮. নসরত খান (প্রচণ্ড প্রতাপ, বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি মৃঃ১৫৬৯ খ্রী.)
৯. পীর মোকারম সদর জাঁহা ওর্ফে শাহ ভিখারী ওর্ফে শাহ আব্দুল ওহাব	৯. জালাল খান (চাটিগ্রাম দেশকান্ত মৃত্যু ১৫৮৬ খ্রী.)
১০. শাহ আহমদ বা মুহম্মদ	১০. ইব্রাহিম খান (সমরেত সমরাম) — মুবারিজ খান ভৃগুপতি (পার্থ ধনুর্ধর)
	১১. কবি মুহম্মদ খান (নায়েব উজির?)

AMARBOI.COM

কবির মাতামহ সদরজাহাঁর পিতৃদত্ত নাম আবদুল ওহাব। গরিব-দুঃখীর প্রতি সদয় ছিলেন বলে তিনি 'শাহ্ ভিখারী' তথা ভিখারীর বাদশা ['ভিক্ষুকজনের' পতি' যাহাকে বুলিলা] রূপে জনপ্রিয় হন। আর 'পীর-ই-মুল্‌ক' অর্থে তিনি 'সদরজাহাঁ' খেতাব কিংবা পদ বা খ্যাতি লাভ করেন [পীর-ই-মুলুক যারে বোলে সর্বজন]। এই আবদুল ওহাব সদরজাহাঁ গৌড়সুলতান ও আরাকান রাজের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, এবং তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত রয়েছে। ইতি রাস্তিখানের বংশধর নসরত খানের জামাতা, ভুঁইয়া-প্রমুখ ঈসা খান ও রামু-চকরিয়ার সামন্ত-শাসক আদমের প্রিয় কিংবা পীর ছিলেন।

কবির পূর্বপুরুষ রাস্তিখান গৌড়সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্‌র অধীনে চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। তারপর চট্টগ্রাম কখনো গৌড়শাসনে কখনো আরাকান অধিকারে থাকলেও এঁরা বংশপরম্পরায় শাসক পদে নিযুক্তি পেয়েছেন। মিনা খান সম্ভবত পরাগল খানের ছোটভাই ও ছুটি খানের পিতৃব্য। মুহম্মদ খান মিনা খানের বংশধর বলেই পরাগল খানের নামোল্লেখ করেননি। লক্ষণীয় যে, পিতা ও পিতৃব্য এবং মাতামহ ও মাতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া কবি সর্বত্র একক বংশধরেরই পরিচয় দিয়েছেন।

মুহম্মদ খানের পিতৃব্য ইব্রাহিম খান ছিলেন আরাকান রাজ্যের চট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসক বা উজির। মুহম্মদ খানও সম্ভবত শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নায়েব-উজির ছিলেন। আঠারো-উনিশ শতকের কবি মুহম্মদ চুহর কবিপ্রণামে মুহম্মদ খানকে 'পীর-কবি' বলে উল্লেখ করেছেন :

আদ্য গুরু কল্পতরু ছৈদ সুলতান
কবি আলাওল পীর মোহাম্মদ খান।

৩

কবি সৈয়দ সুলতানের ইচ্ছে ছিল সৃষ্টিপত্তন থেকে শুরু করে 'কেয়ামত' অবধি ইসলামী ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনা করবেন। সৃষ্টি-পত্তন থেকে' ওফাত-ই-রসুল' তক্‌ রচনা করে কোনো কারণে তিনি লেখনী ত্যাগ করেন। 'মক্তুল হোসেন'-এ তাঁর আরব্ধ কর্মে সমাপ্তি দান করে, তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেন তাঁর প্রিয় শিষ্য কবি মুহম্মদ খান।

পীরের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গভীরতা শিষ্যের ছিল না সত্য, কিন্তু কবিত্বে, সহৃদয়তায়, সংবেদনশীলতায়, ভাষার লালিত্য ও বর্ণনভঙ্গির নিপুণতায় শিষ্য পীরকে অতিক্রম করেছেন। এখন পীর-সাগরেদ সংবাদ মুহম্মদ খানের মুখেই শোনা যাক :

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস' দধি
শ্যাম নবজলধর সুন্দর শরীর
দানে কল্পতরু পৃথিবী সম স্থির।
অসীম মহিমা পীর শাহ সুলতান।...
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ।
হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈলা করতার।
'নবীবংশ' রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচি আর না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি
চারি সা'বার কথা কৈলুঁ পদাবলী।
দুই ভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশন
এহা হন্তে, ধিক কথা নাহি কদাচন।
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ।

মক্তুল হোসেন এগারো পর্বে সমাপ্ত। কবির ভাষায় এর বিষয়সূচি এই :

১. আদিপর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব।
২. কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন
চারি আসহাবের কথা শাস্ত্রের নিদান।
৩. কহিব তৃতীয় পর্বে হাসনের বাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যয়নবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি।
৪. চতুর্থ মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন
৫. কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষে পাছে
৬. ষষ্টমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে
৭ সপ্তমে স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি
৮. অষ্টমেত দূতপর্ব শুন দিয়া মন
৯. নবমে ওলিদ পর্ব শুন গুণিগণ।
১০. দশমে এজিম পর্ব কহিবাম এবে
১১. একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব।
যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর
যেন মতে আসিয়া পুনি ঈসা পয়গাম্বর।
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল সংহারি।
এআজুজ মাজুজ সেই দুই বাহিনী
যেনমতে হেসাব দিবেক সর্বজনি।

একাদশ পর্বটি কেয়ামতনামা ও দজ্জালনামা নামে পৃথক দুখানি পুস্তিকা হিসেবেও চালু ছিল। এজিদ পর্বও 'হানিফার লড়াই' নামে জনপ্রিয় হয়। এভাবে মুহম্মদ খান একটিমাত্র গ্রন্থে কেয়ামত অবধি বর্ণন করে পীরের অভিলাষ পূর্ণ করেন। 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের রচনাকাল মিলেছে :

মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল।
হিন্দুয়ানি তারিখের শুন কহি কত
বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত।
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।
পঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি।
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গৈইল
সেই রাত্রি পঞ্চলিকা সমাপ্ত হইল।

[এত হিজরী ১০০০+৫০+৬=১৬৪৫-৪৬ খ্রীস্টাব্দ; এবং শক ৫ x ২ = ১০০০ +৫০০ + ২০ x ৩+৭ = ১৫৬৭ + ৭৮ = ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ মেলে।]

৪

সব দেশের কাহিনী-কাব্যই ঐতিহ্য-নির্ভর। আমাদের বাঙালি মুসলিম রচিত সাহিত্যের উপজীব্যও ছিল মুসলিম ইতিকথা। তার মধ্যে ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরত্ব-মহত্ত্বজ্ঞাপক গৌরবময় কাহিনীই বিশেষ করে তাঁদের কাব্য-সৌধ নির্মাণের উপকরণ যোগায়।

আরব দেশ, রূপকথার ভাষায়, সাত সাগরের ওপারে। সেকালে যানবাহনের সুবিধে ছিল না। আজকের মতো পৃথিবী তখনো মানুষের পদচারণের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে পরিণত হয়নি। তাই সত্যিকথাও কল্পনাপ্রিয় অজ্ঞ মানুষের মুখে মুখে রূপকথার মতো অবাস্তব, অস্বাভাবিক ও রোমান্টিক হয়ে উঠত। তাছাড়া মানুষের মনোজগতে— সাহিত্যের আনন্দ-মেলায়, আদর্শায়িত জীবন স্বপ্নে বাস্তবের মূল্য চিরকালই নগণ্য। যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব সেখানে সামান্যই। তাই ইসলামের উদ্ভবকালের জাতীয় বীরদের নানা যুদ্ধকাহিনী মনোময় কল্পনার অবাধ প্রশ্রয়ে রূপে-রসে, সত্য-মিথ্যায়, সম্ভব-অসম্ভবে, বাস্তবে-কল্পনায় আকর্ষণীয় অবয়ব পেয়েছে। মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন'ও এমনি একটি করুণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুর, জ্বালা-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত সুন্দর রচনা। এ কাব্য মৌলিক রচনা নয়, ফারসি কাব্যের অনুসৃতিমূলক। আবার এর আংশিক অনুকৃতি মেলে মীর মুশাররফ হোসেনের গ্রন্থে। 'জঙ্গনামা'-র চরম ও সুন্দরতম রূপায়ণ হচ্ছে মীর মুশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু। কিন্তু মধ্যযুগীয় কাব্য হিসেবে 'মক্তুল হোসেন' এ জাতীয় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুহম্মদ খান নিজেই বলেছেন :

মুহম্মদ খানে কহে শুনিতে মরম দহে
পাষাণ হইয়া যায় জল।

এই দাবীতে অত্যুক্তি নেই। তাঁর কাব্য সত্যি কারুণ্যের নির্ঝর। তাই বলে বীররস-বিহীন নয়। যে যুগের , যে সমাজের, যে মানুষের কথা এতে বর্ণিত তা আজ ধূসর কল্পনার বিষয়। কিন্তু আজো সেই ক্রূরতা মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করে ; হোসেনের আত্মসম্মান বোধ, সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, আত্মত্যাগ আজো মানুষকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে ; আজো তাঁর বীরত্ব, মহত্ত্ব ও স্বাধীনতা-প্রীতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

'শির দেগা সের দেগা, নেহি দেগা আমামা' —এই ছিল হোসেনের বক্তব্য। অন্যায় ও জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে অনুগৃহীতের সুখ তাঁর কাম্য ছিলো না। জানের চেয়ে মান বড়, তার চেয়েও বড় স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এজিদের কৃপাজীবীর নিশ্চিন্ত জীবন তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তাঁর মর্যাদা ও আদর্শ রক্ষা করলেন। সংগ্রামের ভেতরেই জীবনের সার্থকতা খুঁজলেন, মুযাহীদের জীবন এবং শহীদের মৃত্যুই তাঁর লক্ষ্য হল। শহীদ হয়েও যিনি মনুষ্যস্মৃতিতে অমর গাজীর গৌরব নিয়ে বেঁচে রইলেন। সেই হোসেনের সংগ্রামের কথা, শাহাদাতের কথা আজো এবং চিরকাল স্মরণীয় থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! বিশেষ করে, রসুলের দৌহিত্রের হৃদয়-বিদারক কাহিনী সাড়ে তেরো শ বছর ধরে মুসলমানের চক্ষু অশ্রুসিক্ত রাখছে, কেয়ামত তক্ এমনি অশ্রু ঝরবে তাদের দু-চোখের কোণ বেয়ে, যখন মুহম্মদ খানের লেখা-চিত্র তারা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে :

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার
কান্দন্ত ফিরিস্তা সব গগন মাঝার।
বিলাপন্ত যথেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর
আর্শ কুর্সি লওহ্ আদি কাঁপে থরথর।
অষ্ট স্বর্গবাসী যথ করন্ত বিলাপ
ধিক ধিক কুফি সৈন্য অধার্মিক পাপ।
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ
কম্পমান সূর্য দেখি হোসেন নিধন।
ক্ষীণ হৈল নিশাপতি আমীরের শোকে
মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাখি মুখে।
বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান
শনি কালা বস্ত্র পিন্দে পাই অপমান।
জোহরা নক্ষত্র কান্দে ত্যাজি নাট গীত
ফাতেমা জোহরা কান্দে শোকে বিষাদিত।
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ
কম্পিত পর্বত ছাড়ে সঘন নিশ্বাস।
কম্পমান পৃথিবী যতেক চরাচর
হইল শোণিত বর্ণ দিগ্‌দিগন্তর।
জল ত্যাজে মীনগণে পক্ষী ত্যাজে বাসা
সব কান্দে হাসএ ইব্লিস অনা-আশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

মুহম্মদ খান 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ' নামে নীতিশিক্ষামূলক একখানি রূপককাব্যও রচনা করেছিলেন। এটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থ।* এ কাব্যে সত্য ও কলির তথা ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য আর সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে সার্থকভাবে চিত্রিত। এ কাব্যের বিষয়সূচি কবির জবানিতে এরূপ :

ক. প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি।
সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন
মিত্র কণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ।
না করিল সন্ধিপত্র আইল পুরোহিত
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত।
খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই সৈন্যের সংগ্রাম
সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ অনুপাম।
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর
মুহুর্চ্ছিত সত্য লই পুনি গেল ঘর।
গ. তৃতীয় অধ্যায়ে তবে কহিলুঁ কথন
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন।
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী।
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল
যোগী-সত্যবতী যেন সম্বাদ ঘুচিল।
ঘ. চতুর্থ অধ্যায়ে পুনি সত্য পাইল জয়
পুনি মুহুর্চ্ছিত হৈল কলি পাপাশয়।
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল
ভোগী-ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল।
ভোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সম্বাদ
ঙ. পঞ্চম অধ্যায়ে পুনি যুদ্ধের বিবাদ
তৃতীয় [ত্রেতা] দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন।

তত্ত্বকথা যেন গুরুভার হয়ে না পড়ে, সেদিকে কবির সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাই কবি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী, সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা প্রভৃতি প্রণয়োপাখ্যানও প্রাসঙ্গিক করে সুকৌশলে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। সত্য ও পুণ্যের জয় এবং মিথ্যা ও পাপের পরিণামে ক্ষয় প্রদর্শনই কবির লক্ষ্য হলেও কবি শিল্পীসুলভ সংযম রক্ষা করেছেন এবং বাস্তবজীবনে উপলব্ধ সত্যে তাঁর তাচ্ছিল্য ছিল না। বাস্তবজীবনে পাপ ও মিথ্যা যে সত্যের ও পুণ্যের উপরে জয়ী হয় (তা যত সাময়িকই হোক না কেন) এবং সত্য ও পুণ্যের পথ যে বন্ধুর, দুঃখ-দুষ্ট এবং বর্থতাকীর্ণ তাও কবি নিপুণতার সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন।

কবির প্রতীকী চরিত্রগুলোও জড়প্রতীক নয়, একান্তভাবে রক্তমাংসের মানুষ। আমাদেরই ঘরের ও সমাজের লোক। চিনতে একটুও কষ্ট হয় না, বরং মনে হয় নিত্য-দেখা অতি পরিচিত জন। কোথাও রহস্যের কিংবা অজানার আড়াল নেই।

* দশ শত বাণ শত বাণ দশ' ধিক সনে তথা ১০০০ + ৫০০ + ৫ × ১০ + ৭ = ১৫৫৭ শকে—১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্র-পাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণপ্রতীক, তেমনি সুন্দর : সত্য, কলি, দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, দুঃশল , মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা, যোগী প্রভৃতি।

সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র—এ দুটোও গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য অগ্নিময়—সত্যে দাহ আছে; চন্দ্র স্নিগ্ধ ও সুন্দর—পাপ আপাতমধুর ও লোভনীয়।

যোগী-সত্যবতী ও ভোগী-দুঃশীলা সম্বাদে ব্যবহার-বিধি, নিয়ম-নীতি, পাপ-পুণ্য ও সংযম-অসংযমের যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তা মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যার ইতিকথা।

কবি প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সমকালীন লোকচরিত্রের যে আভাস দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় সতেরো শতকে বিশ শতকে তফাৎ নেই কিছুই। অধিকাংশ মানুষের অমানুষিকতা আজো তেমনি রয়েছে।

মুহম্মদ খান পীরের দৌহিত্র, সূফীপীরের মুরীদ ও নিজে পীর ছিলেন। আবার দুর্লভ কবিত্বও তাঁর ছিল, সর্বোপরি তিনি প্রশাসনিক বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব তাঁকে আমরা সতেরো শতকের ধার্মিক ও ধর্মপ্রবক্তা, কবি ও সংস্কৃতিবিদ, রাজনীতিক ও অভিজাত নাগরিক হিসেবেই গ্রহণ করব। তিনি সতেরো শতকের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মানুষের একজন। কাজেই তাঁর রচনা সে-শতকের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার এবং নীতিবোধের প্রতীক ও প্রতিভূ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ্ আবদুল লতিফ ভিটাই

করাচী থেকে ট্রেনে করে হায়দরাবাদ রওয়ানা হলাম ভিটশাহ্ উদ্দেশে। মরু সিন্ধুর বুক চিরে ছুটে চলেছে ট্রেন। দুদিকে বসতি বিরল ও বসতিহীন প্রান্তর ; এখানে ওখানে বাবলা গাছ, কাঁটা ঝোপ আর পাথুরে টিলা। প্রকৃতির এ রুক্ষতা ভাবিয়ে তোলে, বিস্মিতও করে। যেখানে সংগ্রাম সেখানেই বুঝি স্বাস্থ্য। নইলে প্রাচুর্যের দেশ বাঙলায় কেন জন ও জীব দুইই ক্ষুদ্রকায়। আর অনুর্বর অঞ্চলে মানুষে পশুতে কী পায় আর কী খায় যে সেখানে এরা আকারে বড় আর স্বাস্থ্যে সুষ্ঠু। ট্রেন চলেছে। একঘেয়ে দৃশ্য। তাই মন চলে গেছে সুদূর অতীতে। ইতিহাসের পাতা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। এ মরুভূমিতে দেখা দিয়েছিল একদিন প্রাণ-বন্যা, উঠেছিল বিচিত্র জীবনের কলরোল। ময়েনজোদাড়োর বিস্ময়কর সংস্কৃতি-সভ্যতা সেই মুখর জীবনের প্রতীক। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা প্রাচীন মানুষের অক্ষয় কীর্তি। দেখতে পাচ্ছি দাহিরের পরাজয় ও লাঞ্ছনাম্লান মুখ, মুহম্মদ বিন কাসিমের বিজয়দীপ্ত চেহারা, দৃপ্ত পদক্ষেপ। মুসলিমের বিজয় কেতন। পরে আরো কত পরাক্রান্ত দাম্ভিক বিদেশীর উদ্ধত পদধ্বনি। তারপর এই বিগত শতকে তালপুর বংশীয়রা সিন্ধু শাসন করেছেন। ১৮৩১ সনে বৃটিশের নজর পড়ল সিন্ধুর ওপর। তালপুরেরা সে শ্যেনদৃষ্টির সামনে টিকতে পারল না। ১৮৪৩ সনে সিন্ধু পড়ল বৃটিশ খপ্পরে।

কতক্ষণ অতীতের ইতিহাসলোকে ছিলাম জানিনে, আবার যখন নিজের মধ্যে ফিরে এলাম, তখন দেখছি ট্রেন কোটরি স্টেশনে থেমেছে। কোটরি একটি ক্ষুদ্র শহর—সিন্ধুর আঞ্চলিক শাসন ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

এক ঘণ্টার মধ্যে হায়দরাবাদ পৌছলাম। হায়দরাবাদ প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী, তখন আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র। বড় শহর। লোকসংখ্যা শুনলাম প্রায় তিন লক্ষের মতো। রাজধানীসুলভ সব প্রতিষ্ঠানই আছে। দু-তিনটে সিন্ধি ও উর্দু দৈনিক বের হয় এখান থেকে। আমরা সরকারি অতিথি। আমাদের দেখাশুনার ভার পড়েছে হায়দরাবাদের ইনফরমেশন বিভাগের উপর। ইনফরমেশন অফিসার ও তাঁর দুই সহকর্মী জনাব হাজী আবদুর রহমান আর জনাব আলাড়ী দায়-সারানো সরকারি কাজ হিসেবে আমাদের ভার নেননি, বরং শ্রদ্ধেয় পারিবারিক অতিথি হিসেবেই বরণ করেছিলেন। তাঁদের সৌজন্য, আন্তরিকতা, যত্ন-আপ্যায়ন আমাদের অভিভূত করেছে। দু-দিন আমরা সেখানে ছিলাম। আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে থাকতেন। হালিম সাব সুদ্ধ এ চারজন সিন্ধি ভদ্রলোকের আচরণ সুপ্রাচীন আরবি ঐতিহ্যের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

প্রাণের স্পর্শে প্রাণ জাগবেই। তা প্রেমে হোক, প্রীতিতে হোক কিংবা সৌজন্যে হোক। তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তায় আমরাও তাই তাঁদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলাম। ভুলে গেলাম যে তাঁরা সরকারি কর্মচারী, কর্তব্য করছেন মাত্র, তাই বিদায়কালে আত্মীয় বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করেছি।

হায়দরাবাদ থেকে বাসে ভিটশাহ্ যাত্রা করলাম। পাকা ঋজু রাস্তা চলে গেছে লাহোর পেশোয়ারে। দু-ধারে সবুজের সমারোহ। মনে হচ্ছে, বাঙলা দেশেরই কোথাও শরতে ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছি। মনে হয় পানির স্পর্শে পাষাণ-প্রাণ অহল্যা জেগে উঠেছে। মরুতে সোনা ফলেছে। গম আর তূলা ক্ষেত। বাড়ন্ত ফলন্ত অবস্থা। দেখলে চোখ জুড়ায়।

সিন্ধু জেগেছে। তার মাটি জেগেছে, তার মানুষ জেগেছে। প্রাণের পরশ মাটির ফসল সে উল্লাস ব্যক্ত করছে নৃত্যের তালে তালে। আর মানুষের আশাপ্রদীপ্ত প্রাণে দেখা দিয়েছে কর্মচাঞ্চল্য। মরু বালুকার বুকে যেমন জেগেছে জীবন-স্বপ্ন, তেমনি সিন্ধিরাও করেছে বৃহৎকে তাদের ধ্যানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তু। দুটোই সম্ভব হয়েছে শুক্কুর ও গোলাম মোহাম্মদ বাঁধ প্রভৃতির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ফলে। প্রকৃতি-নিগৃহীত সিন্ধিরা এভাবে প্রকৃতিকে এনেছে বশে, আর তাদের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিচ্ছে বাস্তবায়নের পথে। এসবের আভাস পেয়েছি সাধক কবি শাহ্ আবদুল লতিফ ভিটাই-এর উর্‌সের মেলায়। বসতি-বিরল সিন্ধুর জনসংখ্যা হচ্ছে মাত্র চল্লিশ লক্ষ।

দূরদূরান্তর থেকে দুইদিনব্যাপী মেলায় এসেছে প্রায় দু-লক্ষের মতো লোক। চল্লিশ লক্ষের মধ্যে দু-লক্ষের উপস্থিতিতেই সাক্ষ্য দেয় যে, শাহ্ আবদুল লতিফ ভিটাই সিন্ধিদের হৃদয়-রাজ্যের রাজা ও জাতীয় মানসের প্রতীক। তাই আজ ভিটাই-বার্ষিকী দূরদেশের উর্‌স মাত্র নয়, বরং জাতীয় মহোৎসব। এ উৎসবের মাধ্যমে সিন্ধু নিজেকে প্রকাশ করছে। স্থির করেছে নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য। শাহ আবদুল লতিফের সাধনা ও বাণীর মাধ্যমে জাগছে তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা। আর জীবনের দিশাও তারা খুঁজছে সেই আলোকে। আবদুল লতিফ ভিটাই ইতর-ভদ্র ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই প্রিয়। অশিক্ষিতরা তাঁর কাছে যায় অভীষ্ট সিদ্ধির বাঞ্ছা নিয়ে; আর শিক্ষিতেরা তাঁর মধ্যে খোঁজে জাতীয় মানসের স্বরূপ। অশিক্ষিতের কাছে লতিফ ঐহিক জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা-সহায় আর অধ্যাত্ম জীবনের পীর এবং শিক্ষিতের চোখে তিনি জাতীয় মনন ও সংস্কৃতির প্রভিভূ। অশিক্ষিতেরা করে উর্‌স আর শিক্ষিতেরা করে স্মৃতিবার্ষিকী। এভাবেই শাহ লতিফ হয়েছে সিন্ধিদের আশা-ভরসা ও লক্ষ্যের অবলম্বন। এক কথায় লতিফ National hero, সবাই তাঁর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়। দেখেশুনে মনে হয়, লতিফের সাধনা ও বাণী আদর্শ করেই সিন্ধু জেগেছে, সিন্ধু জাগছে।

এবার শাহ্ লতিফের পরিচয় দেব। মহৎ জীবনের উপর অলৌকিকতা আরোপ করা একটি মানবিক দুর্বলতা। শাহ্ লতিফ-চরিত্রও এই অলৌকিকতার প্রলেপ থেকে মুক্ত নয়। তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত কাহিনী চালু আছে। ভক্তজনের কল্পনাপ্রসূত এসব কাহিনী থেকে তথ্য ও সত্য উদ্ধার করা সহজ নয়। তাই আগে শাহ্ আবদুল লতিফের জীবনী লিখিত হয়নি। তবে যাঁরা দশের উপরে বড় হন, তাঁদের জীবনে হয়তো কিছু অসামান্যতা থাকে। সে অসামান্যতাই ভক্তজনের চিত্তমুকুরে অলৌকিকতার রূপ ধরে প্রচার লাভ করে।

১৬৮৯ সনে হায়দরাবাদের হালাহাবেলী গ্রামের এক প্রখ্যাত সৈয়দ বংশে শাহ্ লতিফের জন্ম। তাঁর পিতার নাম শাহ্ হাবীব। প্রপিতামহ শাহ্ আবদুল করিম কবি ছিলেন। পীরালিই পারিবারিক পেশা। মেধাবী লতিফ অল্প বয়সেই আরবি, ফারসি ও ইসলামে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

হালাহাবেলী অঞ্চলে এক তায়মুরী পরিবার ছিল চেঙ্গিস-তৈমুরের বংশধর এবং দিল্লীর বাদশাহর জ্ঞাতি বলে সমাজে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্য ছিল। শাহ লতিফেরা ছিলেন তাঁদের পীর-পরিবার। একবার তায়মুরী পরিবারের প্রধান মীর্যা মুঘল বেগের কুমারী কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিরাময়ের জন্যে আল্লাহর নাম কালাম পড়ে দোয়া করবার জন্যে ডাক পড়ল পীর শাহ হাবীরের। তিনি কোনো কারণবশত যেতে পারলেন না , পাঠালেন কিশোর ছেলে লতিফকে। পীরের কাছে পর্দা নেই। কাজেই লতিফকে অন্দরে রোগীর শয্যাপাশে নেয়া হল। বয়োধর্মের গুণে লতিফ প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হলেন। এবং তার হাত ধরে আত্যন্তিক আবেগে তাকে প্রেম নিবেদন করলেন। বললেন, 'সৈয়দের হাতের ছোঁয়া লেগেছে যার আঙুলে, সাগর তরঙ্গের সাধ্য নেই তাকে ছিনিয়ে নেয়।" দেশজ প্রথায় এটা যথার্থই পাণিগ্রহণ। পীর-পুত্রের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করা মীর্যা মুঘল বেগের পক্ষে কঠিন হল। কলঙ্কের ভয়ে তিনি এ কথা প্রকাশ করলেন না বটে, কিন্তু পীর-পরিবারের উপর নানাভাবে নিপীড়ন শুরু করলেন। ফলে শাহ্ হাবীব গাঁ ছেড়ে আত্মরক্ষা করলেন। এদিকে কিশোর লতিফ প্রণয়ে ব্যর্থতার আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘর ছাড়লেন এবং বিবাগী হয়ে, যোগী হয়ে সন্ন্যাসীদলে ভিড়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। এ সময়ে তিনি যোগশাস্ত্র ও সুফীমতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। কাবুল, কান্দাহার, হিংলাজ, যশল্মীর, কচ্ছ, কাথিওয়ার, লাসবেলা, মাকরান প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করলে তিনি নানা ধর্মমত ও বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। এ অভিজ্ঞতার প্রভাবে তিনি নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন, নারী-প্রেম ভূমা-প্রেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নীত হল। ঐহিক কামনা পরমের সাধানায় রূপ পেল। তিনি হলেন যোগী সূফী এবং সাধক কবি। বিবাগী জীবনে তিনি স্বরচিত দোহরা গেয়ে বেড়াতেন। আমাদের পদাবলীর সঙ্গে দোহরার একদিকে মিল আছে ; কেননা এগুলো মানবিক ও অধ্যাত্ম- এই উভয় প্রেমের গান হিসেবে উপভোগ করা চলে।

বহুকাল পরে তিনি ঘরে ফিরলেন। এদিকে মীর্যা মুঘল বেগের পরিবারে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পীর-পরিবারের উপর পীড়ন করার ফলেই দুর্ভাগ্যের দুর্দিন দেখা দিয়েছে মনে করে অনুতপ্ত মীর্যা মুঘল বেগ লতিফের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। এ কাহিনী 'ঘোট ভিটাই' (ভিটাইয়ের দুলামিয়া) নামে আজো চালু আছে।

এবার গৃহী সাধক লতিফ ইরানি সূফী কবিদের মতো পুরোনো লৌকিক প্রণয় গাথাগুলোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার—মানুষ ও আল্লাহ্র প্রেমের রূপকে রূপান্তরিত করেন। এগুলোও রুচিমতো মানবিক প্রণয় কিংবা অধ্যাত্মপ্রেমের রূপক হিসেবে আস্বাদন করা যায়। এতে স্বদেশপ্রেম, সাহস প্রভৃতি ব্যবহারিক গুণের আলেখ্য আছে। এভাবে পুরোনো প্রণয় গাথাগুলোক তাঁর হাতে নতুন মহিমায় উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 'মুহনী মহিয়াল', 'শশীপুন্ন', 'হির ঝনঝা', 'মোমেল-রানু', 'লীলা-চানেসার', 'সোবথ দিয়া-বিজল,' 'মা আরভি-মারুঙ্গ-উমর' প্রভৃতি তাঁর অমর কীর্তি। কেউ কেউ বলেন, শাহ্ লতিফ ৩৬টি নাট্য-গাথার রচয়িতা।

১৮৬৬ সনে জার্মান পণ্ডিত Tremp-ই প্রথম শাহ্ লতিফের কাব্য-সংগ্রহ বের করেন। পরের বছর বোম্বাই সরকারের শিক্ষা দফতর থেকেও একটি সংশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সনে Dr.Surely তাঁর 'Shah Abdul Latif of Bhit Shah' নামের গবেষণামূলক গ্রন্থে লতিফের জীবনকাহিনী ও তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। হায়দরাবাদের সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় শাহ লতিফের রচনার নির্ভরযোগ্য সিন্ধি সংস্করণ ও তাঁর উর্দু তরজমা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়াও, পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ও বোম্বাই প্রদেশে শাহ্ লতিফ সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং সে সূত্রে তাঁর রচনার কিছু কিছু অনুবাদও হচ্ছে।

শাহ্ লতিফ সাধনা ও কবিত্বের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন। পীরালি সূত্রে লোকসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহ্যও ছিল সুপ্রাচীন। তাই তিনি সহজেই জনগণকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন, আর নিজেও হয়ে উঠেছিলেন তাদের আপন মানুষ। ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার ভাষা হিসাবেই চিরকাল মুখের বুলি সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে। সিন্ধি-ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহাসিক যুগে দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের, দরবারের ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা ছিল সংস্কৃত, তারপরে মুসলমান আমলে দরবার ও সংস্কৃতির ভাষা হল ফারসি, ইংরেজ আমলে হল ইংরেজি। তাই দেশের আঞ্চলিক বুলিগুলো স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে শালীন সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হতে পায়নি। তবু এর মধ্যে গৌতমবুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের ধর্মপ্রচারের বাহন হয়ে পালি ও প্রাকৃত, রাজপুত রাজাদের প্রশাসনের মাধ্যমরূপে অবহট্ট, এবং মধ্যযুগের কলন্দর, রামানন্দ, কবীর, দাদু, রামদাস, রজব, নানক, চৈতন্য প্রমুখের মতপ্রচারের বাহন হয়ে আধুনিক সাহিত্যিক ভাষাগুলো গড়ে ওঠে। ধর্ম প্রচার ও রাষ্ট্র পরিচালনার সহায়ক ভাষারূপে তুর্কী আমলে একবার এবং ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে আর একবার বাঙলা ভাষার বহুল চর্চা হওয়ার ফলেই বাঙলা অন্যান্য পাক–ভারতীয় আধুনিক ভাষাকে (রূপে ও সামর্থ্যে) অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু সিন্ধি ভাষা এ সৌভাগ্য থেকে অনেক কাল বঞ্চিত ছিলো। প্রধান কারণ, সিন্ধু ভারতের সীমান্ত-মুখের দেশ হওয়ায় চিরকাল বিদেশী আক্রমণের কবলে পড়েছে, স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পায়নি। দারা, আলেকজান্ডার, মুহম্মদ বিন কাসিম, মুহম্মদ গজনভী, মুঘল, নাদির শাহ, আহমদ শাহ প্রভৃতির আক্রমণের কবলে যে সিন্ধু প্রাণে মরেনি, তাই তা যথেষ্ট। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রী.) পর কুলহুড় বংশীয় নূরমুহম্মদ-আধা স্বাধীনভাবে সিন্ধু শাসন করবার অধিকার পান। কুলহুড়রা ছিলেন সিন্ধিভাষী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরবারি ভাষা ফারসি থাকা সত্ত্বেও এদের সময়েই সিন্ধি ভাষার বহুল চর্চা শুরু হয় এবং সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। অবশ্য পনেরো শতক থেকেই সিন্ধিরচনার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কুলহুড় বংশের পতনের পর তালপুর বংশীয়রা ১৮৪৩ সন পর্যন্ত সিন্ধুর শাসক ছিলেন। এরপর ইংরেজ শাসনে সিন্ধির কদর হ্রাস পায়।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় শাহ লতিফের বয়স ছিল আঠারো। কাজেই শাহ লতিফের বাকি জীবন কুলহুড় শাসনাধীনেই কেটেছে। শাহ্ লতিফের সূফীমত তাঁর সিন্ধি ভাষায় রচিত গানগাথার মাধ্যমেই প্রচার লাভ করে। তখনো এ ভাষা ও সাহিত্যে লোকবুলিও লোকসাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হয়নি। বিশেষ করে শাহ্ লতিফের উদ্দিষ্ট শ্রোতাও ছিল অশিক্ষিত জনগণ। শাহ্ লতিফ মুখে মুখেই তার গান ও গাথা রচনা করেন। (জনশ্রুতি এই যে, লতিফ লিখে লিখেই তাঁর গান ও গাথা রচনা করেন। কিন্তু অহংকার বিলুপ্তির জন্যে তিনি নিজের হাতেই তাঁর পুথিগুলো কিরার হ্রদের পানিতে ফেলে দেন।) গাইয়ে শিষ্যরা তা শ্রুতিস্মৃতিতে জিইয়ে রেখেছে এবং পুরুষপরম্পরায় তা মুখে মুখে চালু রয়েছে। অবশ্য শিক্ষিত লোকের পড়বার জন্যে আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে তার রচনাবলী লিপিবদ্ধ হয়। কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তাঁর রচনা অবিকৃতভাবে আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। তবু ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, সুরে, শব্দের চয়ন ও বিন্যাস-সৌন্দর্যে শাহ্ লতিফের রচনা সিন্ধিভাষায় অতুলনীয়। তাই আজো তিনি শ্রেষ্ঠ সিন্ধি কবি। তিনি একাধারে লোককবি, সাধক কবি এবং শালীন সাহিত্যের কবি-শিল্পী। এজন্যেই রসিক ও ভক্ত, পণ্ডিত ও মূর্খ, যোগী ও সূফী এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই তিনি প্রিয় কবি। আঙ্গিকের দিক দিয়ে সিন্ধি ভাষায় তাঁর বিশেষ দান 'ওয়াই'-শ্রেণীর কবিতা। সোরথ, মা আরভি, মা-আরবি, দোথী, মা আযুরী হোসাইনী, সোহিনী, কোহিয়ারী (পাহাড়ী) প্রভৃতি সুরে শাহ লতিফের গান ও গাথা গীত হয়।

পাঞ্জাবের বুলেহশাহ ও আমাদের লালন প্রভৃতি বাউল কবির সমগোত্রীয় ছিলেন লতিফ। সাধারণভাবে হয়তো বলা যায়—রুমী, জামী, হাফিজ প্রমুখ সূফী কবি এবং রামানন্দ, কবীর, দাদু কলন্দর, রজব প্রভৃতির উত্তরসাধক ছিলেন শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই। ভিট শব্দের অর্থ টিলা, আর টিলাবাসী বলে ভিটাই এবং শাহর টিলাই হল ভিটশাহ।

সূফী বৈষ্ণবদের মতো পরমের বিরহবোধই শাহ লতিফের অধ্যাত্ম-প্রেরণার উৎস এবং পরমের সাথে মিলনই কবির সাধনার লক্ষ্য।

বৈষ্ণব কবি বলেন :

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন ন গেল।

লতিফও বলেন:

প্রিয়তমা মোরে ছাড়িয়া গিয়াছে
হৃদয় আমার বিরহে বিধুর,
প্রেম থেকে আমি বঞ্চিত তাই
পরাণে বাজিছে বেদনার সুর।

এবং প্রেমিকের গানে না-পাওয়ার সুর চিরকাল তাই ধ্বনিত হয়।

কিংবা — আমার হৃদয় একটি বহ্নিশিখা
অবিরাম জ্বলছে। সেই জ্বালিয়েছে
শিখাটি যাকে আমি ব্যাকুল হয়ে
খুঁজে চলেছি।

রবীন্দ্রনাথও বলেন :

আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূফীরা প্রেমের রাহে ফানা হয়ে যেতে উপদেশ দেন। শাহ্ লতিফেও তাই পাই—'হে পতঙ্গ, প্রেমের অনল তোমায় ইশারায় ডাকছে। ভয় পেও না তুমি, ঝাঁপ দাও নিঃসঙ্কোচে। সে-অনলে পুড়ে পুড়ে খাঁটি হবে তোমার চিত্ত।'

লতিফ আরো বলেন :

'আশেক মাশুকে কোনো ভেদ নেই। সাগর আর ঢেউ যেমন মূলত এক হয়েও দুইরূপে দেখা দেয়, কিংবা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি যেমন দুই সুরে বেজে উঠে, আত্মা ও পরমাত্মাও তেমনি ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র।'

লতিফ তাই বলেন :

'তুমি বৃথাই দূরের পথে যাত্রা করছ ; চেয়ে দেখ, বন্ধু তোমার কাছে রয়েছে—রয়েছে তোমার মেঝের উপর। যাকে পাওয়ার জন্যে এত দুঃখ পাচ্ছ, সে তো তোমার ভিতরেই বাস করে। তাকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে খোঁজো। তোমার পায়ের পর্যটন থামাও। এবার হৃদয়পথে মন চালাও। কেননা, পায়ে হেঁটে কচ্ছদেশে পৌছার সে সাধ্য নেই।'

আমাদের বাউল কবিও তাই বলেন :

লামে আলিফ লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা না হলে কি সব নূরের তন
আদম তনকে সেজদা জানায়।

অথবা —

এ মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
যারে আকাশ পাতাল খোঁজো
এই দেহে তিনি রয়।

কিংবা —

দেহের মাঝে আছে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

অথবা —

আছে তোরই ভিতর অতল সাগর
তার পাইলি না মরম।
তার নাই ফূলকিনারা শাস্ত্রধারা নিয়ম কী রকম।

রবীন্দ্রনাথও বলেন—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
আমি তাই হেরি তায় সকল খানে।

অথবা —

ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে আমার বুকে
ওরে দেখরে আমার দুনয়নে।

কিংবা —

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি,
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাইনি।

রুমীও বলেন—

আমি দেখলাম, তিনি আমার অন্তরেই আছেন, আর কোথাও নাই।

লালনের —

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধি মরমী কবি সাচালও বলেন —

প্রিয়তম আমার হৃদয়েই আছেন, তিনি আমার দেহ-বাগের
কোকিল, আমি প্রিয়তমকে আমার হৃদয়ের মধ্যেই দেখেছি,
দিল-আলো-করা তিনি এসেছিলেন আমার চেতনার সীমার
ভেতরে।

আল্লাহ বলেন—

মো কো কহাঁ ঢুড়োঁ বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
না মৈঁ দেবল, না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ।

(কবীর)

কলন্দর বলেন —

নহো মোল্লা, নহো ব্রহমন দুই কো ছোড় কর পূজা
হুকুম হৈ শাহ কলংদরকা আনলক কহ্য তাজা।

মদন বলেন —

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।

লতিফও বলেন —

আল্লাহ হচ্ছেন প্রেমের বশ। তাই তিনি বলেন,
তোমার হৃদয় কর আলিফের লীলাস্থল
তাহলেই বুঝবে তুমি কেতাবী গানের অসারতা।
জীবনকে দেখতে শেখো, তাহলে বুঝবে
আল্লাহর নামই যথেষ্ট। প্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা
যার জেগেছে, সে কেবল প্রিয়তমের পাঠই পড়ে।

কিংবা —

প্রিয়তমের পথ অতি সরল ও প্রশস্ত
কেবল কামনা-বাসনার কাঁটাই তাকে আকীর্ণ করেছে।

অথবা —

নামাজ রোজা ভালো বটে
কিন্তু প্রিয় মেলে অন্য বাটে।

হাফিজও বলেন —

ঢালো সুরা সখি সাজাও পেয়ালা শরম আছে কি তায়
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো ধরম যাহারা চায়।

কবি সাচাল বলেন—

পাপ-পুণ্যের পথে আল্লাহকে কেউ জানতে পায় না।

বেদিল বলেন —

পুথি পড়ে কী হবে; কেবল ফানার তত্ত্ব শেখো।

শাহ লতিফ বলেন—

আমার চোখদুটো দেখে কেবল দেখে
তারা দেখেছে প্রেমে এবং চিনেছে প্রেম
আর তাই ফিরে এসেছে আমার কাছে।

কিংবা—

প্রিয়তম তুমি যখন আমার তখন পৃথিবী আনন্দে গেয়ে ওঠে
পথে পথে তৃণ-লতা-ফুল তোমাকে চুম্বন করে ধন্য হয়।
তোমাকে দেখে আমার সকল আশা মুহূর্তে মিটে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথও বলেন—

তোমার আমার মিলন হবে বলে
এমন ফুল্ল শ্যামল ধরা।...

তাদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি
আমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।...

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

উপরে আমরা দেখতে চেয়েছি, দুনিয়াব্যাপী সব মরমী সাধকের এক বোল এবং সাধনার লক্ষ্যও অভিন্ন ; কেবল ভঙ্গিটি দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে বিচিত্র। আমাদের বাউল গানে যতটা ব্যবহারিক জীবন ও সমাজ-চেতনা রয়েছে, সিন্ধি মরমী সাহিত্যে ততটা নেই। আবার বাউল গানে ছন্দোমাধুর্যের বিশেষ অভাব আছে, সুরের লালিত্য এবং বৈচিত্র্যও কম। কিন্তু শাহ্ লতিফের গান ও গাথা রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই ছন্দোবদ্ধ কবিতা। শাহ্ লতিফ সচেতন সুরকার ও ছন্দকুশল শিল্পী। তার অধিকাংশ দোহরা, কাফী ও গাথার সুর তাঁর সৃষ্টি। সিন্ধিরা আজো তাঁর দেয়া সুরে তাঁর সৃষ্ট রাগ-রাগিণীতে যে কেবল তাঁর রচিত গানই গায় তা নয়: অন্যান্য গান এবং গাথায়ও তাঁর সাধা সুর প্রয়োগ করে। তাঁর অনেক গান ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙে গীত হয়। মরুভূ সিন্ধুর 'লু' হাওয়া যখন সিন্ধিদের দেহমন তপ্ত ও অশান্ত করে তোলে, তখন শাহ্ লতিফের দোহরার গীতমূর্ছনা তাদের দেহেমনে স্বস্তি-শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। কিংবা যখন জীবন-জীবিকার নানা যন্ত্রণায় তারা মুষড়ে পড়ে, তখনো শাহ্ লতিফের গানের অনবদ্য প্রাণ-জুড়ানো সুরে ও ভাব-রসে বিভোর হয়ে তারা স্নিগ্ধ প্রশান্তি লাভ করে। এক কথায়, শাহ্ লতিফের রচনা সিন্ধিদের জীবনমরুর মরূদ্যান। তাই সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, উৎসবে-পার্বণে, সাফল্যে-ব্যর্থতায় তারা শাহ্ লতিফের শরণ নেয়। সে শরণ তাঁর রুহের দোয়ার, তাঁর গানের—তার বাণীর। দু-শ বছর আগের শাহ্ লতিফ আজো সিন্ধিভাষীর হৃদয়-মনের একচ্ছত্র রাজা। তিনি তাদের প্রাণ জুড়ে বিরাজ করছেন, তাদের মন-মননের দিশা দিচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবীবুল্লাহ বাহার স্মরণে

প্রথমে চট্টগ্রামে, মধ্যে কোলকাতায় এবং পরে ঢাকায় 'বাহার' ছিল একটি প্রিয় নাম। প্রিয়জনের উচ্চারিত নাম চিত্তে একপ্রকার প্রসন্নতা আনে। 'বাহার'ও ছিল তেমন একটি মধুর ধ্বনি।

সুদীর্ঘ সুঠাম শ্যামল সুপুরুষ বাহার সাহেবের আঙ্গিক লাবণ্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। আবাল্য তিনি ছিলেন দেহে-মনে সুস্থ, সুন্দর ও প্রাণবান। তিনি অন্যের অন্তরের স্পর্শ পেতে যেমন চাইতেন, তেমনি নিজের অন্তরও মেলে ধরতেন অন্যের কাছে। তাঁর সঙ্গ-প্রিয়তা তাঁকে করেছিল বাক্‌পটু, বন্ধুবৎসল, অকপট ও পরার্থপর। তাঁর এই মানস-প্রবণতা বা চারিত্রিক গুণই তাঁকে করেছিল মজলিশি লোক ও আড্ডাবাজ। তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য এবং ব্যপ্তিও আসে হয়তো এই সঙ্গ-সুখ প্রবণতা থেকেই। খেলার মাঠে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের আসরে ও রাজনীতিক মঞ্চে তাঁর ছিল সমান আকর্ষণ, পাওয়া যেত তাঁকে সর্বত্র। তাঁর নির্দিষ্ট কোনো পেশা বা বৃত্তি ছিল না বলে তিনি সমান উৎসাহে যোগ দিতে পেরেছেন সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মে ও খেলাধুলায়। ক্রীড়া ও কর্ম দু-ই তাঁর কাছে সমান ছিল। তাঁর প্রাণময়তা ও আনন্দিত জীবনের উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সব ভাব-চিন্তা ও কর্মে। বাহার সাহেবের জীবন খেলা দিয়ে শুরু এবং সেবা দিয়ে শেষ। প্রথম জীবনে ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং পরবর্তী জীবনে বাক্‌পটুতাই তাকে জনপ্রিয় করে। তুচ্ছ কথাকেও রসিয়ে রসিয়ে বলে বা লিখে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার আশ্চর্য জাদু ছিল তাঁর আয়ত্তে। কারো নিন্দায় বা প্রশংসায় তিনি সমান মুখর থাকতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল আসূয়ামুক্ত ও স্বার্থবুদ্ধিবিহীন, তাই এ সব নিন্দা-প্রশংসায় তাঁর বিদ্বেষ বা অনুগ্রহ লোভ ছিল না। ফলে তা হত অনাবিল উপভোগ্য আড্ডা-রস।

২

বাহার সাহেবের মাতৃ ও পিতৃভূমি ছিল ফেনী মহকুমার পরশুরাম থানার অন্তর্গত উত্তরগুথুমা গাঁ। তাঁর প্রপিতামহ তমিজুদ্দীন চৌধুরী ওর্ফে তমিজুদ্দিন মুন্সী ছিলেন নোয়াখালী আদালতের ফারসিনবিশ উকিল। প্রমাতামহ আমজাদ আলি ছিলেন ইংরেজি জানা সরকারি চাকুরে—চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের প্রথমে পেশকার ও পরে Personal assistant. তমিজুদ্দীন মুন্সীর বজলুর রহিম, ফজলুল করিম, আব্দুল ওদুদ, শামসুদ্দীন প্রভৃতি পাঁচটি পুত্রই উচ্চ ইংরেজি শিক্ষালাভ করে চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলিম সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন এবং এ পরিবার প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠে। আমজাদ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল আজিজই নোয়াখালী জেলার প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। এই দুই পরিবারের অনেকেই পদস্থ সরকারি কর্মচারী, ব্যবহারজীবী ও জননেতা হিসেবে সরকারি খেতাব এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেন। আবদুল আজিজ বিয়ে করেন তমিজুদ্দিন মুন্সীর মেয়ে এবং আমজাদ আলির কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় বজলুর রহিমের। তমিজুদ্দিন মুন্সীর প্রথম পুত্র ফজলুল করিমের পুত্র নুরুল্লাহ চৌধুরী। নুরুল্লাহ চৌধুরী বিয়ে করেন আমজাদ আলির পুত্র খান বাহাদুর আবদুল আজিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে। বাহার সাহেব ও বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ এঁদেরই সন্তান। বাহার সাহেবের মাতৃ ও পিতৃকুলে উচ্চশিক্ষা ও ঐশ্বর্য দু-ই ছিল। বাহার-নাহার এই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্যুতি ও ঐশ্বর্যের প্রসাদের মধ্যে লালিত।

তা ছাড়া বাহার ও নাহার আরো একটি বিশেষ পরিবেশ পেয়েছিলেন। তা দুর্ভাগ্য দিয়ে শুরু বটে কিন্তু সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও সূচিত হয় সে-পথেই। খান বাহাদুর আবদুল আজিজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁর ছিল পাঁচটি কন্যা। আশ্চর্য, অতি অল্প সময়েই তিন কন্যার হয় মৃত্যু এবং দুই কন্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন বিধবা। বাহার সাহেবের মা ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি যখন বিধবা হন তখন তাঁর বয়স বিশের বেশি নয়। এবং বাহার তিন বছরের আর নাহারের বয়স তখন দেড় বছর। এসময় তাঁদের মা-খালারা এবং নানা-নানী সব জীবিত এবং সম্ভবত খালারাও অবিবাহিতা। আবদুল আজিজ সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী পরিদর্শক ছিলেন এবং চট্টগ্রাম শহরেই স্থায়ীভাবে বাস করতেন। এখানেই পিতৃহীন বাহার-নাহার নানা-নানী, মা-খালাদের চোখের মণিরূপে পরম আদরযত্নে লালিত হন। খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ জনহিতৈষী শিক্ষাবিস্তারকামী উদার-হৃদয় ও সাহিত্য-প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কাব্যচর্চাও করেছিলেন। সমকালীন বিরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশেও তিনি কন্যাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁরই ঘরে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাহার-নাহার লালন ও শিক্ষা পান। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে বাহার এবং ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে নাহারের জন্ম।

৩

শিশু স্বাস্থ্যবান হলেই চঞ্চল হয়, আর শৈশবের চাঞ্চল্যের অপর নাম দুরন্তপনা। এবং দুরন্ত ছেলেই বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে ক্রীড়াপ্রিয় হয়। আবার ক্রীড়াপ্রিয় মানুষ বন্ধু ও সঙ্গ-সুখকামী হয়। বাহার সাহেবের আবাল্য এসব বৈশিষ্ট্য ছিল। আজীবন আড্ডাবাজ থাকার মূলে রয়েছে এই মানসচেতনা। খেলোয়াড়েরা সাধারণত পড়ুয়া ছাত্র হয় না। বাহার সাহেব ছিলেন মাঝারি ছাত্র। বাড়ির পাশের চট্টগ্রাম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। আই-এসসি পাস করে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন—কিন্তু এ কর্ম আড্ডাবাজ ছেলের জন্য নয়, তাই চট্টগ্রাম কলেজে আরবিতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়তে থাকেন। পরীক্ষার সময় কিন্তু অনার্স পরীক্ষা দেননি। বিএ পাস করার পর তাঁর শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হয়।

AMARBOI.COM

৪

চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদী তরুণদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। অনন্ত সিং তাঁদের অন্যতম। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবে তাঁর সমর্থন ছিল না—তিনি নিয়মতান্ত্রিক-আন্দোলন সাফল্যে আস্থাবান ছিলেন।

তাঁর জীবনে বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব কখনো গভীর হতে পায়নি। তাঁর পারিবারিক প্রভাবই তাঁর চরিত্র নির্মাণ ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। নানা-নানী ও মা-খালাদের থেকে তিনি দুটো সম্পদ লাভ করেছিলেন—একটি সাহিত্য-প্রীতি এবং অপরটি নৈতিক-চেতনা। তাঁর জীবনে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগে পারিবারিক পরিবেশ থেকেই। ধর্মবুদ্ধি, আদর্শবাদ ও উদারতার সমন্বয় ঘটেছিল এ পরিবারের পরিজনদের চরিত্রে। বাহার সাহেবের মধ্যে আমরা এসব দুর্লভ গুণের উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ করি। খেলোয়াড় ও আড্ডাবাজ বাহারের আদর্শবাদ ছিল অনাবিল ও অটল, নৈতিক চেতনা ছিল প্রবল। তাই এই প্রাণবন্ত প্রবল পুরুষের জীবনের কোনো নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, ছিল না কোনো কাপট্য বা মিথ্যাচার। আদর্শ চরিত্র ও মহৎ জীবনের অনুধ্যানেই তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁর রচনাবলীর অধিকাংশই তাই চারিত্র্যপূজার ও কীর্তিমান পুরুষের কর্মের অনুধ্যানের নিদর্শন।

ধর্মভাব ও আদর্শবাদ তাঁকে অতীত ও বর্তমানের মুসলিম জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র- চিন্তায় উৎসাহী করেছে। তাঁর স্বধর্ম ও স্বধর্মীপ্রীতি বিধর্মী-বিদ্বেষ জাগায়নি। তাই তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিন্দা চিরকালই অসূয়ার হুল-মুক্ত ছিল। তার 'হিং ও হালিম' তাই বিদ্বিষ্টমনের বিষ ছড়ায়নি, রসিকজনের চিত্তে কেবল রসই সিঞ্চিত করেছিল। গাল যে খেলো আর গাল যে দিল—উভয়েই রইল পাঠকের উচ্চহাস্যের আধার হয়ে। 'হিং ও হালিমে' কলমের জোর যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি কলমের পশ্চাতে যে-মন ক্রিয়াশীল ছিল, তার প্রসারও হত আভাসিত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর নিন্দা-গালিও যে অশ্লীলতা-মুক্ত হতে পারে, তা বাহার সাহেব নতুন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনে তিনি তাসে আসক্ত ছিলেন। 'তাসে নাশ' এই আপ্তবাক্যের প্রভাবে তাঁর মা তাঁকে তাস খেলতে নিষেধ করেন। এই নিষেধের পরে তিনি জীবনে আর তাস স্পর্শও করেননি। এ-কথা আমি তাঁরই মুখে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শুনেছিলাম।

সাহিত্যিক হিসেবে মহৎ জীবনের চরিত্র ও কৃতির আলোচনা মাধ্যমে নৈতিকচেতনা, আদর্শানুগত্য ও মহৎভাব জাগানোর সচেতন প্রয়াস ছিল তাঁর। সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি তার প্রমাণ। তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গিতে এক দুর্লভ লাবণ্য ও আকর্ষণ-শক্তি ছিল। বক্তা হিসেবে তিনি যেমন শ্রোতাকে অভিভূত রাখতে পারতেন, আলাপচারী হিসেবে যেমন উপস্থিত ব্যক্তিকে একটানা পাঁচ-সাত ঘণ্টা ধরে রাখতে পারতেন, লেখক হিসেবেও তিনি পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করতে জানতেন। অনর্গল অনবরত রসিয়ে রসিয়ে অক্লান্তভাবে কথা বলার সে কী আশ্চর্য সামর্থ্য ছিল তাঁর। এজন্যেই তাঁর সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য ছিল তাঁর বন্ধু-বান্ধবের পক্ষে। তাঁর সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকা এবং রচিত 'পাকিস্তান' গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যপ্রাণতার ও রাজনীতি প্রীতির নিদর্শন। তাঁর দেখবার দৃষ্টিও ছিল তীক্ষ্ণ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিবেশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবার অদ্ভুত শক্তি রাখতেন। এ সূত্রে কলম্বোর চিঠি ও জেনেভার চিঠি স্মর্তব্য। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত অবধি তিনি একটি তাজা তরুণ প্রাণ বয়ে বেড়াতেন। রসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবন ও জগৎকে, প্রতিবেশ ও প্রতিবেশীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর চারদিককার ভবন থেকে তিনি জীবনরস গ্রহণ করেছেন অবাধে এবং দিয়েছেন অকাতরে সবাইকে যারা তাঁকে বেষ্টন করে থাকতেন। তিনি এভাবে অন্তরে-বাইরে এক আনন্দলোক সৃষ্টি করে জীবনকে উপভোগ করতে ও করাতে চেয়েছেন। জীবনে তিনি চাকরি করেননি। তাই তাঁর সময় ছিল অঢেল, প্রয়োজন ছিল সামান্য, লোভ ছিল অজ্ঞাত, ঔদাসীন্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঔদার্য, সবটা মিলে এক নির্ভাবনার জীবন। তিনি ভালোবাসতে জানতেন। জীবনভরে ভালোবাসা দিয়েছেন এবং ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। তাঁর জীবনে প্রীতির লেনদেনই ছিল মুখ্য। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর প্রতিপত্তি ও সাফল্য আসে এই স্বতঃস্ফূর্তপ্রীতির পথেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাকাকাব্যে মৃত্যু-মহিমা

রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্রোহী-বিপ্লবী সংগ্রামী কবি নজরুল ইসলামের পূর্ব-সূরী ও বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষাগুরু, সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি। বলাকাকাব্য থেকে এখানে বিপ্লবী-সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তুলে ধরছি।

ইন্দ্রনাথ চরম তাচ্ছিল্যে শ্রীকান্তকে বলেছিল, মৃত্যুকে ভয় কি, 'মরতে তো একদিন হবেই।' নৌকাডুবি হয়ে, গাড়িচাপা পড়ে, ঝড়-বন্যা-মহামারীর কবলে পড়ে রোজ কত কত অপঘাত-অপমৃত্যু হচ্ছে। মরণকে এড়ানো-আটকানো যায় না। মরতেই যদি হবে, তাহলে অন্য দশ প্রাণীর মতো অসহায় নিষ্ফল মৃত্যুর জন্যে সভয়ে অপেক্ষা করার চেয়ে স্বেচ্ছায় মহৎ মৃত্যুবরণ করাই তো মানুষের কাজ। সক্রেটিস, যিশু, ব্রোনো এমনি মহৎ মৃত্যুই হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। এ মৃত্যু বাঁচবার ও বাঁচাবার জন্যেই। এক প্রাণ দিয়ে লক্ষ কোটি প্রাণের নিরাপত্তা দানই এমন মৃত্যুর লক্ষ্য। প্রয়োজনমতো যে মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার অধিকার তারই। সময়মতো যে মরতে জানে সেই বাঁচিয়ে রাখে জগৎ-সংসারের মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যেই সে সগৌরবে সার্থক হয়ে বাঁচে। 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিব দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

যিশু ক্রুসে বিদ্ধ হয় রক্ত দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন প্রাণ। তাঁর রক্ত ধুইয়ে-মুছে দিয়েছে কোটি কোটি পাপী-তাপী খ্রীস্টানের পাপ-তাপ এবং তাঁর এক প্রাণের বিনিময়ে কোটি কোটি প্রাণ পেয়েছে ত্রাণ। তাই যিশু হলেন মানুষের ত্রাণকর্তা Saviour এবং যে-ক্রুসে যিশু বিদ্ধ হয়েছিলেন তা হল মানুষের প্রাণরক্ষক বর্ম। এমনি করে মৃত্যুর বিনিময়ে জাগে প্রাণ, বিকাশ পায় জীবন। দুনিয়াব্যাপী মানুষের অগ্রগতির মূলে রয়েছে বীর মুযাহিদের আত্মদান।

স্বার্থপর লোভী নিজেও শেষ অবধি বাঁচতে পারে না, অন্যকেও বাঁচতে দিতে জানে না। তার লোভ ও আত্মরতি তাকে পরস্বে ও পীড়নে প্ররোচিত করে। লোকহিতার্থে তাকে ঠেকানোর জন্যেই ত্যাগবীরের প্রয়োজন। যে-দেশে যে-সমাজে তেমন লোকের অভাব, সে-দেশের ও সে-জাতির জীবন-যন্ত্রণা কেবলই বাড়ে। ভীরুরা আত্মসংকোচন করে ও পালিয়ে বাঁচতে চায়। আত্মসংকোচন ও পলায়ন নামান্তরে আত্মবিলোপ বই কিছুই নয়। কেননা ওতে লোভীর লোভ ও দুর্বৃত্তের পীড়ন-স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। মানুষের জীবনে ও জীবিকার যেখানে যতটুকু নিরাপত্তা রয়েছে তা তো ঐ নির্ভীক ত্যাগবীরের প্রাণের বিনিময়েই লব্ধ। এবং প্রয়োজনমতো প্রাণদানে সমর্থ কিছুসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিই তো লোভী হিংস্রকে সংযত রেখেছে। দুর্বৃত্তের সম্বল বুদ্ধি ও বাহুবল। এগুলোর সীমা আছে। লোক-রক্ষক সংগ্রামীর শক্তির উৎস হচ্ছে সদিচ্ছা ও মনোবল। এ শক্তি তাই অসীম, অপরিমেয় ও অফুরন্ত। ত্রাসের ঝড় বিভীষিকাময় কিন্তু ক্ষণজীবী, ত্রাণের বায়ু মৃদু-প্রবাহী কিন্তু স্থায়ী ফলপ্রসূ। দুর্বৃত্ত নামে ঝড়ের বেগে এবং গতিও তার ঝড়ো। জনে জনে হয় জনতা। তার বেগ বন্যার। এবং বন্যা বাঁধ মানে না। জনতার সৃষ্টি রক্তবীজে। কেটে-মেরে তাকে নিঃশেষ করা যায় না। কেবলই বাড়ে, অসংখ্য ও অজয় হয়ে বাড়ে। বাহুবলে বলীয়ান দুর্বৃত্ত সিংহচর্মের আবরণে শৃগাল।

তাই আত্মপ্রত্যয়ী জনতা যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন সেই দুর্বৃত্তপীড়ক—

'পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যায় মিশে।'

কেননা, 'কেহ নাহি সহায় তাহার
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা
আপনার মনে মনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোবল আসে ন্যায়নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় থেকে। সদিচ্ছা ও কর্তব্যবুদ্ধিই মানুষকে করে নির্ভীক ও আত্মদানে অনুপ্রাণিত। তেমন মানুষই পা বাড়ায় বিপদের মুখে। এগিয়ে যায় নিশ্চিত মৃত্যুর পথে। কেননা সে জানে, পরিণামে জয়ী হয় শহীদেরাই। ভয়-সংশয় দলিত করে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে যে প্রথম এগিয়ে যায়, সেই-দেশ-জাত মানুষের ত্রাণকর্তা। পৌরুষ ও কাপুরুষতার মধ্যে ব্যবধান ঐ এক কদমেরই। ঐ বাড়তি কদমেরই নাম বীরত্ব, আত্মত্যাগ, নেতৃত্ব, মনুষ্যত্ব এবং লোকত্রাণ। জগতে ও জীবনে শক্তির ও সংগ্রামী প্রেরণার উৎস ঐ আগে-বাড়ানো কদমটিই। এই বাড়তি কদমের মূলে রয়েছে যে জাগ্রত চিত্ত, সে-চিত্ত আগেই জীবনের প্রসাদরূপে গ্রহণ করে :

কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। (৪৫)

সে-চিত্ত জানে—পীড়ন হবে যত প্রবল, মুক্তি আসবে তত দ্রুত। শিকল পরেই বিকল করতে হয় শিকল, একপ্রাণের বীজ সৃজন করতে হয় কোটি প্রাণ, বুকের রক্তই হয় রক্তবীজ যা সৃষ্টি করে অসংখ্য-অজেয়-অমর আত্মা। এমন মানুষের নেতৃত্বেই তো দেশ-জাত ও ধর্ম রক্ষার জন্যে মানুষ চিরকাল অকাতরে প্রাণ দিয়েছে—মরণোৎসবে উল্লসিত হয়েছে, 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে' তুলেছে বিদ্রোহের ধ্বজা। যারা প্রাণের মমতায় প্রাণীমাত্র, তারা প্রাণটা জিইয়ে রাখার জন্যে সদসতর্ক থেকেও অকালে- অসময়ে-অকারণে-অঘোরে প্রাণ হারায়; আর যারা প্রাণের মূল্য বোঝে, তারা দেশ-জাত-মানুষের ত্রাণের জন্যে প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণটি দিয়ে প্রাণের মূল্য প্রমাণ করে। এবং ধন্য হয় নিজে, ধন্য করে জগৎ সংসারকে।

'আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে?' (৩)
দিনে দিনে যখন 'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি' (৩৭)
তখন বন্ধন পীড়ন-দুঃখ অসম্মান ক্ষুব্ধ মৃত্যুঞ্জয় তরুণেরা —

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি-অভিমান। (৩৭)

দূর করবার জন্যে নেমে পড়ে বন্ধুর পথে। ঝড়ো হাওয়ার মতো, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ-সমুদ্রের মতো তারা প্রতিবাদের রোল-কল্লোল জাগায়। তখন বিশ্বজগৎ অবাক হয়ে দেখে আর শোনে 'ঝড়ের মাতন, বিজয় কেতন নেড়ে, অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে' (১) এগিয়ে চলছে তরুণরা। এবং

ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে। (৩৭)

প্রপীড়িত আত্মার বন্ধন জর্জরতা ঘুচাবার সংকল্পে দৃপ্ত নির্ভীক তরুণের কণ্ঠে জেগে উঠে মরণজয়ী-গান :

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়?
ঝাঁপ দিয়েছি অতল পানে
মরণ-টানে। (২২)

মরণপণ সংগ্রাম তাদের। তারা জানেই :

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো সুখের-সম্পদের ও কোনো খ্যাতি-ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে তরুণদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্বান করেননি। গ্যারিবল্ডীর মতোই তিনি সংগ্রামী সৈতিকদের ডাক দিয়েছেন-দুঃখ যন্ত্রণার ও মৃত্যুর পথে। তাঁর মতে যে প্রয়োজনমতো মরতে ও মারতে জানে, বাঁচবার ও বাঁচাবার যোগ্যতা রয়েছে তারই। দেশ-জাতমানুষের হিতার্থে আত্মাহুতি দিতে পারে, সমাজে তেমন তরুণের আবির্ভাব তিনি চিরকালই কামনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস 'জীবন-মৃত্যুকে যে পায়ের ভৃত্য' করেনি, তেমন মানুষ দিয়ে দেশ-জাত-মানুষের কোনো কল্যাণ আসতে পারে না, কেননা সারা দুনিয়াব্যাপী পাশব-শক্তিরই দানবীয় লীলা চলছে। তার মোকাবেলার জন্যে দিতে হবে রক্ত ও প্রাণ, দিতে হবে শোণিত ও জীবন। এভাবেই দূর করা সম্ভব —

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল
যত হিংসাহলাহল।(৩৭)

মানুষের প্রাণে মানুষ যত বিষ মিশিয়েছে, সে বিষ ধুইয়ে-মুছে ফেলবার জন্যে চাই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির রক্ত। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ত্যাগবীর তরুণের রক্ত ও প্রাণ'দান কামনা করেছেন নব-দানবের দেয়া দারিদ্র্য-পীড়ন-যন্ত্রণা থেকে মানুষের মুক্তির জন্যে। এই দানবের সাথে লড়াইয়ের জন্যে ঘরে ঘরে যে লড়িয়ে-তরুণ প্রস্তুত হচ্ছে, তাও তিনি দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এবং এ-ও জানতেন :

কোনো ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণ শৃঙ্খে আহ্বান করিছে তার নাম। (১৬)

আমরা যারা বাঁচবার মতো বাঁচতে জানলাম না, পারলাম না মরার মতো মরতে, এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের আত্মাহুতির সহজ প্রবণতা দেখে আমরাও জীবনে হঠাৎ করে খুঁজে পাই শক্তি, গর্ব ও প্রত্যয়। ভাবীসংগ্রামে শহীদেরাই হয়ে থাকে প্রেরণার উৎস ও পথের দিশারী।

রবীন্দ্রনাথের মতে, দুঃখ-বেদনা ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঘটে নবযুগের ও নতুন জীবনের অরুণোদয়। যে-পোষ মানে, সে মরে, যে অতীতকে আশ্রয় করে, সে হয় জীর্ণতায় অবসিত। কাজেই বিপদ সামনে নয়, পশ্চাতে। পশ্চাতই—পুরাতনই মানুষকে গ্রাস করে :

ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।..
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে। (৩)

সম্মুখের বাধার আহ্বানে যে সাড়া দেয়, জীবনযাত্রায় সেই হয় জয়ী। জীবন তার কাছেই ধরা দেয়। সে জানে সামনে নতুন দিন। প্রভাত হতে দেরি নেই :

নতুন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব নাই আর। (৩৭)

রবীন্দ্রনাথের চিরকালই এ-বিশ্বাস ছিল যে-কোনো মহৎ মৃত্যুই বৃথা যায় না এবং রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে ছাড়া কোনো মহৎ কল্যাণ, কোনো বৃহৎ মুক্তি আসতে পারে না। কেননা পাপ ও পীড়ন, অন্যায় ও শোষণ দানবীয় শক্তিরই দান। সেই রাক্ষুসে রাহু- গ্রাসই ম্লান করে দিয়েছে— কালো করে দিয়েছে পৃথিবীর আলো। তাই আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে কবি প্রশ্ন করেছেন :

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর ছাড়া সবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ-দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীপন্থী ছিলেন না, তিনি শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবেলায় আস্থা রাখতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে

কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ব বাঙলার সবচেয়ে প্রিয় নাম। দুই বঙ্গেই এই নাম নিত্য উচ্চারিত এবং পূর্ববাঙলায় নিত্য আলোচিতও। এ প্রিয়তা যতখানি আবেগ সঞ্জাত, ততখানি বিচারসিদ্ধ যে নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বাঙালি মাত্রেই ছিল তাঁর কাব্যের রসমুগ্ধ, এবং অনুরাগপ্রসূত আবেগ-বশে তাঁকে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, গণসংগ্রামী, সাম্যবাদী, এবং মানবতার, যৌবনের, তারুণ্যের ও স্বাধীনতার কবি প্রভৃতি নানা আখ্যায় বিভূষিত করে কৃতজ্ঞ মানুষ তাঁদের আকূতির অভিব্যক্তি দিয়েছে।

তিনি বাঙালিকে চমকে দিয়েছিলেন, মাতিয়ে তুলেছিলেন ঠিকই। এবং এও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে-দেশে অর্ধজীবন নিন্দা ও তাচ্ছিল্য পেয়েছেন, নজরুল প্রথম দর্শনেই পেয়েছেন বরণডালা। এটি তাঁর প্রথম জয়।

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় বিপর্যয়, রুশবিপ্লব, বেঙ্গল প্যাক্ট, অসহযোগ, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, কোলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক ধর্মঘট, স্বরাজবাদী প্রভৃতির উত্তেজনাকর পরিবেশে নজরুলের কবিকর্মের শুরু ও চরম বিকাশ। গণসমাজের সব মতবাদীরই ঠিক মনের কথাটি প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর রচনায়। কেননা তিনি কোনো একক মতে নিষ্ঠ ছিলেন না। বারোয়ারি দাবী মিটিয়েই তাঁর আনন্দ। তাঁর বাণীও নতুন ছিল না, কারণ এক্ষেত্রে পূর্বসূরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ। অবশ্য পাঠক-সমাজে তাঁদের প্রভাব ছিল সামান্য। তার মুখ্য কারণ তাঁদের বাণী যতটা তাত্ত্বিক, ততটা বাস্তব ছিল না। কিন্তু নজরুলের দৃষ্টি ছিল বাস্তব এবং ভঙ্গি ছিল অভিনব। ফলে তাকে মনের কথার মুখপাত্ররূপে পেয়ে দেশের শিক্ষিত মানুষ হল প্রীত। এভাবে গণহৃদয়ে আসন হল তাঁর অনায়াসলব্ধ। তখন মানুষের ঔৎসুক্য ছিল উত্তেজনার ইন্ধন সন্ধানে এবং নজরুল তা না চাইতেই দিলেন অঢেল অজস্র। কাজেই নজরুল হলেন তাদেরই একজন। এই চারণ কবিকে আশ্রয় করেই তাদের যন্ত্রণা পেল অভিব্যক্তি, উত্তেজনা পেল প্রকাশ-পথ এবং তারুণ্য ও বাহুবল হল মহিমান্বিত। নজরুল হলেন গণকবি, তারুণ্যের কবি, যৌবনের কবি, জীবনের কবি, মুক্তির দিশারী কবি। এটি তাঁর দ্বিতীয় সাফল্য।

তাঁর তৃতীয় সাফল্য আসে সঙ্গীতকার রূপে। গণমানসে এই নতুন সুরের আবেদনও ছিল তীব্র ও দ্রুত। প্রথম দুটো স্বীকৃতি এসেছে শিক্ষিত সাহিত্য-পাঠক থেকে। তৃতীয়টি এল গণমানুষ থেকে। অতএব নজরুলের জনপ্রিয়তা ছাপিয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকেও । এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা বিশেষ স্তরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচি অর্জিত না হলে রবীন্দ্রনাথ থাকেন নাগালের বাইরে। আসলে তো 'এবার ফিরাও মোরে, দীনের সঙ্গী, ধূলা মন্দির, অপমানিত, সবুজের অভিযান, নববর্ষ, শঙ্খ'[১] প্রভৃতি কবিতায় ও গানে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বাঙলার তরুণদের যে আহ্বান জানিয়েছেলেন, তাতেই সাড়া দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের আবেদন ছিল কানের কাছে—যা দৈহিক উত্তেজনা আনে ও লড়তে পাঠায় এবং যা স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষণজীবী। আর রবীন্দ্রনাথের আর্জি ছিল বিবেক ও বুদ্ধির কাছে যা দায়িত্ববোধে প্রবুদ্ধ করে, যার ফল পরোক্ষ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

যে পরিবেশে নজরুলের প্রতিষ্ঠা, তা আজ অপগত। এখন নজরুলকে কোনো্ দৃষ্টিতে দেখব, যাচাই করব কোনো্ নিরিখে, দৃষ্টি হবে কি ঐতিহাসিকের, নিরিখ হবে কি সাহিত্যের?

ঐতিহাসিকের বিচারে নজরুল যুগের দান ও যুগধর। তাঁর ভূমিকা ও সাফল্য সময়োচিত। তাঁর প্রয়াস ও প্রভাব উত্তেজনার মুহূর্তে গণমানসের চাহিদার আনুপাতিক। তাঁর চেতনা ও জীবনদর্শন পুরোনো ও স্থূল। সে কারণে তাঁর আহ্বান মর্মস্পর্শী ও গণ- বুদ্ধিগ্রাহ্য। কাজেই নজরুল Heor—জনমন অধিনায়ক।

উত্তেজনা জিনিসটি একমুখো বিশেষ চেতনার প্রসূন। কাজেই তা কেবল উদ্দীপক চায়, হিতাহিত পরখ করে না। অতএব নজরুলকে দিয়ে সমকালীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে গণবিক্ষোভ পেয়েছে অভিব্যক্তি। তাই নজরুল সফল ও সার্থক। গণমানসও কৃতার্থ এবং কৃতজ্ঞ। সুতরাং তাঁর ভূমিকা কালিক, তাঁর সাফল্য স্থানিক এবং তাঁর প্রয়াস সাহিত্যিক।[২] সদর্থেই বলা চলে, তিনি হুজুগ মিটানো যুগের কবি। তাঁর হালকা বক্রোক্তিই নিয়তি নির্দেশের মতো তাঁর সম্বন্ধে সত্য ভাষণের রূপ নিয়েছে :

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবি।

ইতিহাস হচ্ছে মুখ্যত কাল-চেতনার স্বাক্ষর। এবং Literature-ও is a journalism that lasts, কাজেই নজরুল-সাহিত্য এ তত্ত্বের স্বীকৃতি অনুসারে সাময়িক নয়, চিরন্তন। এক বিশেষ দেশ-কালে মানুষের জীবন-প্রতিবেশ ও জীবন-চেতনার অক্ষয় শৈল্পিক সাক্ষ্য।

৩

কিন্তু সাহিত্যশিল্পের দাবী অন্যতর। শিল্প- নিরিখে যাচাই করলে নজরুলের ঠাঁই কোথায়, দেখা যাক। যাঁরা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পক্ষপাতী, তাঁদের সঙ্গে আমাদের এখানেই ছাড়াছাড়ি। কেননা আমরা ভিন্নযুগের মানুষ। আমাদের কাছে নজরুল কেবল কবি-শিল্পী। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও সম্পর্ক সাহিত্যের হাটে। এখানে বক্তব্যের মূল্য কানাকড়ি, ভঙ্গির দাম অপরিমেয়, আদর্শের মূল্য গুরুতর, লক্ষ্যের প্রয়োজন স্বীকৃত, দর্শনের মিশ্রণ অভিপ্রেত। নজরুলের রচনায় আমরা কী পাই, এ তৌলে নজরুল কোথায় দাঁড়ান, খুঁটিয়ে দেখা যাক।

নজরুলের প্রথমদিককার সংগ্রামী কবিতায় রয়েছে কোরান-হাদিস ও গীতা-পুরাণের বাণীর ছান্দসিক রূপায়ণ। আস্তিক কবি ধর্মীয় চেতনার আশ্রয়ে, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বাণীর আবরণে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। পুরোনো কথাই পাঠকের সুপ্ত চেতনায় তীক্ষ্ণ করে তুলবার এ এক সুপ্রয়াস মাত্র। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙ্গার গান স্মর্তব্য। এক্ষেত্রে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কবির জীবন-চেতনা কালোচিত নয়। কেননা তাঁর শাস্ত্রীয় মানবতা ন্যায় ও করুণাভিত্তিক, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সম-অধিকারের অঙ্গীকারপ্রসূত নয়। তবু কবিচিত্তে অতীতের বন্ধনমুক্তির একটি লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট—তা তাঁর গোঁড়ামিমুক্ত উদার দৃষ্টি, যে দৃষ্টি সম্প্রদায়-ভেদ মিথ্যা বলে জেনেছিল। এখানেই তাঁর আত্মশক্তির পরিচয়, তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যের উৎস, এবং তাঁর কাব্য হৃদয়ভেদ্য হবার কারণ। এ পর্বে কবি মুখ্যত ন্যায়-নীতি ও আদর্শবাদের প্রেরণা সঞ্চারে প্রয়াসী। সে-প্রেরণা প্রধানত নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং চেতনাপ্রসূত। তাই সর্বত্র তাঁর বাণীর বাহন ও সহগামী হয়েছে মুসলিম ঐতিহ্য ও হিন্দু পুরাণ।

দ্বিতীয় পর্বে পাচ্ছি! সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা ও প্রলয় শিখা। এ সময়ে কবি মানবিক আবেদনের ফলপ্রসূতায় আস্থাবান। এবার তাঁর যুক্তি দ্বিমুখো—শাস্ত্রীয় ও মানবীয়। ধর্মের দোহাই, বিবেকের দিব্যি ও মানবতার যুক্তি প্রয়োগে মানুষকে দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সংবেদনশীল করে তুলতে কবির প্রযত্ন লক্ষণীয়। এ পর্বে কবির শাস্ত্র-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাশিয়ার সাম্য ও সমাজবাদের পরোক্ষ প্রভাব। এ স্তরে কবি তাই দ্বৈতসত্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিশাহারা। আসলে ইসলামী সাম্য ও সমাজবাদের ধন বণ্টননীতির সমন্বয়ে তিনি দুকূল রক্ষায় প্রয়াসী। কেননা তাঁর যুগে সমাজতন্ত্রে দীক্ষার পূর্বশর্ত ছিল নাস্তিক্য, তা তিনি গ্রহণ করেননি। কাজেই তিনি মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে কিংবা লেনিনীয় সমাজ বিন্যাসে আস্থা রাখতে পারেননি। অতএব তাঁর শ্রেণী-চেতনা তখনো ধর্মীয় সংস্কার প্রভাবিত। তাই তিনি যখন বলেন :

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নাহি কিছু মহীয়ান।

তখন তা মার্কসীয় শ্রেণীবিরোধতত্ত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং তাঁর শাস্ত্রীয় মানুষ যে নুর-ই-ইলাহি ও আশরাফুল মখলুকাত কিংবা নরনারায়ণ ও জীবব্রহ্ম—এ তথ্যের অঙ্গীকার মাত্র। কাজেই তিনি ধার্মিকের ন্যায় শাসিত প্রীতি-সুন্দর সমাজ কামনা করেছিলেন, নাস্তিকের ধন নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক সমাজ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। এক্ষেত্রে নজরুলের ভূমিকা কতকটা এ যুগের স্বধর্মপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর মতো, যাঁরা কম্যুনিজমকে গ্রহণ করতে নারাজ, কিন্তু তার সুব্যবস্থায় ও প্রভাবে বিচলিত এবং স্বধর্মে কম্যুনিজমের ব্যবস্থাবলী সন্ধানে উৎসুক এবং স্বধর্মে কম্যুনিজমের নীতি ও আদর্শের মিল আবিষ্কার করে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত। কাজেই মুক্তপ্রাণ হলেও নজরুল ছিলেন বদ্ধচিত্ত। তাই তিনি লড়িয়ে সৈনিক হয়েই রইলেন, জিগীষু সেনাপতি হয়ে উঠেননি। তাঁর কাব্যে তাই সমাজ ভাঙার প্লান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই।

৪

অতএব নজরুল প্রথম পর্বে কামালপন্থী ছিলেন না, দ্বিতীয় পর্বেও ছিলেন না সমাজবাদী কিংবা ডেমোক্র্যাটিক সোসিয়ালিস্ট। তিনি ছিলেন মূলত ধার্মিক। তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহ ও বিবেকের দোহাই দিয়ে পীড়নপ্রবণ লোভী মানুষকে সংযত রাখতে , যা যে-কোনো ধর্মবাদী ও ধার্মিকের লক্ষ্য।

নজরুল ছিলেন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার প্রচারক কোনো সূক্ষ্মতত্ত্ব বা অভাবিতপূর্ণ মহৎ আদর্শের উদ্ভাবক নন। মানুষের স্থূল চেতনায় ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাকিদ সৃষ্টিই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। অর্থাৎ তিনি দেশের মানুষের দ্বিবিধ মুক্তি কামনা করেছিলেন—রাজনীতিক পরাধীনতার ও অর্থনীতিক পরবশ্যতার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট অস্ত্র ছিল না, কিন্তু লক্ষ্য ছিল স্থির।

স্বদেশের স্বাধীনতাই তাঁর কাম্য ছিল বলে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনা করেছেন। এজন্যে তিনি তাঁদের কুসংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছেন, ধর্মের অবিকৃত সারবাণী স্মরণ ও অনুসরণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন, আচারিক ধর্মের নিন্দা করেছেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকার মূলে রয়েছে এ আদর্শ। কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য এবং হিন্দু পুরাণের মিশ্রণও এ উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রণোদিত। হিন্দু-মুসলিম মিলন না হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হবে অসম্ভব। ফলে স্বাধীনতা থাকবে অনায়ত্ত। মুসলিম ঐতিহ্য ও হিন্দু পুরাণের নির্বিচার বহুল ব্যবহার তাঁর কাব্যকে করেছে হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়গ্রাহী। তাঁর উদাত্ত আহ্বান তাই সাড়া দিয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের সমধর্মী মানুষের মন।

স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি আরো এক পন্থা গ্রহণ করেছিলেন—আফ্রো-এশিয়ার পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামী নেতাদের প্রশস্তি গান রচনা করেছিলেন। আকস্মিক যোগাযোগে (accidental coincidence) তাঁরা ছিলেন মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের মুসলিম নেতা। কাকতালীয় ন্যায় প্রয়োগে নজরুল হলেন মুসলিম জাগরণের চারণ কবি Pan Islamist যাঁরা তাঁকে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তাবাদী ঠাওরিয়ে উল্লসিত হলেন, সেই শিক্ষিত মুসলিম বাঙালিরাও স্বস্থ ছিলেন না, তাঁরা তখনো জামালুদ্দীন আফগানীর প্রভাবে অভিভূত। এবং নিজেরা নিঃস্ব ও অসমর্থ বলে জ্ঞাতির সৌভাগ্যস্বপ্নে আনন্দিত। তাই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতীপুরুষ আরবি-ফারসি নামধারী হলেই, তাঁর গৌরব-গর্বে তাঁরা হতেন স্ফীত। এজন্যেই যে কামাল আতাতুর্ক কোরান পুড়িয়ে, মসজিদ ভেঙে এবং আরবি ছাড়িয়ে তুর্কীজাতিকে নবজীবন দানে হলেন প্রয়াসী অর্থাৎ ইসলামের কবলমুক্ত করেই বাঁচাতে চাইলেন স্বজাতিকে, তিনিই এদেশী মুসলমানদের চোখে হলেন মুসলিমদের জাতীয় বীর ও ইসলামের ত্রাণকর্তা। স্বয়ং নজরুল ইসলাম এঁদের অন্যতম।[৩]

যদিও নজরুল pan Islamist ছিলেন না, তবু স্বধর্মীপ্রীতির সংস্কার তাঁরও ছিল। এখানেও তাঁর দ্বৈতসত্তা। Pan Islamist নন অথচ একপ্রকার ধর্মীয় জাতীয়তায় আস্থা রাখেন। ফলে তিনি কখনো দেশগত জাতি নির্মাণে ব্রতী, কখনোবা ধর্মীয় স্বজাতির কীর্তি ও কর্ম থেকে প্রেরণা সঞ্চয়ে উদ্যোগী। অবশ্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ঐক্যকামনা করেছেন, অভিন্ন জাতিরূপে গড়ে তোলা সম্ভব, ভাবেননি। অর্থাৎ পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কে নয়—সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সমস্বার্থে সমবেত হতে আহ্বান জানিয়েছেন মাত্র। এটি বাস্তব পন্থার কাছাকাছি কিন্তু বাস্তব নয়। কেননা সমস্বার্থে মিলনের আগে স্বার্থ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া দরকার। এটি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, নজরুল নয়।

নিপীড়িত জনতার দারিদ্র্যমুক্তির ব্যাপারেও তিনি কোনো নতুন মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন না। ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমে তিনি শোষক-পীড়কদের ন্যায়নিষ্ঠ ও কৃপাবান করতে চেয়েছিলেন। সামন্ত সমাজের অশোভন অসঙ্গতি থেকে বিবেকবান সমাজে উত্তরণই যেন তাঁর কাম্য ছিল। তাই তিনি কুলি-মজুর-চাষীর প্রতি সুবিচার দাবী করেছেন। মার্কসীয়তত্ত্বের অনুসরণে কিংবা লেনিনীয় সমাজের অনুকরণে ধন বণ্টনভিত্তিক শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। এখানেও তিনি শাস্ত্রানুমোদিত অথচ কিছুটা মার্কসবাদ সমর্থিত আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। এ একপ্রকার গোঁজামিলে দুকূল রক্ষার প্রয়াস। তাই তিনি যন্ত্রের পরিবর্তন চাননি—যন্ত্রজ পদার্থকে প্রতিপক্ষ ভেবে গাল দিয়েছেন জমিদার, মহাজন, সওদাগর ও কল মালিককে। এখানেও তাঁর সেই দ্বৈতসত্তা প্রত্যক্ষ করি। এর কারণ নজরুলের চেতনায় কোনো সংস্কার-মুক্তি ছিল না। পরিবেশ থেকে পাওয়া নতুন ভাব-চিন্তা তাঁর অন্তরের রক্ষণশীলতার ও সংস্কারাচ্ছন্নতার মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। ফলে তাঁর প্রগতিবাদিতা তথা নতুন চিন্তানুরাগ বাহ্যাড়ম্বর ও বাগাড়ম্বররূপে ত্বকে প্রলিপ্ত চন্দনের মতো আভরণ হয়ে কিংবা অঙ্গে মর্দিত তৈলের মতো লাবণ্য হয়েই রইল, তাঁর কাব্যে এটি মর্মবাণী হয়ে উঠল না।

৫

প্রতিভা কেন, কোনো মানুষেরই মত-পথ ধ্রুবতায় অবসিত হয় না। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে মত বদলাতে হয়, পাল্টাতে হয় পথ। এ অসঙ্গতি সব প্রতিভারই চেতনায় ও কর্মে সুলভ। এটি বরং চলমানতার ও গতিশীলতার লক্ষণ, অগ্রগতির ও উত্তরণের পরিমাপক। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে স্ববিরোধ—দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতারই সাক্ষ্য। নজরুলে এই স্ববিরোধ অত্যন্ত প্রকট। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সন্ত্রাসবাদ এবং শোষণ মুক্তির জন্যে সাম্যবাদ তাঁর প্রিয় হলেও তিনি একাধারে নিয়মতান্ত্রিক, গান্ধীপন্থী, কামালপন্থী, গণবিপ্লবী, সমাজ-সংস্কারক, চরকা-মাহাত্ম্য প্রচারক, লীলাবাদী আধ্যাত্মিক ও মরমী, সর্বসংস্কারমুক্ত, ভৌতিক বিশ্বাসে অভিভূত, স্বধর্মনিষ্ঠ ও না'তে আসক্ত এবং শ্যাম-শ্যামা সঙ্গীতে আগ্রহী।

এমনকি তিনি কোরআনের মুমীন অনুবাদক এবং রসুলজীবনের ভাষ্যকারও। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'আমি যাকে ঐশ্বর্য দিই, তাকে বেহিসাব [অপরিমেয়] দিই। আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।' এবং রসুল ন্যায়নিষ্ঠায়, অনুকম্পায় ও দানে দীক্ষা দিয়েছেন, ধনবৈষমের নিন্দা করেননি। শাস্ত্র ও সাম্যবাদের মহিমা একই সঙ্গে উচ্চারণ নীতি-নিষ্ঠার অভাবপ্রসূত।

কোনো একক প্রত্যয় তাঁকে একনিষ্ঠ করেনি বলেই যা-কিছু তাঁর কল্পনা-উদ্দীপিত করেছে, যা-কিছু তাঁর বক্তব্যের অনুকূল, তা তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করলেন এবং মত-পথের বিচার না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই স্বাধীনতার সংগ্রামী মাত্রকেই সমান আগ্রহে করেছেন অভিনন্দিত। আবার কার্যকারণ বিচার না করেই ধনীকে জেনেছেন অপরাধী, ভেবেছেন শত্রু। নিজে নিঃস্ব ও দুঃস্ব বলেই তিনি নিপীড়িত মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল, নির্যাতিত মানবতার বিক্ষুব্ধ নায়ক। কিন্তু তাঁর অবচেতন লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া ঐশ্বর্য ও বুর্জোয়া বিলাস। তাই ধনিক-বণিকদের হত্যা করে ধ্বংস করে তাদের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চেয়েছেন তিনি :

'এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।'

—কৃষাণের গান

সংবেদশীলের যে মানবতাবোধ বুর্জোয়াকে স্বস্বার্থবিরোধী গণসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে, নিঃস্ব নির্যাতিত মানুষের দুঃখ মোচনে উদ্বুদ্ধ করে, নিজের কায়েমী স্বার্থ ও নিশ্চিত আরামের জীবন ত্যাগের তাকিদ দান করে, নজরুলের মানবতাবাদ সে শ্রেণীর নয়। এ অনেকটা স্বস্বার্থে সংগ্রাম এবং জৈবিক উত্তেজনা প্রসূত, তাই এ তমঃগুণজাত। এ কারণে এত দূরদৃষ্টি নেই—স্থায়ী সমাধান পন্থার নির্দেশ এতে অনুপস্থিত। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তাতে নির্বিশেষ মানুষের কল্যাণ তিনি চাননি। কেননা ধনবৈষম্য তাঁর অনভিপ্রেত নয়। কেবল বুভুক্ষা-নগ্নতা-নিরাশ্রয় মুক্ত সমাজই তাঁর কাম্য যা ঐশ্বর্যশালী পুঁজিবাদী সমাজে দুর্লভ নয়। অতএব কুলি-মজুর-চাষীর জন্যে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ সংস্থানই তাঁর লক্ষ্য, তা যেভাবেই হোক—দয়ায় বা দাবীতে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি মনে পড়ছে :

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'।

নজরুলেরও মনটি ছিল ঠিক চোখের কোলেই। তিনি যা দেখেছেন, তাই বলেছেন, ভাবেননি কিছুই। তিনি চোখের আনুগত্যে চলেছেন, অন্তরের নির্দেশ পাননি। এর একাধিক গূঢ় কারণ আছে নিশ্চয়ই। সেগুলোর একটি শিক্ষাগত আর একটি আবেগসঞ্জাত।

AMARBOI.COM

৬

নজরুল দুটো বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একটি পাঁচশ বছর আগেকার ফারসি সাহিত্য এবং অন্যটি দুই-আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু-পুরাণ। অথচ আমাদের আজকের জীবনবোধ ও শিল্পচেতনা পাশ্চাত্য শিক্ষায় লব্ধ। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তো ইংরেজি সাহিত্যেরই প্রতিরূপ। সেই কারণেই মোহিতলাল নজরুলকে একটি সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁকে ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করতে বলেছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেননি। আধুনিক জীবনবোধ বিকাশের জন্যে সমকালীন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠ আবশ্যক ছিল। নজরুল সে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। নজরুলের জন্মের পূর্বেই ডারুইন, মার্কস ও ফ্রয়েড মানুষের জগতে ও জীবনে কালান্তর ঘোষণা করেছেন। এই তিনজনকে অবহেলা করে আধুনিক মানুষ হওয়া চলে না। নজরুলের কাছে ডারুইন ও ফ্রয়েড অজ্ঞাত আর মার্কস অবহেলিত। কাজেই তাঁর বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে সত্য কথাই বলেছিলেন :

পড়ে না 'কো বই, বয়ে গেছে ওটা।—কবির কৈফিয়ৎ'

ফলে কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি কেবল লাটিমের মতো ঘুরেছেন, অগ্রসর হননি মোটেই। ভাব ভাষা ছন্দ কিংবা ভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই। কোনো নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে, কোনো নতুন প্রত্যয়ের ঐশ্বর্যে, কোনো নতুন সৃষ্টির সাফল্যে, কোনো নবলব্ধ চেতনার চাঞ্চল্যে, কোনো নবাবিষ্কৃত সত্যের প্রসঙ্গে তাঁর জীবন কিংবা সাহিত্য উত্তরণের পথ খুঁজে পায়নি। জীবনে, সমাজে ও সাহিত্যে তিনি অন্ধের মতো কেবলই ছুটোছুটি করেছেন—বিপ্লবীরূপে, ধার্মিকরূপে, মরমীরূপে, প্রেমিকরূপে। শ্রান্ত হয়েছেন, সফল হননি।

নব নব কিশলয় মাধ্যমে বৃক্ষ বেড়ে ওঠে, আত্মবিস্তার করে। নজরুল-প্রতিভাকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাঁর প্রতিভা গুল্ম-জাতীয়—সহজে স্বপ্রতিষ্ঠ, নাতিবৃদ্ধি ও স্বল্পজীবী। ১৯২২ থেকে ১৯৩২ সনের মধ্যেই তাঁর আকস্মিক উন্মেষ, বৈদ্যুতিক বিকাশ ও বেলুনীয় পরিণতি! এ সময়ের মধ্যে আম-জাম-বেগুন-বরইর মতোই তাঁর সৃষ্টি অঢেল অজস্র। বাকি বারো বছরের ফসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য, বৈশিষ্ট্য বর্জিত, নিস্পন্দ ও ম্লান। অথচ তখনো তিনি প্রৌঢ় নন, যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে মাত্র।

৭

নজরুল তাঁর মন ও মস্তিষ্কের অদ্বয় সহযোগিতা পাননি কোনোদিন। হৃদয়বৃত্তিই ছিল তাঁর সম্বল। তাই তিনি সর্বত্র আবেগ চালিত। আবেগ পরিমিতি মানে না। তাই তাঁর রচনায় পরিমিতি দুর্লভ। অতিকথন তাঁর গল্পে উপন্যাসে নাটকে প্রবন্ধে এবং গানে কবিতায় সর্বত্র দৃশ্যমান। এই আবেগ-বিহ্বলতা, এই উচ্ছ্বাসের অপ্রতিরোধ্যতা তাঁর গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ মাটি করেছে। গান ও কবিতা দুঃসহ হয়নি অন্য কারণেএস কথা পরে হবে। এমকি সামান উৎসর্গপত্র কিংবা মুখবন্ধও উচ্ছ্বাসের আত্যন্তিকতায় ফেনিল। আবেগ উচ্ছ্বাস স্থানকাল বিশেষে ভালোই, এমনকি প্রয়োজনীয়ও। কিন্তু সার্বত্রিক প্রয়োগে তা শিল্পকলাকে নষ্ট করে, বক্তব্যকে করে লঘু ও নিষ্ফল। উচ্ছ্বাস মুখ্য হলেও গল্পে উপন্যাসে নাটকে রূপক-রচনায় নজরুল ইসলামের ব্যর্থতার অন্য কারণও রয়েছে। গল্প উপন্যাস নাটক লেখার প্রতিভা নজরুলের সামান্যই ছিল। এতে মস্তিষ্কের প্রয়োজন বেশি, হৃদয়বৃত্তির স্থান সামান্য। ভূয়োদর্শন, পরিবেষ্টনী চেতনা, মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির গতি-প্রকৃতি জ্ঞান, ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণের ও বাহ্য ঘটনার আন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্বের ধারণা এবং প্রজ্ঞা প্রভৃতির সমন্বিত সামর্থ্যেই সম্ভব গল্প উপন্যাস নাটক সৃজন। নজরুলে এগুলো সুলভ ছিল না। তাই তাঁর পরিকল্পিত কাহিনী শিথিলগ্রন্থি, তাঁর অঙ্কিত চরিত্র নির্বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য বর্জিত। তাঁর বক্তব্য তাৎপর্যহীন। সংলাপ প্রায় অপ্রতিরোধ্য প্রলাপ ও জীবনবোধ সংকীর্ণ। অবশ্য খণ্ডচিত্র দুর্লভ নয়, মনোহর বাণীমূর্তিও সুলভ। এবং কোনো কোনো প্রবন্ধ সুখপাঠ্য। ভাষাও স্থানে স্থানে হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু সামগ্রিক সৌন্দয দুর্লক্ষ্য।

৮

আরো দুটো বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল—ছন্দে ও শব্দে। ছন্দের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাব অনুকৃতি ও অনুসৃতির পথে তাঁকে ছন্দো-স্রষ্টার মর্যাদায় উন্নীত করে। আরবি-ফারসি ছন্দের আদলে বাঙলা ছন্দ সৃষ্টি করে তিনি বাঙলা ছন্দে বৈচিত্র্য ও বিস্তার দান করেছেন, তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক নতুন ও মিশ্র রাগ-রাগিণীর স্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাবও নজরুলে ছিল গভীর। রবীন্দ্র-কাব্যের ও গানের বহু Phrase নজরুল হুবহু গ্রহণ করেছেন, তাঁর অনেক বাক্যাংশ কিংবা চরণাংশও দুর্লভ নয় নজরুলের কাব্যে। নজরুল আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের প্রেরণা পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল থেকে। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মোহিতলালেরও গুরু।

দেশী মুসলমানরা দৈশিক ও ভাষিক পরিচয়ে বাঙালি। এবং আরব-উদ্ভূত ধর্মে বিশ্বাসী। বাঙালি হিসেবে সব মুসলমানেরই দৈশিক ঐতিহ্য ও পুরাণের—যা নামান্তরে হিন্দুর ও হিন্দুয়ানীর—সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটে এবং ধর্মীয় সূত্রে আরব-ইরানি ঐতিহ্য ও পুরাণেরও কিছু কিছু জানাশোনা থাকে। ফলে মুসলমান মাত্রেই হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য ও পুরাণের সঙ্গে পরিচিত। এবং যেহেতু হিন্দুর দৈশিক ও ধার্মিক ঐতিহ্য ও পুরাণ অভিন্ন, তাই হিন্দু মাত্রই কেবল দৈশিক—নামান্তরে হিন্দুর—ঐতিহ্য ও পুরাণই জানে। এরই অপব্যাখ্যায় নজরুল বা মুসলিম লেখক উদার বলে প্রশংসিত, আর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দু লিখিয়েরা নিন্দিত হয়েছেন গ্রহণ-বিমুখ সংকীর্ণচিত্ত বলে।

বলেছি নজরুল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দ্বিবিধ ঐতিহ্য ও পুরাণ আয়ত্ত করেছিলেন। এবং মুসলিম ঐতিহ্যের ও হিন্দু পুরাণের সার্বত্রিক সুপ্রয়োগে নতুন রস ও লাবণ্য লাভ করেছে তাঁর কবিতা ও গান। এজন্যেই তাঁর কবিতা ও গানে অতিকথন দোষ, আবেগপ্রাধান্য, চটুল ছন্দের বহুল প্রয়োগ, শিথিল বাক্‌বিন্যাস, ভাবগত স্ববিরোধ ও অসংলগ্নতা এবং পৌনপুনিকতা দোষ সহসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিগোচর হয় না। নইলে এমনও দেখা যায় পৌরাণিক রূপ-প্রতীকাদি কিংবা তাঁর প্রিয় শব্দগুলো প্রয়োগ করবার লোভে বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেও তিনি কবিতা দীর্ঘ করেছেন। এতে কবিতায় ভাবগত স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি প্রশ্রয় পেয়েছে, ফলে কাব্যে রসাভাস ঘটেছে। বিদ্রোহী, দারিদ্র্য, পূজারিণী, সিন্ধু প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ কবিতায় এ দোষ লক্ষণীয়। আর এই ঐতিহ্য ও পুরাণ সংপৃক্ত উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার বহুল প্রয়োগ নেই বলেই তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্য রুচিবান পাঠকের পক্ষে প্রায় অসহ্য।

আসলে ভঙ্গিও নয়, বক্তব্যও নয়, মুসলিম ঐতিহ্যের ও হিন্দু পুরাণের সুষম দেদার অঢেল অজস্র ব্যবহারই নজরুলের কবিতা ও গানকে লোকপ্রিয় করেছে। তাঁর কবিগৌরব এতেই লব্ধ, তাঁর জনপ্রিয়তা এতেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁর বৈশিষ্ট্য এতেই সুপ্রকাশিত।

৯

নজরুলের প্রেমের কবিতা ও গান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সামান্য। নজরুল বলেছেন বটে : 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ তূর্য' কিন্তু তাঁর অন্তরলোকেও দেখছি দুটো আলাদা কোঠা। একটি অপরটি থেকে পাকা দেয়ালে বিচ্ছিন্ন। এ-কক্ষ ও-কক্ষ দুটো সদর-অন্দরের মতো একেবারে ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন আলো আকাশ, বিপরীত আবহাওয়া। এক কক্ষে আগুন, অপর কক্ষে অশ্রু। এখানেও কবির দ্বৈতসত্তা প্রকট।

একই কালে তিনি শোষণ, পীড়ন, ভণ্ডামি, পরাধীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ চিত্তে সংগ্রামী কবিতা যেমন লিখেছেন, তেমনি নারীপ্রেমের কোমলকান্ত পদও রচনা করেছেন, তেমনি লিখেছেন না'ত কিংবা শ্যাম-শ্যামাসঙ্গীত। অথচ এক ভাব কোনো ক্রমেই অন্যভাবকে প্রভাবিত করেনি, লঙ্ঘন করেনি, করেনি আচ্ছন্ন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, কবির আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর, এবং আমাদের কাছে বিস্ময়কর সংবাদ। এ কি গভীর বোধ, প্রত্যয় ও নিষ্ঠার অভাবপ্রসূত! এ কি চঞ্চল চিত্তের অস্থির প্রকাশ সঞ্জাত অথবা এ ধীরস্থিত প্রতিভার এক আশ্চর্য প্রকাশ! না কি একটা 'মিটিংকা বাত', অপরটা অন্তরঙ্গ আলাপ। এর হদিসের জন্যে কবির ব্যক্তিক জীবনের অনুষঙ্গ জ্ঞান আবশ্যক।

অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশীর সঙ্গেই পাচ্ছি দোলন চাঁপা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া ; আবার ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা ও জিঞ্জিরের পাশে পাই বুলবুল, চোখের চাতক, চক্রবাক ; পুনরায় পাচ্ছি সন্ধ্যা ও প্রলয় শিখার সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু। কিন্তু যতই অবাক হই, এও নজরুলের পক্ষে সম্ভব এবং সত্য ছিল।

নজরুলের প্রেমের গান ও কবিতা বৈচিত্র্যবিহীন। Pangs of separation and disappointment-ই তাঁর প্রেমের কবিতা ও গানের প্রধান সুর। তাঁর পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা'য় এর প্রথম উন্মেষ। না-পাওয়ার বেদনা, পেয়ে হারানোর জ্বালা, অবহেলা প্রাপ্তির ক্ষোভ, ভুলতে না-পারার যন্ত্রণা, সাধাসাধির ব্যর্থতায় হতাশা, পাওয়া-না -পাওয়ার অবমাননা, প্রিয়ার স্মৃতির সঞ্চয়ে ঠাঁই না-পাওয়ার ব্যথা, মিলনোৎকণ্ঠা, বিচ্ছেদ শঙ্কা, আনন্দিত স্মৃতির বিষাদ, বিরহ বিধুরতা, অতৃপ্তির অস্থিরতা, প্রতিদান না-পাওয়ার দাহ প্রভৃতিই তাঁর প্রেমবিষয়ক বিভিন্ন কবিতায় ও গানে অভিব্যক্ত।

এ প্রেমে সূক্ষ্ম ও মহৎ দর্শন নেই। এ নিতান্ত শারীর ও নির্লক্ষ্য। একনিষ্ঠতাও নেই। কবি বহুবল্লভ। আছে কেবল হৃদয়ের আকৃতি ও প্রণয়-বিহ্বলতা। একটা অসহ্য আবেগ, একটা অদম্য আকর্ষণ, একটা অসীম উৎকণ্ঠ, একটা অশেষ বাসনা, একটা অসহ্য অতৃপ্তি কবিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কাঁদিয়ে মারছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাও এমনি বিচলিতা, এমনি হতভাগিনী। তবু বিপ্রলব্ধ পর্বে—পূর্বরাগে প্রেমবৈচিত্র্যে মানে প্রবাসে উপলক্ষ্য ও অনুভূতির বৈচিত্র্য আছে। নজরুলের কাব্যে তা দুর্লভ। তাই একই অনুভূতির পৌনপুনিকতা পীড়াদায়ক। মনে হয় একটা অকারণ ক্ষোভ, একটা অহেতুক বেদনা, একটা অগভীর অতৃপ্তি ও একটা কৃত্রিম বিরহ বাঞ্ছা বা বিলাস যেন কবিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে বসেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতায় ও গানে তাই ক্ষোভ, কান্না ও বিলাপই মুখ্যত দৃশ্যমান। বহু-বল্লভের এই শারীর-প্রেম কবিকে কোনো বোধের তথা উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ করেনি। তাই এ প্রেম নজরুলের চৈতন্যস্বরূপ হয়ে ফোটেনি।

১০

এবার গানের কথা বলি। সত্য বটে নজরুল অজস্র গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা কেউ বলেন দু-হাজার, কেউ বলেন তিন হাজার। সুরস্রষ্টা হিসেবেও তিনি প্রখ্যাত। বিদেশের ও বিভাষার নানা সুর বাঙলা গানে সংযোজিত করে এবং অনেক মিশ্ররাগ নির্মাণ করে তিনি গানের আকাশ করেছেন বিস্তৃত, সঙ্গীতশাস্ত্রকে করেছেন ঋদ্ধ। তাঁর গানের কথা ও সুর সঙ্গীতরসিকদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর গানের স্বীকৃত বিশিষ্টতা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো নজরুলগীতিরও গর্বিত স্কুল বা খান্দান গড়ে তুলেছে। গানের জগতে নজরুলের দিগ্বিজয়ী জনপ্রিয়তা-মুগ্ধ কোনো কোনো গুণী ও বিদ্বান এমনও মনে করেন যে, কাজের ক্ষেত্রে যাই হোক, গানের ভুবনে নজরুল অমর এবং তাঁর গান ও সুর থাকবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিনশ্বর। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, দুনিয়ায় অক্ষয় অবিনাশী কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন কাব্য হিসেবেও সুন্দর ও ভাবগর্ভ অর্থাৎ তাতে ভাব, ভাষা, ছন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম গভীর বাণীও । নজরুলেরও অনেক গান তেমন সব গুণে ঋদ্ধ। কিন্তু আধুনিক গানের তোড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতই পিছিয়ে পড়ছে, নজরুল গীতই বা কি টিকবে! কালান্তরে পুরোনো সুর টেকে না বলেই গান নশ্বর । যুগে যুগে যুগোপযোগী সুরই যুগের চাহিদা মিটায় এবং কালান্তরে তা বিলীন হয় কালগর্ভে। মানুষ চিরকালই সুখে দুঃখে, কাজে অকাজে, ভয়ে ভক্তিতে, দ্বন্দ্বে সংগ্রামে গান গেয়েছে বটে, কিন্তু তা কখনো অপরিবর্তিত থাকেনি। বৈদিক বন্দি গন্ধর্বের গায়ত্রী বন্দনা থেকে আজকের আধুনিক গান অবধি সঙ্গীতের এদেশী বিবর্তন ধারাই আমাদের এ ধারণার সমর্থক। কালে কালে মানুষের মন বদলায়, বদলায় রুচি। তাছাড়া ভাষা আর সুরও বদলায়। কাজেই মনের সঙ্গে কথা এবং ভাষার সঙ্গে সুরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই তো আমাদের কীর্তন, গাজন, গম্ভীরা, রামপ্রসাদী যেমন সাধন-ভজন সংপৃক্ত হয়েও লুপ্তপ্রায়, তেমনি মানবিক সুখ দুঃখের গানও অতিক্রান্তকালে চিরদিনই হয়েছে বিলুপ্ত। বাউলগান, ব্রহ্মসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্র-রজনী-অতুল-মুকুন্দের গানই বা আজ আর কে গায়! কাজেই মর্মান্তিক হলেও এ সত্য অস্বীকার করা চলবে না যে রবীন্দ্র-নজরুলসঙ্গীতও আগামী পঞ্চাশ বছরও টিকবে না ।

১১

নজরুলের অনেক অপূর্ণতার কথাই বলা হল বটে, কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। গীতিকবি তো দার্শনিক কিংবা সমাজকর্মী নন, তাঁকে নানা দায়ে দায়ী করার সার্থকতা কী? স্বেচ্ছায় যা দিয়েছেন বা দিতে পেরেছেন, এবং আমরা যতটুকু আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছি বা পাচ্ছি তা তো যথালাভ। তাছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি আজকের পরিবেশেও অম্লান সূর্য, প্রাণময়তার উৎস। তাঁর ছিল তাজা, তরুণ ও উচ্ছল প্রাণ। সেই প্রাণের স্পর্শে দেশে জেগে উঠেছিল লক্ষ প্রাণ। আজো তেমনি জাগে, কেননা তিনি যে-পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, তা আজো অবিলুপ্ত। তাই আজ বাঙলার সবকিছু ভাগ হয়েছে। ভাগ হননি কেবল নজরুল। এজমালি সম্পদরূপে তাঁর এই স্থিতিই প্রমাণ করে যে নজরুল এত বিচ্যুতি সত্ত্বেও সার্থক ও সফল কবি। বাঙলার ও বাঙালির তিনি আজও মনের মানুষ, হৃদয়ের ধন, সংগ্রামের প্রবর্তনদাতা নায়ক। এক হৃদয়ের প্রীতি অন্য হৃদয়েও অনুরাগ জাগায়। সীমিত ও সংকীর্ণ অর্থে নজরুলও মানবতাবাদী ও মানবপ্রেমিক। তাঁর বিদ্রোহের জড় রয়েছে এই মানবতাবোধে। মানবপ্রীতিই তাঁকে বিদ্রোহী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ঠুর সংগ্রামী করেছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি প্রেম দিতে এসেছিল্যম, প্রেম পেতে এসেছিলাম।' তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। নজরুল দীন-দুঃখী-নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসতেন, তাই শোষক- পীড়করা ছিল তাঁর শত্রু। স্বদেশের কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে তিনি প্রাণপ্রিয় হয়েই আছেন। তাই তারা তাঁকে ভুলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারবে না। জয়তু নজরুল।

তথ্যসংকেত

১. ক. শিকলদেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া...
ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে...
আয়রে আমার কাঁচা।

খ. কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা...
সেই তোর রুদ্রের প্রসাদ। ইত্যাদি অনেক।

২. রক্ত ঝরাতে পারিনে তো ভাই
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

৩. 'কামাল'—প্রবন্ধ, ধূমকেতু, ১ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ৩০শে আশ্বিন, ১৩২৯ সাল।

AMARBOI.COM

নজরুল-কাব্যে বীর ও বীর্যপ্রতীক

যদি আমরা বিশ্বাস করি, যে-কোনোকিছুর উপযোগ ও ফলপ্রসূতা তার স্বকালেই সীমিত, তাহলে কোনোকিছুই কালজয়িতা ও চিরন্তনতার জন্যে আমাদের উৎকণ্ঠা ঘুচাবে। আসলে চিরন্তনতার কামনা একটি মানসমোহ ছাড়া কিছু নয়। এটি আবেগের প্রসূন, উপযোগ-বুদ্ধি কিংবা প্রয়োজন-চেতনার ফল নয়। প্রকৃতির জগতে ফুল-পাতা, অথবা আম-জাম, কলা-মূলা স্বল্পজীবী, তাই বলে কোনো অর্থেই তাদের জীবন মিথ্যে বা ব্যর্থ নয়। তেমনি মানুষের জীবনে ও সমাজে কোনোকিছুরই উপযোগ চিরস্থায়ী নয়—অন্তত তার স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক উপযোগ ভেদ ও রূপান্তর আছে। কোনো পুরাতনই নতুনকালের নতুন মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এই তাৎপর্যে নতুন মানে বর্তমান আর পুরাতন অতীতেরই প্রতীক। সকালে যা নতুন, অতিক্রান্তকালে তাই হৃতউপযোগ পুরাতন।

এই দৃষ্টিতে নজরুল-কাব্য আজো নতুন। তার উপযোগ ও প্রয়োজন আজো বর্তমান। কেননা আমাদের সমাজে, ধর্মে, অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে আজো রূপান্তর ঘটেনি। নজরুল-বিঘোষিত সংগ্রাম ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য আজো সফল হয়নি। লক্ষ্য আজো অনায়ত্ত, মঞ্জিল আজো অদৃষ্ট। তাই নজরুল আজো প্রিয়নাম। নজরুল-কাব্য আজো অবশ্যপাঠ্য। এ-কারণেই বাঙলার সবকিছু ভাগ হয়েছে, ভাগ হয়নি নজরুল। পর হয়ে যাননি তিনি কারো—তাই তাকে নিয়ে আজো দুই বঙ্গে এত টানাটানি ও কাড়াকাড়ি।

বলাবাহুল্য, নজরুল ছিলেন বিপ্লবী ও বিদ্রোহী। তিনি উপায়নিষ্ঠ ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিচল। এ-ও সত্য যে, তিনি রাজনীতিক জটিলতা বুঝতেন না। কিন্তু বৈপ্লবিক চেতনা ছিল তাঁর গভীর ও তীব্র। তাঁর মন ও মস্তিষ্কের মেলবন্ধন ছিল না বলেই তাঁর ভাবকর্ম যতটা আবেগ-চালিত, ততটা মনীষা-নিয়ন্ত্রিত ছিল না। রক্তপিচ্ছিল সহিংস বিপ্লবই তাঁর প্রিয় ছিল, তবু তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য উপায়কেও অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর অস্থির অথচ অকৃত্রিম আগ্রহ ও সমর্থন ছিল সব পদ্ধতিরই প্রয়োগ-প্রয়াসে।

সমাজ ও ধর্মবুদ্ধির সংস্কারে, আর্থিক জীবনের রূপান্তরে এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর আকুতি-আকুলতার তীব্রতাই তাঁকে 'মারি অরি পারি যে-কৌশলে' মতে প্রবর্তনা দিয়েছিল। এসব কিছুর মূলে রয়েছে শোষিত-পীড়িত মানুষের প্রতি দরদের গভীরতা। তা ছাড়া আরো একটি অবচেতন প্রেরণা হয়তো ছিল—সেটি আত্মত্রাণের; কেননা তিনিও ছিলেন নিঃস্বদের একজন। এই দ্বৈতকারণের সমন্বয়ে তাঁর বাণী তীব্র, তীক্ষ্ণ ও অকৃত্রিম যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বঞ্চিত ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ আবেগে ভারগ্রস্ত।

এ কারণেই জাগ্রত জীবনের আহ্বানে যারা বুকের রক্ত দিয়ে কঠিন মাটি নরম ও উর্বর করে, যারা পলাশলাল সূর্যের অনুধ্যানে আনন্দিত, যারা খুন-রাঙা তরুণ তপনের আকর্ষণে চঞ্চল, যারা আত্মাহুতির উল্লাসে মত্ত, যারা বাঁচবার আগ্রহে মৃত্যুবরণ করে চরম তাচ্ছিল্যে, যারা মহিমান্বিত মৃত্যুর সঞ্চয়ে ও জাগ্রত জীবনের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে দেশ ও জাতিকে ; তাদেরই বন্দনা গেয়েছেন কবি। তাদেরকেই তিনি জেনেছেন দেশ-জাত-মানুষের ত্রাণকর্তা বলে। যৌবনে ও তারুণ্যে তাঁর প্রত্যয় ছিল প্রবল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—চিরকাল এমনি তরুণেরাই নর-দানবের পাশব শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে লড়ে আত্মাহুতি দিয়ে দেশ-জাত-মানুষকে পীড়ন থেকে, শোষণ থেকে ও অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে। তাই যার মধ্যেই এই প্রাণপ্রাচুর্য, এই তারুণ্য, এই যৌবনদীপ্তি ও সংগ্রামী স্পৃহা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশ-কাল-জাতের গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি তারই প্রশস্তি রচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের নামে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন দেশের তরুণদের। প্রবুদ্ধ তারুণ্যের ও জাগ্রত যৌবনের বন্দনায় তিনি মুখর থেকেছেন সর্বক্ষণ।

শাসক-শোষক-পীড়ক এক রক্ত-খেকো রাক্ষুসে শক্তি। বাঘ-সিংহের মতোই তার লোভ ও হিংস্রতা। বুকের রক্ত দিয়েই তার মোকাবিলা করতে হয়। পার্থক্য কেবল এই, বাঘ-সিংহ রক্ত খেয়ে হয় পুষ্ট এবং আরো লুব্ধ, আর রক্তের স্পর্শে চুন-লাগা জোঁকের মতো কাবু হয়ে পড়ে ঐ দানবীয় শক্তি, গণরক্তের বিষক্রিয়ায় তার শক্তি-ভাণ্ড হয় জর্জরিত। এজন্যেই রক্তের বিনিময়ে আসে মুক্তি। দানবীয় রাক্ষুসে শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা সম্মুখ-সমরের জন্যে তাই তরুণের তাজা টকটকে লাল রক্ত প্রয়োজন।

অতএব রক্তদানের অঙ্গীকারে নজরুলের গণসংগ্রামের শুরু এবং যারা এভাবে বুকে বুলেট কিংবা গলায় ফাঁস গ্রহণ করেছে, তারাই নজরুলের বন্দ্যবীর। আর যারা মুক্তিসংগ্রামে বুকের রক্তদানে উৎসুক তারাই তাঁর ভরসাস্থল। সংগ্রাম-সুন্দর রক্ত-ঝরা দিন এবং রক্ত-রাঙা মাটিই তাঁর স্মৃতির সঞ্চয় ও ঐতিহ্যের আকর। তাই মৃত্যুর মহিমান্বিত রূপের অনুধ্যানে তার আনন্দ। নতুন সৃষ্টির সুখ-উল্লাসই তাঁকে প্রবর্তনা দেয় পুরোনো সবকিছুর ধ্বংস সাধনায় এবং জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ-স্বপ্নই মৃত্যুবরণে করে উৎসাহিত। এই ধ্বংস ও মৃত্যুর ভয়াল রূপের অন্তরে রয়েছে কল্যাণ-সুন্দর রূপ :

জরায় মরা মুমূর্ষুদের
প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে —
এবার মহানিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায়
শিশু চাঁদের কর
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
কাজেই, ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন জীবনহরা
অসুন্দরে করতে ছেদন।
কেননা, ভেঙে আবার গড়তে জানে
সে চির-সুন্দর।

AMARBOI.COM

এই ভয়ঙ্কর আসে দুরন্ত, দুর্মদ, দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, অথচ গণকল্যাণকামী রক্ত-মাতাল মৃত্যু-মাতাল তরুণরূপে। তাই বেদুঈন, চেঙ্গিস, পরশুরাম, দুর্বাশা, জমদগ্নি, নটরাজ, বিশ্বামিত্র, খালেদ, উমর, হায়দর, কামাল, আনোয়ার প্রভৃতি তাঁর কাছে পৌরুষের আদর্শ। এ দুর্বার বিদ্রোহ ভৃগুর মতোই 'ভগবান-বুকে পদচিহ্ন এঁকে' দেয়ার স্পর্ধা রাখে।

কবির প্রিয় ধ্বজা রক্তরঙিন, তাঁর প্রিয় ফুল জবা ও পলাশ, তাঁর প্রিয় পোশাক লাল-গৈরিক, তাঁর প্রিয় শরাবও রক্তরাঙা; তাঁর সংগ্রামী প্রেরণাও হয়তো এসেছিল লালফৌজ থেকে, তাঁর আসমানও খুন-খারাবির রঙ মাখা, তাঁর বিপ্লবের ঘোড়াও রুধির-লাল-রক্ত অশ্ব। তাঁর প্রিয় শাড়ি লাল, কেননা তাঁর বিশ্বাস রক্ত-দান ও গ্রহণ- সামর্থ্যেই মানবিক সমস্যার সমাধান। তাই তিনি শক্তিরূপিণী দেশমাতৃকার অঙ্গে কামনা করেছেন রক্তাম্বর, হাতে চেয়েছেন খুনরাঙা তরবারি, ললাটে দেখতে চেয়েছেন সিঁদুরের বদলে কাল্‌চিতার রাঙা আগুন এবং আরো কামনা করেছেন দেশমাতার 'চরণ-আঘাতে উদগারে যেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান, এবং 'বুকে-মুখে-চোখে রোষ হুতাশন, নয়নে তার ধূমকেতু জ্বালা উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।' আর 'জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন 'ছোটে রক্ত উদধি' এবং 'ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল' যখন 'ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহ্নির বান', যখন 'কোটি বীর প্রাণে—শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ গমকে শিরায় গমগম', যখন স্বর্গমর্ত্য পাতাল—মাতাল রক্তসুরায়, বিধাতাও ত্রস্ত' ; তখনই কেবল দানবীয় শক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'রণভেরী,' 'কোরবানী' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর বীর ও বীরত্বের আদর্শ সুপ্রকট। রক্ত ও মৃত্যু, প্রাণদান ও গ্রহণ, হিম্মত ও খঞ্জর—বীরের নিত্যসঙ্গী—বলা চলে জীবনচর্যার অবলম্বন। 'খুনে খেলব খুন-মাতন' এই হচ্ছে বীরব্রত। 'রণ-বিপ্লব-রক্ত' বর্জিত মুক্তি তাঁর কল্পনাতীত। বাহুবল ও মনোবল ব্যতীত প্রতিকার প্রতিরোধের অন্য কোনো উপায় তার মনে ঠাঁই পায়নি।

তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছে রণ, রক্ত, রুদ্র, শক্তি, ঝড়, সূর্য, বহ্নি, মৃত্যু প্রভৃতি অবলম্বনে। এগুলোকে তিনি বল-বীর্যে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তেমনি ন্যায়, কল্যাণ ও অধিকারের প্রতীক হয়েছে সত্য। আর সবকিছুর গোড়ায় রয়েছে অহংবোধ—আমিত্ব তথা আত্মপ্রত্যয়। এটিই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দিয়েছে প্রবর্তনা।

কিশোর বয়সেই নজরুল ইসলাম সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছিলেন। পল্টনী ব্যায়ামেই তাঁর সৈনিক জীবন সীমিত। লড়াইয়ের কল্পচিত্র (যেমন ভার্দুনট্রেঞ্চ) ও বীরত্বের স্বপ্ন-সুন্দর জীবন তার মন হরণ করেছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে হয়ত তিনি এত রণ-রক্ত প্রিয় হতে পারতেন না, সহিংস বিপ্লবেও হয়তো থাকতো না তাঁর এত আগ্রহ। ক্ষুধা-যন্ত্রণা-মৃত্যুশাসিত সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই Chivalry যুগের কুইকসোটি প্রেরণার প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। তাঁর সংগ্রামী কবিতায় তাই রক্ত-অগ্নি-ঝড় মৃত্যুই পেয়েছে প্রাধান্য। ত্রাস ও ধ্বংসকর মহাশক্তির অনুধ্যানেই তাঁর আনন্দ, সত্যের প্রতিষ্ঠা শক্তি দিয়েই সম্ভব—এই তাঁর বিশ্বাস। কাব্যের ক্ষেত্রে এই প্রলয়ঙ্কর ভয়াল ভৈরবত্বের আবহ সৃষ্টির জন্যে প্রায় প্রতি কবিতায় হাইফেন-যোগে তিনি অসংখ্য বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। তাঁর মনোনীত ছন্দের বন্ধনে তাঁর নির্মিত বাক্-খণ্ডও উত্তেজিত মানুষের আবেগচালিত অনর্গল রক্তধারার মতো করে তুলেছে তাঁর কবিতাগুলোকে। রুদ্ধশাসে যেন অনবসর জীবনের কথাগুলো বলে শেষ করতে পারলেই আবেগ-ভারাক্রান্ত মানুষটি স্বস্তি পান। আবেগের তাপে মুখে যেন তাঁর খই ফুটছে, পটকার মতো গর্জে উঠছে যেন এক-একটি কথা।

অগ্নি-ঋষি, বহ্নি-রাগ, অগ্নি-মরু, বেদন-বেহাগ, অগ্নি-সুর, রক্ত-শিখা, প্রলয়-নেশা, মৃত্যুগহন, বজ্র-শিখা, প্রাণ-লুকানো, রক্ত-তড়িৎ, সৃজন-বেদন, বজ্র-গান, শাসন-ত্রাসন, চুম্বন-চোর-কম্পন, রৌদ্র-রুদ্র, হিম্মত-হ্রেষা, অগ্নি-পাথার, নভ-তড়িৎ,বহ্নি-ফিনিকি, লাল-গৈরিক, রোষ-হুতাশন, রক্ত-উদধি, ফেনা-বিষ, রক্ত- ফোয়ারা, রক্ত-সুরা, মন-খুনী, খুন-খচা, রক্ত-অশ্ব, জ্বালা-ক্রন্দন-ক্রুর, বিষ-মদ-চিক্কুর, ফণা-ছায়া-দোল, অশুভ-অগ্নি-পতাকা, মমতা-মানিক, বিষ-অভিশাপ-সিক্ত, অগ্নি-ম্লান, অগ্নি-ফণী, সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া, জর-জর শোক, বহ্নি-সিন্ধু, আঁসু-পরিমল, হারামণি-পাওয়া-হাস্য, রক্ত-পাথার, ক্রন্দন-ঘন, জীবন-ফাগুন, মালঞ্চ-ময়ুর-তখ্‌ত, ধ্বংস-বন্যা, শক্তি-বজ্র, বহ্নি-বীর্য, অগ্নি-মন্ত্র, মুক্তি-তরবারি, উল্কাপথিক, মাভৈঃবিজয়মন্ত্র, ফন্দি-কারার, গণ্ডী-মুক্ত, ভয়-দানব, অমর-মর-সিন্ধু-তীর, রক্ত-যুগান্তর, স্বরাজ-সিংহদুয়ার, দেশ-দ্রৌপদী, দুঃশাসন-চোর, জাত-শেয়াল, জাত-জুয়ারী, বহ্নি-লিখা, মুক্তি-শঙ্খ, মৃত্যু-শোণিত এলকোহল, প্রাণ-আঙুর, আকাশ গাঙ, স্নেহ-সুরধুনী, গ্রহণ-বালা, বোলতা-ব্যাকুল—এমনি আরো শত শত বাক-মূর্তি রয়েছে তাঁর কাব্যে। বস্তুত এগুলো তাঁর মনোভঙ্গির—তার মানস বা Style-এর পরিচয়বাহী এবং হয়তো অসম্বৃত আবেগেরও প্রমাণক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রামের ইতিহাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি যুগ

১
'চট্টগ্রাম' নামের উৎপত্তি

তিব্বতী সূত্রে[১] চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম পাওয়া যাচ্ছে—'জ্বালনধারা'—তপ্তজল সমন্বিত অঞ্চল। এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধ সিদ্ধ বালপাদ জ্বালন্ধরী নাম প্রাপ্ত হন। এরই অপর নাম হাড়িফা। ঝাড়ুদার হাড়ির কাজ করেছিলেন বলেই এই নাম। হয়তো অগ্নিতপ্ত জল ধারণ করে বলেই স্থানটি 'জ্বালন্ধর' নামে পরিচিত ছিল। সীতাকুণ্ডে ও বাড়বকুণ্ডে এখনো তপ্তজল পর্বতগাত্র থেকে নিঃসৃত হয়। এরই আরবি-ফারসি নাম সম্ভবত 'সামন্দর'। সাম —(অগ্নি) অন্দরে (অন্তর< অন্দর) আছে যে স্থানে সেটিই সামন্দর।[২]

সামন্দর নামের প্রথম উল্লেখ পাই, ইবন খুর্দাদবেহ্-র বর্ণনায়। ইনি এ অঞ্চলকে 'রুহ্‌ম' বা 'রুহ্‌মি' রাজার শাসনভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সামন্দরের দ্বিতীয় উল্লেখ মেলে 'হুদুদুল আলম' গ্রন্থে। এখানে রাজার নাম 'দহ্‌ম'। এই দহ্‌ম ও রুহ্‌ম—ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে, একই নামের বিকৃতি। দহ্‌ম> দহম> দক্ষ> ধর্ম। ইনি বঙ্গাধিপ ধর্মপাল।[৩] হোদীওয়ালাও এ মত পোষণ করেন।[৪] আর এক কিংবদন্তি এই যে, আরাকানরাজ চূড়সিংহ চন্দ্র (Chulataing Tsandaya) ৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে একটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করান এবং তাতে Tsit-Tat-Gung—'যুদ্ধ করা অনুচিত' —এই বাণী উৎকীর্ণ হয়। এরই বিকৃত রূপ 'চাটিগাঁও'। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মতে ' চৈত্যগ্রাম' থেকে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম-এর উৎপত্তি। হিন্দুদের ধারণা 'চট্ট' (কুলীন ব্রাহ্মণ)-দের নিবাস বলে চট্টল> চট্টলা, কিংবা চট্টগ্রাম হয়েছে। মুসলমানদের বিশ্বাস, শাহ বদর আলম চাটি (মৃৎবর্তিকা) জ্বালিয়ে জ্বীন-পরীর কবল থেকে অঞ্চলটিকে মুক্ত করেন বলে, স্থানটি চাটিগ্রাম বা চাটিগাঁও নামে অভিহিত হয়েছে। Bernonilli বলেছেন—আরবি শাত (বদ্বীপ) ও গঙ্গা (নদী) থেকে, অর্থাৎ গঙ্গার মুখস্থিত বদ্বীপ অর্থে আরব বণিকেরা একে 'শাৎগাঙ'> শাৎগাঁও নামে অভিহিত করত [৫] এবং উচ্চারণ বিকৃতির ফলে চাটগাঁও চাটিগাঁও, এবং সংস্কৃতায়নের ফলে চট্টগ্রাম হয়েছে বলে অনুমিত। District Gazetteer: Chittagong-এ O' Malley অনুমান করেছেন, সংস্কৃত 'চর্তুগ্রাম' বা চারিগ্রাম থেকে 'চাটিগাঁও' নামের উৎপত্তি। 'আহাদিসুল খাওয়ানীন' লেখক খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খানের মতে হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) পুত্র নুসরৎ শাহ ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করে এর নাম দেন 'ফত্‌হ্‌-ই-আবাদ। এবং শায়েস্তাখান ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম অধিকার করে আওরঙজেবের অভিপ্রায়ক্রমে এর নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। পর্তুগীজ বণিকেরা Porte grando বলেই এর পরিচয় দিত। আল্ ইদ্রিসী কর্ণফুলীর নামানুসারে একে 'কর্ণবুল' নামে আখ্যাত করেন।

২
দেশ-পরিচয়

প্রাচীনকাল থেকেই সামুদ্রিক বন্দর বলে চট্টগ্রামের ইতিহাস ঋজু থাকেনি। রক্তে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাও দেশবাসীর পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি। নানা জাতির সংমিশ্রণে সঙ্কর সমাজের উদ্ভব যে গোড়া থেকেই হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান সম্ভব। এমনি সঙ্কর সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনও বৈচিত্র্যে জটিল হয়ে উঠে। ইতিহাসবিহীন প্রাচীন যুগের কোনো সংবাদ আমাদের কালে এসে পৌঁছেনি। তবে পরোক্ষ তথ্যের আলোকে একটি কল্পচিত্র আঁকা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋগ্বেদের আমলে আজকের বাঙলা দেশের অধিকাংশ ছিল সমুদ্র। আরো অনেক পরে শুক্লযজুর্বেদের যুগেও গণ্ডকী নদীর পূর্বদিক ছিল জলপ্লাবিত। মহাভারতিক কালেও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ ছিল সমুদ্রে লীন। পর্যটক স্ট্রাবোর ভারত ভ্রমণ কালে (১৮-২৪ খ্রী.) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্যে বহু নগরের চারদিকে বাঁধ ছিল। হিউএয়নৎ সাঙও সমতট কামরূপের মধ্যাঞ্চলে প্রায় হাজার ক্রোশব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তবু বাঙলা ও আসাম যে মহাভারতিক যুগে বসতিবহুল ছিল তা নিশ্চিত। পুণ্ড্রের বসুদেব, ভগদত্তের প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম)[৬] ঐ যুগের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খ্রী. পূ. ৭ম শতক) পুণ্ড্রের জনগণকে দস্যু বলা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে অনার্য বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চের জাতির উল্লেখ রয়েছে[৭]। এতে অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে খ্রীস্টপূর্ব সাত শতকেও এদেশে জনবসতি ছিল এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আর্যসমাজে আহৃত হয়েছে।

বৌধায়নসূত্রে অঙ্গ ও মগধের লোকেরা অভিহিত হয়েছে 'সংকীর্ণযোনি' (তথা অংশত আর্য বা আর্যরক্ত সম্পৃক্ত) বলে। আর কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশকে তখনো আর্য-বর্জিত অঞ্চল বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এদেশে আসলে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এর পরে রচিত একটি শ্লোকে[৮] দেখতে পাই তীর্থদর্শনার্থ অঙ্গে, বঙ্গে ও কলিঙ্গে যাওয়ার বিধান রয়েছে। এতে বোঝা যায়, সমাজক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলত্রয়ের লোক ঘৃণ্য হলেও তাদের দেশের স্থানবিশেষ তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এর মধ্যে বাঙলায় আর্য আর আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের প্রমাণ, অন্তত আভাস মেলে। সম্ভবত বাঙলার গঙ্গাসাগর ও উড়িষ্যার বৈতরণী তীরই এই অনুক্ত তীর্থক্ষেত্র।[৯]

দুটো লিপির সাক্ষ্যেও প্রমাণিত হয় যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এদেশে আর্য-প্রভাব দৃঢ় ও গাঢ় হয়ে উঠেছে। এর একটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এবং মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত[১০] এবং অপরটি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের, প্রাপ্তিস্থান নোয়াখালির শিলুয়া গাঁ।[১১] এছাড়া বাঙলার বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত কুষাণ আমলের মুদ্রাও আর্যাবর্ত তথা উত্তরভারতের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিঃসংশয় প্রমাণবাহী।[১২] এসব থেকে সহজেই অনুমান করা চলে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই বাঙলা দেশে চালু হয়েছে। আর্যবসতি না থাকলে এ কিছুতেই সম্ভব হত না। সিংহলী মহাবংশ বর্ণিত কাহিনীসূত্রে জানা যায়—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গে রাজা ও রাজ্য ছিল ।[১৩] এতে বাঙলার বর্বরোত্তর যুগের আভাস পাই।

৩
চট্টগ্রাম-আরাকানের জনগোষ্ঠী

বিদ্বানদের মতে [১৪] অস্ট্রো-এশীয় এবং ভোট-চীন গোত্রীয় মানুষই সম্ভবত চট্টগ্রাম ও তার সংলগ্ন আরাকানের খ্রীস্টপূর্ব যুগের আদি অধিবাসী। আর খ্রীস্টীয় সনের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও বৌদ্ধেরা তাদের উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসব অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। এভাবে খাসী ও কুকী চীনাদের সাথে (অস্ট্রো-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়-মোঙ্গল-আলপাইনীয়-নর্ডিক মিশ্রণে গঠিত) আর্যজাতির ভাষা' ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। আরাকানী সূত্রে [১৫] জানা যায়, আরাকানে দশ কিংবা বারো শতকের পূর্বে বর্মী অনুপ্রবেশ ঘটেনি। পক্ষান্তরে উত্তরভারতিক আর্যেরা খ্রীস্টীয় সনের গোড়া থেকেই আরাকানে বসতি নির্মাণ করে। আরাকানে প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ও পরে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হয়। এর পুরোনো রাজধানীর নাম দিন্নাওয়াতী (ধান্যবতী বা তৃণবতী) এবং বেসালি (বৈশালী), চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সংস্কৃত ও বিকৃত সংস্কৃত নাম. সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, আরাকানীদের মাগধী[১৬] বলে আত্মপরিচয় দান, বৃষ মূর্তি, ধ্বজ ও লাঞ্ছন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের ও ভারতিক জনবসতির স্বাক্ষর বহন করে। সম্ভবত বিহারের বৈশালী থেকে আগত চন্দ্ররাজা পিতৃভূমের নামানুসারে রাজধানীর নাম বৈশালী রাখেন।[১৭] আরাকানের ইতিহাসের আলোকে চট্টগ্রামের পুরোনো ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। Phayre ও Harvey -র সংযোজিত তালিকায় দেখা যায় চন্দ্রবংশীয়দের রাজত্বকাল —সাময়িক ছেদ থাকলেও —১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি প্রসারিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪
ইতিহাসের দূরাগত ধ্বনি

স্থানীয় কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় মহাভারতিক যুগে কর্ণের পুত্র বিকর্ণ চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন। তার রাজধানী ছিল কাঞ্চন নগর। পটিয়া ও ফটিকছড়ি থানা অঞ্চলে দুটো কাঞ্চনগর আছে, সাতকানিয়া থানায় আছে 'কাঞ্চনা'। এ তিনটেই বিকর্ণের রাজধানীর গৌরব দাবী করে। এছাড়া কিংবদন্তি সূত্রে আর কিছু জানা যায় না।

তিব্বতী সূত্রে[১৮] জানতে পাই, লামা তারানাথ চট্টগ্রাম পর্যটন করেননি। তিনি ভারতে ও তিব্বতে লোকমুখে শুনে কিংবা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত কাহিনী ভিত্তি করে চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। তবু এর মধ্যে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। সিংহচন্দ্রের প্রপৌত্র বালচন্দ্রের পৌত্র বিমল চন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র (বা গোপচন্দ্র) চট্টগ্রামকেই শাসনকেন্দ্র করেন। তিনিই গোপীচাঁদ-ময়নামতী মানিকচাঁদ গীতিকার নায়ক। জ্বালন্ধরীপা বা হাড়িফা তারই মাতা ময়নামতীর গুরু। এ সময় চট্টগ্রামে তীর্থিক ও বৌদ্ধদের সমান প্রাধান্য ছিল। তাই বৌদ্ধবিহারে ও তীর্থিক মন্দিরে চট্টগ্রাম ছিল আকীর্ণ। তান্ত্রিক মহাযান মতই তখন চট্টগ্রামে চালু ছিল। (পরবর্তীকালে বর্মী-আরাকানী প্রভাবে হীনযান মত প্রাধান্য লাভ করে, আরো পরে হীনযান প্রসূত থেরবাদ চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের ধর্ম হয়ে ওঠে। [১৯])

এই সময় চট্টগ্রামে জ্বালনধারা ছিল। সম্ভবত সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ডই এই জ্বালনধারা বা তপ্তজল ধারা। এ থেকে আমরা দুটো অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি: এক. সিন্ধুদেশীয় বালপাদ জ্বালন্ধরে বাস করেছিলেন বলে জ্বালন্ধরীপা নামে পরিচিত হন; দুই. জ্বালন্ধর ও সামন্দর (সাম অগ্নি+ অন্দর< অন্তর, অভ্যন্তর) একার্থবোধক হলে আরব ভৌগোলিকদের সামন্দর চট্টগ্রামই।

এমনও অনুমিত হয় যে নালন্দাবিহারের গৌরব ও প্রভাব ম্লান হওয়ার কালে চট্টগ্রামই বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার পণ্ডিতবিহারের খ্যাতিও ছিল আন্তর্জাতিক। এই বিহার আধুনিক সীতাকুণ্ড কিংবা চক্রশালায় ছিল বলে লোকশ্রুতি আছে। আদিনাথ-চন্দ্রনাথ শিবও মূলত বৌদ্ধ দেবতা—তা নামেই প্রকাশ।

দশশতকের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধ তিলযোগী চট্টগ্রামেরই সন্তান। মগধের প্রধান আচার্য নরতোপা চট্টগ্রামে গিয়ে তিলযোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামের ছগল রাজা বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। তার দাপট বাঙলা থেকে দিল্লী অবধি অনুভূত হত। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তার বৌদ্ধ-পত্নীর প্রভাবে মগধে এবং বৌদ্ধগয়ায় ও নালন্দায় নানা সৎকর্ম করেন। বৌদ্ধপণ্ডিত সারিপুত্রের সাহায্যে তিনি বৌদ্ধগয়ায় বুদ্ধপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ছগল তারানাথের গ্রন্থ রচনার তিনশ বছর পূর্বে (চৌদ্দশতকের শেষপাদে) বর্তমান ছিলেন।

চট্টগ্রামের পণ্ডিত বর্ণরত্ন একটি ভিক্ষুদল নিয়ে তিব্বত পরিভ্রমণে গমন করেন। চট্টগ্রামের আর একজন রাজা ববলাসুন্দর খগেন্দ্রে অবস্থানরত সিদ্ধ শান্তিগুপ্তের কাছে চট্টগ্রামবাসী একদল পণ্ডিত পাঠিয়েছিলেন, এঁরা সেখান থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের অনেক গ্রন্থ চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। ববলাসুন্দরের চার সন্তান ছিল: চন্দ্রবাহন, অতীতবাহন, বালবাহন ও সুন্দর হচি। এঁরা সবাই বৌদ্ধধর্মের প্রতিপোষক ছিলেন। চন্দ্রবাহন আরাকানে, অতীতবাহন চাকমাদেশে (পার্বত্য চট্টগ্রামে), বালবাহন বর্মায় এবং সুন্দর হচি আসাম-কাছাড়-ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন।

এ থেকে চটল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির আভাস মেলে। পণ্ডিতবিহার এবং তীর্থিকদের সঙ্গে বৌদ্ধভিক্ষুদের শাস্ত্রীয় বিতর্কের উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের চট্টগ্রাম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫
ইতিহাসের ইঙ্গিত

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিংবা শাসনাদি লিপিতে চট্টগ্রামের নাম মেলে না। কিন্তু Strabo-র বর্ণনা ও Periplus of the Erythrean Sea থেকেও বোঝা যায়, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেও চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

পাহাড়পুরে খলিফা হারুন-অর-রশীদের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা মিলেছে। এ মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদীয়া টাকশালে তৈরি।[২০] আব্বাসীয় খলিফার আর একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে ময়নামতীতে। ওটির কোনো বর্ণনা আজো প্রকাশিত হয়নি। আরব বণিকেরা চট্টগ্রাম হয়েই বঙ্গের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করত, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। কাজেই অষ্টম শতকেও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

৭৮৮-১০১৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি আরাকানের বেসালি নগরে এক চন্দ্রবংশ রাজত্ব করেছেন। এ বংশের আদিপুরুষ মহাসিংহচন্দ্র (৭৮৮৮-৮১০) আর এর বংশধর চূড়সিংহ চন্দ্র (Chula Taing Chandra ৯৫১-৫৭) চট্টগ্রাম জয় করেন বলে কথিত। পাটিকেরও বেসালির চন্দ্ররা জ্ঞাতি হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে ধান্যবতীতে এদের পূর্বে রাজত্ব করতেন 'চন্দ্রসূর্য' বংশীয়রা (১৪৬-৭৮৮)। এঁরা যে ভারতিক ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাবিত অথবা ভারত থেকে আগত তাতে সন্দেহ নেই।[২১] সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত লিপি, শিব লাঞ্ছন ও ভারতীয় হরফ তার প্রমাণ। বিশেষত আরাকানের চন্দ্র রাজাদের মুদ্রা মিলেছে ময়নামতীতে। আটশতকের বাঙলায় প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় ম্রোহঙ-এর সিথাওঙ প্যাগোডার স্তম্ভে উৎকীর্ণ রাজা আনন্দচন্দ্রের লিপি থেকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি পূর্বতন রাজাদের প্রশস্তিমূলক রচনা। এতে ৬৫টি শ্লোক আছে।[২২] ত্রিপুররাজ ছেঙথুমও একবার চট্টগ্রাম জয় করেন।

নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলের বৌদ্ধরাজা কান্তিদেবের একটি তাম্র-শাসনের অসম্পূর্ণ খসড়া চট্টগ্রামের এক মন্দিরে পাওয়া গেছে।[২৩] কান্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর। হরিখেল হুগলী থেকে যশোর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপী ছিল বলে অনুমিত হয়।

সপ্তমশতকে হিউএনৎসাঙের পর্যটনকালে সমতট রাজ্য উত্তরে পুরোনো নিম্নব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পদ্মানদী অবধি বিস্তৃত-ছিল। কুমিল্লা জেলার লোকশ্রুতি অনুসারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে লালমাই পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সমুদ্র ছিল। যুগীদিয়া ও ভুলুয়া ছিল দ্বীপ। ফেনী অঞ্চল ছাড়া নোয়াখালির অন্যান্য অংশ ছিল সমুদ্রগর্ভে। সমুদ্রে চর জাগার পর 'তিতাস' নদীরূপে দেখা দেয়, ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা কুমিল্লার দিকে প্রবাহিত ছিল। এ নদী ক্রুম (ভলুয়া) নামে পরিচিত ছিল। গতিহারা ক্রুম বা ' ভলুয়া' নদীর চিহ্ন এখনো বর্তমান। চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু শেঙ চি'র পরিভ্রমণকালে সমতটের রাজা ছিলেন রাজভট্ট।[২৪]

কানিংহামের মতে 'সমতট' গঙ্গার বদ্বীপ যশোর অঞ্চল, Fergusson ও Watters-এর মতে যথাক্রমে ঢাকা ও ফরিদপুর। কিন্তু হিউএনৎসাঙ-এর বর্ণনা অনুসারে চট্টগ্রামও সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা: এবং সাত শতকে সম্ভবত উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে পুরাতন গঙ্গা বা পদ্মা (তথা আধুনিক মধুমতী নদী) বেষ্টিত ছিল এই সমতটরাজ্য।[২৫]

কোনো কোনো বিদ্বানের মতে নয়শতকে এবং কারো কারো মতে সাত শতকের শেষে ও আটশতকের শুরুতে [২৬] খড়গরা সমতটে রাজত্ব করতেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে সম্ভবত খড়গরাই সমতটে শাসক ছিলেন। I-Tsing -এর বর্ণনা মতে সাত শতকের শেষার্ধে ছাপ্পান্ন জন ভিক্ষুর ভারত ভ্রমণকালে শেঙচি সমতটে রাজভট্টকে রাজা দেখেছিলেন। অতএব, সাতশতকেই খড়গরা রাজত্ব করতেন।[২৭]

খড়গ সাধারণ কুলবাচী নয়। প্রথম বৌদ্ধ রাজা নৃপাধিরাজ খড়গোদ্যমের সন্ততি হিসেবেই পিতৃনামাংশ গ্রহণ করেছেন পরবর্তী দুজন রাজা—জাতখড়গ ও দেবখড়গ। দেবখড়গর পুত্রের নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজভট্ট। এঁদের পরিচয় পাওয়া গেছে ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তরপূর্বস্থিত আশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ও কুমিল্লা থেকে এগারো মাইল দূরে দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত সর্বাণীমূর্তিলিপি থেকে।[২৮] খড়্গরাজাদের রাজধানী ছিল 'কর্মন্ত বাসক'। এইটি বিদ্বানদের মতে কুমিল্লা জিলার বড়কমতা। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী নিজে এ অঞ্চল পরিদর্শন করে এই মতই পোষণ করতেন।[২৯]

খড়্গদের পরেই সমতটে চন্দ্রবংশীয়রা রাজত্ব করেন। এঁদের রাজধানী ছিল প্রথমে পাট্টিকের ও পরে বিক্রমপুর। দশ ও এগারো শতকের প্রথমার্ধ অবধি সমতটে চন্দ্ররাজারা রাজত্ব করেন। চন্দ্র রাজারা আরাকানী রাজাদের জ্ঞাতি হলে, এসময় চট্টগ্রাম চন্দ্ররাজাদের অধিকারে ছিল বলে অনুমান করা সম্ভব। বিশেষ করে লামা তারানাথ বলেছেন গোপচন্দ্র চট্টগ্রামেই (জ্বালনধারায়) রাজত্ব করতেন এবং সাতশতকেও হিউএনৎসাঙ চট্টগ্রামকে সমতট রাজ্যভুক্ত দেখেছেন। চন্দ্ররাজাদের প্রথম রাজা পূর্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি (লালমাই, কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত)। তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও লালমাইতে রাজত্ব করতেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্য চন্দ্র (আনু. ৯০০-৯২৯ খ্রী.) শক্তিমান হয়ে চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করেন।[৩০] এ সময় থেকে সমতটের চন্দ্ররাজারা বঙ্গেরও এক অংশের শাসক হলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তিনি প্রাগজ্যোতিষপুররাজকে পরাজিত করেন আর গৌড়রাজ গোপালকে সিংহাসনে পুনর্বহাল করেছিলেন। রাজ্যসীমা বিস্তৃত হওয়ায় তিনি বিক্রমপুরকে রাজধানী করে রাজত্ব করতে থাকেন (আনু ৯২৯-৯৭৫ খ্রী.) তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র (৯৭৫-১০০০) তাঁর পুত্র লড়হচন্দ্র (১০০০-১০২০) এবং তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (১০২০-১০৫০) রাজত্ব করেন। তিরুমালাই শিলালিপির প্রমাণে রাজা রাজেন্দ্রচোল ১০২১-২৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। মদনপুর, ঢাকা, ভাড়েলা ও পাইকপাড়ায় প্রাপ্ত যথাক্রমে শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের তাম্র ও মূর্তিলিপির আলোকে তিরুমাল্যইর শিলালিপি ভিত্তি করে চন্দ্ররাজাদের প্রায় নিশ্চিত আনুমানিক রাজত্বকাল নির্ণিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের পরে সমতট পালরাজ্যভুক্ত হয় এবং মহীপাল (১০৮০-৮৪) বাঘাউরা শিলালিপির প্রমাণে সমতটেরও অধিপতি ছিলেন। সম্ভবত সমতটে পাল অধিকার স্বল্পস্থায়ী ছিল।

চন্দ্রদের পরে বর্মণরাই সমতটের শাসনভার প্রাপ্ত হন।[৩১] এরা রাঢ় অঞ্চলের সিংগুর বা সিংজোর (সিংহপুর) নগরে রাজত্ব করতেন বলেই কোনো কোনো পণ্ডিতের মত। ডি সি গাঙ্গুলীর মতে সিংহপুরা পূর্ববঙ্গের কোথাও অবস্থিত এবং এটি বর্মণ রাজাদের শাসনকেন্দ্র ছিল।[৩২]

ভোজবর্মণের বেলাব (Belava) তাম্র শাসনের আলোকে অনুমান করা চলে যে বজ্রবর্মণের পুত্র জাতবর্মণ এই রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা।[৩৩] তৃতীয় বিগ্রহপাল ও জাতবর্মণ কর্ণের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। কাজেই বিগ্রহপাল ও জাতবর্মণ সমসাময়িক। জাতবর্মণ এগারো শতকের তৃতীয় পাদে রাজত্ব করতেন। জাতবর্মণের পরে তার ছেলে হরিবর্মণ এবং পৌত্র ভোজবর্মণ এবং তার পরে জাতবর্মণের অপর পুত্র সামল বর্মণ রাজা হন। এরপর সমতট সম্ভবত সেন-অধিকারভুক্ত হয়। সেনেরা ও বর্মণেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। পালেরা ও চন্দ্ররা ছিলেন বৌদ্ধ। এক রণবঙ্কমলহরিখেলদেবও (১২০৪-২০) সমতটে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তার এক তাম্রশাসন মিলেছে। এবং পাটিকের বৌদ্ধবিহারে ভূমিদানই এর বিষয়।[৩৪]

বর্মণদের পরে সমতটে দেববংশীয়রাই সম্ভবত রাজত্ব করেন। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মধুমথনদেবই প্রথম রাজা। তাঁর পুত্র বাসুদেব ও তাঁর পুত্র দামোদরদেব ও তাঁর পুত্র (?) দশরথদেব।

এ বংশের দামোদর দেবের (সিংহাসন আরোহণ ১২৩৯ খ্রী.) তাম্রশাসন মেহের (১২৪৩) ও চট্টগ্রামে (১২৪৩) মিলেছে। দশরথদেবের তাম্রশাসন মিলেছে আদাবাড়িতে। দশরথ বিক্রমপুর থেকে তার তাম্রশাসন প্রদান করেছেন, তাতে মনে হয় কেশব সেনাদি সেন-সামন্তদের রাজ্যও তিনি অধিকার করেছিলেন। দামোদর দেব অন্তত ১২৪৩ সন অবধি রাজত্ব করেন।[৩৫] মিনহাজ বলেছেন লক্ষ্মণ সেনের বংশধররা ১২৪৫ কিংবা ১২৬০ সন অবধি রাজত্ব করেন। অতএব দশরথ দেব তার পরই বিক্রমপুর জয় করে থাকবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্কো পোলো বলেছেন, ত্রয়োদশ শতকের শেষপাদে (১২৭১-৯৫) মিয়েন (Mien) ও বাঙলার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১০৪৪-৭৪ খ্রীস্টাব্দে পঁগারাজ অনরঠার রাজ্যের উত্তরপূর্ব সীমা ছিল পাটিকের। কাজেই চট্টগ্রাম তখন অনরঠার রাজ্যভুক্ত ছিল। এর বংশধর নরসিংহপতি (Narathihapatei) কুবলাই খানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে বাঙলার রাজাও তার সহায়ক ছিলেন। সম্ভবত বাঙলারাজ তথা সমতটরাজ তখন হয়তো নরসিংহপতির সামন্ত ছিলেন। কাজেই মার্কো পোলোর প্রত্যক্ষ জ্ঞানজ উক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

কুমিল্লার কাছে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রমাণে বলা যায় ত্রয়োদশ শতকেও পাটিকের রাজ্য বর্তমান ছিল।[৩৬] পাটিকের রাজকন্যাও বর্মীরাজ অলংসিথুর বিয়ে ও সে-কন্যার নরথু কর্তৃক হত্যাকাহিনী বর্মা ও আরাকানে সামান্য ভিন্নভাবে প্রচলিত এবং সে-কাহিনী Burma Chronicle-এ ও সাহিত্যে বিধৃত।

৬
ইতিহাসের ছায়া

কেউ কেউ মনে করেন, গঙ্গা আগে চট্টগ্রামের পাশে সন্দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় বঙ্গোপসাগরে মিলিত হত। Rennel-এর মানচিত্রেও এর আভাস আছে। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বলেন : (Ganges) Rising in the mountains towards the north, it passes through the province of Delhi and imperial Agra and Allahabad and Behar into the the province of Bengal, and near Qazirhattah in the Sarkar of Barbakabad it divides into two streams, one of these following east-wards falls into the sea of the port of Chittagong [৩৭]

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম পাদে গঙ্গামুখ বহির্বাণিজ্যের বন্দর ছিল বলে স্ট্রাবো (১৮২৪ খ্রী.) উল্লেখ করেছেন। গ্রীকরাও গঙ্গার মোহনাস্থিত বন্দরে বাণিজ্য করত। গঙ্গার নৌযানের নাম ছিল কলন্দিয়া (Calandia)। জলবাণিজ্য তত্ত্বের আদিগ্রন্থ Periplus of the Erythrean Sea -তে (খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক) গঙ্গামুখস্থ বন্দরের কথা পাই : On the bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought 'Malabathrum' and Gangetic spikenard and pearls and muslin of the finest sorts, which are called Gangetic, It is said that there are gold mines near these places and there is a gold coin which is called 'Caltis'. And Just opposite this river there is an island in the ocean the last par of the inhabited world towards the east, under the rising sun itself, it is called 'Chryse' and it has the best tortoise shell of all the places on the Erythrean Sea . এর সঙ্গে আলবেরুনীর 'গঙ্গাসাগর'ও (গঙ্গা পতিত হয়েছে যে সাগরে?) তুলনীয়।[৩৮] এবং Bernonilli তার গ্রন্থে আরবি শাত (delta) ও গঙ্গা নদী থেকে গঙ্গার মোহনাস্থিত বদ্বীপ নির্দেশ করবার জন্যে আরবেরা শাতগাঙ (< সাতগাওঁ > কাওন) নাম দান করে বলে যে-মত প্রকাশ করছেন, তাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। ইবন বতুতার সাতকাওন (Sudkawan) সম্ভবত এই 'শাত+ গাঙ' -এরই বিকৃতরূপ। ইবন বতুতা বলেছেন : "The First city in Bengal (লখনৌতি তথা গৌড় নয়) that we entered, was Sudkawan, a large town on the coast of the great sea. Close by it the river Ganges, to which the Hindus go on pilgrimage, and the river Jun unite and discharge together into the sea— এ অংশের সঙ্গে "Fakhruddin used to make expedition up the river against the land of Lakhnawti because of his naval superiority, but when the rainless season returned, Ali Shah would make raids by land on Bengal এবং I set out from sudkawan for the mountains of Kamru, a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

month's journey" আর "after fifteen days sailing down the river (blue-river Meghna, from Kamru) as we have related, we reached the city sunarkawan" ৩৯ মিলিয়ে পাঠ করলে সন্দেহ থাকে না যে বতুতা (ক) 'বাঙলা' অর্থে পূর্ববঙ্গ বুঝেছেন এবং (খ) তার Sudkawan চট্টগ্রামই। এখান থেকেই উজান বেয়ে কামরূপ এক মাসের পথ। সপ্তগ্রাম বাঙলার নয়, লখনৌতির অন্তর্গত। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল এবং পর্তুগীজ ঐতিহাসিক দ্যা ব্যারোজ বলেছেন, চট্টগ্রামের পাশেই গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। (গ) Jun (যমুনা) নামে এখানে ব্রহ্মপুত্র নদকেই নির্দেশ করা হয়েছে অতএব, বতুতার Sudkawan চাটগাঁও বলেই আমাদের বিশ্বাস। ভাগীরথী, যমুনা পদ্মা ও মেঘনাকে সাধারণভাবে গঙ্গা নামে অভিহিত করার রেওয়াজ বিদেশীদের মধ্যে সুপ্রাচীন। বিশেষ করে যুগদিয়া ও মুলুদিয়া যে দ্বীপ ছিল, তা এ দুটোর নাম ও এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি সূত্রেই প্রকাশ। এ তথ্য যদি মেনে নি, তাহলে গঙ্গামুখ যে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছেই ছিল তা মানতে দ্বিধা হবে না।

আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে সোলায়মান ইবন খোর্দাদবেহ (৯১২ অথবা ৮৪৪-৪৮) হুদুদুল আলমের অজ্ঞাত লেখক (৯৮২ খ্রী.) আলমাসুদী (৯৫৬ খ্রী.) এবং আল ইদ্রিসীর (১০৭৫-১১০০ খ্রী.) বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাঙলা দেশ।

সোলায়মানের রচনা বলে পরিচিত 'সিলসিলাত-অল-তওয়ারিখে' (৮৫১ ৫১ খ্রী.) বাঙলা দেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'সমন্দর'-এর উল্লেখ আছে ইবন খোর্দাদবেহর 'কিতাব অলমাসালিক ওয়াল মুমালিক' -এ আল মাসুদীর গ্রন্থে আর 'হুদুদুল আলমে'। ইবন খোর্দাদবেহ বলেন : 'সমন্দরে চাউল উৎপন্ন হয়, পনেরো-বিশ দিনের পথ কামরূপ ও অন্যান্য স্থান থেকে এখানে চন্দন (মুসববর বা ঘৃতকুমারী Aloe) আমদানি হয়।

আল ইদ্রিসীর মতে : Samandar is a large town, commercial and rich, where there are good profits to be made. It is a port dependent upon Kanauj, king of this country. It stands upon a river which comes from the country of Kashmir. Rice and various grains specially excellent wheat are to be obtained here. Aloe-wood is brought hither from the country of Karmut (Kamrup), 15 days distance by a river of which the waters are sweet. The aloe-wood which comes from this country is of a superior quality and of a delicious perfume. It grows in the mountains of Karan.

One day's sail from this city there is a large island well peopled and frequented by merchants of all countries. It is four days distance from the island of Sarandib. To the north, at sevendays distance from Samandar is the city of Kashmir.

এ বর্ণনা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও সমন্দর সম্বন্ধে খোর্দাদবেহ ও আল ইদ্রিসীর উক্তির অনেকাংশে মিল আছে। আল ইদ্রিসীর মতে (ক) সমন্দর নদীতীরস্থ বাণিজ্যবন্দর; (খ) ধান ও গমাদি নানা শস্য ও বন্দরে পাওয়া যায়; (গ) পনেরো দিনের পথ কামরূপ থেকে নদীপথে এখানে চন্দন আমদানি হয় এবং (ঘ) সমন্দর থেকে একদিনের পথে একটি বড় দ্বীপ আছে, এ দ্বীপও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর। 'হুদুদুল আলমে' রাজার নাম 'দহুম', আল ইদ্রিসীর মতে কনোজ। কিন্তু aloe সম্বন্ধে তিনজনই একমত।

সোলায়মানের 'সিলসিলাত অল তওয়ারিখে' পাই : These three states (Jurz গুর্জররাজ, Balhara— রাষ্ট্রকূটরাজ বল্লভরাজ এবং Tafak) border on a Kingdom called Ruhmi which is at war with that of Jurz. The king is not held in very high estimation. He is at war with Balhara as he is with the King of Jurz or the King

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of Tafak. It is said that when he goes out to battle he is followed by about 50.000 elephants... There is a stuff made in his country which is not to be found elsewhere; so fine and delicate is this material that a dress made of it may be passed through a single ring (Muslin) is made of cotton and we have seen a piece of it. Trade is carried on by means of *kauris* which are the current money of the country. They have gold and silver in the country, aloes, and the stuff called *samara,* of which *madabs* are made the striped *bushan* or *karkaddam* is found in this country. It is an animal which has a single horvein in the middle of its forehead and in this horn there is a figure like unto that of a man.

এই উক্তি থেকে পাচ্ছি : (ক) দেশের রাজার নাম রুহমি, তিনি শক্তিমান ও যুদ্ধপ্রিয় রাজা। কেবল গজারোহী সৈন্যের সংখ্যাই তার অর্ধলক্ষ। (খ) এখানে সুচিক্কণ মসলিন পাওয়া যায়। মসলিন ভারতের অন্যত্রও পাওয়া যেত, কিন্তু সেগুলো অত সূক্ষ্ম ছিল না। (গ) এখানে কড়ির মুদ্রা চলে এবং aloe ও গণ্ডার পাওয়া যায়। হুদুদুল আলমের বর্ণনার সঙ্গে এ বর্ণনা কতেকাংশে মিলে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হুদুদুল আলমে আছে : (ক) দেশের রাজার নাম দহুম, তিনি শক্তিমান এবং তার ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। (খ) এদেশে ভালো সুতা, চন্দন, হাতী ও (সামুদ্রিক) শঙ্খ সুলভ।

আল মাসুদীও বলেন : The Kingdom of Rahma extends both along the sea and continent. It is bounded by an inland state called the kingdom of *Kaman*. The inhabitants are fair and have their ears pierced. They have elephants, camels and horses; both sexes are generally handsome. Beyond this kingdom is that of Rahma which is title for their kings and generally at the sametime their name. এ বিষয়ে আল ইদ্রিসী ইবন খোর্দাদবেহর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : Kings generally bear hereditary titles;.... Among the kings of india, there are the Balhara Jaba Tafir, Hazr, Abat, Dumi (Rahmi?) and Kamrun. These names are taken only by the prince who reigns over the province or country no other has any right to assume them, but whoever reigns takes the name.

AMARBOI.COM

এখানে ধারণাটা সত্য হলেও নাম ও বাচীর পার্থক্য নির্ণয়ে ত্রুটি ঘটেছে। তা হোক, কিন্তু সম্ভবত 'রুহমি' 'রুহম' ও 'দুহম' একই নামের বিকৃতি। এ বিষয়ে Hodivala -র অনুমান সমাধানের সহজ পন্থা নির্দেশ করে : It seems to me that Rahma which is said by Masudi to have been the title or name of the king as well as his kingdom, is to be explained by the fact that the kingdom was described in the original writing to which Sulaiman and Masudi were indebted for their knowledge as 'Mulk-I-Duhma' This phrase is equivocal and may mean "The kingdom of Dharma" and also the "King of Dharma"; the *'dal'* was subsequently supposed to be a *'re'* and the *'re'* a 'wav' The phrase was thus misread as 'Mulk-I -Ruhm or Ruhmi—kingdom of Ruhmi '

এদেশের রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই সম্ভবত পূর্বসূরীর অনুসরণে আরব ভৌগোলিকরা গ্রন্থপরম্পরায় একই তথ্য পরিবেশন করেছেন। Jurz যদি গুর্জর হয় আর বলহার যদি রাষ্ট্রকুটরাজ বল্লভরায় হন, তাহলে পালরাজশ্রেষ্ঠ ধর্মপালই উক্ত 'দুহম' বা রুহমি তথা 'রহম'। কেননা, ধর্মপালের (৭৭০-৮১০) সঙ্গে এঁদেরই যুদ্ধ হওয়ার কথা।[৪০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে পরিবেশিত তথ্যগুলো থেকে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে-ধারণা পাই তা হচ্ছে এই :

ক. চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও ভোট-চীনা লোকের বসতিই আদিম।

খ. খ্রীস্টোত্তর যুগে বিহার অঞ্চলের আর্য-সংস্কৃতিপুষ্ট লোকেরা এ এলাকায় উপনিবিষ্ট হয় এবং সে সূত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এখানে প্রচার লাভ করে। আর তা পর্বতের বাধা অতিক্রম করে পগাঁ ও পেগু (হংসবতী) অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

গ. খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের দিকে চট্টগ্রামে-আরাকানে বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এ শতকেই সম্ভবত কোনো চন্দ্রবংশীয় রাজা মহামুনি বুদ্ধপ্রতিমা নির্মাণ করান।

ঘ. এ অঞ্চল অন্তত ষষ্ঠশতক অবধি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সমতটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

ঙ. চট্টগ্রাম প্রাচীনকালে—সীতাকুণ্ড ও বাড়ব পর্বতনিঃসৃত তপ্তজল ধারাসমন্বিত অঞ্চল—উত্তর-পূর্ব ভারতে জ্বালন ধারা নামে পরিচিত ছিল। এই জ্বালনধারাই কালক্রমে জ্বালন্ধর নামে খ্যাত হয়। তা-ই সম্ভবত প্রথম যুগের আরব বণিকদের মুখে সামন্দর হয়ে ওঠে।

চ. ধর্মপালের আমলে চট্টগ্রাম হয়তো স্বল্পকালের জন্য পালশাসনভুক্ত হয়।

ছ. উত্তরকালীন 'চাটিগাও' নামের উৎপত্তির অনেকগুলো অনুমিত উৎসের মধ্যে 'চিৎতৎ-গঙ্গ ও 'শাৎ-ই গাঙ—এ দুটো বেশি নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসহ।

জ. সুপ্রাচীনকাল থেকেই সিন্ধু এবং গঙ্গা—এ দুটোই সুপরিচিত প্রধান নদী। অন্যগুলো এ দুটোর শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিগণিত। ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গার উল্লেখই বেশি পাই বিদেশীর রচনায়। এজন্যে আমরা দেশী লোকেরা নদী নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হই। চট্টগ্রামের পাশেই গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে পড়ত। এ উক্তি থেকে তিনটে ধারণা করা সম্ভব। এক. সেকালের গঙ্গা বর্তমানে গতি পরিবর্তন করেছে। দুই. মেঘনা বা পদ্মাকে গঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিন. মেঘনা বা পদ্মাও গতিপরিবর্তন করে চট্টগ্রাম থেকে দূরে সরে এসেছে।

ঝ. খ্রীস্টোত্তর দশম-দ্বাদশ শতকে চট্টগ্রাম সমতটের সঙ্গে প্রশাসনিক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়। অবশ্য সাময়িক বিযুক্তি যে ঘটেনি তা নয়। আর এর আগে তিনদিকে পর্বত ও একদিকে সাগর-বেষ্টিত আরাকান ও চট্টগ্রাম একটি একক অঞ্চল ছিল বলে অনুমান করা চলে।

৭

আমরা দেখেছি, পর্বত ও সাগরবেষ্টিত চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন ভূখণ্ড। এর সঙ্গে আরাকানের সম্পর্কও সুপ্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে আরাকান ও চট্টগ্রাম একই ভূখণ্ড। মধ্যে কেবল পর্বতমালার ব্যবধান। এই দুরতিক্রম্য বাধাই উভয় অঞ্চলে অভিন্ন গোত্রীয় জনবসতির অন্তরায় ছিল। তাই চট্টগ্রামে অস্ট্রিকাদি জনগোষ্ঠীর বসতি অধিক। আর আরাকানে দেখছি, ভেট চীনা গোত্রীয় কিরাত-জাতীয় লোকের আধিক্য। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতবেষ্টিত বলেই আরাকান ব্রহ্মদেশ থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে আরাকানের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছিল অনেক কাল।

তবু আরাকান অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠীর এবং আভিজাত্যকামী জনগণের মাগধী-ঐতিহ্যপ্রীতি ধর্মসূত্রে উত্তরভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব স্বীকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রায় দু' হাজার বছর আগে হিন্দু-বৌদ্ধ জনসমষ্টি তাদের ভাষা, লিপি, ধর্ম ও সংস্কৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে এ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানীয় জনগণকে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করে।

যদিও সমগোত্রীয় বলে চট্টগ্রামবাসীরা ধর্মে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে উত্তরভারতীয় জাতীয়তা স্বীকার করে নিল, তবু রাষ্ট্রীয় অভিন্নতা সাধন সম্ভব হয়নি অনেককাল। এর মুখ্য কারণ সম্ভবত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা।

এখনকার বাঙলাদেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যই প্রাচীনতম, রাঢ় অঞ্চলও প্রাচীন। কিন্তু সেখানকার জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন নয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি—" ব্যাধ গোহিংসক জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।" এবং জৈন-বৌদ্ধ গ্রন্থেও রাঢ়বাসীর নিন্দা রয়েছে।

এই উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগ বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। কেননা সমতট (Plain coastal land) অঞ্চল সম্ভবত সাগরগর্ভ থেকে গড়ে ওঠে অনেক পরে। হুএনৎসাঙ কিংবা ইৎসিঙের বর্ণনাসূত্রে জানতে পাই যে সমতট অঞ্চলে দিগন্তবিসারী হাওড় বা জলাভূমি ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে (১৮-২৪ খ্রী.) পর্যটক স্ট্রাবোও লোনা জলের উপদ্রব দেখেছিলেন। কাজেই এ অঞ্চল জনবিরল থাকাই সম্ভব।

উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই হয়তো চট্টগ্রাম মৌর্য, গুপ্ত কিংবা পাল শাসনভুক্ত হয়নি। এ সুযোগে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে চট্টগ্রাম-সংলগ্ন আরাকানের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি চট্টগ্রামে স্বাধিকার বিস্তার করে। এ অধিকার পরে সমতট অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপিতে, ময়নামতীর চন্দ্ররাজাদের ঐতিহ্যে, পঁগারাজ অনারঠার আরাকান-পাট্টিকের-এ আধিপত্য লাভের ইতিকথায় কুবলাই খাঁর বাহিনীর সঙ্গে Mien ও বাঙালি সৈন্যের যুদ্ধের উল্লেখে, পাট্টিকের রাজকন্যার সাথে পঁগারাজ অলংসিথুর বিয়ের বর্ণনায় এবং পাট্টিকের রাজপুত্রের পঁগারাজকন্যার পাণি প্রার্থনার কাহিনীতে আমাদের অনুমানের সমর্থন মেলে।[৪১]

আরাকানী রাজ-'ইতিবৃত্ত রাজোয়াঙে' (রাজবংশ) চট্টগ্রামের ইতিহাসের কিছু উপাদান রয়েছে। এজন্যে আরাকানী ইতিবৃত্তের আলোচনা প্রয়োজন। রাজোয়াঙ সূত্রে জানা যায় এক 'চন্দ্রসূর্য' আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ধান্যবতীতে রাজত্ব করতেন। তার বংশধরেরা সূর্যাধিপতি -সূর্যপ্রতিপদ-সূর্যরূপ-সূর্যমণ্ডল-সূর্যবর্ণ-সূর্যউষ্ণ-সূর্যনাথ-সূর্যবন্ত -সূর্যবন্ধু-সূর্য কল্যাণ -সূর্যমুখ্য-সূর্যতেজ-সূর্যপুণ্য-সূর্যকলা-সূর্যপ্রভা-সূর্যসিক্ত-সূর্যতীর্থ -সূর্যবিমল-সূর্যসেন-সূর্যগ্রন্থ -সূর্যস্বর্গ -সূর্যশ্রী -সূর্যক্ষিতি-সূর্যকূট-সূর্যকেতু নাম নিয়ে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তারপর বৈশালীতে (Wesali) ৭৮৮ থেকে মহাসিংহ চন্দ্র-সূর্য সিংহচন্দ্র-মৌলসিংহচন্দ্র, পুরসিংহচন্দ্র, কালসিংহচন্দ্র, তূবসিংহচন্দ্র, শ্রীসিংহচন্দ্র, তীক্ষ্ণসিংহচন্দ্র, চূড়সিংহচন্দ্র প্রভৃতি ৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করার পর মিউগোত্র প্রধান 'অম্যহতু' সিংহাসন দখল করেন। তার পুত্র য়েপিউ (Yepyu) থেকে চূড়সিংহের সন্তান সিংহাসন ছিনিয়ে নেন। চূড়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্তান Hkittathin, Pyinsa- কেই রাজধানী করেন। এখানে ১০১ থেকে ১১০৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি এ বংশের রাজধানী থাকে। তারপর এ বংশেরই রাজা Letyminnau ১১০৩ কিংবা ১১১৮ সনে Parin কে রাজধানী করেন। এখান থেকে ১১৬৭ সনে এই বংশের Minousa, Hkrit শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। এ বংশের Misuthin Pyinsa -কে আবার রাজধানী করেন ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৩৭ সনে Laungyet-এ রাজধানী হয় এবং ১৪৩৩ সন থেকে ১৭৮৫ সনে বর্মী বিজয় অবধি Mrohaung বা Mrauku-ই শাসনকেন্দ্র ছিল। তালিকা অনুসারে দেখা যায় চন্দ্রসূর্যের বংশধরেরাই প্রায় ১৬৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেন। অবশ্য মাঝেমধ্যে তারা সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুতও হয়েছেন। এই তালিকার সঙ্গে আনন্দচন্দ্র প্রদত্ত তালিকার মিল নেই। আনন্দচন্দ্রের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রাপ্ত পূর্ব রাজাদের অস্তিত্বেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ করা যায় না। কেননা, এর মধ্যকার কোনো কোনো নামের মুদ্রা মিলেছে। তাহলে আমাদের অনুমান করতে হবে, কোনো এক বংশ গোটা আরাকান অঞ্চলে উপর (Yoma পর্বতসীমা অবধি) সব সময় রাজত্ব করেনি। কেন্দ্রীয় শাসন-শৈথিল্যের সময় বিভিন্ন সামন্ত স্বাধীনভাবে বংশপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন। রাজধানী পরিবর্তনের কারণ হয়তো এ-ই। সম্ভবত ধান্যবতী ও বৈশালী বা অন্যত্র একই সময়ে অর্থাৎ ৩৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে চন্দ্রবংশীয় দুটো শাখা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এবং ৭৮৮ সনে হয় ধান্যবতী শাসকেরা (Phayre ও Harvey-র তালিকা অনুসারে) বৈশালী রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পূর্ববর্তী রাজাদের মতো 'চন্দ্র' বাচী গ্রহণ করেন, অথবা এ সময়ে বৈশালীর চন্দ্ররা ধান্যবতী রাজ্য জয় করে গোটা অঞ্চলের অধিপতি হন।

প্রথমোক্ত অনুমান সত্য হলে, আর একটি অনুমানও যোগ করতে হবে, তা এই *Dven* চন্দ্রের রাজ্যসীমা সমতট অবধি বিস্তৃত ছিল। বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের পতনের পর পরপুর [৪২] নামক উপকূল অঞ্চলের সামন্ত (?) রাজা মহাবীর আরাকানের একাংশে রাজত্ব করেন। সে অঞ্চলের রাজপরম্পরার নামই আনন্দের স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। এরপরে ব্রয়জপ (*Vrayajap*) ও *Sevinreni* -উভয়েই বারো বছর করে ২৪ বছর রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন ধর্মশূর। তারপর বজ্রশক্তি-ধর্মবিজয়-নরেন্দ্রবিজয়-ধর্মচন্দ্র অথবা নরেন্দ্র চন্দ্র (বজ্রশক্তির অপর পুত্র) আনন্দচন্দ্র।

চন্দ্রদের রাজধানীর উল্লেখ আনন্দচন্দ্রের উৎকীর্ণ স্তম্ভলিপিতে নেই। এই স্তম্ভ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাও জানা নেই। স্থানান্তরিত হয়ে ম্রোহঙের *Shitthaung* প্যাগোডায় রক্ষিত আছে। [৪৩] কাজেই বৈশালীই আনন্দ-চন্দ্রদের রাজধানী ছিল, তেমন কথাও বলা চলে না। তবে ম্রোহঙ-এ বা তার সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে আনন্দ চন্দ্ররা যে রাজত্ব করতেন, তা ম্রোহঙ-এ রক্ষিত আলোচ্য স্তম্ভলিপি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। যা হোক, সমতটের সঙ্গে যে এর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক যোগ ছিল তা উভয় অঞ্চলে চুণ্ডাদেবীর প্রতিষ্ঠা, মহাযান-সর্বাস্তি মতের প্রাবল্য, *Naulakka, Domgaha, Dankangamarganga, Duvara Bhuro kanaulakkalvaraka* প্রভৃতি বঙ্গের অনার্য স্থান-নাম এবং সমতট অঞ্চলে (ময়নামতীতে) আরাকানী চন্দ্ররাজাদের মুদ্রা প্রাপ্তি প্রভৃতি তার প্রমাণ।

E. H. Johnston -এর বিবৃত পাঠের অনুসরণে আমরা আনন্দের স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ রাজ পরম্পরার নামের তালিকা পেশ করছি :

১।

ক্রমিক সংখ্যা	রাজা	রাজত্বকাল
১	——	১২০
২	——	১২০
৩	——	১২০
৪	বহুবলি	১২০
৫	রঘুপতি	১২০
৬	——	১২০
৭	চন্দ্রোদয়	২৭
৮	অন্নবেত	৫
৯	——	৭৭
১০	রিম্ব্যপ্প	২৩
১১	রানী কুবেরামী বা কুবেরো	৭
১২	তারস্বামী উমাবীর্য	২০
১৩	যজ্ঞ (*Jugna*)	৭
১৪	লাঙ্কী (*Lanki*)	২

এঁরা ১০১৬ কিংবা ১০৬০ বছর ব্যাপী রাজত্ব করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। চন্দ্রবংশীয় রাজা : এ বংশের উদ্ভবকাল আনু. ৩৩০-৬০ খ্রীস্টাব্দ,
পতনকাল আনু . ৫৬০-৯০ খ্রীস্টাব্দ।

ক্রমিক সংখ্যা	রাজা	রাজত্বকাল	মন্তব্য
১	(*Dven*) দ্বেনচন্দ্র	৫৫	১০১ জন রাজা পরাভূত করেন
২	রাজচন্দ্র	২০	
৩	কালচন্দ্র	৯	একটি প্রাপ্ত মুদ্রা কালচন্দ্রের বলে অনুমিত। (*Johnston p.384*) এ নামটি এবং ৯ বছর শাসনকাল বৈশালীর কালচন্দ্রের সঙ্গে মিলে যায়।
৪	দেকচন্দ্র	২২	এঁর মুদ্রা মিলেছে।
৫	যজ্ঞচন্দ্র	৭	—
৬	চন্দ্রবন্ধু	৬	কেউ কেউ নামের তাৎপর্যে গুরুত্ব দিয়ে এঁকে ভিন্নবংশীয় বলে (জবর দখলকার?) অনুমান করেন।
৭	ভূমিচন্দ্র	৭	—
৮	ভূতিচন্দ্র	২৪	—
৯	নীতিচন্দ্র	৫৫	এঁর বড় ছোট অ:েক মুদ্রা মিলেছে।
১০	বীর্যচন্দ্র বা বীরচন্দ্র	৩	মুদ্রায় 'বীর' নাম উৎকীর্ণ।
১১	প্রীতিচন্দ্র	১২	মুদ্রা মিলেছে।
১২	পৃথিবীচন্দ্র	৭	ঐ
১৩	ধৃতিচন্দ্র	৩	ঐ

এঁরা আনু . ৫৬০ বা ৫৯০ অবধি ২৩০ বছর রাজত্ব করেন।

৩। পরবর্তী শাসকগণ :

১	মহাবীর	১২
২	ব্রযজপ (*Vrajayap*)	১২
৩	*Sevinirin* (*Mavukaghatin*)	১২
৪	ধর্মশূর	১৩

৪। ধর্মশূরের পরবর্তী শাসকবংশ :

১	বজ্রশক্তি	১২	দেবাউজ বা শ্রীধর্মবাজাওজ তথা আদিনাথের বংশজ।
২	ধর্মবিজয়	৩৬	বিজ্ঞানবাদী বা সর্বাস্তিবাদী মহাযান পন্থী, এর মুদ্রা মিলেছে।
৩	নরেন্দ্র বিজয়	২ মাস	
৪	শ্রীধর্মচন্দ্র বা বীরনরেন্দ্রচন্দ্র (বজ্রশক্তির অপর সন্তান)	১৬	এঁর মুদ্রা মিলেছে।
৫	আনন্দচন্দ্র ইনি সিংহলের শিলামেঘ বর্ণ রাজার ও দাক্ষিণাত্যের শ্রীতাম্রপত্তনের রাজা শৈব-অন্দের কন্যা Dhanda কে বিয়ে করেছিলেন।	৯	এঁর রাজত্বের নবম বছরে আলোচ্য স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হয়। আনন্দচন্দ্র আনন্দোদয় আনন্দ মাধব, আনন্দেশ্বর নামের বহু মঠ মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠাতা; সিংহলের ভিক্ষুদেরকেও দানে তুষ্ট করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দচন্দ্ররা আনু. ৬৮৫ কিংবা ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১২৫ বছরকাল রাজত্ব করেন।[৪৪] পরবর্তী দুজন রাজার নাম (আনু. দশ শতকের) সিংহ গণপতিশূর চন্দ্র এবং সিংহ বিক্রমশূর চন্দ্র ।

উপরে আলোচিত তথ্য থেকে আমরা কয়েকটি ধারণা গঠন করতে পারি :

ক. ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত উত্তরভারতীয় লোকেরা আরাকানে উপনিবিষ্ট হয়। এদেরই ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত আদি রাজার নাম চন্দ্রসূর্য। ধান্যবতী (*Dinnyawati* > ধান্যবতী *Johnston* প্রদত্ত নাম)। এঁর ও এঁর বংশীয়গণের আটশতক অবধি রাজধানী ছিল।

খ. সম্ভবত খ্রীস্টিয় চতুর্থশতক থেকে এদের জ্ঞাতিবংশীয় বা অপর 'চন্দ্র' বংশীয় সামন্ত *Dven* (*Devendra* বা *Dvija Singh*) চন্দ্র বৈশালীতে বা ম্রোহঙ-এ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ২৩০ বছর যাবৎ এ বংশীয়রা রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের রাজ্যসীমা সম্ভবত সমতট অবধি বিস্তৃত ছিল।

গ. দেশীয় শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে ধান্যবতীর রাজারা ৭৮৮ সনে বৈশালীতে রাজধানী করেন। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না হয়তো যে ধান্যবতীর রাজা বৈশালী রাজ্য দখল করে এখানেই রাজধানী করলেন এবং পূর্ববর্তী স্থানীয় রাজাদের অনুকরণে 'চন্দ্র' বাচীও নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন। সম্ভবত ধান্যবতীর রাজা গোটা চন্দ্র রাজ্য জয় করতে পারেননি। তার উত্তরাংশে ম্রোহঙ অঞ্চলে চন্দ্রদের পরপুরাস্থ সামন্ত রাজা মহাবীর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। অথবা পরপুরা তাঁর নবার্জিত রাজ্যেরও শাসনকেন্দ্র হয়।

ঘ. পালি-সাহিত্যের 'নিদ্দেস'-উক্ত পুরেপ্পুর> পরপুর> পুরপুর, *Ptolemy* র বরকুর ইবন বতুতার বরকান, কুতবদিয়া ও আকিয়াবের মধ্যস্থিত কোনো বন্দর। কাজেই পরপুর, বৈশালী, *Hkrit*, পিনসা, পেরিন ও ম্রোহঙ-এর নিকটবর্তী হওয়ারই কথা।

ঙ. মহাবীর বা তাঁর পরবর্তী রাজা বজ্রশক্তি বংশীয়দের রাজধানী কোথায় ছিল, তা স্তম্ভলিপি থেকে কিংবা মুদ্রা থেকে জানা যায় নি। বৈশালী ছাড়া উক্ত চারস্থানের যে-কোনো একটা অথবা পরপুরা এদের রাজধানী ছিল বলে মনে হয়।

চ. বজ্রবিক্রমের পরবর্তী রাজারা চট্টগ্রামের তথা সমতটে কতেকাংশ স্বাধিকারে এনে ছিলেন মনে হয়। দশম শতকে আরাকানে যখন এঁদের শাসনাধিকার লুপ্ত হয়, তখনো চট্টগ্রাম অঞ্চল এ বংশীয়গণের করতলে ছিল সম্ভবত। বৈশালীর রাজা চূড়সিংহচন্দ্র (*Chulataing Chandra*) হয়তো-এমনি কোনো শূরচন্দ্র রাজা থেকে চট্টগ্রামের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আরাকানী ইতিহাসে ইনিই হয়তো থুরতান (<শূরচান> শূরচান্দ), যাকে আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থে (আরব) সুলতান (পৃ. ২-৩) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেউ কেউ 'থুরতন' নামটি রাজ্যজ্ঞাপক বলে মনে করেন, তারা 'থুরতন' অর্থে ত্রিপুরা রাজ্য বুঝেছেন।

ছ. ধর্মে ও সংস্কৃতিতে, সংস্কৃতের ব্যবহারে, নাগরী হরফের প্রয়োগে, চুণ্ডাদেবীর প্রতিষ্ঠায় ও মহাযানমতের প্রাবল্যে সমতট ও আরাকানে কোনো পার্থক্য ছিল না। বৃষ শঙ্খ ও লাঞ্ছনাও তাদের অভিন্ন ছিল।

জ. তাই মনে হয়, সমতটের চন্দ্ররা সম্ভবত আরাকানের চন্দ্রদেরই জ্ঞাতি ছিল। ওখানে চন্দ্রদের অধিকার লুপ্ত হওয়ার পরেও এঁরা এখানে এগারো শতকের প্রথমপাদ অবধি টিকে ছিলেন। সময়ের দিক দিয়েও প্রায় মিলে যায়। এ বংশের প্রথম রাজা বলে অভিহিত পূর্ণচন্দ্র সম্ভবত প্রথম রাজা নন; পূর্ণচন্দ্র-সুবর্ণচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যচন্দ্র গড়ে ৪৪/৪৫ বছর ধরে রাজত্ব করতে থাকলে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এরা সমতটে কখনো সামন্ত, কখনো বা স্বাধীন রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছেন বলে অনুমান করবার যুক্তি আছে।

ঝ. লামা তারানাথও (জন্ম ১৫৭৩, গ্রন্থ সমাপ্তি ১৬০৮ খ্রী:) এক চন্দ্রবংশের উল্লেখ করেছেন : বৃক্ষচন্দ্র, বিগমচন্দ্র, কামচন্দ্র (হর্ষবর্ধনের সময়ে বঙ্গরাজা ছিলেন) সিংহচন্দ্রের (হর্ষপুত্র শীলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে) প্রপৌত্র, বালচন্দ্রের পৌত্র বিমলচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন। তিনি 'ছগল' বলে এক রাজার নামও বলেছেন। আবার ববলা সুন্দর ও তার পুত্র চন্দ্রবাহন আদির নাম করেছেন। এতগুলো নাম নিছক কল্পনাপ্রসূত না হওয়ারই কথা, মনে হয় এরা চট্টগ্রামে সাধারণ বা সামন্ত শাসক ছিলেন। উপরোক্ত চন্দ্ররা আরাকানের অথবা সমতটের চন্দ্রদের প্রতিনিধি হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষ করে আনন্দ চন্দ্রের স্তম্ভলিপির প্রথম নাম হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতে বালচন্দ্র। [৪৫] এর পাঠোদ্ধার *Johnston* করেননি।

৮

১। সমতট

এলাহাবাদে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতেই প্রথম সমতটের উল্লেখ পাই। একে গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক সীমান্তে করদরাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় সমতট ও বঙ্গকে পৃথক অঞ্চল বলে নির্দেশ করা হয়েছে[৪৬] *Cunningham* -এর মতে সমতট গঙ্গার বদ্বীপ যশোর, *Ferguson* ও *Watters* -এর মতে ফরিদপুর ও ঢাকা।

সাত শতকে হিউএনৎসাঙ সমতট রাজ্যকে কামরূপের দক্ষিণস্থ নিম্ন ও আর্দ্রভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর মতে রাজ্যের আয়তন ৩০.০০০ লি (প্রায় ৭০০ মাইল) এবং রাজধানীর আয়তন ২০ লি (প্রায় ৪$\frac{২}{৩}$ মাইল)। ইৎসিঙ তাঁর পর্যটনকালে রাজভট্টকে সমতটের রাজা দেখেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে আশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয় এঁরই পিতা দেব খড়্গের।[৪৭] কুমিল্লায় প্রাপ্ত সর্বাণীমূর্তি লিপিতে এঁর পূর্ব রাজাদের নাম আছে। সমতটের আদি রাজধানী ছিল কারমান্তা, এটি কুমিল্লা জেলার আধুনিক (বর) কামতা গ্রামে ছিল।[৪৮] এখানে রাজধানীসুলভ নিদর্শনাদি এখনো বর্তমান। এক পাণ্ডু-লিপিতে প্রাপ্ত লোকনাথের আলেখ্য পরিচিতিতে চাম্পিতলাকে (কুমিল্লা জিলায়) সমতটের অর্ন্তভুক্ত বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে সমতটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকজন স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করেন। কোটালিপাড়ার পাঁচখানি ও বর্ধমানের একখানি তাম্রলিপি ও মুদ্রা থেকে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এঁরা ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করতেন।[৪৯] হিউএন সাঙ যখন সমতট পর্যটন করেন, তখন তিনি সেখানে ত্রিশটি সঙঘারাম ও দুহাজার ভিক্ষু দেখেছিলেন। এবং জৈনাদি সর্বধর্মের লোকের বাস ছিল ও শতেক মন্দির শোভা পেত। হিউএন সাঙের শিক্ষক নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটের রাজকুমার ছিলেন।[৫০] ইৎসিঙ (৬৭৩-৮৭) বলেছেন সমতটরাজ বৌদ্ধ ছিলেন, তার নাম রাজভট্ট। এই রাজভট্ট খড়্গ-বংশীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র। দেবখড়্গ জাতখড়্গের আর জাতখড়্গ খড়্গোদ্যমের পুত্র। রাজভট্ট যদি সপ্তম শতকের শেষপাদে রাজত্ব করে থাকেন তাহলে খড়্গোদ্যম ষষ্ঠ শতকের শেষপাদে সমতটের রাজা ছিলেন।[৫১] হিউএন সাঙের মতে শীলভদ্র ও কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী বলেছেন, বর্মণ যদি ব্রাহ্মণের কুলবাচী হয়, তাহলে খড়্গাও ব্রাহ্মণ হতে বাধা নেই এবং খড়্গা সন্তানের রাজভট্ট নামও এ অনুমানের পরিপূরক। আশরফপুর তাম্রলিপির প্রমাণে খড়্গাদের আমলে সমতটরাজ্য নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমতট শশাঙ্কের সময়ও স্বাধীন ছিল কেননা, হিউএন সাঙ (৬৩৮ খ্রী.) শীলভদ্রকে সমতটের রাজবংশীয় বলেছেন।[৫২] আর হিউএনসাঙ ও ইৎসিঙ সমতট রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইৎসিঙের সহচারী শেঙচি রাজা রাজভট্টের নামও করেছেন। ইৎসিং দেববমের (দেব খড়্গা?) রাজ্যে শ্রীগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত চীনা-চৈত্য দেখেছিলেন।

২। চন্দ্রবংশ

নানা জায়গায় প্রাপ্ত তাম্রপত্র ও মূর্তিলিপির প্রমাণে ও বিদ্বানদের বিশ্লেষণে সমতটের চন্দ্ররাজাদের একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ নাম তালিকা ও রাজত্বের প্রায়-নিশ্চিত সময়কাল নির্ণিত হয়েছে। মনে হয়, গোপচন্দ্র সমাচারদেব এবং আদিত্য, দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গে তথা হরিখেলমণ্ডলে রাজত্ব করতেন। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খড়্গরা করতেন সমতটে। সম্ভবত খড়্গদের পতনের পরে সমতট আরাকানের চন্দ্ররাজাদের অধিকারে আসে। আরাকানীসূত্রে দেখা যায়, বৈশালী নগরের চন্দ্ররা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হয় এবং উত্তর আরাকান সম্ভবত মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে এবং সমতট অঞ্চলে হয় বিতাড়িত চন্দ্ররা অথবা তাদের জ্ঞাতি সামন্ত-শাসক বংশীয়রা প্রায় দেড়শ বছর অবধি রাজত্ব করতে থাকেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে তাদের রাজপরম্পরার একটি পীঠিকা দেওয়া হল ' :

রাজা	রাজত্বকাল	খ্রীস্টাব্দ	মন্তব্য
১ পূর্ণচন্দ্র	আনু. ৪০	৭৮৮-৮২৮	রাজধানী পাটিকের
২ সবর্ণচন্দ্র	ঐ	৮২৮-৮৬৮	ঐ
৩ তৈলোক্যচন্দ্র	ঐ	৮৬৮-৯০৮	হরিকেল মণ্ডলপতি, কান্তিদেব এঁর আশ্রিত ছিলেন
৪ শ্রীচন্দ্র	ঐ	৯০৮-৯৪৮	দিগ্বিজয়ী, রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন, দ্বিতীয় গোপাল তাঁর হাতে পরাজিত হন।
৫ কল্যাণচন্দ্র	নিশ্চিত রাজত্বকাল ২৪ আনু. ৩৫	৯৪৮-৯৮৩	বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।
৬। লড়হচন্দ্র	নিশ্চিত : ১৮ আনু. ২৫	৯৮৩ -১০০৮	
৭ গোবিন্দচন্দ্র	নিশ্চিত : ২৩ আনু. ৩০	১০০৮-১০৩৮	ইনি চোলরাজ রাজেন্দ্র কর্তৃক (১০২১-২৩ সনে) পরাজিত হন।
৮ আত্মীয় ললিতচন্দ্র	আনু. ৩২	১০৩৮-১০৭০	

AMARBOI.COM

বৈদ্যকশাস্ত্র গ্রন্থ বৃক্ষায়ুর্বেদ, লৌহসর্বস্ব (লৌহ পদ্ধতি) ও শব্দপ্রদীপ লেখক এবং রাজা ভীমপালের চিকিৎসক সুরেশ্বর বা সুরপালের পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালের (১০৭৭—১১২০) এবং তার পিতামহ ' দেবগণ' গোবিন্দচন্দ্রের চিকিৎসক ছিলেন। এই ভিত্তিতে গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্বকাল ১০৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি অনুমান করা সম্ভব। সম্ভবত রাজা দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫) চন্দ্রদের সমতট রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। এঁর বাঘাড়াউড় মূর্তিলিপিই সমতট অঞ্চলে পাল প্রভাবের প্রথম সাক্ষ্য বহন করে। [৫৪] পূর্ণচন্দ্রাদির আমলে বৃক্ষচন্দ্রাদিই হয়তো চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক ছিলেন।

৩। হরিখেল

হরিখেল মণ্ডল এলাকা আজো অনির্ণীত। ইৎসিঙের (৭ম শতকের শেষার্ধ) মতে হরিখেল ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চল। কর্পূরমঞ্জরী লেখক রাজশেখরদত্ত (৯ম শতক) হরিখেলকে পূর্বদেশ বলেই পরোক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন।[৫৫] যশোধারার জয়মঙ্গলে আছে : 'বঙ্গালোহিত্যাং পূর্বেন'। এসব গুলোই কামরূপ ও সমতট মধ্যস্থ শ্রীহট্টকে নির্দেশ করে।

আবার যাদবানন্দ কবিরাজের রসরূপচিন্তামনি (১৫৯৩ খ্রী.) বাসুদেব কবিকঙ্কন চক্রবর্তীর 'রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্যে' (পাণ্ডুলিপি: ঢা. বিশ্ববিদ্যালয়) এবং কেশব কৃত্যসরের 'কল্পদ্রু'তে ও আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শ্রীহট্টকেই হরিখেল বলে নির্দেশ করা হয়েছে [৫৬]

কিন্তু চীনাসূত্রে এও জানা যায় যে সমতট ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী হরিখেল কোনো উপকূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চল। হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামনি' গ্রন্থে 'বঙ্গাস্তু হরিখেলিয়:' উক্তিতে বঙ্গকেই হরিখেল বলা হয়েছে। আবার নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলপতি কান্তিদেবের অসম্পূর্ণ তাম্রলিপি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে। তাতে দেখা যায় তার রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর। এই বর্ধমানপুরের কোনো ঐতিহ্য সিলেটে কিংবা দক্ষিণবঙ্গে মেলে না। শ্রীচন্দ্রের রামপালে প্রাপ্ত তাম্রপত্রেও হরিখেলের উল্লেখ আছে।

অতএব (ক) সিলেটে (খ) ফরিদপুর-বরিশাল-খুলনা প্রভৃতি উপকূল অঞ্চল (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকা—এর যে-কোনো একটি হরিখেল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে 'খেল' < কেল' যদি < 'কের' থেকেই হয়ে থাকে তাহলে পাট্টিকের'র যে-কোনো একপাশেই 'হরিখেল' বিদ্যমান ছিল। আমাদের মনে হয়, দক্ষিণবঙ্গের উপকূলাঞ্চলই হরিখেল ছিল, এখান থেকেই কান্তিদেব সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম জয় করেন, কিন্তু সমতট রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কাছে পরাজিত হওয়ায় তার তাম্রপত্রটি চট্টগ্রামে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এদিকে দক্ষিণবঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপাদি) জয় করে ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজ্যসীমা বিস্তৃত করায় পাট্টিকের থেকে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ চন্দ্ররাজাদের অধিকারে ছিল। ত্রৈলোক্যচন্দ্র যখন বিক্রমপুরে রাজধানী করেন, তখন তার সামন্ত কুসুমদেব বা তার পিতা পাট্টিকের অঞ্চল শাসনের ভারপ্রাপ্ত হন। এরই সন্তান ভাবুদেব লড়হ চন্দ্রের সময়ে কারমন্তার শাসক ছিলেন—নটেশ্বর শিবের মূর্তিলিপি থেকে তাই অনুমান করা যায়। চন্দ্ররাজারা দক্ষিণ-দেশীয় রাজাদের দ্বারা বারবার পর্যুদস্ত হন। রাজেন্দ্র চোল (১০২১-২৩) গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন বলে তিড়ুমালাই লিপি থেকে জানা যায়, আবার কালকুচি রাজারাও চন্দ্ররাজ্যে বারবার হানা দেন। কোক্কল্ল (আনু. ৮৪০-৯০) ও তার পৌত্র লক্ষ্মণ রাজা এবং পরবর্তী কালকুচি রাজা কর্ণ (১০৪১-৭০) বঙ্গরাজার উপর জয়ী হয়েছিলেন। বাঘাউড়া লিপির প্রমাণে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপাল সমতটের কতেকাংশ জয় করেছিলেন। কিন্তু এ জয় স্থায়ী হয়নি। ইনি কর্ণ-বিধ্বস্ত বঙ্গ-সমতট জয় করবার সুযোগ পেলে রক্ষা করতে সমর্থ হননি বলেই মনে হয়। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ববঙ্গরাজ জাতবর্মণ কালকুচিরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিয়ে করেছিলেন। কাজেই মহীপালের বিজয়ের সময় কর্ণ ও জাতবর্মণ উভয়েই জীবিত।[৫৭]

Belava তাম্রপত্রের আলোকে অনুমান করা সম্ভব যে ললিত চন্দ্রের স্বল্পকাল (?) রাজত্বের পরেই (কলিঙ্গ দেশজ বা পশ্চিমবঙ্গীয় হরি বর্মণের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের সিদ্ধিতলা গায়ের লোক। তার পিতামহ আদিদেব বঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন)[৫৮] উচপদস্থ কর্মচারী বজ্রবর্মণ বা তার পুত্র জাতবর্মণ চন্দ্র সিংহাসন দখল করেন। সম্ভবত ১০৭০ খ্রীস্টাব্দের পরেই বর্মণ অভ্যুত্থান ঘটে। জাতবর্মণ দিগ্বিজয়ী ছিলেন। "বৈনর পুত্র পৃথুর গৌরব মুছে দিয়ে, কর্ণের মেয়ে বীরশ্রীকে বিয়ে করে, অঙ্গগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, কামরূপের গর্ব খর্ব করে, দিব্যের বাহুবলকে লজ্জা দিয়ে গোবর্ধনের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়ে এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরকে ধনদান করে তিনি তার সার্বভৌমত্ব বিস্তার করেন।"[৫৯]

এই উক্তির মধ্যেকার কালকুচিরাজ কর্ণ ও কৈবর্তদিগের পরিচয় আমরা জানি। এই দিব্য দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে (১০৭০-৭৫) বিদ্রোহী হয়ে বরেন্দ্রে স্বাধীনভাবে কিছুকাল রাজত্ব করার সুযোগ পান। জাতবর্মণের পরে তার পুত্র হরিবর্মণ ও সামলবর্মণ রাজত্ব করেন। এদেরও রাজধানী বিক্রমপুরেই ছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বর্মণদের আদি নিবাস কলিঙ্গে, যেখান থেকে তারা রাঢ়ের সিংগুর অঞ্চলে বাস করতে থাকেন এবং বজ্রবর্মনের আমলে বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। হরিবর্মণের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টরাও রাঢ়বাসী এবং বঙ্গরাজ মন্ত্রী। বর্মণরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। সামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণই *Belava* তাম্রশাসনটি তার রাজত্বের পঞ্চম বছরে রাজধানী বিক্রমপুর থেকে প্রদান করেন। তিনি বারোশতকের প্রথমার্ধেই হয়তো রাজত্ব করেন। ভোজবর্মণের পর আমরা পাট্টিকের রাজ্যের তথা সমতট অঞ্চলের বিশেষ কোনো সংবাদ পাইনে। কেবল রণবঙ্কমল্ল হরিখেল দেবের (১২০৪-২১) তাম্রশাসনই (১২২১ খ্রী.) পাই। এ তাম্রপত্রে রণবঙ্কমল্ল পাট্টিকের-র বৌদ্ধবিহারে ভূমিদান করেছেন।[৬০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটি তাম্রশাসনের ৬১ প্রমাণে বঙ্গ-সমতটে এক দেববংশের রাজত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু হরিখেলদেবের সঙ্গে এ বংশের সম্পর্ক নির্ণয় করবার মতো তথ্য আজো হাতে আসেনি। পুরুষোত্তমদেব, মধুসূদন (মথন) দেব, বাসুদেব, দামোদরদেব, দশরথদেব—এ পাঁচজনের নাম তাম্রশাসন থেকে পাচ্ছি। সম্ভবত এঁরা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের আমলের পাট্টিকের সামন্ত কুসুমদেবের বংশধর। এবং লখনৌতিতে মুসলিম অধিকারের সুযোগে সমতট অঞ্চলে বর্মণদের পরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। হরিখেলদেব সম্ভবত পুরুষোত্তমের ভাই। তাঁর মৃত্যুর পর পুরুষোত্তমের পুত্র মধুসূদনই সিংহাসন লাভ করেন। দামোদরদেবের মেহের তাম্রলিপি তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে তৈরি। অতএব, তাঁর সিংহাসনারোহণ কাল হচ্ছে ১২৩০ খ্রীস্টাব্দ। এতে অনুমান করি মধুসূদন ও তাঁর পুত্র বাসুদেব দশবছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। 'অরি-রাজা চান্দর মাধব' দামোদরদেবের অধিকার যে চট্টগ্রাম অবধি বিস্তৃত ছিল তা তাঁর তাম্রশাসনেই প্রমাণ। দামোদরের পরবর্তী রাজা 'অরিরাজ দনুজমাধব' দশরথদেব (ওর্ফে দনুজ রায়) সেনদের বিক্রমপুরাদি অধিকারেও আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু দশরথদেবকে আমরা (১২৮৩ খ্রীস্টাব্দে) গিয়াসুদ্দীন বলবনের প্রতি (সন্ধিসূত্রে?) আনুগত্য প্রদর্শন করতে দেখি। তাম্রপত্র সূত্রে মনে হয় হয়তো এই বংশেরই গোকুলদেব, নারায়ণদেব, কেশবদেব ও ঈশানদেব সম্ভবত সিলেট অঞ্চলে আরো অনেকদিন স্বাধিকার বজায় রেখেছিলেন।[৬২]

অতএব এ আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাই :

ক. প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে কিংবা তাম্রপত্রে চট্টগ্রামের নামও মিলে না। *Strabo* ও *Periplus of the Erythrean sea* থেকে জানা যায় চট্টগ্রাম খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

খ. খ্রীস্টীয় চার-পাঁচ শতক অবধি আরাকান-চট্টগ্রাম একক অঞ্চলরূপে ছিল। এবং দশশতক অবধি আরাকানে চট্টগ্রামে মহাযান (সর্বাস্তিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী) মত চালু ছিল। তবে তখনো ব্রাহ্মণ্যবাদ ম্লান হয়নি, প্রবলই ছিল। আনোরহটার রাজত্বকালে পগাঁয় রাজকীয় সমর্থনে শিন অরহন গুরুবাদী মহাযান 'আরি' মত উচ্ছেদ করে হীনযানী থেরবাদ (গুরুবাদ) প্রবর্তন করেন। আনোরহটা (১০৪৪-৭৭) আরাকান ও চট্টগ্রামাদি অঞ্চল পট্টিকের-র সীমা অবধি জয় করে সেখানেও থেরবাদ চালু করেন।[৬৩]

গ. চট্টগ্রাম গোড়া থেকেই সম্ভবত আরাকানী শাসনে ছিল। আর নয়শতকের শেষপাদে ৮৭৭ অব্দের পূর্বে কোনো সময়ে সমগ্র সমতট আরাকানী শাসনভুক্ত ছিল। উক্ত সনে বৈশালীর (?) চন্দ্ররা আরাকানে ক্ষমতাচ্যুত হলেন আর পাট্টিকের অঞ্চলে সম্ভবত বৃক্ষচন্দ্রের বংশধর পূর্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয়রা গোটা সমতট বঙ্গ ও হরিখেলে রাজত্ব করতে থাকেন। ময়নামতীতে আরাকান রাজের মুদ্রা মিলেছে।[৬৪]

ঘ. সাত শতকে চট্টগ্রাম সমতটের খদড়্গরাজ বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইৎসিঙ ও শেঙচির পর্যটনকালে রাজা ছিলেন রাজভট্ট। এ সময়—হিউএন সাঙের মতে—সমতটরাজ্য উত্তরে পুরোনো নিম্নব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে পদ্মানদী। খদড়্গদের পরেই চন্দ্ররা রাজত্ব করেন।

ঙ. পাহাড়পুরে আট শতকের খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলের মুদ্রা মিলেছে। আরব বণিকেরা সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ-কামরূপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতেন এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

চ. বঙ্গীয়সূত্রে জানা যায়, নয়শতকের হরিখেল মণ্ডলের বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেব একবার চট্টগ্রামে অধিকার বিস্তার করেন। চট্টগ্রামের এক মন্দিরে তাঁর একটি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কান্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুরা। ফরিদপুর খুলনা প্রভৃতি উপকূলাঞ্চলই সম্ভবত হরিখেল মণ্ডল। এখান থেকেই সমুদ্রপথে হয়তো কান্দিদেব স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রামের অধিকার পান এবং তাম্রপত্র সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বিতাড়িত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. চন্দ্ররাজ শ্রীচন্দ্রের আমলে বৈশালীরাজ চূড়চন্দ্রসিংহ (৯৫১-৫৭) চট্টগ্রাম জয় করতে এসে 'চিৎ-তৎ-গঙ' (যুদ্ধ করা অন্যায়) —এই আপ্তবাণী স্তম্ভে উৎকীর্ণ করে ফিরে যান। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা থুরতন < সুরচন্দ্র (?) তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এমনও হতে পারে যে আনন্দচন্দ্রের পরবর্তী 'সুরচন্দ্র' বাচীর কোনো লোক চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে সুলতান চট্টগ্রামের আরব বণিক শাসক। আবার ত্রিপুরা রাজ্যকেও 'থুরতন' বলা হত।

জ. চূড়চন্দ্র সিংহের চট্টগ্রাম বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সম্ভবত চন্দ্র-সামন্তরাই চট্টগ্রাম শাসন করতে থাকেন এবং জাতবর্মণ আধিপত্য বিস্তার করেন। কেননা, পগাঁরাজ অনোরহ্টা (১০৪৪-৭৭) ১০৫৯ সনে বা তার কিছু পরে উত্তর-আরাকান জয় করেন। অনোরহ্টার রাজ্যের উত্তর পূর্বসীমা ছিল পট্টিকের। পট্টিকের 'অঞ্চল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। চট্টগ্রামে অনোরহ্টা নিজেই সম্ভবত এসেছিলেন। (He visited the Indian land of Bengal, perhaps Chittagong and planted magical images of men there) চট্টগ্রাম অনোরহ্টা বংশীয়ের দখলে অনেককাল ছিল। একারণেই সীমান্তের পট্টিকের রাজপরিবারের সঙ্গে পগাঁরাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। পট্টিকের-র এক রাজকুমার পগাঁরাজ *Kyanzittha* -র (১০৮৪-১১১২) কন্যা *Shewe einthi* প্রেমে পড়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের কুমারের সঙ্গে একমাত্র সন্তান Shewe-র বিয়ে হলে রাজ্যের অধিকার ভিনদেশী জামাতার হাতে চলে যাবে—এ বিবেচনায় তাকে বিমুখ করা হলে রাজপুত্র আত্মহত্যা করে। আর এই রাজকন্যারই সন্তান রাজা *Alaungsithu* (১১১২—৬৭) পট্টিকের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। সে কন্যার সৎপুত্র নরথু কর্তৃক হত্যাকাহিনী বর্মা ও আরাকানে ভিন্নভাবে চালু আছে বর্মারাজ ইতিবৃত্তে ও সাহিত্যে এ কাহিনী বিবৃত রয়েছে। *Alaungsithu* -র বংশধর নরসিংহপতি (১২৫৪ -৮৭) ১২৭৭ সনে কুবলাই খানের বাহিনীর সঙ্গে Ngasaunggyan -এ যুদ্ধ করেন। মার্কোপলো বলেছেন Mien -এর রাজার সঙ্গে বাঙলার রাজাও যোগ দিয়েছিলেন এই যুদ্ধে।[৬৫] Hall প্রভৃতি সবাই *Marco Polo* -র এ স্থলে বাঙলার উল্লেখ করা ভুল হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় *Marco Polo* স্বয়ং কুবলাই খাঁর দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি বাঙলার যে-পরিচয় দিয়েছেন তাতে অজ্ঞতার ছাপ নেই। কাজেই এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নির্দেশে তাঁর ভুল হওয়ার কথা নয়। সম্ভবত চট্টগ্রামের সামন্তশাসক তখনো পগাঁরাজের অনুগত এবং এ যুদ্ধে সহায়তা করতে বাধ্য ছিলেন। ১২৮৩ সনে দ্বিতীয় মোঙ্গল আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়ে, তার ফলে উত্তর আরাকান (এবং এ সঙ্গে চট্টগ্রামও) স্বাধীন হয়ে যায়। এ সময় পগাঁরাজ্যে মুসলিম প্রভাবও লক্ষণীয়। ঝড়ে বাণিজ্যতরী ভঙ্গ হলে *Byatta* নামে এক আরব বণিক বা নাবিকও এ সময় পগাঁয় বাস করতে থাকেন। এঁর এবং *Raman kan* (*Rahman Khan*) এর দরবারে প্রতিপত্তি ছিল, এ ছাড়া সৈন্যদলে অনেক মুসলিম ও ভারতীয় থাকতো[৬৬]

ঝ. এগারো-বারো শতকে চট্টগ্রাম সম্ভবত পগাঁসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তেরোশতকের প্রথমার্ধে মধুসূদনদেব, বিশেষ করে দামোদরদেবের (১২৪৩) শাসনে ছিল—দামোদরদেবের তাম্রশাসনই তার প্রমাণ। এর পরেও হয়তো পগাঁরাজ চট্টগ্রাম শাসকের আনুগত্য পেতেন, নইলে ১২৭৭ সনে তাকে কুবলাই খানের সঙ্গে যুদ্ধে পগাঁরাজের সহায়করূপে পেতাম না।

ঞ. রাজমালা সূত্রে জানা যায়, ত্রিপুরারাজ ছেঙথুমফা-ই প্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। এ দশশতকের কথা, কিন্তু তার অধিকার স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য রত্নফা ও তাঁর পিতা বা ভ্রাতার আমলে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা শাসনে ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। পগাঁর বিপর্যয়ের সুযোগে আরাকান -রাজ *Mihnti* প্রবল হয়ে ওঠেন। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন এবং সোনার গাঁয়ের সেন রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে করদান করতেন। মার্কোপলো এবং ১৩১৩ সনে স্যার জন হার্বার্ট চট্টগ্রাম পর্যটন করেন। হার্বার্ট চট্টগ্রামকে সমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরীরূপে দেখেছেন। Mihnti বা মেঙদির আমলে উত্তর বঙ্গের চাকমা রাজধানী মাইচাগির (১৩৩৩-৩৪) আরাকান অধিকারে আসে। যুদ্ধে কাঁইচার ত্রিশ হাজার বাঙালি মজুর হিসেবে যোগদান করে।[৬৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগ : প্রাক-মুঘল আমল

(তেরো শতক থেকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি)

ত্রিপুররাজ ছেঙথুম ফা সম্ভবত ১২৪০-৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রাজত্ব করতেন। তার আমলেই পার্বত্য ভোটচীনা তিপরা জাতি চট্টগ্রাম জয়[৬৮] করে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। সম্ভবত ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বে দামোদর দেব বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে কিংবা আরাকান অথবা ত্রিপুরার[৬৯] সামন্ত হিসাবে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। মনে হয়, তাদের কারো হাত থেকে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ চট্টগ্রামের অধিকার ছিনিয়ে নেন (১৩৩৮-৩৯ খ্রী.) চট্টগ্রামের কিংবদন্তিতে এবং শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায় এর সমর্থন আছে। আমাদের ধারণায় ইবন বতুতাও (১৩৪৬ খ্রী.) সদকাউন (Sadkawan) নামে ফখরুদ্দীনের আমলের এই চট্টগ্রামকেই নির্দেশ করেছেন।[৭০] কবি মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন'-এর ভূমিকা ভাগ থেকে জানা যায় ফখরুদ্দীনের আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন কদর বা কদল খান গাজী। তাঁর নামে একটি গ্রাম আজো কদলপুর বলে পরিচিত। এই কদর খানের আমলেই পীর বদরুদ্দীন আলাম ও কবির পূর্বপুরুষ মাহিআসোয়ার আরব বণিক হাজী খলিলের সঙ্গে চট্টগ্রামে উপনীত হন। ফখরুদ্দীন 'শায়দা' নামের এক দরবেশকে চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এ ভণ্ড সাধু ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে নিহত হয়। কবি মুহম্মদ খান গৌড় সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) চট্টগ্রামস্থ কর্মচারী বা প্রতিনিধি রাস্তি খানের বংশধর। তিনি তার পূর্বপুরুষের তালিকা দিয়েছেন :

মাহি আসোয়ার
↓
হাতিম
↓
সিদ্দিক
↓
রাস্তিখান
↓
পরাগলী ও ছুটি খানী মহাভারত সূত্রে
↓

পরাগল খান → ছুটি খান

মীনা খান
↓
গাভুর খান
↓
হামজা খান
↓
নসরত খান
↓
জালাল খান
↓

বিরহিম খান (ইব্রাহিম)

মুবারিজ খান
↓
কবি মুহম্মদ খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বদর আলাম, সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, কদর খান, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ এবং ইবন বতুতা (১৩৪৬ খ্রী.) চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রায় সমসাময়িক। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে আরাকান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি উপকূল-লগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলের বদরমোকামগুলো স্থানীয় জনগণের উপর পীরবদরের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। চট্টগ্রামের ধর্মীয় ইতিহাসে বদরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।[৭২]

সম্ভবত বিহারের পীর বদরউদ্দীন বদরই আলাম (মৃত্যু ১৩৪০ খ্রী. বর্ধমানের কালনায় যাঁর নকল সমাধি রয়েছে) আর চট্টগ্রামের পীর বদর অভিন্ন ব্যক্তি।[৭৩] কিন্তু অন্য অনেকের মতে ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে বদর আলামের মৃত্যু হয়।[৭৪] ইতিহাস ও 'মুক্তল হোসেন' কাব্য সূত্রে জানা যায় রাস্তি খানের বংশধরগণ ইব্রাহিম ওর্ফে বিরহিম অবধি (ইনিও উজির ছিলেন) গৌড় আরাকান ও ত্রিপুরা রাজার অধীনে (চট্টগ্রাম যখন যে রাজ্যভুক্ত থাকত) চট্টগ্রামের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাস্তি খান স্বয়ং রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) কর্মচারী ছিলেন।[৭৫]

পরাগল খান ও ছুটিখান ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩ -১৫১৯ খ্রী.) ও নুসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রী.) আমলে ফেনী নদী ও রামগড় মধ্যবর্তী সীমান্ত রক্ষী সেনানী বা লস্‌কর। হামজা খান, নসরত খান ও জালাল খান গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের অধীনে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।[৭৬]

শিহাবুদ্দীন তালিস ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে মুঘলবিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম বিজয় ও চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা নির্মাণের কথা বলেছেন। তালিস স্বচক্ষে সে রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখেছেন।[৭৭] এখনো ফখরুদ্দীনের নামের ফখরুদ্দীনের পথ (ফঅরদ্দীনের অদ) নিশ্চিহ্ন হয়নি। এ রাস্তাও লালমাই অঞ্চল দিয়ে প্রসারিত ছিল।

সেনানী কদর খানের সৈনাপত্যে চট্টগ্রাম বিজয়ও স্বীকার করা চলে।[৭৮] (ইনি মালিক পিণ্ডার খান খালজী ওর্ফে কদর খান নন। তিনি নিহত হওয়ার আগে যে কয়মাস সোনারগাঁয়ে ছিলেন, সে সময় বর্ষাকাল ছিল। কাজেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করেননি।)

সম্ভবত ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম গৌড় শাসনে ছিল। পনেরো শতকের গোড়া থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি যে চট্টগ্রাম গৌড়-সুলতানদের অধিকারভুক্ত ছিল তার প্রমাণ বহু :

ক. চীনা দূতের ইতিবৃত্ত ১৪০৯, ১৪১২, ১৪১৫ ।[৭৯]

খ. আরাকানরাজ নরমিখলের বা মঙ সাউ মঙের গৌড় দরবারে আশ্রয় গ্রহণ (১৪০৪-৩৩ খ্রী.)

গ. চট্টগ্রামে তৈরি দনুজমর্দনদেব গণেশ (১৪১৭), মহেন্দ্র (১৩১৮) ও জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহর (১৪১৫-১৬,১৪১৮-৩১) প্রাপ্ত মুদ্রাই তার সাক্ষ্য।[৮০] চীনা দূতেরা চট্টগ্রাম হয়েই গৌড়ে গিয়েছিলেন।

আবার চৌদ্দ শতকের রাজনৈতিক খবরও একেবারে বিরল নয়। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দের দিকে ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ চট্টগ্রাম সমেত[৮১] পূর্ববাঙলার অধিকার লাভ করেন। এর পরে সিকান্দর শাহ (১৩৫৯-৮৯খ্রী.) ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী.) পনেরো শতকের প্রথম দশক অবধি রাজত্ব করেন। আযম শাহর আমলেই আরাকানরাজ নরমিখলে বা মঙ সাউ মঙ গৌড়ে আশ্রিত হন (১৪০৪ খ্রী.) এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১ খ্রী.) ১৪৩০ খ্রীস্টাব্দে তাকে আরাকান সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আরাকানী বিদ্বানদের মতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহই (১৪৩৩-৫৯) মঙ সাউ মঙকে সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছিলেন (বর্মা রিচার্স সোসাইটিস এ্যানিবারসারি ভলিউম ১৯৬০)। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) যে চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন তা কেবল মঙ সাউ মঙের আশ্রয় গ্রহণ থেকেই নয়, বিহারের দরবেশ মুজাফফর শামস বলখী হজ যাত্রার সময় চট্টগ্রাম থেকে তার কাছে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তা হতেও জানা যায়।[৮২] গিয়াসুদ্দিন চীনদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীনা সূত্রেও ধারণা হয় যে চট্টগ্রাম আযম শাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধীনে ছিল। তার পর সইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, গণেশ, মহেন্দ্র, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শামসুদ্দীন আহমদ শাহ এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯) প্রভৃতি সুলতানের আমলেও চট্টগাম গৌড়রাজ্যভুক্ত ছিল। মঙ সাউ মঙের সিংহাসনে আরোহণ (১৪৩০) থেকে আরাকানে মুসলমানদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রবল হয়। রাজার মুসলিম নাম, মুদ্রায় কলেমা ও আরবি হরফ তার প্রমাণ। ইলিয়াস শাহ বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে মঙ সাউ মঙের ভাই মঙ খ্রী ওর্ফে আলি খান (১৪৩৪-৫৯) রামুর কিছু অংশ অধিকার করেন।[৮৩] এবং সে সূত্রে আরাকানরাজ গৌড়সুলতানের প্রভাবমুক্ত হন। রামুর যে-অংশ আরাকানরাজের অধীনে গেল সে-অংশ রাজারকুল আর যে-অংশ চাকমা সামন্তের(?) অধিকারে রইল তা চাকমারকুল নামে আজো পরিচিত। মাহমুদ শাহর রাজত্বের শেষ বছরেই (১৪৫৯ খ্রী.) চট্টগ্রাম গৌড় সুলতানের হস্তচ্যুত হয়। মঙ খ্রী-পুত্র বসউ পিউ কলিমা শাহ (১৪৫৯-৮২) ১৪৫৯ সনে উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন।[৮৪] কিন্তু তার অধিকার দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। তাই রাস্তিখানের উৎকীর্ণ মসজিদ লিপিতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রী.) মাহমুদ শাহর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহকে চট্টগ্রামের অধিপতি দেখি।[৮৫] এর পরে এক সময় চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারভুক্ত হয়।

চট্টগ্রামের নিযামপুর ও ফেনী অঞ্চলে শাহজাদা খান্দানী সংক্ষেপে শাহজাদখানী বলে এক সম্ভ্রান্ত বংশের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত শ্রুতি-স্মৃতি থেকে জানা যায়, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে মাতুল কিংবা পিতৃব্য কর্তৃক সিংহাসনে বঞ্চিত হয়ে এক শাহজাদা গৌড়ে এসে মাহমুদ শাহর কন্যা বিয়ে করে চট্টগ্রামের আধুনিক নিযামপুর অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করেন। এক দরবেশ তাকে বলেছিলেন তার হাতী যেখানে লুটিয়ে পড়বে সেখানেই যেন তিনি বসতি করেন। এখানেই হাতী লুটে পড়েছিল বলে স্থানটির নাম হাতী লুটাগাঁ এবং শাহজাদার নাম মাহমুদ ছিল বলে অঞ্চলটি মাহমুদাবাদ নামে অভিহিত হয়। এটিই কি মাহমুদ শাহ কিংবা রুকনউদ্দীন বারবকের টাকাশাল অঞ্চল মাহমুদাবাদ! অবশ্য যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলও মাহমুদাবাদ্য নামে পরিচিত ছিল (হিসটরী অব বেঙ্গল ঢাকা ইউনিভারসিটি ভলিয়ম ২য় পৃ : ১৮৯)। এই শাহজাদার সঙ্গে সাতটি খান্দানী পরিবার আর এদেরই কারো জামাতারূপে বিবাহ-সূত্রে একটি অর্ধ অভিজাত পরিবার এই সাড়ে সাত ঘর আলোচ্য অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করে বলেও লোকশ্রুতি আছে। এদের একজন উসমান কাজি। এঁদের বংশধরগণ নিযামপুর ও ফেনীর আমিরাবাদ পরগনার বিভিন্ন গায়ে ছড়িয়ে আজো বাস করে। এই শাহজাদা বংশীয় শেখ মুহম্মদ ভুঁইয়া শমসের গাজীর মিত্র ছিলেন। তার কথা শেখ মনোহরের 'শমসের গাজীনামা'য় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮৬] এইকিংবদন্তি সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর জামাতা খিজির খান—তুর্কী সংপৃক্ত অথবা শের শাহর ভাগিনেয় মুবারিজ খান ওর্ফে সুলতান মুহম্মদ শাহ আদিল কর্তৃক ইসলাম শাহ সুরের পুত্র ফিরোজসুরের হত্যাকাহিনীর সঙ্গে জড়িত।[৮৭] এই ফিরোজ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর পুত্রও হতে পারেন। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে পরাগল খান-বংশীয়রাও উক্ত সাড়ে সাত ঘরের একঘর এবং তাঁরা নিজেদের এক উজির জুজার খানের বংশধর বলে দাবী করেন, যদিও পরাগলী মহাভারত সূত্রে আমরা পরাগল খাকে রুদ্র-বংশীয় তথা স্থানীয় দীক্ষিত মুসলিম বংশজ বলে জানি। অবশ্য কবি-প্রযুক্ত 'রুদ্র' অর্থে যোদ্ধা বা বীর ধরলে রাস্তি খান পরাগল খানকে তুর্কী বা আফগান বংশীয় বলেই মানা যাবে।

দ্বিজ ভবানী নাথের রামাভিষেক বা লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় কাব্য ষোলো শতকের প্রথম দশকে জয়ছন্দ বা জয়চান্দ রাজার আগ্রহে রচিত। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে জয় ছন্দ ১৪৮২-১৫২৩ অবধি কর্ণফুলী ও শঙ্খনদ মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আরাকান সামন্ত।[৮৮] এ তথ্য নির্ভুল হলে বুঝতে হবে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহর (১৪৭৬-৮২) সময়ে বা তাঁর পরে চট্টগ্রাম গৌড়-সুলতানের হস্তচ্যুত হয়।

অতএব শামসুদ্দীন ইউসুফ কিংবা জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর আমলে চট্টগ্রামে আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম আরাকান শাসনে থাকে।[৮৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের উক্তিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে বলতে হবে চট্টগ্রাম ফতেহ্ শাহর শাসনাধীনে ছিল না। বিজয় গুপ্ত প্রস্তাবনায় বলেছেন—'মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্ সীম। পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর। মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।' ফতেহ্ শাহ্ হোসাইনীর আমলে ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান শাহজাদা ওর্ফে খোজা সেরা, সইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ কিংবা শামসুদ্দীন মুজফফর শাহ্র রাজত্বকালে চট্টগ্রাম আরাকানরাজার শাসনে ছিল। তারপর ১৫১২ সনে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রামের উত্তরাংশ কর্ণফুলী নদী অবধি ছিনিয়ে নেন। এই সময় গৌড়-সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ আলফা হোসাইনী বা আলফা খান নামের এক বণিকের সহায়তায় চট্টগ্রাম দখল করলেন।[৯০] এরূপে ধন্য মাণিক্যের সঙ্গে হোসেন শাহর বিবাদ উপস্থিত হল। ধন্যমাণিক্য আবার সৈন্য পাঠিয়ে ১৫১৩ সনে হোসেন শাহর বাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রামে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুদ্রা তৈর করান :

তারপরে শ্রীধন্য মাণিক্য নৃপবর :
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর।
চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল
শ্রীধন্য মাণিক্য তাকে দূর করি দিল।

অথবা: চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা। মারণে কাটনে ভঙ্গ দিন গৌড় সেনা।[৯১]

হোসেন শাহ্ প্রতিশোধ নেবার জন্যে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করলেন তাঁর সেনাপতি হৈতন খান (হায়াতুন্নবী) ও গৌড়মল্লিক (গৌর মহল্লিক) ধন্যমাণিক্যের হাতে পরাজিত হন বটে, কিন্তু তার আগেই তিনি মেহেরকুলাদি অঞ্চল দখল করে মোয়াজ্জমাবাদ শিকভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে এ বিবাদের সুযোগে আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেছিলেন। গৌড় মল্লিককে পরাজিত করে ধন্যমাণিক্যের সাহস বেড়ে গিয়েছিল, তিনি নারায়ণ ও চয়চাগের নেতৃত্বে বিপুল বাহিনী নিযুক্ত করলেন। ধন্যমাণিক্য নিজেও এদের সহগামী ছিলেন। (শ্রীধন্যমাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে—রাজমালা)। নারায়ণ রামু অবধি জয় করে 'রোসাঙ্গ-মর্দন' খেতাব লাভ করেন। কিন্তু সম্ভবত কয়েক মাসের মধ্যেই আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুরাধিকার করেছিলেন। আরাকানীদের হাত থেকেই নুসরৎ খান পরাগল খানাদির সহায়তায় উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন। আরাকানরাজ কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদের মধ্যবর্তী চক্রশালায় ঘাঁটি করে গৌড়- সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে সম্ভবত ১৫২৫ সন অবধি দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারের আভাস আছে কবি শাহ্ বারিদ খানের একটি পদবন্ধে।[৯২] নুসরৎ খান পরবর্তী কোনো অভিযানে শঙ্খনদ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামও দখল করেন। দ্য বারোজের বর্ণনায় প্রকাশ— Joao de Silviera ১৫১৭ সনে চট্টগ্রাম বন্দরকে গৌড়-সুলতানের দখলে এবং আরাকানরাজকে গৌড়-সুলতানের সামন্ত বলে জেনেছিলেন।[৯৩] আরাকানরাজ মঙইয়াজা বা মঙ রাজা (১৫০১-২৩) এ বিপর্যয়েও আশা ছাড়লেন না। তিনি সেনাপতি ছেন্দুইজা, মন্ত্রী ছাঙ্গেগ্রী ও রাজকুমার ইরে মঙের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুনরাধিকারের জন্যে ১৫১৭ সনে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন পরাজিত হয়ে চক্রশালার মুসলিম সেনানীশাসক মুরাসিন বা মীর ইয়াসীন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে (সম্ভবত চাঁদপুর হয়ে সোনারগাঁয়ে) আশ্রয় নেন। (রাজোয়াং-রাজবংশ ৯৪)। এরূপে চক্রশালা আরাকান অধিকারে চলে গেল। আরাকানরাজের এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জয় করে লক্ষ্মীপুরে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে এবং ১৫১৭-১৮ সনে আরাকানরাজ ঢাকা ভ্রমণ করেন।[৯৫] কিন্তু আরাকানের এই দিগ্বিজয় স্থায়ী হয়নি। উত্তর চট্টগ্রামেও আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না এ যুদ্ধে। তবু কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর অবধি গোটা অঞ্চল আরাকান শাসনে রয়ে গেল। ১৫২২ সনে ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন।[৯৬] এর ফলে উত্তর চট্টগ্রামবাসী মঘেরা আরাকানে পালিয়ে যায় বলেকিংবদন্তি আছে। একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঘধাওনী বা মঘ পলায়নী বলে।[৯৭] এ অভিযানে ত্রিপুরার সেনাপতি ছিলেন রায় চাগ। সম্ভবত তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামও আক্রমণ করেন (রাজমালা)। দেবমাণিক্যও চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন নি। এদিকে আরাকান সিংহাসনের তখন নিরাপত্তা ছিল না। গজপতি (১৫২৩-২৫) মঙ সাউ (১৫২৫), থাতোসা (১৫২৫-৩১) প্রভৃতি জ্ঞাতিরা আট বছরের সময় পরিসরে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন।[৯৮] এই দুর্বলতার সুযোগে নুসরৎ শাহ ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ১৫৫৩ সন অবধি গৌড়-সুলতানের শাসনাধীন ছিল।[৯৯]

হোসেন শাহ কিংবা নুসরৎ শাহ নাকি বিজিত চট্টগ্রামের নাম ফতেয়াবাদ রেখে ছিলেন।[১০০] কিন্তু ফতেয়াবাদ নামের কোনো উল্লেখ কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে নেই। তবে ষোলোশতকে চট্টগ্রাম শহর তথা রাজধানী যে ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল, তা দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী মজনু* কাব্যে পষ্ট উল্লেখ আছে এবং রাজধানীর নামানুসারে পুরো অঞ্চলটিও ফতেয়াবাদ রূপে পরিচিত ছিল হয়তো। এখনকার চট্টগ্রাম শহরের সাত মাইল দূরে ফতেয়াবাদ গ্রাম আছে। এখানে পুরোনো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান।

ষোলোশতকের মাঝামাঝি কোনো এক নিযাম উত্তর- চট্টগ্রামে জাফরাবাদ গাঁয়ে প্রতাপশালী জমিদার বা আরাকানরাজের সামন্ত ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে দৌলত উজিরের উক্তি থেকে :

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পূর এ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নিযাম শাহা শূর
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর।

'ধবল অরুণ গজেশ্বর' আরাকানরাজ চট্টগ্রামের সার্বভৌম রাজা, এবং তার অধীনে নিযাম শাহ প্রশাসক—এই অর্থই সঙ্গত। কেননা নৃপতি, শাহ ধবল অরুণ গজেশ্বর প্রভৃতি স্তোক-জ্ঞাপক শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত। ফাজিল নাসির, কবি চুহর, এতিম কাসেম, তমিজী, লোকমান প্রভৃতি কবি উচ্চবিত্তের সাধারণ লোককেও তোয়াজের ভাষায় নৃপতি, সুলতান, অধিপতি বলে অভিহিত করেছেন। কবি মুহম্মদ খানও তার পূর্বপুরুষগণকে স্বাধীন নৃপতিরূপেই বর্ণনা করেছেন।[১০১] নিযামের নামের পরগনা নিযামপুর এখনো বর্তমান। বাহারিস্তান গায়েবীতেও নিযামপুর পরগনার জমিদারের উল্লেখ আছে।[১০২]

এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানরাজ মঙ বেঙের (যৌবক শাহ ১৫৩১-৫৩) আমলে ত্রিপুরার সৈন্যেরা পার্বত্য পথে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারে ঘন ঘন হানা দিয়ে লুটপাট করত। ১৫৫৩ সনে কয়েক মাসের জন্যে উত্তর চট্টগ্রামও মঙ বেঙের দখলে ছিল, তা চট্টগ্রামে তৈরি তাঁর নামাঙ্কিত প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে প্রমাণিত।[১০৩] আবার গৌড়ের সুর-বংশীয় সুলতান শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজীরও উক্ত সনে চট্টগ্রামে তৈরি মুদ্রা মিলেছে। অতএব ১৫৫৩-৫৪ সনে চট্টগ্রামে কিছুকাল আরাকানী আর কিছুকাল গৌড় শাসন ছিল।

গৌড় ও পর্তুগীজ সূত্রে জানা যায়, ১৫৩৯-৪০ সনে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি খুদাবখশ খান ও হামজা খানের (আমীরজা খান) বিবাদের সুযোগে নোগাজিল (নওয়াজিস, নিযাম, খিজির?) শেরশাহর হয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন।[১০৪] অতএব ১৫৫৩ সনে মঙ বেঙই সম্ভবত উত্তর চট্টগ্রামে হানা দিয়ে তা কিছুকাল দখলে রাখেন।

আরাকান রাজ মঙ বেঙের সময়েই দক্ষিণ চট্টগ্রামে মঘী কানি ও দ্রোনে জমির পরিমাপ পদ্ধতি এবং মঘী সন চালু হয়। মঘী সন বাঙলা সন থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরে কম।

মুহম্মদ খানসুর ওর্ফে শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান গাজী চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে আরাকান আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্ভবত আরাকান বেশিদিন তার দখলে থাকেনি।[১০৫] যদিও আরাকানে তৈরি তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদ্রা (৯৬২ হিজরি ১৫৫৩-৪ খ্রী.) মিলেছে।[১০৬] ১৫৫৬ সনে ত্রিপুরারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫২৮-২৯—১৫৭০ খ্রী.) চট্টগ্রাম অবরোধ করেন:

আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে। (রাজমালা)

এই সময় বিজয় মাণিক্যের পাঠান সৈন্যেরা বিদ্রোহ করলে, তাদের হত্যা করা হয়। গৌড়ের পাঠান সুলতান এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার শ্যালক মুবারকের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বাহিনী প্রেরণ করেন :

এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠান শুনিল।
ক্রোধে গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য দিল রণে
মমারক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল। (রাজমালা)

কিন্তু সম্ভবত পুনরাক্রমণে মুবারক পরাজিত ও ধৃত হয়ে কালী কিংবা চতুর্দশ দেবতার বেদীমূলে বলিরূপে প্রাণ হারান।[১০৭] বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি জয় করে তথায় স্নান করেন। এই ঘটনার স্মারক-মুদ্রা মিলেছে : 'শ্রী শ্রী লক্ষ্যাস্নায়ী বিজয় মাণিক্য দেব] (১৪৮১ শক ১৫৫৯ খ্রী.)[১০৮] মুবারক সম্ভবত মুহম্মদ শাহ গাজীরই শ্যালক। মনে হয়, ১৫৭০ সন অবধি চট্টগ্রাম বিজয়মাণিক্যের শাসনে ছিল। উক্ত সনে সম্ভবত সোলেমান কররানী চট্টগ্রাম জয় করেন।[১০৯]

অতএব উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি তথ্য পাচ্ছি :

ক. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬—৮২ বা জালালুদ্দীন ফতেহ শাহর (হোসাইনী) আমলে কিংবা তাদের পরের কার গৌড়-সুলতান খোজা সেন্য, সইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ অথবা শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ—এ কয়জনের যে-কোনো কারো সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-শাসনভুক্ত হয়। শাহ বারিদ খানের 'প্রেমবন্ধ' ও দ্বিজ বা পণ্ডিত ভবানীনাথের লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় এ ধারণার পরিপূরক।[১১০]

খ. হোসেন শাহ ১৫১২ সনে উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন। ধন্যমাণিক্য ১৫১৩ সনের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন:

চৌদ্দশ পাঁচতিস শকে নিজ বাহুবলে
চাটি গ্রাম বিজই বলি মোহর মারিল

(রাজমালা, সাহিত্য পরিষৎ পুথি)

এই বিজয়ের স্মারক চট্টগ্রামজয়ী স্বর্ণমুদ্রা মিলেছে।[১১১] কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই ধন্যমাণিক্য সে অধিকার হারান। ১৫১৩ সনের শেষের দিকে হোসেন শাহর সৈন্য চট্টগ্রাম দখল করে। এতে হোসেন শাহর সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের বিবাদ বাধে। গৌরমল্লিক, হৈতন খান ও হোসেন শাহর নেতৃত্বে তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম দুই যুদ্ধে হোসেন শাহর পরাজয় ঘটে। তৃতীয় যুদ্ধে হোসেন শাহ ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি অবধি হানা দিলেন এবং মেহেরকুল অবধি অঞ্চল মোয়াজ্জমাবাদ পরগনাভুক্ত করে খাওয়াজ খানকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[১১২]

গ. হোসেন শাহর সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে জয়ী হয়েই ধন্যমাণিক্য পুনরায় নারায়ণ, রায় কছম ও রায় কচাগের (রায় চাগ) নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন-চৌদ্দশ ছত্রিশ শকে চাটিগ্রাম গেল ১৫১৪-১৫ খ্রী.) এবার গৌড়-সুলতানের উত্তর চট্টগ্রাম এবং আরাকানরাজের দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকার করে ত্রিপুরা সৈন্যেরা আরাকানেও হানা দেয়। নারায়ণ এই কৃতিত্বের জন্যে 'রোসাঙ্গ-মর্দন' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু হোসেন শাহর পুত্র নুসরৎ খান অচিরে শঙ্খনদ অবধি পুনরুদ্ধার করেছিলেন (১৫১৭ সনের গোড়ার দিকে)। দ্য সিলবেরিয়া তাই ১৫১৭ সনে চট্টগ্রামকে গৌড়-সুলতানের অধিকারে এবং আরাকানরাজকে তার সামন্ত বলে জেনেছিলেন।

ঘ. শ্রীকর নন্দীর উক্তিতে প্রকাশ—ছুটি খান ত্রিপুরাগড় অবধি জয় করে সেখানে সন্নিধান করেছিলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ। (ছুটিখানী মহাভারত)

তাহলে আরো একবার ত্রিপুরা বিজিত হয়। আরাকানরাজ মঙরাজা বিপুল বাহিনী পাঠিয়ে সম্ভবত ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর চট্টগ্রাম নুসরৎ খানের হাত থেকে কেড়ে নেন। এবং সন্দ্বীপ, হাতিয়া, যুগদিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জয় করেন। এদিকে দেবমাণিক্য ১৫২২ সনে চট্টগ্রাম দখল করেন। কিন্তু রাখতে পারেন নি। সম্ভবত ১৫২৫ সনের দিকে নুসরৎ শাহ্ আরাকানের ঘরোয়া বিবাদ ও শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেন। এবং খুদাবখশ খানকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক নিযুক্ত করেন, চকরিয়া ছিল তার শাসনকেন্দ্র। এরপর তা গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহর রাজত্বকাল অবধি (১৫৩৮ খ্রী.) স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু রামু প্রভৃতি দক্ষিণ চট্টগ্রামের অবশিষ্টাংশ তখনো আরাকান অধিকারে যে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে চান্দিলা রাজার মন্দিরলিপিতে (১৫৪২ খ্রী.)[১১৩]

ঙ. গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলের চট্টগ্রামস্থ শাসক খুদাবখ্শ খান ও হামজা খানের (আমীরজা খান) বিবাদের সুযোগ নিয়ে শেরশাহর পক্ষে নোগাজিল চট্টগ্রাম দখল করে নেন। কাজেই ১৫৩৮-এর পরে চট্টগ্রাম ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি শেরশাহ্ বংশীয়দের হাতে ছিল। তাই দ্য বারোজ চট্টগ্রামকে বাঙলা রাজ্যের ঋদ্ধ বন্দররূপে দেখেছিলেন। ১৫৫৩ সনে মঙ বেঙ সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম দখল করে চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রা বের করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিজয়মাণিক্য মঙবেঙ থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন।[১১৪] পর বৎসর ১৫৫৪ সনে গৌড়-সুলতান মুহম্মদ খান সুর ওরফে শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ গাজী বিজয়মাণিক্য থেকে উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার কেড়ে নিলেন এবং আরাকান অবরোধ কিংবা অধিকার করে সেখান থেকে মুদ্রা বের করেন (১৫৫৪ খ্রী.) রাজমালার সাক্ষ্যেও প্রমাণ বিজয়মাণিক্য থেকেই পাঠানেরা চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নিয়েছিল।

চ. কিন্তু বিজয়মাণিক্যও দাবী ছাড়েননি। ১৫৫৪-৫৫ সনে কালানাজিরের নেতৃত্বে বিপুল বাহিনী চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়, আট মাসেও জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না। অবশেষে গোপনে সুড়ঙ্গ খনন করে সেই সুড়ঙ্গপথে ত্রিপুরার সৈন্যরা চট্টগ্রামের পাঠান দুর্গে প্রবিষ্ট হয়ে পাঠান-সৈন্যদের অতর্কিতে পর্যুদস্ত করে এবং মুবারককে বন্দী করে নিয়ে চন্তাইয়ের পরামর্শে চতুর্দশ দেবতার কাছে বলি দেয়। ত্রিপুরার এ বিজয় সম্ভবত ১৫৫৬ সনে ঘটেছিল। তখন থেকে ১৫৭৩ সন অবধি চট্টগ্রাম ত্রিপুরার দখলে ছিল।[১১৫] চট্টগ্রাম জয় করে বিজয়মাণিক্য লক্ষ্যা নদী অবধি পূর্ববঙ্গও জয় করেন। (মুদ্রা : ১৪৮১ শক, ১৫৫৯ খ্রী.)। শ্রী শ্রী লক্ষ্যাস্নায়ী বিজয়মাণিক্য দেব: চাটিগ্রাম জয়ী।[১১৬] বিজয় মাণিক্যের এই সুযোগ জুটেছিল মুহম্মদ শাহ গাজী ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর (খিজির খান) মুহম্মদ শাহ আদিল ও তাঁর সুবাদার শাহবাজ খানের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন বলেই (১৫৫৫-৫৭)।[১১৭]

ছ. ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর অনন্ত মাণিক্য সম্ভবত দেড় বছর রাজত্ব করেন (১৫৭১-৭২)। তাকে নিহত করে সেনাপতি উদয় মাণিক্য সিংহাসনে বসেন (১৫৭২)। 'চৌদ্দশ চুরানব্বই শকে উদয় রাজন।' (রাজমালা ২য় খণ্ড পৃ. ৬৯)। এ সময় সোলেমান কররানীরও মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র বায়াজিদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। কাজেই দাউদ খান কররানীই (১৫৭৩-৭৬) ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নেন (১৫৭৩)। দাউদের সৈন্যেরা বাধা পেল ত্রিপুরার কাছাকাছি খণ্ডলে। কিন্তু ত্রিপুরা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে চলল পাঠান বাহিনী।[১১৮] এর পরে ফিরোজ আন্নী আর জামাল খান পন্নীর নেতৃত্বে দাউদ আরো একদল সৈন্য পাঠালেন চট্টগ্রামে। এই দল মেহেরকুলে ত্রিপুরা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। সম্ভবত পাঁচ মাস ধরে এই যুদ্ধ চলে; 'পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল পন্নীর সনে।' ১৫৭৬ সনে গৌড়ে মুঘল বিজয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে। কাজেই পাঁচ বৎসর যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পাঁচ মাস হওয়াই সম্ভব। এবারেও দাউদ খাঁর জয় হয়।

আইন-ই আকবরীতে চট্টগ্রামের শেখপুর মহলের অপর নাম সোলায়মানপুর বলে উল্লেখ আছে।[১১৯] আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সাতটি মহলের কোনোটিই শঙ্খনদের দক্ষিণ তীরে ছিল না; এতে বোঝা যায় দাউদ কররানীও শঙ্খনদ অবধি উত্তর চট্টগ্রামই দখল করেছিলেন। গৌড়ে মুঘল বিজয়ের সুযোগেই সম্ভবত আরাকানরাজ ও মঙ ফালঙ (১৫৭১-৯৩) উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারভুক্ত হওয়ার আগেই কররানীর রেকর্ড থেকেই চট্টগ্রামের মহলগুলো তোডড়মল মুঘল তৌজিভুক্ত করেন। শিহাবুদ্দীন তালিস তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

> When Bengal was annexed to the Mughal Empire. Chatgaon was entered in the papers of Bengal as one of the defaulting and unsettled districts. When the Mutasaddis did not really wish to pay any man whose salary was due, they gave him an assignment on the revenue of Chatgaon. [১২০]

দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকেন্দ্র ছিল রামু। ম্যানরিক ও রালফ ফিচ রামুকে শাসনকেন্দ্র দেখেছেন। রামকোটে তার ধ্বংসাবশেষ আছে।[১২১]

রাজোয়াঙে বর্ণিত যে রনবী দ্বীপে আরব জাহাজ ভেঙে ছিল, তাও সম্ভবত রামু। সম্ভবত উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরা ও আরাকানে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ চলছিল। এই যুদ্ধে সৈনাপত্য পান ত্রিপুরার রাজকুমার রাজ্যধর। ইনি রামু অবধি অগ্রসর হন। উকিয়ার শাসনকর্তা আদমের এলাকার সীমায় আরাকানীরা তাকে বাধা দিল। রসদ যোগাড়ে অসমর্থ হয়ে রাজ্যধর চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আরাকান পক্ষ উকিয়ার সামন্তের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে অমর মাণিক্য তা গ্রহণ করেন। রাজ্যধর ত্রিপুরায় চলে গেলে সন্ধিভঙ্গ করে আরাকানীরা চট্টগ্রাম দখল করে। অমর মাণিক্য আবার রাজ্যধরকে পাঠালেন। আরাকানরাজ চালাকি করে গজদন্ত নির্মিত মুকুট উপহার দিয়ে সন্ধির জন্যে দূত প্রেরণ করলেন। রাজ্যধরের সঙ্গে আরো দুইজন রাজপুত্র এসেছিলেন। মুকুটের দাবী নিয়ে তিনজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। আর আরাকানরাজ এ সুযোগে তাদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করলেন। সেনাপতি রাজ্যধর শামুক ফুটে পঙ্গু হলেন। অপর রাজপুত্র যুঝামাণিক্য নিজের মত্ত হাতীর আক্রমণে প্রাণ হারালেন।

এ কাহিনীতে সত্য আছে কিনা জানিনে। তবে ১৫৮৫ সনে রালফ ফিচ চট্টগ্রামকে আরাকান অধিকারে দেখলেও ত্রিপুরার সঙ্গে আরাকানের স্থায়ী সংগ্রামের কথাও শুনেছিলেন।[১২২] অবশ্য রাজমালা মতে অমর মাণিক্য (সম্ভবত ১৫৮৫ সালে) আরাকানরাজ থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন। আবার আরাকানী সূত্রে জানা যায় ১৫৮৬ সালে রাজা মঙ ফালঙ ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম জয় করে নেন।[১২৩] আইন-ই-আকবরীর সমাপ্তিকাল ১৫৯৮ সন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে : To the south -east of Bengal is a considerable Tract called Arakan which possesses the port of Chittagong ।[১২৪] কাজেই ১৫৯৮ সাল অবধি অন্তত চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারে যে ছিল, তা নিশ্চিত।

জ. আগেই বলেছি রাস্তিখানের সন্তান মীনাখান ও তাঁর বংশধরগণ অন্তত ১৬৬৫ সাল অবধি চট্টগ্রামের শাসনকার্যে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। মীনা খার পৌত্র হামজা খান (মসনদ-ই-আলা—মছলন্দ) গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে (১৫৩৮ খ্রী. অবধি) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। খুদাবখ্‌শ খান নামে অপর ব্যক্তিও তাঁর সহকারী বা তাঁর সমকক্ষ অপর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই হামজা খানকে পর্তুগীজরা আমীরজা খান বলে উল্লেখ করেছে। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর সময়ে এ দুইজনের মধ্যে সদভাব ছিল না একজন ছিলেন পর্তুগীজদের বশে, অপরজন পর্তুগীজ-বিদ্বেষী। দুইজনের দ্বন্দ্বের সুযোগে শেরশাহ প্রেরিত নোগাজিল (নিয়াম; খিজির?) সহজেই চট্টগ্রাম দখল করে নিলেন। এ সময় পর্তুগীজ কেপ্টেন সেমপাউ মনস্থির করে কিছুই করতে পারলেন না, ফলে চট্টগ্রাম স্বাধিকারে পাওয়ার সুযোগ হারালেন : Castanheda তাই বলেছেন ...through the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

folly and indiscretion of Sampayo, the king of Portugal lost Chittagong which could easily have been taken possession of considering that Sher Shah was busily engaged on the other side of bengal.[১২৫]

হামজা খান সম্বন্ধে 'মক্তুল হোসেন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি ত্রিপুরা জয় করেন এবং তিনি পাঠান বিজয়ীও। এতে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। হামজা খান শের শাহর সেনাপতি চট্টগ্রাম বিজেতা নোগাজিলের (নিযাম খিজির?) সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই বোধ হয় গৌরব-গর্বী উত্তরপুরুষ মুহম্মদ খানের বর্ণনায় 'লীলায় পাঠানগণ জিনি' পাচ্ছি। আর ১৫৫৩-৫৫ সালে বিজয় মাণিক্যকে বিতাড়িত করেন বলেই কবি 'করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ' লিখেছেন। এতে বোঝা যায় নোগা- জিলের বিজয়ের পরেও তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হামজা খানের পর তাঁর পুত্র নসরত খানও পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। আরাকানী সূত্রে জানা যায়, নসরত খান গৌড়ের পাঠান সুলতানের তথা শামসুদ্দীন বাহাদুর শাহর (ওর্ফে খিজির খান ১৫৫৬-৬০) আমল থেকে সোলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২) আমলের মাঝামাঝি কাল অবধি (১৫৬৯-৭০) চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। কিন্তু নসরত খানের সময় চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধিকারে ছিল—গৌড়ের নয়। ত্রিপুরারাজের উজির নসরত খান আরাকানরাজ সউলাহর (১৫৬৩-৬৪) কাছে আত্মরক্ষামূলক সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করে সউলাহকে ভেট পাঠিয়ে তুষ্ট রাখেন। কিন্তু সউলাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র মঙসিইটা বা মঙসিতা (১৫৬৪-৭১) সম্ভবত নসরত খানের আনুগত্য দাবী করেন। তখন দেয়াঙ্গ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজেরা ছিল আরাকানরাজের বশে। আরাকানরাজের ইঙ্গিতেই নসরত খানের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ বাধে এবং পর্তুগীজদের হাতেই ১৫৬৯-৭০ সালে তিনি প্রাণ হারান।[১২৬] উদয় মাণিক্যের (১৫৮৫-৯৬) সময়ে ঈসা খান সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর বাসভূমি আজো ঈসাপুর নামে পরিচিত।[১২৭] আগেই উল্লেখ করেছি ১৫৮৫-৮৬ সনে আরাকানের ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার রাজকুমার রাজ্যধরের সৈনাপত্যে কয়েকটি যুদ্ধ ঘটে। রামু-চকরিয়ার আরাকানী সামন্ত আদম আরাকানরাজের বিরাগভাজন হয়ে আশ্রয় নিলেন অমর মাণিক্যের। আরাকানরাজ আদমকে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানালে অমর মাণিক্য আশ্রিতকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। এতে তৃতীয়বার ত্রিপুরা বাহিনী চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়। এবার ত্রিপুরা বাহিনীতে পাঠান সৈন্যও (সম্ভবত ঈসা খানের নেতৃত্বে) নিযুক্ত ছিল, তারা দুই লক্ষ আরাকানী সৈন্যের বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং বিশ্বাসভঙ্গ করে ত্রিপুরা সৈন্যদের সম্পদাদি লুট করে পালিয়ে যায়। অমর মাণিক্য এ আকস্মিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঈসাপুর থেকে ধুমঘাট হয়ে পালিয়ে যান এবং অপমানে আত্মহত্যা করেন (১৫৮৬)। মঘেরা রাজধানী উদয়পুর লুট করে সেখানে পনরো দিন অবস্থান করে। তার পর আরাকানরাজ মঙ ফালঙ (১৫৭১-৯৩) যুগদিয়া, আলমদিয়া প্রভৃতি জয় করে ঢাকাও দখল করেন। এভাবে ঢাকা-ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর কতেকাংশ ও চট্টগ্রাম অধিকৃত হওয়ায় আরাকানরাজের গৌরব বৃদ্ধি পেল। এ যুদ্ধে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ উজির (শাসক) নসরত খান-পুত্র জালাল খান গোপনে ত্রিপুরা রাজের সহায়ক ছিলেন। অমর মাণিক্যের পরাজয়ে ও আত্মহত্যার সংবাদে তিনি নাকি ভয়েই প্রাণ হারান (১৫৮৬) । ১৫৮৫ সালে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ কামুও চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা করেন।

জালাল খানের পুত্র, কবি মুহম্মদ খানের পিতৃব্য বিরহিম বা ইব্রাহিম খান চট্টগ্রামে আরাকানী উজির হন (১৫৮৬)। ১৬০৭ সনে Francois pyvard প্যাগানরাজের (আরাকান রাজের) অধীনে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনকর্তা দেখেছেন। ইনি সম্ভবত ইব্রাহিম খান।[১২৮]

কহে ফতে খানে, সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম খান
ভব কল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ সুলতান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ইব্রাহিম যদি উজির ইব্রাহিম খান হন, তবে কবি সৈয়দ সুলতান ও তিনি সমসাময়িক ছিলেন। ফতে খানের অপর পদে আলাউল খানের নাম আছে। এতে মনে হয় ফতে খানের পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতান। উজির ইব্রাহিম খান ছিলেন ফতে খানের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক আর আলাউল ছিলেন তার প্রায় সমবয়সী। ১৫৮৬-১৬০৭ সনের মধ্যে 'লায়লী মজনু' কাব্যোক্ত নিযাম শাহ্সুর চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন বলে ডক্টর যে অনুমান করেছেন, তা যদি মানতে হয় তাহলে উজির হিসেবে ইব্রাহিম খানের স্থিতি অস্বীকার করতে হবে।[১২৯] জালাল খানের বিশ্বাসভঙ্গের পর থেকে আরাকানরাজের পুত্র কিংবা ভ্রাতা চট্টগ্রামে প্রধান শাসকরূপে নিযুক্ত হতে থাকেন।[১৩০] এবং এটি রেওয়াজে পরিণত হয়। ম্যানরিক (১৬২৯-৩৫) বলেন : The principality of Chittagong belonged by hereditary right to the second son. আরাকানরাজ মঙরাজাগী বা মঙইয়াজাগীর মুসলিম নাম ছিল সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)। তিনি নিজেকে আরাকান, বাঙলা ও ত্রিপুরার নরপতি বলে অভিহিত করতেন। চট্টগ্রামে তৈরি তাঁর মুদ্রায় আরবি, বর্মী ও নাগরী হরফ উৎকীর্ণ করান।

এ যুগটা চট্টগ্রামে পর্তুগীজ প্রাবাল্যের কাল। পরে বিস্তৃতভাবে পর্তুগীজ ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে।

ঝ. ১৬১৬ সালে বাঙলার মুঘল সুবাদার কাসিম খান চট্টগ্রাম বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি নিজে ভুলুয়া অবধি গিয়ে আবদুন নবীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। আবদুন নবী নিযাম-পুরের জমিদারকে বশে এনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আরাকানী সৈন্যেরা বাড়বকুণ্ডের নিকটে কাঠের দুর্গ তৈরি করে তাকে বাধা দিলেন। এ স্থান এখন কাঠগড় নামে পরিচিত। দুই দিন যুদ্ধ হল, মুঘলেরা সুবিধা করতে না পেরে ঢাকার দিকে চলে এল। এ যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে ' বাহারীস্তান গয়বী' গ্রন্থে।

ঞ. ১৬২১ সনে মুঘল সুবাদার ইব্রাহিম খানও চট্টগ্রাম বিজয়ে অগ্রসর হন। তিনি ত্রিপুরা থেকে জঙ্গল পথে (রামগড় পাহাড় হয়ে) এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের বন্ধুরতার অভিজ্ঞতা তার ছিল না বলে অভিযানের চেষ্টা ত্যাগ করে তাঁকে ফিরতে হল। ১৬২৪ সালে শাহজাদা খুরম যখন সুবাদার ইব্রাহিম খানকে হত্যা করে ঢাকা দখল করেন, তখন আরাকানরাজ সুধর্মার সঙ্গে খুরমের মৈত্রী হয় এবং মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ উপহার বিনিময় হয়। ১৬২৫ সালে বাঙলার সুবাদারের প্ররোচনায় চট্টগ্রামে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে সামন্ত-বিদ্রোহ ঘটে। এ বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এলেন স্বয়ং সুধর্মা রাজা (১৬২২-৩৮)। তিনি চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে ভুলুয়ায় হানা দেন (১৬২৬) এবং আরো এগিয়ে গিয়ে দোলাই খাল বেয়ে খিজিরপুর ও ঢাকা লুণ্ঠন করে বহু ধন-রত্ন ও বন্দী নিয়ে ফিরে যান। সুবাদার মহব্বত খান কিংবা তার সন্তান খান জাদ খান কোনো বাধাই দিতে পারলেন না (Campos)। ভুলুয়ার থানাদার মির্জা বুগীস ৭০০ অশ্বারোহী ৩০০ রণতরী নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হয়নি।

ট. ১৬৩৮ সালে চট্টগ্রামস্থ আরাকানী শাসনকর্তা মুকুটরায় (Magat Re—সেনাপতি, ফিল্ড মার্শাল) আরাকানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। লোকশ্রুতি এই যে, মুকুটরায়ের পিতা গৌড়েশ্বর রায়ের নিবাস ছিল খণ্ডল পরগনায়। তিনি নাকি চট্টগ্রাম অধিকারের ব্যাপারে ত্রিপুরা-রাজের বিরুদ্ধে আরাকানরাজকে সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রামের কদুরখিল গায়ে বসতি নির্মাণ করেন।[১৩১] অপর মতে, সুধর্মা রাজার মৃত্যুর পর তার রাণির প্রেমিক নরপতিণি যখন সিংহাসন দখল করেন, তখন চট্টগ্রামের আরকানী শাসক Magat Re বিদ্রোহী হন। Magat Re আরাকানে হানা দেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ভুলুয়ার মুঘল থানাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর পিছু নিয়ে আরাকানী সৈন্যেরাও যুগদিয়া অবধি অগ্রসর হয়। এখানে সুবাদার ইসলাম খান মসৌদির নৌবাহিনীর সঙ্গে আরাকানীদের যুদ্ধ হয়। আরাকানীরা এ যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কিছুকাল পরে পর্তুগীজদের প্ররোচিত করে এবং নিজেও সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়ে আরাকানরাজ মুঘল-শাসিত বাঙলার নানাস্থানে মানুষ ও ধনসম্পদ লুট করাতে লাগলেন। ইসলাম খানের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাকানরাজের নৌযুদ্ধও হয়।[১৩২] মুঘলেরা মগ হার্মাদের ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করতে পারেনি। ১৬৬৫ সাল অবধি জলপথে বাঙলা দেশের সর্বত্র অবাধে পীড়ন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে এরা। ১৬৬৫ সালের পরেও মগ-ফিরিঙ্গী দস্যুদের হামলা বন্ধ হয়নি, তবে কমে ছিল।

ঠ. আওরঙজীব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সুজা আরাকান-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৬৬০)। তরুণ রাজা চন্দ্র সুধর্মা সুজা-কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। অভিজাত ও মুসলমান সুজা সে-প্রস্তাব চরম অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলে রূপমুগ্ধ, অপমানিত রাজা সুজার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। তিনি সুজাকে দেশত্যাগের ইঙ্গিত দেন, কিন্তু মক্কা পাঠাবার জন্যে প্রতিশ্রুত নৌকা দিতে অসম্মত হন। সুজা আসন্ন বিপদের শঙ্কায় মরিয়া হয়ে উঠলেন এবং আরাকানী মুসলমান ও বাঙালিদের নিয়ে তিনি আরাকান সিংহাসন দখলে প্রয়াসী হন। যথাসময়ে চন্দ্র সুধর্মা এ খবর পেয়ে সানুচর সুজাকে আক্রমণ করেন। সুজা পালিয়ে যান, তাঁর অধিকাংশ অনুচর নিহত হন। তার পরিবার বন্দী হয়। সুজাও পরে ধৃত হয়ে নিহত হন। সুজার দুই মেয়ে আত্মহত্যা করে। এক মেয়ে রাজপত্নী হওয়ার পর রাজার প্রাণনাশের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে প্রাণ হারান। সুজার তিন পুত্র বন্দী থাকে। বাংলার মুঘল সুবাদার মীর জুমলা সুজার পুত্রদের প্রত্যর্পণের দাবীতে এক ওলন্দাজ বণিককে রোসাঙ্গে দূত পাঠান। সুধর্মা সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং মীর জুমলার হুমকিতে বিরক্ত হয়ে সুজার পুত্রদের হত্যা করেন (১৬৬৩)। সুজার পুত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু বাঙালি মুসলমানকেও রুষ্ট রাজা নির্বিচারে হত্যা করান। সুজা ও সুজা-কন্যার করুণ পরিণতির কাহিনী নিয়ে রচিত গাথা *পূর্ববঙ্গ গীতিকায়* সংকলিত রয়েছে।[১৩৩]

আওরঙজীব এ সংবাদে সম্ভবত অপমানিত বোধ করেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ বাঙ্গলায় শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সনে ২৭ শে জানুয়ারি শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদ খান চট্টগ্রাম দখল করেন। অবিশ্য মুঘল বাহিনী এগিয়ে যেয়ে রামু অবধি গোটা চট্টগ্রামই অধিকার করেছিল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় জল-কাদার জীবনে অনভ্যস্ত মুঘল বাহিনী চট্টগ্রামে ফিরে আসে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে আবার আরাকান- অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিকার ১৭৫৬ সাল অবধি বহাল থাকে। আবদুল করিম খোন্দকার রচিত 'দুল্লা মজলিসে' রামুর আরাকানী শাসকের প্রশস্তি আছে। 'সহস্রেক সাথে শতেক সাত' মঘীসনে তথা (১১০৭+ ৬৩৮) ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত। তখনো মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণতীর তথা আধুনিক কক্সবাজার মহকুমা অঞ্চল আরাকান অধিকারে ছিল। সম্ভবত মুঘল সীমান্ত সেনানী আধু খাঁ-ই চট্টগ্রামেরদক্ষিণ প্রান্তে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

ড. ঈসা খান :কিংবদন্তি অনুসারে ভুঁইয়া-শ্রেষ্ঠ ঈসা খান চট্টগ্রামে কিছুকাল আত্মগোপন করে ছিলেন। চট্টগ্রামে তার বাসস্থান ঈসাপুর নামে খ্যাত হয়। এটি এখনো একটি সমৃদ্ধ গ্রাম এবং ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত। ঈসাপুরের পাশেই আছে কবি শা বারিদ খানের পূর্বপুরুষ নানুরাজা মহল্লিকের নামের নানুপুর। ঈসা খান যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন এবং সদর জাহাঁকে পীর কিংবা বন্ধু করেছিলেন, তা 'মুক্কুল হোসেন' কাব্যেও রয়েছে। এমনও অনুমতি হয় যে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ কামু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ঈসা খান (১৫৮৩) ত্রিপুরা রাজ্যান্তর্গত উত্তর চট্টগ্রামে বসতি-বিরল এক গ্রামে বাস করতে থাকেন।কিংবদন্তি অনুসারে ১৫২৫ সালে যখন নুসরৎ শাহ উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন, তখন এই অঞ্চলের আরাকানী মগেরা আরাকান অধিকারে চলে যায়। একে 'মগ ধাওনী' তথা মগ-ধাওয়া বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে উক্ত স্থানটি জনবিরল হয়েছিল। 'রাজামালা' মতে [১৩৪] অমর মাণিক্যের সৈনাপত্য করেছেন ঈসা খানই। ঈসা খান চট্টগ্রামে সংগৃহীত সৈন্য দিয়েই সোনারগাঁয়ে মুঘলদের এবং কোচবিহারের রাজাকে পরাজিত করেন।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের ভূমিকা

১৪৯৮ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের উপকূলের সন্ধান পান। তখন থেকেই ভারতের সম্পদে রিক্ত আর অন্তরে ঋদ্ধ হওয়ার পালা শুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৯২ সনে স্পেন থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগীজরা সুদূরের ডাকে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো দিকবিদিকে ছুটে চলল চোখে তাদের আনন্দিত দিনের স্বপ্ন, বুকে তাদের হিম্মত, মাটি তাদের পায়ের নিচে, সমুদ্র তাদের দাঁড়ের আঘাতে বিক্ষত, বাতাস তাদের পালে ধরা, আকাশ তাদের মাথার ছাতা। আরব-ইরানের নামনিশানা রাখবে না তারা নীলসমুদ্রে। কেবল তাদের জাহাজই পাল তুলবে সাতসাগরে। হাঁসের মতো তারাই হবে জলচর। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা দৃঢ়পণ। তাদের নিয়ন্তা হবে লোভ, পাথেয় হবে বাহুবল ও মনের জোর। ন্যায়-নিয়ম-নীতির পরওয়া তারা করবে না। তাই—

> On reaching portugal the next spring (1499) da Gama advised the king that provided sufficiently strong force were sent, the Moslems could be driven off the sea and the Trade divcerted from the Persian Gulf to the cape route. Emanuel accepted this advice and in the following years put it into operation... built fortresses from Africa to Malacca ।

পর্তুগীজরা গোড়া থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং প্রায় আড়ইশ' বছর ধরে সর্বপ্রকার অপকর্মে লিপ্ত ছিল। বাঙালির কাছে পর্তুগীজ তথা হার্মাদ (Armadan) নামটি ত্রাস ও বীভৎসতার প্রতীক। এমন পুরুষানুক্রমিক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে আচরণের নজির ইতিহাসে বিরল। আরো আশ্চর্যের কথা, এর মধ্যেও নাকি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল— There was religious zeal to enslave people and convert them to christianity. Their, abduction, ruin, enslavement, degradation were spiritually an extra-ordinary piece of good fortune for them .. .. Manriqe gives statistics : 3400 persons were kidnapped annually and brought to Dianga. Of these he was able to baptize some 2000 a year. He goes on to say these that it was easier to convince these wretched beings than the residents in the Chittagong Province among whom the annual average of conversion was not more than 400. Their (kidnapped persons) misery and despair did not shock Manriqe because his mind was fixed on saving their soul by baptizing .

AMARBOI.COM

এমনিভাবে পর্তুগীজদের কেউ পার্থিব, কেউ অপার্থিব সম্পদ লাভের লোভে পড়ে সহজ স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব হারিয়ে আড়াইশ' বছর ধরে মানুষের দেহ-মনের উপর সীমাহীন পীড়ন চালিয়েছে।

গামা ভারতের উপকূলেই নৌকা ভিড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু খবর নিয়ে গিয়েছিলেন তিন সাগরের। বাঙলা সম্বন্ধে (১৪৯৯) রাজার কাছে তাঁর প্রতিবেদন ছিল এরূপ :

> Bengal has moorish king and mixed population of Christians and moors, Its army may be about 24000 strong, 10000 being cavlry and the rest infantry with 400 war elephants. The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods, clothes which sell on the spot for 22s-6d fetch 90 s. in calicut. It abounds in silver .

পূর্বদেশীয় পর্তুগীজ গভর্নর Albuquerque ১৫১৩ সালে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলকে জানান Bengal requires all our marchandise and is in need of it. কিন্তু আসলে বাঙলার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠে আরো আঠারো-উনিশ বছর পরে।

১৫১৪ সনের উড়িষ্যার পিপলি বন্দরে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। সেখান থেকেই তারা মেদিনীপুরের হিজলী বন্দরে যাতায়াত করত। ১৫১৭ সনে জোয়াও দ্য সিলভীরার নেতৃত্বে প্রথম বাণিজ্যবহর চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হয়। জোয়াও দ্য সিলভীরা বাণিজ্যের অনুমতি লাভের দৌত্য নিয়ে এসেছিলেন। এসেই কিন্তু দুটো স্থানীয় বাণিজ্যতরী লুট করেন। এ নিয়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। কাজেই কুঠি নির্মাণের জন্যে রাজ-অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ফিরে যান। ১৫২৮ সন অবধি দ্য সিলভীরা সমুদ্রে অন্যদের বাণিজ্যতরী লুট করতে থাকেন। এর ফলে এদেশের বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটে। এত অপকর্ম করেও পর্তুগীজেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের আশা ছাড়েনি। প্রতি বছর তাদের অন্তত একখানা বাণিজ্য জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসত। আর গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো দ্য কুনহা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চট্টগ্রামে পর্তুগীজের বাণিজ্যাধিকার লাভের জন্যে। ভাসকো ডা গামা যেমন প্রথমবারেই কালিকটে জেলেদের বেঁধে রেখে রাজার থেকে সুবিধে আদায় করে নিয়েছিলেন, এখানেও সে উপায় অবলম্বিত হল।

১৫২৮ সনে পর্তুগীজ কেপ্টেন আফোনসো দ্য মেলোর জাহাজ চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝামাঝি স্থানে ঝড়ের মুখে পড়ে ভেঙে গেল। জেলেরা তাদের উদ্ধার করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসক খুদাবখ্শ খানের নিকট নিয়ে এল। খুদা বখ্শ মেলোর সাহায্যে তাঁর এক প্রতিপক্ষকে দমন করেন, এবং ভবিষ্যতে এ প্রকার কাজে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে মেলোকে বন্দী করে রাখেন। গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা নুনো দ্য কুনহার কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি অরমুজের বণিক খাজা শাহাবুদ্দীনকে পর্তুগীজ কর্তৃক লুণ্ঠিত তাঁর জাহাজ ও পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে বশ করেন। এবং ৩০০০ কুজুওড্রুস বা টাকা মুক্তিপণ নিয়ে দ্য মেলোকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে খাজা শাহাবুদ্দীনকে দূত করে পাঠালেন গৌড় দরবারে। এ দৌত্য সাময়িকভাবে সফল হল।

১৫৩৩ সনে মেলো আবার পাঁচখানা জাহাজ ও দুইশ' অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এলেন। এলেন পথে পথে দেশী ও আরব বাণিজ্যতরী লুট করে করেই। বন্দরে এসে তিনি গৌড়-সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহর কাছে Duarte-de-Azevdo-র নেতৃত্বে বারোজন লোক মারফত বহুমূল্য উপহার পাঠালেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাঙালির জাহাজ থেকে লুটকরা গোলাপজলের পিপাও ছিল। সুলতান লুণ্ঠিত দ্রব্য শনাক্ত করতে পেরে দরবারে প্রেরিত পর্তুগীজদের বন্দী করলেন। সানুচর মেলোকে বন্দী করার জন্যেও নির্দেশ পাঠালেন। ইতিমধ্যেই শুল্ক-ব্যাপারে মেলোর বিবাদও বাধল চট্টগ্রামের শুল্ক-কর্মচারীদের সঙ্গে। সুলতানের নির্দেশ আর এই বিবাদের সুযোগে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা Mello-র সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালেন। তাতে পর্তুগীজদের বিপুল ক্ষতি হল ধনে-প্রাণে। এ সংবাদ পেয়ে পর্তুগীজ শাসনকর্তা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ৩৫০ জন লোক নিয়ে আনতোনিও দ্য সিলভা মেনজিস-এর নেতৃত্বে এক নৌবহর পাঠালেন। মেনজিস চট্টগ্রামে পৌঁছে বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন। মাহমুদ শাহ পর্তুগীজ কারিগর প্রাপ্তির শর্তে—অপর মতে ১৫০০০ পাউন্ড মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু শর্তারোপে রুষ্ট হয়ে মেনজিস চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন লাগিয়ে দেন এবং বহু লোক হত্যা করেন ও বন্দী করে নিয়ে যান। করমণ্ডলের পর্তুগীজ অধ্যক্ষ Diego Rebello ১৫৩৫ সনে সশস্ত্র অনুচর নিয়ে সপ্তগ্রামে আসবার পথে দুটো আরব বাণিজ্য-জাহাজকে বঙ্গোপসাগর থেকে বিতাড়িত করেন।

তবু শেরশাহর আক্রমণে বিপর্যস্ত মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের হাত করতে প্রয়াসী হলেন। ফলে মেলো ও রেবেলোকে শেরশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগালেন। এই সুযোগে রেবেলো চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ণ অধিকার লাভ করলেন এবং এরূপে আরব ইরানী ও অন্যান্য জাতির চট্টগ্রামের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হল। Villalobos ও জোয়াও কোরিয়ার নেতৃত্বে শেরশাহর বিরুদ্ধে মেলো দুটো নৌবাহিনী দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় মাহমুদ শাহ মেলোকে ৪৫০০০ রী (Reis) এবং পর্তুগীজ সৈন্যদের মাথাপিছু দৈনিক ১০ টাকা করে ভাতা দেন এবং চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে তারা কুঠি নির্মাণ ও শুল্কালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়। এমনকি নুনো ফারনানডেজ Freire এবং জোয়াও কোরিয়া যথাক্রমে চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এর পরে বাঙলায় এলেন কেপ্টেন আফনসো দ্য ব্রাইটো। মাহমুদ শাহর সাহায্যার্থ গোয়া থেকে ভাসকো-ডা সেম্পাও-র নেতৃত্বে নয়টি রণতরী প্রেরিত হয়। এ সময় মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ শাসনকর্তা খুদাবখ্শ খান ও হামজা খানের মধ্যে বিরোধ চলছিল। পর্তুগীজ শুল্কাধ্যক্ষ Fernandez হামজা খানের পক্ষাবলম্বন করেন। এ বিরোধের সুযোগে শেরশাহর সেনাপতি খিজির খান চট্টগ্রাম বন্দরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার পান। কিন্তু শীঘ্রই সেম্পাও-এর বাহিনী খিজির খার প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। তখন শেরশাহর পক্ষ থেকে পর্তুগীজদের আশ্বাস দেয়া হল, তারা আগের মতো সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে। এতে পর্তুগীজ-অধ্যক্ষ ফারনানডেজ হামজা খানের পক্ষ ত্যাগ করে খিজির খানের তথা শেরশাহর পক্ষ নিলেন। কিন্তু তখনো সেম্পাওর প্রেরিত পর্তুগীজ সৈন্যেরা হামজা খানের পক্ষে ছিল। তারা খিজির খানের অফিসারদের ধরে নিয়ে সেম্পাওর জাহাজে বন্দী করে রাখল। এ বিরোধের ফলে ১৫৪০ সালের দিকে খিজির খানের হাতে পর্তুগীজদের ধন-প্রাণের ক্ষতি হল বিস্তর। এরূপে সেম্পাওর অবহেলা এবং ফারনানডেজের অপরিণামদর্শিতার ফলে চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্তির সুযোগটি পর্তুগীজদের হারাতে হল। অবশ্য পর্তুগীজরা বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি দুটোই সমান চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু ষোলো শতকের শেষাবধি পর্তুগীজেরা বাঙলা দেশে দুর্গাদি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যদিও চট্টগ্রামে (Porto Grando) ও হুগলীতে (galin or porto pequino) তারাই প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যের উপায় করে নিয়েছিল। চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ভূমিকার প্রধান ঘটনাগুলো এই:

ক. ১৫৬৯ সনে Ceasar Frederick সন্দ্বীপে মুসলিম বাসেন্দা ও মুসলিম সুশাসক রাজা দেখে ছিলেন।

খ. ডক্টর জেমস ওয়াইজ-এর মতে ফাদার ম্যানরিক ১৬৩০ সনে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন।

গ. ফ্রানসিস ফারনানডিজ নামে গোয়ানিজ পাদ্রীর বন্দী হিসেবে ১৬০২ সনে চট্টগ্রামের কারাগারে মৃত্যু হয়। আরাকানরাজের পীড়নেই তার মৃত্যু হয়।

ঘ. ১৬০১ সনে যশোরে ও চট্টগ্রামে দুটো জেসুইট মিশন আসে। তখন দেয়াঙ্গে এক গীর্জাও ছিল।

ঙ. ১৬০২ সনে পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আরাকান শাসক কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে সন্দ্বীপে ঘাঁটি করে। সন্দ্বীপ আগে বাকলারাজের শাসনে ছিল, কিন্তু পরে গৌড় শাসনভুক্ত হয়। ১৫৬৫-৮৬ সনের দিকে সন্দ্বীপের মুসলমানেরা পর্তুগীজদের প্রতি প্রীতি ও সৌজন্য রাখত।

চ. বাকলারাজের অনুগত Dominique Carvalho এবং Manuel-de-Mallos -এর যুক্তবাহিনী সন্দ্বীপ দখল করল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আরাকানরাজ তাদের বিতাড়িত করে সন্দ্বীপ পুনরাধিকার করে বাকলা জয় করেন (১৬০২), যশোরে হানা দেন এবং বাঙলাদেশ জয়ের হুমকি হাঁকেন। তখন কারভালহু কিছু অনুচরসহ পালিয়ে শ্রীপুরে আশ্রয় নেন।

ছ. ১৬০৭ সনে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গ দখল করেন। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজ বাসেন্দাদের কিছু নিহত হয়, কিছু মেঘনার দ্বীপাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। এক মুঘল নৌ-অধ্যক্ষ ফতেহ খান সন্দ্বীপ দখল করে মুঘলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনিও পর্তুগীজ আর খ্রীস্টান দাসদের হত্যা করে উচ্ছেদ করেন। এ সময় সাবসটিয়ান গনজালিস টিবাও এবং কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ দেয়াঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। এদিকে ফতেহ খান ১৬৬৫ সনে মুঘল সেনা ইবন হোসেনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন।

জ. দস্যু গনজালিস ক্রমে শক্তিশালী হয়ে সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা হন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেন। আবার আরাকানরাজ-ভ্রাতা আনোপোরমকে বশ করে তার ভগ্নীকে বিয়ে করেন এবং কিছুকাল পরে তাকে হত্যা করে বহু ধনরত্নের মালিক হন। গনজালিস সন্দ্বীপে নয় বছর রাজত্ব করার পরে আরাকানরাজের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যান (১৬১৬) এভাবে। (Gongales' s) 'sovereignty passed like a shadow. his pride was humbled and his villainies punished. পর্তুগীজরা এরপরে আর কোনোদিন রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করেনি, তবে উপকূলাঞ্চলে অপ্রতিহতভাবে দৌরাত্ম্য করতে থাকে। হার্মাদদের 'জালিয়া' দেখলে মুঘল নওয়ারাও ত্রস্ত হয়ে উঠত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ. বানিয়ার বলেছেন —(১৬৬৮) St Augustine সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষু Fra goan কয়েক বছর ধরে স্বাধীনভাবে সন্দ্বীপে রাজত্ব করেছেন।

ঞ. বহু পর্তুগীজ শাহ সুজাকে (১৬৬০) আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সহায়তা করেছে। সুজার পরাজয়ে এরা আরাকান থেকে পালিয়ে এসে বাঙলার উপকূলাঞ্চলে (সুন্দরবন, বাকলা ও হুগলী অবধি) ডাকাতি করে বেড়াত।

ট. ফ্রায়ার ম্যানরিক -এর (১৬২৮-৪৩) বর্ণনায় পাই:

১. পর্তুগীজরা আরাকানরাজের অনুমতি নিয়েই দেয়াঙ্গে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। বন্দর করবার জন্যেই পর্তুগীজরা আরাকানরাজ থেকে দেয়াঙ্গ ইজারা নেয়।

২. আরাকানরাজ মুঘলশক্তিকে প্রতিরোধ করবার অভিপ্রায়েই পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তা করতেন, এমনকি এ কার্যে ওদেরকে তিনিই নিযুক্ত করতেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের ও দাসের অর্ধেক পেতেন তিনি।

৩. দেয়াঙ্গে ও তার চারপাশের গাঁয়ে খাঁটি ও সঙ্কর পর্তুগীজের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাতশ। এসব লোক কয়েকটি কম্পানী বা দলে বিভক্ত ছিল। আরাকানরাজ তাদের জায়গীর দিয়েছিলেন। ১৬১৬ সনে সন্দ্বীপের রাজা গনজালিস টিবাও আরাকানে হানা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজদের উপর গোয়ার গভর্নর-এর কোনো কর্তৃত্ব চলত না। গনজালিস ও ব্রাইটো নিজেদেরকে গভর্নরের সমকক্ষ বলে দাবী করতেন।

৪. ম্যানরিক যখন দেয়াঙ্গে আসেন, তখন চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন সুধর্মার ভাই। তাঁর মৃত্যুতে নতুন এক শাসক প্রেরিত হন। ১৬০০-১৭ সাল অবধি পর্তুগীজ প্রতাপ অপ্রতিরোধ্য ছিল। তখন 'The portuguese had dreams of making and unmaking the rulers of Arakan'। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবার জন্যে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজীব দেয়াঙ্গের পেশাদার পর্তুগীজদের ঘুষে ও হুমকিতে বশ করেছিলেন।

ঠ. শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায় আরো কিছু তথ্য মেলে :

১. চট্টগ্রাম দুর্গের ভেতরে একটি টিলায় একটি সমাধি আছে। ঐটি পীর বদরের আস্তানা নামে পরিচিত। মঘেরাও এ সমাধিকে তীর্থরূপে মানে কয়েকখানি গ্রাম এই সমাধির জন্যে ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে ।

২. কর্ণফুলীর অপর তীরে চট্টগ্রাম দুর্গের বিপরীত দিকে একটি সুদৃঢ় ও উঁচু দুর্গ আছে। এখানে প্রতিরক্ষার সব উপকরণ মজুত থাকে। আরাকানরাজের বিশ্বস্ত আত্মীয় বা জ্ঞাতি চট্টগ্রামে শাসনকর্তা থাকেন। ১৫৮৬ সন থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়। আরাকানরাজ নিজের নামে চট্টগ্রামে স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করান।

৩. অতীতে বাঙলার সুলতান ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা (আল) তৈরি করিয়েছিলেন, এ রাস্তা শ্রীপুরের বিপরীত দিকে নদীর অপর পার থেকে শুরু। ফখরুদ্দীনের সময়ে নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ছিল চট্টগ্রামে। এগুলোর ভগ্নাবশেষই তার প্রমাণ।

৪. বাঙলার সুলতানদের রাজত্বের শেষের দিকে এবং মুঘল শাসনের প্রথমদিকে বাঙলা দেশে বড় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত।

"Chatgaon again fell into the hands of the Maghs who did not leave a bird in the air or a beast on the land (from Chatgaon) to Jagdia ; the frontier of Bengal increased the desolation. Thick-kened the jungles, destroyed the Al and closed the road so well that even the snake and wind could not pass through. They built a strong fort and left a large fleet to guard it. Gaining composure of mind from the strength of the place they turned to Bengal and began to plunder it."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইব্রাহিম ফতেহ্ জঙ্গ ব্যতীত কোনো মুঘল সুবাদারই শায়েস্তা খানের আগে এদের দমন করবার চেষ্টা করেননি। ফিরিঙ্গি ও মগ সমন্বিত আরাকানী জলদস্যুরা জলপথে বাঙলাদেশের ভুলুয়া, সন্দ্বীপ, সংগ্রামগড়, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, বাকলা, যশোর, ভূষণা ও হুগলী লুণ্ঠন করত। তারা হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ ও বড়-ছোট নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যেত। হাতের তালু ফুঁড়ে বেত চালিয়ে গরু ছাগলের মতো বেঁধে নৌকার পাটাতনে ঠাঁই দিত। মুরগীকে যেভাবে দানা ছিটিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকেও তেমনি চাউল ছুড়ে দেয়া হত খাবার জন্যে। এ অবহেলা ও পীড়নের পরেও যারা বেঁচে থাকত তাদেরকে ভাগ করে নিত মঘে-পর্তুগীজে। মঘেরা অপহৃত লোকদের অবমাননাকর ও শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করত এবং পর্তুগীজেরা অপহৃত ব্যক্তিদের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বেনেদের কাছে দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলোতে, এমনকি তমলুক আর বালেশ্বরেও দাসরূপে বিক্রয় করত।

৫. কর্ণফুলীর মোহনাস্থিত নদীর দক্ষিণতীরে পর্তুগীজ দস্যুঘাঁটির নাম ছিল ফিরিঙ্গি বন্দর। আরাকানরাজ দস্যুবৃত্তির জন্যে নিজের জাহাজ পাঠাতেন না। তিনি ফিরিঙ্গিদের তার চাকুরে মনে করতেন. এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ও দাসের অর্ধেক নিজে নিতেন।

৬. মঘ-ফিরিঙ্গি দস্যুরা এমন ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে মুঘল নওয়ারা বা নৌ-বাহিনীও এদের দেখলে ভয়ে ছুটে পালাত এবং হার্মাদের কবলে পড়ার চাইতে ডুবে মরাই শ্রেয় মনে করত। পর্তুগীজ দস্যুরা হার্মাদ (আরমাদা দেশীয়) নামে পরিচিত ছিল।

৭. ১৬৬৫ সনে আরাকানরাজ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধে। পীড়নের ভয়ে পর্তুগীজেরা মুঘলদের আশ্রয়ে চলে আসে। যুগদিয়া ও নোয়াখালির থানাদার ফরহাদ খান এদের সবাইকে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করলেন। শায়েস্তা খান পর্তুগীজ কেপ্টেনকে হাত করবার জন্যে ২০০০ টাকা ইনাম এবং মাসিক ৫০০ টাকা বেতন ধার্য করে দিলেন। এদের সহায়তা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ইতিহাসের উপকরণ বিরল। ঐতিহাসিক যুগে চট্টগ্রামের কোনো রাজা-বাদশাহ রাজত্ব করেননি। তাই এর কোনো একক ইতিহাস লিখিত হয়নি। শাসকদের ইতিহাসে কেবল প্রাসঙ্গিকভাবেই চট্টগ্রাম সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা খবর মেলে। এসব খবর জড়ো করে চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করা কঠিন কাজ।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে-কয়টি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্য সমাবেশের প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়নি।

এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ হয়েছে। গৌড়ের সুলতানের, ত্রিপুরার হিন্দুরাজার, আরাকানের বৌদ্ধ নৃপতির এবং খ্রীস্টান পর্তুগীজদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক—ক্ষেত্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবন্দর এবং বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান—এ চারটি ধর্মবিশ্বাসীর আবাসভূমি চট্টগ্রামের মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের, নানা সমস্যার ও বিচিত্র সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ সব-কিছুই তাদের মন, মেজাজ ও মননের উপর প্রভাব রেখে গেছে।

এমনি বিচিত্র আবহে লালিত চট্টগ্রামী মানুষ ধর্মীয় কোন্দল, জাতিবৈরকে তুচ্ছ জেনে এক উদার অথচ স্বধর্ম ও সংস্কৃতি-নিষ্ঠ মনোভঙ্গির অধিকারী হয়েছিল বলে অনুমান করি। কেননা, মধ্যযুগে চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, এসব গ্রন্থে কোথাও বিদ্বিষ্ট মনের পরিচয় নেই। স্বধর্মী রাজার সঙ্গে সাযুজ্যবোধে কেউ বিধর্মী প্রতিবেশীর প্রতি পীড়ন প্রবণ হয়নি—অন্তত সে-প্রমাণ নেই। স্বতন্ত্র থেকেও তারা সদ্ভাব ও সদিচ্ছা বজায় রাখতে জেনেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য থাকে—এই তত্ত্ব ও আপ্তবাক্য মনে হয়, তাদের জীবনে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এর আভাস মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য সংকেত

** নিম্নোক্ত ইতিহাসগ্রন্থে নানা উপকরণ মেলে :

Revenue History of chittagong H. Cotton. 1860. Ahadisul Khawani (Tawrikh-i-Hamidi), K. B. Hamidullah Khan, 1871 (persian), Eastern Bengal District Gazetteer : Chittagong, O' Malley 1908. চাকমা জাতির ইতিহাস–সতীশচন্দ্র ঘোষ : ১৯০৯। এতে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য রয়েছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি তথ্যবহুল উচ্চমানের ইতিহাস। ইসলামাবাদ, –আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৩২৫-২৬ সন (১৯১৮-১৯ খ্রী.) সম্প্রতি বাঙালা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। ১৯৬৪ খ্রী. । চট্টগ্রামের ইতিহাস : পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী। ১৯২০ খ্রী.। A short history of Chittagong. Syed Ahmadul Haq, 1948. চট্টগ্রামের ইতিহাস: পুরানা আমল, নবাবী আমল ও ইংরেজ আমল নামে পুস্তিকা, ১৯৪৯ সনে তিন খণ্ডে প্রকাশিত। History of Chittagong : S M Ali 1964 .

এটি কিছুটা ইতিহাস ও কিছুটা গেজেটিয়ার শ্রেণীর রচনা। এছাড়া চট্টগ্রামের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ মেলে রাজমালা, ত্রিপুর বংশাবলী, চম্পকবিজয় প্রভৃতি ত্রিপুরারাজদের ইতিকথা গ্রন্থে। আরাকানের রাজন্য কাহিনী রাজোয়াঙ (রাজবংশ), স্কট ফেয়ার, হায়ভে প্রভৃতির 'হিসটরী অব বার্মা' স্ব. ই. হল-এর হিসটরী সাউত ইস্ট এশিয়া প্রভৃতি আরাকান-বর্মার ইতিহাসগ্রন্থে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের বাঙ্গালার ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত হিসটরী অব বেঙ্গল' লামা তারা নাথ, মাহুয়ান, ইবন বতুতা, মার্কপলো, ভারথেমা, ম্যানরিক, বারবোসা, ফ্রাঁসোয়া বানিয়ার প্রমুখ পর্যটক বর্ণিত ভ্রমণবৃত্তান্ত, ডেনভারস ও ক্যামপোজ রচিত পর্তুগীজ ইতিহাসে এবং নানা গবেষণাপত্রে।

AMARBOI.COM

১। *Journal of Asiatic society of Bengal (JASB)*, 1898, 21-23.
২। Steingass—*Comprehensive persian—English Dictionary*.
৩। *Proceedings of Pakistan history Conference* 314-15.
৪। Hodivala J S : Studies on Indo Muslim history, 4.
৫। Bernonilli : *Description Historiqu de 'e' Inde*, 1.
৬। D. C. Sarcar : *Select Inscriptions* (SI), 500.
৭। Majumdar R. C; ed : *Histroy of Bengal* (HB), 7-.8
৮। Bagchi P. C. : Pre-*Aryans and pre-Dravidians in India*. পৃ. 73-74
৯। JASB, 1952; 172 . মহাভারত, বন পর্ব—তীর্থযাত্রা।
১০। SI, 82-83.
১১। Si 82-83 : Archaeologial Survey of India: *Report*, 1230 -34, 30-39
১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস : বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (৩য় সং) পৃ. ৩২-৩৩-৩৭-৩৯ : *JASB*: NS XXVIII 127 *Journal of Numismatic Society of India (JNSI)* XIII, 107; *Excavations at Bangarh*, 30-32
১৩। JASB 1953, 174
১৪। JASB (Letters) XVI 1950, 232
১৫। JASB 19, 14, 90 phayre, A : *History of Burma* 45-47, 293-304; Harvey, G E *History of Burma* 137-313, 369-70, Hall, D. E. : *History of South East Asia*. 121, 328-29 : *Bulletin of the school of oriental and African studies* (BLSOAS) XI, 357 -85
১৬। *Bengal past and present. XXXIII* ,1927, 139.
১৭। Harvey, প্রাগুক্ত, ২৩, ১৩৭-৩১৬ : Phayre প্রা. ২২, Hall প্রা. ৩২৯
১৮। *JASB* 1898, 21-23

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯। Hall প্রা ১২৪-২
২০। Dikhsit K N : *Memoirs of the Archaeological Survey of India (MASI)* P. 87, Coin no 55.
২১। Harvey , প্রা . 637, 369-70.
২২। *BLSOAS XI*, p, 357,385, *JASB* 1950, 233.
২৩। এই শাসনটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। HB, I, 29, 31, 126 134
২৪। ঐ, 86-87 note.
২৫। *JASB* N.S *XIX* 375 Basak R G *History of north Eastern India* Calcutta, 1934 *(HNI)* p. 203
২৬। বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস : বাঙলার ইতিহাস ১ম, ২৩৩, *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal* (MASB) I, no-6, 85. *JASB*, NSX 87, *XIX*, 378 *HNI* 202.
২৭। *HB*, I, 87 : *HNI*, 207
২৮। *MASB* I no 6. 86-91 HB I, 16 ; *Epigraphia India* (EI) XVII, 357.
২৯। *JASB* N S X 86-91
৩০। *HB*, I, 130 -31.
৩১। ঐ ২০০ : *EI* ,XII 37.
৩২। *JASB* 1910, 604-*HB*, I, 30, 197, 198 note : *Indian Historical Quarterly (IHQ)* XII, 608-9.
৩৩। *EI*, *XII* 37: Majumdar, NG Inscriptions of Bengal (IB), III, 14.
৩৪। *HB* ,I, 199, 268
৩৫। ঐ, 253, IB, 182.
৩৬। ঐ, ২৫৭-২৫৮ Harvey : প্রা ৬৫৭, ৩০।
৩৭। আবুল ফজল : আইন-এ-আকবরী (জ্যারেটের ইংরাজি অনুবাদ, যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, ১৯৪৯) ২য় খণ্ড ১৩৩।
৩৮। *Periplus of the Erythrian Sea*, Tr. Schoff 47-48, Sachau : Alberuni's India I, 201, 261 .
৩৯। Gibb H A R. tr : *Travels of Ibn Battuta* 567-68, 271, 366 note.
৪০। Nainar S.H. : *Arab Geographers knowledge of South india*, 12, 89: :Elliot-Dowson, *History of India as told by its own historians* 1. 5, 25, 86 90-91, Hodivala, op cit 5, *HBI* 104.
৪১। *JASB*, *XVI*, 1950 232-33 : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৭ পৃ. ২৪-৩৫।
৪২। পুরপুরা, পুরপুর, পুরপ্পুরা (Purappura): *BLSOAS* পৃ. ৩৬৯-৭০; টলেমীর Barakura ইবনে বতুতার Barakan; Katabeda সম্ভবত Kutabdia। এই Katabeda র পরেই bara এটিই সম্ভবত purapqura এবং আকিয়াব ও কুতুবদিয়ার মধ্যস্থলে।
৪৩। *BLSOAS* প্রা. পৃ..৩৭০-৭১।
৪৪। অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি) : HB.
৪৫। ঐ, পৃ ১৯৩. পাদটীকা।
৪৬। Watters ed : Yuan Chunag II, 188; JASB 1914, 86 ; HB I, 17, 47, 49, 51
৪৭। বৃহৎ সংহিতা অধ্যায় ১৫, শ্লোক ৬ – ৮।
৪৮। *JASB* 1914, 86-87 note.
৪৯। *HB* I,17, 51 note

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০। ঐ, পৃ. ৮৫-৮৭।

৫১। JASB (NS), XIX 378; HB I, 60,85-56

৫২। বাড়েলা মূর্তিলিপি : EI XVII 149, ১৮ তম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। রামপাল তাম্রশাসন (শ্রীচন্দ্র) *ibid*, XII, 136-42 কেদারপুর তাম্রশাসন : (ঐ) *ibid* XVII 188-92 ধুলিয়া তাম্রশাসন (ঐ), IB, ১৬৫-৬৬; ইদিলপুর তাম্রশাসন EI; XVII 189-90, IB পৃ ১৬৬-৬৭; বাঘাউরা মূর্তিলিপি EI : XVII, 353-55; নারায়ণপুর মূর্তিলিপি *Indian culture* IX 111-15, ময়নামতিতে প্রাপ্ত লড়হচন্দ্রের ২৩ ও ২৪ রাজ্যাঙ্কে মুদ্রিত দুইটি তাম্র শাসন; পাইকপাড়ায় প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের এবং ঢাকায় দোকানে প্রাপ্ত কল্যাণচন্দ্রের তাম্রশাসন; ভারতবর্ষ ১৩৪৮, IHQ , XVI , 255

৫৩। HBI, 183, 317

৫৪। ঐ পৃ ১৩৭, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৭ ; *Indian culture*, VII 812.

৫৫। HB I, 17

৫৬। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৯ : JASP, VI : 1961, 272; Paul PL *Early History of Bengal* (1939) introduction II-IV

৫৭। HB, I, 128. 135. 193-199 note ; Bheraghat inscription EI, II 11, 15; Rewa stone inscription ,ঐ XXIV, 105, 112

৫৮। HB, I, 201-02, IB, 25; ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৪৪. পৃ ১৬৯।

৫৯। EI, XII, 37, IB ,14

৬০। HB, I, 150, 199, 202, 203, 227, 258 -59

৬১। দামোদর দেবের মেহের ও চাটিগাঁও তাম্রশাসন (১১৫৬, ১১৬৫ শকাব্দ); দশরথ দেবের আদাবাড়ী তাম্রশাসন।

৬২। HB I, 251-257.

৬৩। Harvey op cit 6-7; Hall op cit 124-126.

৬৪। JASP, VI, 1961, 169.

৬৫। Yule, ed Marco polo 197, 204; Harvey *op cit* 30, 49, 65-67

৬৬। Hall, *op, cit* 132; Harvey op cit 24, 31.

৬৭। সৈয়দ আহমাদুল হক : *A short history of chittagong* পৃ. ২; মাহবুবুল আলম: চট্টগ্রামের ইতিহাস, পুরানা আমল (৩য় সং) পৃ. ৩৪ ৩৯।

৬৮। রাজমালা- সম্পাদক: কৈলাস চন্দ্র সিংহ; ২য় ভাগ পৃ. ২৭ আগরতলা, ১৩০৬ সন।

৬৯। *History of Bengal* (H. B.) Vol. II pp. 251-57 Dacca University. 1948.

৭০। Hamid-ullah khan: *Ahdis-ul-Khawanin*, Calcutta, 1871.
J. N. Sarkar : *Studies in Mughal India (studies)*, P 122, Ibn Battuta : Travels tran. H A. R Gibb, PP -267-68. Yule মনে করেন যে সাদকাওয়াঁ (Sadkawan) ও চট্টগ্রাম অভিন্ন। P 66. Shihab uddin Talish *Fathiyyah-i-Ibriyyah* (J N Sarkar : Shaista khan in Bengal, J A S B 1906, PP 257-60.) N K Bhttasali : *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, pp 145-49, Cambridge, 1922

৭১. সত্য কলি বিবাদ সংবাদ (ভূমিকা); সাহিত্য পত্রিকা, ১ ম সংখ্যা, ১৩৬৬ সন। কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য, ঐ ২য় সংখ্যা, ১৩৮১ সন।

৭২। M. S. Khan : 'Badr Maqams or the Shrines of Badr-al-Din-Auliya,' *Journal of the As ociety of Pakistan* (J. A. S. P Vol VII, I PP. 17-46. বদর পীর সম্ভবত : দুইজন

৭৩। মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা ১৯৩৫: পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম ঢাকা ১৯৪৮। M S Khan: পূর্বোক্ত Blochmann, Firozshahi Inscription in the Chhota Dargah , (761 A H) J ASB XXXX II, 18 P. 302

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৪। M. S. Khan : পূর্বোক্ত PP, 3,6 এবং 40
৭৫। H B, II A. H. Dani : *Bibliography) of the Muslim Inscriptions of Bengal, (Bibliography),* Appendix A J A S P II 1957 PP -28-33 আলাওল : (তোহফা, সম্পাদক : আহমদ শরীফ, (ভূমিকা)১৩৬৪ সন ৭০।
৭৬। মুহম্মদ খান: মক্তুল হোসেন, সত্য কলি বিবাদ সংবাদ (ভূমিকা) পূর্বোক্ত। S. M. Ali : 'Arakan Rule in Chittagong' (1550-1666 A . D.) Paper Read in History Conference at Dacca in 1961.
৭৭। Shihabuddin Talish ,পূর্বোক্ত P. 257-60.
৭৮। Yahya Sihrindi : *Tarikh-i-Mubarak Shahi* tran K. K Basu. Baroda 1932, PP. 106-107.
৭৯। P. C Bagchi : 'Political Relations between Bengal and China' *Visva-Bharati Annals* 1945 PP. 127-34; মমতাজুর রহমান তরফদার : চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ২য় সংখ্যা ১৩৬৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শা বছর, ১ম সংস্করণ পৃ.-৯১/১—১০৩/২।
৮০। N K Bhattasali: পূর্বোক্ত PP 119-29
৮১। রাজমালা: পূর্বোক্ত পৃ .৩৬।
৮২। S. H. Askari : 'Correspondence of the two 14th century Sufi Saints of Bihar with the Contemporary Sovereigns of Delhi and Bengal' *Proceedings of the 9 th session of Indian History congress.* 1956. PP. 206-44 : সুখময় মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত পৃ ৯৩
৮৩। A. B. M. Habibullah : 'Arakan' J. A. S. B 1945.
৮৪। Phayre : History of Burma p 171, Harvey : *History of Burma...,* Ch on Arakan.
৮৫। Dani : *Bibliography,* P 28, H. B. Habibullah : *op cit*
৮৬। শমসের গাজীর পুথি।
৮৭। H. B. II . PP. 177 এবং 179.
৮৮। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : কবি ভবানীনাথ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১-২য় সংখ্যা, পৃ..১৬-৩২।
৮৯। সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ.,৬৬-৬৭। Phayre : PP 77-78, Harvey : P 139.
৯০। মাহবুবুল আলম : চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল পৃ. ৫৪-৫৫; S. M. Ali : *History of Chittagong* P 20; S Ahmadul Haq : *A short History of Chittagong* .
৯১। রাজমালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথি : সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত।
৯২। আহমদ শরীফ: বিদ্যাসুন্দরের কবি, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ,১৩৬৪ সন।
৯৩। J J A Campos : *History of the portugelse in Bengal,* de Barros -এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সারাংশ, Calcutta 1919, PP. 28 ও 30. Habibullah : p cit; *Bengal past and present* 1944.
৯৪। মাহবুবুল আলম: পূর্বোক্ত পৃ. ৫৮
৯৫। H. B II 149-50
৯৬। রাজমালা পৃ :
৯৭। মাহবুবুল আলম: পূর্বোক্ত পৃ : ৭৫
৯৮। Harvey, PP 371-72.
৯৯। দৌলতউজীর বাহরম খান: লায়লী মজনু (ভূমিকা) সম্পাদক: আহমদ শরীফ, ঢাকা ১৯৫৭।
১০০। 'Ahdisul khawanin' J. A. S. B 1871, 1872.
১০১। দৌলত উজির : পূর্বোক্ত , ভূমিকা ; 'কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য' পূর্বোক্ত, ২য় সংখ্যা ১৩৬৯ সন। 'বাংলা সাহিত্যের প্রতিপোষক' ' রাগতালনামা।' 'আওরা দ্দ বারোজ প্রশস্তি' 'কবি চুহর'। (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০২। Mirza Nathan : *Baharistan Gheybi*, tran. M I Borah vol, I pp 407, 409, vol II P. 842 'কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য' পূর্বোক্ত পৃ. ২০৮-২০৯।
১০৩। Harvey : P 140.
১০৪। *H. B* II PP 173-74.
১০৫। Habibullah : Op cit.
১০৬। S. Lanepool : *Catalogue of Indian coins*, P 56.
১০৭। রাজমালা : ৫৭-৫৮ H. B. II.
১০৮। N K Bhattasali: Bengal Chiefs struggle, *Bengal, past and present* (B.P. P) July _December 1929.
১০৯। J A S B 1950, P 218.
১১০। 'বিদ্যাসুন্দরের কবি' পূর্বোক্ত; কবি ভবানী নাথ ও রাজা জয়ছন্দ' পূর্বোক্ত।
১১১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৪ সন ,পৃ. ২৬।
১১২। J. A. S. B. 1872 PP , 33-34 (হোসেন শাহের শিলালিপি: ৯১৯ হি: ১৫১৩ খ্রী.)
১১৩। ঐ No II 383.
১১৪। রাজমালা : (সিংহ) পৃ. ৪৪।
১১৫। Bhattasali : B. P. P. পূর্বোক্ত; Blochmann: *Ain-i Akbarti* vol I, preface.
১১৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৪ সন,পৃ.২৬।
১১৭। H. B, II pp 179-80
১১৮। Long : *Analysis of Rajmala* J A S B XIX 1850 রাজমালা (কালিপ্রসন্ন সেন) ২য় তরঙ্গ পৃ. ৭১।
১১৯। *Ain* (Jarret and Sarkar) Vol II Calcutta 1949.
১২০। O : Malley : Eastern Bengal Gazetteers, *Chittagong*, Calcutta 1908. J. N. Sarkar : *Studies* P 122; রাজমালা (সিংহ) পৃ. ৩১৬। Talish : পূর্বোক্ত (Continuation)।
১২১। W Foster: *Early Travels in India* P 26; Manrique : *Travels* (1629-35) Vol I, P, 94 Oxford, 1927
১২২। JN Das Gupta : *Bengal in the sixteenth century* A D 141-42 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। Calcutta 1914.
১২৩। Bhattasali : পূর্বোক্ত B P P July -Dec 1929, রাজমালা (সিংহ) পৃ, ৩১৭। ১৫৩২ শকে এ যুদ্ধ ঘটে বলে উল্লেখ রয়েছে। তারিখটি ভুল।
১২৪। *Ain*, Jarret ও সরকার, P 132
১২৫। K R Qanuago: *Sher shah* p 138, Calcutta 1921. Campos; পূর্বোক্ত pp 30, 36-38, 40, 43; Habibullah পূর্বোক্ত।
১২৬। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : 'চট্টগ্রামে মঘপাঠান রাজত্ব' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৪ সন।
১২৭। রাজমালা (সিংহ) : পৃ. ১৭ ও ৩১৭। এতিম কাসেম, আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১১৬০। সত্য কলি বিবাদ সংবাদ (ভূমিকা), পূর্বোক্ত।
১২৮। Albert Gray (tran) *The Voyage in Francois pyvard* vol I pp 326, 333 Haklyt Society, London ,1887.
১২৯। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০. পৃ. ৯৬।
১৩০। Manrique : পূর্বোক্ত PP X L X N—LI
১৩১। J. A. S. B. 1923.
১৩২। ঐ' 1845.
১৩৩। H. B. II PP 331-32.
১৩৪। ঐ P. 332 .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনপঞ্জি

১৯২১ জন্ম ১৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, সকাল ৯টা-১০টার মধ্যে। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রাম।

পিতা : আবদুল আজিজ (১৮৮০-১৯৪৬); মাতা : সিরাজ খাতুন (১৮৮৮-১৯৮৩)

পিতামহ : মুনশি আইনুদ্দিন (১৮৪০-১৯৩৭)। আবদুল আজিজ আইনুদ্দিনের তৃতীয় সন্তান। অন্যেরা বদিউন্নেসা, আবদুল মজিদ, আবদুল গনি, আবদুল সোবহান। আইনুদ্দিন চট্টগ্রাম জজকোর্টে নকলনবিশ ছিলেন।

পিতা আবদুল আজিজ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজিয়েট স্কুলের কেরানি ছিলেন। পিতামাতার চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র। ভাইবোনেরা মিলে পাঁচজন, যথাক্রমে আহমদ কবীর (১৯০৮-১৯৭২), সাজেদা আরা বেগম, আহমদ সোবহান (১৯১৯-১৯৮৪), আহমদ শরীফ, আহমদ জহীর (মৃত্যু ১৯৮৪), চেমন আরা।

পিতৃব্য ও ফুফা : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) এবং তাঁর স্ত্রী ফুফু বদিউন্নিসা (১৮৭৩-১৯৫৩)। পুত্রহীন এই দম্পতির পোষ্যপুত্ররূপে অত্যধিক স্নেহে ও আদরে লালিত পালিত।

AMARBOI.COM

১৯৩৮ পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।

১৯৪০ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। চট্টগ্রাম কলেজে পড়াকালে কলেজ ম্যাগাজিনে 'ভাষাবিভ্রাট' নামক প্রবন্ধ মুদ্রিত।

১৯৪২ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় নন-ডিস্টিংশন পেয়ে উত্তীর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এমএ প্রথম পর্বে ভর্তি।

১৯৪৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু।

১৯৪৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। এমএ পাসের পর দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি প্রাপ্তি। কিন্তু নৈতিক স্খলন হবে মনে করে এ চাকরি প্রত্যাখ্যান।

১৯৪৫ আগস্ট মাসে লাকসাম পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজে বাংলার অধ্যাপকরূপে যোগদান। এই প্রতিষ্ঠানের ইংরেজির শিক্ষক পরবর্তীকালের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমেদের সাহচর্য ও বন্ধুত্বলাভ।

১৯৪৬ পিতা আবদুল আজিজের মৃত্যু, টাইফয়েড রোগে, ১১ জানুয়ারি।

১৯৪৭ বিয়ে, ফেনীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খানসাহেব শাহাবুদ্দিন মাহমুদের দ্বিতীয়া কন্যা সালেহা মাহমুদের (১৯২৮) সঙ্গে, ৭ নভেম্বর।

১৯৪৮ ডিসেম্বর মাসে নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফেনী ডিগ্রি কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৯ ফেনী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে জুন মাসে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টেন্ট নিযুক্ত। এই পদে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত।

১৯৫০ প্রথম ছেলে রেজভীর (মাহমুদ করিম) জন্ম, ১৮ মার্চ শনিবার। মাহমুদ করিম এখন মেঘনা পেট্রোলিয়ামের নির্বাহী কর্মকর্তা।
রেডিয়োর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান।

১৯৫১ দ্বিতীয় ছেলে ফৈজীর (নেহাল করিম) জন্ম, ২১ নভেম্বর, বুধবার। ডক্টর নেহাল করিম এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

১৯৫২ বাংলা বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার পদে উন্নীত, ১১ আগস্ট।
পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত এবং এই সংঘের সদস্য।

১৯৫৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্ত্রী মাতৃসম ফুফু বদিউন্নিসার মৃত্যু, ২৫ মার্চ, বুধবার, আশি বছর বয়সে।
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবনাবসান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিরাশি বছর বয়সে, ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল সাড়ে দশটায়।
বাংলা বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার থেকে পুনরায় গবেষণা সহকারী।

১৯৫৪ তৃতীয় ও ছোট ছেলে স্বপনের (যাহেদ করিম) জন্ম, ৯ মে রবিবার, যাহেদ করিম এখন সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট।

১৯৫৪-৫৬ মধ্যযুগের কিছু পুথির পাঠ ও সম্পাদনা কাজে নিয়োজিত।

১৯৫৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার পদে উন্নীত, ১৭ অক্টোবর।
দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী মজনু* সম্পাদিত কাব্যের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। উল্লেখ্য, এটি বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। শ্রীধর কবিরাজ বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* পুথির সম্পাদিত পাঠের প্রকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষাসফরে পশ্চিম পাকিস্তানে গমন দু'সপ্তাহের জন্য।

১৯৫৮ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত প্রায় ছয়শ পুথির পরিচায়িকা *পুথি-পরিচিতি* গ্রন্থের সম্পাদনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত। উল্লেখ্য, এটি বাংলা বিভাগের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।
আলাউল রচিত 'তোহফা' সম্পাদিত কাব্যের প্রকাশ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এতিম কাসেম রচিত *আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি* সম্পাদিত রচনার প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

১৯৫৯ মুহম্মদ খান বিরচিত *সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ* বা *যুগ-সংবাদ* ও মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* সম্পাদিত কাব্যদ্বয়ের প্রকাশ। প্রথমটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; দ্বিতীয়টি বাংলা একাডেমী থেকে। মুহম্মদ ফসীহ রচিত *আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত* ও শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত *যয়নবের চৌতিশা* সম্পাদিত রচনার প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

১৯৬০ বাংলা বিভাগে স্থায়ী লেকচারার পদে বহাল, ৭ আগস্ট। এই পদে থেকেই কয়েক বছর চাকরির পর সিনিয়র লেকচারার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ আকিল রচিত *মুসানামা* সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

১৯৬১ *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* ও *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা* (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে) সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬২ *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা গঠিত এবং এই সংঘের সদস্য; পরে এর কোষাধ্যক্ষ।

পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির লক্ষ্যে ছাত্রলীগের নেতা সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে গঠিত 'নিউক্লিয়াস' স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ।

১৯৬৩ আলাউল রচিত *রাগতালনামা* ও *পদাবলী* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

বাংলা বিভাগ আয়োজিত *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* অনুষ্ঠানে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলোচক।

ছাত্রনেতা আবদুল আজিজ বাগমারের উদ্যোগে গঠিত গোপন সংগঠন *অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার* সংক্ষেপে *অপূর্ব সংসদ* থেকে প্রচারিত পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার রচয়িতা।

১৯৬৪ মধ্যযুগের কবি জয়েনউদ্দীনের *রসুল বিজয়* সম্পাদিত কাব্যের প্রকাশ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬৫ মুজাম্মিল রচিত *নীতিশাস্ত্র বার্তা* সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

অপূর্ব সংসদ কর্তৃক প্রচারিত 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামনা, পূর্বপাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করার এবং বাংলা ভাষায় জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাব। প্রবন্ধটির শেষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবসি' সংগীতটির প্রথম কয়েক লাইন যুক্ত হয়। এটি অপূর্ব-এর জাতীয় সংগীত এবং এই সংগীতকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৬৬ বিভিন্ন দোভাষী কবির রচনা সংকলন *পুথির ফসল* সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশ, পাকিস্তান পাবলিকেশনস।

শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী প্রকাশিত, বাংলা একাডেমী।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত, ২০ ডিসেম্বর ; এবং এ পরিষদের সক্রিয় সদস্য।

১৯৬৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ। অভিসন্দর্ভের বিষয় : সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ।

পিএইচ ডি লাভ উপলক্ষে চট্টগ্রাম সমিতি কর্তৃক সংবর্ধিত, বাংলা একাডেমীতে; ১৮ মার্চ।

মধ্যযুগের রাগতালনামা ও কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত *চন্দ্রাবতী* সম্পাদিত কাব্যদ্বয়ের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

গুল বকশ রচিত *খণ্ডনে কুকির হামলার ইতিকথা* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের প্রতিবাদে বিবৃতিদানকারীদের একজন।

১৯৬৮ প্রথম প্রবন্ধ সংকলন *বিচিত চিন্তার* প্রকাশ, কথাকলি, ঢাকা। এ গ্রন্থে ১৯৫১ থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিংবা সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচিত নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ সংকলিত।

বিদ্যাপতি রচিত *ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী* সম্পাদিত পুথির মুদ্রণ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা।

গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খানের শাসনের দশ বছরপূর্তি উপলক্ষে উন্নয়ন দশক উদযাপনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। —প্রবন্ধ পাঠ, ১ ডিসেম্বর; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতি, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর।

১৯৬৯ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* গ্রন্থের প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বাঙলার সূফী সাহিত্য ও আফজল আলীর *নসিহতনামা* সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা গ্রন্থের জন্য দাউদ সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাম হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার ক্রান্তিসময়ে এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৯-৭৩।

লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠিত এবং এর সদস্য।

লেখক-শিল্পীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর পাকিস্তানী শাসনগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদসভায় অন্যতম বক্তা, ১৫ জানুয়ারি।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্বপাকিস্তানের নাম 'বাংলা' রাখার সাতজন প্রস্তাবকের অন্যতম, ৩০ নভেম্বর।

বাংলা একাডেমীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করার দাবি, ২৪ ডিসেম্বর।

এক দুর্ঘটনায় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জীবনাবসান, ৩রা জুন। ডক্টর শরীফের শিক্ষক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনাবসান, ১৩ জুলাই।

মুনীর চৌধুরীর অধ্যক্ষতাকালে বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা *সাহিত্য পত্রিকার* সম্পাদক।

১৯৭০ বাংলা বিভাগের রীডার (বর্তমানে এসোসিয়েট প্রফেসর বা সহযোগী অধ্যাপক) পদে উন্নীত, ২৭ জুলাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে পিএইচ ডি সনদ গ্রহণ।

স্বদেশ অন্বেষা গ্রন্থের প্রকাশ, খান ব্রাদার্স, ঢাকা।

জীবনে সমাজে সাহিত্যে গ্রন্থের প্রকাশ, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা।

লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১ মার্চ অপ্রত্যাশিতভাবে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সাহসী ভূমিকা পালন। ২ মার্চ গঠিত লেখক সংগ্রাম শিবিরের সভাপতি।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংগ্রামী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরিচালক ও সভাপতি, ৫ মার্চ।

বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত লেখক সংগ্রাম শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব, ১৪ মার্চ।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে *লেখক সংগ্রাম শিবির* আয়োজিত বিপ্লবী কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানের সভাপতি, ২১ মার্চ।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে 'ভবিষ্যতের বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ, ২৩ মার্চ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পরে মুক্তিযুদ্ধের সবটা সময় গোপন অবস্থান গ্রহণ।

১৯৭২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত দুই একদিন আগে স্বাধীনতা-বিরোধী ঘাতকদের হাতে মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশার নৃশংস হত্যার কারণে বাংলা বিভাগের বিপর্যস্ত অবস্থায় বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে বিভাগের শিক্ষক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ কবীরের মৃত্যু।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনের আলোচনা সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে রবীন্দ্র গুণগ্রাহীদের প্রতিক্রিয়া এবং আহমদ শরীফকে রবীন্দ্র-বিরোধী বলে দেখানোর চেষ্টা।

বাংলা বিভাগের প্রফেসর পদে উন্নীত, ৪ নভেম্বর।

পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ *সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*–এর প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

১৯৭৩ *তামাকু পুরাণ* ও উইলিয়ম কেরীর *ভাষাকথাক্রম ব্যাকরণ* সম্পাদিত রচনা দুটির প্রকাশ— *প্রথমটি ইতিহাস পরিষদ পত্রিকায়*, দ্বিতীয়টি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকা *ভাষা সাহিত্য পত্র-এ*।

বাউল তত্ত্ব ও *হিন্দু কবির পদসাহিত্য* গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত, দুই বছরের জন্য। প্রথমবার ডীন হিসেবে পঁচাত্তর পর্যন্ত কর্মরত।

নবগঠিত সুকান্ত একাডেমীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং সুকান্তকে একালের প্রধান কবি আখ্যাদান।

১৯৭৪ ঢাকার দুটি প্রকাশনা সংস্থা কথাকলি ও মুক্তধারা থেকে যথাক্রমে *যুগযন্ত্রণা* ও *কালিক ভাবনা* গ্রন্থ দুটির প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি গঠিত, ৩০ মার্চ ; এবং এই কমিটির সভাপতি।

মন্বন্তর প্রতিরোধ কমিটি গঠিত, ১১ অক্টোবর এবং এই আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য।

১৯৭৫ দোনা গাজী রচিত *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* সম্পাদিত কাব্যের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি; কার্যকাল ৭৫-৭৬। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন। বাকশালে যোগদানের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ।

ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ, ১৫ অক্টোবর থেকে।

১৯৭৬ *সওয়াল সাহিত্য* সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

আসাদ দিবস উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান।

সভাপতি, সংযুক্ত একুশে উদযাপন সাংস্কৃতিক কমিটি।

আহ্বায়ক, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি।

সভাপতি, বাংলাদেশ লেখক শিবির, কার্যকাল ১৯৭৬-১৯৮১।

সভাপতি, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, গঠিত ১৯৭৬ ; ১৯৯৪ পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিসি প্যানেলের প্রার্থী, কিন্তু বাকশাল আমলের সিনেটরদের ভোট না পাওয়ায় নির্বাচনে বৈফল্য।

১৯৭৭ আলাউলের *সিকান্দারনামা* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ গ্রন্থ প্রকাশ, মুক্তধারা।

দ্বিতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত, জুলাই ১৯৭৭।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর স্মৃতি বক্তৃতা দান, ১০ জানুয়ারি।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক।

বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ায় এবং রাজাকারদের পুনর্বাসিত করার জন্য সামরিক শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সভায় এবং লেখক শিবিরের সভাগুলোতে বুদ্ধিজীবীর সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ।

১৯৭৮ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)* গ্রন্থের প্রকাশ, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* ও *রসুলচরিত* এবং শেখ মুতালিবের *কিফায়েতুল মুসল্লিন* ও *কায়দানী কিতাব* সম্পাদিত পুথিগুলোর প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

ব্রজমোহন দাসের *চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ* সম্পাদিত পুথির মুদ্রণ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভাপতি, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, গঠিত ১৭ জানুয়ারি।
বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানের কার্যকাল সমাপ্ত, ১১ ডিসেম্বর।

১৯৭৯ *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* গ্রন্থের প্রকাশ, অক্ষর, ঢাকা।
কবিচন্দ্র মিশ্র রচিত *গৌরীমঙ্গল* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, পাণ্ডুলিপি, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতাদান, ১৯ এপ্রিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত তৃতীয়বারের মতো।

১৯৮০ বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক লাভ।

১৯৮১ সভাপতি, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসীবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি, ২৮ এপ্রিলে গঠিত।
সভাপতি, কর্নেল তাহের সংসদ, ৫ জুলাই গঠিত।
সভাপতি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাগরিকদের জাতীয় কমিটি, ২৮ জুলাই গঠিত।
সভাপতি, আসামের বিখ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংবর্ধনা সভা, ২ মার্চ।
চতুর্থবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত।

১৯৮২ সভাপতি, ডারউইন মৃত্যু শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, ২৪ ডিসেম্বর গঠিত।
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মৃত্যু, ১৬ ফেব্রুয়ারি।

১৯৮৩ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)* গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।
সভাপতি, জানুয়ারি মাসে গঠিত কার্ল মার্কস শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি।
বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি হিসেবে এরশাদ সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের সূত্র ধরে সারাদেশে বিক্ষোভ ও আন্দোলন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপনা থেকে অবসরগ্রহণ, ৩০ জুন। কলা অনুষদের ডীনের কার্যকালও সমাপ্ত, ৩০ জুন। যদিও প্রকৃত জন্মসন ১৯২১, সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯২২, সুতরাং ষাট বছর পূর্তি ১৯৮২ সানে। ডক্টর শরীফের বিপুল পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের কারণ, অথচ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এক বছরের বেশি অতিরিক্ত চাকরি করতে দেয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় আর কোনোভাবে তাঁকে অধ্যাপনার বা গবেষণার কাজে সংযুক্ত রাখতে চায়নি। সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি 'এমিরিটাস প্রফেসর' হতে পারেন নি।

১৯৮৪ বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা দান ২০, ২১, ২২ সেপ্টেম্বর। অলক্ত সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার লাভ।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগের কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক পদে যোগদান।
১৯৮৬ পর্যন্ত এ পদে কার্যরত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* গ্রন্থের ভূমিকা সমাপ্ত করা (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মৃত্যুজনিত কারণে)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৫ *কালের দর্পণে স্বদেশ* গ্রন্থের প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।
মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থের (*বিচিত চিন্তা* গ্রন্থভুক্ত মধ্যযুগের *বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াপত্র* দীর্ঘ রচনার সামান্য পরিমার্জিত রূপ) প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র প্রচ্ছদ ব্যক্তিত্ব, ১৫ ফেব্রুয়ারি।
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের সদস্য, ২২ আগস্ট গঠিত এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ।

১৯৮৬ দুটি প্রকাশিত গ্রন্থ– *বাঙলাভাষা সংস্কার আন্দোলন*, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি।
ইদানীং আমরা, মুক্তধারা, ঢাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের মানববিদ্যা বক্তৃতাদান, ৬ আগস্ট।
চট্টগ্রাম সংস্কৃতি পরিষদ পদক লাভ ও সংবর্ধনা, ৫ মার্চ।

১৯৮৭ প্রকাশিত গ্রন্থ –*বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা* , ইউপিএল, ঢাকা।
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বাংলা একাডেমী।
এবং *আরো ইত্যাদি*, মাওলা ব্রাদার্স।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোবিন্দ দেব স্মারক বক্তৃতাদান, ২০ জুলাই।
কাজী নুরুজ্জামান ও শাহরিয়ার কবির সহযোগে *একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়* গ্রন্থের সম্পাদনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র।
এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নিয়াজ জামান–Genocide '71-An account of the killers and collaborators। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র এটিও প্রকাশ করে। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নামও সংযুক্ত হয়।

১৯৮৮ ৬৮তম জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বিশেষভাবে সংবর্ধিত, ২৪ ফেব্রুয়ারি।
এরশাদ সরকার কর্তৃক স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি প্রবর্তন করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন।
বাউল কবি ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

১৯৮৯ কর্নেল তাহের সংসদ আয়োজিত সভায় 'বাংলার বিপ্লবী পটভূমি' বিষয়ে স্মারক বক্তৃতাদান এবং ঐ শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশ।
বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি হিসেবে এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন।
মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার লাভ ও সংবর্ধনা, ৬ ফেব্রুয়ারি।
ঋত্বিজ শিল্পগোষ্ঠীর পদক লাভ ও সংবর্ধনা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।
অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংবর্ধনা সভার সভাপতি, ৯ আগস্ট, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯০ তিনটি গ্রন্থের প্রকাশ—*একালে নজরুল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
মানবতা ও গণমুক্তি, ইউপিএল, ঢাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতাদান, ১৪ সেপ্টেম্বর।
বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি ও বরেণ্য বুদ্ধিজীবী হিসেবে আন্তর্জাতিক জগতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশী রাজনীতিতে নানা অশুভ তৎপরতার বিশেষ করে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিদান, ৭ নভেম্বর। সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন দাবিতে বিবৃতিদান, ২৬ ডিসেম্বর।
সভাপতি, উপসাগরীয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা কমিটি।
সভাপতি, স্বদেশ চিন্তা সংঘ, ১৯৯০-তে গঠিত। আমৃত্যু এ সংঘের সভাপতি।

১৯৯১ দুটি গ্রন্থের প্রকাশনা— *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা*, প্রসূন প্রকাশনা, ঢাকা। *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র ভাবনা*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একুশে পদক লাভ।
The Humanist and Ethical Association of Bangladesh-এর First National Humanist Award লাভ, ২৫ ডিসেম্বর।

১৯৯২ উপদেষ্টা, ১৯ জানুয়ারিতে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি।
বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে আলোচনা সভার সভাপতির ভাষণে বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী ধর্মান্ধ অপশক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান, ২১ ফেব্রুয়ারি।
অন্যতম বিচারক—২৬ মার্চ ১৯৯২ ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গঠিত গণ-আদালত-১।
ঘাতক দালাল ও মৌলবাদীদের নানা প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ তৎপরতা ও তাদের মদদদাতাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নানা সভাসমিতিতে বক্তব্যদান।
আয়োজক, নভেম্বর মাসে সংগঠিত ভিক্টর অ্যাবিমেল গুজমানের জীবন রক্ষার আন্তর্জাতিক জরুরী কমিটি, বাংলাদেশ।
কবি মতিউর রহমান স্মারক বক্তৃতাদান, ২ ও ৩ মার্চ (বিষয় : সংস্কৃতি)।
তিনটি গ্রন্থের প্রকাশনা : *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, সাহিত্যলোক (কলিকাতা)।
জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন, বস্তুপ্রকাশ, ঢাকা।
সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রধান সম্পাদক, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী।
বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ঐক্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণদান, টিএসসির সড়কদ্বীপ, ২৪ অক্টোবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২ নভেম্বর জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে স্বদেশচিন্তা সংঘের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ নিয়ে সরকারী প্রশ্রয়ে মৌলবাদী চক্রের দেশব্যাপী ঘৃণ্য অবস্থার সৃষ্টি। মৌলবাদী পত্রিকাগুলোরও জঘন্য ভূমিকা। এরই জের ধরে আহমদ শরীফকে হত্যার হুমকি, তাঁকে মুরতাদ ঘোষণা, তাঁর বাসায় বোমা নিক্ষেপ এবং দেশের নানা জায়গা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু।

১৯৯৩ তিনটি গ্রন্থের প্রকাশ—*শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি*, বস্তুপ্রকাশ, ঢাকা।

সংকট, জীবনে ও মননে, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

কলিকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি লাভ, ৭ মে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বক্তৃতাদান, ২১ মে।

সাহিত্য আকাদেমির কলকাতাস্থ কেন্দ্রে বক্তৃতাদান।

কমরেড মাও-সে-তুঙ জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য।

কমরেড চারু মজুমদার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য এবং টিএসসির সড়কদ্বীপে অনুষ্ঠিত 'নকশালবাড়ি ও চারু মজুমদার' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, ২৪ অক্টোবর।

প্রয়াত সমাজতন্ত্রী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের স্মরণসভায় সমাজতন্ত্রের জয়গান এবং বাংলাদেশের জন্য সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ।

টিএসসি সেমিনার কক্ষে স্বদেশচিন্তা সংঘ আয়োজিত 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে' আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ার আহ্বান, ১০ জুলাই।

স্বদেশচিন্তা সংঘের সভাপতি হিসেবে তসলিমা নাসরিনের *লজ্জা* উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিদান।

কর্নেল তাহেরের ১৭তম হত্যাবার্ষিকীতে আলোচনা সভার সভাপতি, ২০ জুলাই।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের অষ্টম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধক, ৭ সেপ্টেম্বর।

টিএসসিতে স্বদেশচিন্তা সংঘের 'এনজিও প্রসঙ্গে' সভায় সভাপতি, ৪ নভেম্বর।

কর্নেল তাহের সংসদ আয়োজিত *বাংলাদেশের আমলাচক্র : জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের অন্তরায়* সেমিনারের সভাপতি, ৬ নভেম্বর।

শত্রু সম্পত্তি বিক্রয়ের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অন্যতম বিবৃতিদাতা, ১৯ নভেম্বর।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে বক্তৃতাদান, ৭ ফেব্রুয়ারি।

১৯৯৪ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ — *প্রগতির বাধা ও পন্থা*, সন্দেশ, ঢাকা।

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা, *চার্বাক*, ঢাকা।

পঠিতব্য বক্তৃতার ব্যাপারে আপত্তি উঠায় বাঙলা একাডেমীর ২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান বর্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টার দা সূর্যসেনের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদের সদস্য এবং এই উপলক্ষে টিএসসিতে আয়োজিত সভায় সূর্যসেনকে জাতীয় বীর আখ্যাদান।

৬ আগস্ট গঠিত সিরাজ সিকদারের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে অন্যতম বক্তা, টিএসসির সড়কদ্বীপ, ৭ ফেব্রুয়ারি।

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সংহতি সমাবেশে বক্তৃতাদান, তোপখানা রোড, ঢাকা ৭ সেপ্টেম্বর।

কর্নেল তাহের স্মৃতি সংসদ আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব, টিএসসি মিলনায়তন, ৬ নভেম্বর এবং আলোচনায় তাহের হত্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা।

১৯৯৫ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ—*সময় সমাজ মানুষ,* বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।

দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও সাম্য, আলীগড় লাইব্রেরি, ঢাকা।

সতেরো শতকের কবি মুকুল ওরফে মঙ্গলের *শাহজালাল মধুমালা উপাখ্যান* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রোসাঙ্গ কবি মর্দানের *নসিব কথা* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত, ২৩ সেপ্টেম্বর।

আয়োজক, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মৃত্যু শতবর্ষ উদযাপন কমিটি।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের পক্ষে বক্তব্য দান, রমনা গ্রীন, ঢাকা, ৪ মে।

স্বদেশ চিন্তা সংঘের 'এনজিওদের নির্বাচন ভাবনা' বিষয়ক আলোচনা সভায় বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সুবিধাবাদিতার নিন্দা জ্ঞাপন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ২২ জুলাই।

সরকার হুমায়ুন আজাদের *নারী* গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করাতে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় লেখকের মুক্তচিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা নস্যাৎ প্রয়াসের নিন্দা, টিএসসি, ২৭ নভেম্বর।

১৯৯৬ কবি শমসের আলীর *রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

মাওলানা ভাসানীর বিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভার বিশেষ বক্তা, পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর।

মরণোত্তর দেহ ধানমন্ডীস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি ইত্যাদি শেখার জন্য দান করার অসিয়তনামায় স্বাক্ষর, ৩১ ডিসেম্বর।

১৯৯৭ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ—*স্বদেশ চিন্তা,* সন্দেশ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।

রোসাঙ্গ কবি আবদুল করিম খোন্দকারের *হাজার মসায়েল* ও *নূরনামা* এবং নসরুল্লাহ খোন্দকারের *শরীয়তনামা* সম্পাদিত পুথিদ্বয়ের প্রকাশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নসরুল্লাহ খোন্দকারের *মুসার সওয়াল* সম্পাদিত পুথির প্রকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢা. বি.।

আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতাদান, ১০ এপ্রিল।

সভাপতি, কৃষক ফেডারেশন আয়োজিত প্রয়াত কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার খান স্মরণসভা, ১৩ মার্চ।

১৯৯৮ চারটি গ্রন্থের প্রকাশ— *উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা,* মুক্তধারা, ঢাকা।

মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনা, ঢাকা।

স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

বিশ শতকে বাঙালী, ঈক্ষণ, ঢাকা,

ছলছুতো অবলম্বন করে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের ইরাকী জনগণের উপর হামলার প্রতিবাদে বিবৃতিদান, ১৭ ডিসেম্বর।

এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আখ্যাদান এবং এগুলো বন্ধ করার দাবি।

বুকে ঠাণ্ডা লাগার কারণে অসুস্থতা, নভেম্বর-ডিসেম্বর।

১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ* প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নতুনভাবে বিন্যস্ত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)* গ্রন্থের প্রকাশ, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ঢাকা।

সিরাজ সিকদার হত্যার ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান, ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তন, ২ জানুয়ারি।

উনআশিতম জন্মদিন উদযাপন, ১৩ ফেব্রুয়ারি।

'ডেইলি স্টার' পত্রিকায় দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দান, ১৯ ফেব্রুয়ারি।

বামপন্থীদের একত্র করার চিন্তাভাবনা।

অসুস্থতা বোধ, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে। মধ্যরাতে হৃদরোগে আক্রান্ত; হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়ার পথে মৃত্যু, মঙ্গলবার রাত ১-৪০ মিনিটে। ইংরেজি তারিখ গণনার হিসেবে মৃত্যুদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার।

চোখ দুটো 'সন্ধানী'কে দান। ২৮ তারিখ রবিবার দুপুর পর্যন্ত মরদেহ বারডেম হাসপাতালে সংরক্ষণ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মরদেহ আনয়ন। সন্ধ্যার পূর্বপর্যন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বানুষ্ঠান। এরপর মরদেহ একটি গাড়িতে তুলে শোভাযাত্রা করে ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে আনয়ন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ডক্টর আহমদ শরীফের মরদেহ অর্পণ।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ :

বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ	আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়	ঐ
কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা	ঐ
আহমদ শরীফ রচনাবলী (১ম খণ্ড)	ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ পরিচিতি

বিচিত চিন্তা

'বিচিত চিন্তা' আহমদ শরীফের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন। এই সংকলনের প্রকাশ হয়েছিল ১৯৬৮ সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। বইটির প্রকাশক জনৈক খায়রুল আলম চৌধুরী, মুদ্রক, কথাকলি মুদ্রণীর আনোয়ার আলম চৌধুরী, আর পরিবেশক- চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা। এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তখনকার উদীয়মান তরুণ শিল্পী হাশেম খান। বইয়ের দাম এগারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১৯৭৫-এর নভেম্বরে প্রাগুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে, তখন দাম হয় পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা আখ্যাপত্র ও সূচিপত্র বাদ দিয়ে ৪১৮।

আহমদ শরীফ তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই উৎসর্গ করেছেন তাঁর ফুফু বদিউননিসাকে। বদিউননিসা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্ত্রী। ১৯৫৩ সনে তিনি মারা যান। এই সেই ফুফু যিনি আহমদ শরীফকে শৈশবে পরম স্নেহে ও আদরে পুত্রবৎ লালন-পালন করেছেন। সুতরাং বদিউননিসা আহমদ শরীফের 'জননীস্বরূপা ফুফু আম্মা' তো বটেই।

AMARBOI.COM

চল্লিশের দশকে লেখালেখি শুরু করলেও আহমদ শরীফ সংস্কৃতিচর্চার এই গুরুতর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন পঞ্চাশের দশকে। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন এবং পুথি-সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করছেন। এর মধ্যে তিনি 'লায়লী মজনু' এবং আরো কয়েকটি পুথির সম্পাদনার কাজ করছেন। ফাঁকে ফাঁকে লিখছেন পত্র-পত্রিকায়, প্রায় নিয়মিত ভাবেই। সে আমলের আজাদ, ইত্তেহাদ, ইনসাফ, ইত্তেফাক, মিল্লাত, সোনার বাংলা, সওগাত, নওবাহার, মোহাম্মদী, কাফেলা, মাহেনও, দিলরুবা ইত্যাদি দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে চলেছেন। গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করছেন 'সাহিত্য পত্রিকা'য় কিংবা বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা'য়। ১৯৬৭-তে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের পর অনুভব করলেন তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন বের হওয়া উচিত। ততদিনে পত্র-পত্রিকায় ও সাময়িকীতে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে। এগুলো থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন হল 'বিচিত চিন্তা'। বিশেষভাবে চয়িত অর্থেই প্রবন্ধ সংকলনের নামকরণ। সংকলন প্রসঙ্গে বইটির আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে–

> সংকলিত রচনাগুলো পনেরো বছরের পরিসরে বিভিন্নমুখী অনুভব চিন্তার ফসল। কালিক ব্যবধান ও বিষয়গত বিচ্ছিন্নতা এ ধরনের লেখায় যুক্তির ও ভাবনার পারম্পর্য রক্ষার অন্তরায়। লেখক যে 'শ্রেয়'-এর সন্ধানে ব্যাকুল ও দিশেহারা– এই মানস-দ্বন্দ্ব, চিন্তার অসংগতি ও বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতা তারই পরিচায়ক।

'বিচিত চিন্তা'য় মোট বায়ান্নটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। যদিও কোথায়ও উল্লেখ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি, তবু ধারণা করতে অসুবিধে নেই যে ভাষা শহীদ দিবসে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই বায়ান্নো সংখ্যার তাৎপর্য। বায়ান্নোটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য চিন্তা', 'সংস্কৃতি চিন্তা' ও 'সাহিত্যিক চিন্তা' এই তিনটি উপশিরোনামায় বিভক্ত। 'সাহিত্য চিন্তা'য় উনিশটি, 'সংস্কৃতি চিন্তা'য় চৌদ্দটি, আর 'সাহিত্যিক চিন্তা'য় উনিশটি–মোট বায়ান্নোটি প্রবন্ধ বায়ান্নো সনের বাংলা ভাষা আন্দোলনের কথা মনে রেখেই চয়িত।

উল্লেখিত হয়েছে যে সংকলিত প্রবন্ধগুলো আগেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' রচনাটি পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি। রচনার দৈর্ঘ্য এর কারণ হতে পারে। আহমদ শরীফ এ রচনাটি তৈরি করেছিলেন ১৯৬০ সালে। ১৯৬২ সালের 'সওগাত' পত্রিকায় 'মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' নামের যে প্রবন্ধটি বের হয়েছিল তা এ রচনাজাত। 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' আহমদ শরীফের একটি অতি সুখ্যাত রচনা। সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় তথ্য ও বিশ্লেষণের এমন সুমিত সমন্বয় কম দেখা যায়। একেবারেই বাহুল্য বর্জিত নির্মেদ রচনা, অথচ পুরো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের, সংবাদ ও চিত্র এতে চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। রচনাটির বাড়তি আকর্ষণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাসমূহ ও কবিদের নিয়ে তৈরি এক ছকচিত্র। আগ্রহী পাঠকেরা কিংবা অনুসন্ধিৎসুরা এই ছকচিত্র অবলোকন করলেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়ে থাকেন। এই সুদীর্ঘ রচনাটি আলাদা গ্রন্থের মর্যাদাও পেতে পারত। কিন্তু ঐ সময় আহমদ শরীফ এ রচনাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থে রূপ দেন নি, 'বিচিত চিন্তা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রাখতে পছন্দ করেছেন। অবশ্য বহু বছর পরে 'বিচিত চিন্তা' গ্রন্থভুক্ত 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র' রচনাটি সামান্য ভূমিকা ও পরিমার্জনাসহ 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য' নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৮৪)।

AMARBOI.COM

'বিচিত চিন্তা' সংকলনের প্রবন্ধগুলো যে যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার বিবরণ :

মহাকবি কায়কোবাদ	:	মাহে নও, জুলাই ১৯৫১
সাময়িক পত্র	:	দৈনিক মিল্লাত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
মানববিদ্যা	:	এ প্রবন্ধটি 'শিক্ষা' নামে ছাপা হয়েছিল ইনসাফ পত্রিকায়, ১০ আগস্ট ১৯৫২। 'বিচিত চিন্তা'য় সংকলনের সময় পরিবর্তিত নাম 'মানববিদ্যা'।
বুর্জোয়া সাহিত্য বনাম গণসাহিত্য	:	মিল্লাত, ১১ মে ১৯৫২
গণসাহিত্য	:	মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৫৮। এই প্রবন্ধটি অন্য অনেক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
অতীন্দ্রিয়লোকে রবীন্দ্রনাথ	:	সোনার বাংলা, ২০ বৈশাখ, ১৩৫৯
নজরুলের কাব্যপ্রেরণার উৎস	:	মিল্লাত, ২৫মে ১৯৫২
নজরুলের কাব্যসাধনার লক্ষ্য	:	আজাদ, ২৫মে ১৯৫২
নজরুল কাব্যে প্রেম	:	মাহে নও, মে ১৯৫৭। প্রবন্ধটি ফজলুল হক ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৫৯)
নজরুল ইসলামের ধর্ম	:	সোনার বাংলা, ২৪মে ১৯৫২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা	:	মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৫৯। এই প্রবন্ধটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। 'আজাদ' পত্রিকায় তালিম হোসেন ও ফররুখ আহমেদ প্রতিবাদ লেখেন। সংবাদ এ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে লেখে। আজাদ-সংবাদের এই বাদানুবাদে অবশ্য ডক্টর শরীফ নিশ্চুপই ছিলেন।
মানুষের সাধনা	:	মিল্লাত, আযাদী সংখ্যা ১৪ আগস্ট ১৯৫২
সাহিত্যে আদর্শবাদ ও অর্ডিন্যান্স	:	মিল্লাত, ১৯ অক্টোবর ১৯৫২
সাহিত্যের স্বরূপ	:	কাফেলা, ঈদ সংখ্যা ১৯৫৩
শাহাদৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য	:	মাহে নও, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪
দোভাষী পুথির ভাষা	:	দিলরুবা, আগস্ট ১৯৫৫
সৈয়দ এমদাদ আলীর সাধনা	:	প্রবাহ, ডিসেম্বর ১৯৫৬
জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের মূল্য	:	সমকাল, ১৯৫৮

সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা : সওগাত, ডিসেম্বর ১৯৫৯

কথাসাহিত্যের সমস্যা ও বিষয়বস্তু	:	এটি প্রথমে ঢাকা হল সাহিত্য সভায় ৪. ৮. ১৯৫৮ সনে পঠিত হয়েছিল। পরে সমকাল পত্রিকায় ১৯৫৮-এ প্রথম কিস্তি, ১৯৫৯ দ্বিতীয় কিস্তি ছাপা হয়।
বিকাশের পথে মানবতা	:	ঢাকা হল ম্যাগাজিন, ১৯৫৯
কবিতার কথা	:	সওগাত, ১৯৫৯
নজরুল ইসলাম	:	এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে : উইমেন্স হল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, ১৯৫৯।
ভাষার কথা	:	সমকাল, ১৩৬৬
স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর	:	উত্তরণ, ১৯৬০
ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র	:	সংবাদ, ঈদ সংখ্যা ১৯৬০
সাহিত্যে রূপপ্রতীক	:	সওগাত, ১৯৬০
জীবনবোধ ও সংগ্রাম	:	সংবাদ, ১লা বৈশাখ, ১৯৬০
যুগন্ধর কবি নজরুল	:	চট্টগ্রামে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে পড়েছিলেন, পরে ফজলুল হক হল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত, ১৯৬০।
বঙ্কিম মানস	:	ইকবাল হল ম্যাগাজিন ১৯৬০
আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান	:	বেতার কথিকা, ১৩ অক্টোবর ১৯৬০
কেজো ও অকেজো সাহিত্য	:	ঢাকা হল ম্যাগাজিন, ১৯৬০
নজরুল মানস	:	ফজলুল হক ম্যাগাজিন, ১৯৬১
নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদন	:	ঢাকা হল ম্যাগাজিন, ১৯৬২
মধুসূদনের অন্তর্লোক	:	বেতার কথিকা, ১৯৬২
বাউল সাহিত্য	:	মাহে নও, ১৯৬২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধের রচনা-সন

রবীন্দ্রনাথ	:	১৯৬১, রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীর সময়
স্বাতন্ত্র্য	:	১৯৬২
ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা	:	১৯৬৩
পুথি সাহিত্যের ইতিকথা	:	১৯৬৩
সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য	:	১৯৬৩
জীবনশিল্পী	:	১৯৬৩
দেশ জাত ধর্ম	:	১৯৬৩
সংস্কৃতি	:	১৯৬৩
দুর্দিন	:	১৯৬৩
বিশ্বের নাগরিক	:	১৯৬৩
সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা	:	১৯৬৭
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে	:	১৯৬৭

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা

AMARBOI.COM

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা' আহমদ শরীফের দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন। এই সংকলনটির প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৬ (সেপ্টেম্বর ১৯৬৯); প্রকাশক : আহমেদ আতিকুল মাওলা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১; মুদ্রাকর : এম. এস. রহমান, গ্রীনল্যান্ড প্রেস, ২৪, মোহিনী দাস লেন, ঢাকা-১। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী; মূল্য : ছয় টাকা। আহমদ শরীফ এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর মা সিরাজ খাতুনকে। উৎসর্গ পত্রের কথাগুলো এইরূপ–

মা, তোমার নাম সিরাজ,
তোমার মতো তোমার আশিসও যেন
আমার জীবন-পথে দীপ হয়ে থাকে।

আখ্যাপত্র বাদ দিয়ে এ সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮। সংকলনে ২০টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আখ্যাপত্রে বিনয়ী বচনে আহমদ শরীফ বলেছেন, "সংকলিত রচনাগুলোতে বক্তব্যকে ভাষা দিতে চেয়েছি। নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন বলেই সাহিত্য বানাবার বৃথা চেষ্টা করিনি।" 'সাহিত্য' বলতে আহমদ শরীফ সম্ভবত কলামণ্ডিত ভাষারূপ বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলবার কথা এই, চিন্তা, গবেষণা ও সত্যানুসন্ধান প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাষা পরিচর্যার ধার ধারে না, সেজন্য আহমদ শরীফ বক্তব্য প্রকাশকে কাম্য বিবেচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে কিছু গুরুতর গবেষণামূলক প্রবন্ধ হয়েছে। যেমন, বিদ্যাপতির কাল নিরূপণ প্রসঙ্গ, কিংবা বৈষ্ণব মতবাদ, প্রণয়োপাখ্যান, বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ, অথবা বাংলা ভাষার ব্যাপারে সেকালের লোকদের মনোভাব ইত্যাদি। এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা পরবর্তীকালে 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'মোহিতলালের কাব্যের মূল সুর' প্রবন্ধটি বহু বছর আগে রচিত (১৯৫২)। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার একজন সেরা রূপকার মোহিতলাল মজুমদার সম্বন্ধে বাংলাদেশে এইটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। সংকলিত 'ইংরেজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয়-সূত্র', 'ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা', 'জাতিবৈর ও বাঙলা সাহিত্য' ইত্যাদি প্রবন্ধও গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে এগুলোতে বাঙালি মুসলমানের আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে। কিছু প্রবন্ধ চিন্তামূলক, যেমন 'জাতীয়তা', 'অন্ন ও আনন্দ', 'বিশ্ব সমস্যা' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সংকলিত। প্রবন্ধগুলো হল 'পঁচিশে বৈশাখ', 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে'। ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে উৎসাহী ও অনুরাগী লোকের অভাব ছিল বাংলাদেশে। সে সময় আহমদ শরীফ রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলোর কিছু 'বিচিত চিন্তা'য় কিছু 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' রচনাটির কথা উল্লেখ করতে হয় এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উত্তরকালের আহমদ শরীফের ধারণা ও অভিমতের সূচনা করেছে এই প্রবন্ধটি।

সংকলিত কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে তথ্য :

মোহিতলালের কাব্যের মূলসুর	–	কবি মোহিতলালের কাব্যের মূলসুর নামে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত, ৭.৬.১৯৫২
অন্ন ও আনন্দ	–	পরিক্রম, ফেব্রুয়ারি-জুন সংখ্যা ১৯৬৮
জাতিবৈর ও বাঙলা সাহিত্য	–	পূর্বদেশ, ১৪ আগস্ট ১৯৬৮
মুক্তি অন্বেষায়	–	পূর্বদেশ, ঈদসংখ্যা ১৯৬৮
পঁচিশে বৈশাখ	–	পূর্বদেশ, এপ্রিল, ১৯৬৮
মানবিক সমস্যার সমাধানে সংবাদপত্র	–	পূর্বদেশ, মে ১৯৬৯ (৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫)
ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা	–	পরিক্রম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৮
মসী সংগ্রামীর সমস্যা	–	রচনা ১৫ নভেম্বর ১৯৬৮
জীবন সমাজ ও সাহিত্য	–	পরিক্রম, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৯

AMARBOI.COM

স্বদেশ অন্বেষা

স্বদেশ অন্বেষার প্রথম প্রকাশ ১লা আষাঢ় ১৩৭৭ (মে ১৯৭০); প্রকাশক : কে. এম. ফারুক খান; ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১। মুদ্রণে : এম. এ হাসিম; চাবুক প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং হাউস; ৯১, তাঁতিবাজার, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ এঁকেছেন হারাধন বর্মণ, বইটির মূল্য : সাত টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা, আখ্যাপত্র বাদ দিয়ে ২০৮।

আহমদ শরীফ 'স্বদেশ অন্বেষা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর শাশুড়ি মরহুমা রাবিয়া খাতুন চৌধুরীর স্মরণে। এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের সংখ্যা একুশ। এগুলো সম্পর্কে আহমদ শরীফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখ্যাপত্রে লিখেছেন, 'সংকলিত রচনাগুলো আত্মদর্শন ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণাপ্রসূত।'

'আত্মদর্শন' ও 'আত্মজিজ্ঞাসা' শব্দটি দুটি বুঝে নিতে হবে। আসলে এ হচ্ছে বাঙালি সত্তার স্বরূপ উপলব্ধির অন্তর্তাগিদ। বাঙালির দেশগত ও জাতিগত আত্মানুসন্ধান পরিচ্ছন্ন ইতিহাসজ্ঞানের ও বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আহমদ শরীফের 'স্বদেশ অন্বেষা' একটি তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। ষাট থেকে সত্তর দশকে প্রবল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 'স্বদেশ অন্বেষা'র প্রবন্ধচিন্তা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশ তখনো স্বাধীন হয়নি বটে, কিন্তু বাঙালির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় জানা থাকলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিও দৃঢ় হয়। বলাবাহুল্য, 'স্বদেশ অন্বেষা'র প্রবন্ধগুলো ঐ সময় শিক্ষিত মনে দাগ কেটেছিল।

'স্বদেশ অন্বেষা'য় সংকলিত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল–

বাঙলায় সূফী প্রভাব	–	১৯৬৪
সংস্কৃতির মুকুরে আমরা	–	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
ইতিহাসের ধারায় বাঙালী	–	এই রচনাটি ১৯৬৬ সনে আবদুল আজিজ বাগমার বেনামে ছাত্রলীগের পক্ষে পুস্তিকা রূপে প্রকাশ করেন।
সংস্কার-সততা-সাহিত্য-প্রজ্ঞা-শিক্ষা	–	সংস্কার (২১.১.৬৯) সাহিত্য (২৩.১.৬৯) সংস্কার (৬.৯.৬৯)
বাঙালীর সংস্কৃতি	–	১১ অক্টোবর ১৯৬৯
খাদ্য সংকট : বিশ্ব সমস্যা	–	২০ অক্টেবার ১৯৬৯
শিল্প ও সাহিত্যের গণরূপ	–	২৭ অক্টোবর ১৯৬৯
মিলন ময়দানের সন্ধানে	–	৯ নভেম্বর ১৯৬৯
জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব	–	২৮ ও ২৯ অক্টোবর, ১৯৬৯
রাজনীতি ও গণমানব	–	৪ ও ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
ইতিহাসের আলোকে আত্মদর্শন	–	৬, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
ভাষাপ্রসঙ্গে—বিতর্কের অন্তরালে	–	৯ ও ১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
একটি প্রতারক প্রত্যয়	–	৫ ও ৬ জানুয়ারি, ১৯৭০
কল্যাণ-অন্বেষা	–	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০
নজরুল জিজ্ঞাসা	–	১৬ মার্চ, ১৯৭০
একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য	–	২৭ এপ্রিল, ১৯৭০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে সমাজে সাহিত্যে

'জীবনে সমাজে সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৯৭০ (অগ্রহায়ণ ১৩৭৭); প্রকাশক : আনওয়ারুল হক, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং; ৬০ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১। মুদ্রণ : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৪২-এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা-১। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ছয় টাকা। আখ্যাপত্র বাদ দিয়ে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২।

আহমদ শরীফ 'জীবনে সমাজে সাহিত্যে' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর পিতা আবদুল আজিজকে। উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ : 'সমকালীন জীবনের সমস্যা ও যন্ত্রণার মধ্যে পিতা মরহুম আবদুল আজিজের আদর্শনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা স্মরণ করি।'

এই গ্রন্থে মোট ৩০টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বেশিরভাগ প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্য বিষয়ক। 'বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা', 'সঙ্গীত ও অধ্যাত্ম সাধনা' ও 'নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে' এই তিনটি প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলো আকারে ছোট।

সংকলিত প্রবন্ধগুলোর প্রকাশ কাল :

AMARBOI.COM

বাউল মত ও সাহিত্য	–	১৯৬২-তে রচিত।
জীবনের নিয়ামক	–	আগস্ট ১৯৬৮। পূর্বরচিত একটি প্রবন্ধের পুনর্লিখনের ফল 'জীবনের নিয়ামক' প্রবন্ধটি।
অপ্রেম	–	প্রবন্ধটির প্রথম নাম ছিল 'বিকৃত বুদ্ধি ও অসুস্থ মন', পরে নাম দেওয়া হয় 'অপ্রেম'। রচনা ৩০ আগস্ট ১৯৬৮।
দূর্বা	–	২৯ আগস্ট ১৯৬৮।
একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা	–	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮। এ রচনা পরে পরিক্রম পত্রিকায় ছাপা হয় ডিসেম্বর ১৯৬৮—জানুয়ারি ১৯৬৯
সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য	–	১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
ঐক্যসূত্র	–	৫ অক্টোবর ১৯৬৯
একটি অলস চিন্তা	–	১৭ নভেম্বর ১৯৬৮
জিজ্ঞাসা	–	৩০ নভেম্বর, ১৯৬৮
শিক্ষার হেরফের	–	ইত্তেফাক, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮
একটি আষাঢ়ে চিন্তা	–	১০ ডিসেম্বর ১৯৬৮
প্রতিকার পন্থা	–	১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮, ইত্তেফাকে প্রকাশিত ১৯ ডিসেম্বর ৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের দ্বিতত্ত্ব	–	২০ ডিসেম্বর ১৯৬৮
নজরুল সমীক্ষা- অন্য নিরিখে	–	২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ১৯৬৯
বলাকা কাব্যে মৃত্যু মহিমা	–	১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে	–	৬ মার্চ ১৯৬৯
নজরুল কাব্যে বীর ও বীর্য প্রতীক	–	ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ ১৯৬৯
হবীবুল্লাহ বাহার স্মরণে	–	দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ মার্চ ১৯৬৯
প্রবন্ধসাহিত্য ও গবেষণা সাহিত্য	–	১৭ মে ১৯৬৯
সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ	–	২২ মে ১৯৬৯
ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস	–	অরণি, ২৩ জুন ১৯৬৯
প্রবন্ধ সাহিত্য	–	২৯ জুন ১৯৬৯
বিদ্যা ও বিশ্বাস	–	পাণ্ডুলিপি ৬ জুলাই ১৯৬৯
পূর্ব পুরুষ : উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য	–	৫ ও ৬ জুলাই ১৯৬৯

চট্টগ্রামের ইতিহাস

AMARBOI.COM

'চট্টগ্রামের ইতিহাস' ছাপা হয়েছিল ইতিহাস পরিষদের মুখপত্র 'ইতিহাস' পত্রিকার ৩য় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৬) অতিরিক্ত মুদ্রণ হিসেবে। রচনাটি অসম্পূর্ণ। এতে আছে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি দিয়ে শুরু করে ১৬৬৫ সন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। চট্টগ্রামের রচিত সাহিত্যে কোথায়ও সাম্প্রদায়িকতা নেই এইটি লক্ষ্য করে আহমদ শরীফ বলেছিলেন তিনি চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি সম্পর্কে লিখবেন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই আভাস মিলবে। কিন্তু সেটি আর লেখেননি।

অসম্পূর্ণ হলেও চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে এইটিও একটি গবেষণালব্ধ মূল্যবান রচনা। চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক যে বইগুলোর নাম জানা আছে সেগুলো হল

'Revenue History of Chittagong – H. Cotton 1860

Eastern Bengal Distict Gazetteer Chittagong-O Malley 1908

চাকমা জাতির ইতিহাস—সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯০৯

চট্টগ্রামের ইতিহাস - পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ১৯২০

A Short history of Chittagong .. Syed Ahmadul Haq 1948 চট্টগ্রামের ইতিহাস -মাহবুবউল আলম ১৯৪৯
(পুরানা আমল, নবাবী আমল, ইংরেজ আমল)
History of Chttagong - S.M.Ali 1964
ইসলামাবাদ –আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৯৬৪
উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি দুটি ইতিহাস ও গেজেটিয়ার শ্রেণীর রচনা। একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা যাবে যে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ইতিহাসের উপকরণ অপ্রতুল। ঐতিহাসিক যুগে কোনো রাজা বাদশাহ রাজত্ব করেননি বলে এর একক ইতিহাসও নেই। আর যে কয়টি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোও কোনোটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এই সব রচনায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্য সমাবেশের প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু এগুলোতে ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না। ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ইচ্ছে থেকেই 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' রচনাটির জন্ম। এটি পূর্ণতা পেলে চট্টগ্রামের একটি সুন্দর প্রামাণ্য ও বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস পাওয়া যেত। উল্লেখ যে, অসম্পূর্ণ রচনাটি এর আগে অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

* বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনাকাল দেওয়া হয়েছে। তথ্যাভাবে কিছু প্রবন্ধের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~